রবীন্দ্রনাথের

রাজা ও রানী পরিক্রমা

সম্পাদক

অধ্যাপক ভট্টাচার্য ও বসু

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি

কলিকাতা - ১২

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের নাট্যরচনা হিসাবে **রাজা ও রানী** নাটকখানি নানা দিক দিয়াই রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচক ও পাঠকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। **প্রথমত**, এই নাটকখানি পরবর্তী যুগের 'প্রচলিত নাট্য-রীতিদ্রোহী, অঙ্ক দৃশ্যের নিয়মবহির্ভূত নাটকে'র ন্যায় নয়। **দ্বিতীয়ত**, উত্তরকালে নাটকীয় রসবিচারের ক্ষেত্রে ট্রাজেডি-জাতীয় রচনা রবীন্দ্রনাথ বিশেষ সৃষ্টি করেন নাই, রাজা ও রানী রবীন্দ্রনাথের একখানি উৎকৃষ্ট ট্রাজেডি বলা যাইতে পারে। **তৃতীয়ত**, পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নাট্যসৃষ্টিতে নাটকীয়তা অপেক্ষা গীতধর্মিতাকেই অধিকতর প্রাধান্য দিয়াছেন। সংগীতে-ভাষায়-আবেগে প্রৌঢ় বয়সের রবীন্দ্রনাট্য কাব্যধর্মে প্রচুরভাবে অভিষিক্ত। কিন্তু প্রথম পর্বের রাজা ও রানী কাব্যনাট্য হওয়া সত্ত্বেও নাটকীয়তায় সমৃদ্ধ। **চতুর্থত**, পরবর্তী জীবনের রবীন্দ্রনাট্যে ঘটনার গতি মন্দীভূত; নাট্যসংস্থান নির্মাণে নানাবিধ বৈচিত্র্যকর দৃশ্যবস্তুর সংযোজনায় রবীন্দ্রনাথের প্রযত্ন বা কৌতূহল প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু এইদিক দিয়াও রাজা ও রানী ব্যতিক্রম। ইহার পাঁচটি অঙ্কের মোট তিরিশটি দৃশ্যের ঘটনাবস্তু নির্মাণ করিতে কবিকে যে বেগ পাইতে হইয়াছে, তাহা পরবর্তী কোনো নাটকের ক্ষেত্রে দৃষ্ট হয় না।

রাজা ও রানী নাটকের এক প্রান্তে আছে **মায়ার খেলা**, **মানসী** এবং আর এক প্রান্তে আছে **বিসর্জন-মালিনী**। ১২৯৫ সালের বৈশাখ হইতে আষাঢ় পর্যন্ত গাজিপুরে রচিত কবিতাগুলির মধ্যে প্রেমের যে আবেগসর্বস্বতা প্রকাশ পাইয়াছে, মায়ার খেলা নাটকে তাহারই এক সাংগীতিক রূপ এবং রাজা ও রানীতে উহার নাট্যরূপ দৃষ্ট হয়, এইরূপ বলা যায়। **মানসীর 'গুপ্ত প্রেম'** কবিতায় কবি বলিয়াছিলেন,

প্রেম যে চুপে চুপে ফুটিতে চাহে রূপে
মনেরই অন্ধকূপে থেকে যায়।

এই অন্ধকূপাবৃত প্রেমের সহিত প্রেমের প্রকাশবেদনার সংশয়দ্বন্দ্বে পীড়িত কবিচিত্ত বলে,

তবে প্রেমের আঁখি প্রেম কাড়িতে চাহে,
মোহনরূপ তাই ধরিছে,

আমি যে আপনায় ফুটাতে পারি নাই
পরান কেঁদে তাই মরিছে।

বস্তুত, প্রেম এক মহান সম্পদের ন্যায়, তাহা অমরাবতী অপেক্ষা মহীয়ান্‌, তাহা জীবনের তমো দূর করে ; তাই কুরূপা নারী পর্যন্ত বলে,

আমি আমার অপমান সহিতে পারি
প্রেমের সহে না তো অপমান।

চিত্রাঙ্গদা নাটিকাতেও এই রূপব্যতিরিক্ত প্রেমের বিজয় প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে। রূপাকাঙ্ক্ষার দ্বারা প্রেম যদি বঞ্চিত হয় তবে চিত্রাঙ্গদার জীবনে আসে গ্লানি। সুমিত্রাও ঠিক একই কারণে যথার্থ প্রেমের বদলে আসক্তির মধ্যে গ্লানি অনুভব করিয়াছিল। আবার বিক্রমদেবও প্রতিহতপ্রেম রোষে একদিন উপলব্ধি করিয়াছিলেন, মায়ার খেলার মত,

ভালবেসে যদি সুখ নাহি
তবে কেন মিছে ভালবাসা।

এই দিক দিয়া মায়ার খেলার সঙ্গেই ইহার সাদৃশ্য। স্মরণ রাখা দরকার যে গাজিপুর হইতে ফিরিয়া পুনরায় কবি সোলাপুর যান এবং সেখানেই এক মাসের মধ্যে রাজা ও রাণী লিখিত হয়। মানসী, কাব্যের একটি মাত্র কবিতা সোলাপুরে রচিত দেখা যায়, ইহার নাম 'প্রকাশবেদনা'। এই প্রকাশবেদনা কবিচিত্তেরই একটি তৎকালীন অভিজ্ঞতা, এই প্রকাশবেদনাই তাঁহার সমগ্র সৃষ্টিতে সংক্রামিত ও নাট্যচরিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে। কবি বলিয়াছেন,

আপন প্রাণের গোপন বাসনা
টুটিয়া দেখাতে চাহি রে—
হৃদয়বেদনা হৃদয়েই থাকে
ভাষা থেকে যায় বাহিরে।

এই অস্ফুটতা এই পর্বে বিক্রমদেবের মধ্যে আছে, কুমারসেন ইলার প্রেমের মধ্যে আছে, দেবযানী-কচের মধ্যেও প্রেমের এই গোপনীকৃত মর্মব্যথার প্রকাশ দেখি। ইহারই রূপান্তর হয়ত দুঃখবাদ, এই পর্বের নাট্য-রচনায় এক ধরনের নিহিলিজম্‌কে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। পর পর

কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যাইতে পারে। যেমন, মানসীর 'প্রকাশবেদনা' কবিতায় দেখি,

আমি চেয়ে থাকি শুধু মুখে
ক্রন্দনহারা দুখে—
শিরায় শিরায় হাহাকার কেন
ধ্বনিয়া উঠে না বুকে?

মানসীর 'মায়া' কবিতায়,

বৃথা এ বিড়ম্বনা!
কিসের লাগিয়া এতই তিয়াষ
কেন এত যন্ত্রণা!

'নিষ্ফল কামনা' কবিতায়,

বৃথা এ ক্রন্দন,
বৃথা এ অনল-ভরা দুরন্ত বাসনা।

বাল্মীকি-প্রতিভায় বাল্মীকির মুখে ইহার পূর্বাভাস,

জীবনের কিছু হল না হায়,
হল না গো হল না হায় হায়!
গহনে গহনে কত আর ভ্রমিব, নিরাশার এ আঁধারে?
শূন্য হৃদয় আর বহিতে যে পারি না,
পারি না গো পারি না আর।

মায়ার খেলার সর্বত্রই এই প্রকাশবেদনা অনুস্যুত হইয়া আছে, মায়া-কুমারীগণ অন্তরাল হইতে এই হৃদয়বেদনার কোরাস গাহিতেছে। কখনো,

কাছে আছে দেখিতে না পাও
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও।

অথবা, নিমেষের তরে শরমে বাধিল
মরমের কথা হল না,
জনমের তরে তাহারি লাগিয়া
রহিল হৃদয়বেদনা।

ইহার সহিত তুলনীয় রাজা ও রানী নাটকে বিক্রমদেবের আর্তনাদ,

রাজা আমি পৃথিবীর কাছে, তুমি শুধু

জান মোরে দীন বলে। ঐশ্বর্য আমার
বাহিরে বিস্তৃত—শুধু তোমার নিকটে
ক্ষুধার্ত কঙ্কালসার কাঙাল বাসনা।

এই নৈরাশ্যবাদ চরমে উঠিয়াছে বিসর্জনের জয়সিংহের চিত্তে,

চলে যা অপর্ণা! দয়া মায়া স্নেহ প্রেম
সব মিছে! মরে যা অপর্ণা! সংসারের
বাহিরেতে কিছুই না থাকে যদি, আছে
তবু দয়া মায়া, মৃত্যু। চলে যা অপর্ণা।

এই নৈরাশ্যের নাট্যরূপই রাজা ও রানী এবং বোধহয় ইহা বলা অবান্তর হইবে না যে, নাট্যতত্ত্বে ট্র্যাজেডি নামক আঙ্গিকের প্রতি প্রসক্তি হইতেই রবীন্দ্রনাথ রাজা ও রানী বা বিসর্জনের মত নাটক রচনা করেন নাই, পরন্তু তাঁহার কবিচিত্তের এই সমকালীন প্রকাশবেদনা ও নৈরাশ্যবাদই এই সকল নাটকের বিয়োগান্ত পরিণতি নিশ্চিতভাবে নির্ধারিত করিয়া দিয়াছে। ইহা রবীন্দ্রনাথের নিকট জানা ছিল বলিয়াই, উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন মানসিক অবস্থায় রাজা ও রানী সম্পর্কে অস্বস্তিবোধ করিয়াছেন, ইহাকে রূপান্তরিত করিয়া নূতন নাটক সৃষ্টি করিয়াছেন, নীহারিকা ভাঙিয়া জ্যোতিষ্ক রচনা করিয়াছেন। ঠিক একই কারণে রাজা ও রানী সম্পর্কে তিনি লিরিক-প্রাবল্যের অভিযোগ করিয়াছেন। ইহা সজ্ঞান আত্মসমালোচনা এবং তাহা অনেকাংশেই সত্য। কোনো কোনো সমালোচক রবীন্দ্রনাটকের মর্মরহস্য অনুধাবন করিতে না পারিয়া নাট্যতত্ত্বের পাণ্ডিত্যাভিমানে রবীন্দ্র-নাট্যের বিকৃত সমালোচনা করিয়াছেন, রাজা ও রানীর হাস্যকর শিশুসুলভ বিচার করিয়াছেন।

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রাজা ও রানীর পর্যালোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,

"রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেমের মূল কথা হইতেছে সংযম। প্রেমে সংযমের অভাব হইলে উহা কী নিষ্ঠুর, কী কুৎসিত হয়, তাহা এই নাট্যে বিক্রমের মুগ্ধ ভালবাসায় প্রকাশ পাইয়াছে। মোহবশে রাজা বিক্রম তাঁহার মানসপ্রেমকে দেহের মধ্যে খুঁজিয়া ফিরিতেছেন। সুতরাং তাহা পদে পদে পরাভূত হইতেছে, এবং যতই সে প্রতিহত হইতেছে, ততই

তাহাকে পাইবার জন্য জিদ বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহারই পাশাপাশি কবি ফুটাইয়াছেন সুমিত্রাকে। যথার্থ প্রেমের মর্যাদা রক্ষার জন্য নারী কতদূর আত্মসংযম ও আত্মত্যাগ করিতে পারে, তাহাই দেখি এই মহীয়সী নারীর চরিত্রে। প্রেমকে কেবল আপনার ভোগের সামগ্রী করিব বলিয়া চাপিয়া ধরিলে সে প্রেম নিবিয়া যায়। 'রূপ নাহি ধরা দেয় বৃথা সে প্রয়াস'—এই বাণী মানসী যুগেরই। 'কড়ি ও কোমলে'ও সেই সুর শুনিয়াছিলাম 'পবিত্র প্রেম' ও 'পবিত্র জীবন' কবিতাদ্বয়ে। মানসীর মধ্যেও সেই সুরটি বারে বারে নানা ছন্দে ঝঙ্কৃত হইতেছে।"

ইহাই নাটকের লিরিক লক্ষণ। ঘটনার বৈচিত্র্য ও তাৎপর্য, আকস্মিকতা ও করুণ পরিণামকে ছাপাইয়া যখন নাটকের এই তত্ত্বটি শেষ পর্যন্ত তাঁহার কাব্যজীবনের সহিত ওতপ্রোত হইয়া আমাদের নিকট স্থায়ী হয়, তাহাকেই বলা যায় রবীন্দ্রনাটক। নাট্যরীতি বা তত্ত্বের শুদ্ধির কষ্টিপাথরে তাহার সর্বদা বিচার হয় না। রবীন্দ্রনাথে নাট্যসাহিত্য প্রসঙ্গে ইহা বিশেষভাবে ছাত্রছাত্রীদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে।

মায়ার খেলা গীতপ্রধান নাটক, বিসর্জনেও একাধিক সংগীত আছে, একমাত্র মালিনীতে কোনো গান নাই, রাজা ও রানী নাটকে কয়েকটি গান আছে। সাধারণত ভাবমুখ্য রবীন্দ্রনাটকে গানগুলি নাট্যকারের নিজস্ব সংলাপ, কিন্তু রাজা ও রানী নাটকে সংগীতের প্রয়োগ সেইরূপ তাৎপর্যপূর্ণ ও সংকেতবাহী নয়। পক্ষান্তরে তপতীর সমগ্র নাট্যদেহ গীতব্যঞ্জনায় কম্পিত হইয়াছে। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে জনৈক শৈলনকের গান 'ঐ আঁখি রে' নাট্যধর্মের সঙ্গে বিশেষ সম্পৃক্ত নয়। ঐ অঙ্কে দ্বিতীয় দৃশ্যে সখীদের গান 'যদি আসে তবে কেন যেতে চায়', পঞ্চম দৃশ্যে সখীর গান 'বাজিবে সখী বাঁশি বাজিবে' এবং 'ঐ বুঝি বাঁশি বাজে' কুমারসেন-ইলার প্রেমের ললিত-লাবণ্যময় পটভূমিকা বিস্তার করিয়াছে। তবে শেষের দুইটি গানের মধ্যে নাট্য-পরিণামের প্রতি ঈষৎ সম্পর্ক আছে। কুমারসেন ও ইলার আসন্ন মিলন যে সহসা অপরিহার্য ব্যর্থতায় পরিণত হইবে, ইহা তাহার প্রতি নাটকীয় আয়রনি মাত্র। পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে কাশ্মীরবাসিগণের হাটের গান 'যমের দুয়োর খোলা পেয়ে', ইহাও গভীর তাৎপর্যযুক্ত নয়। চতুর্থ দৃশ্যে ইলার গান 'আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি' ইলার ব্যথাক্ত

হৃদয়ের বিরহ-বেদনার গান। সখী ও ইলার সংগীতগুলি আবহে মানসিকতায় সুরে ও ভাষায় মাধব খেলাকে মনে করায় মাত্র। ইহার পর ঘটনা এত দ্রুতগতিতে সংঘটিত হইয়াছে যে, এই প্রবল ঘটনাস্রোতের মধ্যে, আকস্মিক পরিণতি ও অনিবার্য বিস্ময়ের ভিতর সংগীত-যোজনার কোনো অবকাশ নাট্যকার পান নাই। মোটের উপর রাজা ও রানী নাটকের গানগুলি ইহার নাট্য-প্রয়োজনের সঙ্গে অপরিহার্যভাবে যুক্ত হইয়া উঠে নাই।

রাজা ও রানী পরিক্রমা ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী করিয়াই লিখিত হইয়াছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাট্যের রসগৌরবকে ক্ষুণ্ণ করা হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ প্রতিভা তাঁহার নাট্যরচনায় কী ভাবে রূপসৃষ্টি করিয়াছে, তাহার যথাসম্ভব ব্যখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের নাটক কেবল নাটকরূপেই পঠনীয় নয়, ইহা রবীন্দ্রনাথের নাটক, এই সত্যটি সমালোচকগণ ভুলিয়া যান। তাই বাজারে প্রচলিত গ্রন্থে ছাত্রদের নিকট পরীক্ষার মোক্ষসাধনের যে-সকল মন্ত্রগুপ্তি পেশ করা হয়, তাহা যেন স্বল্পজ্ঞানীর নিকট অনুস্বরবিসর্গের ছলনার দ্বারা সংস্কৃতের প্রতীতি-উৎপাদন মাত্র। যাঁহারা অশেষ জ্ঞানসমুদ্র পাড়ি দিয়া দুই চারিটি ইংরাজি-উদ্ধৃতির ঝিনুক-খোলস দিয়া পুঁথি ভরান, তাহাদের সম্পর্কে সচেতন হইবার সময় আসিয়াছে। আমরা ছাত্রসমাজকে বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, **গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নাটকের রীতিতে রবীন্দ্রনাট্য-সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার করা মূঢ়তা।** আমাদের গ্রন্থে তাহা করা হয় নাই। ইহা রাজা ও রানীরই বিচার এবং এক হিসাবে রবীন্দ্রনাট্য-পরিক্রমারই অঙ্গ। যাহাদের জন্য এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহাদের নাট্য-কৌতূহল, রসবোধ ও বিচার-শক্তিকে জাগাইতে পারিলে সম্পাদকদ্বয় তাঁহাদের শ্রম সফল বোধ করিবেন।

অধ্যাপক ভট্টাচার্য ও বসু
সম্পাদক
রাজা ও রানী

সূচীপত্র

রাজা ও রানী পরিক্রমা

রবীন্দ্র-প্রতিভার স্বরূপ ঃ

লক্ষ আলোকবর্ষ দূরের নক্ষত্র যদি সহসা আমাদের পৃথিবীর পথে নামিয়া আসে, তাহার ছায়পথস্পৃষ্ট মহাশূন্যের রহস্য এবং অনন্ত জ্যোতির্মণ্ডলীর ধূসরতম নীহারিকা যদি সহসা স্পষ্ট হইয়া উঠে, আর এই সমগ্র অভাবনীয় বিস্ময় যদি একটি মানবরূপ ধারণ করে, তবেই তাহা রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ও অস্তিত্বের সহিত উপমিত হইতে পারে। কত লক্ষ বৎসরের তপস্যার ফলে মানব-ইতিহাসে এই আনন্দ-মাধবীর আবির্ভাব ঘটে, জগৎ-সংসারের কত যুগের নিঃশব্দসঞ্চারী চিন্তা একটি মহাকবির বাণীতে বাঙ্ময় হইয়া উঠে!

রবীন্দ্রনাথের সৌরকর আমাদের জীবনকে নানাভাবে স্পর্শ করিয়াছে, 'সূর্যকরঘাতে শৈলতুষারের মত' বিগলিত হইয়াছে আমাদের জীবন। জড়ত্বের হিমবাহ, মূর্ছাতুর রক্ষণশীলতা, স্তম্ভিত অতীতের আবরণ উন্মোচন করিয়া নব জীবনের আবেগে গত এক শতাব্দীর মধ্যে ভারতবর্ষের নবজন্ম হইয়াছে।

প্রতিভার সহিত অঙ্গারের তুলনা করা যাইতে পারে। ইহা একদিকে যেমন বহু সহস্র বর্ষের তরুলতার সমাহিত রূপান্তর, অন্যদিকে ইহা অনন্ত শক্তির উৎস, আগ্নেয় দীপ্তির উপকরণ। আবার অঙ্গারের মধ্যেই নিহিত থাকে বহু রাসায়নিক পদার্থের সম্ভাবনা, খাদ্য ও প্রসাধন, ঔষধ ও গৃহনির্মাণ পদার্থ, এমন শত শত বস্তু। রবীন্দ্র-প্রতিভাও বহুগা, কাব্যের সরোবর প্লাবিত করিয়া তাহা গল্প উপন্যাস নাটক প্রবন্ধ ইতিহাস বিজ্ঞানের উপত্যকা-বন্ধুর ভূমি, পর্বতসানু বেলাভূমি সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁহার একটিমাত্র পরিচয়কেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন তিনি কবিমাত্র। জগতে আনন্দ যজ্ঞে তিনি নিমন্ত্রিত অতিথি এবং তৃণে-পুলকিত এই মৃন্ময় বসুন্ধরার প্রতি তাঁহার বীণার একটি মাত্র ঝঙ্কার ঃ যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই। তাঁহার উক্তির

শৈশবের প্রথম ছন্দ-সচেতন দিনগুলি হইতে জীবনের শেষ মুমূর্ষু প্রহরগুলি পর্যন্ত তিনি কাব্যলক্ষ্মীর নিকট কখনও কপটতা করেন নাই। তাই তাঁহার জীবনদর্শন ও আদর্শ কবির মনোলোক হইতে উদ্ভাসিত হইয়াছে। সৌন্দর্যপ্রিয়তা ও সীমার রেণুতে অসীম অনির্বচনীয়ের চকিত রহস্যস্ফুরণ প্রত্যক্ষ ও অনুভব করাই কবিরূপে তাঁহার সাধ্যসাধন তত্ত্ব। বিশ্বের রহস্য তাঁহার নিকট কখনও নিঃশেষ হয় নাই। প্রেম তাঁহার নিকট চিরকালই দেহের গুণ্ঠন অপসারিত করিয়া ইন্দ্রলোকের অমৃতবারির বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছে। প্রকৃতি তাঁহার নিকট দূর প্রতিবেশী নয়, জীবজগৎ ও জড়প্রকৃতির মধ্য দিয়া একই প্রাণধারার প্রবহমানতা তিনি স্বীকার করেন। তাই পৃথিবীর সৌরপরিক্রমার মধ্য দিয়া, ঋতুর আবর্তনের ভিতর দিয়া, মৃত্তিকার তলদেশচারী বীজের অঙ্কুরোদ্গমের মধ্য দিয়া কবি তাঁহার জীবন-বিবর্তনের রহস্য অনুভব করেন। প্রেমের মধ্যে যেমন তিনি অনন্ত জন্মজন্মবাহিত লীলায় বিশ্বাসী, আষাঢ়ের মধ্যে তিনি তেমনি যুগান্তরের বর্ষণমুখরতাকে প্রত্যক্ষ করেন। এইভাবে বর্তমানের সহিত দূর অতীত ও অনাদ্যন্ত কালের যোগসাধনায় তাঁহার কবিধর্ম কখনও ক্লান্ত হয় নাই। তাঁহার কাব্যেতর সৃষ্টিতেও এই জীবনাদর্শেরই প্রতিবিম্বন ঘটিয়াছে। সর্বোপরি তিনি পরিপূর্ণ মনুষ্যমহিমায় বিশ্বাস করিতেন, ক্ষণস্থায়ী নরজন্মকে তিনি মহৎ মর্যাদা দান করিয়াছেন। অমরলোকের বীণায় এই মানুষের নামটি অভ্রান্ত বিশ্বাসে তিনি বাজাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার কথাসাহিত্যে, গল্পে-উপন্যাসে-নাটকে এই পূর্ণতার প্রতি, মনুষ্যত্বের ধ্রুব আদর্শটির প্রতি তাঁহার দৃষ্টিপ্রদীপ অনির্বাপ্য রাখিয়াছেন তিনি। যেখানে এই মহিমা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, সেখানে তিনি বেদনা অনুভব করিয়াছেন, কখনও তাঁহার ক্রোধ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। জীবনের সহজ স্বাভাবিক, বাধাবন্ধহীন, শোষণপীড়নমুক্ত, শস্যসম্ভব শ্যামলতার প্রতি তাঁহার আকর্ষণ ছিল সর্বাধিক; সমাজের শাস্ত্রানুমোদিত মনুষ্যরচিত আত্মঅনাদরকে তিনি ঘৃণা করিতেন, ধর্ম তাঁহার কাছে শাশ্বত মানবধর্ম ও সত্য বলিয়া বোধ হইয়াছে। ইহাই তাঁহার কবিজীবনের মর্মবাণী, ইহাই তাঁহার অন্যান্য সাহিত্যেরও মর্মবাণী।

দীর্ঘ এক শতাব্দীর ত্রি-চতুর্থ যুগ বাঙলা দেশকে যিনি গরুড়ের মত পক্ষপুটে আশ্রয় দান করিয়াছেন, তিনি একমাত্র কবি ছিলেন ইহাও তাঁহার

সম্পর্কে সর্বশেষ উক্তি নয়। রাজনীতি সমাজনীতি অর্থনীতি বিষয়ে তিনি অনুৎসাহ পশ্চাদবর্তী ছিলেন না। ইংরাজ রাজত্বের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে অবগাঢ় হইয়া আবার শেষ জীবনে সেই সাম্রাজ্যবাদকেই তিনি ধিক্কার জানাইয়া গিয়াছেন। রাষ্ট্রের একনায়কতন্ত্র তাঁহার নিকট অকাম্য, তাঁহার আদর্শ শাসক হইবেন রাজর্ষি যুগপৎ শাসন ও ক্ষমতার, ভোগ ও ত্যাগের, সহিষ্ণুতা ও তিতিক্ষার প্রতীক। তাঁহার সমাজচেতনায় মানবই আদর্শ। অসংখ্য প্রবন্ধে নাটকে কাব্যে এই সামাজিক আদর্শের ধ্রুব সাফল্য তিনি নিঃসংশয়িত ভাষায় ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। দেশের সকল প্রকার বৈপ্লবিক শক্তি, আন্দোলন ও নেতৃত্ব, উত্তেজনা ও তারুণ্যের প্রতি তাঁহার গভীর যোগ ছিল, সকলের প্রতি ছিল তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি। একদা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিয়া সমগ্র জাতিকে তিনি উন্মাদ করিয়া ছিলেন। তাহার পর সুখে দুঃখে অভাবে পীড়নে পর্যুদস্ত হইয়াও বাঙালী তাঁহার 'সোনার বাঙলা' গান গাহিয়া চলিয়াছে। মাতৃভাষাকে তিনি অস্ফুট কলতান হইতে সহসা দৃপ্ত-যৌবনে সঞ্জীবিত করিয়াছেন। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবন ও তাহার শতলক্ষ শাখা-প্রশাখা রবীন্দ্ররসে অপরিসীম পুষ্ট হইয়াছে। রবিশস্যে পুষ্ট দেশ আজ বিশ্বের কাছে ঐ একটি নামে পরম শ্লাঘা অর্জন করিয়াছে।

য়ুরোপীয় হিউম্যানিজম্ এবং রোমান্টিক কবিসমাজের সৌন্দর্যচেতনার সহিত ঔপনিষদিক অনাবিল ব্রহ্মচেতনার বিচিত্র সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিমানস গড়িয়া উঠিয়াছে। তাঁহার সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে কোথাও তিনি মানুষের অবমাননা করেন নাই। কাব্য-নাটক-উপন্যাস-গল্প-প্রবন্ধ-সংগীত-চিত্রকলা প্রতিটি শিল্পের সোপানের উপর চরণ রাখিয়া তিনি এক পরম নন্দনতীর্থে উপনীত হইয়াছেন যেখানে শিল্পের কোনো গোত্র নাই, কোনো সংকীর্ণ সংজ্ঞা নাই। তুচ্ছের মধ্যে পরম মূল্য আবিষ্কার, স্থূলের মধ্যে সূক্ষ্মের রাগিণী-অন্বেষণ, সামান্যের মধ্যে অসামান্যের হিরণ-কিরণ লাভ, রূপের পাত্রে অরূপ মধুপিপাসাই তাঁহার সংগীত-সাধনার চূড়ান্ত সাফল্য। নিরবধিকাল ও বিপুলা পৃথিবীর নিকট শেষ পর্যন্ত তাঁহার কোন্ সৃষ্টি অবিনশ্বর হইয়া থাকিবে ইহা সীমাবদ্ধ ভৌমগুলিক জীবের পক্ষে ধারণা করা দুঃসাধ্য, কিন্তু মনে হয় তাঁহার সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে তাঁহার সংগীতগুলি পূর্ণতম সৃষ্টি। এমন সূক্ষ্ম

মর্ম-রহস্য-উন্মোচক মাধুর্য আর অন্য কোনো সৃষ্টিতে সম্ভবত নাই। জীবনের সকল আনন্দ বেদনাকে স্পর্শ করিয়া, তুচ্ছ বৃহতের মালা গাঁথিয়া ইহা এক অসীম অব্যক্তের কণ্ঠে পরাইয়া দেয়। তথাপি সমকালের তটে দাঁড়াইয়া আমরা তাঁহার সমগ্র সৃষ্টির লবণাম্বু-তরঙ্গকেই অনুভব করিয়াছি, ইহাই আমাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। সেই দুরবগাহ মহাম্বুধির শীকরকণায় সিক্ত হইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি। তাঁহার মানব-আদর্শ আমাদের পাথেয়, তাঁহার স্বদেশ প্রেম আমাদের শোণিতপ্রবাহ, তাঁহার ধর্ম আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার আনন্দ আমাদের আবাম, তাঁহার প্রেম আমাদের প্রেয়, তাঁহার সংগীত আমাদের উজ্জীবন।

সংক্ষেপে রবীন্দ্র-প্রতিভার স্বরূপ কে নিরূপণ করিবে?

রবীন্দ্র-প্রতিভা বিচিত্র ও বহুমুখী। সেই জন্যই তাহা ব্যাপক আলোচনা-সাপেক্ষ। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, রবীন্দ্র-প্রতিভার কথা চিন্তা করিয়া শুধু বিস্মিত হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

বস্তুত তিনি সাহিত্য তথা শিল্পের সকল বিভাগেই তাঁহার অনন্যসাধারণ-সৃষ্টি-প্রতিভার মৌলিক স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি একাধারে কবি, গীতিকার, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক, দার্শনিক, ঔপন্যাসিক এবং নাট্যকার। এই বিশেষ বিশেষ শাখাগুলির প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তিনি শিল্পী বা সাহিত্যিক হিসাবে অদ্বিতীয়। শুধুমাত্র আঙ্গিক বা ভাবের দিক দিয়াই যে এইগুলি বিশেষভাবে সমৃদ্ধ তাহাই নহে, সংখ্যার দিক দিয়াও তাঁহার সৃষ্টি অতুলনীয় সন্দেহ নাই। বাস্তবিকপক্ষে, সব দিক বিবেচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের সহিত একাসন লাভ করিয়াছেন। তাঁহার এই অতুলনীয় প্রতিভার আলোকে শুধু যে বাংলা সাহিত্যই আলোকিত হইয়াছে তাহা নহে, বলা যাইতে পারে রবীন্দ্র-প্রতিভার আলোকে সমস্ত বিশ্বমানব-সমাজ আলোকিত। সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া তিনি সাহিত্য সাধনা করিয়াছেন। তিনি নিত্য নূতন ভাবের আলোকে মানব-জীবনকে মহত্তর পথে চালিত করিতে চাহিয়াছেন, মানুষের আত্মিক-বিকাশের ও সংস্কৃতির নব নব পথ ও অধ্যায় রচনা করিয়া শিল্পের বেদীমূলে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। এইভাবে রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়া মানব-সমাজ এক বিচিত্র জীবনের সন্ধান পাইয়াছে। রবীন্দ্র-প্রতিভার সোনার কাঠির স্পর্শে আমাদের জড়-জগতের

ঘুম ভাঙিয়াছে; এক বিচিত্র রূপলোকের দ্বার আমাদের নিকট উন্মুক্ত হইয়াছে।

একথা ঠিক যে, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক হিসাবে সকল বিভাগকেই স্পর্শ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সবচেয়ে বড়ো পরিচয় তিনি কবি। একথা তিনি 'ছিন্নপত্রাবলী'তে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি যাহাই লিখুন না কেন, তাঁহার সবচেয়ে বড়ো পরিচয়—তিনি কবি। নিজের প্রতিভা বা সৃষ্টি সম্পর্কে কবির এই উক্তি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বলা যাইতে পারে, একথা গভীর ভাবে সত্য। বাস্তবিকপক্ষে, তাঁহার সমস্ত সৃষ্টির মধ্যেই এই কবিপ্রতিভাই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে। যখন তিনি গল্প-উপন্যাস লিখিয়াছেন, তখনো তাহা গোপন থাকে নাই, যখন তিনি চিঠি লিখিয়াছেন, তাঁহার কবি-সত্তা আপনিই বিকশিত হইয়াছে, যখন তিনি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তখনো তিনি যে মূলতঃ কবি, তাহা স্বাভাবিকভাবেই ধরা পড়িয়াছে, এমন কি যখন তিনি নাটক লিখিতে বসিয়াছেন, তখনো তাঁহার এই বিশেষ সত্তাটি পরিপূর্ণভাবেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, তাঁহার সমস্ত সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে কবি-সত্তার প্রেরণা। আর কবিসত্তার মূল কথাই হইল রূপের মধ্যে অরূপের সন্ধান, সাধারণ সহজেই কবির চোখে অসাধারণ বলিয়া প্রতিভাত হয়। অর্থাৎ কবি জীবনের মধ্য হইতে এক বিচিত্র রস সন্ধান করিয়া জীবনকে তাহারই জারকে রসায়িত করেন। এমন যে শিল্পী-সত্তা, স্বভাবতই জীবনের ছবি তাহার দ্বারা অন্যভাবে অঙ্কিত হয়। রবীন্দ্রনাথও এই কারণেই যখনই কিছু বলিতে বসিয়াছেন, তখন বাইরের জগতের মধ্যেই তাঁহার দৃষ্টি সীমাবদ্ধ থাকে নাই—বাহিরের রূপলোকের মধ্যে অরূপের সন্ধান করিয়াছেন। তাই, রবীন্দ্র-শিল্পলোক গভীর স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ, তাহা আপন স্বরূপে আপনি ধন্য।

শিল্প-সৃষ্টির মূলে থাকে নানা উপাদান। বাইরের জগতে যে মন নানা পথে বিচরণ করিয়া বেড়ায়, তাহাই আবার অন্তরের মধ্যে নানা রঙের নানা রূপের মালা গাঁথিয়া রাখে। এমনি করিয়া শিল্পী-মন অন্তরে বাহিরে পরিভ্রমণ করে। রবীন্দ্রনাথের শিল্পী-প্রতিভা মূলত অন্তর্মুখীন, তাই তাঁহার সৃষ্টিতে বাহিরের জগৎ প্রধান হইয়া দেখা দেয় নাই, মূলত তিনি অন্তর্লোকের কবি। অর্থাৎ মন্ময়তাই তাঁহার সৃষ্টির ও সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ।

কিন্তু তাই বলিয়া তিনি কোন কিছুকে অবহেলা করেন নাই। তিনি অন্তর্লোকে প্রবেশ করিতে চাহিয়াছেন বাহিরের দুয়ার অতিক্রম করিয়াই। বরং বলা চলে, তিনি সব কিছুকেই গ্রহণ করিয়াছেন, কিছুই বাদ দেন নাই। তাই দেখি, একদিকে যেমন ভারতীয় তথা বাংলার শিল্প, সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার গভীর আগ্রহ, তেমনি য়ুরোপীয় সংস্কৃতির প্রতিও তাঁহার উৎসাহের অন্ত নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষ যেমন তাহার সাহিত্য ও সংস্কৃতির পসরা লইয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে, তেমনিই নবীন ভারতবর্ষও তাঁহার চিত্তদুয়ার হইতে ফিরিয়া যায় নাই। এইভাবে রবীন্দ্র-প্রতিভা নানা উপাদানকে আত্মসাৎ করিয়া বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যের ও সংস্কৃতির সহিত তাঁহার পরিচয় গভীর ছিল বলিয়াই তিনি সহজেই দুইটিকে সহজেই মিলাইতে পারিয়াছেন। কালিদাস, জয়দেব, বৈষ্ণব কবিবৃন্দ যেমন তাঁহার দোসর, তেমনিই সেক্সপীয়র গ্যেটে শেলী প্রমুখ য়ুরোপীয় কবি। রামায়ণ, মহাভারত, অভিজ্ঞান শকুন্তলম্‌, গ্রাম্য ছড়াব প্রতি যেমন উৎসাহ, তেমনি উৎসাহ দেখা যায় মেঘনাদবধ, রাজসিংহ এমন কি তাঁহার সমসাময়িক কালের কোন অখ্যাত তরুণ লেখকের রচনার প্রতি। এইভাবে দেখিতে পাই, যে রবীন্দ্র-প্রতিভা যখনই যেখানে কিছু দেখিয়াছে, তাহা ছাইয়ের মতো উড়াইয়া তাহার মধ্য হইতে মাণিকরতনের সন্ধান করিয়াছে। এই জন্যই নানা রূপ-রসের সমন্বয়ে এক মৌলিক অনন্যসাধারণ অপূর্ব সাহিত্যলোক সৃষ্টি করা সম্ভবপর হইয়াছে। আর, এইসব কারণেই রবীন্দ্র-প্রতিভার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিতে হয়—রবীন্দ্র-প্রতিভা বিচিত্র ও বহুমুখী।

রবীন্দ্র-নাটকের প্রকৃতি ও শ্রেণীবিভাগ :

নাটক-প্রসঙ্গ :

সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মধ্যে নাটকের একটি বিশিষ্ট রূপ ও ধর্ম আছে, তাহা গল্প, উপন্যাস, কবিতা হইতে পৃথক। কাব্য মূলত কবিমনের রূপায়ণ। মহাকাব্যে চরিত্র-সৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহার মূলে থাকে কল্পনার ঘনঘটা। তেমনি গীতিকাব্য একান্তভাবেই আত্মগত সৃষ্টি।

উপন্যাসের ক্ষেত্রে লেখকের স্বাধীনতা থাকে অনিয়ন্ত্রিত এবং বিস্তৃত পরিসরে তাহার পটভূমি রচিত হয়। সেখানে অসংখ্য নরনারী ভিড় করিয়া আসে, এবং তাহারা সকলেই বাস্তব জগতের মানুষ। বস্তুত, কাব্য বা উপন্যাসের মধ্যে লেখককে আমরা কখনো দেখি দ্রষ্টার ভূমিকায়, কখনো বা ভাষ্যকারের ভূমিকায়। অর্থাৎ তাহার মধ্যে লেখকের অস্তিত্ব সহজেই অনুভব করা যায়।

কিন্তু নাটকের শিল্প-রীতি বা প্রকৃতি ভিন্ন। তাহার সুযোগ সংকীর্ণ, পরিবেশ সীমিত এবং অভিব্যক্তির রীতিও স্বতন্ত্র। কোনো একটি চলমান ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন চরিত্রের ভাষণ ও কার্য দ্বারা যে রূপ প্রতিবিম্বিত হয়, তাহাই নাটকের শিল্প-রূপ। নাটকের মধ্যে তাই নাট্যকারকে দেখা যায় না, তাঁহার বিশেষ কোন প্রবণতাও যে সহজে ধরা যায়, এমন কথাও বলা চলে না। নাটকের মধ্যে নাট্যকারের স্থান নেপথ্যবর্তী, শিখণ্ডীর অন্তরালস্থিত অর্জুনের মতো। একটি ঘটনার সুরু হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত ধাবিত যে অনিবার্য গতি পাত্র-পাত্রীর সংলাপ ও কার্যকে অবলম্বন করিয়া রূপায়িত হয়, তাহার মধ্যে নাট্যকারের বিশেষ কোনো বক্তব্যও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যে ভাব-কল্পনা চিন্তার বিকাশ নাটকের মধ্যে দেখা যায়, তাহা বিভিন্ন চরিত্রের অঙ্গীভূত হইয়াই তাহাদের মুখে অভিব্যক্ত হয়। সেই ভাব-কল্পনা, দৃষ্টিভঙ্গী বা মতবাদ নাটকীয় চরিত্রের মনোজগতের চিত্র,— উহাদের দ্বারা বিশেষ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বা স্বধর্মই উদ্‌ঘাটিত হইয়া থাকে, প্রত্যক্ষভাবে তাহাদের সহিত নাট্যকারের কোন যোগ থাকে না। বাস্তবিকপক্ষে, জীবন নাটকের মধ্যে বর্ণনীয় কোনো ব্যাপার নহে, তাহা সম্পূর্ণভাবেই দর্শনীয়। সাহিত্যের এই বিশিষ্ট রূপের মধ্যে অকারণে কোথাও কিছু ঘটে না। কাব্যেরও বিশেষ সুযোগ নাই। যদি কিছু-বা থাকে, তবে তাহা পাত্রপাত্রীর অন্তরের মধ্যে। ঘটনার সহিত সংযুক্ত চরিত্রের সুখদুঃখ, উত্থান-পতনের তাগিদ অনুসারেই যাবতীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ শিল্পীর এই নৈর্ব্যক্তিকতা (impersonality) অথবা নির্লিপ্ততাই (detachment) নাট্যকলার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

তাছাড়া, নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বস্তুধর্মিতা (objectivity)। নাটকের মধ্যে মনোজগতের স্থান আছে, কিন্তু তাহার উপাদানগুলি সজ্জিত থাকে বাহিরের বস্তুগত (objective) জগতে। মানব-জীবন নাট্যশিল্পের

মূল বস্তু। মানুষের দেহ, অন্তর, বুদ্ধির বিচিত্র অভিজ্ঞতার সমষ্টির উপর তাহার আসন প্রতিষ্ঠিত। দেশ, কাল, পাত্রের বিভিন্নতা সত্ত্বেও যে ছবি নাটকের মধ্যে রূপায়িত, তাহা মানব-জীবনেরই অংশ মাত্র। মানব-জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই—প্রতিটি ঘটনারই সূচনা, বিকাশ ও পরিণতি থাকে। সেই অনিবার্য ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কার্য, ভাব-কল্পনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখদুঃখ আবর্তিত হইতে হইতে শেষে পরিণতি লাভ করে। নাটকের মধ্যে এই প্রবহমান ঘটনা, তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট নরনারীর হৃদয়ের আকৃতি, চিন্তা, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সংহত ও সুসংবদ্ধ আকারে রূপায়িত হয়।

বাস্তবিকপক্ষে, ঘটনার ক্রমবিকাশ বা ঘটনাসঞ্জাত গতিই (action) হইল নাটকের প্রাণ। ঘটনার আবর্তের মধ্য দিয়া চরিত্রগুলি বিকশিত হইয়া উঠে এবং ঘটনার দ্বারাই নাটকের কাহিনীটি বিবৃত হয়, অথবা বলা যায়, দৃশ্যগুলির অবগুণ্ঠন যেন অনাবৃত হইতে থাকে। ঘটনার মধ্য দিয়াই সমস্ত নাটকীয় বিষয়টি যেন পাঠক বা দর্শকের নিকট ধরা দেয়। নরনারীর চরিত্রচিত্রণই যেহেতু নাট্যকারের উদ্দেশ্য, তাই নাটকে গতিশীল ঘটনাপুঞ্জ একান্তভাবেই অপরিহার্য। নানা ঘটনার সংঘাতে কাহিনী ধীরে ধীরে পরিণতির দিকে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হইতে থাকে। নাটক আসলে বাস্তবজীবনের অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। বাস্তবজগতের নরনারীর হৃদয়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্ব নানা পরিস্থিতিতে নূতন আলোকের দীপ্তিতে আমরা নূতন করিয়া দেখি এবং মানব-জীবনের নিবিড় রহস্যের মুখোমুখি দাঁড়াই। তাই গতিশীল বাস্তবজীবনের একটা প্রতিচ্ছবি না দেখিলে পাঠক বা দর্শকের রসপিপাসা চরিতার্থ হয় না।

ঘটনার এই যে সংঘাত, তাহা সৃষ্টি হইয়া থাকে দুইটি বিপরীতধর্মী পরস্পর-বিরুদ্ধ শক্তির বিরোধ বা দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া। এবং এই বিরোধই নাটকের মেরুদণ্ড বলা চলে। নাটকের সূচনায় এই বিরোধের বীজ রোপিত হয়, পরে তাহাই আবার বিকশিত হইয়া পরিণতি লাভ করে।

সাধারণত দেখা যায়, বিরুদ্ধশক্তির সংঘাতের দ্বারা যে দ্বন্দ্ব বা জটিলতার উদ্ভব হয়, তাহাই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া এক সময় এমন চরমে পৌঁছায়, যখন বিরুদ্ধশক্তির মধ্যে একটির জয় ও অন্যটির পরাজয় সুস্পষ্ট হয়।

অতঃপর ঘটনার গতি অনিবার্যরূপেই সেই সম্ভাব্য জয়ের অনুকূলে অগ্রসর হইয়া নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটায়। এই বিরুদ্ধশক্তির মধ্যে ভালো মন্দের দ্বারা অথবা মন্দ ভালোর দ্বারা কিংবা পুণ্য পাপের দ্বারা বা পাপ পুণ্যের দ্বারা পরাজিত হইতে পারে। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া Hudson উল্লিখিত নাটকের কথাবস্তু-সংঘটনের মূল নীতিগুলি উল্লিখিত করা গেল :

We have, to begin with, some Initial Incident or Incidents in which the conflict originates ; Secondly, the Rising Action, Growth, or complication, Comprising that part of the play in which the conflict continues to increase in intensity, while the outcome remains uncertain ; thirdly, the Climax or turning point, at which one of the contending forces obtains such controlling power that henecforth its ultimate success is assured ; fourthly, the Falling Action, Resolusion, or Dénouncement, comprising that part of the play in which the stages in the movement of events towards this success are marked out ; and fifthly, the Conclusion or Catastrophe, in which the conflict is brought to a close.

[An Introduction to the Study of Literature.

ইহা ব্যতীত তিনি সূচনায় Introduction বা Exposition নামে প্রারম্ভিক স্তরের কথাও বলিয়াছেন। অবশ্য, আমাদের সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রেও এই বিষয়ে অনুরূপ আলোচনা রহিয়াছে—'নাটকং খ্যাতবৃত্তস্যাৎ পঞ্চসন্ধি সমন্বিতং।' মূলত, এই ভাবেই নাটকের আখ্যানভাগ পরিকল্পিত বা সন্নিবেশিত হয়।

নাটকের সমস্ত আখ্যানভাগ পূর্বানুযায়ী পরিকল্পিত হয়। বস্তুত, প্রতি অংক বা অংকের মধ্যস্থিত দৃশ্যগুলি পূর্ববর্তী সূত্রানুসারে গ্রথিত হয়। Introduction বা সূচনাতে নাটকীয় বিষয়বস্তু বা বিরোধের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অতঃপর, Hudson যাহাকে Initial Incident এবং Rising Action বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে সেই বিরোধ অঙ্কুর-অবস্থা হইতে আত্মপ্রকাশ করে। তাহার পর Climax-এর মধ্যে সেই বিরোধই সর্বোচ্চ

স্তরে উঠিয়া সমস্ত ঘটনাপ্রবাহকে এক প্রবল সংঘাতের মুখোমুখি করিয়া দেয়। অবশেষে সেই দ্বন্দ্ব নামিয়া আসিতে থাকে, ঘটনাগুলির পরিণতি অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। এইভাবে Falling Action এবং Catastrophe-তে সমস্ত দ্বন্দ্ব বা সংঘাতের অবসান ঘটে। পরিণতি যদি প্রাপ্তির আনন্দে বা মিলনের আনন্দে উদ্ভাসিত হয়, তবে তাহাকে মিলনান্ত বলা হয় এবং তাহার বিপরীত ঘটিলে তাহাকে বিয়োগান্ত বলা হয়।

একটা কথা স্পষ্ট করিয়া মনে রাখা দরকার। নাটকের গঠন-কৌশল অনুসারে সাধারণত দেখা যায় তৃতীয় অংকেই নাটকের চরম বিকাশ বা climax ঘটে। কিন্তু তাহা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হইতে পারে। অঙ্ক বিভাগ বা দৃশ্য বিভাগ যে ভাবেই করা হউক না কেন, পূর্ববর্তী নাটকীয় ঘটনা-সংস্থানের পূর্ব-উল্লিখিত পাঁচটি পর্যায় সব নাটকে কোন-না-কোন ভাবে থাকিবেই। এমন কি একাংশ নাটকের মধ্যেও। সর্বোপরি, আগেই বলিয়াছি, দুইটি বিরুদ্ধশক্তি বা ব্যক্তি-সত্তার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়াই নাটকীয়-সংঘাত বা action সৃষ্টি হয়। কাজেই, যে কোন নাটকে এই দুই শ্রেণীর চরিত্রের অবতারণা করা হয়।

নাট্যবিচার করিতে গিয়া এই কথাগুলি স্মরণ রাখা কর্তব্য।

রবীন্দ্র নাটকের প্রকৃতি ঃ

রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত কবি বলিয়াই তাঁহার প্রতিভার স্বরূপই হইতেছে, যে তাহা লিরিক্যাল বা গীতিধর্মী। আত্মভাবমূলক কবিতা বা গান তাঁহার প্রতিভার উপযুক্ত বিকাশস্থল। তাছাড়া, তাঁহার কবি-মানস একান্তভাবেই মন্ময় বা subjective। তাই ব্যক্তিগত ভাব ও অনুভূতির আলোকে জীবন ও জগৎকে দেখিয়াছেন। বাহিরের বস্তুজগৎ তাঁহার অনুভূতি ও কল্পনার ইন্দ্রধনুচ্ছটায় অনুরঞ্জিত হইয়া একান্তভাবেই মনোজগতের এক নিভৃত কোন আশ্রয় করিয়াছে। যে প্রতিভা একান্তভাবে গীতিপ্রবল, তাহার রহস্যই এই যে, সব কিছুকেই তাহা নিজস্ব মনের আলোকে আলোকিত করে। তাই বাহিরের দিকে দৃষ্টি থাকিলেও তাহার মধ্যে অন্তর্নিহিত যে রূপ-রস লুকায়িত থাকে, তাহারই সন্ধানে সে ব্যাপৃত থাকে। রবীন্দ্রনাথের জীবনের সুরু হইতেই এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

বলা বাহুল্য, এইরূপ প্রতিভা নাটকের পক্ষে সাফল্যকর নয়। কারণ, নাটকের বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতা নির্ভর করে বস্তুময়তার উপর। যাঁহারা গীতিপ্রবণ, তাহাদের নাটকগুলি শেষপর্যন্ত তাঁহাদের স্বকীয় কল্পনার বাহন ও হৃদয়োচ্ছ্বাসের লীলাভূমি হইয়া দাঁড়ায়। সমস্ত নাটকের আড়ালে বা সামনে গীতি-প্রবাহ তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথের নাটকের বেলায় ইহা একান্তভাবে সত্য হইয়া উঠিয়াছে। তাই দেখি, তাঁহার নাটক গীতিকাব্য হইতে পৃথক নয়, এবং সব নাটকই কোন-না-কোন তত্ত্বের বাহন।

এই কারণেই তাঁহার নাটকগুলি তথাকথিত বাস্তবতার দাবী রক্ষা করে নাই। তাঁহার নাটকগুলি তাই কাব্যসমৃদ্ধ ও ভাবসমৃদ্ধ রূপ লাভ করিয়াছে। বস্তুত, কাব্য ও তত্ত্বের রূপায়ণই তাঁহার নাটকের বিশিষ্ট মূর্তি।

হয়ত এই কারণেই, একান্তভাবে কবি বলিয়াই, তিনি সাধারণ নাট্যকলার অনুসরণ করেন নাই। তিনি নিজস্ব এক নাট্যজগৎ রচনা করিয়াছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি যুরোপীয় নাট্যকলার অনুসরণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহাও রবীন্দ্রনাথের শিল্পী-সত্তার গুণে অনন্যসাধারণ হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত তাই দেখা যায়, নাটকের আখ্যানভাগ, চরিত্র-সৃষ্টি বা নাটকের পরিবেশ—কোন কিছুই বিশেষ কালের মধ্যে আবদ্ধ না হইয়া কালাতীত রূপ ধারণ করিয়াছে অর্থাৎ সেগুলি সর্বদেশের সর্বকালের হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্র-নাটকে তাই বলিয়া যে দ্বন্দ্ব নাই বা সংঘাতের অভাব ঘটিয়াছে, এমন মনে করা সমীচীন নহে। তবে সেই দ্বন্দ্ব ব্যক্তি বনাম ব্যক্তির নয়, অথবা ঘটনা বনাম ঘটনার সংঘাত নয়। বরং, সেই সংঘাত সৃষ্টি হইয়াছে ভাবের দ্বন্দ্বের বা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়া অর্থাৎ একটি ভাব বা idea-কে কেন্দ্র করিয়াই। রবীন্দ্র-নাটকের পরিমণ্ডল, প্লট, ঘটনাপুঞ্জ ও সংঘাত সৃষ্ট, নিয়ন্ত্রিত ও ঘনীভূত। Edward Thompson রবীন্দ্র-নাটকে 'Pressure of Thought' লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, এই কারণেই রবীন্দ্র-নাটকগুলি নাটকীয়তার দিক হইতে মন্থর।

বাল্মীকি-প্রতিভা, কালমৃগয়া ও মায়ার খেলা গীতিনাট্যের পর রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্য রোমান্টিক ট্র্যাজেডীর আদর্শানুসরণে নাট্য-রচনায় হাত দেন।

রাজা ও রানী, বিসর্জন, এবং মালিনীর মধ্যে বাহিরের বস্তুধর্মী উপাদান এবং দ্বন্দ্বসংঘাতময় আখ্যানভাগ থাকিলেও এই নাটকগুলি দাঁড়াইয়া আছে বিভিন্ন ভাবের বা তত্ত্বের উপর। পরবর্তী কাব্যনাট্যগুলির মধ্যেও তাহাই লক্ষ্য করি। বিদায় অভিশাপ, গান্ধারীর আবেদন, নরকবাস, সতী প্রভৃতি কাব্যনাট্য তো প্রত্যক্ষভাবেই তত্ত্বের বাহন। তাহার পর আসিল সাংকেতিক বা রূপক-নাট্যের যুগ। বিশেষভাবে লক্ষণীয়, সাংকেতিক নাটকের পূর্ববর্তী এই নাট্যধারার মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট আখ্যান-ভাগ রহিয়াছে, তদনুযায়ী চরিত্রগুলিও কতকটা বস্তুধর্মী হইয়া উঠিয়াছে, অন্তত তাহাদের মধ্যে রক্তমাংসের আস্বাদ পাওয়া যায়। কিন্তু অচলায়তন, মুক্তধারা, রক্তকরবী প্রভৃতি রূপক বা সাংকেতিক নাটকগুলি মূলত ভাব বা তত্ত্বপ্রধান। বরং বলা চলে, একটি তত্ত্বকে রূপ দিবার জন্যই যেন নাটকের অবতারণা করা হইয়াছে।

রবীন্দ্র-নাটকের শ্রেণীবিভাগ ঃ

রবীন্দ্র-নাট্যধারার আদিতে রহিয়াছে গীতিনাট্য, সর্বশেষ স্তরে রচিত হইয়াছে নৃত্যনাট্যগুলি। ইহার মধ্যবর্তী পর্বে ক্রমান্বয়ে রচিত হইয়াছে কাব্যনাট্য, কৌতুকনাট্য, রূপক-সাংকেতিক নাট্য, ইত্যাদি। নাটকের প্রকৃতির দিক হইতে রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :—

[ক] **গীতিনাট্য** [সংগীতপ্রধান]

১. বাল্মীকি-প্রতিভা,
২. কালমৃগয়া
৩. মায়ার খেলা

[খ] **কাব্যনাট্য** [কাব্যপ্রধান]

১. চিত্রাঙ্গদা
২. বিদায় অভিশাপ
৩. গান্ধারীর আবেদন
৪. সতী
৫. নরকবাস

৬. কর্ণকুন্তী সংবাদ
৭. লক্ষীর পরীক্ষা

[গ] **রোমান্টিক ট্রাজেডী** [কাব্য ও নাটকের সমন্বয়]
১. রাজা ও রানী [তপতী]
২. বিসর্জন
৩. মালিনী

[ঘ] **রূপক-সাংকেতিক নাটক** [ভাব ও তত্ত্বপ্রধান]
১. প্রকৃতির প্রতিশোধ
২. শারদোৎসব [ঋণশোধ]
৩. রাজা [অরূপরতন]
৪. অচলায়তন [গুরু]
৫. ডাকঘর
৬. ফাল্গুনী
৭. মুক্তধারা
৮. রক্তকরবী
৯. কালের যাত্রা
১০. তাসের দেশ

[ঙ] **সামাজিক নাটক** [সামাজিক পরিবেশমূলক]
১. প্রায়শ্চিত্ত [পরিত্রাণ]
২. গৃহপ্রবেশ
৩. শোধবোধ
৪. নটীর পূজা
৫. চণ্ডালিকা
৬. বাঁশরী
৭. মুক্তির উপায়

[চ] **কৌতুকনাট্য** [কৌতুকপ্রধান]
১. গোড়ায় গলদ
২. বৈকুণ্ঠের খাতা
৩. চিরকুমার সভা

৪. হাস্যকৌতুক
৫. ব্যঙ্গ কৌতুক

[চ] ঋতুনাট্য [ঋতু-আশ্রয়ী ও গীতপ্রধান]
১. শেষবর্ষণ
২. বসন্ত
৩. নবীন
৪. নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা
৫. শ্রাবণ গাথা

[ছ] নৃত্যনাট্য [নৃত্যপ্রধান]
১. শাপমোচন
২. চিত্রাঙ্গদা
৩. শ্যামা
৪. চণ্ডালিকা

রোমান্টিক ট্র্যাজেডী : রাজা ও রানী :

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় সেক্সপীয়রের আদর্শানুসরণে নাটক-রচনা সুরু হয়। সেক্সপীয়র কমেডীও রচনা করিয়াছেন বটে, তবে ট্রাজেডীর জন্যই তাঁহার খ্যাতি বেশী, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। গ্রীক ট্রাজেডীর সাহিত্য-গৌরব প্রাচীন কাল হইতেই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে এবং এই ট্রাজেডী-গুলি সাহিত্য-পাঠকের অতি প্রিয়। এইভাবে ট্রাজেডীর ধারাটি সেক্সপীয়র এবং অনুবর্তী নাট্যকারদের মধ্যে অব্যাহত থাকিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে ট্রাজেডী বলিয়া কিছু ছিল না বলিলেই হয়। অথচ সাহিত্য-শিল্পে ট্রাজেডীর স্থান অতি উচ্চে। গত শতাব্দীতে নব্য যুরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে ইহার প্রতি গভীর আসক্তি দেখা গিয়াছিল। নাট্যকারবৃন্দও সেক্সপীয়রের অনুসরণে ট্রাজেডী রচনায় হাত দেন। এমনি করিয়া বাংলা সাহিত্যে ট্রাজেডীর উদ্ভব ঘটে। বাঙালীর সাহিত্য-চেতনায় একদা ওথেলো, ম্যাকবেথ প্রভৃতি নাটক যে কী গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা বোধ করি শিক্ষিত বাঙালীর অজানা নাই। সৌভাগ্যবশতঃ, পূর্বসূরীদের গতানুগতিক অনুসরণ না করিয়াও, রবীন্দ্রনাথ সেক্সপীয়রের অনুসরণে

ট্রাজেডী রচনায় হাত দেন। রবীন্দ্রপ্রতিভা যদিও কোন বিশেষ শিল্পধারার অন্ধ অনুসরণের পক্ষপাতী নহে, তথাপি কেন যে রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত বিসর্জন, রাজা ও রানী-র মতো ট্রাজেডী রচনায় হাত দিলেন, তাহা বিস্ময়ের কথা। অন্য কারণ যাহাই থাকুক না কেন, একথা ঠিক, এই বিশেষ শিল্প তাঁহাকে গভীরভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল এবং নিঃসন্দেহে তিনি ট্রাজেডীর সাহিত্য বা শিল্প-মূল্য সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। বস্তুতঃ, ট্রাজেডীর সাহিত্য-মূল্য বা সাহিত্য-গৌরব প্রাচীন গ্রীসেই স্বীকৃত ছিল। তাই দেখি Aristotle সাহিত্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা প্রধানতঃ ট্রাজেডীকে কেন্দ্র করিয়া। Aristotle ট্রাজেডীকে এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

A Tragedy, then, is an imitation of an action that is serious and also, as having magnitude, complete in itself; in language with pleasurable accessories, each kind brought in separately in the parts of the work; in a dramatic, not in a narrative form; with incidents arousing pity and fear, wherewith to accomplish its catharsis of such emotions

[On the Art of Poetry—Aristole—Ingram Bywater.

এই ট্রাজেডীকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—classical এবং Romantic. গ্রীক-ট্রাজেডীগুলি প্রধানতঃ classical ট্রাজেডী বলিয় অভিহিত এবং সেক্সপীয়র যে সব ট্রাজেডী রচনা করেন, সেইগুলি Romantic ট্রাজেডীর পর্যায়ে পড়ে। অবশ্য, চুলচেরা বিচারে সেক্সপীয়রের ট্রাজেডী-গুলির মধ্যে কোথাও কোথাও calssical উপাদান যে নাই, তাহা বলা যায় না।

বস্তুতঃ, classical ও Romantic ট্রাজেডীর মধ্যে প্রকৃতি ও গুণগত পার্থক্য রহিয়াছে। Aristotle ট্রাজেডীর যে সংজ্ঞা দিয়াছেন বা স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য অর্থাৎ কতকগুলি সাধারণ ধর্ম উভয় ক্ষেত্রেই বিদ্যমান থাকে (পূর্বে উল্লিখিত ইংরাজী উদ্ধৃতি স্মরণযোগ্য), কিন্তু তথাপি বাহ্যত কিছু পার্থক্য রহিয়াছে।

প্রথমতঃ ক্লাসিকাল ট্রাজেডীর যে দ্বন্দ্ব বা সংঘাত তাহা ব্যক্তির সহিত

পরিবেশের, পক্ষান্তরে রোমান্টিক ট্রাজেডীর দ্বন্দ্ব বা সংঘাত ব্যক্তির অন্তরের দ্বন্দ্ব। দ্বিতীয়তঃ, ক্লাসিকাল ট্রাজেডীতে ত্রয়ী ঐক্য (Three unities : Tjme, Space and Action) মানা হয়, অন্যদিকে রোমান্টিক ট্রাজেডীতে এই নিয়ম মানিবার প্রয়োজন নাই। তৃতীয়তঃ, রোমান্টিক ট্রাজেডীতে সংলাপ গদ্য অথবা পদ্যে—উভয় ভাষাতেই রচিত হইতে পারে, কিন্তু ক্লাসিকাল ট্রাজেডীর ভাষা একান্তভাবেই কাব্য। তাছাড়া, ক্লাসিকাল ট্রাজেডীতে Chorus এক অপরিহার্য অঙ্গ, পক্ষান্তরে রোমান্টিক ট্রাজেডীতে তাহার স্থান নেয় স্বগত উক্তি (Soliloquy)।

রোমান্টিক ট্রাজেডীর এই প্রকৃত-বিচারে সেক্সপীয়রের ট্রাজেডীগুলিকে রোমান্টিক ট্রাজেডী বলিয়া গণ্য করিতে হয়। অবশ্য, একথা ঠিক যে, রোমান্টিক ট্রাজেডী হইলেও, কোনো কোনো নাটকে ক্লাসিক উপাদান রহিয়াছে। যেমন, Tempest নাটকের Theme বা বিষয়বস্তু রোমান্টিক, কিন্তু কলা-শৈলী বা Technique-এর দিক থেকে বিচার করিলে দেখা যাইবে, তাহা ক্লাসিক।

বাস্তবিক পক্ষে, সেক্সপীয়রের রোমান্টিক ট্রাজেডীগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবেযে, এই সব নাটকে এক অভিজাত জীবন-কাহিনী চিত্রিত হইয়াছে, বাস্তব জগতের ঊর্ধ্বলোকে তাহার স্থিতি এবং শিল্পীর গগনচুম্বী কল্পনায় ঘনঘটায় নাটকগুলি কাব্যরসে রসায়িত। গ্রীক-ট্রাজেডীর মধ্যে দেখা যায় Nemesis-এর প্রভাবে বা এক অদৃশ্য দৈবী শক্তির ক্রীড়নক হইয়া সব কিছু ঘটনা ঘটিতেছে, চরিত্রগুলিও যেন তাহারই হাতছানিতে অসহায়-ভাবে স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছে। সেক্সপীয়রের মধ্যে তাহার পরিবর্তে দেখিলাম—Nemesis নহে, নিয়তির পরিবর্তে চরিত্রের ত্রুটিই তাহার পতনের মূলে রহিয়াছে অর্থাৎ Character is destiny. এ্যারিস্টটল ট্রাজেডীর প্রতিক্রিয়া হিসাবে Pity এবং Fear-এর কথা বলিয়াছেন। যখন দেখি একজন মহৎ মানুষ বা বীর নিয়তির খেয়ালে বা সামান্য চারিত্রিক ত্রুটির জন্য অসহায়ভাবে মৃত্যুর মুখে আগাইয়া চলিয়াছে, স্বভাবতঃই তখন একদিকে তাহার জন্য অন্তরের নিভৃত কোণে করুণার সঞ্চার হয়। এবং সেই সঙ্গে সেই ভীষণ পতনের চিত্র দেখিয়া মনের মধ্যে ভীতির সঞ্চারহয়। ক্লাসিকাল ট্রাজেডীর মতো রোমান্টিক ট্রাজেডীতেও এক মহৎ-জীবনের করুণ পরিণতির

চিত্রই অংকন করা হয়। কিন্তু, ক্লাসিকাল ট্রাজেডীর যে সংঘাত, তাহা ব্যক্তি বনাম পরিবেশের। ব্যক্তির সহিত পরিবেশের সংঘর্ষের মধ্য দিয়াই ব্যক্তির পতনের চিত্রটি রূপায়িত হয়। কিন্তু, ব্যক্তির হৃদয়ের মধ্যেই রোমান্টিক ট্রাজেডীর যাবতীয় দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। অবশ্য, তাহা শেষ পর্যন্ত বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।

এই সূত্রানুযায়ী 'রাজা ও রানী'র প্রকৃতি বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, এই নাটকের মধ্যে রোমান্টিক ট্রাজেডীর সবগুলি উপাদান বা গুণ বিদ্যমান রহিয়াছে। বিক্রমদেব রাজা, তাঁহার চরিত্রের মধ্যেও রাজকীয় গুণের অভাব নাই। বিক্রমদেব নিজের অন্তরের তৃপ্তির জন্যই বাহিরের জগৎকে তুচ্ছ করিয়াছিলেন।

কী হবে প্রমাণ!
চলিছে বিশাল রাজ্য বিশ্বাসের বলে;
যার পরে রয়েছে যে ভার, সযতনে
তাই সে পালিছে। প্রতিদিন তাহাদের
বিচার করিতে হবে নিন্দাবাক্য শুনে,
নহে ইহা রাজধর্ম। আয়, যাও ঘরে,
করিয়ো না বিশ্রামে ব্যাঘাত।

যাহার জন্য রাজ্যের প্রতি এত অবহেলা, সেই সুমিত্রাই যখন তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া গেল, তখন বিক্রমদেবের অন্তরে সংঘাত দেখা দিল। তিনি তাহাকে পাইবার জন্য আকুল হইলেন—

এখনো সময় আছে,
এখনো ফিরাতে পারি পাইলে সন্ধান।
আবার সন্ধান! এমনি কি চিরদিন
কাটিবে জীবন! সে দিবে না ধরা, আমি
ফিরিব পশ্চাতে! প্রেমের শৃঙ্খল হাতে
রাজ্য রাজধর্ম ফেলে, শুধু রমণীর
পলাতক হৃদয়ের সন্ধানে ফিরিব।

সুমিত্রাকে না পাইয়া বিক্রমদেবের মনের প্রতিক্রিয়া—

পুণ্য গেল, স্বর্গ গেল,
রাজ্য যায়—অবশেষে সেও চলে গেল।

তবে দাও, ফিরে দাও ক্ষাত্রধর্ম মোর ;
রাজধর্ম ফিরে দাও, পুরুষহৃদয়
মুক্ত ক'রে দাও এই বিশ্ব-রঙ্গ মাঝে।

একদিকে সুমিত্রার প্রতি অন্তরের আকর্ষণ, অন্যদিকে পৌরুষের আহ্বান। এই দুয়ের দ্বন্দ্বেই বিক্রমদেবের অন্তর ভরিয়া উঠিয়াছে। তাই বিজয়িনীর বেশে যখন সুমিত্রা শিবির-দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন বিক্রমদেব তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন—

চুপ করো সেনাপতি, শোনো যাহা বলি।
রুদ্ধ করো দ্বার—এ শিবিরে শিবিকার
প্রবেশ নিষেধ।

অতঃপর যাহা ঘটিল, তাহার মূলে রহিয়াছে বিক্রমদেবের আহত পৌরুষের প্রচণ্ড অভিমান। ইলাকে পাইবার আশায় যখন তিনি ব্যগ্র, তখন ইলার মুখ হইতে তাহার অন্তরের পরিচয় পাইয়া হঠাৎ মনে পড়িয়া গিয়াছে সুমিত্রার স্মৃতি—

শুন তবে মোর কথা।
এক কালে চরাচর তুচ্ছ করি আমি
শুধু ভালবাসিতাম। সে প্রেমের 'পরে
পাড়ল বিধির হিংসা—জেগে দেখিলাম
চরাচর পড়ে আছে, প্রেম গেছে ভেঙে।

সবশেষে সুমিত্রার মৃত্যু ; যাঁহাকে পাইবার জন্য এতো আয়োজন, অন্তরের হাহাকার—তাঁহাকে পাওয়া গেল না। বস্তুতঃ, বিক্রমদেবের অন্তর্দ্বন্দ্বই এই নাটকের সমস্ত সংঘাতের ও ঘটনার মূলে। রোমান্টিক ট্র্যাজেডীর এই বিশিষ্ট লক্ষণটি এই নাটকে সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই নাটকে যাহা কিছু ঘটিয়াছে—তাহার মূলে রহিয়াছে রাজার চারিত্রিক ত্রুটি বা দুর্বলতা। নিয়তি নহে, বিক্রমদেবের চরিত্রের দুর্বলতাই সুমিত্রার মৃত্যু ডাকিয়া আনিয়াছে ; তাঁহার চরিত্রের ছিদ্রপথে ট্র্যাজেডী তাহার শিকড় চালাইয়া দিয়া নাটকের পরিণতিকে এমনি করুণ ও বেদনাঘন করিয়াছে।

অবশ্য সুমিত্রার মৃত্যুর ঋণ বিক্রমদেবকে মৃত্যু দিয়া পরিশোধ করিতে হয় নাই, যেমন দেখা যায় সেক্সপীয়রের নাটকে। এই নাটকের ট্র্যাজেডী

তাই আরো গভীর, আরো ভয়ানক। কেননা মৃত্যুই মধ্যেই বিক্রমদেবের যন্ত্রণার অবসান ঘটিল না, সেই দুঃসহ বিয়োগ-ব্যথা এবং ক্ষমাহীন যন্ত্রণার মধ্যেই বিক্রমদেবকে বাঁচিয়া থাকিতে হইল। সুমিত্রার ভালোবাসায় যে রোমান্স ছিল, তাহা অবশেষে অশ্রুকণায় পরিণত হইল। তাই, বিক্রমদেবের জন্য হৃদয়ের একপ্রান্তে করুণার সঞ্চার হয়, অন্যদিকে সুমিত্রার কথা ভাবিয়া জীবন সম্পর্কে ভীতি জাগে।

সেক্সপীয়রের নাটকের আদর্শে এই নাটকের সংলাপ গদ্য এবং পদ্যে রচিত। সাধারণতঃ অভিজাত বা উচ্চবর্গীয় চরিত্রের সংলাপ পদ্যে রচিত হইতে দেখি এবং সাধারণ শ্রেণীর চরিত্রের সংলাপ গদ্যে রচিত। এই সংলাপরূপের বিশেষ আদর্শ রবীন্দ্রনাথ 'রাজা ও রানী' নাটকে বজায় রাখিয়াছেন। তবে, প্রসঙ্গক্রমে মনে রাখা দরকার, আমাদের সংস্কৃত নাটকেও এই আদর্শ চোখে পড়ে। রাজা, প্রভৃতি অভিজাত পুরুষ চরিত্রের সংলাপ সংস্কৃত ভাষায় রচিত এবং স্ত্রীলোক বা সাধারণ ব্যক্তির সংলাপ প্রাকৃত ভাষায় রচিত। তবে, সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ সেক্সপীয়রের আদর্শই অনুসরণ করিয়াছিলেন। সর্বোপরি, এমনও হইতে পারে যে, যেখানে গভীর আবেগ উৎসারিত, সেখানেই সংলাপকে তদনুযায়ী আবেগপূর্ণ করিবার জন্য পদ্যের অবতারণা করিতে হইয়াছে।

সেক্সপীয়রের নাটকের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য স্বগত উক্তি (Soliloquy)। বস্তুতঃ, নায়ক-নায়িকার মনের দ্বন্দ্ব-চিত্রটি স্বগতোক্তির মধ্যে ধরা পড়ে। এই নাটকেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এই ভাবে সেক্সপীয়রের রোমান্টিক ট্রাজেডীর আদর্শে এই নাটকের বিচার করিলে দেখা যায় যে, রাজা ও রানী একটি পূর্ণাঙ্গ রোমান্টিক ট্রাজেডী।

সবশেষে একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার। এই নাটকের কাহিনী আপাতদৃষ্টিতে ঐতিহাসিক বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। বস্তুতঃ, তাহা নহে। জালন্ধর, কাশ্মীরকে কেন্দ্র করিয়া রবীন্দ্রনাথ একটি কাল্পনিক কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন। বিক্রমদেব, শিলাদিত্য, জয়সেন, চন্দ্রসেন, কুমারসেন, সুমিত্রা প্রভৃতি নামের মধ্যে হয়ত-বা ঐতিহাসিক চরিত্রের আভাস রহিয়াছে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাহা নহে। রোমান্টিক কাহিনীর অন্যতম উপাদান হইল অতীতের ইংগিত। হয়ত বা রোমান্টিকতার এই লক্ষণের

জন্যই রবীন্দ্রনাথ এমন এক কল্পনাশ্রয়ী অতীত রোমান্টিক জগতের আশ্রয় লইয়াছেন। অর্থাৎ রোমান্টিক ট্রাজেডী রচনা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ সচেতনভাবেই এই নাটককে রোমান্টিক ট্রাজেডীর সর্বপ্রকার উপাদানে সজ্জিত করাইয়াছেন। রাজা ও রানী তাই নিঃসন্দেহে সার্থক রোমান্টিক ট্রাজেডীর রূপ লইয়াছে।

নাট্য-বিশ্লেষণ

পঞ্চমাঙ্ক নাটকের রীতি অনুযায়ী এই নাটক পাঁচটি অঙ্কে সমাপ্ত। প্রতিটি অঙ্কই আবার কয়েকটি দৃশ্যে বিভক্ত। প্রথম অঙ্কে রহিয়াছে ৮টি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে ৪টি দৃশ্য, তৃতীয় অঙ্কে ৫টি দৃশ্য, চতুর্থ অঙ্কে ৪টি দৃশ্য, এবং সর্বশেষ পঞ্চম অঙ্কে ৯টি দৃশ্য রহিয়াছে। দেখা যাইতেছে, রবীন্দ্রনাথ সচেতন ভাবেই রোমান্টিক-ট্রাজেডীর আদর্শে এই নাটক রচনা করিয়াছেন এবং গঠন-কৌশলের দিক দিয়া বিচার করিলে, ইহা নিঃসন্দেহে পূর্ণাঙ্গ নাটকের সবগুলি দাবীই পূরণ করিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, রবীন্দ্র-নাটকের অধিকাংশই পূর্ণাঙ্গ নাটক নহে ; যে কয়েকটি নাটক তাহার ব্যতিক্রম, রাজা ও রানী তাহাদের অন্যতম। এই দিক দিয়া রবীন্দ্র-নাট্যে এই নাটকটির একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে।

প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য সুরু হইয়াছে বিক্রমদেব ও দেবদত্তের কথোপকথনের মধ্য দিয়া। বিক্রমদেব রাজা, এই নাটকের নায়ক। দেবদত্ত তাঁহার বন্ধু। সুরুতেই দেখিলাম বিক্রমদেবের মধ্যে রহিয়াছে এক দুর্বার শক্তি এবং পুরাতন অন্ধ সংস্কার মানিতে তিনি রাজী নহেন। তাই তিনি তরুণ দেবদত্তের উপর রাজ-পুরোহিত-এর দায়িত্ব দিতে উৎসাহী। বিক্রমদেবের চরিত্রের মূল কথা গভীর আবেগ-প্রবণতা। পরে দেখিব, এই আবেগ-প্রবণতার জন্যই তাঁহার জীবনে নামিয়া আসিতেছে দুর্ভাগ্যের ঘন কৃষ্ণ যবনিকা। তাঁহার আবেগ-প্রবণতা এমনিই গভীর যে, তাঁহার কাছে কুলদেবতার রোষহুতাশন পর্যন্ত তুচ্ছ মনে হয়। তিনি নিজে যাহা ভাবিয়াছেন, তাহার কাছে অন্য সব কিছুই তুচ্ছ। আবার বিক্রমদেবের এই আবেগ-প্রবণতার মূলে রহিয়াছে নারীর প্রেমকাঙ্ক্ষা। তাই কথার মোড় ঘুরাইয়া তিনি বলেন,—

দূর করো মিছে তর্ক যত। এসো করি
কাব্য-আলোচনা। কাল বলেছিলে তুমি
পুরাতন কবিবাক্য 'নাহিকো বিশ্বাস
রমণীরে'—আর বার বলো শুনি।

—বস্তুতঃ, বিক্রমদেবের এই ভাব-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই নাটকীয় আসল সমস্যা ও সমস্যাজনিত জটিলতার পথ খুলিয়া গিয়াছে। সমস্ত নাটকটির সমস্যা ও ঘটনার মূলে রহিয়াছে রাজার অন্ধপ্রেম, তাহার সূচনা এইভাবে সুরু হইয়াছে। Hudson নাট্য-কৌশল প্রসঙ্গে যে Introduction-এর কথা বলিয়াছেন, এই দৃশ্যটি বাস্তবিকপক্ষে তাহাই, সমস্ত নাটকটির মর্মকথা এইভাবেই উন্মোচিত হইয়াছে। রাজা বলিয়াছেন—

রমণীর হৃদয়ের রহস্য কে জানে!
বিধির বিধান-সম অজ্ঞেয়—তা ব'লে
অবিশ্বাস জন্মে যদি বিধির বিধানে,
রমণীর প্রেমে, আশ্রয় কোথায় পাবে?
নদী ধায়, বায়ু বহে, কেমনে কে জানে!
সেই নদী দেশের কল্যাণ-প্রবাহিনী,
সেই বায়ু জীবের জীবন।

বিক্রমদেব 'রমণীর হৃদয়ের রহস্য' আবিষ্কার করিবার জন্যই বুঝি 'রমণীর প্রেমে' ডুব দিয়াছেন এবং তাহার গভীরতা এমনিই যে, বাহিরের রাজকার্য, অন্যান্য দায়িত্ব তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। দেবদত্তর তাহা জানা। তাই দেবদত্ত বলেন,

রানীর রাজত্বে তুমি লও যে আশ্রয়।
যাও অন্তঃপুরে। অসম্পূর্ণ রাজকার্য
দুয়ার বাহিরে পড়ে থাক্; ক্ষীণ হোক
যত যায় দিন। তোমার দুয়ার ছাড়ি
ক্রমে উঠিবে সে ঊর্ধ্বদিকে, দেবতার
বিচার আসন-পানে।

—এই উক্তির মধ্যে নাটকের ভবিষ্যৎ পরিণতির ইঙ্গিত রহিয়াছে। এই দৃশ্যের শেষেই মন্ত্রী খবর দিয়াছে—

রানীর কুটুম্ব যত বিদেশী কাশ্মীরী
দেশ জুড়ে বসিয়াছে। রাজার প্রতাপ
ভাগ করি লইয়াছে খণ্ড খণ্ড করি,
বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন মৃত সতীদেহ-সম।

সর্বশেষে—

মন্ত্রী। ওই শোনো কোলাহল।
দেবদত্ত। একি প্রজার বিদ্রোহ?
মন্ত্রী। চলো দেখে আসি।

এই ভাবে নাটকীয় Action বা গতি সৃষ্টি হইয়াছে। অতঃপর, পরবর্তী দৃশ্যাবলীর মধ্যে এই ঘটনাবর্তের বৃদ্ধি, চরমতা ও শেষ পরিণতি দেখা দিয়াছে।

জালন্ধর রাজ্যের সর্বত্র অরাজকতা নামিয়া আসিয়াছে। সবাই বুঝিয়াছে তাহাদের রাজা রানীর অঞ্চলপ্রান্তে মুখ ঢাকিয়া নিশ্চিন্ত আরামে কাল যাপন করিতেছেন। তাহাদের অন্তরের বিক্ষুব্ধ ক্ষোভ চাপা থাকে নাই। সুমিত্রার কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে তাঁহার সমস্ত অন্তর ধিক্কার দিয়া উঠিল। তিনি রাজাকে বলিলেন—

ওই শোনো ক্রন্দনের ধ্বনি—সকাতরে
প্রজার আহ্বান। ওরে বৎস, মাতৃহীন
নোস্ তোরা কেহ, আমি আছি—আমি আছি—
আমি এ রাজ্যের রানী, জননী তোদের।

ষষ্ঠ দৃশ্যে, ইহা লইয়াই রাজার সহিত রানীর বিরোধ দেখা দিয়াছে। রাজার মনও বিচলিত হইয়াছে। এই অঙ্কের শেষে দেখিলাম এক অনিশ্চিত অশুভ সংশয়ের মধ্যে এই অঙ্কের সমাপ্তি ঘটিল।

দ্বিতীয় অঙ্কে ঘরে-বাহিরে দেখা দিয়াছে বিদ্রোহ, বিক্ষোভ। দেবদত্ত রাজাকে বলিয়াছেন—

সখা, আগুন লেগেছে ঘরে—
আমি শুধু এনেছি সংবাদ, সুখনিদ্রা
দিয়েছি ভাঙায়ে।

এই অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে রাজার কাছে রানীর পলায়ন সংবাদ আসিয়াছে।—

পলায়ন! রাজ্য ছেড়ে পলায়ন! এ রাজ্যেতে
যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার,
যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ়বলে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয়!

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিক্রমদেবের এই মোহ কাটিয়া গেল—

স্বপ্ন ছুটে গেছে,
অশ্বারোহী কোথা তারে পাইবে খুঁজিয়া?
সৈন্যদল করহ প্রস্তুত, যুদ্ধে যাব,
নাশিব বিদ্রোহ।

রাজা 'বিদ্রোহ' দমনের জন্যই যুদ্ধের আহ্বান করিয়াছেন, কিন্তু দেখিব নিয়তির পরিহাস শেষ পর্যন্ত এই যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হইয়াছে রানীর দিকে, রানীর বিরুদ্ধেই। যে রমণীকে ভালোবাসিয়া তিনি নির্জনে রাজপ্রাসাদের একটি প্রান্ত আশ্রয় করিয়াছিলেন, সেই রমণীর বিরুদ্ধেই তাঁহাকে নামিতে হইল, সমস্ত শক্তি দিয়া তাঁহাকে জয় করিবার উগ্র অদম্য কামনায় শেষ পর্যন্ত মানিয়া লইতে হইল এক করুণ নিষ্ঠুর পরিণতি, রোমান্সের এক করুণ ট্রাজিক সমাপ্তি!

তৃতীয় অঙ্কে এই ঘটনারই চরম বিকাশ অর্থাৎ climax। এই অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই ঘটনার স্থানান্তর ঘটিয়াছে কাশ্মীরে। এই নাটকের আখ্যান ভাগ দুইটি রাজ্যকে লইয়া—জালন্ধর ও কাশ্মীর। নাটকীয় সংঘাতও দুই জনকে কেন্দ্র করিয়া—জালন্ধরের রাজা ও কাশ্মীরের রাজকন্যা রানী। বস্তুতঃ, পূর্ববর্তী অঙ্কদ্বয়ের ঘটনাসংস্থান জালন্ধরের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, এই অঙ্কে তাহার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যে নাট্যীয় বিরোধ পূর্ববর্তী দৃশ্যাবলীতে দেখা দিয়াছিল, তাহা এইবার ঘনীভূত হইতে চলিয়াছে।

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে এই নাটকের প্রতি নায়ক কাশ্মীরের যুবরাজ কুমারের জনপ্রিয়তার ছবি অঙ্কিত। সুমিত্রা গিয়া পৌঁছিয়াছেন কাশ্মীরে, তাঁহার পিতৃভূমিতে। দ্বিতীয় দৃশ্যের অবতারণা কুমার ও ইলাকে লইয়া। ইলা নাটকের প্রতিনায়িকা, তাহার আর-এক প্রেমের চিত্রও এই নাটকে হইয়াছে। তৃতীয় দৃশ্যে ভ্রাতা ও ভগ্নীর মিলন। চতুর্থ দৃশ্যে

কুমারসেন যুদ্ধ যাত্রার অনুমতি পাইয়াছে এবং পঞ্চম দৃশ্যে তাহারই প্রতিধ্বনি, যাত্রা করিবার পূর্বমুহূর্তে সে প্রিয়তমা ইলার নিকট হইতে বিদায় লইতে গিয়াছে—

যাই তবে
অয়ি তুমি অন্তরের ধন, জীবনের
মর্মস্বরূপিণী, অয়ি সবার অধিক !

—অনাগত যুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে এক অনিশ্চিত সম্ভাবনার বার্তা লইয়াই যেন এই দৃশ্যটি হঠাৎ থমকিয়া গিয়াছে। দুটি বিরুদ্ধ শক্তি, ঘটনায় সংস্থান এবং নাটকীয় আবর্ত এইভাবে পরস্পর বিরোধিতা করিয়া চরমে উঠিয়া পরস্পরের মুখোমুখি হইয়াছে। এই জন্যই এই অঙ্কটিকে এই নাটকের climax বলা যায়।

নাটকীয় গঠন-কৌশলের ক্ষেত্রে যাহাকে Falling Action বলে, তাহার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে, এই অঙ্কে Climax-এর ঘটনাপুঞ্জ একটি সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করে অর্থাৎ বিপরীতধর্মী দুই শক্তির সংঘাতের চরম ব্যাপ্তির বা বিকাশের অব্যবহিত পরেই তাহার একটি সুনির্দিষ্ট পরিণতির সম্ভাবনা দেখা যায়। বাস্তবিকপক্ষে, এই নাটকের চতুর্থ অঙ্কে আমরা তাহারই পরিচয় পাই। এই অঙ্কটির পরিসর তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র সন্দেহ নাই, কিন্তু নাটকীয়-তাৎপর্যের দিক দিয়া গুরুত্বপূর্ণ। সর্বসমেত ৪টি দৃশ্যে সমস্ত এই অঙ্কের সুরুতেই দেখা যায় রাজা বিদ্রোহী রাজকর্মচারীদের অর্থাৎ শিলাদিত্য, উদয়ভাস্কর প্রমুখকে পরাস্ত করিয়াছেন। যে জন্য তাঁহার যুদ্ধযাত্রা, রাজা বিক্রমদেবকে যাহার জন্যে প্রিয়তমা পত্নীর নিভৃত আশ্রয় হইতে বাস্তব-জীবনের কঙ্করময় মাটিতে পা বাড়াইতে হইল, তাহাতে তিনি জয়ী হইলেন। বিক্রমদেবের মনে এই জয়ের প্রতিক্রিয়া পরবর্তীকালে ভিন্ন রূপ লইয়াছে। তিনি জয়সেন, শিলাদিত্য, যুধাজিৎ প্রমুখ অত্যাচারীদের শাস্তি দিতে চাহিয়াছিলেন, সে কেবল প্রজাদের মুখ চাহিয়া। কিন্তু বিজয়ের জয়টীকা লইয়া যখন বিক্রমদেব পরিতৃপ্ত, ঠিক সেই মুহূর্তেই আবার তাঁহার মানসিক পরিবর্তন দেখা দিল। যে বন্দীদ্বয়কে ধরিবার জন্য দিকে দিকে তাঁহার চর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, নূতন করিয়া সৈন্যদল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে, ঠিক সেই মুহূর্তেই সংবাদ আসিল—

সৈনিক। মহারানী এসেছেন বন্দী করে লয়ে
যুধাজিৎ আর জয়সেনে।

এবং এই সংবাদ তাঁহার পৌরুষকে এমন নিদারুণভাবে আঘাত করিয়াছে যে তাঁহার প্রিয়তমার উদ্দেশ্যে তিনি একথা বলিতে দ্বিধা করেন নাই—

চুপ করো সেনাপতি। শোনো যাহা বলি।
রুদ্ধ করো দ্বার—এ শিবিরে শিবিকার
প্রবেশ নিষেধ।

রাজা এবং রানী—তাঁহারা উভয়েই চাহিয়াছিলেন অত্যাচারীকে শাস্তি দিতে। অত্যাচারীরা পরাস্ত হইল। কিন্তু যে জয়সেনকে ও যুধাজিৎকে রাজা জয় করিতে পারিলেন না, রানী যে অবশেষে কাশ্মীর যুবরাজ কুমার-সেনের সহায়তায় তাহাদের বন্দী করিলেন, ইহা রাজার নিকট অসহ্য হইল। শুধু তাহাই নহে, ইহা তাঁহার অভিমান এবং অহমিকাকে এমনিই আঘাত করিয়াছে যে, শেষে তিনি জয়সেনদের প্ররোচনায় রানী ও কুমারসেনকে পরম শত্রু জ্ঞান করিয়া আবার এক প্রবলতর যুদ্ধের আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। শক্তির দম্ভে, দুষ্কৃতের প্ররোচনায় বিক্রমদেব এমনিই অন্ধ হইয়া পড়িলেন যে পরম বন্ধু দেবদত্তকে ফিরাইয়া দিতে তাঁহার মনে এতোটুকু দ্বিধা জাগিল না—"চাহি না করিতে দেখা ব্রাহ্মণের সনে।"

যে জয় বিক্রমদেবের অভিপ্রেত ছিল, তাহা চরিতার্থ হইল। এখানে নাটকের আখ্যানভাগ অন্য রূপ লাভ করিতে পারিত, হয়ত রাজা ও রানীর মিলনের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সুকৌশলে কুমারসেনকে উপস্থিত করাইয়া নাটকের গতি ও আখ্যানকে অন্য দিকে ফিরাইয়া দিয়াছেন। বস্তুতঃ, রোমান্টিক ট্রাজেডীর সুনিশ্চিত আভাস এই অঙ্কেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অর্থাৎ এই অঙ্কের শেষে পাঠক বা দর্শক সহজেই বুঝিতে পারেন যে, নাটকের পরিণতি আর কোনক্রমেই মিলনাত্মক হইতে পারে না। বরং কুমারসেনকে কেন্দ্র করিয়া আর-এক নূতন বিরোধিতা অথবা জটিল সমস্যা দেখা দিল। নাটকের দিক্-পরিবর্তনের এমন চমৎকার সংঘটন নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের দ্বন্দ্বে, ব্যক্তিত্বের সহিত ব্যক্তিত্বের সংঘাতে, বাহ্যিক ঘটনার আবর্তের মধ্য দিয়া সমস্ত নাটকটি এই ভাবেই দ্রুত পরিণতির পথে অগ্রসর হইয়াছে।

সচেতন ভাবেই হউক অথবা স্বাভাবিকভাবেই হউক, এই নাটকটি নাটকীয় গঠন-কৌশলের বিচারে নিঃসন্দেহে সার্থক সৃষ্টি।

অবশেষে পঞ্চম অঙ্ক, নাটকের Catastrophe অর্থাৎ সর্বশেষ পরিণতি। এই অংশটি নাটকটির অন্যান্য অঙ্কের তুলনায় একটু বড, সর্বসমেত ৯টি দৃশ্যে সমাপ্ত। চতুর্থ অঙ্কে আখ্যানভাগে যে পরিবর্তন আসিয়াছিল, তাহাতে দেখিয়াছি—বিক্রমদেবের সর্বগ্রাসী ক্ষমতার রুদ্ররোষ কুমারসেনকে দগ্ধ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে। এই অঙ্কের প্রথম হইতেই যুদ্ধের দামামা শোনা যায়। কুমারসেন সমস্ত বিপদের ঝুঁকি লইয়াছে। কিন্তু ভাগ্যদেবতা তাহার প্রতি বিরূপ। তৃতীয় দৃশ্যে তাই দেখি, চিরবিদায়ের আগে সে ইলার সহিত দেখা করিবার অধিকারও পাইল না, বিক্রমদেবের আক্রমণে ভীত অমরুরাজ তাহাকে প্রিয়তমার সহিত দেখা পর্যন্ত করিতে দিল না। হতভাগ্য কুমারকে রাজ্য ছাড়িয়া বনে আশ্রয় লইতে হইল। একদিকে বিক্রমদেব তাহাকে বন্দী করিতে চান অন্যদিকে রেবতী বিক্রমদেবের সেই কামনায় অগ্নি নিক্ষেপ করিতেছে। এমনিই দুর্ভাগ্যের বোঝা লইয়া কুমার অরণ্যে পলাতক। এদিকে বিক্রমদেব যখন কাশ্মীর জয় করিয়া বিজয়ের উচ্চতম শিখরে উঠিয়া অমরুরাজকন্যা ইলাকে নূতন করিয়া জীবন-সঙ্গিনী করিতে উদ্যত, ঠিক সেই মুহূর্তেই কুমারসেনের প্রতি ইলার অনির্বাণ প্রেম বিক্রমদেবকে চমকিত করিয়া জাগাইয়া দিল—

> দেবী, চাহি নে তোমার প্রেম।
> শুষ্ক শাখে ঝরে ফুল, অন্য তরু হতে
> ফুল ছিঁড়ে নিয়ে তারে কেমনে সাজাব!
> আমারে বিশ্বাস করো—আমি বন্ধু তব।
> চলো মোর সাথে, আমি তারে এনে দেব;
> সিংহাসনে বসায়ে কুমারে, তার হাতে
> সঁপি দিব তোমারে কুমারী।

বিক্রমদেবের চেতনা ফিরিল, কিন্তু চতুর্থ অঙ্কে যে ট্রাজেডীর বীজ উপ্ত হইয়াছিল, তাহা এতক্ষণে পল্লবিত হইতে চলিয়াছে। বিক্রমদেব ভাবিলেন, তাঁহার জীবনে আবার বসন্ত দেখা দিবে, কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে শেষ পর্যন্ত দুইটি মৃত্যুর বিনিময়ে তিনি স্বীয় উন্মত্ত শক্তির প্রায়শ্চিত্ত করিলেন—

দেবী, যোগ্য নাহি আমি তোমার প্রেমের,
তাই বলে মার্জনাও করিলে না ? রেখে
গেলে চির-অপরাধী ক'রে, ইহজন্ম
নিত্য-অশ্রুজলে লইতাম ভিক্ষা মাগি
ক্ষমা তব ; তাহারে দিলে না অবকাশ ?
দেবতার মতো তুমি নিশ্চল নিষ্ঠুর—
অমোঘ তোমার দণ্ড, কঠিন বিধান।

অনিবার্য ভাবেই ট্রাজেডীর ঘন কৃষ্ণযবনিকা নামিয়া আসিল বিক্রমদেবের জীবনে। দুই বাহু বাড়াইয়া যখন বিরহতপ্ত হৃদয়ে তিনি প্রিয়তমাকে আহ্বান করিবার জন্য উদ্যত হইলেন—কে জানিত তখন মৃত্যু অদূরেই অপেক্ষা করিতেছে। রাজা রানীকে পাইয়াও পাইলেন না, অতৃপ্ত প্রেম বারেক ধরা দিয়া চিরকালের মতো হারাইয়া গেল। বিক্রমদেব সমস্ত জীবন ধরিয়া যাহাকে আগলাইয়া রাখিয়াছিলেন, যাহার নিভৃত অঞ্চলপ্রান্তে মুখ লুকাইয়া রাজ্যের অমঙ্গল ডাকিয়া আনিয়াছিলেন এবং শেষে যাহাকে ফিরিয়া পাইবার জন্যই যুদ্ধের আগুন জ্বালিলেন, নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে সেই আগুনে তাঁহাকেই দগ্ধ হইতে হইল এবং ভস্মীভূত প্রদাহের অনন্ত হাহাকার বক্ষের মধ্যে ধারণ করিয়া সেই রানীকে চির-বিদায় দিতে হইল। এমনিই এক বক্ষভেদী অনন্ত রিক্ততা ও হাহাকারের মধ্যে রাজা ও রানী নাটকের সমাপ্তি ঘটিয়াছে অনিবার্যভাবেই।

নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে একদল সমালোচক এই কথাই বলিতে চান যে, নাট্যকৌশল রবীন্দ্রনাথের জানা ছিল না। অন্য নাটক প্রসঙ্গে যাহাই হউক, দেখিতে পাইতেছি, অন্ততঃ আলোচ্য নাটক প্রসঙ্গে এই অভিমত একান্তভাবেই অগ্রাহ্য। সেক্সপীয়র নাট্য-কৌশলের আদর্শের মানদণ্ডের বিচার করিলে, এই নাটকটিকে পরিপূর্ণ সার্থক রোমান্টিক ট্রাজেডীর পরাকাষ্ঠা বলিয়া গণ্য করিতে হয়। ঘটনা-সংস্থানের নৈপুণ্যে, চরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশে এবং সর্বোপরি দৃঢ়বন্ধের ঘনপিনদ্ধ অনিবার্যতায় সমস্ত নাটকটি স্ফটিকের মতোই সংহত অথচ আলোকদীপ্ত।

তত্ত্ব-বিশ্লেষণ ঃ

কবিতা বা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মধ্যে লেখকের আত্মপ্রকাশের যতোখানি সুবিধা ও সুযোগ থাকে, নাটকের মধ্যে সাধারণতঃ থাকে না, কেননা নাট্যকার শিখণ্ডীর অন্তরালবর্তী অর্জুনের মতো নাটকের নেপথ্যে থাকিয়া চরিত্র সৃষ্টি করেন, যাহারা আপন আপন স্বাতন্ত্র্য লইয়া মঞ্চে উপস্থিত হয়। ফলতঃ, নাট্যকারকে আমরা স্ব-মূর্তিতে কোথাও দেখি না। কাব্যে বা প্রবন্ধে বা অন্যত্র লেখক সম্পূর্ণভাবেই নিজের কথা বলিতে পারেন, তাঁহার মূর্তিটি পাঠকের চোখের সামনে উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হইতে পারে। কিন্তু নাটকে যদি বা কিছু জীবন-তত্ত্ব থাকে, তবে তাহা নাট্যকারের অভিপ্রেত হইলেও একান্তভাবে তাঁহার নয়, কেননা, সেই ভাব বা তত্ত্বটি নাট্যীয় চরিত্রের মধ্য দিয়াই প্রতিভাত হয়।

সাধারণভাবে এ কথা নাটক প্রসঙ্গে প্রযোজ্য হইলেও, রবীন্দ্র-নাটকে আমরা প্রায়শঃই একটি বিশেষ তত্ত্বের সন্ধান পাইয়া থাকি। অবশ্য একথা মনে রাখিতে হইবে, শিল্প মাত্রই শিল্পীর মনের আনন্দ-রূপ, কাজেই তাহা নিছক তত্ত্ব হইলেও তাহা রসহীন নয়। সুতরাং, রবীন্দ্র-নাটকে যদিও কোন তত্ত্ব ফুটিয়া উঠে, তবে তাহা রসোত্তীর্ণ রূপ লইয়াই। Edward Thompson রবীন্দ্র-নাটকে 'Pressure of thought' লক্ষ্য করিয়াছেন যে, এবং বলিয়াছেন যে, নাটকগুলি রবীন্দ্রনাথের 'Vehicle of ideas'—তাহা সত্য হইতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া ভাবের চাপে রস-রূপ ব্যাহত হয় নাই অর্থাৎ নাট্যধর্ম ক্ষুণ্ণ হয় নাই। মনে রাখিতে হইবে শিল্পের রূপায়ণে শিল্পীর স্বাধীনতা সব সময়েই থাকে, সুতরাং কোন আদর্শের ছাঁচে যদি কোন শিল্পরূপে মেলানো না যায়; তবে তাহা যে অসার্থক, তাহা বলা সমীচীন নহে। রবীন্দ্র-নাট্য প্রসঙ্গেও এই কথা গভীরভাবে প্রযোজ্য। বস্তুতঃ, রবীন্দ্র-প্রতিভা নাট্য-রচনার ক্ষেত্রেও স্বতন্ত্র পথ খুঁজিয়া লইয়াছে, তাহা গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসাইয়া পুরাতনের অন্ধ অনুকরণ বা চর্বিতচর্বণ করে নাই। তবু 'বিসর্জন', 'রাজা ও রানী'র মতো নাটক রবীন্দ্রনাথ রচনা করিয়াছেন, যাহা বোধ করি নাট্য-শিল্পের সম্মুখ পথ দিয়াই আগাইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্র-নাট্য প্রসঙ্গে এই কথাগুলি বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার, নচেৎ, আমাদের ধারণা, রবীন্দ্র-নাট্য-বিচারে বিভ্রান্তি ঘটিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং 'রাজা ও রানী'র ভূমিকায় বলিয়াছেন—"প্রকৃতির প্রতিশোধের সঙ্গে রাজা ও রানীর এক জায়গায় মিল আছে। অসীমের সন্ধানে সন্ন্যাসী বাস্তব হতে ভ্রষ্ট হয়ে সত্য হতে ভ্রষ্ট হয়েছে, বিক্রম তেমনি প্রেমে বাস্তবের সীমাকে লঙ্ঘন করতে গিয়ে সত্যকে হারিয়েছে। এই তত্ত্বকেই যে সজ্ঞানে লক্ষ্য ক'রে লেখা হয়েছে তা নয়, এর মধ্যে এই কথাটাই প্রকাশ পাবার জন্যে স্বতঃ উদ্যত হয়েছে যে, সংসারের জমি থেকে প্রেমকে উৎপাটিত ক'রে আনলে সে আপনার রস আপনি জোগাতে পারে না, তার মধ্যে বিকৃতি ঘটতে থাকে।

এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না,
শুধু সুখ চলে যায়—
এমনি মায়ার ছলনা॥"

—বিশেষভাবে লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন 'এই তত্ত্বকেই যে সজ্ঞানে লক্ষ্য ক'রে লেখা হয়েছে তা নয়।' আমাদেরও এই ধারণা। রবীন্দ্র-নাটকের সর্বত্রই সূক্ষ্ম তত্ত্ব রহিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া নাট্যশিল্প হিসাবে ব্যর্থ-সৃষ্টি নহে।

বাস্তবিকপক্ষে, 'রাজা ও রানী' নাটকের মূল কথা হইল প্রেম; মানব-জীবনে প্রেমের যথার্থ স্থান কোথায় এবং তাহার সার্থকতাই বা কোথায়, ইহাই হইল এই নাটকের উপজীব্য। রবীন্দ্রনাথ বারবার নানা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, আংশিকের মধ্যে সত্য নাই, সত্য আছে সমগ্রের মধ্যে। যে মানুষ জীবনকে খণ্ডিত বা আংশিক রূপে দেখে, সে জীবন সত্য লাভ করিতে পারে না। নিজেকে মানুষ যে মুহূর্তে সমগ্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লয়, তখনই সে সত্যধর্ম হইতে বিচ্যুত হয়।

মানব-জীবনের দুইদিক—সীমা ও অসীম, নীড় ও আকাশ। দুই লইয়াই জীবনের পরিপূর্ণতা, একটিকে বাদ দিয়া অপরটি অচল। একান্ত-ভাবে সীমাও সত্য নহে, অসীমও নহে। তাই উভয়ের মিলন প্রয়োজন। যে মানুষ আপন স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া নীড় সাজাইতে ব্যস্ত, সে তাহার জীবনকে সীমার সংকীর্ণতার মধ্যে ঢালিয়া ফেলে। তেমনি যে সংসার ত্যাগ করিয়া, সংসারের দায়িত্ব এড়াইয়া মুক্তির সন্ধানে সাধনায় রত হয়, সেও সত্য ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। কাজেই পরিপূর্ণ সত্যোপলব্ধির জন্য উভয়ের মিলন

বা সাযুজ্য প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ এই মুক্তিরই উপাসক—"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।" রবীন্দ্রনাথের এই জীবনবোধেই নানা রূপে, নানা-ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রেম সম্পর্কেও কবির একই ধারণা। প্রেমেরও দুইটি দিক। তাহার একটি প্রান্ত সংসারে দৈনন্দিন হিসাব-নিকাশের মধ্যে, আর একটি প্রান্ত সংসারের বাহিরে বৃহত্তর জগতে, যেখানে ব্যক্তিগত সুখদুঃখের ঊর্ধ্বে আরো বৃহত্তর আহ্বানে নরনারীকে সাড়া দিতে হয়। পুরুষ স্বভাবতই আপন প্রেমাস্পদাকে কাছে রাখিতে চায়। তাহাকে পাইবার জন্য দুই বাহু বাড়াইয়া সীমিত জগতের সাধনা করে। এমনি করিয়া প্রেমের সীমিত দিকটিই যখন প্রধান হইয়া উঠে, তখন অনিবার্যভাবেই বৃহত্তর জগৎ প্রতিশোধ লয় অর্থাৎ তাহার নিশ্চিন্ত আরামপূর্ণ সীমিত জগতের বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। এবং তখনই অনিবার্যভাবে ট্রাজেডী ঘনাইয়া আসে।

রাজা ও রানী নাটকে দেখি, রাজা বিক্রমদেব রানী সুমিত্রার প্রেমে এমনিই উন্মত্ত যে, রাজ্যশাসন, রাজ্যের দেখাশোনা তাঁহার কাছে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে—

থাক্ গৃহ, গৃহকাজ।
সংসারে কেহ নই, অন্তরের তুমি।
অন্তরে তোমার গৃহ, আর গৃহ নাই—
বাহিরে কাঁদুক পড়ে বাহিরের কাজ।

এবং—

রাজা রানী! কে রাজা। কে রানী?
নহি আমি রাজা। শূন্য সিংহাসন কাঁদে।
জীর্ণ রাজকার্যরাশি চূর্ণ হয়ে যায়
তোমার চরণতলে ধূলির মাঝারে।

অর্থাৎ রাজা সত্যভ্রষ্ট হইয়াছেন। কারণ, তিনি জীবনকে খণ্ডিতরূপে দেখিয়াছেন। নারীর প্রেমই তাঁহার লক্ষ্য এবং সেই প্রেমই জীবন-সর্বস্ব হইয়া দেখা দিয়াছে। কিন্তু রাজা হিসেবে রাজ্য ও প্রজাদের প্রতি তাঁহার আর-এক কর্তব্য ছিল তাহা তিনি পালন করেন নাই। ইহারই প্রতিক্রিয়া হিসাবে অনিবার্যভাবেই রাজ্যে ঝড় উঠিয়াছে। শেষ পর্যন্ত সেই ঝড়ের

উন্মত্ত আন্দোলনে রাজাকে বাহির হইতে হইল, এবং সর্বশেষে রানীকেও হারাইতে হইল। অবশ্য, রানী সুমিত্রা বিক্রমদেবের চেতনা ফিরাইবার বহু চেষ্টা করিয়াছেন—

মহারাজ,
এখন সময় নয়—আসিয়ো না কাছে
এই মুছিয়াছি অশ্রু, যাও রাজকাজে।

বিক্রমদেব তাঁহার কথায় কর্ণপাত মাত্র করেন নাই। তাই যেদিন গভীর নিশীথে রানী প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া গেলেন, রাজাকে তখন বাহির হইতে হইল। যুদ্ধের আগুন জ্বলিয়া উঠিল; যে আগুন তিনি নিজের হাতে জ্বালাইয়া ছিলেন, সেই আগুন তাঁহাকেও দগ্ধ করিতে ছাড়িল না। বিরহসন্তপ্ত অতৃপ্ত হৃদয়ে বিক্রমদেব যখন রানী সুমিত্রার জন্য মনে মনে প্রতিক্ষা করিতেছেন, তখন সেই মুহূর্তেই রানী দেখা দিলেন বটে, কিন্তু ক্ষণেক পরেই মৃত্যুর ঘন কৃষ্ণ যবনিকার আড়ালে হারাইয়া গেলেন চিরতরে। বিক্রমদেব তাঁহাকে পাইয়াও পাইলেন না। এমন করিয়া আপন মৃত্যুর মধ্য দিয়া রানী রাজাকে জানাইয়া গেলেন—"সংসারের জমি থেকে প্রেমকে উৎপাটিত করে আনলে সে আপনার রস দেখাতে পারে না, তার মধ্যে বিকৃতি ঘটতে থাকে।" বিক্রমদেব প্রেমকে 'বিকৃত'রূপে দেখিয়াছিলেন, তাহার সংকীর্ণ দিকটিই চোখে পড়িয়াছিল, সুখের জন্য তিনি প্রেম চাহিয়াছিলেন বলিয়াই প্রেম মেলিল না। সুখ হইতেছে দৈহিক ভোগ। বলা বাহুল্য, মহৎ প্রেমের স্বরূপ তাহা নহে বিক্রমদেব বিবেকহীন বা হৃদয়হীন নহেন। কিন্তু অতিরিক্ত প্রেমশক্তিই তাঁহার জীবনে ট্রাজেডী আনিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মতে, কোন কিছুর প্রতি গভীর আসক্তির অর্থই হইল সমগ্রের প্রতি অবমাননা অর্থাৎ সত্যধর্ম থেকে বিচ্যুত হওয়া। বিক্রমদেবের জীবনে তাহাই ঘটিল। এই নাটকের ট্রাজেডীর মূলে রহিয়াছে তাঁহার অতিরিক্ত প্রেমশক্তি। বস্তুতঃ, রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে বলিতে চাহিয়াছেন যে, প্রেমের সার্থকতা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ভোগের মধ্যে বা সংসারের মধ্যে নহে, সংসারের বা ব্যক্তিগত জীবনের বাহিরেও তাহার কর্তব্য রহিয়াছে। প্রেম যেখানে এই দুয়ের সেতুবন্ধ রচনা করে, সেখানে তাহা সার্থক হইয়া উঠে, যেখানে তাহা ঘটে না, সেখানে অনিবার্যভাবেই ট্রাজেডী ঘনাইয়া আসে।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, প্রকৃতির প্রতিশোধ-এর সহিত এই নাটকের ভাবগত সাদৃশ্য আছে। শুধু প্রকৃতির প্রতিশোধ নহে, অন্যান্য নাটকের সঙ্গেও এই জীবনতত্ত্বের মিল রহিয়াছে। প্রকৃতির প্রতিশোধ নাটকে সন্ন্যাসী বিক্রমদেবের মতোই এক মন-গড়া জগৎ সৃষ্টি করিয়া 'বৈরাগ্য-সাধনে' মুক্তি খুঁজিয়াছিল অর্থাৎ অসীমের সাধনা করিয়াছিল সীমার বা বাস্তব জগতকে অস্বীকার করিয়া। বিক্রমদেব জীবনকে দেখিয়াছিলেন সীমার দৃষ্টিতে, সন্ন্যাসী দেখিয়াছিল অসীমের দৃষ্টিতে। দুই-ই খণ্ডিত, আংশিক, তাই ভ্রান্ত, অসত্য। উভয়কেই তাহার মূল্য দিতে হইল করুণভাবে।

বিষয় বস্তু এবং কবি-মানস

রাজা ও রানী নাটকটি ১২৯৬ সালে (২৫ শে শ্রাবন) লিখিত।

এই নাটকের আখ্যানভাগ বা কাহিনী আপাতদৃষ্টিতে ঐতিহাসিক বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাহা নহে। এই নাটকে কোন ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করা হয় নাই। সেক্সপীয়রও নাটকের আখ্যান-ভাগ ইতিহাস বা অন্যত্র হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন এবং সব সময় তিনি মূল (ঐতিহাসিক) কাহিনীর আনুগত্য না করিলেও তাহা সর্বাংশেই স্ব-কপোল-কল্পিত নহে। কিন্তু, রাজা ও রানী নাটকের বিষয়বস্তু আদৌ ঐতিহাসিক নহে তাহা কবির স্ব-কপোল-কল্পিত। ঠিক বটে, জালন্ধর এবং কাশ্মীরের পটভূমিকার মধ্যে অথবা বিক্রমদেব, শিলাদিত্য, কুমারসেন, দেবদত্ত প্রভৃতি নামকরণের মধ্যে ইতিহাসের গন্ধ রহিয়াছে, কিন্তু এইগুলি যথার্থই কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র নহে। অন্যত্র এই নামের ঐতিহাসিক চরিত্র থাকিতে পারে, আছেও, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে স্বাধীনভাবেই এই নামগুলি ব্যবহার করিয়াছেন। তাছাড়া, এই নাটকের কাহিনী যে বিশেষভাবে কোন্ যুগের তাহাও বুঝা যায় না। ফল কথা, আমরা দেখিব যে, রবীন্দ্র-নাটকের বিষয়বস্তু, চরিত্রগুলি যেন কোন বিশেষ দেশকালের সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়। রাজা ও রানী রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের রচনা; কিন্তু তথাপি এই নাটকেও ঐ বিশেষ প্রবণতাটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং, এই নাটকটিকে কোন দিক থেকেই ঐতিহাসিক নাটক বলা চলে না।

প্রশ্ন হইতে পারে, তবে কেন রবীন্দ্রনাথ এমন একটি কাল্পনিক রাজ্য সৃষ্টি

করিলেন? ইহার উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ হয়ত সচেতন ভাবেই রোমান্টিক ট্রাজেডীর আদর্শে এই নাটকটি রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন। রোমান্সের অন্যতম উপাদান হইল দূরাভাস বা অতীতের আশ্রয়। যাহা নিকট হইতে অথবা বর্তমানের কাছে দুঃসহ, কুৎসিত ও উৎকট মনে হয়, তাই অতীতের আশ্রয় লইয়া আমাদের নিকট প্রিয় হইয়া উঠে। দূর থেকে যে চাঁদকে সুন্দর মনে হয়, হয়ত কাছে যাইলে, তাহার অন্ধকার গুহার নিকট দাঁড়াইয়া আমাদের সমস্ত স্বপ্নালুতা ভাঙিয়া যাইবে। বস্তুতঃ, তেমনিই একটি রোমান্টিক পরিবেশ রচনার জন্যই কবি এক কাল্পনিক রাজ্য সৃষ্টি করিয়াছেন। নাটকের মূল কথাই হইল "Illusion of reality"। তাহাই যদি হয়, তবে বলিতে হইবে, বিষয়বস্তুর দিক দিয়া এই নাটক তাহা সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে।

বাস্তব জীবনে আমরা সচরাচর যাহা দেখি, পর্যবেক্ষণ করি, তাহার মধ্যে কল্পনার ডানা মেলিবার সুযোগ থাকে না। অথচ মানুষের মন মাঝে মাঝে কল্পনার ডানায় ভর করিয়া অনন্ত আকাশে উড়িয়া যাইতে চায়, শেলীর স্কাইলার্কের মতো বাস্তব-জগতের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া নিঃসীম ধ্রুবলোকে বিলীন হইতে চায়। তাই, যাহা আমরা জানি না, চিনি না, যাহাদের আমরা দেখি নাই—সাহিত্যের মধ্যে আমরা তাহাদের দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকি। আর, তখনই বা তাহার জন্য প্রয়োজন এক অলৌকিক জগৎ সৃষ্টি করা। এই অলৌকিক কাহিনীর জন্য লেখকের পক্ষে অতিরিক্ত আবেগ-প্রবণ হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। এমনি করিয়া, ভাবের অতিরেকী আবেগ এবং বিহঙ্গম-কল্পনার সাহায্যে রোমান্টিক জগৎ গড়িয়া উঠে। রোমান্টিক কাব্য বা নাটক আসলে বাস্তবাতীত এক আদর্শ-জগতেরই রূপায়ণ।

রাজা ও রানী নাটকের বিষয়বস্তু একান্তভাবে এমনিই এক রোমান্টিক জীবনের জানালা উন্মুক্ত করিয়া দেয়। এই নাটকে রাজা আছেন, রানী আছেন, মন্ত্রী সেনাপতির অভাব নাই। সেই সঙ্গে রাজকীয় পরিবেশ, যুদ্ধযাত্রা ইত্যাদি মিলিয়া এই নাটকটির আখ্যানভাগ যথার্থই রোমান্টিক।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই নাটকে যুদ্ধযাত্রার কথা আছে, কিন্তু তাহার কর্ণভেদী গর্জনের কোলাহল ভাসিয়া আসে নাই, অথবা, যুদ্ধরত সৈনিকের অসি-ঝংকারের শব্দে স্বপ্নভঙ্গ হয় না। তাই বলিতেছি, ইহা একান্তভাবেই

এক অবিচ্ছিন্ন রোমান্সের জীবনালেখ্য; নায়ক-নায়িকারা যেন নিশ্চিন্ত হইয়া গোলাপের কণ্টক কাঁটাগুলি উৎপাটিত করিয়া পাপড়িগুলিতে আরামে মুখ ঢাকিয়া দিয়াছেন। রবীন্দ্র-নাটকগুলি বিশ্লেষণ করিলেই দেখিতে পাইবে যে, তাঁহার মন বস্তু-জগতে একটুতেই হাঁফাইয়া উঠে। তাই, তাঁহার নাটকে তথা-কথিত বস্তুধর্মিতা প্রায় অনুপস্থিত। নাটক মূলতঃ Action, যেমন এ্যারিস্টটল বলিয়াছেন, তাহা Description নহে। সুতরাং, যুদ্ধের মতো কোন ঘটনাকে নেপথ্যে রাখিলে কেমন করিয়া তাহার ভয়াবহতা দর্শকের সামনে ফুটিয়া উঠিতে পারে? এই নাটকে নায়ক-নায়িকার মনের দ্বন্দ্ব-চিত্রটি ফুটিয়া উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু একটু গভীর দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে, তাহা যতটা কাব্যোচ্ছ্বাসে পূর্ণ, ততটা নাটকীয় নহে, সেইজন্যই সেই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া গভীর কোন জটিলতা সৃষ্টি হইতে পারে না। বস্তুতঃ, এই নাটকের বিষয়বস্তু মূলতঃ গীতিধর্মী বা লিরিক্যাল। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই বিষয়ে সচেতন। তাই ভূমিকায় বলিয়াছেন—"এর নাট্যভূমিতে রয়েছে লিরিকের প্লাবন, তাতে নাটককে করেছে দুর্বল। এ হয়েছে কাব্যের জলাভূমি। ঐ লিরিকের টানে এর মধ্যে প্রবেশ করেছে ইলা এবং কুমারের উপসর্গ।"

কবির প্রথম উক্তি যে সত্য, তাহা এই নাটকের বিষয়বস্তু বা আখ্যানভাগ বিশ্লেষণ করিয়া প্রমাণ করা যায়। পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে তাহার যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে। কিন্তু ইলা ও কুমারের আবির্ভাব কি যথার্থই এই নাটককে দুর্বল করিয়াছে? ইহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

আমাদের মনে হয়, কুমার ও ইলার 'উপসর্গ' এই নাটকের অঙ্গহানি করে নাই অর্থাৎ অপ্রাসঙ্গিক নহে। নাটকের সুরু হইতেই দেখিতে পাই, বিক্রমদেব সুমিত্রাকে সব কিছু হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একান্তভাবে নিজের মধ্যেই পাইতে চান। ইহার ফলে যে রাজকার্য অচল হইয়া পড়িতেছে, সে বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি নাই। এবং ইহার সুযোগ লইয়াই শিলাদিত্য-জয়সেনের দল রাজ্যের মধ্যে অরাজকতা আনিল। সুমিত্রা রাজাকে ভালোবাসেন, কিন্তু সে ভালোবাসা বিক্রমদেবের মতো নহে। তিনি বলেন—

ওই শোনো ক্রন্দনের ধ্বনি—সকাতরে
প্রজার আহ্বান। ওরে বৎস, মাতৃহীন

নোস্ তোরা কেহ, আমি আছি—আমি আছি—
আমি এ রাজ্যের রানী, জননী তোদের।

বস্তুতঃ, একদিকে সুমিত্রা রানী, অন্যদিকে জননী। কিন্তু, রাজা সুমিত্রার দ্বিতীয় সত্তাটিকে স্বীকার করিতে চান না। এবং প্রধানতঃ এই কারণেই, রাজার চেতনা ফিরাইবার জন্যই, সুমিত্রাকে বাহির হইতে হইল। সুমিত্রা চলিয়া গেলেন কাশ্মীরে, ভ্রাতা কুমারসেনের সাহায্যে শত্রুকে পরাজিত করিবেন, এই কামনায়। সুতরাং, স্বাভাবিক ভাবেই এই নাটকের মূল আখ্যানে বা Plot-এ কুমারসেনের আবির্ভাব স্বাভাবিক হইয়াছে। কুমারসেন এই নাটকে প্রতি-নায়ক অর্থাৎ নায়কের প্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্র। সেইজন্য, তাহার চরিত্রটিকে উজ্জ্বল এবং সুস্পষ্ট করিবার প্রয়োজন ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাহাই করিয়াছেন। বিক্রমদেব অপেক্ষা তাহার নাটকীয় ভূমিকা কম তাৎপর্যপূর্ণ নহে। কিন্তু ইলার আবির্ভাব? আমাদের মনে হয়, "লিরিকের প্লাবনে" নহে, নাটকীয়তার প্রয়োজনেই তাহাকে আনিতে হইয়াছে। পঞ্চম অঙ্কের সপ্তম দৃশ্যে বিক্রমদেবের চেতনার পরিবর্তন ঘটাইয়াছে ইলা। বিক্রমদেব যে মুহূর্তে কুমারের প্রতি ইলার মনোভাবের অর্থাৎ উৎসর্গীকৃত প্রেমের পরিচয় পাইলেন, সেই মুহূর্তেই তাঁহার জন্মান্তর ঘটিল। বিক্ষুব্ধ অভিমানের নিদারুণ প্রবাহে দগ্ধ হইতে হইতে উন্মত্ত অশ্বের মতো তিনি যে আত্মঘাতী পথে ছুটিয়া চলিয়াছিলেন, নাটকের পরিণতিতে দেখা গেল, ইলার প্রেমই বিক্রমদেবকে সেই পথ হইতে ফিরাইতে সমর্থ হইল। সুতরাং, নিঃসন্দেহে বলা যায় ইলা ও কুমারের উপাখ্যান 'উপসর্গ' নহে, তাহা নাটকীয়তাসূত্রে মূল আখ্যানের সঙ্গে গভীরভাবেই সম্পৃক্ত। কাজেই দেখা যাইতেছে, এই নাটকের বিষয়বস্তুর মধ্যে কোনো অসঙ্গতি নাই। ইহা রবীন্দ্রনাথের প্রতি Complement নহে, ইহা নাট্যবিশ্লেষণেরই ফলশ্রুতি।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, এই বিষয়বস্তুর বা নাটকের মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের কোন্ পরিচয় পাওয়া যায়?

রাজা ও রানী নাটক রবীন্দ্র-নাট্য-প্রবাহে প্রথম পর্বের রচনা। এই পর্বেই গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য এবং রোমান্টিক ট্রাজেডীগুলি রচিত। তখনো রূপক বা সাংকেতিক নাট্য-রচনার পর্ব অনেক দূরে। বিষয়বস্তুর ভিন্নতা সত্ত্বেও এই পর্বটির স্থায়িত্ব ধরা যাইতে পারে ১৮৮১ খৃঃ হইতে ১৮৯৬ খৃঃ পর্যন্ত। এখন,

সময়ের হিসাবে ১৮৯৬ খৃঃ 'চৈতালি' কাব্যের রচনাকাল। রাজা ও রানী ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে রচিত এবং এই সময়েই রচিত হয় মানসী কাব্য (১৮৯০)। সুতরাং, দেখা যাইতেছে মানসীর কাব্য-চেতনার পরিমণ্ডলের মধ্যেই রাজা ও রানী রচিত। রবীন্দ্র-সাহিত্যে দেখিয়াছি, বিশেষ বিশেষ পর্বে রচিত বিভিন্ন রচনার মধ্যে বেশ একটি ভাবগত সাদৃশ্য রহিয়াছে। কাজেই, এই দিক হইতে বিচার করিলে দেখিব, 'মানসী' কাব্যের কবি-চেতনার আলোকেই রাজা ও রানী নাটকটি আলোকিত।'

রবীন্দ্র-পাঠক জানেন, মানসী কাব্য, রবীন্দ্র-কাব্যের প্রবেশ-দ্বার। রবীন্দ্র-প্রতিভার যথার্থ উন্মেষ এই কাব্যেই প্রথম দেখা গেল। এবং এই মানসী কাব্যের উপজীব্য হইল রোমাণ্টিক প্রেম, বিশেষতঃ বিরহ-কাতর প্রেম। প্রেমকে কখনোই রবীন্দ্রনাথ সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করেন নাই এবং দৈহিক ভোগের মধ্যে প্রেমকে দেখিতে চাহেন নাই। যে প্রেম কল্যাণময়, শান্ত, সংহত এবং মহৎ—সেই প্রেমেরই তিনি সাধনা করিয়াছেন সারা জীবন ধরিয়া এবং 'মহুয়া' প্রভৃতির মতো প্রেমের কাব্যে প্রেমের এই ছবিই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বস্তুতঃ, সেইজন্যই দেখিতে পাইতেছি—রাজা ও রানী নাটকের মূলে রহিয়াছে প্রেমের প্রেরণা; সমস্ত নাটকটি তাহার ভিত্তিতেই রচিত। বিক্রমদেব সুমিত্রাকে ভালোবাসিয়াছিলেন, কিন্তু সে প্রেম ভোগ-লোলুপ, অসংযত এবং সংকীর্ণ। রানী সুমিত্রাও রাজাকে ভালোবাসিয়াছিলেন—সে প্রেম কল্যাণময়, সংহত এবং মহৎ। কুমারের ও ইলার প্রেম একান্তভাবেই ভোগাতীত প্রেম। তাই ইলার প্রেম সহজেই কুমারকে বৃহত্তর জীবনের প্রয়োজনে মুক্তির পথে ছাড়িয়া দিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে কবি-চেতনায় 'মানসী' কাব্য রচিত, সেই প্রেরণাতেই "রাজা ও রানী" নাটকের সৃষ্টি।

চরিত্র-বিশ্লেষণ

বিক্রমদেব ঃ

'রাজা ও রাণী' নাটকের নায়ক রাজা বিক্রমদেব ; তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই ঘটনাপুঞ্জের বিবর্তন, কর্মচক্রের আবর্তনের মুখে আখ্যান ভাগ সূচনা হইতে বিকাশের পথে, বিকাশ হইতে পরিণতির পথে অনিবার্যভাবে ধাবমান।

রাজা ও রানী রোমান্টিক ট্রাজেডী। সুতরাং দেখা দরকার, বিক্রমদেবের চরিত্র তাহার অনুগ কিনা।

এ্যারিস্টটল ট্রাজেডীর নায়ক সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই বলিয়াছেন—'They shall be good···there will be an element of a certain moral purpose.' সেক্সপীয়রের রোমান্টিক ট্রাজেডীর মধ্যে দেখা গেল নায়কের এই রূপ পরিবর্তিত হইয়া তাহারা যে রূপে দেখা দিল, তাহাতে বলিতে হয় যে, তাঁহারা খুব ভালো অথবা খুব খারাপ (Too good or Too bad) নহে। দ্বিতীয়তঃ, নিয়তি নহে, স্বীয় চরিত্রের ত্রুটিই (Flaw of character) পতনের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। তৃতীয়তঃ, তাহারা সকলেই সমাজের উচ্চ বা অভিজাত সমাজের মানুষ। চতুর্থতঃ, তাহাদের দ্বন্দ্ব বা সংঘাত শুধু মাত্র বাহিরের বা পরিবেশের (environment) সহিত নহে, নিজের অন্তরের (Inner) সহিতও বটে। এবং পঞ্চমতঃ, শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর মূল্যে তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

সেক্সপীয়রের রোমান্টিক ট্রাজেডীর নায়কের এই সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কী পরিমাণে বিক্রমদেবের চরিত্রে বিদ্যমান আছে, তাহা দেখা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ, বিক্রমদেব রাজা অতএব স্বভাবতঃই উচ্চগুণের অধিকারী। 'সাহিত্য দর্পণ'-এও মহাকাব্যের নায়কের যেসব গুণের কথা বলা হইয়াছে, তাহার সহিত ট্রাজেডীর নায়কের বেশ খানিকটা মিল রহিয়াছে। মহাকাব্যের নায়কের অন্যতম গুণ হিসাবে বলা যায়, তাঁহারা হইবেন বীর এবং ধীরোদাত্ত অর্থাৎ তাঁহারা স্বাভাবিকভাবেই অসাধারণ গুণের অধিকারী। বিক্রমদেবের চরিত্রে এই গুণগুলির সন্নিবেশ দেখিতে পাই। দ্বিতীয়তঃ, চারিত্রিক ত্রুটি—বিক্রমদেবের চরিত্রের মূল ত্রুটি তাহার ভোগনিষ্ঠ সংকীর্ণ প্রেমাকাঙ্ক্ষা। এই ছিদ্রপথেই তাহার জীবনে দুর্বিপাক দেখা দিয়াছে, নতুবা তাহাকে সর্বদিক দিয়া মহৎ বলিতে বাধা কোথায়? তৃতীয় গুণ—চারিত্রিক আভিজাত্য। প্রথমেই এই গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে। চতুর্থতঃ, সংঘাত বা দ্বন্দ্ব; বলা বাহুল্য—বাহিরের সহিত যেমন সংঘাত বাধিয়াছে, তেমনিই তাঁহার চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্বও দেখা যায়। সর্বোপরি, বিক্রমদেব রাজা হইলেও প্রেমিক, বীর হইলেও নারীর রূপে মন মুগ্ধ হয়। সুতরাং, রোমান্টিক ট্রাজেডীর নায়ক হইবার সর্বপ্রকার গুণের সন্নিবেশ তাঁহার চরিত্রে রহিয়াছে।

বাস্তবিকপক্ষে, বিক্রমদেবের চরিত্রের প্রধান গুণ নির্ভীকতা, বলিষ্ঠতা এবং প্রেমাসক্তি। প্রথম হইতেই দেখিলাম তিনি জড-সংস্কারের উর্ধ্বে উঠিয়া তরুণ বন্ধুকে বলিতেছেন—

তাই তো নির্ভয়ে আমি দিয়েছি তোমারে
পৌরোহিত্য ভার। শাস্ত্র নাই, মন্ত্র নাই,
নাই কোনো ব্রাহ্মণ্য-বালাই।

ইহার জন্য তাঁহাকে হয়ত 'কুলদেবতার রোষহুতাশন'-এ দগ্ধ হইতে হইবে, বন্ধু দেবদত্ত তাঁহাকে একথা বলেন। তাহার উত্তরে বিক্রমদেবের নির্ভীক উত্তর—

রেখে দাও বিভীষিকা।
কুলদেবতার রোষ নত শির পাতি
সহিতে প্রস্তুত আছি—সহে না কেবল
কুলপুরোহিত-আস্ফালন।

এই নির্ভীকতার ছবিটি সম্পূর্ণ হইয়াছে, যখন দেখি তিনি বীরবেশে শত্রুকে পরাজিত করিবার জন্য যুদ্ধের আগুনে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। তাঁহার এই পৌরুষের কাছে যে একে একে সবাই মাথা নত করিয়াছে। শুরু করে নাই দুই জন—সুমিত্রা এবং কুমারসেন। এবং এইখানেই তাঁহার অভিমানে আঘাত লাগিয়াছে। বাত্যাহত তরীর মতো তাঁহার সমস্ত সংযম চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে, দিশাহারা হইয়া, বিবেক হারাইয়া তিনি যে পথে অগ্রসর হইলেন, তাহাতে তাঁহার মহত্ত্ব যে কলঙ্কিত হইল তাহা নহে, যাহাকে ধরিবার জন্য এতো আয়োজন, যাহাকে পাইবার জন্য এতো এতো প্রয়াস—সবই এক নিমেষে ব্যর্থ হইয়া গেল।

নিয়তি নহে, বিক্রমদেবের মত এমন এক মহৎ চরিত্রের বা জীবনের যে করুণ পরিণতি ঘটিল, তাহার জন্য দায়ী তিনি স্বয়ং। সবার অলক্ষ্যে যেমন গোপন ছিদ্রপথে লখীন্দরের লৌহনির্মিত বাসরগৃহে কালসর্প প্রবেশ করিয়াছিল, তেমনি তাঁহার অজ্ঞাতসারেই তাঁহার চরিত্রের এমনি এক ছিদ্রপথ দিয়া ভবিষ্যৎ পরিণতির আভাস দেখা গিয়াছিল। কবিপ্রাণ তিনি, তাই বন্ধু দেবদত্তের কাছে কাব্যালোচনা শুনিতে চান। প্রেমিক তিনি,

তাই দুই বাহু বাড়াইয়া জীবনের লীলাসঙ্গিনী প্রিয়তমা সুমিত্রাকে বলেন—

রাজা রানী! কে রাজা? কে রানী?
নহি আমি রাজা। শূন্য সিংহাসন কাঁদে।
জীর্ণ রাজকার্যরাশি চূর্ণ হয়ে যায়
তোমার চরণতলে ধূলির মাঝারে।

বিক্রমদেব চাহেন, সুমিত্রা তাঁহার বাহুবন্ধনে ধরা দিক, তুচ্ছ হইয়া যাক্ রাজ্যশাসন, পড়িয়া থাক্ বাহিরের কোলাহল, সংসারের প্রয়োজন। এইখানেই তাঁহার ত্রুটি। তিনি প্রেমকে খণ্ডিতরূপে দেখিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়াই অসত্যের বেড়াজালে নিজেকে জড়াইয়া ফেলিলেন এবং তাহা মাকড়সার জালের মতোই তাঁহাকে পাকে পাকে জড়াইয়া ফেলিল।

সুমিত্রার প্রতি তাঁহার প্রেম এমনিই দুর্বার যে, সুমিত্রার পলায়ন-সংবাদ তাঁহার নিকট পৌছাইলে তিনি সর্বশক্তি দিয়া তাঁহাকে ধরিতে চাহিলেন—

এ রাজ্যেতে
যত সৈন্য, যত দুর্গ যত কারাগার,
যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
পাবে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢবলে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয়। এই রাজা!
এই কি মহিমা তার! মহৎ প্রতাপ
লোকবল অর্থবল নিয়ে, পড়ে থাকে
শূন্য স্বর্ণ পিঞ্জরের মতো, ক্ষুদ্র পাখি
উড়ে চলে যায়।

সুমিত্রা চলিয়া গেলেন। জয়সেনকে বন্দী করিয়া নিজেই স্বামীর কাছে ধরা দিবার জন্য আসিলেন। আসিলেন কিন্তু অভিসারিকার বেশে নয়, আসিলেন বিজয়িনীর বেশে। তাহাতেই বিক্রমদেবের আত্মভিমান মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। একদা যাহাকে ধরিবার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, আজ তাহাকে শিবির বাহিরে হৃদয়ের কাছে পাইয়াও আহ্বান করিতে পারিলেন না, বরং দর্পভরে ফিরাইয়া দিলেন। কিন্তু, কে জানিত—

চিরদিনের মতো প্রেমের বাতি নিভিয়া গেল, কে জানিত একদিন অনুশোচনার আগুনে তিলে তিলে পুড়িয়া মরিতে হইবে! শুধু শেষের দিকে আর-একবার সুমিত্রার কথা মনে পড়িয়াছিল—তখন তাঁহার সেই উদ্ধত মূর্তি কোথায় যেন অন্তর্হিত হইয়া গেল। ভগ্নকণ্ঠে আপন-মনে বলিলেন—

আমি কোন্ সুখে ফিরি
দেশ দেশান্তরে, স্কন্ধে বহে জয়ধ্বজা,
অন্তরেতে অভিশপ্ত হিংসাতপ্ত প্রাণ!
কোথা আছে কোন্ স্নিগ্ধ হৃদয়ের মাঝে
প্রস্ফুটিত শুভ্র প্রেম শিশির শীতল!
ধুয়ে দাও, প্রেমময়ী, পুণ্য অশ্রুজলে
এ মলিন হস্ত মোর রক্ত কলুষিত।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, বিক্রমদেবের যখন চেতনা ফিরিল, তখন বড় দেরী হইয়া গিয়াছিল। তাই গভীর ব্যগ্রতার সহিত যখন তিনি সুমিত্রা ও ও কুমারসেনকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই ভ্রাতার ছিন্নমুণ্ড পাত্রে লইয়া সুমিত্রা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং মৃত্যুর মধ্য দিয়াই অন্তিম আত্ম-নিবেদনের ডালিটি তাঁহার পদপ্রান্তে রাখিয়া চিরবিদায় লইলেন।

সেক্সপীয়রের ট্রাজেডীতে দেখি, স্বীয় চরিত্রের ত্রুটির জন্যই নায়ককে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে। ম্যাক্‌বেথের উগ্র উচ্চাকাঙ্ক্ষাই (Volting ambition) তাহার পতনের মূল কারণ। ওথেলোর চরিত্রেও তেমনি দুর্বলতা দেখা যায়। তবে তাহা নিছক 'jealousy' নহে; ওথেলো মহৎ, কিন্তু তাঁহার চরিত্রের মূল ত্রুটি কল্পনা ও বুদ্ধি-বিবেচনার অভাব। এক্ষেত্রে, বিক্রমদেবের চরিত্রের ত্রুটি অন্যরূপ—অতিরিক্ত ভোগাচ্ছন্ন প্রেমাসক্তিই তাঁহার চরিত্রের মূল ত্রুটি। ওথেলোর মত যদিও বিক্রমদেব সুমিত্রাকে স্বহস্তে হত্যা করেন নাই, তথাপি সুমিত্রার মৃত্যুর জন্য তিনিই নিঃসন্দেহে দায়ী। ওথেলোকে তাহার কৃতকর্মের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে মৃত্যুর মধ্য দিয়া। বিক্রমদেবকে আত্মঘাতী হইতে হইল না; বাঁচিয়া রহিলেন, তবে তাহা মৃত্যুর চেয়ে ভয়ানক, ওথেলোর ট্রাজেডীর চেয়েও আরো গভীর।

মৃত প্রিয়তমার পদতলে নতজানু অবস্থায় জীবন-মৃত হতভাগ্য বিক্রমদেবের প্রার্থনা—

দেবী, যোগ্য নহি আমি তোমার প্রেমের,
তাই বলে মার্জনাও করিলে না? রেখে
গেলে চির-অপরাধী করে? ইহ জন্ম
নিত্য-অশ্রুজলে লইতাম ভিক্ষা মাগি
ক্ষমা তব; তাহারো দিলে না অবকাশ?
দেবতার মতো তুমি নিশ্চল নিষ্ঠুর—
অমোঘ তোমার দণ্ড, কঠিন বিধান।

আর মৃত প্রিয়তমা ডেসডিমোনার পদতলে মৃত্যু-পথযাত্রী আত্মঘাতক নতজানু ওথেলোর করুণ আর্তনাদ—

Soft you ; a word or two before you go.
I have done the state some service, and
they know't—
No more of that. I pray you, in your
letters,
When shall these unlucky deeds relate,
Speak of me as I am ; nothing exteunate,
Nor set down aught in malice. Then
must you speak
Of one that that lov'd not wisely, but too well ;
Of one not easily jealous, but, being wrought,
Perplexed in the extreme ; of one whose hand,
Like the base Indian, threw a pearl away
Richer than all his tribe ; of one whose
subdu'd eyes,
Albeit unused to the melting mood,
Drops tears as fast as the Arabian trees
Their med'cinable gum. Set you down this :

And say besides that in Aleppo once,
Where a malignant and a turban'd Turk
Beat a Venetian and traduc'd the state,
I took by th' throat the circumcised dog,
And smote him—thus.

—দুইই এক, স্থানকালপাত্রভেদে একই ছবির পুনরাবৃত্তি।

সুমিত্রা ঃ

রবীন্দ্র-সাহিত্যে নারীকে এক বিশেষ রূপে দেখিতে পাই। যেমন করিয়া সৃষ্টিকর্তা তিল তিল সৌন্দর্য সংগ্রহ করিয়া তিলোত্তমা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তেমনিই পবিত্রতা, মাধুর্য এবং কল্যাণের সমবায়ে গঠিত নারী চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। সংসারের নানা আবর্জনা, দিনযাপনের প্রাণ ধারণের গ্লানির হাত হইতে মুক্ত করিয়া তাহারা পুরুষকে লইয়া গিয়াছে অমরাবতীর পথে, আশ্রয় দিয়াছে, এবং কখনো-বা প্রেমের বন্ধনে বাঁধিয়া প্রতপ্ত জীবনকে স্নিগ্ধ-শ্যামল করিয়া তুলিয়াছে। রবীন্দ্র-নাটকে তাহারা কখনো দিয়াছে শ্রীমতীর রূপে, কখনো অপর্ণার রূপে, কখনো বা নন্দিনীর বেশে। রাজা ও রানী নাটকের নায়িকা সুমিত্রা তাহাদেরই একজন।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে এই নারীকে যে কল্যাণময়ী রূপে দেখিতে পাই, তাহার প্রধান কারণ হয়ত এই যে, পুরুষের ছন্নছাড়া জীবনে রাণী প্রেমের আসন পাতিয়া সংসারকে নিত্যনূতন ঐশ্বর্যে পূর্ণ করিয়া তোলে। সাংখ্য দর্শনে দেখিতে পাই পুরুষ নিষ্ক্রিয়, উদাসীন; প্রকৃতি বা নারীই আপন শক্তি দ্বারা সংসারকে বাঁধিয়া রাখে। রবীন্দ্রনাথ হয়ত এই দর্শনে অনুসরণ করেন নাই, এবং পুরুষকে যে তিনি নিষ্ক্রিয় রূপে গড়িয়াছেন, তাহাও বলা যায় না। কিন্তু আমাদের মনে হয়, নারীকে তিনি শ্রেষ্ঠতর, উচ্চতর আসন দিয়াছেন। স্বভাবতঃই নারী জীবনের প্রধান ঐশ্বর্য প্রেম, স্নেহ, মমতা এবং পুরুষের উদ্‌ভ্রান্ত জীবনে এগুলি প্রেরণা-স্বরূপ। শুধু তাহাই নহে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের সর্বত্রই দেখিতেছি—নারী শুধু কল্যাণময়ী নহে, লীলাসঙ্গিনী, মানসসুন্দরী অর্থাৎ সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তিও বটে। তাই কালো মেয়ের মধ্যে তিনি কৃষ্ণকলিকে দেখিয়াছেন। তাহা বাস্তবের দিক হইতে যাহাই হউক না

কেন, নারীর এই রূপটিই যে একমাত্র সত্য তাহাও বলা যায় না, রবীন্দ্র-সাহিত্যে নারীকে এই রূপেই দেখিতে পাই।

সুমিত্রা এমনিই এক চরিত্র। সুমিত্রার সৌন্দর্য এবং প্রেমের কাছে বিক্রমদেব এমন গভীরভাবে ধরা দিয়াছেন যে, তিনি সংসার ও রাজ্যের সকল দায়িত্ব ভুলিয়াছেন, অন্য সব কিছু তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। সুমিত্রাও রাজাকে ভালোবাসেন বটে, কিন্তু সে প্রেম নৌকার গুণ টানার মতো নহে, তাহা কেবলমাত্র নিজের জীবনকে বাঁধিয়া রাখিয়া আগাইয়া চলুক, ইহা সুমিত্রার অভিপ্রেত নয়। শেষের কবিতায় অমিতকে লাবণ্য বলিয়াছিল—

মোর লাগি করিয়ো না শোক,
আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক।

সুমিত্রার 'বিশ্বলোক' তাঁহার রাজ্য, তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের বাহিরে বৃহত্তর সংসারের আহ্বানেই তিনি একান্তভাবে বিক্রমদেবের বন্ধনে ধরা দিতে চাহেন নাই—

ওই শোনো ক্রন্দনের ধ্বনি—সকাতরে
প্রজার আহ্বান। ওরে বৎস, মাতৃহীন
নোস্ তোরা কেহ, আমি আছি—আমি আছি—
আমি এ রাজ্যের রানী, জননী তোদের।

বিক্রমদেবের ভুল হইয়াছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, সুমিত্রা একান্ত ভাবেই প্রেয়সী, তাই সম্পূর্ণভাবে সুমিত্রাকে চিনিতে পারেন নাই। সুমিত্রা প্রেয়সী, তিনিও রাজার মর্মসঙ্গিনী হইতে চাহেন, কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় সত্তাটিও সমান্তরালভাবে তাঁহার হৃদয়ে পাশাপাশি জাগরূক ছিল এবং এই দ্বিতীয় সত্তাটির তাগিদেই সুমিত্রা রাজাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। অবশ্য, ইহা সুমিত্রার প্রেমেরই মহৎ-দিক, আর-এক রূপ। সেই মহৎ প্রেমই জননীত্বের রূপ ধরিয়া বৃহত্তর সংসারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছে। তাহা হইলে দেখিতেছি, রাজা ও রাণী নাটকের সমস্ত বিরোধ বা জটিলতা অথবা ট্রাজেডীর মূলে রহিয়াছে সুমিত্রার অবহেলিত প্রেমের এই দিক—সুমিত্রা যাহাকে বলিয়াছেন 'জননী' রূপ। সুতরাং নাট্যধর্মের দিক হইতে দেখা যাইতেছে, এই নাটকের সমস্ত বিরোধ সৃষ্টি হইয়াছে সুমিত্রাকে লইয়া। নায়িকার সকল গুণই তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান। ব্যক্তিত্ব, কল্যাণ ও প্রেমের

সমন্বয়ে তাঁহার চরিত্র অসাধারণ হইয়া উঠিয়াছে। সুমিত্রার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য সংহত শান্তশ্রী। এই জন্যই দেখি তাঁহার চরিত্রে কোন দ্বন্দ্ব নাই, কোন ভ্রান্তিও নাই। তিনি নিজের জীবনকে প্রিয়া ও জননী রূপে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখিয়াছেন। তাই যখন বুঝিলেন যে, তাঁহার জন্যই রাজা রাজকার্যে অবহেলা করিতেছেন, রাজ্যে অমঙ্গলের ঘন কৃষ্ণ মেঘ নামিয়া আসিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে তিনি জননীর কর্তব্য পালনে অগ্রসর হইলেন। রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব কৌশলে এই নারী চরিত্রের মধ্যে প্রিয়া ও জায়াকে একত্র মিলাইয়াছেন।

সুমিত্রার এই জননী-রূপ এমনিই প্রদীপ্ত যে তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত বিজয়িনীর বেশে দেখিলাম। নাটকের শেষ দৃশ্যে সুমিত্রার অন্তিম বিদায়ের দৃশ্যটি এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য :

চন্দ্রসেন। একী! জননী সুমিত্রা!
সুমিত্রা। ফিরেছ সন্ধানে যার রাত্রিদিন ধরে
কাননে কান্তারে শৈলে—রাজ্য ধর্ম দয়া
রাজলক্ষ্মী সব বিসর্জিয়া, যার লাগি
দিগ্বিদিকে হাহাকার করেছ প্রচার,
মূল্য দিয়ে চেয়েছিলে কিনিবারে যারে,
লহো মহারাজ, ধরণীর রাজবংশে
শ্রেষ্ঠ সেই শির। আতিথ্যের উপহার
আপনি ভেটিলা যুবরাজ। পূর্ণ তব
মনস্কাম, এবে শান্তি হোক, শান্তি হোক
এ জগতে, নিবে যাক নরকাগ্নিরাশি,
সুখী হও তুমি।

—এই কথাগুলি বলার পরেই সুমিত্রাও চিরবিদায় লইলেন। ইহা কি অভিমানে আত্মহত্যা? আমাদের মনে হয়, সুমিত্রার এই মৃত্যুর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের এক বিশেষ উদ্দেশ্য রহিয়াছে। শেক্সপীয়রের ট্রাজেডীর মধ্যে দেখিতে পাই, পাপীই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে। কিন্তু রবীন্দ্র-নাটকে তাহার বিপরীত লক্ষণ দেখি। পাপী নহে, তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে নিষ্পাপ —যে আপন আত্মাহুতির মধ্য দিয়া পাপীর চেতনা ফিরাইয়া দেয়। রবীন্দ্র-নাটকের সর্বত্রই ইহা দেখিয়াছি। শ্রীমতীর আত্মাহুতির মধ্য দিয়াই

সকলের চেতনা ফিরিয়াছে। সুমিত্রাও রাজা বিক্রমদেবকে এমনি করিয়া জাগাইয়া দিয়া গেলেন আপন মৃত্যুর ডালি নিবেদন করিয়া। সুমিত্রার মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ এমনি এক উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছেন। দর্শক বা পাঠকের মনে শেষ পর্যন্ত সুমিত্রার এই অগ্নিশুদ্ধ পবিত্র আত্মোৎসর্গের চিত্রটিই উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

ট্রাজেডীর নায়ক হিসাবে বিক্রমদেবের মধ্যে এক মহৎ চরিত্রের পতন ঘটিয়াছে। কিন্তু সুমিত্রার জীবনে কি সত্যিই কোন ট্রাজেডী নাই? আমাদের মনে হয়, তাহার জীবনের ট্রাজেডী যথার্থই গভীর। যিনি সুমিত্রার অন্তরের দেবতা, সেই দেবতার ঘুম ভাঙাইবার জন্যই দেবতাকে ছাড়িতে হইল এবং যে প্রিয়তমকে তিনি সমস্ত অন্তর দিয়া ভালোবাসিয়াছিলেন সেই প্রিয়তমের রোষবহ্নিতেই তাঁহাকে দগ্ধ হইতে হইল। ইহা যেমন তাঁহার জীবনের ট্রাজেডী, তেমনি সমস্ত নাটকেরও বটে। বস্তুতঃ, এই নাটকের ট্রাজেডীর বীজ ব্যক্তির সহিত বাহির বা পরিবেশের নহে, ব্যক্তির সহিত ব্যক্তিরও নহে—সুমিত্রা ও বিক্রমদেব দেহে ভিন্ন, মনে তো একই ;—এই নাটকের ট্রাজেডীর বীজ আরো গভীরে—তাহা হইতেছে প্রেমের সহিত প্রেমের। এক প্রেম সর্বগ্রাসী, অন্য প্রেম সর্বত্যাগী। ইহাদের সংঘর্ষেই এই নাটকের ট্রাজেডী ঘনাইয়া আসিয়াছে। আর সুমিত্রা হইতেছেন এই সর্বত্যাগী প্রেমের মূর্ত প্রতীক।

তবু কোথায় যেন সুমিত্রার সহিত 'ওথেলো' নাটকের নায়িকা ডেস্‌ডিমোনার একটা আন্তর মিল রহিয়াছে। বাহ্যতঃ অমিল যাহাই থাকুক না কেন, আসলে তাঁহারা অভিন্ন। দুজনেই সমস্ত হৃদয় দিয়া প্রিয়তমকে ভালোবাসিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিদানে পাইলেন কী? দুজনেই শরৎপ্রাতের শেফালিকার মতো শিশির-সিক্ত ধরণীর বুকে চিরনিদ্রায় নিমগ্ন রহিলেন :

"Seals of love, but
Seal'd in vain
Seal'd in vain !"

[Shakespeare].

কুমারসেন ও ইলা ঃ

রাজা ও রানী নাটকে এই দুইটি চরিত্র তথা তাহাদের উপাখ্যান স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মতে 'উপসর্গ' অর্থাৎ অত্যন্ত শোচনীয়রূপে অসংগত। রবীন্দ্রনাথ যাহাই বলুন, আমাদের মনে হয় তাহাদের ভূমিকা অসংগত হয় নাই। বরং তাহাদের উপস্থাপনার মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ এক মহৎ প্রেমের চিত্র অঙ্কন করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। তাহাদের মধ্য দিয়া প্রেমের এক মহনীয় চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কুমার ও ইলা বাহ্যতঃ যাহাই হউক না কেন, অন্তরের দিক দিয়া বিশেষ কোন পার্থক্য নাই; কেবল একজন নারী অন্যজন পুরুষ মাত্র। তাহারা দুইজনেই পরস্পরের প্রতি আত্মনিবেদন করিয়াছে, তাহার মধ্যে কোন ছিদ্র নাই; তাহার মধ্যে কোন দ্বন্দ্বও তাই জাগে নাই। হয়ত বা এই কারণেই তাহাদের চরিত্রে কোন জটিলতা দেখা যায় নাই। যেন একটি সহজ সরল পথ ধরিয়া প্রেমের অনির্বাণ আলোকে আলোকিত হইয়া তাহারা দুইজনে জীবনাভিসারে বাহির হইয়াছে। এমনি করিয়া তাহারা এক স্বপ্নময় জগৎ রচনা করিয়াছেন।

কিন্তু প্রথম হইতেই দেখিতে পাই, তাহারা দুইজনেই একই ধাতুতে সৃষ্ট, যেন বাস্তবের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্কই নাই। প্রেমের গভীরে তাহারা দুইজনেই এমনি নিমগ্ন যে, বাস্তব-সম্পর্কশূন্য হইয়া দুই সংসারানাভিজ্ঞ তরুণ-হৃদয় খেলাঘর পাতিয়া বসিয়াছে। ইলা কুমারকে বলে—

> মিছে কথা বোলো না কুমার।—
> তুমি রাজা আপন রাজত্বে, এ অরণ্যে
> আমি রানী, তুমি প্রজা মোর। কোথা যাবে ?
> যেতে আমি দিব না তোমারে। সখী, তোরা
> আয়। এরে বাঁধ্ ফুলপাশে, কর্ গান,
> কেড়ে নে সকলে মিলি রাজ্যের ভাবনা।

ইহাকে কী বলিব ? 'আমি রানী, তুমি প্রজা মোর'—ইলার এই কথার মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর কিশোরী রাধিকার স্পন্দন শোনা যাইতেছে।

এই নাটকের একদিকে রহিয়াছেন বিক্রমদেব ও সুমিত্রা, অন্যদিকে রহিয়াছেন কুমার ও ইলা। বিক্রমদেব ভালোবাসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই

ভালোবাসার মধ্যে ত্যাগ বলিয়া কিছু ছিল না। কিন্তু, কুমারের চরিত্র ও প্রেম ত্যাগের মূর্ত প্রতীক। তাই যে মুহূর্তে বৃহত্তর আহ্বান আসিল, সেই মুহূর্তেই কুমার ইলার প্রেমপাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া অনিশ্চিত ভবিষ্যতের গহন অন্ধকারের পথে অগ্রসর হইল। ইলাও তাহাকে বাধা দিল না, কেননা তাহার ভালোবাসার মধ্যে কোথাও ফাঁক দিছ না। তাই সে বলিয়াছে—

যাও তুমি, আমি একা কেমনে পারিব
তোমারে বাধিতে ধরে! হায়, কত ক্ষুদ্র,
কত ক্ষুদ্র আমি! কী বৃহৎ এ সংসার!
কী উদ্দাম তোমার হৃদয়!

কুমারের প্রতি গভীর প্রেম-নিষ্ঠা হইতেই ইলা বলিয়াছে—

জানি, জানি নাথ,
জানি আমি তোমার হৃদয়।

কুমার চলিয়া গেল। নিঃসন্দেহে তাহাকে বিদায় দিতে প্রাণ চাহে নাই, তবু সমস্ত বেদনা সহ্য করিয়া সে কুমারকে যাইতে দিয়াছে। এই ইলাকেই আমরা আর-একরূপে দেখিলাম, কুমার তখন রাজ্যহীন, পলাতক, অরণ্যবাসী। কিন্তু ইলার অন্তরে তাহারই ছবি চির-জ্যোতির্ময়—। বিক্রমদেবকে তাই সে বলিতে পারিল—

সে কি আছে মোর?
সমস্ত সঁপেছি যারে বিদায়ের কালে
হৃদয় সে নিয়ে চলে গেছে, বলে গেছে—
ফিরে এসে দেখা দেবে এই উপবনে।
কত দিন হল; বনপ্রান্তে দিন আর
কাটে নাকো। পথ চেয়ে সদা পড়ে আছি;
যদি এসে দেখিতে না পায়, ফিরে যায়—
আর যদি ফিরিয়া না আসে! মহারাজ
কোথা নিয়ে যাবে! রেখে যাও তার তরে
যে আমারে ফেলে রেখে গেছে।

ইলার এই প্রেমের দৃষ্টান্ত সত্যই অতুলনীয়। 'পথ চেয়ে সদা পড়ে

আছি, যদি এসে দেখিতে না পায়, ফিরে যায়' ইহা অপেক্ষা একজন প্রেমিকার পক্ষে, নারীর পক্ষে আর কী বলা সম্ভব? রাধিকাও এমনি করিয়া সর্বস্ব দিয়া কৃষ্ণের জন্য তমালকুঞ্জবনে অপেক্ষা করিয়াছিল, কালিদাসের পার্বতীও এমনি করিয়া শিবের প্রেমলাভের জন্য দুশ্চর তপস্যা করিয়া অপর্ণা হইয়াছিল। তাহাদের সাহিত ইলার মনোগত, ধর্মগত কোন পার্থক্যই নাই,—পার্থক্য এই পার্বতী শিবকে পাইয়াছিল, ইলা কুমারকে সেই যে বিদায় দিয়াছিল, সেই মহাপ্রস্থানের পথ হইতে কুমার আর তাহার কাছে ফিরিয়া আসিল না। বাস্তবিকপক্ষে, ইলার মধ্যে আমরা এক শাশ্বত আত্মত্যাগী নারীপ্রেমের চিত্র দেখিতে পাই। তাহার চরিত্রে পরিবর্তন নাই সত্য, হয়ত টাইপ চরিত্রও বলা যায়, তথাপি এই নাটকে তাহার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সুমিত্রার প্রেমও মহৎ, সুন্দর, কিন্তু তাহা ইলার মতো এমন স্নিগ্ধ এবং আত্মত্যাগী নহে। সুমিত্রার আত্মদান সত্যধর্মের জন্য, সত্যধর্মই তাহাকে স্বামীর বাহুবন্ধন হইতে বাহিরে আনিয়াছে এবং সেই সত্যধর্মের জন্যই শেষপর্যন্ত সত্যের যূপকাষ্ঠে আত্মবলি দিয়াছে। কিন্তু ইলার মনের মধ্যে তেমন কোন আদর্শ বোধ নাই। থাকিবে কেমন করিয়া? সে তো সুমিত্রার মতো জীবনের কঙ্করভূমিতে দাঁড়াইয়া বৃহত্তর সংসারের ছবিটি দেখে নাই। ইলার প্রেমকে বলা যায় Love for love's sake; তাহার আর অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। প্রেমই তাহার জীবন, প্রেমেই তাহার জীবনের সার্থকতা। শ্রীরাধার মতোই সে হয়ত কুমারের প্রতি মনে মনে বলিয়াছে—

তোমারই গরবে গরবিনী আমি, রূপসী তোমারই রূপে।

বস্তুতঃ, ইলার মতো কুমারের জীবনও প্রেম-সর্বস্ব। হয়ত বা পুরুষ বলিয়াই সে ইলার মতো বিরহ-বেদনায় তাহার তরুণ-কোমল মুখখানি ম্লান হইয়া যায় নাই। ইলা যেমন তাহার প্রতীক্ষায় দিন গনিয়াছে, প্রেমের দুশ্চর সাধনার মধ্য দিয়া দিনগুলি অতিবাহিত হইয়াছে; তেমনি পলাতক আরণ্যক-জীবনে কুমারের দিনগুলিও ইলার ভাবনায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া তাহারই স্মৃতিতে কুমারের হৃদয় পরিপূর্ণ—

সে আমার ধ্রুবতারা,
মহৎ মৃত্যুর দিকে দেখাইছে পথ।

এই ইলা এবং কুমারকে আমরা 'রক্তকরবী'তে নন্দিনী ও রঞ্জনের মধ্যে আর-একবার দেখিতে পাই। কাজেই একথা মনে হওয়া খুবই সংগত, যে এই দুইটি চরিত্রকে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার চরিত্র মূলতঃ মন্ময় (subjective), হয়ত বা গীতিকবিতার মতো প্রাণের একটি তারই বাজিয়া চলিয়াছে; তথাপি, যেহেতু রাজা ও রানী নাটকটি আসলে প্রেমের নাটক, সেই জন্যই এই দুইটি চরিত্রের মধ্য দিয়া এমনি এক প্রেমের চিত্র অঙ্কিত করা একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল।

বিক্রমদেবও সুমিত্রাকে পান নাই, অথবা সুমিত্রা বিক্রমদেবকে। কুমার অথবা ইলা—তাহারাও পরস্পরের সহিত মিলিতে পারিল না। একদা তাহাদের জন্য যে বাসর-কক্ষ সজ্জিত হইয়াছিল, তাহার প্রদীপ নিভিয়া গেল। কিন্তু যে অর্থে বিক্রমদেব সুমিত্রাকে অথবা সুমিত্রা বিক্রমদেবকে পান নাই, তাহা কুমার ও ইলা প্রসঙ্গে প্রযোজ্য নহে। বাহিরের মিলন নহে, অন্তরের মিলনে তাহারা অবশ্যই একসঙ্গে বাঁধা পড়িয়াছে। শুধু তাহাদের জীবনালেখ্য হইতে এই কথাই প্রমাণিত হইল—

"The course of true love never did run smooth."

অন্যান্য গৌণ বা পার্শ্ব চরিত্র :

একটি বৃক্ষ যেমন শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হইয়া থাকে, তেমনি একটি নাটকের মধ্যেও মূল নায়ক-নায়িকা বা প্রধান চরিত্র ছাড়াও আরো চরিত্রের সন্নিবেশ থাকে, যাহারা শাখা-প্রশাখার মতোই আখ্যানভাগ বা প্লটকে সম্পূর্ণতা দান করে। ছবিতে যাহাকে হাইলাইট বলে, তাহা ছাড়াও যেমন আরো রঙের বা রেখার প্রয়োজন হয়, তেমনিই গৌণ চরিত্রগুলিও নাটকের আখ্যানভাগ বা প্লটের সহিত বিজড়িত থাকিয়া অনুরূপ তাৎপর্য বহন করে।

একজন মানুষের জীবনের সীমানা কেবলমাত্র তাহার জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং সমাজের বা সমষ্টির পরিপ্রেক্ষিতেই ব্যক্তি-জীবনের যথার্থ মূল্য যাচাই করা যায়। মহাকাব্য, উপন্যাস বা গল্পে এই কারণেই নায়ক-নায়িকার জীবনালেখ্য অঙ্কন করিতে গিয়া লেখককে আরো অনেক চরিত্রের অবতারণা করিতে হয়। বরং বলা যায়, বৃহত্তর সমষ্টিগত জীবনের

পটভূমিকাতেই ব্যক্তিমানসের চিত্রটি সুসম্পূর্ণরূপে ধরা পড়ে। তবু, কাব্যে, মহাকাব্যে, উপন্যাসে বা গল্পে গৌণ চরিত্রগুলির উপর ততখানি গুরুত্ব দিবার প্রয়োজন নাই, কারণ, কখনো বর্ণনার আড়ালে, কখনো বা কাহিনীর দ্রুত পরিবর্তনের মুখে তাহাদের অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া যায়, পাঠকের কাছে তাহার জন্য কৈফিয়ৎ দাখিল করিবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং, এই সমস্ত গৌণ চরিত্রগুলি 'কাব্যে উপেক্ষিতা' হইলেও বলিবার কিছু নাই। কিন্তু নাটকেব ক্ষেত্রে এই ধরনের গৌণ বা পার্শ্ব চরিত্রগুলিকে উপেক্ষা করিলে চলে না, কারণ, নাটকের প্লটের সহিত তাহারা অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত। নাটকের প্লট রচনাকে স্ফটিকের সহিত তুলনা করা যায়, যাহাব মধ্যে কাব্য বা গল্পসুলভ বর্ণনার সামান্যতম শৈথিল্য ঘটাইবার সুযোগ থাকে না। এই জন্যই দেখা যায়, কোনো নাটকের সামান্যতম তুচ্ছতম চরিত্রেরও কোনো-না-কোনো বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে এবং তাহাব ভূমিকা ক্ষণকালের জন্য বা গৌণ হইলেও তাৎপর্যপূর্ণ।

বস্তুতঃ, রাজা ও রানী নাটকের, মূল বা প্রধান চরিত্রগুলি বাদ দিলে, অন্যান্য গৌণ চরিত্রগুলিরও এই মূল্য বহিয়াছে। শিলাদিত্য, জয়সেন, যুধাজিৎ, এমনকি অবরুরাজ বা নারায়ণীর মতো চরিত্রগুলি নিতান্তই ক্ষণকালের জন্য রঙ্গমঞ্চে আসিয়া দাঁড়ায় বটে, কিন্তু তাহাদেব তাৎপর্য কি কম? তেমনি ত্রিবেদীর চরিত্রকে যদি বিদূষকের ভূমিকার সহিত মিলাইয়া দেখা যায়, তবে বোধ করি এই নগণ্য চরিত্রও অসামান্য রূপে প্রতিভাত হয়। শংকর-এর মধ্যে আমরা এক 'চির পুরাতন ভৃত্য'কে দেখিতে পাই—প্রভুর সেবা করিয়াই যাহারা জীবন কাটাইয়া দেয়।

তথাপি, এইসব গৌণ চরিত্রের মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় চরিত্র—দেবদত্ত, চন্দ্রসেন এবং রেবতী। তাই ইহারা বিশেষ আলোচনার যোগ্য। ইহাদের চরিত্রের মধ্যে কোন জটিলতা নাই, ইহাদের চরিত্রের স্বরূপ বুঝিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না। একদিক দিয়া ইহাদের টাইপ চরিত্র বলা চলে, বিশেষতঃ রেবতী চরিত্রটি তো বটেই।

দেবদত্ত গৌণ চরিত্র, কিন্তু নাটকের সুরু তাহাকে লইয়াই। সে তরুণ ব্রাহ্মণ, রাজার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। রাজার প্রতিও তাহার অনুরাগ গভীর। রাজার সে যে শুধু বন্ধু, তাহাই নহে—বিশেষ বিশ্বাসভাজনও বটে। তাই রাজা

বিক্রমদেব এই তরুণ শাস্ত্র-জ্ঞানহীন ব্রাহ্মণ্য-বালাইহীন ব্রাহ্মণের উপর রাজ-পৌরোহিত্যের ভার দিতে চান—

তাই তো নির্ভয়ে আমি দিয়েছি তোমারে
পৌরোহিত্য ভার। শাস্ত্র নাই, মন্ত্র নাই,
নাই কোন ব্রাহ্মণ্য-বালাই।

অর্থাৎ সংস্কারমুক্ত মন লইয়া দেবদত্ত রাজার প্রণয়-ভাজন হইতে পারিয়াছে। দেবদত্ত তরুণ, কিন্তু জীবন সম্পর্কে তাহার উপলব্ধি গভীর। গোড়াতেই তাই সে রাজাকে নারী সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়াছিল—

বন্যা আনে
সেই নদী; সেই বায়ু ঝঞ্ঝা নিয়ে আসে।

বাস্তবিকই, দেবদত্তের এই বাক্য অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। সুমিত্রাকে দোষ দেওয়া যায় না ঠিক, কিন্তু ঝঞ্ঝা উঠিয়াছে তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই, ইহা অস্বীকার করা চলে না। আবার, সাধারণ মানুষের প্রতিও দেবদত্তের গভীর সহানুভূতি রহিয়াছে। সুমিত্রাকে সে বলিয়াছে—

ধান্য তার বসুন্ধরা যার।
দরিদ্রের নহে বসুন্ধরা। এরা শুধু
যজ্ঞভূমে কুক্কুরের মতো লোলজিহ্বা
এক পাশে পড়ে থাকে, পায় ভাগ্যক্রমে
কভু যষ্টি, উচ্ছিষ্ট কখনো। বেঁচে যায়
দয়া হয় যদি, নহে তো কাঁদিয়া ফেরে
পথপ্রান্তে মরিবার তরে।

রাজার বন্ধু বলিয়াই দেবদত্ত রাজার অন্যায়ের প্রতি বিদ্রূপ করিতে ছাড়ে নাই—

অরাজক কে বলিবে! সহস্ররাজক!

এবং—

দৃষ্টি নাই সে কী কথা! বিলক্ষণ আছে!
গৃহপতি নিদ্রাগত, তা বলিয়া গৃহে
চোরের কি দৃষ্টি নাই? সে যে শনিদৃষ্টি!

বলা বাহুল্য, দেবদত্তের চরিত্র এক মহান সত্যনিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহার

চরিত্রে কোনো অসাধারণত্ব নাই ঠিক, কিন্তু স্বচ্ছ জলের মতোই তাহার চরিত্র পবিত্র, সুন্দর ও কর্তব্যপরায়ণ। সে যাহা অনুভব করে, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে কোন দ্বিধা করে না। সত্য কথা বলিতে কি, দেবদত্ত জীবনকে সহজে বুঝিয়াছে বলিয়াই, তাহার কণ্ঠে সব কথাই সহজ সুরে বাজিয়া উঠে। সংসারের সুখ-দুঃখকে, সব কিছুকেই সে সহজ করিয়া গ্রহণ করিয়াছে, কোন কিছুই তাহার চিত্তকে ভারাক্রান্ত করে না। জীবনকে এমন নিরাসক্ত রূপে দেখা বড় সহজ নহে। তাহাকে বন্দী-জীবন যাপন করিতে হইয়াছে। পরে যখন দীর্ঘদিন পরে বন্ধু বিক্রমদেবের সহিত তাহার দেখা হইল, তখন সেই কারা-জীবনের গ্লানি ভুলিয়া গিয়া রাজাকে পরিহাসের সুরে বলিল—

তাই বটে মহারাজ, রত্ন বটে আমি!
অতি যত্নে বন্ধ করে রেখেছিলে তাই!
ভাগ্যবলে পলায়েছি খোলা পেয়ে দ্বার।
আবার দিয়ো না সঁপি প্রহরীর হাতে
রত্নভ্রমে।

এই দেবদত্তই বন্ধু-কৃত্যের জন্য কুমারের সন্ধানে দুর্গম অরণ্যের পথে পথে ঘুরিয়াছে।

বস্তুতঃ, দেবদত্তের মধ্যে যাহা সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, তাহা হইতেছে মনুষ্যত্ববোধ ও জীবনানুরাগ। অথচ মুক্ত স্রোতের মতোই তাহার জীবন। দেবদত্ত তাই পরিপূর্ণ মানুষ, আমাদের অতি পরিচিত একান্ত আপন ও প্রিয়জন। এইখানেই তাহার চরিত্রের অনন্যতা, এইখানেই সে সামান্য হইয়াও অসামান্য, আবার এইখানেই সে রাজা বিক্রমদেবকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে।

চন্দ্রসেনের চরিত্রেও বিশেষ কোনো জটিলতা নাই। কুমারকে তিনি যথার্থই ভালোবাসেন, কিন্তু তাই বলিয়া পত্নীর অন্যায়ের প্রতিবাদ করিবার মতো পরিমিত শক্তি নাই। চন্দ্রসেন বোঝেন, সিংহাসনের উপর তাঁহাদের কোন অধিকার নাই, কুমারই কাশ্মীরের রাজা। অথচ রেবতী ছলে বলে কৌশলে কুমারকে তাহার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চান। রেবতীর কাছে তাঁহার পৌরুষ মাথা তুলিতে পারে না—তিনি নতমস্তকে পত্নীর অন্যায় সহ্য করেন। একদিক দিয়া চন্দ্রসেনের এই ভীরুতা ক্ষমা নিন্দনীয়। কিন্তু, তিনি

পত্নীর মতো মনুষ্যত্ব বিসর্জন দেন নাই। তাই কুমার যখন যুদ্ধে যাইবার অনুমতি লইতে আসিল, তিনি পত্নীর ভ্রূকুটি তুচ্ছ করিয়া বলিলেন—

যাও তবে। দেখো বৎস
থেকো সাবধানে। দর্পমদে ইচ্ছা করে
বিপদে দিয়ো না ঝাঁপ। আশীর্বাদ করি
ফিরে এসো জয়গর্বে অক্ষত শরীরে
পিতৃ-সিংহাসন 'পরে।

চন্দ্রসেনের তেমন প্রখর ব্যক্তিত্ব নাই বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি মনুষ্যত্বহীন নীচ-চেতা নহেন। ইহাই তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

সর্বশেষে রেবতী, রাজা ও রানী নাটকের Villain চরিত্র বলিয়া যদি কেহ থাকে, তবে সে রেবতী—লেডী ম্যাক্‌বেথের সহোদরা। পূর্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ নারীর চির-কল্যাণী রূপটিই অঙ্কিত করিতে চাহিয়াছেন, নারীকে তিনি নরকের দুয়ারে উপস্থাপিত করিতে চাহেন নাই। তবু আভাসেও যদি কোন কোন নারীর মধ্যে নারীর ঐ ভয়ঙ্করী রূপ দেখা দিয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে তাহা ব্যতিক্রম; রবীন্দ্র-সাহিত্যের রাজপথ দিয়া তাহারা আসে নাই। রেবতীর মধ্যেও নারীর সেই ভয়ঙ্করী রূপ দেখিতে পাইতেছি; আর-একটু হইলেই তাহাকে পুরোপুরি লেডী ম্যাক্‌বেথ বলিয়া ভ্রম হইত। কিন্তু না, রবীন্দ্রনাথ এই চরিত্রের উপর তেমন মনোযোগ দেন নাই। তবু, আড়ালে থাকিয়াও অল্প পরিসরেই রেবতীর ভয়ঙ্করী মূর্তিটি সহজেই ধরা পড়ে।

লেডী ম্যাক্‌বেথ ম্যাক্‌বেথকে বলিয়াছিল—

Only look up clear.
To alter favour ever is to fear.
Leave all the rest to me.

রেবতীও চন্দ্রসেনকে বলিয়াছে—

ক্ষুধিত মার্জার
বসে ছিলে এতদিন সময় চাহিয়া,
আজ তো সময় এল—তবু আজো কেন
সেই বসে আছো!

ম্যাক্‌বেথ লেডী ম্যাক্‌বেথের প্রবোচনাতেই পাপের পথে অগ্রসর হইয়াছে; লেডী ম্যাক্‌বেথই ম্যাক্‌বেথের 'volting ambition'কে জাগাইয়াছে, তাহার হৃদয়ের গোপন কৃষ্ণ সর্পটিকে বাহির করিয়া আনিয়াছে। রেবতীও চন্দ্রসেনকে একই পথে টানিতে চাহিয়াছে। সৌভাগ্যবশতঃ, রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গটি অধিক দূর বাড়িতে দেন নাই, অথবা নাটকের অনিবার্য পরিণতির দিকে তাকাইয়া বলা যায়—তাহার সুযোগও ছিল না।

বস্তুতঃ, এই চরিত্রটি সৃষ্টি করিয়া রবীন্দ্রনাথ এই নাটকের রস-বৈচিত্র্য ঘটাইয়াছেন। রেবতী চরিত্র তাঁহার অভিপ্রেত না হইলেও নাটকীয় চরিত্র হিসাবে ব্যর্থ সৃষ্টি নহে। সর্বোপরি, রবীন্দ্রনাথ নারীকে যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, তাহার ব্যতিক্রম বলিয়াও, সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যে রেবতী চরিত্রটির যথার্থই এক স্বতন্ত্র স্থান রহিয়াছে। রেবতী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, অনন্যতা বা তাৎপর্য যদি কিছু থাকে, তাহা রেবতীর ভয়ঙ্করী রূপের মধ্যেই নিহিত! সত্য কথা বলিতে কি, রেবতীকে ভারতীয় নারী বলিয়া ভাবিতেও ভয় হয়।

রাজা ও রানী

বস্তু সংক্ষেপ :

প্রথম অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য :

জালন্ধর রাজপ্রাসাদের এক কক্ষে রাজা বিক্রমদেব ও তাঁহার ব্রাহ্মণ বন্ধু দেবদত্ত আলাপরত। বিক্রমদেব দেবদত্তকে রাজপুরোহিত পদে নিযুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু দেবদত্ত সেই দায়িত্ব এড়াইয়া যাইতে চাহেন। বিক্রমদেব তাঁহার বন্ধুকে ভালোবাসেন এবং তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কাব্যালোচনার জন্য বলেন। কথাপ্রসঙ্গে উঠিল রমণীর প্রেমের কথা। দেবদত্ত শাস্ত্রের বাক্য স্মরণ করাইয়া দিয়া বলেন যে, রমণীকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। ইতিমধ্যে রাজার সন্ধানে আসিয়া মন্ত্রী দেবদত্তকে জানায় যে, রাজকার্যে অবহেলার জন্য রাজ্যে হাহাকার রব উঠিয়াছে। রানীর পিতৃরাজ্যের কাশ্মীরী কুটুম্ববর্গ দেশ জুড়িয়া বসিয়াছে। তাহাদের অত্যাচারে সমস্ত দেশ জর্জরিত। মন্ত্রীর কথা শুনিয়া দেবদত্ত হাসিয়া উঠিয়া বলিল—রানীর কাছে যাইলে কিছু ফল হইতে পারে, নতুবা রাজা ইহার প্রতিবিধান করিবেন না। এমন সময় বাহিরে কোলাহল উঠিলে তাহা দেখিবার জন্য উভয়েই প্রাসাদের বাহিরে যায়।

দ্বিতীয় দৃশ্য :

রাজপথে একদল লোক নিজেদের মধ্যে আলাপ করিতে করিতে চলিয়াছে। তাহাদের মধ্যে আছে কিনু নাপিত, মন্মথ চাষা, নন্দলাল, কুঞ্জর, শ্রীহর কলু, হরিদীন কুমার প্রভৃতি আরো অনেকে। তাহারা রাজ্যের অবস্থা লইয়াই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিতেছে। তাহাদের আলোচনার প্রধান বক্তব্য হইল, রাজা রানীর অন্তঃপুরে আশ্রয় লইয়াছেন অর্থাৎ রানী রাজাকে অঞ্চলের প্রান্তে বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন। ইহার জন্য তাহারা রাজার বিরুদ্ধে মাথা তুলিতে চায়। এমন সময় দেবদত্ত হঠাৎ তাহাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়। সে তাহাদের সব কথা শুনিয়া বলে যে রাজার বিরুদ্ধাচরণ করা বুদ্ধিমানের কাজ নহে।

তৃতীয় দৃশ্য :

অন্তঃপুরের প্রমোদকাননে বিক্রমদেব রানী সুমিত্রার সহিত প্রেমালাপ-রত। বিক্রমদেবের হৃদয় সুমিত্রার প্রেমে পরিপূর্ণ। সুমিত্রার তাহা অজানা নাই। বিক্রমদেব তাঁহাকে একান্ত আপনার করিয়া পাইতে চাহেন বলিয়াই বাহিরকে তুচ্ছ করিতে বলেন। কিন্তু, সুমিত্রার তাহা অভিপ্রেত নয়। সুমিত্রা বুঝিতে পারেন, রাজা তাঁহারই জন্য গৃহে অন্তরীণ হইয়া আছেন, রাজকার্যে অবহেলা করিতেছেন। তিনি এই বিভ্রান্তি হইতে রাজাকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করেন। বিক্রমদেবের তাহা ভালো লাগে না। তিনি সুমিত্রাকে ভুল বুঝিয়া তাঁহার উপর অভিমান করেন। এমন সময় বাইরে জনতার ক্রন্দনধ্বনি শোনা যায়। সেই ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া সুমিত্রার অন্তর হাহাকার করিয়া উঠে। তিনি বলেন, আমি আছি—আমি এ রাজ্যের রানী, জননী তোদের।

চতুর্থ দৃশ্য :

দেবদত্তের প্রতীক্ষায় সুমিত্রা অন্তঃপুরকক্ষে অপেক্ষা করিতেছেন। দেবদত্ত আসিয়া তাঁহাকে জানায় যে, প্রজারা অনাহারে রহিয়াছে। সুমিত্রা দেবদত্তের কাছে রাজ্যের সমস্ত খবর জানিতে পারেন—শিলাদিত্য প্রভৃতি তাঁহার আত্মীয়বর্গ দেশের এই অবস্থা ঘটাইয়াছে। দেবদত্তের কথা শুনিয়া সুমিত্রা নিজেকে ধিক্কার দেন, বুঝিতে পারেন তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই সমস্ত দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিয়াছে।

পঞ্চম দৃশ্য :

এদিকে দেবদত্ত গৃহে ফিরিয়া বলে, 'বলি ঘরে কিছু আছে কি?' দেবদত্ত রাজ্যের যত ভিক্ষুকের জন্য দুয়ার খুলিয়া রাখে, কিন্তু তাহার নিজের জন্য কিছুই থাকে না। এমন সময় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ত্রিবেদী আসিয়া রাজ-পৌরোহিত্য-পদ লাভের জন্য তাহাকে ভৎর্সনা করে।

অন্তঃপুরের পুষ্পোদ্যানে বিক্রমদেব বেড়াইতেছিলেন, রাজমাতুল বৃদ্ধ অমাত্য আসিয়া তাঁহাকে রাজ্যের সংবাদ দিয়া বলেন যে, সমস্ত রাজ্য

অরাজকতায় ভরিয়া গিয়াছে এবং তাহার মূলে আছে যুধাজিৎ, জয়সেন প্রমুখ বিদেশী আত্মীয়বর্গ। রাজা অমাত্যের কথায় বিশ্বাস করেন না। অমাত্য চলিয়া যাইবার পর ক্ষণকাল পরেই সুমিত্রা রাজার নিকট আসেন। রাজা তাঁহার প্রতীক্ষায় ছিলেন! কিন্তু সুমিত্রা নিজেকে ধিক্কার দিয়া রাজাকে বলিলেন যে, তাঁহাকে ভালোবাসিতে গিয়া রাজা রাজকার্যে অবহেলা করিতেছেন, তাহাতে প্রজাদের কাতর ক্রন্দনে সারা দেশ ভরিয়া গিয়াছে। তিনি বলেন, যাহারা দেশের এই অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে রাজাকে যুদ্ধ করিতে হইবে। দেবদত্তও আসিয়া উপস্থিত হয়। বিক্রমদেব তাঁহাকে আশা করেন নাই। দেবদত্ত বলে যে, সে আসিয়াছে রানীমার কাছে কিছু ভিক্ষার জন্য, কারণ, তাহার গৃহে অন্ন নাই। তাহার কথা শুনিয়া রাজা বুঝিতে পারেন যে, সত্যই হয়তো রাজ্যে অশান্তি দেখা দিয়াছে।

সপ্তম দৃশ্য :

তাই তিনি মন্ত্রীকে ডাকিয়া আদেশ দেন, যেন 'বিদেশী দস্যুদের' রাজ্য হইতে বিতাড়িত করা হয়। মন্ত্রী বলেন, ধৈর্য চাই। রাজা যদি নিজে শাসন-ভার গ্রহণ করেন তবেই এই অমঙ্গল দূর হইতে পারে। অকস্মাৎ দেবদত্তসহ রানী সুমিত্রা তাঁহাদের মাঝে আসিয়া দাঁড়ান। প্রজাদের আর্তনাদ শুনিয়া তিনি আর গৃহে থাকিতে পারিতেছেন না। শেষে স্থির হয়, বিদেশী নায়কদের এক সভায় আহ্বান করা হইবে এবং ত্রিবেদী ঠাকুরকে দূতরূপে পাঠানো হইবে।

অষ্টম দৃশ্য :

ত্রিবেদীর কুটিরে গিয়া মন্ত্রী ত্রিবেদীকে সেই কথা বলেন।

প্রথম অঙ্কের ঘটনা-সংস্থানের তাৎপর্য :

প্রথমতঃ, এই অঙ্কের সুরুতেই অর্থাৎ প্রথম দৃশ্যেই বুঝিতে পারা যায় যে, রাজার অন্তরে প্রেমের আকাঙ্ক্ষা দুর্বার স্রোতের মতই বহমান। তিনি রমণীর জীবন-রহস্য জানিবার জন্য ব্যাকুল; কিন্তু রমণীর বাসস্তিকারূপই

তিনি একমাত্র সত্য বলিয়া মনে করেন। বস্তুতঃ, তিনি এই জন্যই একান্তভাবে রানী সুমিত্রার প্রতি আকৃষ্ট, তাঁহার নিকট ধরা দিয়া তাঁহাকে একান্তভাবে পাইতে চাহেন এবং পাইতে গিয়া রাজসভা ছাড়িয়া রাজ অন্তঃপুরে আশ্রয় লইয়াছেন। এইভাবে রাজ্যে অরাজকতা দেখা দিয়াছে, কারণ, রাজার রাজকার্যের প্রতি অবহেলার সুযোগ লইয়া বিদেশী আত্মীয়রা প্রজাদের উৎপীড়ন সুরু করিয়া দিয়াছে।

রাজা সুমিত্রার প্রেমে আত্মবিভোর বটে, কিন্তু রানী সুমিত্রা তদ্রূপ নন। তিনি একদিকে যেমন রাজার প্রেয়সী, অন্যদিকে তেমনি রানী ও প্রজাদের জননী। এই অঙ্কেই তাঁহার চরিত্রের দুইটি রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। এবং এই দুই সত্তার মধ্যে দ্বিতীয় সত্তাটি শেষ পর্যন্ত জয়ী হইয়াছে। তাই তিনি প্রজাদের কাতর ক্রন্দন শুনিয়া রাজাকে তাঁহার কর্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেন।

বস্তুতঃ, এই অঙ্কেই মূল নাটকের সমস্যার বা দ্বন্দ্বের আভাস পাই। এবং সেই সংঘাত, সমস্যা বা দ্বন্দ্ব রাজা ও রানীর মধ্যে। নাট্যকৌশলের দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায়, এই অঙ্কটি সমস্ত নাটকের ভূমিকা রচনা করিয়াছে এবং নাটকীয় ঘটনাপ্রবাহ ও সংঘাতকে নিপুণতার সহিত পরবর্তী অঙ্কে অনিবার্যভাবেই পৌঁছাইয়া দিয়াছে।

দ্বিতীয় অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য :

সিংহগড়ে জয়সেনের প্রাসাদে জয়সেন, মিহিরগুপ্ত এবং ত্রিবেদীর কথপোকথন চলিতেছে। ত্রিবেদী দূতরূপে জয়সেনের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। ত্রিবেদীর কথা শুনিয়া তাহারা সন্দেহ করিল, রাজা বিক্রমদেব যে তাহাদের ডাকিয়াছেন, ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে। জয়সেন আভাস পাইল যে, রাজা সচেতন হইয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্যে যুধাজিৎ, উদয়ভাস্কর প্রভৃতিকে ডাকিয়া পাঠাইবার জন্য মিহিরগুপ্তকে বলিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য :

এদিকে অন্তঃপুরে রাজা বিক্রমদেব রানীর সভাসদের মুখে খবর পাইলেন যে, মহোৎসবে যোগ দিবার জন্য যুধাজিৎ প্রমুখ দলবল সহ আসিতেছে। সভাসদের কণ্ঠে স্তাবকতা শুনিয়া বিক্রমদেব বিরক্ত হন। সভাসদ চলিয়া

যাইবার পরেই সুমিত্রা আসিতেই বিক্রমদেব করুণ নয়নে তাঁহার প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "তুমি আমার দিকে ফিরে তাকাও। ঘৃণার দর্পে দূরে চলে যেও না।" সুমিত্রা বলিলেন, "তোমার প্রেম আমার একার জন্য নয়।"

ইতিমধ্যে দেবদত্ত আসিল। সে আসিয়া জানাইল যে, রাজ্যের নায়কগণ রাজনিমন্ত্রণ অবহেলা করিয়া বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। শুনিয়া সুমিত্রা চমকিয়া উঠিলেন। সুমিত্রা রাজাকে যুদ্ধে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলেন, শেষে ক্ষুব্ধ হৃদয়ে অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়া যান। বিক্রমদেব হতাশ হন সুমিত্রার ব্যবহারে। দেবদত্ত তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করেন যে, আগুন লাগিয়াছে, সুতরাং সুখনিদ্রায় নিদ্রিত থাকিলে চলিবে না। তবু বিক্রমদেব নীরব থাকেন, সেই সুখনিদ্রার আশ্রয় লইতে চাহেন। শেষে কোন উপায় না দেখিয়া দেবদত্ত রাজাকে ধিক্কার দেন। রাজাও রানীর সন্ধানে বাহির হইয়া যান।

তৃতীয় দৃশ্য :

রজনীর অন্ধকারে সুমিত্রা প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন পুরুষের বেশ ধারণ করিয়া। তারপর মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেবীর রণে প্রণাম নিবেদন করিলেন। এমন সময় কয়েকজন নরনারী বাহিরে আসিল। সুমিত্রা তাহাদের সহিত কথা বলিয়া বুঝিলেন যে, প্রজারাও বিশ্বাস করিয়াছে যে, রানীর জন্যই রাজ্যে অকল্যাণ দেখা দিয়াছে। তাহা শুনিয়া রানী সুমিত্রা তৎক্ষণাৎ (কাশ্মীরে) যাইবার জন্য মন্দির হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। ত্রিবেদী লুকাইয়া সমস্ত দৃশ্য দেখিয়া রাজাকে খবর দিতে ছুটিল।

চতুর্থ দৃশ্য :

সুমিত্রার পলায়ন-সংবাদে বিক্রমদেব উন্মাদ-প্রায় হইলেন। মন্ত্রী ও দেবদত্তকে ডাকিয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্য বলিলেন। ত্রিবেদী আসিলে সুমিত্রার কথা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন। সুমিত্রার প্রতি তাঁহার অন্তর অভিমানে ভরিয়া গিয়াছে। রাজা রানীকে যে সত্যই ভালোবাসেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এমন সময় মন্ত্রী আসিয়া জানাইল যে, সুমিত্রার

খবর সংগ্রহের জন্য লোক পাঠানো হইয়াছে। রাজা বলিলেন, তাহার প্রয়োজন নাই—"আমি নিজেই বিদ্রোহ দমনের জন্য যুদ্ধে যাইব।" এতদিনে রাজার স্বপ্ন ভাঙিল।

দ্বিতীয় অঙ্কের ঘটনা-সংস্থানের তাৎপর্য ঃ

প্লট বা ঘটনা-সংস্থানের কৌশল অনুযায়ী দ্বিতীয় অঙ্কটিকে Rising Action বলা হয়। তাহার মূল তাৎপর্য হইল—এই অঙ্কে নাটকীয় ঘটনা অঙ্কুর হইতে বিকাশের পথে অগ্রসর হয়। পূর্ববর্তী অঙ্কে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়, তাহাই এই অঙ্কে জটিলাকার ধারণ করে। তদনুযায়ী বিচার করিলে দেখিতে পাই, রাজার সহিত রানীর যে সংঘাত বা দ্বন্দ্ব সুরু হইয়াছিল, এই নাটকে তাহার অব্যবহিত ফল-স্বরূপ সুমিত্রা রাজ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন কাশ্মীরে। আমরা বারবার বলিয়াছি, বাহিরের দিক হইতে যাহাই হউক না কেন, রাজা ও রানী নাটকের সমস্যা ও সংঘাত উভয়কে লইয়া। জালন্ধর রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টি করিয়াছে জয়সেন প্রমুখ বিদেশী নায়কবৃন্দ। সারা রাজ্যব্যাপী প্রজাদের বুকফাটা আর্তনাদ রাজ-অন্তঃপুরেও প্রবেশ করিয়াছে, এবং রাজা-রানীর নিভৃত আশ্রয়কে গভীরভাবে আলোড়িত করিয়াছে। তাহা হইলে বাহ্যতঃ দেখিতে পাইতেছি, বাহিরের ঝড় বা বাহিরের ঘটনা হইতেই রাজা-রানীর জীবনে দুর্বিপাক ঘনাইয়া আসিয়াছে। রাজ্যব্যাপী বিদেশী নায়কদের অত্যাচার এবং তজ্জনিত প্রজাবৃন্দের হাহাকার বাহিরের দিক হইতে সক্রিয় বাস্তব ঘটনা। নাটকের ভিত্তিভূমি ইহাই, সন্দেহ নাই। কিন্তু, আরো গভীরে দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাইব, বাহ্যতঃ যাহাকে নাটকের ভিত্তিভূমি বলিয়া মনে হয়, আসলে তাহা রাজা-রানীর অন্তঃপুর হইতেই সৃষ্ট, বরং বলা চলে, সমস্ত সংঘাত রাজ-অন্তঃপুর হইতে উৎসারিত হইয়া সারা রাজ্যে ছড়াইয়া পড়িয়া বুমেরাং-এর মতো তাহা পুনরায় অন্তঃপুরেই প্রবেশ করিয়াছে এবং রাজা-রানীর নিশ্চিন্ত নিভৃত সুখনিদ্রাকে আঘাত করিয়াছে।

গ্রীক ট্রাজেডীতে দেখি, নায়কের চরিত্র এক অদৃশ্য দৈবশক্তির ক্রীড়নক; তাহা যেন ঐ শক্তির দুর্বার টানে অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য গতিতে মৃত্যুর দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। শেক্সপীয়রের ট্রাজেডীতে দেখিলাম,

দৈবশক্তি নহে, চরিত্রের দুর্বলতাই নায়কের মৃত্যু ডাকিয়া আনিয়াছে। ওথেলোর মধ্যে দেখি, যথার্থ কল্পনা ও বুদ্ধিমত্তার অভাবের ফলেই সে ডেস্‌ডিমোনার মৃত্যু ঘটাইয়া নিজের মৃত্যু নিজের হাতেই ঘটাইল। ইয়াগোর নিকট হইতে যখন সে রুমালটি পাইল, তখন তাহার কি কর্তব্য ছিল? সে যে jealous বা হিংসার বশবর্তী হইয়াই স্ত্রীকে সন্দেহ করিতে সুরু করিয়াছে, তাহা নহে; আর, সেকথা সে নিজেই মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে স্বগতোক্তির মধ্যে বলিয়াছে (Of one not easily jealous, but, being wrought, perplexed in the extreme;)। তাহার চরিত্রের এই গোপন ছিদ্রপথেই ট্রাজেডী ঘনাইয়া আসিয়াছে।

ওথেলোর মতো বিক্রমদেবের' জীবনেও অন্য এক বুদ্ধিহীনতার জন্য, যাহাকে অতিরিক্ত প্রেমাসক্তি বলা যায়, ট্রাজেডী ঘনাইয়া আসিয়াছে। বিক্রমদেব সুমিত্রাকে অন্তঃপুরে একান্তভাবে পাইতে গিয়াই বাহিরকে অর্থাৎ তাঁহার রাজ-কর্তব্যকে তুচ্ছ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, জীবনের সত্য খণ্ডিত রূপের মধ্যে নহে, অখণ্ড রূপের মধ্যে। মানুষ যখন খণ্ডিতরূপে জীবনকে দেখে, তখনই পাপ আসিয়া ভিড় করে। বিক্রমদেবের জীবনে তাহাই ঘটিয়াছে। সুমিত্রাকে একান্তভাবে পাইতে গিয়াই রাজকার্যে অবহেলা আসিল, এবং সেই অবহেলা-জনিত রাজ-দুর্বলতার সুযোগ লইয়াই জয়সেন প্রমুখ বিদেশী নায়কবৃন্দ রাজ্যে আগুন জ্বালিবার সুযোগ পাইয়াছে। পরে আবার এই আগুনের প্রদাহ রাজ-অন্তঃপুরকেও স্পর্শ করিয়াছে। তাই বলিতেছি, আপাতদৃষ্টিতে যাহাই হউক না কেন, আসলে রাজ-অন্তঃপুর হইতেই এই নাটকেব সমস্যার উৎপত্তি।

এই অঙ্কে দেখিলাম, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া রাজ্যের নিভৃত অন্তঃপুরের সুখনিদ্রা, সেই রানী সুমিত্রাই এই অঙ্কে অন্তঃপুর তথা রাজ্য ত্যাগ করিলেন। অর্থাৎ এই অঙ্কেই উভয়ের মধ্যে বিরোধের পথ সম্পূর্ণভাবে খুলিয়া গেল। অবশ্য, রাজ্য ত্যাগ করিবার পূর্বে সুমিত্রা রাজাকে নানাভাবে রাজকার্যে সচেতন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। রাজা সচেতন হইলেন না বলিয়াই রানী বাহিরে যাইতে বাধ্য হইলেন। নাটকীয় সংঘাতের মূল ঘটনা এই অঙ্কেই ঘটিয়াছে এবং ইহাই দ্বিতীয় অঙ্কের তাৎপর্য।

অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য :

কাশ্মীর-রাজপ্রাসাদের সম্মুখে রাজপথে বৃদ্ধ রাজভৃত্য শঙ্কর আপন মনে কুমার ও সুমিত্রার শৈশব-কাহিনী বলিয়া চলিয়াছে। এমন সময় একদল সৈনিক রাজপথে আসিয়া দাঁড়ায়। তাহারা যে যুবরাজ কুমারকে গভীরভাবে ভালোবাসে, তাহা তাহাদের কথাবার্তা হইতে বুঝা যায়। যুবরাজ এখন রাজ্যে অনুপস্থিত। তাহারা যুবরাজের বিবাহের দিন গণিতেছে। শঙ্করকে তাহারা যুবরাজের বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করে। তারপর তাহারা চলিয়া যায়।

তাহারা চলিয়া যাইবার পর পুরুষবেশী সুমিত্রা শঙ্করের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। সুমিত্রা শঙ্করকে বলে যে, সে জালন্ধর হইতে কুমারের কাছে সংবাদ লইয়া আসিয়াছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য :

ত্রিচূড়ের ক্রীড়া-কাননে রহিয়াছে কুমার সেন, ইলা ও তাহার সখীবৃন্দ। যুবরাজ কাশ্মীর হইতে তাহার বাগ্‌দত্তা প্রিয়তমা ইলার নিকট আসিয়া সুখে দিন যাপন করিতেছে। অনেকদিন হইয়া গিয়াছে, তাই কুমার এইবার বিদায় লইতে চায়। কিন্তু ইলা তাহাকে যাইতে দিতে রাজী নয়। আসন্ন বিদায়ের কথা স্মরণ করিয়া তাহার দুই চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া যায়।

এমন সময় পরিচারিকা আসিয়া খবর দেয়, কাশ্মীর হইতে দূত আসিয়াছে জালন্ধরের গোপন সংবাদ লইয়া। কুমারসেন বাধ্য হইয়া বিদায় লইলেন। ইলাও চোখের জলে তাহাকে বাধ্য হইয়া বিদায় দিল।

তৃতীয় দৃশ্য :

কাশ্মীরে যুবরাজের প্রাসাদে কুমার ও ছদ্মবেশী সুমিত্রা কথা বলিতেছে; অনেক কাল পরে তাহারা মিলিত হইয়াছে। সুমিত্রার নিকট হইতে কুমার জালন্ধরের সংবাদ পাইয়া বলিল, "কী উপায় আছে, দেখা যাক্।"

চতুর্থ দৃশ্য :

কাশ্মীর প্রাসাদের অন্তঃপুর। সেখানে কুমারের খুল্লতাত চন্দ্রসেন ও রেবতী কথা বলিতেছে। রেবতী চন্দ্রসেনকে বলেন, যে, যেভাবেই হউক,

কুমারকে সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে। চন্দ্রসেন কিন্তু সেই প্রকৃতির নহে। রেবতী বলে, "কুমারকে যুদ্ধে পাঠাও।" এই মুহূর্তেই কুমার আসিয়া চন্দ্রসেনের নিকট যুদ্ধে যাইবার অনুমতি চায়। চন্দ্রসেন অনুমতি দিলে কুমার যুদ্ধে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

পঞ্চম দৃশ্য :

যুদ্ধে যাইবার আগে ত্রিচূড়ের ক্রীড়াকাননে কুমারসেন প্রিয়তমা ইলার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে। ইলা তাহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। বিবাহের আর দেরী নাই ; তাই সখাদের সহিত সে তাহারই আয়োজনে মগ্ন ছিল। এমন মুহূর্তে তাহাকে জানাইল, যে, সে যুদ্ধে যাইতেছে। ইলার সমস্ত হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। যাইবার আগে কুমার ইলাকে বলিল, যে, সে শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে। ইলা যেন তাহাকে মনে রাখে। তাবপর যুবরাজ কুমাব চলিয়া যায়। ইলা তাহার সখীদের ডাকিয়া সমস্ত দীপমালা ভাঙিয়া দিতে বলে। তাহার মনে হয়, হয়ত তাহাব জীবনের সমস্ত সুখ চিরকালের মতো হাবাইয়া গেল।

তৃতীয় অঙ্কের ঘটনা-সংস্থানের তাৎপর্য :

ঘটনা-সংস্থানের দিক হইতে নাটকের তৃতীয় অঙ্কটিই দর্শক বা পাঠকের কাছে সর্বাপেক্ষা বেশী আকর্ষণীয়। এই অঙ্কেই সাধারণতঃ নাটকের climax বা চরম বিকাশ ঘটে। নাটকীয় ঘটনার সংঘাতের মূলে থাকে দুইটি বিরুদ্ধ শক্তি ; তাহাদের সংঘাত যখন সর্বোচ্চ শীর্ষে উঠিয়া যায়, অর্থাৎ দুই বিরুদ্ধ শক্তি যখন পরস্পরের মুখোমুখি হয়, তখনই সমস্ত ঘটনাপুঞ্জ গগনচুম্বী অভ্রংলিহ হিমাচলের মতো মাথা উন্নতশিরে চোখের সামনে প্রতিভাত হয়। ইহাকেই বলে climax এবং ইহার মধ্যে এক গভীর suspence বা সংশয় সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ জয়-পরাজয়ের চিত্রটি ঠিকমতো বুঝিতে না পারিয়া পাঠক বা দর্শক বিহ্বল হইয়া পড়ে। Climax-এর ইহাই প্রধান তাৎপর্য।

এই দিক হইতে বিচাব কবিলে দেখিব যে, এই অঙ্কের মূল ঘটনা কুমারের যুদ্ধযাত্রা—এবং সেই যুদ্ধযাত্রা এই নাটকের নায়ক রাজার বিরুদ্ধে। এখন ভাবিয়া দেখিলে বলিতে হয় কুমারের এই যুদ্ধযাত্রা আসলে রানী

সুমিত্রারই যুদ্ধযাত্রা এবং বিক্রমদেবের বিরুদ্ধে। পূর্ববর্তী অঙ্কে দেখিয়াছি, রাজাও যুদ্ধযাত্রায় নামিয়াছেন। ঠিক বটে তাহার লক্ষ্য বিদেশী নায়কদের পরাজিত করা, কিন্তু দেখিব বিক্রমদেবের যুদ্ধের লক্ষ্য শেষে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। এদিকে কুমার তথা সুমিত্রা যে যুদ্ধযাত্রা করিলেন, প্রকারান্তরে তাহা রাজারই বিরুদ্ধে, কারণ, যাহা রাজার করণীয়, তাহাই রানী সম্পাদন করিতে অগ্রসর হইলেন। তাহা একদিক হইতে রাজার অক্ষমতা এবং রাজার অক্ষমতার জন্যই কি সুমিত্রাকে কুমারের অর্থাৎ কাশ্মীরের সাহায্য লইতে হয় নাই? তাছাড়া, শেষে দেখিব দুইরাজ্য পরস্পরের শত্রু হইয়াছে। কুমার অবশ্য জালন্ধরের মঙ্গলের জন্যই যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন কিন্তু পরবর্তী অঙ্কে দেখিব, তাহার ফল হইয়াছে বিপরীত। সুতরাং, এই অঙ্কের শেষে যখন দেখি কুমার যুদ্ধযাত্রায় বাহির হইলেন, তখন বুঝিতে পারা যায়—নাটকের গতি অনিবার্য দুর্বার গতিতে পরিণতির অভিমুখে চলিয়াছে। কিন্তু কোন্ পক্ষ যে জয়ী বা পরাজিত হইবে—তাহা এই অঙ্ক হইতে বুঝিবার উপায় নাই। তাই এক গভীর সংশয়ে পাঠক বা দর্শকের মন ভরিয়া উঠে, যাহা নাটকের climax-এর পরম লক্ষ্য। তৃতীয় অঙ্কটি এই দিক হইতে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

সর্বোপরি, আমাদের মনে হয়—এই অঙ্কেই আবার এই নাটকের ট্রাজেডীর ইঙ্গিত রহিয়াছে।

রবীন্দ্র-নাটকের সর্বত্রই দেখি, পাপীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে যে পাপী নহে; যে নিষ্পাপ—সেই আত্মাহুতির মধ্য দিয়া পাপীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাপীকে পাপমুক্ত করিয়াছে। এই নাটকেও দেখিব যে, বিক্রমদেবের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন রানী সুমিত্রা। শুধু সুমিত্রা নহে, সুমিত্রার জন্যই কুমারকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে, এবং শেষ পর্যন্ত বিক্রমদেবের রোষবহ্নিতে তাহাকে দগ্ধ হইতে হইয়াছে। এইভাবে দুটি নিষ্পাপ প্রাণের বিনিময়ে বিক্রমদেবের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সুসম্পন্ন হইয়াছে। কুমারের মৃত্যুকে কেন্দ্র করিয়াই অবশ্য সুমিত্রার মৃত্যু ঘটিয়াছে। আসল ট্রাজেডী এই যে, বিক্রমদেব যখন সুমিত্রা ও কুমারের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, সেই মুহূর্তেই সুমিত্রা কুমারের ছিন্নমুণ্ড লইয়া উপস্থিত হইলেন। ট্রাজেডীর বিস্ময়-রস দেখা দিল তাহার পরেই, সুমিত্রার মৃত্যুকে কেন্দ্র

করিয়া। তথাপি, কুমারের মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া মাত্র একজনকেই স্পর্শ করিয়াছে—সে হতভাগিনী ইলা। কিন্তু সুমিত্রার মৃত্যুই সমস্ত নাটকের ভিত্তিভূমি নাড়াইয়া দিয়াছে। অর্থাৎ সুমিত্রার মৃত্যুই এই নাটকের ট্রাজেডির মূলে এবং তাহা রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত।

এই অঙ্কে ঐ পরিণতির অঙ্কুর দেখা যায়। এইদিক হইতেও তৃতীয় অঙ্কের গভীর তাৎপর্য রহিয়াছে।]

চতুর্থ অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য :

জালন্ধরের রণক্ষেত্র-শিবিরে রাজা বিক্রমদেব সেনাপতির সঙ্গে কথা বলিতেছেন। যুদ্ধে রাজার জয় হইয়াছে—শিলাদিত্য, উদয় ভাস্করকে বন্দী করা হইয়াছে। জয়সেন পলাতক। রাজা তাহাকে ধরিবার জন্য পুনর্বার যুদ্ধযাত্রা করিতেছেন এমন সময় চর আসিয়া খবর দিল যে, শত্রুপক্ষ আসিতেছে বটে, তবে তাহাদের কোন বাদ্য বা জয়ধ্বজা নাই। বিক্রমদেব অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন সময় এক সৈনিক আসিয়া খবর দিল যে, মহারানী (সুমিত্রা) জয়সেনকে বন্দী করিয়া বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন; শিবিরে আসিবার অনুমতি চাহেন। এই সংবাদে বিক্রমদেব স্তম্ভিত হইলেন। সেনাপতিকে আদেশ দিলেন, সুমিত্রার শিবিকার প্রবেশ নিষেধ।

দ্বিতীয় দৃশ্য :

দেবদত্তের কুটির; দেবদত্ত তাহার স্ত্রী নারায়ণীর নিকটে বিদায় লইতেছে, তাহাকে রাজার সহিত যুদ্ধে যাইতে হইবে। দেবদত্ত বলিল, রাজা এইবার যুদ্ধ করিতে যাইতেছেন মহারানীর ভ্রাতা কুমারের সঙ্গে। দেবদত্ত কোনদিন তাহার স্ত্রীকে ছাড়িয়া বাহিরে যায় নাই, তাই যাইবার আগে বলিল, হে ভগবান, এদের সকলের উপর তোমার দৃষ্টি রাখিও।

তৃতীয় দৃশ্য :

জালন্ধরের একপ্রান্তে কুমারসেনের শিবির। সেই শিবিরেই সুমিত্রা কুমারের কথা বলিতেছেন। সুমিত্রা বলিলেন যে, আর যুদ্ধ করিয়া কাজ

নাই—সে যেন রাজাকে ক্ষমা করে। কিন্তু কুমার তাহাতে রাজী হইল না। রাজা বিক্রমদেব তাহাকে অপমান করিয়াছে, তাহা সে কিছুতেই ক্ষমা করিবে না। সুমিত্রা কিন্তু চাহেন সব ছাড়িয়া কাশ্মীরে ফিরিয়া যাইতে, মনে পড়িয়া যায় শৈশবের নানা স্মৃতি! এমন সময় শংকর আসিয়া জানায় যে, রাজা তাহাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে, কুমারকে বলিয়াছে 'বালক' 'ভীরু'। রানীই শংকরকে সন্ধির জন্য পাঠাইয়াছিলেন। সুমিত্রা শংকরকে অপমান ভুলিবার জন্য বলেন। শেষে কুমারও শংকরকে আদেশ দিল—এখনি কাশ্মীরে সকল সৈন্যদের ফিরিয়া যাইতে হইবে।

চতুর্থ দৃশ্য ঃ

কুমার কাশ্মীরের পথে ফিরিয়া গিয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়া বিক্রমদেব যুধাজিৎকে বলিলেন যে, তাহাকে আক্রমণ করা আর উচিত নয়। যুধাজিৎ, জয়সেন ইতিমধ্যে বিক্রমদেবের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহার দলে ভিড়িয়াছে। তাহারা রাজাকে বার বার কুমারের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে। রাজা শেষ পর্যন্ত তাহাদের পরামর্শই স্বীকার করেন। ঠিক এমন সময় প্রহরী আসিয়া জানায় যে দেবদত্ত আসিয়াছে। রাজা তাহাকে আসিতে বলেন, কিন্তু জয়সেনের ষড়যন্ত্রে তাহাকে রাজার অগোচরেই বন্দী করিয়া রাখা হয়।

চতুর্থ অঙ্কের ঘটনা-সংস্থানের তাৎপর্য ঃ

যাহাকে Falling Action বলে, এই অঙ্কটি তাহাই, অর্থাৎ এই অঙ্কেই climax-এর পর ঘটনাপ্রবাহ পরিণতির পথে চলিয়াছে।

এই অঙ্কের ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করিলে দেখি, নাটকের পরিণতির সুস্পষ্ট একটা আভাস রহিয়াছে। বিক্রমদেব যেমন শত্রুদের পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তেমনি কুমারসেনও জয়সেনকে বন্দী করিয়া আনিয়া বিজয়ীর বেশে রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইতে চাহিয়াছেন। বিক্রমদেব যাহাকে বন্দী করিতে পারিলেন না, সেই জয়সেনকে কুমার বন্দী করিয়াছে—এই ঘটনা রাজার আত্মাভিমানে প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াছে। কারণ, এই ঘটনায় প্রমাণিত হইল—কুমারই তুলনামূলকভাবে বেশী ক্ষমতাবান। এবং,

এই ঘটনা হইতে পাঠক বা দর্শক স্বভাবতঃই অনুমান করেন যে, কুমারেরই জয় সুনিশ্চিত। কিন্তু অকস্মাৎ ঘটনাপ্রবাহের দিক-পরিবর্তন ঘটিল। সুমিত্রা রাজাকে ক্ষমা করিতে বলিলেন এবং সেইজন্যই কুমারকে কাশ্মীরের পথে ফিরিতে হইল। কুমারের এই স্বেচ্ছাকৃত প্রত্যাবর্তনকে বিক্রমদেব দুর্বলতা ভাবিলেন। যে জয়সেন যুধাজিৎ ছিল তাঁহার শত্রু, তাহারা মিত্ররূপে রাজাকে কুপরামর্শ দিল। কিন্তু রাজা তাহাদের উদ্দেশ্য না বুঝিয়া কুমারের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। এখানেও ওথেলোর মতো বিক্রমদেবের বুদ্ধিমত্তার অভাব দেখা গেল এবং তাঁহার নির্বুদ্ধিতার জন্যই চিরতরে প্রিয়তমা পত্নীকে হারাইতে হইল। যে ভুল ওথেলোর হইয়াছিল, সেই একই ভুলের বশবর্তী হইয়াই বিক্রমদেব সুমিত্রার মৃত্যুর পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।

বস্তুতঃ, কুমার যেন ইচ্ছাকৃতভাবেই নিজের মৃত্যু ডাকিয়া আনিলেন। যে পথে ফিরিয়া গেলেন, সেই পথেই মৃত্যু তাহার পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া তাহার পিছু লইল। নাটকের পরিণতি যে বিয়োগান্ত হইবে, তাহা এই ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা যায়। ইহাই চতুর্থ অঙ্কের তাৎপর্য।

পঞ্চম অঙ্ক ঃ প্রথম দৃশ্য ঃ

কাশ্মীর প্রাসাদে রেবতী ও চন্দ্রসেন। বিক্রমদেব কাশ্মীর আক্রমণ করিতে আসিতেছেন, এ সংবাদ তাহাদের নিকট পৌঁছিয়াছে। রেবতী তাহার জন্য চিন্তিত নয়, কিন্তু চন্দ্রসেন বিক্রমদেবের আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে চায়। কঞ্চুকী আসিয়া খবর দেয় যুবরাজ আসিয়াছেন। রেবতী অন্তরাল হইতে তাহাদের কথা শুনিতে থাকে। সুমিত্রা ও কুমারকে দেখিয়া চন্দ্রসেন বলে, রাজা বিক্রমদেব শত্রু নহেন, সুতরাং তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই, বরং তাঁহাকে অভ্যর্থনা করা উচিত, কারণ তিনি রাজ্যের জামাতা। কুমার বলে, আমাকে সৈন্যভার দাও। হঠাৎ রেবতী অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া কুমারকে ধিক্কারে জর্জরিত করিয়া বলে, যে, সে কাপুরুষ, সে পলাতক। সুমিত্রাও রেবতীকে তাহার ঘৃণ্য ব্যবহারের জন্য ধিক্কার দেন। কুমার চন্দ্রসেনের অভিমতের অপেক্ষা করিয়া যখন কোন উত্তর পাইল না, তখন সে সুমিত্রাকে লইয়া পুনরায় অনিশ্চিতের পথে বাহির হইয়া গেল।

দ্বিতীয় দৃশ্য :

কাশ্মীরের ঘাটে লোক সমাগম হইয়াছে। লোকেরা বলাবলি করিতেছে যে, শীঘ্রই কাশ্মীর জয় করিবার জন্য জালন্ধরের সৈন্য আসিতেছে, তাহারা রাজ্যের সমস্ত সম্পদ লুট করিয়া লইবে। ইতিমধ্যে আর-একদল লোক আসিয়া খবর দেয়, বুড়ো চন্দ্রসেন যুবরাজ কুমারকে জালন্ধরের রাজার নিকট ধরিয়ে দিতে উদ্যত। হঠাৎ দূরে কোলাহল শোনা গেল। তাহারা সকলে মিলিয়া সেইদিকে গান গাহিতে গাহিতে ছুটিয়া যায়।

তৃতীয় দৃশ্য :

কোন উপায় না দেখিয়া কুমার শেষ পর্যন্ত ইলার পিতা ত্রিচূড়ের রাজা অমরুরাজের কাছে গেল, বিশেষভাবে ইলার সহিত দেখা করিবার প্রত্যাশায়। কিন্তু অমরুরাজ শুধু যে তাহাকে ভর্ৎসনাই করিল তাহা নহে, ইলার সহিত দেখা পর্যন্ত করিতে দিল না। এদিকে শঙ্কর আসিয়া জানায়—শত্রুচর তাহার সন্ধান পাইয়াছে। কুমারকে ফিরিতে হইল। সুমিত্রা তাহার জন্য বনপ্রান্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন, কুমার সেইস্থানে যাইতে উদ্যত হইল। এইভাবে হতভাগ্য কুমার শেষ পর্যন্ত সর্বস্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া বনের আশ্রয় লইল।

চতুর্থ দৃশ্য :

বহুদিন কাটিয়া গিয়াছে, কুমারকে ইলা দেখে নাই। ত্রিচূড়ের অন্তঃপুরে সে তাহারই প্রতীক্ষায় দিন কাটায়। কিন্তু হতভাগিনী ইলা জানিতেও পারে নাই, যাহার জন্য সে প্রতীক্ষা করিতেছিল, সে দ্বার হইতে ফিরিয়া গিয়াছে।

পঞ্চম দৃশ্য :

কাশ্মীরের শিবিরে বিক্রমদেবকে জয়সেন ও যুধাজিৎ বলে, কুমারকে তাহারা ধরিবেই। বিক্রমদেব তাহারই সন্ধানে ফিরিতেছেন। তাহাকে না ধরিতে পারিলে তাঁহার সুখ নাই, নিদ্রা নাই। যুধাজিৎ তাঁহাকে জানায় যে, কুমারকে ধরিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে। প্রহরী আসিয়া বলে, চন্দ্রসেন ও রেবতী তাঁহার নিকট আসিয়াছে। অন্য সকলে প্রস্থান করিলে রেবতী ও চন্দ্রসেন প্রবেশ করে। রেবতী বলে, বিক্রমদেব যেন

কুমারকে ক্ষমা না করেন। প্রজারা তাহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে। রেবতী তাঁহাকে রাজপ্রাসাদে যাইবার জন্য অনুরোধ করে। তারপর তাহারা চলিয়া যায়। বিক্রমদেব কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন। তাহাদের প্রতি তীব্র ঘৃণায় তাঁহার অন্তর ভরিয়া যায়। এমন সময় চর আসিয়া খবর দেয়, কুমার ত্রিচূড় অভিমুখে গিয়াছে। বিক্রমদেব একাকী মৃগয়ার দলে সেখানে যাইতে উদ্যত হন।

ষষ্ঠ দৃশ্য ঃ

সুমিত্রা সহ কুমারের দিন কাটিতেছে পর্ণ শয্যায়, গভীর অরণ্যে। এক কাঠুরিয়া আসিয়া বলে, জয়সেন রাতে নন্দীগ্রাম জ্বালাইয়া দিয়াছে। তাহা শুনিয়া কুমারের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া যায়। এক মধুজীবী আসিয়া তাহাকে পুনরায় খবর দেয়, তাহাকে ধরিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে—জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় তাহাকে ধরিতে পারিলে যে কেহ পুরস্কার পাইবে।• সে তাহাদের জন্য মধু রাখিয়া যায়। তারপর এক শিকারী আসিয়া জানায় যে, জয়সেন তাহার গৃহ জ্বালাইয়া দিয়াছে। সে যুবরাজ কুমারকে সিংহাসনে দেখিবার আশায় ব্যাকুল। কুমার তাহাকে আলিঙ্গন করে। শিকারী চলিয়া যায়। হঠাৎ হৃদয়ের দুই তীর প্লাবিত করিয়া কুমারের মনে পড়িয়া যায় ইলার কথা।

সপ্তম দৃশ্য ঃ

বিক্রমদেব ত্রিচূড়ে আসিতেই অমরুরাজ তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানায় পরম সমাদরে। উপরন্তু কন্যা ইলাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য প্রস্তুত। ইলার সৌন্দর্য দেখিয়া বিক্রমদেব বিস্মিত। অকস্মাৎ ইলা নতজানু হইয়া তাঁহাকে জানায় যে, তিনি যেন তাহাকে গ্রহণ না করেন কারণ তাহার সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া আসন পাতিয়া বসিয়া আছে কুমার। ইলার প্রেমের নিষ্ঠা ও গভীর অনুরাগের পরিচয় পাইয়া বিক্রমদেবের স্বপ্নভঙ্গ হয়, মনে পড়িয়া যায় সুমিত্রার কথা, মনে পড়িয়া যায় এক হারানো দিনের অসংখ্য স্মৃতি। বিক্রমদেব ইলাকে প্রতিশ্রুতি দেন—অচিরেই কুমারকে তাহার হস্তে সঁপিয়া দিবেন। প্রহরী আসিয়া বলে, এক ব্রাহ্মণ তাঁহার সহিত দেখা করিতে চায়। আসিল দেবদত্ত। বিক্রমদেব জানিতেন না যে দেবদত্তকে

বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল। দুই বন্ধু বহুদিন পরে মিলিত হইলেন। বিক্রমদেবের মনে হয়—হয়ত এইবার সমস্ত বিপদের কালো মেঘ কাটিয়া যাইতেছে।

অষ্টম দৃশ্য :

অরণ্যেই সুমিত্রা ও কুমারের দিন কাটিতেছে। অনুচরেরা আসিয়া খবর দেয়, শত্রুরা তাঁহাদের সন্ধান পাইয়াছে। কুমার সুমিত্রাকে জানায়—শংকর ধরা পড়িয়াছে। চর আসিয়া আবার খবর দেয়, জয়সেন গতরাত্রে গৃহকূট জ্বালাইয়া দিয়াছে। ইহাতে কুমার বিচলিত হয়। তাহার জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছে। মৃত্যুই তাহার কাছে শ্রেয় বলিয়া মনে হয়। অবশেষে কুমার জীবন বিসর্জন দিতে সংকল্প করে। চির-বিদায়ের আগে বারেকের জন্য কুমারের মনে জাগিয়া উঠে ইলার স্মৃতি।

নবম দৃশ্য :

কাশ্মীরের রাজসভায় বিক্রমদেব কুমারের প্রতীক্ষা করিতেছেন। তিনি খবর পাইয়াছেন, কুমার ধরা দিবার জন্য আসিতেছে। প্রহরী আসিয়া খবর দেয়—শিবিকার দ্বার রুদ্ধ করিয়া যুবরাজ আসিতেছে। দেবদত্ত আসিয়া উপস্থিত হয় এই সময়ে; কুমারের আগমনবার্তা শুনিয়া সে চলিয়া আসিয়াছে। বিক্রমদেব গভীর আগ্রহে তাহার অপেক্ষা করিতে থাকেন। শংকরও আসিয়া উপস্থিত হয়। সকলেই তাহার আগমনের প্রতীক্ষা করিতে থাকে অধীর আগ্রহে। বাহিরে হুলুধ্বনি শোনা যায়। সভামধ্যে শিবিকা প্রবেশ করে। বিক্রমদেব অগ্রসর হইয়া বলেন, বন্ধু—এসো! অকস্মাৎ স্বর্ণথালায় কুমারের ছিন্নমুণ্ড হস্তে সুমিত্রা শিবিকা হইতে বাহির হইয়া আসেন। এক মুহূর্তে সমস্ত বাদ্য থামিয়া যায়। সুমিত্রা রাজাকে বলেন, "তুমি রাত্রিদিন যার সন্ধান করে ফিরেছ, সে নিজের হাতে তার ছিন্নমুণ্ড উপহার দিয়ে গেছে!" বলিতে বলিতে সুমিত্রাও প্রাণত্যাগ করিলেন। ইলা ছুটিয়া আসিল—কুমারের ছিন্নমুণ্ড দেখিয়া মূর্ছিত হইল। শংকর জানাইল অন্তিম প্রণাম। আর, চন্দ্রসেন আত্মধিকারে মস্তক হইতে রাজমুকুট ফেলিয়া দিলেন। রেবতী প্রবেশ করিল, কিন্তু চন্দ্রসেন তাহাকে রাক্ষসী বলিয়া তাড়াইয়া দিল।

আর বিক্রমদেব? আত্মগ্লানির তুষানলে তাঁহার অন্তর জ্বলিতে থাকিল—সুমিত্রার চরণে নতজানু হইলেন। যবনিকা নামিয়া আসিল।

পঞ্চম অঙ্কের ঘটনা-সংস্থানের তাৎপর্য ঃ

সর্বশেষে নাটকের Catastrophe বা সমাপ্তি। এই নাটকের পঞ্চম অঙ্কে ঘটনাপ্রবাহের সমাপ্তি ঘটিয়াছে। পরিণতিতে দুইটি মৃত্যু দেখিতে পাই—কুমার ও সুমিত্রার। তাহা পূর্বপরতা সূত্রে অনিবার্যভাবেই ঘটিয়াছে।

পূর্ববর্তী অঙ্কেই অবশ্য এই পরিণতির একটি মৃদু আভাস পাওয়া গিয়াছিল। মৃত্যু না হউক, কুমারের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছিল। এই অঙ্কে তাহার সম্ভাবনা ঘনীভূত হইয়াছে এবং পরাজয়ের চিত্রটি রূপায়িত হইয়াছে। কুমার একে একে সকল আশ্রয় হারাইয়াছে। রেবতীর ও চন্দ্রসেনের চক্রান্তে যেমন সে স্বীয় অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, তেমনি ত্রিচূড়ের অমরুরাজও তাহাকে ইলার সহিত দেখা করিতে না দিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। তাহার শেষ আশ্রয়স্থল ছিল ইলা—কিন্তু তাহার সহিত দেখা পর্যন্ত হইল না। এমনি করিয়া যখন সকল দুয়ার বন্ধ হইল, তখন সে আশ্রয় পাইল অরণ্যে। এই অরণ্যেই সে প্রতিদিন নিরীহ প্রজাদের উপর অত্যাচারের সংবাদ পাইয়া জীবন সম্পর্কে সমস্ত আশা ছাড়িয়া দিয়া আত্মবিসর্জনের সংকল্প লইল। জীবন তাহার কাছে দুর্বিসহ হইয়া উঠিয়াছিল, তাই সে মৃত্যু বরণ করিল।

তথাপি, নবম দৃশ্যে আমরা তাহাকে বিক্রমদেবের মতই আশা করিতে-ছিলাম; তখনো পাঠকের বা দর্শকের কাছেও তাহার আত্মবিসর্জন প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে নাই। তাহার পরিবর্তে সুমিত্রা আসিয়া আবির্ভূত হইলেন। কিন্তু সুমিত্রাকে হারাইতে হইল। এইভাবে নাটকের শেষে দুইটি মৃত্যুর মধ্য দিয়া পরিণতি বিয়োগান্ত রূপ লইল—বিক্রমদেব যাঁহাকে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার সম্মুখেই সেই রানী সুমিত্রা চিরকালের জন্য চলিয়া গেলেন।

বস্তুতঃ, রাজা ও রানী নাটকের সূচনায় তাঁহাদের মধ্যে যে সংঘাত দেখিয়াছিলাম, তাহা বিভিন্ন অঙ্কের ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়া পঞ্চম অঙ্কে পরিণতি লাভ করিল।

নাটকের প্লটের অর্থ ঘটনা-বিন্যাসের কৌশল। যে-কোন ঘটনার সূচনা, বিকাশ ও পরিণতি থাকে। প্লট রচনা করিতে গিয়া এই তিনটি বিষয়ে নাট্যকারকে দৃষ্টি দিতে হয়। সর্বোপরি লক্ষ্য রাখিতে হয়—সমস্ত ঘটনা-প্রবাহের মধ্যে যেন সংহতি, ভাবসাদৃশ্য এবং সঙ্গতি বজায় থাকে। ইহাদের সার্থক সন্নিবেশ ঘটিলেই নাটক সার্থক শিল্পে পরিণত হয়।

রাজা ও রানী নাটকের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ইহার প্লট-রচনা সার্থক হইয়াছে। কোথাও কোথাও যে দৃশ্য-বিন্যাসের ত্রুটি নাই, এমন নয়—কিন্তু সমস্ত ঘটনাপ্রবাহ নাটকের ঘটনাসংস্থানের সূত্রানুসারে সহজ-সাবলীল গতিতে অনিবার্যভাবেই অগ্রসর হইয়াছে। বিক্রমদেব ও সুমিত্রার জীবন-বৃত্তান্ত নানা জটিলতা ও সংঘাতের মধ্য দিয়া সূচনা হইতে বিকাশে, বিকাশ হইতে পরিণতি লাভ করিয়াছে। এই পরিণতির দিকে চাহিয়া বলিতে হয়, রাজা ও রানী সার্থক রোমান্টিক ট্র্যাজেডি। হয়ত বিক্রমদেবের মৃত্যু ঘটিলে শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডির সহিত এই নাটকের সৌসাদৃশ্য আরো ঘনীভূত হইত। কিন্তু আমাদের মনে হয়, তাহার ব্যতিক্রম ঘটাইয়া রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন স্বকীয়তা দেখাইয়াছেন বা আপন উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছেন, তেমনি এক অর্থে ট্র্যাজেডির রস নিবিড়তর হইয়া উঠিয়াছে। বিক্রমদেবের সম্মুখেই সুমিত্রা প্রাণত্যাগ করিলেন, যে সুমিত্রা ছিল তাঁহার প্রাণের আলো এবং এই মৃত্যুর স্মৃতি বহন করিয়াই বিক্রমদেবকে বাঁচিয়া থাকিতে হইল। ইহা কি মৃত্যুর চেয়েও গভীরতর শাস্তি নহে, ইহা কি ট্র্যাজেডির রসকে নিবিড়তর করে নাই ?

'রাজা ও রানী' নাটক সম্বন্ধে কয়েকটি আলোচনা :

[১] "রবীন্দ্রনাথের আদর্শ রাজার মতো ঋতুরাজ বসন্ত সন্ন্যাসী ; বাহিরে তাহার ঐশ্বর্য, অন্তরে তাহার বৈরাগ্য ; "অন্তরে তার বৈরাগী গায়" ; যে কেবল বাহিরের সম্পদে মুগ্ধ হইল সে কিছুই দেখিল না ; যে ভিতরের উদাসীকে দেখিল, সে-ই দেখিল। কিন্তু বসন্তের এই ভাবটি রবীন্দ্রনাথের মনে ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। যে-বয়সে তিনি রাজা ও রানী লিখিতেছিলেন তখন বসন্তের ভিতর-বাহিরের দ্বন্দ্ব তাঁহার কাছে স্পষ্টভাবে ধরা দেয় নাই, অর্ধগোচরভাবে অবশ্যই ছিল।

বিক্রমদেব ও সুমিত্রার সম্বন্ধের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব আছে, বিক্রমদেবের প্রচণ্ড আসক্তিই সুমিত্রাকে পাইবার পক্ষে বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তার কারণ, বিক্রমদেব বসন্তের বাহিরটাকে কেবল দেখিয়াছেন, সেখানে ঐশ্বর্য এবং ভোগরাত, অন্তরে যেখানে বৈরাগ্য ও আসক্তিহীনতা সেখানে তাঁহার দৃষ্টি পড়ে নাই; তিনি প্রেমের বিলাসকেই দেখিয়াছেন, প্রেমের আত্ম-বিসর্জনপরতাকে দেখেন নাই; কাজেই তিনি প্রেমে তৃপ্তি পান নাই, সুমিত্রাকে পাইয়াও পান নাই, বিক্রমদেবের প্রচণ্ড আসক্তিই ঢেউ তুলিয়া আকাঙ্ক্ষিত পদ্মটিকে দূরে ঠেলিয়া দিয়াছে। এই নাটকে বসন্তের ভাবটি কবির কাছে অর্ধগোচর; সচেতনভাবে প্রত্যক্ষ নয়।

রাজা ও রানীর রূপান্তর তপতী সুপরিণত বয়সে লেখা, তখন কবির মনে ঋতুর ভাবের ক্রমবিকাশ স্পষ্ট রূপ ধরিয়াছে, কাজেই রাজা ও রানীর চেয়ে তপতীতে বসন্তের আইডিয়াটি পরিণততর; সত্য কথা বলিতে কী, তপতীর কাহিনী আইডিয়াটির উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

কবি লিখিয়াছেন:

সুমিত্রা ও বিক্রমের সম্বন্ধের মধ্যে একটি বিরোধ আছে, সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই বিরোধের সমাধা হয়। বিক্রমের যে প্রচণ্ড আসক্তি পূর্ণভাবে সুমিত্রাকে গ্রহণ করার অন্তরায় ছিল, সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই শান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্য উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হল, এইটিই রাজা ও রানীর মূল কথা।"

[রবীন্দ্র-নাট্য-প্রবাহ, ১ম খণ্ড: শ্রীপ্রমথনাথ বিশী]

[২] "রাজা ও রানী রচনার সময় রবীন্দ্রনাথ মানসীর ভাবচক্রের মধ্যে ছিলেন। তখন প্রেমের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রধানত তাঁহার ভাব ও চিন্তা কেন্দ্রীভূত। সেই ভাব ও চিন্তা মানসীর অনেক কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে। মায়ার খেলা গীতিনাট্যে এবং রাজা ও রানী নাটকে সেই ভাব-চিন্তাই প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রেমকে সংকীর্ণ ভোগের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া নিজের লালসা-পরিতৃপ্তির উপায়স্বরূপ মনে করিলে প্রেমের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না। সে-প্রেম হয় জ্বালাময়, অতৃপ্তিকর ও নানা অনিষ্টের মূল। প্রেম নিরবচ্ছিন্ন দেহভোগের মধ্যে নাই; প্রেমপাত্রীকে একান্তভাবে কামনা করিলে

তাহা মেলে না ; প্রেম এক অপার্থিব বস্তু, 'আত্মার চিরন্তন সম্পত্তি—এই প্রেম দেহ-মিলনের মধ্য দিয়া, প্রবল আসঙ্গ-লিপ্সা চরিতার্থতার দ্বারা লাভ করা যায় না।—

ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব,
কেহ নহে তোমার আমার।
অতি সযতনে,
অতি সংগোপনে,
সুখে দুঃখে, নিশীথে, দিবসে,
বিপদে সম্পদে
জীবনে মরণে,
শত ঋতু-আবর্তনে,
বিশ্ব জগতের তরে, ঈশ্বরের তরে
শতদল উঠিতেছে ফুটি,
সুতীক্ষ্ণ বাসনা-ছুরি দিয়ে
তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে ?

এই প্রেম দেহাতীত এক অলৌকিক আনন্দরস, এবং এইরূপে উপলব্ধির মধ্যেই ইহার সার্থকতা।—

লও তার মধুর সৌরভ
দেখো তার সৌন্দর্যবিকাশ,
মধু তার করো তুমি পান,
ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী,
চেয়ো না তাহারে।
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।

এই প্রেম আত্মার জ্যোতি, অনন্তের অংশ, দেহের মধ্যে ইহাকে পাওয়া যাইবে না—"হৃদয়ের ধন কভু ধরা দেয় দেহে ?" প্রকৃতপক্ষে এই ভাবধর্মী, শান্ত, সংযত, দেহাতীত, বিশুদ্ধ-আনন্দরস-সম্ভোগমূলক প্রেমই রবীন্দ্রনাথের প্রেম। মানসীর যুগে এই প্রেমই নানা অনবদ্য লিরিক-এ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

একান্ত ভোগসর্বস্ব প্রেম নানা বিকৃতিতে রূপান্তরিত হয়। রাজার প্রেম

বাধাপ্রাপ্ত হইয়া দারুণ প্রতিহিংসায় পরিণত হইয়াছে, প্রেমের পরিণাম এক নিষ্ঠুর বীভৎসতায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং তাহাই রাজার জীবনে এক মর্মান্তিক ট্রাজেডি টানিয়া আনিয়াছে। ইহা আমরা নাটকের মধ্যে দেখিয়াছি।"

[রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা : শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য]

[৩] "As you Like It নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে Stopford Brooke এক জায়গায় লিখিয়াছেন—"In this paly love lives in many forms". এই কথাটি 'রাজা ও রানী' সম্বন্ধেও বিশেষভাবে প্রযোজ্য। সুমিত্রার প্রতি বিক্রমের প্রেমে যে উন্মাদনা, যে সংযমহীন আবেগের প্রাধান্য দেখা যায়, যে অন্ধ ভালোবাসা তাঁহাকে রাজধর্ম, রাজকর্তব্য বিসর্জন দিয়া হিতাহিতজ্ঞানশূন্যের ন্যায় ক্রমাগত প্রেমিকার পানেই আকৃষ্ট করিয়া চালয়াছে তাহারই বিপরীত অথচ বিশুদ্ধ পবিত্র এবং স্বর্গীয় প্রেমের বন্ধন দেখিতে পাই কুমার ও ইলার মধ্যে। এ প্রেমে উন্মাদনা নাই,—ইঁহাদের চরিত্রের সংযম প্রত্যেকেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। জীবনের চরম পরীক্ষার সময়েও ইঁহারা কখনও কর্তব্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলেন নাই—তাই ইঁহারা সকলেরই প্রিয়, সকলেরই ভালোবাসার পাত্র।

বিক্রমের প্রতি তাঁহার বাল্যসখা দেবদত্তের যে আন্তরিক ভালোবাসা তাহাও আমাদের অন্তর স্পর্শ না করিয়া পারে না। ইহার ভিতর কোনো স্বার্থের সম্বন্ধ নাই—ইহা বিশুদ্ধ বান্ধবপ্রীতি। সুমিত্রা ও কুমারের মধ্যে যে সুন্দর ভালোবাসার সম্বন্ধ দেখিতে পাই তাহার তুলনা পাওয়া যায় না। পাছে সুমিত্রা ব্যথিতা হন তাই কাপুরুষতার অপবাদ লইয়াও তিনি বিক্রমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করিয়াই কাশ্মীরে ফিরিয়া আসিলেন। বৃদ্ধ ভৃত্য শংকর ইহাতে বিরক্ত হওয়াতে কুমার তাহাকেও বুঝাইয়া শান্ত করিলেন। আবার শেষদিকে যখন মনে হইল যে আত্মগোপন করিয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যুও বরণীয়, তখন সেই পথই বাছিয়া লইলেন। সুমিত্রাও তাহাতে বাধা দিলেন না—আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়া জীবনধারণ করা অপেক্ষা মৃত্যুও ভাল—সুতরাং প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ভাইকে তিনি তাহার সংকল্প হইতে বিচ্যুত করিবার চেষ্টা করিলেন না। কুমার ও সুমিত্রার এই ভালোবাসার সম্বন্ধ যেন স্বর্গীয় সুষমায় মণ্ডিত।

আবার কুমার ও সুমিত্রার প্রতি বৃদ্ধ ভৃত্য শংকরের যে স্বার্থলেশহীন স্নেহের পরিচয় পাই তাহা যেন As You Like It নাটকের Oslando-র প্রতি Adam-এর অনুরক্তির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

আর সবার উপর লক্ষ্য করিবার বিষয় বিক্রমের প্রতি রানী সুমিত্রার গভীর ভালোবাসা। স্বামীর গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এবং তাঁহার রাজধর্ম জাগাইয়া তুলিবার জন্য যে নারী নিজের সমস্ত স্বার্থ এভাবে বিসর্জন দিতে পারেন তাঁহার প্রেমের মহানুভবতা তো ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। এ প্রেম সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাম এবং নিষ্কলুষ, অপার্থিব এবং স্বর্গীয়।"

[রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা : শ্রীঅশোক সেন]

[৪] "রাজা ও রানী রবীন্দ্রনাথের প্রথম পূর্ণায়ব পঞ্চাঙ্ক নাটক। এখানে নাটকের কয়েকটি আবশ্যক উপাদান দেখা যায়—দৃঢ়চরিত্র, সংকল্পে কঠোর নর ও নারী ও উহাদের মধ্যে প্রণয়ের অতৃপ্তি ও আদর্শের পার্থক্য লইয়া নিদারুণ সংঘাত। নাটকের পটভূমিকায় সামন্ততান্ত্রিক রাজ্যশাসনপ্রণালী, রাজার যথেচ্ছাচার ও প্রজার দুঃখে নির্মম উপেক্ষা, রাজনৈতিক কূটনীতি ও ষড়যন্ত্র ও কতকগুলি পার্শ্বচরিত্রের সমাবেশ। বিক্রম ও সুমিত্রার আদর্শ-সংঘাত ক্ষুব্ধ ও একদিকে হিংস্র জিঘাংসায় ও অন্যদিকে অনমনীয় বিমুখতায় রূপান্তরিত প্রেমের বিপরীত-রূপে কুমার ও ইলার সমপ্রাণতা-মধুর কিন্তু অদৃষ্টবিড়ম্বিত প্রেম এবং নরেশ ও বিপাশার বাইরের বাগ্-বিতণ্ডার অন্তরালে পারস্পরিক আকর্ষণ দেখান হইয়াছে। কিন্তু যে বৈপরীত্য নাটকের প্রাণ হইতে পারিত তাহা কেবল বহিরঙ্গমূলক সংযোজনায় পর্যবসিত হইয়াছে; ইহা পরিকল্পনাতেই সীমাবদ্ধ, নাটকীয় তাৎপর্যমণ্ডিত হইয়া উঠে নাই। আসল কথা, বিক্রমের কোন প্রতিনায়ক নাই; তাহার দুর্জয় অভিমান সুমিত্রার আত্মবিসর্জনে নির্বাপিত হইয়াছে, কিন্তু অন্য কাহারও প্রভাবে ইহার কোন হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে নাই। বিক্রমের অতিরঞ্জিত আত্মরতিকে নাটকীয় স্বাভাবিকতা দিতে গেলে উহার বিপরীতধর্মী কোন চরিত্রসৃষ্টি করার প্রয়োজন ছিল। এইখানেই নাটকীয় সংঘাত খানিকটা কৃত্রিম ও মাত্রাহীন হইয়া পড়িয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই সত্য অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার পরবর্তী পরিবর্তিত সংস্করণ তপতী হইতে কুমার ও ইলার অংশ বাদ দিয়াছেন এবং অতিরিক্ত ভাববিলাসকে সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও নাটকীয় ভারসাম্য রক্ষিত

হয় নাই। আসল কথা, বিক্রমের ন্যায় দুর্ধর্ষ চরিত্রের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী নাটকীয় রসসিদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যক; সুমিত্রার নীরব প্রতিরোধ ও নৈতিক আত্মবলিতে নাটকের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। তপতীতে সুমিত্রার দিব্য-রূপটিকে প্রাধান্য দেওয়াতে এই পরিণতির সহিত নাটকের পূর্ববর্তী ঘটনা-বিন্যাসের সংযোগ অনেকটা শিথিল হইয়াছে। 'রাজা ও রানী' আতিশয্য-বিড়ম্বিত নাটক; তপতী অদ্বৈতভাবের বাহনরূপে অনেকটা রূপক-লক্ষণান্বিত।"

[বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা: শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।]

[৫] "The most notable thing in King and Queen is what has been an outstanding feature of his work, its greater success in delineating women than men. Ila is a very lovely figure, though paling out into shadow at the close, and never free from nebulosity, a nymph seen through the fountain spray of sorrow. Her beauty, her loyalty and gentleness, there are seen. Her filmy envanishment is part of the play's scattered finish in a mixture of melodrama and fine tragedy, of carelessness and subtle art, as disordered a close as ever a good poet gave. A second female figure has drawn Rabindranath's still deeper sympathies, those sympathies which go out to women's loveliness, their great sufferings and passion. Queen Sumitra, so rarely seen yet so pervading, flashes through the tale, a queen from her noble putting by of a love which is merely selfish play and her swift riding from it, to her death. Ibsen's influence has been considerable on the younger school of Bengali Writers; I cannot say if Rabindranath, in these earlier days, had read A Doll's Huose, but the resemblance between Nora and Sumitra is striking, and (I should guess) not accidental. His pre-occupation with the question of marriage, so marked in Manasi, here shows on a wider field.

The husband, by being lover only, has lost the wife's respect; and the callous brutality with which he indicates his manhood, when she has fled, only loses her completely.

King and Queen should have been Rabindranath's greatest drama, for the theme has rich possibilities."

[Rabindranath Tagore: Poet and Dramatist. Edward Thompson.]

[৬] "নাটকখানি প্রধানত পদ্যে রচিত। গদ্যাংশ অল্পই, এবং তাহা নাট্যঘটনাবর্তে বিশ্রাম দেওয়ার উদ্দেশ্যেই।

হৃদয়ের ধনকে দেহে আঁকড়িয়া ধরিবার বাসনা, সমগ্র মানবকে পাইতে চাহিবার দুঃসাহস রাজা ও রানীর ট্রাজেডি। মানসীর 'নিষ্ফল কামনা' কবিতায় নাটকটির বীজ নিহিত। নায়ক বিক্রমদেবের অবুঝ প্রেমাবেগ আত্মপর নিপীড়নের কারণ। সুমিত্রার প্রেম শান্ত, সংযত, কর্তব্যপরায়ণ। বিক্রমের সর্বগ্রাসিতায় সে প্রেম পথ পাইতেছে না। রাজকর্তব্যের অবহেলা সুমিত্রার প্রেমের প্রকাশকে রুদ্ধ ও কুণ্ঠিত করিয়াছে।

ছি ছি মহারাজ
এ কি ভালোবাসা? এ যে মেঘের মতন
রেখেছে আচ্ছন্ন ক'রে মধ্যাহ্ন আকাশে
উজ্জ্বল প্রতাপ তব।......
আমারে দিও না লাজ;
আমারে বেস না ভালো রাজশ্রীর চেয়ে।

বিক্রম ভুল বুঝিল। সে ভাবিল,

ঐশ্বর্য আমার
বাহিরে বিস্তৃত শুধু তোমার নিকটে
ক্ষুধার্ত কঙ্কালসার কাঙাল বাসনা।
তাই কি ঘৃণার দর্পে চলে যাও দূরে
মহারানী রাজরাজেশ্বরী?

সহধর্মিনী রূপে স্বামীর কর্তব্যে ত্রুটি শুধরাইবার ভার নিজের হাতে লইয়া

সুমিত্রা ভবিতব্যতার জট পাকাইয়াছিল। নিজেকে দূরে না রাখিলে বিক্রমের দৃষ্টিঘোর কাটিবে না মনে করিয়া রানী পিতৃগৃহের উদ্দেশ্যে চলিল। বিক্রমের ঘোর ছুটিল, কিন্তু প্রতিক্রিয়া হইল গুরুতর। প্রেমের নিরুদ্ধ আবেগ হিংসার তাণ্ডবে বিচ্ছুরিত হইল।

> এ প্রবল হিংসা ভাল, ক্ষুদ্র প্রেম চেয়ে।
> প্রলয় তো বিধাতার চরম আনন্দ।
> হিংসা এই হৃদয়ের বন্ধন-মুক্তির
> সুখ।

কুমারসেন-সুমিত্রাকে ভস্ম করিয়া তবেই এই দাবানল নির্বাপিত হইয়াছিল।

কুমারসেন ইলার প্রেম সম্পর্কে বিক্রম-সুমিত্রার ঠিক বিপরীত। কুমারসেনের প্রেম সুমিত্রার প্রেমের মতই স্থির কর্তব্যনিষ্ঠ। আর ইলার প্রেম বিক্রমের প্রেমের মতই মত্ত অধীর। কুমারসেন-ইলার আখ্যায়িকা প্রধান নাট্যকাহিনীকে খুব ব্যাহত করে নাই। বরং বৈপরীত্যের বৈচিত্র্য দিয়াছে। তবে এই আখ্যায়িকার বহর কম হইলে ভালো হইত। কুমারসেন-সুমিত্রার সৌহার্দ্য বৌঠাকুরানীর হাটের উদয়াদিত্য-বিভার সৌহার্দ্যের স্মারক। দেবদত্ত মধ্যস্থ ভূমিকা। সে যেন রাজারই শুভবুদ্ধি। সংস্কৃত-নাটকের বিদূষক চরিত্রের এ এক বিচিত্র পরিণতি। রেবতী-চরিত্রে লেডি ম্যাকবেথের ছায়া আছে এবং স্বাভাবিকতার হানি নাই।

উপসংহার কিছু চমকপ্রদ হইলেও রাজা ও রানীর নাট্যরস অসামান্য। নাট্যকাহিনীর পরিকল্পনা ও পরিণতি সুসঙ্গত। ভূমিকাগুলি সুপরিস্ফুট। রাজা ও রানী বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম যথার্থ নাটক।"

[বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খণ্ড): রবীন্দ্রনাথ। সুকুমার সেন]

'রাজা রানী' এবং 'তপতী'

'রাজা ও রানী' ১২৯৬ সালে লিখিত এবং 'তপতী' রচিত হয় ১৩৩৬ সালে, মধ্যে চল্লিশ বছরের ব্যবধান। 'রাজা ও রানী' নাটকেরই রূপান্তর 'তপতী'। অবশ্য, শুধু এই নাটকই নহে, অন্যান্য নাটকেরও রূপান্তর রহিয়াছে। যেমন, 'রাজা' হইতে 'অরূপরতন', 'অচলায়তন' হইতে 'গুরু', 'প্রায়শ্চিত্ত', হইতে 'পরিত্রাণ' ইত্যাদি। সুতরাং 'রাজা ও রানী' নাটকের

ক্ষেত্রেই যে শুধু রূপান্তর ঘটিয়াছে, তাহা বলা যায় না। অর্থাৎ এবিষয়ে এই রূপান্তরের মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য নাই।

কেহ কেহ মনে করেন, কোন ঘটনার একটিমাত্রই 'নাট্যরূপ' থাকিতে পারে, একাধিক নহে। সুতরাং যখন কোন ঘটনা অবলম্বন করিয়া কোন নাটক রচিত হয়, তখন আর রূপান্তরের প্রশ্ন উঠে না। নাটক যেন সম্পূর্ণ রূপ লইয়াই আত্মপ্রকাশ করে।

অথচ রবীন্দ্রনাথের নাটকের রূপান্তর রহিয়াছে। একই নাটককে তিনি নানাভাবে বদলাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এইরূপ হইল কেন? প্রশ্ন হইতে পারে, তিনি কি নাট্যশিল্প সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না? তাহার উত্তর যাহাই হউক, বাস্তবে দেখিতেছি, মূল নাটকের পাশাপাশি রূপান্তরিত নাটকগুলির প্রতিই যেন কবির অধিকতর অনুরাগ। কবি তাঁহার স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গী হইতে প্রথমে লিখিত নাটকের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কিছু ত্রুটি দেখিয়াছেন, যাহা সংশোধন করিবার জন্যই পরবর্তীকালে রূপান্তরে হাত দিয়াছেন। কবি যে কারণেই রূপান্তর ঘটাইয়া থাকুন না কেন, এই ধরনের মূল ও রূপান্তরিত নাটকের তুলনামূলক আলোচনায় দেখিতে হইবে, এবং তাহাই প্রধান বিচার্য বিষয়—নাট্যশিল্পের বিচারে কোন্ রূপটি শিল্পোত্তীর্ণ।

নাটক মূলতঃ বস্তুধর্মী (objective) শিল্প এবং তাহাও আবার ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের উপর নির্ভরশীল। ঘটনা বস্তুগত ব্যাপার, এবং বিভিন্ন ঘটনার সংঘাতের মধ্য দিয়াই নাটকের গতি সৃষ্টি হয়। নাটকের মধ্যে কবিতার মতো বর্ণনার সুযোগ নাই। যেভাবেই দেখা যাক্ না কেন, নাট্যবিচারের প্রধান লক্ষ্য হইল—নাট্যধর্ম, এবং দেখিতে হইবে কোন নাটকে এই নাট্যধর্ম বজায় আছে কিনা। যখন বলা হয় Drama is action, তখন প্রকারান্তরে ইহাই বলা হয় যে, সব কিছুই ঘটিতেছে। নাটকের মধ্যে আমরা যাহা কিছু দেখি, তাহা ঘটিতে দেখি এবং তাহার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যেমন নাটকীয় গতি সঞ্চার করে, তেমনি পাঠক বা দর্শকের মনেও নাট্যরসের প্রতিফলন ঘটে। সুরু হইতে শেষ পর্যন্ত, অনিবার্যভাবে নানা দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের আবর্তে সমস্ত ঘটনা ঘটিতে থাকে, তখন পাঠক বা দর্শক এক বিচিত্র জগৎকে প্রত্যক্ষ করে। সুতরাং, ঘটনা যখন নিছক বর্ণনা বা

বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া উপস্থিত হয় তখন সেখানে নাটকীয়তা ব্যাহত হয় অর্থাৎ নাট্যশিল্পের হানি ঘটে। কোন নাটক-বিচারের সময় প্রধানতঃ এই ঘটনা-সমাবেশের প্রতিই দৃষ্টি দেওয়া হয়।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে 'রাজা ও রানী' এবং 'তপতী'র আলোচনা করা যাইতে পারে। স্বভাবতঃই 'তপতী' মূল নাটক 'রাজা ও রানী' হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে এবং রূপান্তরজনিত পরিবর্তন সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এই পরিবর্তন দুই দিক হইতে—আঙ্গিক ও ভাবগত। অবশ্য, আঙ্গিকগত পরিবর্তনই প্রধান।

'তপতী'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :—

"রাজা ও রানী আমার অল্পবয়সের রচনা, সেই আমার প্রথম নাটক লেখার চেষ্টা।

সুমিত্রা এবং বিক্রমের সম্বন্ধের মধ্যে একটি বিরোধ আছে—সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই বিরোধের সমাধা হয়। বিক্রমের যে প্রচণ্ড আসক্তি পূর্ণভাবে সুমিত্রাকে গ্রহণ করবার অন্তরায় ছিল, সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই শান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্য উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হল, এইটিই রাজা ও রানীর মূল কথা।

রচনার দোষে এই ভাবটি পরিস্ফুট হয় নি। কুমার ও ইলার প্রেমের বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিকতার দ্বারা নাটককে বাধা দিয়েছে এবং নাটকের শেষ অংশে কুমার যে অসঙ্গত প্রাধান্য লাভ করেছে তাতে নাট্যের বিষয়টি হয়েছে ভারগ্রস্ত ও দ্বিধাবিভক্ত। এই নাটকের অন্তিমে কুমারের মৃত্যু দ্বারা চমৎকার উৎপাদনের চেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে—এই মৃত্যু আখ্যানধারার অনিবার্য পরিণাম নয়।

অনেকদিন ধরে রাজা ও রানীর ত্রুটি আমাকে পীড়া দিয়েছে। ...স্থির করেছি এ নাটক আগাগোড়া নতুন করে না লিখলে এর সদ্‌গতি হতে পারে না। লিখে এই বইটার সম্বন্ধে আমার সাধ্যমতো দায়িত্ব শেষ করেছি।"

কবি-লিখিত এই ভূমিকার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দুইটি নাটকের তুলনামূলক আলোচনার প্রথমেই চোখে পড়ে ভাষার দিকে। রাজা ও রানী মুখ্যতঃ পদ্যে রচিত, মাঝে মাঝে গদ্য সংলাপ আছে, পক্ষান্তরে তপতী আগাগোড়াই গদ্যে লিখিত।

রাজা ও রানী নাটক লিখিবার সময় কবির সামনে আদর্শ ছিল শেকসপিয়ারের রোমান্টিক ট্রাজেডি। পূর্ববর্তী আলোচনায় বলিয়াছি, রোমান্টিক ট্রাজেডি হিসাবে এই নাটক সার্থক। সেইজন্যই, সংলাপ পদ্যে রচিত হওয়ায়, নাটকটির স্বাভাবিকতা বজায় আছে। T. S. Eliot প্রসঙ্গান্তরে বলিয়াছেন যে, আবেগপ্রকাশের ভাষা পদ্য, কাব্যই তাহার উপযুক্ত বাহন। সেইদিক দিয়া বিচার করিলে দেখিব, রাজা ও রানী নাটকে রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রহিয়াছে। পক্ষান্তরে, তপতীর বিষয়বস্তু ঠিক থাকিলেও সংলাপ গদ্যে রচিত হইয়াছে, এবং ইহার ফলে নাটকটি যেন স্বধর্মচ্যুত হইয়াছে। তপতী-কে রোমান্টিক ট্রাজেডি হিসাবে না দেখিয়া রূপক নাটক হিসাবে দেখিলেই বোধহয় ভালো হয়। কিন্তু ভাষার এই পরিবর্তনের ফলে দেখিতেছি—তপতী যেন প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে দুইটি নাটক হইতেই বিক্রমদেবের একটি সংলাপ উদ্ধৃত করা গেল :

হায় নারী, কী কঠিন হৃদয় তোমার !
কোনো কাজ নাই প্রিয়ে, মিছে উপদ্রব।
ধান্যপূর্ণ বসুন্ধরা, প্রজা সুখে আছে,
রাজকার্য চলিছে অবাধে। এ কেবল
সামান্য কী বিঘ্ন নিয়ে, তুচ্ছ কথা তুলে
বিজ্ঞ বৃদ্ধ অমাত্যের অতি-সাবধান।

[রাজা ও রানী]

ইহারই পাশাপাশি

তুমি আমাকে চিনতে পারলে না—তোমার হৃদয় নেই নারী! শংকরের তাণ্ডবকে উপেক্ষা করতে পারো কি! সে তো অপ্সরার নৃত্য নয়। আমার প্রেম, এ প্রকাণ্ড, এ প্রচণ্ড, এতে আছে আমার শৌর্য—আমার রাজপ্রতাপের চেয়ে এ ছোটো নয়। তুমি যদি এর মহিমাকে স্বীকার করতে পারতে তাহলে সব সহজ হত। ধর্মশাস্ত্র পড়েছ তুমি, ধর্মভীরু—কর্মদাসের কাঁধের উপর কর্তব্যের বোঝা চাপানোকেই মহৎ ব'লে গণ্য করা তোমার গুরুর শিক্ষা। ভুলে যাও, তোমার ওই কানে মন্ত্রগুলো। যে আদিশক্তির বন্যার উপরে ফেনিয়ে চলেছে সৃষ্টির বুদবুদ,

সেই শক্তির বিপুল তরঙ্গ আমার প্রেমে—তাকে দেখো, তাকে প্রণাম করো, তার কাছে তোমার কর্ম অকর্ম দ্বিধাদ্বন্দ্ব সমস্ত ভাসিয়ে দাও, একেই বলে মুক্তি, একেই বলে প্রলয়, এতেই আনে জীবনে যুগান্তর। [তপতী]

একই চরিত্রের এই দুইটি সংলাপের দিকে লক্ষ্য রাখিলে। প্রথমেই অনুভব করা যায় যে, প্রথমটির ভাষা পদ্যে রচিত হইলেও তাহাতে জীবনের, আবেগের, প্রাণের স্পন্দন রহিয়াছে; বক্তার চরিত্রের গভীর আবেগপূর্ণ ও প্রেমিকসুলভ বৈশিষ্ট্য ফুটিয়াছে। কিন্তু গদ্যে রচিত সংলাপের মধ্যে প্রাণের কোন সাড়া নাই। মনে হয়, যেন কেহ একটি তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন। বিক্রমের চরিত্রের (উভয় নাটকেরই উপজীব্য) প্রধান বৈশিষ্ট্য উৎকট প্রেমাসক্তি। কিন্তু, তপতীর বিক্রমদেবের মধ্যে প্রেমিকের চিহ্নমাত্র নাই। বস্তুতঃ, তপতী নাটকটি একান্তভাবেই রূপকনাট্য পর্যায়ের; সেইজন্যই নাটকটির সুরু হইতেই মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ একটি তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে বসিয়াছেন সচেতনভাবে। Edward Thompson রাজা ও রানীর আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"In Rabindarnath's dramas the pressure of thought often strangles the action." এই মন্তব্য আসলে তপতী প্রসঙ্গে একান্তভাবে প্রযোজ্য।

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল, দৃশ্যবিন্যাস। তপতীর ভূমিকায় কবি বলিয়াছেন, "যে নাট্যাভিনয়ে আমার কোনো হাত থাকে, সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো-নামানোর ছেলেমানুষকে আমি প্রশ্রয় দিই নে। কারণ বাস্তবসত্যকেও এ বিদ্রূপ করে, ভাবসত্যকেও বাধা দেয়।" এই দৃষ্টিকোণ হইতে তপতী লিখিয়াছেন বলিয়াই, এই নাটকে পঞ্চমাঙ্ক নাটকের রীতিতে অঙ্ক বা দৃশ্য ভাগ করেন নাই। ভৈরব মন্দিরের প্রাঙ্গণ, কাশ্মীর ইত্যাদি সূচনায় লেখা আছে বটে, কিন্তু তাহাও দৃশ্যপট হিসাবে নহে। বাস্তবিক পক্ষে, এইভাবে তপতীকে তিনি রূপকনাট্যের আদর্শে রূপ দিতে চাহিয়াছেন।

এই দুইটি নাটকের শেষ দৃশ্যটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রাজা ও রানী নাটকের শেষ দুইটি মৃত্যু দেখানো হইয়াছে। একটি মৃত্যুর চিহ্ন রহিয়াছে কুমারের ছিন্নমুণ্ডের মধ্যে; অপরটি সুমিত্রার অকস্মাৎ মৃত্যু। প্রথম মৃত্যুর উপস্থাপন একটু বীভৎস হইয়াছে সন্দেহ নাই; উপরন্তু তাহা আবার রবীন্দ্র-আদর্শ বা রবীন্দ্র-নাটকের আদর্শের বিরোধী। তপতী-তে

কবি 'ত্রুটি' সংশোধন করিয়াছেন। এই নাটকে প্রত্যক্ষভাবে সুমিত্রার মৃত্যু দেখানো হয় নাই—চিতাগ্নির আভাসের মধ্যে তাহা সম্পন্ন করা হইয়াছে।

'রাজা ও রানী' নাটকে কয়েকটি গান রহিয়াছে বটে, কিন্তু তপতী-তে সেই গানগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং তাহার পরিবর্তে অনেকগুলি নূতন গান সংযোজিত হইয়াছে।

সর্বোপরি, কাহিনীর দিক হইতে দেখা যায়, ইলা ও কুমারসেনের আখ্যানভাগ তপতী-তে পরিত্যক্ত হইয়াছে। কুমারসেনের চরিত্রটি বজায় আছে বটে, কিন্তু তাহা একান্তভাবে গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। এবং ইলা ও কুমারের আখ্যানের মতো আর-একটি নূতন আখ্যানভাগ সংযোজিত হইয়াছে বিপাশা ও নরেশকে কেন্দ্র করিয়া। নরেশকে প্রতি-নায়কের রূপে দেখিতে পাই। রাজা ও রানী-তে কুমার বিক্রমদেবের প্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক ছিল বটে, কিন্তু কখনো তাহাকে বিক্রমের সম্মুখে উপস্থিত হইতে দেখি নাই, ইহাতে সংঘাতের ঘনত্ব হ্রাস পাইয়াছে। সেইদিক দিয়া নরেশকে যথার্থ প্রতি-নায়করূপে চিত্রিত করিবার প্রয়াস সার্থক হইয়াছে বলা যায়।

রাজা ও রানী-র রূপান্তর তপতী-র সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রূপান্তর হইতেছে চরিত্রগত। ঠিক বটে, মূল নাটকের চরিত্রগুলির প্রায় সবই এই নাটকে স্থান পাইয়াছে, কিন্তু মনে হয় তাহারা যেন ভিন্ন চরিত্র। মূল নাটকে দেবদত্তকে দেখিয়াছি হাস্য-পরিহাসভরা রাজার বাল্যসখারূপে, সর্বদাই সে রাজার সঙ্গে ছায়ার মতো ফিরিয়াছে। রাজাকে সে সত্যের পথে চালিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে বটে, কিন্তু কখনো প্রবল বিরোধীরূপে প্রতিভাত হয় নাই। কিন্তু তপতী-তে তাহাকে রাজার বিরোধীরূপে দেখিতে পাই। এমনকি এক সময় বিক্রমদেব বলিয়াছেন, "দেবদত্ত, পৌরোহিত্য তুমি রাজার কাছ থেকে পাও নি—ত্রিবেদী পুরোহিত।" অথচ রাজা ও রানী-তে ঠিক ইহার বিপরীত দেখি—নাটকটি সুরু হইয়াছে দেবদত্তের উপর রাজ-পৌরোহিত্যের দায়িত্বের প্রসঙ্গ লইয়া।

বিক্রমদেবের চরিত্রের মধ্যে যে প্রেমিক-হৃদয় ছিল, যে মানব-হৃদয়ের স্বাদ ছিল, তাহা তপতী-তে প্রায় নাই। তাহার পরিবর্তে রাজাকে দেখি প্রচণ্ড ও উন্মত্ত রূপে। তাহার মধ্যে যেন মানুষের প্রাণ নাই।

বিক্রমদেব, (বা অন্যান্য চরিত্রগুলিও বটে) টাইপ চরিত্রে পরিণত হইয়াছেন।

সুমিত্রার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই নূতন নামকরণ করা হইয়াছে 'তপতী'। রাজা ও রানী-তে সুমিত্রার তপতী-রূপ তেমন ভালভাবে ফুটিয়া উঠে নাই। তপতী-তে সুমিত্রার সর্বত্যাগী অগ্নিশুদ্ধ সূর্যকন্যার রূপটি সার্থকরূপে চিত্রিত হইয়াছে। সুমিত্রাও এই নাটকে টাইপ চরিত্রে পরিণত।

তবে একটি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। তপতী-তে তিনি প্রত্যক্ষভাবেই একটি তত্ত্বকে রূপ দিতে চাহিয়াছেন—"সংসারের জমি থেকে প্রেমকে উৎপাটিত করে আনলে সে আপনার রস আপনি জোগাতে পারে না, তার মধ্যে বিকৃতি ঘটতে থাকে" অথবা, "বিক্রমের যে প্রচণ্ড আসক্তি পূর্ণভাবে সুমিত্রাকে গ্রহণ করবার অন্তরায় ছিল, সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই শান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্য উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হল,…"। কবি বলিয়াছেন, "রচনার দোষে এই ভাবটি" রাজা ও রানী-তে "পরিস্ফুট হয় নি।" তপতী-তে এই ভাবটি নিঃসন্দেহে পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ তপতী-কে এক 'নতুন' নাটকে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। এই আলোচনা হইতে দেখা যাইবে, তপতী রাজা ও রানী-র প্রচ্ছায়ায় রচিত হইয়াও যথার্থই নূতন নাটক। রাজা ও রানীর-র রস তাহাতে নাই। ইহার স্বাদ ভিন্ন।

কিন্তু, নাট্যশিল্পের বিচারে দেখিতে পাই, হয়ত তপতী-তে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে। কিন্তু নাটকের একমাত্র উপজীব্য কি নাট্যকারের উদ্দেশ্য? রাজা ও রানী-তে প্রাণের যে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ও দুরন্তপ্রবাহ লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তাহা তপতী-তে কোথায়? ঠিক বটে, মূল নাটকের দৃশ্য-বিন্যাসে কোথাও কোথাও শৈথিল্য ঘটিয়াছে এবং তপতী-র দৃশ্যবন্ধগুলি সুসংহত। তথাপি, তপতী-তে কিসের যেন অভাব রহিয়াছে। শিল্পী মূর্তি রচনা করিতে বসিয়া যদি তাহাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে না পারেন, তবে তাহাকে সার্থক শিল্প বলিতে পারি না। তপতী-তেও সেই প্রাণের অভাব রহিয়াছে। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী বলিয়াছেন যে, রবীন্দ্র-নাটকের চরিত্রগুলি 'রক্তাল্পতা' দোষে দুষ্ট। তপতী-র চরিত্রগুলিও যেন রক্তমাংসের মানুষ

নহে। চরিত্রগুলির এই প্রাণহীনতার জন্যই তপতী নাটকটি প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে।

তাছাড়া, শুধু চরিত্র-চিত্রণের দিক দিয়াই নহে, নাট্যধর্মের দিক দিয়া তপতী-তে এক গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি রহিয়াছে। এই দুইটি নাটকের তুলনামূলক আলোচনার সূচনায় বলিয়াছিলাম—নাট্যধর্মের মূল ও প্রধান বৈশিষ্ট্য ঘটনা। ঘটনার আবর্তের মধ্য দিয়াই নাটকীয় দ্বন্দ্ব বা নাটকীয়তা সৃষ্টি হয়। উপরন্তু, চরিত্রগুলির বিরোধও ঘটনার মধ্য দিয়াই অভিব্যক্ত হয়। কাজেই, নাটকের এই প্রধান বৈশিষ্ট্য যদি কোন নাটকে না দেখা যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে নাট্যধর্ম ব্যাহত হইয়াছে। তপতী-তে সুমিত্রার গৃহত্যাগের প্রসঙ্গ ছাড়া প্রত্যক্ষভাবে কোন সংঘাতমুখর ঘটনা সংঘটিত বা চিত্রিত করা হয় নাই। এইজন্যই দেখা যায়, এই নাটকের দ্বন্দ্ব যতটা বাচিক অর্থাৎ সংলাপগত, সেই পরিমাণে ঘটনাগত নয়। তাহার ফলে, তপতী-তে নাট্যধর্ম বা নাটকীয়তা প্রায় নাই বলিলেই চলে।

বস্তুতঃ, নাট্যশিল্পের বিচারে বলিতে হয়, অনেক 'ত্রুটি' সত্ত্বেও রাজা ও রানী রসোত্তীর্ণ, সার্থক রোমান্টিক ট্রাজেডির দৃষ্টান্ত, কিন্তু 'ত্রুটি'হীন হইয়াও তপতী রসোত্তীর্ণ হয় নাই।

শব্দার্থ, টীকা ও ব্যাখ্যা :

প্রথম অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য :

ত্রিষ্টুভ, অনুষ্টুভ—বৈদিক ছন্দ বিশেষ।

শ্রুতিস্মৃতি—শ্রুতি শাস্ত্র। শ্রুতি—বেদ, শ্রুতিকে স্মরণ করে পরবর্তীকালে যে শাস্ত্র রচিত হয়, তাহাকে বলে স্মৃতি। শ্রুতিস্মৃতি ঢালিয়াছি বিস্মৃতির জলে—এখানে দেবদত্ত বলিতে চান যে, তাহার বিন্দুমাত্র শাস্ত্রজ্ঞান নাই। লক্ষণীয়, দেবদত্ত তাহার বাল্যসখা রাজা বিক্রমের সহিত ছদ্ম-গাম্ভীর্যের সুরে অর্থাৎ পরিহাসের সুরে কথা বলিতেছেন।

দেবতা তেত্রিশ কোটি—সাধারণ হিন্দুর পৌরাণিক বিশ্বাস।

অমর পাণিনি—অমরসিংহের অমরকোষ এবং পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী সিদ্ধান্ত কৌমুদী।

শুধু বুলি ছোটে·········দোঁহারে পীড়ন—এই দৃশ্যের দুই বন্ধুর সংলাপের মধ্যে তরল পরিহাস লক্ষণীয়। এখানে বিক্রমদেব ত্রিবেদী তথা ব্রাহ্মণের প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছেন। তিনি বলিতে চান, ব্রাহ্মণেরা যথার্থ শাস্ত্রজ্ঞ নহেন, তাঁহারা কেবল মন্ত্রগুলি মুখস্থ করেন এবং তাহা না বুঝিয়া উচ্চারণ করেন। রাজার কাছে ইহা অসহ্য। ইহা একদিকে যেমন তাঁহাকে পীড়া দেয়, অন্যদিকে তেমনি ব্যাকরণের প্রতিও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়, কারণ সেই উচ্চারণও সব সময় ব্যাকরণ-সম্মত বা শুদ্ধ হয় না।

কাল বলেছিলে তুমি·········বিশ্বাস রমণীরে—বিক্রমের এই উক্তির মধ্যে উভয়ের আলোচনার বিষয়বস্তুর পরিবর্তনের সূচনা দেখা গেল। বাস্তবিক পক্ষে, নাটকটির মূল উপজীব্য রমণীর প্রেমের স্বরূপ ও পরিণতি—এবং বিক্রমের মধ্য দিয়াই সুমিত্রার প্রেমের পরিণতি ঘটিয়াছে। কাজেই, ইহাকে Dramatic irony বলা যায়। তাছাড়া, এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, রাজা হইলেও নারীর প্রেমের প্রতি তাঁহার আসক্তি বেশী।

কোলে থাকিলেও ···· নাহি মানে'—দেবদত্তের উক্তি। ভর্তৃহরির 'নীতিশতকে' এইরূপ উপদেশ রহিয়াছে। "বিশ্বাসো নৈব নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রিষু রাজকুলেষু চ।" (হিতোপদেশঃ)

রমণীর হৃদয়ের···········কোথায় পাবে?—মনুসংহিতায় বলা হইয়াছে—"স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং দেবা ন জানন্তি, কুতো মনুষ্যাঃ।" বিক্রমদেব হয়ত তাহাই স্মরণ করিয়াছেন। তিনি বলিতে চান, তথাপি রমণীর প্রেমই পুরুষের জীবনের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্পদ। রমনীর প্রেমই পুরুষের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। এই উক্তির মধ্যে সুমিত্রার প্রতি রাজার প্রেমাসক্তির ইংগিত পাওয়া যায়।

শেষে তোমারি সংসর্গে·········নারীর মহিমা—দেবদত্ত তাহার বাল্যসখা' বিক্রমের উপযুক্ত বন্ধু বটে! সে সকল দেবতাকে ভুলিয়াছে, শুধু মনে রাখিয়াছে প্রেমের দেবতা অনঙ্গদেব অর্থাৎ মদনকে! শিবের অভিশাপে মদন অতনু বা অনঙ্গ হন; তাই তাঁহাকে অনঙ্গদেব বলা

হয়। অর্থাৎ দেবদত্ত তাহার বন্ধুর মতোই নারীর মহিমা গাহিতে শিখিয়াছে।

নারীর বচনে মধু………জ্বালে দাবানল—ভর্তৃহরির 'নীতিশতকে' এই উপদেশ রহিয়াছে।

বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন মৃত সতীদেহ সম—মন্ত্রী বলিতে চান রাজার বিদেশী আত্মীয়রা তাঁহার অধিকারকে খণ্ড খণ্ড সতীদেহের মতো ভোগ করিতেছে। পুরাণে আছে বিষ্ণুচক্রে সতীদেহ খণ্ডিত হইয়া ভগ্ন জায়গায় পতিত হয়। মন্ত্রী এই উপমার মধ্যে রাজ্যের অরাজকতা ও রাজার অসহায়তার কথা বলিতে চাহিয়াছেন।

ব্যাখ্যা:

রানীর রাজত্বে তুমি ………বিচার-আসন-পানে—দেবদত্ত তাহার বাল্যসখা রাজা বিক্রমের প্রতি এই উক্তি করিয়াছে। এই উক্তির মধ্যে ভবিষ্যৎ ঘটনা এবং নাটকের পরিণতির আভাস রহিয়াছে। ইহা যেন যথার্থই দৈব-উক্তি। বিক্রম সুমিত্রাকে ভালোবাসেন এবং তাঁহার প্রেমাসক্তি এতোই বেশী যে তাহার জন্য তিনি অন্তঃপুরের আশ্রয় লইয়াছেন। স্বভাবতঃই তাহার ফলে রাজার কর্তব্যে অবহেলা ঘটিতেছে। রাজার এই অবহেলার সুযোগ লইয়াই বিদেশী কাশ্মীরীরা রাজার শক্তিকে আয়ত্ত করিয়া প্রজাদের উপর অত্যাচার করিতেছে। এবং তাহার ফলে প্রজাদের আর্ত হাহাকারে রাজ্য ভরিয়া উঠিয়াছে। রাজা এইভাবে রাজ্যের অমঙ্গল ডাকিয়া আনিয়াছেন।

দেবদত্ত যেন রাজা ও রাজ্যের ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা; তাই সে রাজ্যের ভবিষ্যৎ দেখিয়া ভীত হইয়া উঠিয়াছে। দেবদত্ত বুঝিতে পারে, প্রজারা শক্তিহীন দুর্বল বলিয়া অন্যায়ের প্রতিকার করিতে পারে না, তাহারা শুধু আর্তনাদ করিয়াই মরে। কিন্তু বিধাতার রোষবহ্নিতে একদিন রাজাকে পুড়িতে হইবে। যে আগুনে প্রজারা পুড়িয়া মরিতেছে, তাহা একদিন রাজাকেও স্পর্শ করিবে।

বলা বাহুল্য, দেবদত্ত তাহার বন্ধুকে ভালোবাসে বলিয়াই তাহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে। তাছাড়া, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও যেন দেবদত্তের মুখ দিয়া নাটকের

ভবিষৎ পরিণতির একটা ইঙ্গিত দিয়াছেন। দেবদত্ত সত্যদ্রষ্টা, তাই তাহার চোখের সম্মুখে ভবিষ্যতের ছবিটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য :

ভিক্ষেনং নৈম নৈমচং—আসলে 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ'। কিন্তু নাপিত অজ্ঞ লোক, কাজেই সে এইরূপ ভুল বলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছা করিয়াই এইরূপ সংলাপ রচনা করিয়াছেন এবং ইহার মধ্যে তাঁহার চরিত্র-চিত্রণের অসাধাবণ ক্ষমতার পরিচয় রহিয়াছে।

জঠরাগ্নির বাড়া তো আর অগ্নি নেই—নন্দলালের উক্তি। অর্থাৎ ক্ষুধাই মানুষের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। রবীন্দ্রনাথ সুকৌশলে এইভাবে আগুনের প্রসঙ্গ আনিয়াছেন।

অতি দর্পে হত লঙ্কা… ……সর্বমত্যন্তগর্হিতম্—এই শ্লোকটি সুক্তিরত্নাবলীর অন্তর্গত। অতি দর্পের ফলে সব কিছুই বিনাশপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ অতি অহংকার হইতে অবশ্যম্ভাবীরূপে মানুষের জীবনে পতন দেখা দেয়।

রাবণের অতিশয় অহংকারের ফলে স্বর্ণলংকার পতন হইয়াছিল, অতিশয় আত্মাভিমানের জন্যই কৌরবপক্ষ পরাজিত হইয়াছিল এবং অতিরিক্ত দানের গরিমায় বলিরাজা এমনিই বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন, যে, শেষ পর্যন্ত তাঁহার পতন ঘটিল।

লালনে বহবো………লালয়েৎ—ভর্তৃহরির নীতিশতকের অন্তর্গত।

ন সমানসমান………খলু কামিজনঃ—শৃঙ্গার রসাত্মক কামিজনেব বর্ণনা।

দুর্বলস্য বলং রাজা, বালানাং রোদনং বলং—বালকদের শক্তি ক্রন্দন। ভর্তৃহরির নীতিশতকে ইহা বলা হইয়াছে।

তৃতীয় দৃশ্য :

মৌনমুগ্ধ সন্ধ্যা ওই………প্রিয়ে ?—বিক্রমদেব আপনাকে সন্ধ্যার পটভূমিকায় উপস্থাপিত করিয়া তাহার সহিত নিজের জীবনের সাদৃশ্য অনুভব করিতেছেন। তাঁহার মনে হইল, নিশীথের অন্ধকার যেমনগোধূলির

কনক-কান্তি গ্রাস করে, তেমনি তিনিও সুমিত্রার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। ইহার মধ্যে সুমিত্রার প্রতি বিক্রমের গভীর অনুরাগের পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সংসারের কেহ নহ, অন্তরের তুমি—এই কথা বলিয়া বিক্রম সুমিত্রাকে সবকিছু হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে চাহিয়াছেন। মানুষ যদি আপনার মধ্যে একান্তভাবে বাঁধা পড়ে, তাহা হ'লে তাহার জীবন সত্যভ্রষ্ট হয়। বিক্রমও সুমিত্রাকে এমনি সংকীর্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই, তাঁহাকে যথার্থ চিনিতে পারেন নাই।

অন্তরে প্রেয়সী তব, বাহিরে মহিষী—সুমিত্রা বলিতে চাহিয়াছেন যে, তাঁহার জীবনের দুইটি সত্তা। একদিকে তিনি রাজার প্রেয়সী, অন্যদিকে তিনি রানী। প্রেয়সী হিসাবে যেমন তাঁহার রাজার প্রতি কর্তব্য রহিয়াছে, রানী হিসাবেও তেমনি প্রজাদের প্রতি কর্তব্য আছে। বরং, বাহিরের রূপটিই একদিক দিয়া মহত্তর, কারণ, তাহার মূলে রহিয়াছে প্রজাদের সর্বজনীন আহ্বান। সুমিত্রা এ বিষয়ে সচেতন, তাই তিনি রাজাকে এই কথা বলিয়াছেন।

তোমরা পুরুষ····· ·····তোমাদের সাথে—নারীকে লতা এবং পুরুষকে তরুর সঙ্গে তুলনা করা হয় অর্থাৎ একটি লতা যেমন বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বর্ধিত হয়, তেমনি নারীও পুরুষের আশ্রয়েই বাঁচিয়া থাকে। সুমিত্রা এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন।

ধান্যপূর্ণ বসুন্ধরা—রাজা বলিয়াছেন 'প্রজা সুখে আছে।' ইহার পরবর্তী দৃশ্যে সুমিত্রা বলিয়াছেন—"ধান্যপূর্ণ বসুন্ধরা, তবু প্রজা কাঁদে অনাহারে।'—এই দুইয়ের মধ্যে contrast বা বৈষম্য লক্ষণীয়। রাজা জীবনকে দেখিতেছেন দূর হইতে, সুমিত্রা দেখিয়াছেন নিকট হইতে। রাজা বাস্তবকে দেখিতে পান নাই, অথবা দেখিতে চাহেন নাই, রানী বাস্তবকে দেখিয়াছেন, তাই প্রজাদের আর্তনাদ তিনি শুনিতে পাইয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ

রাজা রানী !·········ধূলির মাঝারে—সুমিত্রা রাজাকে বলিলেন, 'আজি মোরা রাজারানী'। তাহা শুনিয়া বিক্রমদেবের অন্তর ক্ষণকালের

জন্য আত্মগ্লানিতে ভবিয়া গিয়াছে, ক্ষণকালের জন্য তিনি যেন উদাসীন হইয়া পড়িয়াছেন।

সুমিত্রাকে ভালোবাসিয়া রাজা যে রাজকর্তব্য হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন তাহা বিক্রমের অজানা নাই। তথাপি তিনি বিভ্রান্তি-মুক্ত হইতে পারিলেন না। পতঙ্গ যেমন অগ্নিতে ঝাঁপ দিবার জন্যই অন্ধকার বিবর হইতে উড়িয়া আসে, বিক্রমও তেমনি নিজের মৃত্যু ডাকিয়া আনিতেছেন। এবং ইহা তাঁহার নিজেব কাছেও অজানা নাই।

মানুষের মনের কাছে পাপ বা অন্যায় ঢাকা থাকে না। অন্তরালবর্তী আত্মগ্লানির প্রদাহে হৃদয় যখন দগ্ধ হইতে থাকে, তখন আমরা বাহির হইতে তাহার রূপ প্রত্যক্ষ করি না বটে, কিন্তু তাহা সত্য। সেই নিষ্ঠুর সত্যকে পাপী বা অন্যায়কারী এড়াইতে পাবে না।

বিক্রমদেবও তাঁহাব কৃতকর্মেব জন্য মনে মনে আত্মগ্লানির তুষানলে দগ্ধ হইতেছিলেন। বিদেশী অমাত্যরা একদিকে যতই তাঁহার শক্তি হরণ করিতেছিল, তিনি ততই অন্তঃপুরে একটু একটু করিয়া আত্মগোপন করিতেছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে, গ্রীক ট্রাজেডির নায়কের মতোই যেন তাঁহার জীবন কোন্ এক অন্ধকার ভরা নদীতে মৃত্যুর দিকে ভাসিয়া চলিতেছিল। সুমিত্রা যখন সেই গোপন ক্ষতে সামান্য আঘাত করিলেন, অমনি এক মুহূর্তেই সেই ক্ষতস্থান হইতে অঝোর ধারায় রক্ত ঝরিতে লাগিল। আসলে, ইহা সুমিত্রার প্রত্যুত্তরে বলা হইলেও ইহার মধ্য দিয়া ক্লান্ত বিক্রমের সমস্ত হৃদয়ের ছবিটি উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িয়াছে। বিক্রম জানেন, তাঁহারই কৃতকর্মের জন্য রাজসিংহাসনের অবমাননা ঘটিতেছে, কাজেই তিনি রাজা নহেন! তিনি জানেন, একান্তভাবে সুমিত্রার প্রেমের দাসত্ব করিতেছেন বলিয়াই অন্য সকল কর্তব্য তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে।

বস্তুতঃ, মুহূর্তের জন্য বিক্রমকে আমরা এইভাবে আনমনা হইতে দেখি। যেন ক্ষণকালের জন্য তিনি নিজের, এমনকি সুমিত্রার অস্তিত্বও বিস্মৃত হইয়াছেন। শুধু অন্তরে জাগিতেছে গভীর ধিক্কার, আত্মগ্লানির তুষানলে তাঁহার অন্তর গভীরভাবে দগ্ধ হইতেছে।

বিক্রমের এই উক্তি গভীরভাবে বিচার করিলে বলিতে হয়—ইহা তাঁহার স্বগত-উক্তি। ইহার মধ্য দিয়া বিক্রম-চরিত্রের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া

পড়িয়াছে। সমগ্র নাটকের মধ্যে বিক্রমের এই সংলাপটি সত্যই অতুলনীয়। তুলির একটি টানের একটি রেখার মতোই এই ছোট্ট সংলাপটির মধ্যে বিক্রম-চরিত্রের স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সংলাপ-রচনার দক্ষতার ইহা নিঃসন্দেহে এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ওই শোনো…………জননী তোদের—রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গান্তরে বলিয়াছেন নারীর দুই রূপ—প্রিয়া ও জননী। নারী যেখানে প্রিয়া, সেখানে সে পুরুষের সঙ্গিনী বা সহচরী। যেখানে সে জননী, সেখানে করুণা, মায়া, স্নেহ-বিগলিত হৃদয়ে এক অপূর্ব জ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে জীবনের মাঝে আসিয়া দাঁড়ায়। রবীন্দ্রনাথ সুমিত্রার মধ্যে এই দুই সত্তার সমন্বয় দেখাইতে চাহিয়াছেন।

সুমিত্রা নিজেও সে কথা জানেন। বিক্রমকে তিনি তাহা বলিয়াছেন। বিক্রমদেব তাঁহাকে প্রিয়া রূপে পাইতে চাহেন, ইহাতে তাঁহার আপত্তি নাই। কিন্তু সুমিত্রা জানেন, তাঁহার আর এক সত্তা রহিয়াছে—তিনি রানী, তিনি প্রজাদের জননী। বিক্রম সুমিত্রার এই সত্তাটি দেখিতে পান নাই, অথবা স্বীকার করিতে চাহেন নাই। এইজন্যই সুমিত্রার সহিত বিরোধ দেখা দিল।

তাই যখন তিনি বাহির হইতে প্রজাদের আর্তনাদ শুনিলেন, তখনই তিনি রাজার কঠিন প্রেমের বন্ধন হইতে বাহির হইয়া প্রজাদের আহ্বানে সাড়া দিলেন।

বাস্তবিকপক্ষে, সুমিত্রাকে আমরা পরিপূর্ণ নারীর প্রতিমূর্তি বা প্রতীক বলিতে পারি। নারীর জীবনের সার্থকতা বা চরিতার্থতা তাহার জননী-রূপের মধ্যে। সংসারে নারী তাহার কল্যাণহস্ত বুলাইয়া দুঃখ ও আর্তি দূর করে। সুমিত্রাও সেই দুই সত্তার সমন্বয়ে রচিত। রাজা যদি সুমিত্রার জননী-সত্তাটিকে অবহেলা না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সহিত বিরোধ বাধিত না। কিন্তু সুমিত্রার এই সত্তাটি অবহেলিত হইয়াছে বলিয়াই সে বিষয়ে সুমিত্রা যেন আরো বেশী সচেতন হইয়াছেন। তাছাড়া, যখন সুমিত্রা বুঝিলেন যে তাঁহার প্রতি রাজার অন্ধ ভালোবাসাই প্রজাদের হাহাকারের মূল কারণ, তখন তিনি সেই বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টা করিলেন। শেষ পর্যন্ত দেখিব, সুমিত্রার জীবনে দ্বিতীয় সত্তাটিই প্রধান হইয়া পড়িয়াছে। তাহারই আহ্বানে তিনি রাজা ও রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

চতুর্থ দৃশ্য ঃ

জীর্ণচীর ক্ষুধিত তৃষিত কোলাহল—এখানে বস্ত্রহীন ক্ষুধার্ত অসহায় প্রজাদের কথাই বলা হইয়াছে।

বল তো এখনি·· · ···কোলাহল—দেবদত্ত বলিতে চায়, সৈন্যদের সাহায্যে যদি ঐসব হতভাগ্য প্রজাদের তাড়াইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহাদের কোলাহল অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

বস্তুতঃ, কথাগুলি ব্যঙ্গ করিয়া বলা হইয়াছে। আসলে ঐসব হতভাগ্য প্রজাদের প্রতি দেবদত্তের সমবেদনাই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ধান্যপূর্ণ বসুন্ধরা, তবু প্রজা কাঁদে অনাহারে ?

—সুমিত্রার ধারণা ছিল যে, রাজ্যে আহার্যের অভাব নাই, সুতরাং প্রজারা আহারের জন্য কাঁদিবে কেন! তিনি জানিতেন না, আহার্য থাকিলেও তাহা প্রজাদের নিকট সব সময় পৌঁছায় না।

ধান্য তার বসুন্ধরা যার—দেবদত্ত বলিতে চায়, শক্তি যাহার হাতে, ঐশ্বর্যও তাহারই আয়ত্তাধীন। ইংরাজীতে আছে, Might is right.

দরিদ্রের নহে বসুন্ধরা—প্রচলিত প্রবাদ, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। এই উক্তির মধ্যে পরোক্ষভাবে দেবদত্ত যেন রাজাকে ব্যঙ্গ করিতে চাহিয়াছে, অন্যদিকে দরিদ্র প্রজাদের প্রতি তাঁহার গভীর সমবেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অরাজক কে বলিবে সহস্ররাজক—দেবদত্তের প্রতি কথায় ব্যঙ্গ ফুটিয়া উঠে। এই কথার মধ্য দিয়া রাজা ও রাজ্যশাসনের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ ফুটিয়া উঠিয়াছে। অরাজক বলিতে বুঝায়, রাজার অভাব। কিন্তু, বাস্তবিক-পক্ষে, রাজার রাজকর্তব্যে অবহেলার সুযোগ লইয়া জয়সেন, শিলাদিত্য প্রমুখ অত্যাচারী রাজকর্মচারী প্রকারান্তরে স্ব স্ব প্রধান হইয়া রাজ্যশাসন করিতেছে। দেবদত্ত রাজ্যব্যাপী এই চরম অরাজকতার প্রতিই ইঙ্গিত করিতে চাহিয়াছে।

রানীর আত্মীয় তারা, প্রজার মাতুল ·······মামা কালনেমি—মাতুল কংস যেমন শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করিতে চাহিয়াছিল, এবং মহাসুর কালনেমি স্বজনের অনিষ্ট সাধন করিতে চাহিয়াছিল, তেমনি রানীর কাশ্মীরী

আত্মীয়রা জালন্ধর রাজ্যে অনুরূপ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া রাজ্যের অমঙ্গল ডাকিয়া আনিয়াছে।

কৌতূহলী ছাত্র-ছাত্রীর জন্য কালনেমি প্রসঙ্গে অতিরিক্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করা গেল :

কালনেমিঃ (পুং)—স্বনামখ্যাত রাক্ষসঃ। যথা কালনেমিং দুরাধর্ষং রক্ষঃ পরমদুর্জয়ম্। চতুরাস্যং চতুর্হস্তমষ্টনেত্রং ভয়াবহম্॥ ইতি রামায়ণম্। দৈত্য বিশেষঃ। যথা আত্মানামিহ সংজাতং মানন্ প্রাগ্নিষ্ণুনাহতম্। মহাসুরং কালনেমিং যদুভিঃ স ব্যরুধ্যত। ইতি শ্রীভাগবতম্। স তু হিরণ্যকশিপু-পুত্রঃ, ইতি হরিবংশঃ॥

পঞ্চম দৃশ্য :

প্রিয়ে, প্রেয়সী, মধুরভাষিণী, কোকিলগঞ্জিনী—দেবদত্ত স্ত্রীকে পরিহাস করিয়া সম্বোধন করিতেছে।

শব্দশাস্ত্রের প্রতি রাগ কেন?—এখানে শব্দশাস্ত্র বলিতে বুঝান হইয়াছে ব্যাকরণ। ইহার আর-এক অর্থ হয়—এবং শব্দশাস্ত্র বলিতে প্রধানতঃ বুঝায় পতঞ্জলির মহাভাষ্য।

ব্রাহ্মণবাক্য মিথ্যা হবে না—সাধারণ লোকের এইরূপ ধারণা। এখানে দেবদত্ত পরিহাসভরে তাহাই স্মরণ করিয়াছে।

ষষ্ঠ দৃশ্য :

বিদ্বেষ-অনল উদগারিছে কৃষ্ণ ধূম নিন্দা রাশি রাশি—বিক্রমের ধারণা, জয়সেন প্রমুখ বিদেশী বলিয়াই, তাহাদের প্রতি সকলে বিদ্বেষ-পোষণ করে।

ইহা নহে রাজধর্ম—রাজকার্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি দিলে রাজকার্য চলে না।

বিশ্রামেরে জেনো কর্তব্য কাজের অঙ্গ—রাজা এইভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছেন। তিনি অন্তঃপুরে আশ্রয় লইয়াছেন, ইহা রাজার পক্ষে অনুচিত। কিন্তু বিক্রম বলিতে চাহেন, অন্তঃপুরে তিনি যে বিশ্রাম ভোগ করিতেছেন, তাহাও কর্তব্যের জন্যই।

ব্যাখ্যা ঃ

হায় কষ্ট মানব জীবন.........পঞ্জরপিঞ্জরে—ইহা রাজা বিক্রমের স্বগতোক্তি। আপন মনে তিনি ইহা বলিয়াছেন, অমাত্যের প্রস্থানের পর যখন তিনি একা রহিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলিয়াছেন, 'যা না চাইবার তাই আজি চাই গো, যা' না পাইবার তাই কোথা পাই গো!' ইংরেজ কবি Shelleyও বলিয়াছেন, "We look before and after and pine for what is not." অর্থাৎ বলিতে হয়, মানুষের মনের মধ্যে চিরকালের মতো এক অতৃপ্তি শেষ পর্যন্ত থাকিয়া যায় এবং ইহার জন্য তাহার বেদনার অন্ত নাই।

বস্তুতঃ, আমাদের জীবনের সেই বেদনার মূলে রহিয়াছে নানা নিয়মের, নানা অনুশাসনের বেড়াজাল। তাহার মধ্যে চাপা পড়িয়া আমাদের প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে। মানুষ যাহা চায়, তাহা সে পায় না। ইহাই তাহার জীবনের ট্রাজেডি।

বিক্রমদেবও চাহিয়াছিলেন যে, তিনি একটি নিজস্ব প্রেমের জগৎ রচনা করিয়া তাহার মধ্যে নিমগ্ন থাকিবেন। তিনি রাজা। কিন্তু রাজ ঐশ্বর্য অপেক্ষা প্রেমই তাঁহার নিকট আকর্ষণীয়। এবং তিনি এই প্রেমের টানেই কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মতো আপন সিংহাসন হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। অথচ বাস্তবের রূঢ় স্পর্শে তিনি দেখিলেন, ক্ষণে ক্ষণে সেই নিভৃত নীড়ের স্বপ্ন চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে; স্বপ্ন ও বাস্তবের মিল হইতেছে না। অর্থাৎ তিনি যাহা কামনা করিয়াছিলেন, তাহা পরিতৃপ্ত হইতেছে না। তুলনা দিয়া বলা যায়, তাঁহার হৃদয়ের অতৃপ্ত বাসনা যেন পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মতোই খাঁচার মধ্যে মাথা কুটিয়া মরিতেছে।

বস্তুতঃ, বিক্রমের এই স্বগতোক্তির মধ্যে তাঁহার অন্তরের এক গভীর আর্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সপ্তম দৃশ্য ঃ

বিদেশী দস্যুরে—বিদেশী কাশ্মীরী রাজ-নায়কদের অর্থাৎ জয়সেন, শিলাদিত্য প্রমুখ অত্যাচারী শাসকদের। এই উক্তির মধ্যে বিক্রমের মনোভাব কীভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহা বিশেষভাবে লক্ষণীয়

অন্ধকারে বাড়িয়াছে বহুকাল ধরে অমঙ্গল—এখানে অন্ধকার বলিতে মন্ত্রী রাজ-কর্তব্যের প্রতি অবহেলার কথা বলিতে চাহিয়াছেন। তাহার ফলে রাজ্যে দুর্দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে। মন্ত্রী রাজাকে এই দুর্দিনের কথাই বলিতে চাহেন।

একদিনে চাহি তারে.........কাঠুরিয়া করে ভূমিসাৎ—কাঠুরিয়া যেমন বহুবর্ষব্যাপী বর্ধিত শাল গাছকে এক মুহূর্তেই কাটিয়া ফেলে, তেমনি বিক্রমও রাজ্য হইতে সমস্ত অমঙ্গলের কারণ দূর করিতে চাহেন। বিক্রম বহুদিন রাজকর্তব্য পালন করেন নাই, তাহার ফলেই রাজ্যে অমঙ্গল দেখা দিয়াছিল। আজ তাঁহার চৈতন্যোদয় হইয়াছে। হয়ত আত্মগ্লানির হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্যই তিনি অত্যাচারীদের শাস্তি দিতে চাহেন। অথবা, তিনি বুঝিয়াছেন যে, রানীকে পরিপূর্ণভাবে পাইতে হইলে মঙ্গলের পথেই পাইতে হইবে। তাই তাঁহার এই আগ্রহ।

সেনাপতি নিজেই বিদেশী—রাজা অত্যাচারীদের শাস্তি দিবার জন্য সেনাপতির সন্ধান করিলে মন্ত্রী এই কথা বলিয়াছেন। ইহাকে Dramatic Irony বলা যাইতে পারে।

তবে ডেকে নিয়ে এসো.........বন্ধ করো মুখ—রাজার এই উক্তির মধ্যে রাজার অসহায় অবস্থার চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রাজা রানী ভুলে গেছে সবে...কদাচিৎ জনশ্রুতি শোনা যায়—দেবদত্তের এই উক্তির মধ্যে রাজ্যের অরাজকতার চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। সূর্যের অস্তিত্ব যেমন প্রাতনিয়ত অনুভব করা যায়, তেমনি রাজ্যের মধ্যে রাজার অস্তিত্বও অনুরূপ। কিন্তু রাজা-রানী প্রজাদের অন্তর হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছেন। ইহা রাজ্যের ঘোরতর অকল্যাণের চিত্র, সন্দেহ নাই। দেবদত্ত সুমিত্রার নিকট এই চিত্রই তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছেন।

কালভৈরবের পূজোৎসবে—রুদ্রের পূজোৎসবের কথাই বলা হইয়াছে। ইনি সংহারের দেবতা, শিবের সংহারমূর্তি। এই দেবতার পূজার উৎসবে রাজ্যের সকল অকল্যাণ দূর হইবে—সুমিত্রা ইহাই বলিতে চাহেন। প্রসঙ্গক্রমে, 'তপতীর' কথা স্মরণীয়। সেই নাটকে সুমিত্রা

রাজার বিরুদ্ধাচারণের জন্যই কালভৈরবীর পূজা করিতে চাহিয়াছেন।

নির্বুদ্ধিই বুদ্ধিতার······ নির্ভরের দণ্ড।—দেবদত্ত জানেন, ত্রিবেদী ধূর্ত অথচ বাহিরে নির্বোধের ভান করিয়া থাকে। আপাতদৃষ্টিতে তাহাকে সরল মনে হয় বটে, কিন্তু আসলে তাহা "বক্রতার"ই ছদ্মরূপ।

অষ্টম দৃশ্য :

পৈরহিত্যের বেলায়—পৌরোহিত্যের সময়। ত্রিবেদীর স্বভাব এইরূপ ভুল বলা।

দেখা যাবে কে কতখানি বোঝে—ত্রিবেদীর ধূর্ত-চরিত্রের প্রমাণ।

দ্বিতীয় অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য :

আশুবিশ্রুতি হবে—যা' পেয়েছি তা হারাতে হবে, অথবা, লব্ধবিদ্যার বিশ্রুতি ঘটবে।

শাস্ত্রে বলে শব্দ ব্রহ্ম—শব্দ ব্রহ্ম। ব্রহ্মসূত্রে, এমন কি উপনিষদেও তাহাই বলা হইয়াছে।

ধর্মস্য সূক্ষ্মা গতি—নীতিশতক-এ উক্ত। ইহা নীতিসমন্বিত প্রচলিত সংস্কৃত বাক্য। ধর্মের গতি সূক্ষ্ম।

রাজদ্বারে শ্মশানে চ ·········ইত্যাদি—হিতোপদেশ।

তেমনি শ্রুতিপৌরুষ—তেমনি গাল-ভরা কথা অর্থাৎ শুনিয়াও পৌরুষভাব জাগিয়া উঠে।

মুকুন্দ মুরহর মুরারে—জয়দেবের শ্লোকের কথা মনে পড়িয়া যায়।

দ্বিতীয় দৃশ্য :

আনন্দে বিহ্বল তারা। সত্বর আসিছে দলবল নিয়ে—আসলে সভাসদ বিক্রমকে বিদ্রূপ করিতেছেন। 'আনন্দে বিহ্বল তারা'—ইহা স্পষ্টতঃই দ্ব্যর্থক।

কোথা যাও, একবার······ ··মোরে দীন ব'লে—ইহার মধ্যে রাজার হৃদয়ের এক অতৃপ্ত বাসনার ছবি উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। এবং সেই সঙ্গে তাঁহার অন্তরের গভীর আকুতিও প্রকাশ পাইয়াছে।

রাজার ঐশ্বর্যের অভাব নাই। সেই ঐশ্বর্য বাহিরের। অথচ, রাজা মনে করেন যে, তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য প্রেম। প্রেমের কাঙাল বলিয়াই তিনি ঐ বাহিরের ঐশ্বর্যকে তুচ্ছ করিতে চাহেন। অথচ, ভাগ্যের এমনিই পরিহাস যে, যাহাকে ধরিবার জন্য, প্রেমের বন্ধনে বাঁধিবার জন্য এতো আগ্রহ, সেই সুমিত্রাই তাঁহার নিকট ধরা দিল না। সুমিত্রা জানেন, রাজা তাঁহার প্রেমের কাঙাল। তাই তিনি রাজাকে স্বচ্ছন্দে তুচ্ছ করিতে পারেন।

বস্তুতঃ, তাহা সত্য নহে, ইহা বিক্রমদেবেরই মন-গড়া কল্পনা। কারণ, সুমিত্রা যে বিক্রমকে উপেক্ষা করিয়াছে, তাহা রাজার দীনতার জন্য নহে। সুমিত্রা রাজার নিকট হইতে দূরে থাকিতে চাহেন, কারণ, রাজা ভ্রান্ত-পথের আশ্রয় লইয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ

যে প্রেম করিছে ভিক্ষা ……… ……… নই কভু—রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে বলিয়াছেন যে, মানুষের মধ্যে দুই 'আমি' রহিয়াছে। একটি 'আমি' ছোট, সংসারের ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে তাহার অবস্থিতি। অন্য 'আমি' বড়, জীবনের বৃহত্তর মহত্তর ক্ষেত্রে তাহার চরিতার্থতা। প্রেম প্রসঙ্গেও অনুরূপ ধারণা রূপান্তরে অভিব্যক্ত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, মহৎ প্রেম নৌকোর গুণ টানা নহে, তাহা বন্ধনের মধ্য দিয়া প্রেমিককে টানিয়া রাখে না, অর্থাৎ তাহা 'ঘড়ায় তোলা জল' নহে, তাহা হইতেছে 'দীঘির জল'—তাহাতে মুক্তির আনন্দ সঞ্চিত থাকে। মহৎ প্রেম সম্বন্ধে কবির এই অভিমত নানা লেখায়, কবিতায় ও গানে প্রকাশিত হইয়াছে।

এখানে সুমিত্রার মুখ দিয়া কবি তাহাই বলিতেছেন।

সুমিত্রা বলিতে চাহেন, বিক্রমের প্রেম যদি সত্যই মহৎ হয়, তবে তাহাতে বিশ্বের অংশ আছে। অথচ, বিক্রম সেই প্রেমকে একা সুমিত্রার চরণে নিবেদন করিতে উৎসুক।

কবি বলিয়াছেন, বস্তুর সমগ্র রূপের মধ্যেই সত্য রহিয়াছে, খণ্ডিত রূপের মধ্যে সত্য নাই। এবং আংশিকের প্রতি আসক্তিবশতঃ সমগ্রের প্রতি অবমাননাই হইল পাপ। বিক্রমও সেই দোষে দোষী, কারণ, তিনি তাঁহার

প্রেমের সার্থকতা খুঁজিয়াছেন খণ্ডিত রূপে অর্থাৎ সুমিত্রার মধ্যে। এইখানেই বিক্রমের প্রেমের বিকৃতি। সেইজন্যই তিনি সুমিত্রাকে একান্তভাবে অন্তঃপুরের মধ্যে তাঁহাকে বন্দিনীরূপে আপনার করিয়া পাইবার জন্য ব্যগ্র। সুমিত্রা রাজার এই দৃষ্টিবিভ্রমের এবং তাহার অব্যবহিত পরিণতির কথা অনুভব করিয়াই রাজাকে এই কথা বলিয়াছেন।

অর্জুনের শরাঘাতে, ইত্যাদি—অর্জুন শরাঘাত করিয়া পাতাল হইতে যে জলস্রোত আনয়ন করেন, ভীষ্ম তাহাই পান করিয়াছিলেন। এখানে সুমিত্রার 'তীক্ষ্ণ কথা'র সহিত অর্জুনের শরাঘাতের তুলনা করা হইয়াছে।

রক্তশোষা কীটদের—জয়সেন প্রমুখ রাজ্যের নায়কদের।

তৃতীয় দৃশ্য :

সেই কৈলাসের পথে আর ফিরিল না—রানী সুমিত্রা নিজেকে সতীর সহিত তুলনা করিতেছেন। তাঁহার মনে হইতেছে, হয়ত ইহাই তাহার চির-বিদায়, তিনিও আর কখনো ফিরিবেন না।

পতিসত্যপালনের লাগি আমি যাব—রানী জালন্ধর রাজ্য ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন; ইহার মূলে রহিয়াছে এক মহৎ উদ্দেশ্য—রাজাকে অমঙ্গল হইতে রক্ষা করা, তাহা হইলেই রাজ্যে শান্তি আসিবে।

চতুর্থ দৃশ্য :

বৃহৎ প্রতাপ.......... ক্ষুদ্র পাখি উড়ে চলে যায়—এখানে রাজা নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভাবিতেছেন। তিনি প্রভূত শক্তি ও ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়াও সুমিত্রার মতো সামান্য এক ক্ষুদ্র পাখিকে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। 'ক্ষুদ্র পাখি' অর্থে সুমিত্রাকে বুঝানো হইতেছে। এই উক্তির মধ্যে সুমিত্রার প্রতি বিক্রমের গভীর আকর্ষণের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রেমের শৃঙ্খল হাতে........করো পলায়ন—বিক্রম কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছেন না যে, তিনি প্রবল পরাক্রমশালী রাজা হইয়াও সামান্য এক নারীর কাছে পরাজিত। এই পরাজয়ের গ্লানি যতই তাঁহার অন্তরকে আচ্ছন্ন করিতেছে, ততই তাঁহার চিত্ত সুমিত্রার জন্য হাহাকার করিয়া উঠিতেছে। মরুভূমিতে তৃষ্ণা-

নিবারণের উপায় থাকে না বলিয়াই তৃষ্ণার তীব্রতা বাড়ে। তেমনি সুমিত্রাকে আয়ত্তের মধ্যে পাইলেন না বলিয়াই তাঁহার জন্ম রাজার হৃদয় নিরন্তর তৃষিত হইয়া রহিয়াছে।

বারবার তার কথা কে চাহে শুনিতে—বিক্রম রাজা হইলেও প্রেমিক; এখানে তাঁহার অভিমান প্রকাশ পাইয়াছে।

অন্তর্যামী দেব ……তারে ভালোবাসা—ব্যাকুল অন্তরে বিক্রম বলিতেছেন যে, সুমিত্রাকে ভালোবাসাই তাঁহার জীবনের চরম আনন্দ, অথচ তাহা বাহিরের চোখে অপরাধ।

পুণ্য গেল……… …বিশ্বরঙ্গ মাঝে—সুমিত্রাকে ভালোবাসিয়াই তিনি নিঃস্ব হইয়াছেন। তিনি এই কথা যখনই বুঝিলেন, তখন দেখিলেন—সম্মুখে একটি মাত্র পথই উন্মুক্ত রহিয়াছে। সুমিত্রাকে পাইলেন না। ইচ্ছা করিলে এখনো রাজ্যকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারেন। তাই তিনি ব্যাকুল হৃদয়ে জীবন দেবতার উদ্দেশে এই উক্তি করিলেন।

সুমিত্রা চাহিয়াছিলেন যে, রাজার চৈতন্যোদয় হউক এবং তাহার জন্যই তিনি রাজাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। দেখিতেছি, সুমিত্রাকে হারাইয়াই যেন রাজার চেতনা ফিরিয়া আসিল।

বস্তুতঃ, রাজা যেন আবার তাঁহার পৌরুষ ফিরিয়া পাইয়াছেন।

স্বপ্ন ছুটে গেছে—এতোদিন বিক্রম যেন মোহান্ধ হইয়াছিলেন, এতোদিনে তাঁহার চেতনা সঞ্চার হইল। যথার্থই বিক্রমদেব এক কাল্পনিক জগতের আশ্রয় লইয়াছিলেন; বাস্তবের রূঢ় আঘাতে তাঁহার স্বপ্নভঙ্গ হইল। স্বপ্ন এবং বাস্তবের কখনো মিল হয় না। স্বপ্নে তিনি যাহা সত্য ভাবিয়াছিলেন, বাস্তবে দেখিলেন তাহা মিথ্যা। সুমিত্রা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন আঘাত করিবার জন্য, যাহাতে রাজার চেতনা ফিরিয়া আসে স্বভাবিকভাবে। তাহাই হইল। সুমিত্রার নিকট হইতে আঘাত পাইয়া রাজা বুঝিলেন যে, জীবন কল্পনা বা স্বপ্ন নয়।

আমারে পশ্চাতে ফেলে চলে গেছে চোর—চোর বলিতে এখানে সুমিত্রাকে বুঝানো হইয়াছে। সুমিত্রাই যেন বিক্রমের সমস্ত কিছু হরণ করিয়া লইয়াছিল; সেইজন্যই রাজা তাঁহাকে চোর বলিয়া সম্বোধন করিলেন।

আপনারে পেয়েছি কুড়ায়ে—আপনাকে খুঁজিয়া পাইয়াছি অর্থাৎ রাজা আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছেন।

মেঘ যাক কেটে—এতোদিন রাজার জীবনে এবং রাজ্যে যে দুর্যোগ দেখা দিয়াছিল, তাহা দূর হইয়া যাক্।

তৃতীয় অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য :

নিয়মিত দু'সন্ধে দুবার মরতে পারি—প্রথম সৈনিকের এই উক্তির মধ্যে কুমারসেনের জনপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

চোখের চেয়ে তার কঙ্কণ ভয়ানক—পরিহাসের সুরে প্রথম সৈনিক এই কথা বলিয়াছে। সে বলিতে চায়, (মহিচাঁদের মেয়ে) শুধু মাত্র চোখের আগুনেই দগ্ধ করে না, কোমল হস্তের কঙ্কণের আঘাত করিতেও ছাড়ে না।

যেন ভরতের রাজত্বে রামচন্দ্রের জুতোজোড়াটার মতে পড়ে আছে—বৃদ্ধ রাজভৃত্য শঙ্করের রাজভক্তির পরিচায়ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য :

সব আছে, তবু কিছু নাই—ইলার প্রতি কুমারের প্রেমের গভীরতার পরিচায়ক এই উক্তি। প্রেমিকের কাছে আপন প্রেমিকা ছাড়া আর সবই মিথ্যা, সব কিছুর মধ্যেই সে প্রিয়তমার অন্বেষণ করে। অর্থাৎ প্রেমিকের হৃদয় একান্তভাবে প্রেমের পাত্রকে আশ্রয় করে বলিয়াই তাহার মধ্যেই জীবনের চরিতার্থতা খোঁজে। কাজেই, তখন আর-সব তুচ্ছ হইয়া যায়।

তুমি না থেকেও আছ প্রাণতমে—অর্থাৎ 'নয়ন সমুখে' না থাকিলেও 'নয়নের মাঝখানে' আশ্রয় লইয়াছ বলিয়াই—তোমার অস্তিত্ব আমি সর্বদাই পাই—ইহাই কুমারের বক্তব্য।

এ মিলন পাশ.........জীবনে জীবনে ?—ইলার সমস্ত সত্তা যেন কুমারের সহিত মিলনের কামনায় অধীর হইয়া উঠিয়াছে।

মৌন লজ্জা.........বিদায়ের বেলা—এখানে প্রেমিক-চরিত্রের স্বরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রেমিক-প্রেমিকা যতক্ষণ বিবাহবন্ধনে বদ্ধ না হয়, ততক্ষণ তাহাদের মধ্যে থাকে গভীর অতৃপ্তি—উভয়ের মধ্যে এক অদৃশ্য দ্বিধা ও সংশয়ের ব্যবধান থাকিয়া যায়। যখন তাহাদের

সাক্ষাৎ হয়, তখন একদিকে থাকে মিলনের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা, অথচ ঐ ব্যবধান থাকে বলিয়া মৌন লজ্জায় তাহাদের অন্তর ভরিয়া যায়। তেমনি অন্যদিকে, প্রতিবার বিদায়ের সময় বিদায়-জনিত অশ্রু ফেলিতে হয়, কারণ মিলনের বাসনা অতৃপ্তি থাকিয়া যায়। বস্তুতঃ, দাম্পত্যবন্ধনে বদ্ধ হইবার আগে প্রেমিক-প্রেমিকাকে এইভাবে সংকোচ, দ্বিধা ও অশ্রুজলের পালা শেষ করিতে হয়।

আজি তার শেষ—Dramatic irony. কুমার ভাবিয়াছিলেন যে, শীঘ্রই সে ইলাকে বধূরূপে পাইবে। কিন্তু ঐ লজ্জা ও অশ্রুজলের পালা কোনোদিনই শেষ হইল না। তাহা চির-বিরহের অতৃপ্ত বেদনা বক্ষে লইয়া চির-বিরহীরূপে চোখের সামনে জাগিয়া রহিল।

এ কি দুঃখগান ....উদাস উদাস—আসন্ন সম্ভাব্য সুখ-স্মৃতির মধ্যে হঠাৎ সুমিত্রার কথা মনে পড়িয়া গিয়াছে। ইলার মনে হইল, নারীজন্মের লক্ষ্যই হইল আত্মসুখ নহে, আত্মবিসর্জন। হয়ত তাহাকেও আত্মবিসর্জনের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। ইলার মনে হইল, এমনি করিয়া সুখ নারীর জীবনে আসে আত্মবিসর্জনের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া। কাজেই, কুমার যখন তাহার গান শুনিয়া বলিল যে, আনন্দের মধ্যে হঠাৎ কেন তাহার কণ্ঠে করুণ স্বর জাগিয়াছে, তাহার উত্তরে ইলা বলিল, সুখের সঙ্গে দুঃখের কোন বিরোধ নাই। বরং, গভীর সুখ ত্যাগের চিত্র লইয়া উপস্থিত হয় বলিয়াই তাহার মধ্যে এমন উদাস-করা স্বর বাজিতে থাকে।

বৈষ্ণব পদাবলীতেও আছে, দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া। বৈষ্ণব-কবিরাও মিলনের মধ্যে বিচ্ছেদের হাহাকার শুনিতে পাইয়াছেন। বস্তুতঃ, ইহাই জীবন-সত্য। সুখের সঙ্গে দুঃখ, আনন্দের সঙ্গে বেদনা, দিনের সঙ্গে রাত্রি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কাজেই ইলার উক্তিতে জীবনের এক সত্যরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

দক্ষিণে চাহিয়া দেখো, ইত্যাদি—কুমারসেনের এই সংলাপ একান্তভাবেই গীতিধর্মী বা Lyrical। রবীন্দ্রনাথ ইলা ও কুমার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, রাজা ও রানী নাটকের নাট্যভূমিতে রহিয়াছে লিরিকের প্লাবন—তাহারই টানে ইলা-কুমার প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িয়াছে। কুমার-চরিত্র

মূলতঃ গীতিধর্মী, তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য, এই সংলাপ ছাড়াও অন্যত্রও এই গীতিধর্মিতা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

দুটি পাখি একমাত্র মহামেঘনীড়ে—ইলা কুমারকে লইয়া একটি নিভৃত জগতের স্বপ্ন দেখিতেছে। তুলনীয়, 'কপোত-কপোতী যথা উচ্চবৃক্ষচূড়ে' (মধুসূদন)। প্রেমিক-প্রেমিকা স্বভাবতঃই এক নিভৃত নীড়রচনা করিবার জন্য উৎসুক থাকে।

তৃতীয় দৃশ্য ঃ

ছদ্মবেশ দূর করো বোন—কুমার সুমিত্রাকে তাঁহার ছদ্মবেশ ত্যাগ করিতে বলিয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে, সুমিত্রা ছদ্মবেশ ধারণ করিলেন কেন? তাহার কি কোন নাটকীয় সার্থকতা অথবা ইহার পিছনে সুমিত্রার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য রহিয়াছে? হয়ত ইহাই হইতে পারে যে, সুমিত্রা জালন্ধরের অরাজকতার কথা কাশ্মীরের জনসাধারণের নিকট জানাইতে চাহেন না। তাহা একদিক দিয়া লজ্জা ও কলঙ্কের কথা, সন্দেহ নাই। সর্বোপরি, জালন্ধরে যে অরাজকতা সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে রানীর কাশ্মীরী আত্মীয়বর্গ। তাহাও কলঙ্কের কথা এবং তাহাদের বিনাশ-সাধনে কাশ্মীরের নৈতিক দায়িত্ব রহিয়াছে। অথচ, এ সবই গ্লানিকর ব্যাপার। এই গ্লানি যাহাতে সকলের নিকট ধরা না পড়ে, সেইজন্যই সুমিত্রা ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছেন।

চতুর্থ দৃশ্য ঃ

ক্ষুধিত মার্জার..........তবু আজো কেন বসে আছ—রেবতী এই বলিয়া চন্দ্রসেনের গুপ্ত কামনাকে জানাইতে চাহিয়াছে। লেডী ম্যাকবেথও ম্যাকবেথকে এইভাবে প্ররোচিত করিয়াছিল। তুলনীয় :

..... Nor time nor place
Did then adhere, and yet you would make both.
They have made themselves, and that their fitness now
Does unmake you.

[Macbeth-Act I, Sc. VII.]

লেডী ম্যাক্‌বেথের মতোই রেবতীর চরিত্র; রবীন্দ্রনাথ এই চরিত্রটি সেই আদর্শেই অঙ্কিত করিয়াছেন।

দেবতা তোমার হয়ে অলক্ষ্যসন্ধানে করিবে না তব লক্ষ্যভেদ—লক্ষ্যভেদ প্রসঙ্গটি মহাভারতের অর্জুনের লক্ষ্যভেদ প্রসঙ্গ হইতে গৃহীত, তাহারই ভাবানুষঙ্গ বহন করিতেছে। এখানে রেবতী বলিতে চায় যে, চন্দ্রসেন যদি ভাবিয়া থাকে যে, তাহার উদ্দেশ্য অপরে সাধন করিয়া দিবে, তবে তাহা ভুল। রেবতী আসলে চন্দ্রসেনকে এইভাবে উত্তরোত্তর উত্তেজিত করিতে চাহিয়াছে।

দীপ্ত যৌবনের ⋯⋯আলস্য উৎসবে—এইভাবে রেবতী কুমারকে মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, সে কুমারকে উৎসাহ দিয়াছে, কিন্তু ইহা তাহার ছলনা। কুমারও রেবতীর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে নাই, তাই সে উৎসাহভরে বলিয়াছে—

> জয় হোক, জয় হোক, জননী, তোমার।
> এ কী আনন্দসংবাদ। নিজমুখে তাত
> করহ আদেশ।

পঞ্চম দৃশ্য:

শেষে নিবাতে হল কি উৎসবের দীপ!—ইলার সখীর এই উক্তির মধ্যে Dramatic irony ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহারা সত্যই ভাবিতে পারে নাই যে, উৎসবের দীপ চিরতরে নিভিয়া গেল।

কেন আজ মনে হয়⋯⋯⋯⋯ছায়ার মত—ইলা যেন আপনার অজ্ঞাতসারেই আপনার ভবিষ্যতের ছবি উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। নিয়তিই যেন তাহার মুখ দিয়া ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা ঘোষণা করিয়া গেল।

ইলা যে স্বপ্নভরা নীড়ের স্বপ্ন দেখিয়াছিল, কে জানিত তাহা স্বপ্নই থাকিয়া যাইবে। এই নাটকের পরিণতিতে দেখিব যে, ইলার এই হাহাকার মিথ্যা হয় নাই। কুমারকে সে একান্তভাবেই ভালো বাসিয়াছিল বলিয়াই হয়ত সে অন্তরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে ভবিষ্যৎকে দেখিতে পাইয়াছিল।

চতুর্থ অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য :

মানবমৃগয়া—যুদ্ধ।

অবলার ক্ষীণ বাহু·········বিবর-মাঝে—অর্থাৎ সুমিত্রার প্রেমে তিনি এমনিই উন্মত্ত হইয়াছিলেন যে, এই 'প্রচণ্ড সুখের' প্রতিও আকৃষ্ট হন নাই। লক্ষণীয়, এই উক্তির মধ্যে সুমিত্রার প্রতি বিক্রমের তাচ্ছিল্য বা বিদ্রূপের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাই তিনি প্রেমকে বলিলেন 'ক্ষীণ বাহু' এবং যে অন্তঃপুরে তিনি এক নিভৃত স্বপ্নমুখর নীড়ের কল্পনা করিয়াছিলেন, সেই অন্তঃপুর তাঁহার কাছে আজ 'বিবর'!

শৃঙ্খল বন্দীরে ছেড়ে আপনি পলায়ে গেছে—বিক্রম নিজেকে বন্দী বলিয়াছেন এবং শৃঙ্খল বলিতে বুঝাইতেছে সুমিত্রার প্রতি তাঁহার প্রেম। বিক্রম সেই প্রেমে বন্দী হইয়াছিলেন। এতোদিনে তাঁহার মোহমুক্তি ঘটিয়াছে—এবং সেই কারণেই তিনি মুক্তির আনন্দে উল্লসিত হইয়াছেন।

ব্যাখ্যা :

এ প্রবল হিংসা ভালো··········হিংসা স্বাধীনতা—বিক্রমের এই স্বগতোক্তির মধ্যে তাঁহার পৌরুষ-দৃপ্ত রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মানুষের মধ্যে দুইটি সত্তা নিহিত থাকে—শিব ও রুদ্র। মানুষের যে সত্তা শিবের মত, তাহা ভালোবাসিতে চায়, কল্যাণের দৃষ্টিতে জীবনকে দেখে। আবার যে সত্তা রুদ্রের মতো, তাহার স্বরূপ প্রচণ্ড, সংহার করাই তাহার লক্ষ্য। প্রাচীন পুরাণে আমরা শিবের মধ্যে এইদুই সত্তার সমন্বয় দেখি। যে শিব জগতের কল্যাণ করেন, যে শিব প্রেমিকরূপে উমার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই শিবই রুদ্র, ধ্বংসের দেবতা।

আবার, প্রেমের লক্ষণই হইল আত্মত্যাগ, যে ভালোবাসে সে যেন সর্বস্ব দিবার জন্যই প্রস্তুত।

বস্তুতঃ, বিক্রমের মধ্যে আমরা ঐ দুই রূপই দেখিতে পাই। চতুর্থ অঙ্কের আগে দেখিয়াছি প্রেমিক বিক্রমকে, তখনো তিনি রানী সুমিত্রার প্রেমে আত্মবিস্মৃত, আপন কর্তব্য-বিস্মৃত। যে মুহূর্তে সেই কোমল রূপ খসিয়া পড়িল, অমনি তাহার মধ্য হইতে বিক্রমের রুদ্ররূপ বাহির হইয়া আসিল।

বাস্তবিকপক্ষে, মানুষের ঐ দ্বিতীয় সত্তাটির প্রকাশ হিংসা, দ্বেষ এবং বিদ্বেষের মধ্যে। বিক্রম সেই পথেই অগ্রসর হইতেছেন। নিজের হৃদয়ের দিকে তাকাইয়া তিনি বলিলেন যে, ধ্বংসের মধ্যে যেমন বিধাতার অদৃশ্য আনন্দের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি তিনিও আপনিই এক হিংসামুখর প্রলয়ংকরী জীবনের পথে বাহির হইয়াছেন।

সত্য কথা বলিতে কী, প্রলয়ের জন্য বা ধ্বংসের জন্যও চাই প্রেমও বা প্রচণ্ড শক্তি। শিবের যে রূপ প্রেমিক, তাহার মধ্যে রহিয়াছে কোমলতা, কিন্তু যে রূপ রুদ্র, তাহার মধ্যে রহিয়াছে ভীষণতা এবং প্রচণ্ড শক্তির আভাস।

বিক্রমও আজ যে পথে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা কোমলতার পথ নহে। তাহার মধ্যে প্রেম নাই, আছে হিংসা, কিন্তু তাহা প্রচণ্ড, তাহা দৃপ্ত, পৌরুষপূর্ণ। বিক্রম তাই উল্লসিত, আপনার মধ্যে যে প্রচণ্ড শক্তি লুক্কায়িত ছিল, তাহার দিকে চাহিয়া তিনি নিজেই বিস্মিত—বন্ধনমুক্তির এক অপরিসীম আনন্দে তাঁহার চিত্ত আন্দোলিত হইয়া উঠিতেছে।

সেনাপতি, পালাও, পালাও—সুমিত্রার এই আবির্ভাবের জন্য বিক্রমদেব বিন্দুমাত্র প্রস্তুত ছিলেন না। যে জয়সেনকে তিনি পরাজিত করিতে বা ধরিতে পারেন নাই, সেই বন্দী-জয়সেন সহ সুমিত্রা শিবির-দ্বারে উপস্থিত। তাঁহার এই আবির্ভাব বিক্রমের কাছে শুধু যে অপ্রত্যাশিত তাহাই নহে, ইহা তাহার পৌরুষকেও যেন লজ্জা দিয়াছে। তাহারই গ্লানির হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য বিক্রম পালাইবার কথা বলিতেছেন।

কাহার সাথে! রমণীর সনে সাক্ষাতের এ নহে সময়—সুমিত্রাকে লক্ষ্য করিয়া বিক্রম কহিতেও ছাড়িলেন না। অথচ এই সুমিত্রাকে পাইবার জন্যই তাঁহার সমস্ত অন্তর প্রতীক্ষা করিতেছিল। ইহাকেই বলে Dramatic irony!

দ্বিতীয় দৃশ্য :

মাস বিদায় হয়—দেবদত্ত স্ত্রীর সহিত পরিহাস করিতেছে।

হা ভগবান মকরকেতন—প্রেমের দেবতা মদন বা অনঙ্গদেব।

পুষ্পশর—মদনের পঞ্চবাণ।

শক্তিশেল—শক্তিশালী অস্ত্র বিশেষ। তুলনীয় 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'।

শিখরদশনা ইত্যাদি—কালিদাসের মেঘদূতে বিরহিণী প্রিয়ার রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—

তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।

—এখানে দেবদত্ত শিখরদশনা ইত্যাদি বলিয়া স্ত্রীর সহিত পরিহাস করিতেছে।

মহাবীর ধূম্রলোচন—মার্কণ্ডেয় চণ্ডী (পুরাণ)-এর অন্তর্গত চণ্ডী মাহাত্ম্যের কাহিনীতে আছে যে, মহাবীর ধূম্রলোচনকে দুর্গা বধ করিয়াছিলেন।

রাজার শরীরে কলি প্রবেশ করেছে—কলি সাধারণতঃ পাপ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে বলা যায়, রাজার মধ্যে কলিযুগের প্রভাব দেখা যাইতেছে। অর্থাৎ রাজা পাপের আশ্রয় লইতেছেন।

মলয় সমীরণ তোমার কিছু করতে পারবে না—সাধারণতঃ বলা হয় যে, বসন্তের বাতাসের স্পর্শে বা দাখনা-বায়ুর স্পর্শে বিরহীর হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠে। দেবদত্ত পরিহাসভরে বলিতে চায় যে, তাহার অবর্তমানে তোমার (তাহার স্ত্রী নারায়ণীর) সেইরূপ অবস্থা ঘটিবে না।

তৃতীয় দৃশ্য :

ক্ষমা, তার চেয়ে বীরত্ব অধিক—ক্ষমা করার মধ্যেও থাকে প্রচণ্ড ক্ষমতা; একমাত্র শক্তিমানই ক্ষমা করিতে পারে এবং তাহার মধ্যে যে বীরত্ব রহিয়াছে, তাহা যুদ্ধের রণাঙ্গনের বীরত্বের অপেক্ষা অধিকতর গৌরবের বিষয়। কুমারসেন সেই কারণেই বিক্রমের ঔদ্ধত্যকে ক্ষমা করিতে চায়।

অবশ্য, আরো গভীরতর দৃষ্টিতে কুমারের এই ক্ষমাকে অন্যভাবে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। কুমার বোঝে—সুমিত্রা বাহিরে যে ভাবই দেখান না কেন, আসলে বিক্রমের প্রতি দুর্বলতা রহিয়াছে। তাই সুমিত্রা কুমারকে বলিয়াছেন বিক্রমকে ক্ষমা করিবার জন্য। কুমার সুমিত্রার সেই মনোভাব লক্ষ্য করিয়াই ক্ষমার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছে। ইহার মধ্যে অবশ্য সুমিত্রার প্রতি তাহার গভীর প্রীতির পরিচয় রহিয়াছে।

সৈন্যদের জানাও আদেশ, এখনি ফিরিতে হবে কাশ্মীরের পথে—সুমিত্রার প্রতি কুমারের অনুরাগের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। বিক্রমদেব কুমারকে অপমান করিয়াছেন; কুমার সেই অপমান নীরবে সহ্য করিয়াছে শুধু সুমিত্রার কথা ভাবিয়া। পাছে সুমিত্রা দুঃখ পান, সেইজন্যই সমস্ত অপমান স্বীয় মস্তকে পাতিয়া লইয়াও কুমার প্রত্যাগমনের আদেশ দিয়াছে।

পলাতক অপরাধী...... ব্যর্থ হয় তবে—একদা যুধাজিৎকে শাস্তি দিবার জন্যই বিক্রমদেব যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভাগ্যের পরিহাসে আজ সেই যুধাজিতের দল বিক্রমকে উত্তেজিত করিতেছে নিরপরাধ কুমারের বিরুদ্ধে!

বালক সে, ইত্যাদি—যদিও বিক্রম কুমারকে পরাজিত করিবার জন্য ব্যগ্র, তথাপি কুমারের প্রতি সহানুভূতিমিশ্রিত স্নেহ ভাবও রহিয়াছে। বিক্রমের এই উক্তি হইতে তাহা সহজেই অনুভব করা যায়। এবং বিক্রমের এই উক্তির মধ্যে তাঁহার উদার চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়।

দেখি কোথা গিয়া পড়ি—বিক্রম যেন নদী-স্রোতে ভাসমান তৃণখণ্ডের মতোই নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। তাই শেষ পর্যন্ত বিবেকহীন অবস্থায় জয়সেনের প্ররোচনায় কুমারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়া জীবনের চরম ট্রাজেডিকে ডাকিয়া আনিলেন।

কোথা পাই কূল—ইহা যেন বিক্রমের অসহায় আর্তনাদ। এই সামান্য কথাটুকুর মধ্যে তাঁহার রিক্ত বিড়ম্বিত জীবনের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে।

চূর্ণিবে সে লোকালয়—বিক্রম নিজের প্রতি সম্বোধন করিয়াই এই কথা দেবদত্তের উদ্দেশে বলিয়াছেন। এখানে 'সে' শব্দে বিক্রম নিজেকে প্রমত্ত নদীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। প্রমত্ত নদী যেমন দুই তীরের জনপদ ভাসাইয়া দেয়, তেমনি বিক্রমও রুদ্রমূর্তি ধারণ করিয়াছেন। একদিন সুমিত্রা তাঁহাকে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য বলিয়াছিল। আজ সুমিত্রা তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত নাই, কিন্তু বিক্রম সত্যই যুদ্ধে ঝাঁপ দিয়াছেন। এখন আর তাঁহার সম্মুখে কোন মোহ বা বন্ধন নাই, তাই তিনি যেন যুদ্ধের নেশায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। সেইজন্যই বিক্রম নিজেকে প্রমত্ত মহানদীর সহিত তুলনা করিতেছেন;—ধ্বংস করাই তাঁহার লক্ষ্য।

আমি ধেয়ে চলি—বিক্রম যেন নিয়তির টানে প্রবল বন্যার মতো ধ্বংসের নেশায়, প্রলয়ের আনন্দে যুদ্ধে মাতিয়া উঠিয়াছেন।

প্রচণ্ড আনন্দ অন্ধ—একজন নেশাগ্রস্ত বা মদমত্ত ব্যক্তি যেমন মুহূর্তের আনন্দে অন্ধ হইয়া মদ্যপান করিতে থাকে, তার ফল বিষময় জানিয়াও তাহা হইতে বিরত হয় না, তেমনি এক অন্ধ ভ্রান্ত আনন্দের বশবর্তী হইয়া বিক্রম নিজেকে যুদ্ধের আগুনে সঁপিয়া দিয়াছেন।

মুহূর্ত তাহার পরমায়ু—বিক্রম জানেন, নেশা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। তেমনি তাঁহার এই প্রমত্ততাও বেশীক্ষণ স্থায়ী হইবে না।

জড় সিংহাসন—বিক্রম চাহিয়াছিলেন প্রেম, রাজ-ঐশ্বর্যের মধ্যে বাঁধা পড়িতে চাহেন নাই। কিন্তু নিয়তির পরিহাসে তাহা ব্যর্থ হইয়া গেল। যে সুমিত্রাকে তিনি সমস্ত হৃদয় দিয়া ভালোবাসিয়াছিলেন, সেই সুমিত্রা আজ বহু দূরে। অথচ, শুধু মাত্র কর্তব্যের জন্যই যুদ্ধের আগুনে পুড়িয়া মরিতেছেন। কাজেই সুমিত্রাহীন রাজ্য বা রাজ-সিংহাসন তাঁহার নিকট ব্যর্থ মনে হইতেছে। সুমিত্রার সঙ্গে সঙ্গে যেন জীবনের সমস্ত আনন্দ চলিয়া গিয়াছে। তাই রাজ-কর্তব্যকে বলিতেছেন—'জড় সিংহাসন'।

পঞ্চম অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য :

মিত্র আসিতেছে—বিক্রমদেব কাশ্মীর অধিকার করিতে আসিতেছেন শুনিয়া রেবতী উল্লসিত, কারণ, তাহা হইলে কুমার সিংহাসন লাভ করিতে পারিবে না। রেবতীর এই গুপ্ত বাসনার জন্যই সে বিক্রমদেবকে 'মিত্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে। তাহার বিশ্বাস, বিক্রম কাশ্মীর জয় করিলে সিংহাসন তাহাদের অধিকারে আসিবে—'তার পরে ফিরে নিয়ো বন্ধুভাবে'। পূর্বেই বলিয়াছি, রেবতী চরিত্র লেডী ম্যাকবেথের আদর্শে অঙ্কিত। এখানে রেবতীর ক্রুর স্বভাব উদ্‌ঘাটিত হইয়া উঠিয়াছে।

যুদ্ধের ছলনা করে পরাজয় মানিবারে চাও—ইহা বলিয়া রেবতী চন্দ্রসেনকে উত্তেজিত করিতেছে।

আপনারে ছদ্মবেশী চোর বলে সন্দেহ জনমে—চন্দ্রসেনের চরিত্রের মধ্যে সৎ ও অসতের যুগপৎ সন্নিবেশ দেখিতে পাই। সে রেবতীর মতো সম্পূর্ণভাবেই villain চরিত্র নহে, তাহার মধ্যে ঐ দুইয়ের দ্বন্দ্ব দেখিতে পাই। এই

উক্তির মধ্যে দেখি, চন্দ্রসেন আত্মবিশ্লেষণ করিয়া আত্মগ্লানিতে নিজেকে ধিক্কার দিয়াছে। যেন তাহার কাছে নিজের হীনতা ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

অরণ্যে গমন ভালো, মৃত্যু ভালো—এই কথা বলিয়া অভিমানভরে রেবতী চন্দ্রসেনকে পাপকার্যে প্রবোচিত করিতেছে।

পারি নে লুকাতে আমি হৃদয়ের ভাব—রেবতীর এই উক্তিকে আত্ম-স্বীকৃতি বা confession বলা চলে।

সে যদি আসিল গৃহে…… ··করিব সম্ভাষণ?—চন্দ্রসেনের চরিত্রে দেবাসুরের দ্বন্দ্ব রহিয়াছে। রেবতী বারবার তাহার অসুর-সত্তাকে জাগাইতে চাহিয়াছে। এই উক্তির মধ্যে দেখি, রেবতীর উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইয়াছে অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত চন্দ্রসেনেরও নগ্ন বাসনা প্রকাশ পাইয়াছে।

কাশ্মীরের সিংহাসন?—এতদিনে রেবতীর স্বরূপ কুমারের কাছে ধরা পড়িল। রেবতীর এই উক্তির মধ্যে তাহার নগ্ন-কামনার মূর্তিটি প্রকটরূপে ধরা পড়িয়াছে।

নারী হয়ে রাজকার্যে দিয়ো না হাত—সুমিত্রা রেবতার স্বরূপ বুঝিতে পারিয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিতেছেন।

যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব, রাজ্যরক্ষা—নারীর স্থান অন্তঃপুরে, জীবনের কল্যাণময় রূপের মধ্যে অর্থাৎ অন্তর্লোকেই নারী-জীবনের সার্থকতা। নারী যদি বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে সমস্যা দেখা দিবে। কেননা, নারী-জীবন মূলতঃ অন্তর্মুখী। পুরুষের জীবন তাহার বিপরীত। যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব, রাজ্যরক্ষা ইত্যাদির মধ্যে অকল্যাণ রহিয়াছে; স্বভাবতঃই তাহা নারীর অভিপ্রেত হইতে পারে না। সুমিত্রা রেবতীকে তাহাই বলিতে চান।

নির্দয় বিলম্ব তব—শেষ পর্যন্ত কুমারের কাছেও চন্দ্রসেনের হীন উদ্দেশ্য স্পষ্টরূপে ধরা পড়িয়াছে।

প্রাণে বাজে, ইচ্ছা করে··· ·····আঘাত বেদনা—চন্দ্রসেনের এই উক্তির মধ্যে দেবাসুরের দ্বন্দ্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য:

পথে অনেক মামা বসে আছে—মামা বলিতে এখানে শত্রুকে বুঝাইয়াছে। কাশ্মীরে যে বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে, এই উক্তির মধ্যে তাহার ইঙ্গিত রহিয়াছে।

আপাততঃ লড়তে হবে—যুবরাজ কুমারের প্রতি সাধারণ লোকের গভীর ভালোবাসার পরিচায়ক এই উক্তি।

যমের দুয়ার খোলা পেয়ে—এই গানটির মধ্যে জনসাধারণের উল্লসিত হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

তৃতীয় দৃশ্য :

আপনি মজিবে তুমি—কুমারের বিড়ম্বিত জীবনের চিত্র। দুর্ভাগ্য তাহার পিছু লইয়াছে, তাই অমরুরাজও তাহাকে আশ্রয় দিতে নারাজ। মনে হয়, নিয়তিই যেন তাহাকে এমনি করিয়া মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দিতেছে।

ইলারে দেখিয়া যাব একবার শুধু—আসন্ন মৃত্যুপথযাত্রী কুমারের হৃদয় ইলার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

ফিরে এসে দেখা দিব—কুমার একদা ইলাকে বলিয়াছিল, আবার সে তাহার কাছে ফিরিয়া আসিবে; তাই সে ইলার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে। চির-বিদায়ের আগে কুমারের হৃদয় এইভাবে ইলাকে একান্তভাবে শুধু দেখিবার আশায় আকুল হইয়া উঠিয়াছে। এই উক্তির মধ্যে কুমারের প্রেমের গভীরতা উপলব্ধি করা যায়।

চতুর্থ দৃশ্য :

কেনই বা না ভুলিবে, কী আছে আমার—কুমারের প্রতি ইলার অন্তর অদর্শনজনিত অভিমানে ভরিয়া উঠিয়াছে!

ভুলে যদি সুখী হয় সেই ভালো—ইলার ধারণা হইয়াছে যে, কুমার তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু, ইহার জন্য অভিমান থাকিলেও কুমারের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই। বরং, সর্বস্ব সমর্পণ করিতে পারিলেই যেন তাহার সুখ এবং তাহার প্রেমের চরিতার্থতা।

হতভাগিনী ইলা কল্পনা করিতেও পারে নাই যে, কুমার দ্বারে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে।

বস্তুতঃ, এই উক্তির মধ্যে ইলার প্রেমের স্বরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইলার এই প্রেমকে বলা যায় ভীরু ভালোবাসা। 'কল্পনা' কাব্যের 'মার্জনা' কবিতার মধ্যেও এমনি এক প্রেমের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

পঞ্চম দৃশ্য :

সে না হলে সুখ নাই, নিদ্রা নাই মোর—বিক্রমের সমস্ত রোষ ঘনাইয়া উঠিয়াছে কুমারের বিরুদ্ধে। একদা বিক্রম যুদ্ধে নামিয়াছিলেন, জয়সেন প্রমুখ অত্যাচারী রাজ-নায়কদের শাস্তি দিবার জন্য। কিন্তু অকস্মাৎ সেই যুদ্ধের গতি ও লক্ষ্য পরিবর্তিত হইল। যে সুমিত্রা ও কুমার তাঁহার প্রিয় পাত্র ছিল, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল তাহাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। বিক্রমের ধারণা, কুমারই সুমিত্রাকে যুদ্ধে প্ররোচিত করিয়াছে। কাজেই তাহার সমস্ত রোষ বর্ষিত হইয়াছে কুমারের উপর।

ব্যাখ্যা :

রাজ্য মোর রয়েছে পড়িয়া…… ……শত্রু পলাতক—সুমিত্রা যেদিন কুমারের সাহায্যে জয়সেনকে বন্দী করিয়া বিক্রমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিল, সেইদিন হইতেই বিক্রমের সমস্ত অন্তর সুমিত্রার প্রতি বিরূপ হইয়াছিল। বস্তুতঃ, কুমারের সাহায্যে শত্রুদমন বিক্রমের পৌরুষকে গভীরভাবে আঘাত করিয়াছিল। সেইজন্যই তাঁহার সমস্ত রোষ বর্ষিত হইয়াছে কুমারের উপর।

তারপর কুমারের প্রতি এই রোষ দিনে দিনে বর্ধিত হইয়াছে, তাহাতে ইন্ধন যোগাইয়াছে জয়সেন প্রভৃতির কুমন্ত্রণা। এই জন্যই, তাহাকে বন্দী করিবার জন্যই, বিক্রম কাশ্মীরেও আসিলেন।

কিন্তু দেখা গেল, যাহাকে তিনি বন্দী করিতে চান, সে-ই তাহাকে এক কঠিন বন্ধনে বন্দী করিয়া ফেলিয়াছে। যুদ্ধের জন্য রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়িয়াছে, রাজ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে—তথাপি তিনি এক মিথ্যা দম্ভের বশবর্তী হইয়া অন্ধকারে পাড়ি দিয়াছেন অর্থাৎ নিজের জালে নিজেই জড়াইয়া পড়িয়াছেন। আত্মগ্লানিতে বিক্রমের অন্তর ভরিয়া উঠিয়াছে; তিনি জানেন যে, যে-পথে চলিয়াছেন তাহা সত্য নহে, তথাপি সেই স্রোতেই গা ভাসাইয়া দিয়াছেন

বিক্রম যেন নিজের জীবনের বিড়ম্বনা ও ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইয়াছেন।

এ হিংসা আমার…… ……উন্মাদ দুর্নিবার—মদোন্মত্ত ব্যক্তি যেমন বিবেকহীন হইয়া আপনাকে মত্ততার কাছে সমর্পণ করিয়া অসহায়ের মতো দুর্বিপাকের স্রোতে চলিতে থাকে, সুরার তীব্র

নেশার কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া যেমন মৃত্যুর স্রোতে গা ভাসাইয়া দেয়, তেমনি বিক্রমদেবও যুদ্ধের নেশায় উন্মত্ত হইয়া তেমনি এক নিষ্ঠুর নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। তিনি যুদ্ধে নামিয়াছিলেন অন্য উদ্দেশ্যে—অত্যাচারীর শাস্তি বিধান করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু পরিবেশ ও ঘটনার আবর্তে তাহার লক্ষ্য পরিবর্তিত হইয়া গেল—তিনি নেশাচ্ছন্ন হিংসান্ধ ব্যক্তির ন্যায় এক নির্দোষকে ধরিবার আশায় অগ্রসর হইলেন।

বিক্রমের সমস্ত রোষ বর্ষিত হইয়াছে কুমারের উপর। কারণ তাঁহার ধারণা হইয়াছে—কুমারই তাঁহার হৃদয়ের ধ্রুবতারা প্রিয়তমা সুমিত্রাকে ছিনাইয়া লইয়াছে। বস্তুতঃ, কুমারের প্রতি এই মনোভাব বা হিংসার বশবর্তী হইয়াই তিনি যুদ্ধের আগুনে ঝাঁপ দিয়াছেন। তাঁহার এই হিংসার মূলে রহিয়াছে পৌরুষের অভিমান, এই অভিমানের জন্যই তিনি হতভাগ্য নির্দোষ কুমারের প্রতি এমনভাবে হিংস্র হইয়া উঠিয়াছেন।

সুতরাং, দেখা যাইতেছে, বিক্রমের এই মনোভাব নিন্দনীয় হইলেও ঘৃণ্য বা হীন নহে। বিক্রমের বাত্যাহত প্রেমই এমন ভীষণ রূপ ধারণ করিয়াছে।

কুমার যদিও বিক্রমের প্রতি-নায়ক হইবার যোগ্য নয়, কারণ তাহার মধ্যে দৃপ্ত পৌরুষ নাই, তথাপি, বিক্রম তাহাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবিয়াছেন। বিক্রম যাঁহাকে প্রেমের দ্বারা সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াও জয় করিতে পারেন নাই, কুমার তাহাকে প্রীতি ও স্নেহে জয় করিয়া লইল—ইহা বিক্রমের কাছে অচিন্ত্যনীয় এবং অপ্রত্যাশিত এবং ইহাই তাঁহার পৌরুষের অভিমানকে আঘাত করিয়া এমন ভীষণ হিংস্র করিয়া তুলিয়াছে। অবমানিত পৌরুষের জ্বালাতেই তাঁহার অন্তর জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে সত্যই কোন হীনতা নাই। বিক্রমের উক্তি যেমন আত্মবিশ্লেষণমূলক, তেমনি তাহা তাঁহার চরিত্রের এক উজ্জ্বল দিক উদ্ঘাটিত করিয়াছে। বিক্রম কুমারকে পরাজিত করিতে চান হীন স্বার্থের জন্য নহে।

বিক্রম এই নাটকের নায়ক। ট্রাজেডির নায়ক রূপে তাঁহার মধ্যে আমরা পৌরুষ ও মহত্বের পরিচয় পাই। এই স্বগতোক্তিও তাহারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ষষ্ঠ দৃশ্য :

জাগিয়াছি দুঃস্বপ্ন দেখে—কুমার যেন অনুভব করিয়াছে, তাহার জীবন-প্রদীপ নিভিতে আর বেশী দেরী নাই।

শুনি যেন পদশব্দ কার—মৃত্যুর আভাস।

জীবনের প্রতি বিন্দুটিতে যত মিষ্টি আছে, সব আমি পেয়েছি আস্বাদ—আসন্ন মৃত্যুর আভাস পাইয়াছে কুমার, কিন্তু তাহার জন্য মনে কোন বেদনা নাই। জীবন ও মৃত্যু—দুই-ই তাহার কাছে মধুময়। মনে হয়, কুমারের এই মনোভাবের মধ্যে মৃত্যু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কী ধারণা, তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। মৃত্যুকেও রবীন্দ্রনাথ কখনো অমৃতহীন বা নিরানন্দ মনে করেন নাই। এখানে দেখি, কুমারও মৃত্যুকে বন্ধুর মতো আলিঙ্গন করিতেছে।

আশীর্বাদ করো যেন—শিকারীর এই উক্তির মধ্যে কুমারের রাজ্যব্যাপী জনপ্রিয়তার চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে।

•

সপ্তম দৃশ্য :

সহকার মাধবিকা-লতার আশ্রয়—অভিজ্ঞান শকুন্তলম্-এ এই উপমাটি আছে। মাধবিকা লতা যেমন সহকারের আশ্রয়ে বাড়িয়া উঠে, তেমনি অমরুরাজ-কন্যা ইলাও বিক্রমকে স্বামীরূপে পাইলে ধন্য হইবে—ইহাই অমরুরাজের বক্তব্য।

তবে লহো এ জীবন·········নিয়ে যাও—ইলা নিজেকে তীরবিদ্ধ হরিণীরূপে তুলনা করিয়াছে। বিক্রমকে সে বলিতে চায়, জীবন থাকিতে বিক্রমকে স্বামীরূপে কল্পনা করা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়।

সমস্ত স পেছি যারে ইত্যাদি—এই উক্তির মধ্যে কুমারের প্রতি ইলার এক গভীর প্রেমের চিত্র ফুটিয়াছে। ধূপ যেমন আপনাকে দগ্ধ করিয়া সমস্ত সৌরভটুকু ঢালিয়া দিয়া নিঃশেষ হইয়া যায়, তেমনি ইলাও কুমারের জন্যই তাহার জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছে। তাহার প্রেম এমনিই যে, তাহার হৃদয়কেও হরণ করিয়া লইয়া কুমারের চরণে সমর্পণ করিয়াছে। বস্তুতঃ,

ইহাই মহৎ প্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এবং ইলা চরিত্রের সমস্ত মাধুর্য এই প্রেমের মধ্যে তিলোত্তমা রূপ ধারণ করিয়াছে।

সাবধান, অতি প্রেম সহে না বিধির—বিক্রমও সমস্ত অন্তর দিয়া সুমিত্রাকে ভালোবাসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে পান নাই। বিক্রম বলিতেছেন, যে, ইলা যদি তাহার প্রিয়তমকে এমনি গভীরভাবে ভালোবাসিয়া থাকে, তবে তাহার পরিণতি সুখের হইবে না।

তোমারি সে বন্ধু বুঝি !—Dramatic irony! ইলা জানে না যে, কুমার বিক্রমের জন্যই পলাতক, আর বিক্রমও জানেন না যে, পলাতক কুমার এতো ভাগ্যবান, এক রমণীর অন্তরে ধ্রুবতারার মতো জাগরূক রহিয়াছে।

দেবী, চাহি নে তোমার প্রেম—যে মুহূর্তে বুঝিলেন যে ইলার সমস্ত অন্তর কুমারের জন্যই প্রতীক্ষা করিয়া আছে, তখনই তিনি বুঝিলেন যে, জোর করিয়া কাহারও প্রেম বা হৃদয় অধিকার করা যায় না।

ব্যাখ্যা :

গৃহহীন পলাতক.........সম্পদের মতো—সৃষ্টির মূলে থাকে প্রেরণা এবং নারীর প্রেম পুরুষের জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেরণা। যে পুরুষ সেই প্রেম লাভ করে, তাহার জীবন ধন্য হয়, সে তখন মৃত্যুকে হাসিমুখে বরণ করিয়া লয়। এবং যে পুরুষ সেই নারী-প্রেম লাভ করিতে পারিল না, তাহার মতো হতভাগ্য আর কেহ নাই। বস্তুতঃ, নারী-প্রেম পুরুষের জীবনে পরম ঐশ্বর্য—যে পায়, সে নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান।

বিক্রম সুমিত্রার প্রেমের কাঙাল, সমস্ত দিয়া সুমিত্রার প্রেম লাভ করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু সুমিত্রাকে একান্তভাবে সব কিছু হইতে বিচ্ছিন্নভাবে পাইতে গিয়া তাঁহার ভাগ্যে সেই প্রেমলাভ ঘটিল না। সেইজন্যই তাঁহার অন্তর আজ শূন্য। তিনি যুদ্ধে জয়ী হইয়াছেন ঠিক, কিন্তু তাঁহার অন্তর শূন্য মরুর মতোই হাহাকার করিতেছে।

অন্যদিকে সর্বস্ব হারাইয়াও কুমারের জীবনে কোন গ্লানি বা দুঃখ নাই। কারণ, ইলার প্রেম তাহার জীবনে এমন এক প্রেরণা যোগাইয়াছে, যে, কুমার হাসিমুখে সমস্ত ঝঞ্ঝাকে বরণ করিয়া লইয়াছে।

বিক্রম ভালোবাসিয়াছেন কিন্তু প্রতিদানে ভালোবাসা পান নাই। তিনি

যখন কুমারের প্রতি ইলার প্রেমের পরিচয় পাইলেন, তখন যথার্থ প্রেমের স্বরূপ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন। এক মুহূর্তে বুঝিতে পারিলেন যে, মানুষের জীবনে বাহিরের ঐশ্বর্য যতই থাক্ না কেন, যে জীবন নারীর প্রেম-লাভ করিতে পারিল না, সে জীবন ব্যর্থ, বিড়ম্বিত।

তাই নিজের সহিত কুমারের তুলনা করিতে গিয়া মনে হইল, পলাতক হতভাগ্য কুমার বাস্তবিকপক্ষে তাঁহার চেয়ে অনেক বেশী ভাগ্যবান, বুঝিলেন সব হারাইয়াও কুমার সুখী এবং সব থাকা সত্ত্বেও তিনি নিঃস্ব।

বলা বাহুল্য, কুমার সম্পর্কে যে মুহূর্তে ঐ ধারণা হইল, সেই মুহূর্তেই কুমার সম্পর্কে তাঁহার মনোভাব পরিবর্তিত হইল। যাহাকে একদিন শত্রু ভাবিয়াছিলেন, আজ তাহাকে অনেক বড়, অনেক মহৎ বলিয়া মনে হইল। বস্তুতঃ, ইলার প্রেমের পরিচয় পাইয়াই যেন বিক্রমদেব নূতন মানুষ হইয়া উঠিলেন—তাঁহার জীবনাকাশ হইতে সমস্ত মেঘ দূর হইবার সঙ্গে সঙ্গে আবার তাঁহার মহৎ রূপটি উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিল, তাঁহার নবজন্ম হইল।

বিরহব্যথায় মেঘদূত কাব্যখানা—কালিদাসের মেঘদূত বিরহের কাব্য। 'প্রাচীন সাহিত্যে' রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, মেঘদূতের মধ্যে মানুষের অনন্ত বিরহ রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে।

বিরহ সামান্য নয়—দেবদত্তের চরিত্রের মধ্যে বিদূষকের গুণের আভাস পাওয়া যায়, সব কথাতেই পরিহাসের সুর লাগিয়া থাকে। কিন্তু সেও বিরহযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে।

এরেও ছাড়ে না পঞ্চবাণ—অর্থাৎ দেবদত্তের জীবনেও প্রেমের স্পর্শ লাগিয়াছে।

মনে পড়ে পুণ্যবতী জানকীর কথা—বন্দিনী সীতা যেমন অকারণে দুঃখ পাইয়াছিলেন, তেমনি সুমিত্রাকেও অকারণে দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছে। এই উক্তির মধ্যে সুমিত্রার প্রতি দেবদত্তের গভীর শ্রদ্ধার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বললে পিত্তয় যাবি নে—পিত্তয় প্রত্যয় শব্দের তদ্ভব রূপ বা অপভ্রংশ। অর্থাৎ বললে তোর বিশ্বাস হবে না।

সে আমার ধ্রুবতারা..................করিব ধারণ—মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া কুমারের হৃদয়ের ইলার মূর্তি ভাসিয়া উঠিয়াছে। ইলার অনির্বাণ

প্রেমের আলোকে তাহার চিত্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে; তাই সে হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করিতে পারিয়াছে।

কুমার বলিতে চায়, পূর্ণিমার রাত্রে ইলার সহিত মিলিত হইবার কথা কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে ইহজীবনে তাহার সহিত মিলনের পথ চিরতরে রুদ্ধ হইয়া গেল। দীর্ঘদিন সে অরণ্যে ফিরিয়াছে, অরণ্যই আজ তাহার গৃহ। তাহার জন্যই, রাজ্যের অসহায় প্রজাদের উপর দিনের পর দিন অত্যাচার হইয়াছে। এইসব দুঃখ কুমারের অন্তরে দীর্ঘদিন ধরিয়া সঞ্চিত হইয়াআছে। তবু, ইহার মধ্যে আশা ছিল, একদিন ইলার সহিত মিলন হইবে। কিন্তু যখন কুমার অনুভব করিল যে, তাহার জন্য অসংখ্য নিরীহ প্রাণবলি দিতেছে, তখনই তাহার কাছে জীবন অর্থহীন হইয়া উঠিল। অপরের জীবনের বিনিময়ে বাঁচিয়া থাকা তাহার কাছে গ্লানিকর মনে হইল—তাই সে মৃত্যু কামনা করিয়াছে। তাহার বিশ্বাস—একমাত্র মৃত্যুর মধ্যেই সমস্ত দুঃখ ও গ্লানির অবসান ঘটিবে, তিলে তিলে জীবন্মৃত হইয়া বাঁচিয়া থাকার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার ইহাই একমাত্র পথ।

নবম দৃশ্য ঃ

মহারাজ, নহে ইহা কুমারসেনের মতো কাজ—চন্দ্রসেনও জানে, আত্মসমর্পণের গ্লানি মাথা পাতিয়া লইতে কুমার কখনো রাজী হইবে না। ইহার চেয়ে বরং মৃত্যু তাহার নিকট শ্রেয়ঃ। তাই চন্দ্রসেন কুমার সম্বন্ধে বলে—"দৃপ্ত যুবা সিংহসম।"

চিরভৃত্য তব আজি, ইত্যাদি—বৃদ্ধ শঙ্কর কুমারকে জানে। অপমানের চেয়ে মৃত্যুই যে কুমারের কাম্য—শংকর তাহা জানে। কাজেই, যখন সে জানিতে পারিল যে, কুমার রাজার কাছে স্বয়ং ধরা দিবার জন্য আসিতেছে, তখন সে মৃত্যু কামনা করিল, কারণ ইহা অপেক্ষা গ্লানিকর আর কিছুই নাই।

দণ্ড ভালো মার্জনার চেয়ে—শঙ্কর বলিতে চায়, দুর্বল ব্যক্তিই ক্ষমা ভিক্ষা করে। কিন্তু কুমারকে তো দুর্বল বলা যায় না। সুতরাং, তাহাকে ক্ষমা করার প্রশ্নই উঠে না, বরং সে দণ্ড ভোগ করিতেও রাজী, কারণ তাহার মধ্যে ভীরুতা, দুর্বলতা বা হীনতা নাই।

এসো এসো, বন্ধু, এসো!—Dramatic irony! বিক্রম ইহার অব্যবহিত পরবর্তী ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাই কুমারকে লক্ষ্য

করিয়া, বন্ধুরূপে তাহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্যই দুই হাত বাড়াইয়া দিয়াছেন।

'পূর্ণ তব মনস্কাম ···· ····সুখী হও তুমি—সুমিত্রাও রাজার মনোভাব পরিবর্তনের কথা জানিতে পারেন নাই, অবশ্য জানিবার সুযোগও ছিল না। একদিন কুমারকে বন্দী করিবার জন্য বিক্রম পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে তাঁহার ভুল ভাঙিয়া গেল, তিনি নবজন্ম লাভ করিলেন। ট্রাজেডি এই যে, তাঁহার এই মানস-পরিবর্তনের পরিচয় কেহই পাইল না। তাই যখন সমস্ত অন্তর দিয়া বিক্রম এক শান্তিপূর্ণ মুহূর্তের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই ঐ অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিয়া গেল, সুমিত্রা তাঁহাকে শান্ত নিষ্কম্প বিকারে জর্জরিত করিয়া চিরবিদায় লইলেন!

সুমিত্রা ভাবিয়াছিলেন যে, বিক্রম কুমারের ছিন্নমুণ্ড পাইলেই খুশী হইবেন, সমস্ত ঝড় থামিয়া যাইবে। তাই তিনি ঐ উক্তি করিয়াছেন।

এই নাটকের শেষ পরিণতিতে যদিও দুইটি মৃত্যু আকস্মিকভাবে ঘটিয়াছে, তথাপি তাহার মধ্যে ট্রাজেডির রস অনুভব করা যায়। সুমিত্রার এই উক্তির মধ্যেই তাহার আভাস পাওয়া যায়।

এ রোষ রবে না চিরদিন—রেবতীকে পূর্বে যে রূপে দেখিয়াছি, নাটকের শেষেও সেই রূপেই দেখিতেছি। চন্দ্রসেনেরও চরিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু রেবতী পূর্বের মতোই অটল। সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্যে রেবতীর মতো দ্বিতীয় villain চরিত্র আছে কিনা সন্দেহ!

দেবী, যোগ্য নহি ·· ·······কঠিন বিধান—লোকান্তরিতা সুমিত্রার চরণতলে বিক্রমের অন্তিম প্রার্থনা। শেষে মৃত্যুর মধ্য দিয়াই বিক্রমের কাছে সুমিত্রা ধরা দিলেন, বিক্রম বুঝিতে পারিলেন, যে, তিনি সুমিত্রার প্রেমের যোগ্য নহেন। যে আগুন তিনি জ্বালিয়াছিলেন, সেই আগুনে সুমিত্রাকে দগ্ধ হইতে হইল। বিক্রমও মনে মনে আত্মগ্লানির তুষানলে দগ্ধ হইতেছিলেন। সুমিত্রার কাছে ত্রুটি স্বীকার করিবারও সুযোগ পাইলেন না। এইভাবে মৃত্যুর মধ্য দিয়া সুমিত্রা তাঁহাকে দেবতার কঠিন বিধানের মতো ক্ষমাহীন শাস্তি দিয়া গেলেন। ক্ষমাহীন শাস্তির অগ্নিদহনে দগ্ধ হইবার জন্য বিক্রমকে বাঁচিয়া থাকিতে হইল—'রাজা ও রানী' নাটকের ইহাই যথার্থ ট্রাজেডি।

সংযোজন

রাজা ও রানী নাটকে শেক্‌স্‌পীয়রের প্রভাব

রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্য রবীন্দ্রনাথের কবিধর্মেরই এক ক্রমবিকশিত সংস্করণ। জীবনকে তিনি রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের বাতায়ন দিয়া নিরীক্ষণ করিয়াছেন, অদূরবর্তী বিশ্ব তাঁহার প্রেম ও সৌন্দর্যের রহস্যময় গুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া কবির নিকট ধরা দিয়াছে। সেই পরিচয়ের বিস্ময়-পুলকেই রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্যশিল্প স্পন্দিত। নাটকের মধ্যে জীবনের কোনো গভীর প্রবৃত্তিদ্বন্দ্ব, বাসনার সংঘাত, পরস্পর-বিরোধী চরিত্রের বিচিত্র বৈপরীত্য ফুটাইয়া তোলেন নাই। বিশ্বের রাজাধিরাজ যেমন তাঁহার অনন্ত অসীমতাকে রূপের মধ্যে বিধৃত করিয়া লীলার সম্বন্ধে মানুষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়ান, রবীন্দ্রনাথও সেইরূপ তাঁহার সৃষ্ট জগতের সহিত লীলার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। নাটকে নিজেকে তিনি কোথাও গোপন করিতে পারেন নাই, নিরপেক্ষতা ও নিরাসক্তি তাঁহার স্বভাব নয়। এই দিক দিয়া বিচার করিলে শেক্‌স্‌পীয়রীয় নাট্যরীতির অনুবর্তন তাঁহার সজ্ঞান চেতনায় সম্ভব নয়।

তথাপি শেক্‌স্‌পীয়র রবীন্দ্রনাথের আয়ত্ত ছিল এবং নাট্যজীবনের ভূমিকায় শেক্‌স্‌পীয়রের প্রভাবও তাঁহার কয়েকটি নাটকে লক্ষ্য করা যায়। নিঃসন্দেহে রাজা ও রানী, বিসর্জন ও প্রায়শ্চিত্ত এই প্রসঙ্গে মনে পড়িবে। ইঁহাদের মধ্যে রাজা ও রানীতেই শেক্‌স্‌পীয়রীয় নাট্যরীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞের আলোচনা উদ্ধৃত হইল—

"বক্তব্যের বিচারে রাজা ও রানী অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত। প্রেম যদি শক্তির কাজে দীক্ষিত না হয়, তাহলে যে অভিশাপ অনিবার্যভাবে নেমে আসে, রাজা ও রানী তারই কাহিনী। এরই আর একদিক আছে চিত্রাঙ্গদায়, এই বক্তব্যই পূর্ণতর হয়ে ফুটেছে তপতী নাটকে।

তবুও রাজা ও রানী শেক্‌স্‌পীয়রের স্বাদ বহন করে আনে। প্রথমত কাব্যনাট্য বা সাংকেতিক নাটকগুলির মত এর চরিত্র, ঘটনা অথবা সংলাপ কবির বিশেষ ভাব-ভাবনার অনুচর মাত্র নয়, তারা কয়েকটি প্রতীকেও পরিণত হয় নি। বিক্রম-সুমিত্রার চিত্ত-সংঘাতকে কেন্দ্রবিন্দুতে বিধৃত রেখেও অন্যান্য চরিত্ররা চরিত্র হয়েই ফুটতে পেরেছে। নানা ঘটনা আছে,

নানা রসের সমাবেশ আছে ; কাশ্মীর ত্রিচূড় জালন্ধরের তিন কেন্দ্রে গল্প ছড়িয়ে গেলেও তা ত্রিমুখী হয়নি। বরং শিল্পের দিক থেকে মোটামুটি সার্থক ত্রিভুজেই পরিণতি লাভ করেছে। লিরিকের মাত্রা একটু বেশি হয়ত আছে, কিন্তু সেজন্য গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথ যতটা লজ্জিত, পাঠক ততখানি সংকোচের কারণ খুঁজে পাবেন কিনা জানি না ; এবং 'ঐ লিরিকের টানে এর মধ্যে প্রবেশ করেছে, ইলা এবং কুমারের উপসর্গ। সেটা অত্যন্ত শোচনীয়রূপে অসংগত'—এও ঠিক গ্রহণযোগ্য নয়।...

লিরিকের চকিত উচ্ছ্বাসে মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকেও থেকে থেকে ঊর্ধ্বায়িত হয়েছে—ওথেলো লীয়ার হ্যামলেট ম্যাকবেথ-অসংখ্য বহুলোদ্ধৃত এবং উচ্চারিত স্তবকের পুষ্পতরু। প্রসঙ্গত জুলিয়েটের সেই প্রেমোচ্ছ্বাস মনে পড়ল :

Come night ; come Romio ,
Come thou day in night ;
For thou wilt lie
upon the wings of night
Whiter than new snow
an a raven's back .

আশা করা যায় 'লিরিকের প্লাবনে' রবীন্দ্রনাথেরও লজ্জিত হওয়ার কারণ নেই। প্রথম দিকের নাটক হিসাবে রাজা ও রানী ক্রটিযুক্ত নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু সমালোচনার দিক থেকে একথা অনস্বীকার্য যে, যেকালে নাটকটি লেখা হয়েছিল সেই সময় এই রকম ভাবগভীর উচ্চাঙ্গের ট্রাজেডি বাঙলা সাহিত্যে খুব সুলভ ছিল না। সেদিক থেকেও বইখানি স্মরণীয়।

মূল গঠনরীতি ছাড়া চরিত্রকল্পনা এবং সংলাপেও শেক্‌স্‌পীয়ারের প্রভাব রাজা ও রানীতে দুর্লক্ষ্য নয়। অ্যান্টনি এণ্ড ক্লিয়োপেট্রা নাটকে রোম থেকে যখন দূত এল, তখন ক্লিয়োপেট্রার ব্যঙ্গের আঘাতে চকিত হয়ে অ্যান্টনি বলছেন,

Let Rome in Tiber melt,
and the wider a'rch

Of the ranged empire fall !
Here is my space.
Kingdoms are clay :
our dungy earth alike
Feeds beasts as man ;
the nobleness of life
Is to do thus :
When such a mutual pair.

[ক্লিয়োপেট্রাকে আলিঙ্গন]

And such a twain can do't
in which I find
On paih of punishment,
the world to weet
We stand up peerless—

অথবা ক্লিয়োপেট্রা যখন বললেন, Hear the ambassadors, তার উত্তর দিচ্ছেন অ্যাণ্টনি : No messenger, but thine.

রাজা ও রানীতে বিক্রম ও সুমিত্রার সম্পর্ক আলাদা ; ছলনাময়ী নীলনদের নাগিনী যখন পাকে পাকে অ্যাণ্টনিকে গ্রাস করছে, তখন সুমিত্রা চাইছেন বিক্রমকে সর্বমোহাবেশ থেকে মুক্তি দিতে তাঁকে রাজধর্মের মধ্যে উদ্বোধিত করতে। কিন্তু বিক্রমের ভাষণে তখন অ্যাণ্টনির প্রতিধ্বনি :

রাজা রানী ! কে রাজা ! কে রানী !
নহি আমি রাজা ! শূন্য সিংহাসন কাঁদে
জীর্ণ রাজকার্যরাশি চূর্ণ হয়ে যায়
তোমার চরণতলে ধূলির মাঝারে।

অন্যত্র

ধিক্ তুমি ! ধিক মন্ত্রী ! ধিক রাজকার্য !
রাজ্য রসাতলে যাক মন্ত্রী লয়ে সাথে !

অথবা

জান নাকি প্রিয়ে
সকল কর্তব্য চেয়ে প্রেম গুরুতর !
প্রেম এই হৃদয়ের স্বাধীন কর্তব্য।

আর শেকস্‌পীয়ার বলেছেন,

Now for the love of love and her soft hours; let us not confound the time with conference harsh !

ওথেলো নাটকে শেকস্‌পীয়ারের অনুরণন অনুভব করা যায় সেইখানটিতে—যেখানে বিক্রম নিজের অন্ধ উন্মত্ত আবেগের তাড়নায় মূর্তিমান সর্বনাশের মত ছুটে বেরিয়ে পড়েছেন। কোনমতেই তাঁর নিবৃত্তি নেই। দেবদত্তকে তিনি বলেছেন,—

হায় বিপ্র তোমরাই
ভাঙিয়াছ বাঁধ, এখন প্রবল জলস্রোত
শুধু কি শস্যের ক্ষেত্রে জলসেচ ক'রে
ফিরে যাবে তোমাদের আবশ্যক বুঝে
পোষমানা প্রাণীর মতন। চূর্ণিবে সে
লোকালয়, উচ্ছন্ন করিবে দেশ গ্রাম—

আর ক্ষিপ্ত ওথেলোকে যখন ইয়াগো বলছে,

Patience, I say, your mind perhaps may change, তখন জবাবে ওথেলো বলেছেন,

Never Iago,
Like to the Pontiac sea
Whose icy currents and compulsive course
Ne'er feels retiring ebb;
but keeps due on
To the Propontic
and the Hellespont,
Even so my bloody thoughts,
with violent pace,

Shall ne'er look back,
ne'er ebb to humble love,
Till that a capable and wide revenge
Shallow them up—

— বিচ্ছিন্ন সংলাপের অংশ ছাড়া রাজা ও রানীর অন্যত্র ও শেক্স্পীয়রের প্রভাব অলক্ষ্য নয়। ম্যাকবেথ এবং লেডি ম্যাকবেথের ছায়ায় রচিত হয়েছে চন্দ্রসেন এবং রেবতী চরিত্র।

চন্দ্রসেন। ধীরে রানী ধীরে।
রেবতী। ক্ষুধিত মার্জার
বসেছিল এতদিন সময় চাহিয়া
আজ তো সময় এল, তবু আজ কেন
সেই বসে আছ!
চন্দ্রসেন। কে বসিয়া ছিল রানী
কিসের লাগিয়া
রেবতী। ছি ছি আবার ছলনা!
লুকাবে আমার কাছে?
কোন অভিপ্রায়ে
এতদিন কুমারের দাওনি বিবাহ?
কেন বা সম্মতি দিলে ত্রিচুড় রাজ্যের
এই অনার্য প্রথায়—

এবং এর পরবর্তী অংশের সঙ্গে তুলনীয় লেডি ম্যাকবেথের উক্তি,

Art thou affeered
To be the same in
thine own act and valour
As thou art in desire?
Wouldst thou have that
Whice thku esteem'st
the ornament of life,

And live a coward
in thine own esteem,
Letting 'I dare not'
wait upon 'I would'
Like the poor cat
i' the adage ?

অন্যত্র অনুরূপ একটি পরিবেশে রেবতীর হিংস্র আত্মপ্রকাশ লেডি ম্যাকবেথের সেই বিখ্যাত বীভৎস ভাষণের প্রায় আক্ষরিক প্রতিধ্বনি।

How tender 'tis to love
the babe that milks me ;
I would, while it was
smilling on my face,
Heve plucked my nipples
from her boneless gums
and dashed the brains out—

রেবতীর ভাষা এত ভয়ংকর নয়। কিন্তু বক্তব্যে পার্থক্য সামান্যই,

আমিও পালিব তবে
কর্তব্য আপন। নিশ্বাস করিয়া রোধ
বধিব আপন হস্তে সন্তান আপন।
…… আমি তারে
দিয়েছি জনম। আমি তারে সিংহাসন
দিব—নহে আমি নিজ হস্তে মৃত্যু দিব
তারে।

এ ছাড়া রাজা ও রানী নাটকে যে জনতার দৃশ্য আছে, তা জুলিয়াস সীজারের নাগরিকদের স্মরণ করায়। রোমান সিটিজেনদের তুলনায় জালন্ধর কিংবা কাশ্মীরের জনসাধারণ অনেকখানি স্তিমিত এবং নির্বোধ। অনেক বেশি গ্রাম্য। কিন্তু এক জায়গায় দুই দলেরই মিল আছে। তারা সহজে অভিভূত হয়, আন্দোলিত হয়—যে কেন প্রবল ব্যক্তিত্ব তাদের নিয়ন্ত্রিত করতে পারে।…

রাজা ও রানীর সমাপ্তিও একান্তভাবে শেক্‌স্‌পীয়রের স্মারক। পরিণতিতে মহামৃত্যুর যে করুণ ভয়ংকর যবনিকা তা কিং লিয়ার কিংবা হ্যামলেটের মরণ-মহোৎসবেরই অনুরূপ।

আগেই বলেছি, গীতিনাট্য কাব্যনাট্য নাট্যকাব্য এবং সাংকেতিকতার পথযাত্রী রবীন্দ্রনাথ নাটকের ক্ষেত্রে শেক্‌স্‌পীয়রের ধারায় বেশিদূর অগ্রসর হয়নি।" বিসর্জনকে আংশিকভাবে গ্রহণ করা যায় কিনা জানি না, কিন্তু সমতার বিচারে রাজা ও রানীই তাঁর একমাত্র শেক্‌স্‌পীয়রীয় নাটক—প্রায় নিঃসঙ্গ একটি স্বতন্ত্র সৃষ্টি। আর এই বিশেষ সৃষ্টিতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দ্বারা শেক্‌স্‌পীয়রের যে স্বীকরণ ঘটেছে, তাতে রবীন্দ্রনাথের মৌলিকতা কিছুমাত্র বিচলিত হয়নি, সাহিত্যের ক্ষেত্রে চিরন্তন উত্তরাধিকারের সত্যটিই প্রমাণিত হয়েছে মাত্র।"

[অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—রবীন্দ্রনাথের একখানি নাটক ও শেক্‌স্‌পীয়র—অমৃত, ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা]

প্রশ্নোত্তর

১। 'রাজা ও রানী' নাটকের নামকরণের সার্থকতা বিচার কর। এই নাটকে রবীন্দ্রনাথের কোন্ বক্তব্য ফুটিয়া উঠিয়াছে?

উত্তর। আলোচ্য নাটকের নামকরণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যদি নাটকটির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করি, তাহা হইলে দেখিব সমস্ত ঘটনা দুইটি চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া বিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে। এই দুইটি চরিত্র হইল—রাজা বিক্রমদেব এবং রানী সুমিত্রা।

বস্তুতঃ, তাঁহাদের জীবনের একটি সমস্যাকে লইয়াই এই নাটকটি রচিত। বিক্রম সুমিত্রাকে ভালোবাসেন, কিন্তু তাঁহার প্রেমে এমনিই উন্মত্ত যে, তিনি রাজকার্য ছাড়িয়া রানীর অন্তঃপুরে আশ্রয় লইয়াছেন। ইহার ফলে রাজ্যে দেখা দিয়াছে অরাজকতা, বিদেশী কাশ্মীরী আত্মীয়দের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া প্রজারা হাহাকার করিতেছে। কিন্তু সেই হাহাকার মনে কোন রেখাপাত করে না; তিনি সুমিত্রাকে লইয়া অন্তঃপুরের একান্তে যে রাজ্য রচনা করিয়াছেন—সেখানেই নিশ্চিন্ত আরামে প্রেমের স্বপ্নে দিন যাপন করিতে চান—

জীর্ণ রাজকার্যরাশি চূর্ণ হয়ে যায়
তোমার চরণতলে ধূলির মাঝারে।

কিন্তু রানী সুমিত্রা যখনই জানিতে পারিলেন যে, তাঁহাকে ভালোবাসিয়া রাজা রাজকর্তব্যে অবহেলা করিতেছেন, তখন তিনি রাজাকে বলিলেন—

আমারে দিয়ো না লাজ
আমারে রেখো না ভালো রাজশ্রীর চেয়ে।

এইভাবেই উভয়ের মধ্যে সংঘাত শুরু হইল। রাজা সুমিত্রাকে জয় করিবার জন্য যতই চেষ্টা করিতে থাকেন, সুমিত্রা ততই দূরে সরিয়া যান। অবশেষে, রাজা যখন প্রজাদের আর্তনাদ উপেক্ষা করিলেন, রানী বুঝিলেন যে রাজাকে ফিরাইবার আর কোন পথ নাই, বুঝিলেন, নিজেকে রাজার নিকট হইতে সরাইয়া না লইলে রাজার চেতনা ফিরিবে না, তখন তিনি অত্যাচারীদের শাস্তি দিবার সংকল্প লইয়া একদিন নিশীথে গোপনে রাজ্য ত্যাগ করিয়া গেলেন।

এই খবর যখন রাজার নিকট পৌছাইল, তখন তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। তারপর অত্যাচারীদের দমনের জন্য যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ওদিকে সুমিত্রাও তাঁহার ভ্রাতা কুমারের সাহায্যে পলাতক জয়সেনকে বন্দী করিয়া রাজার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। সুমিত্রার এই আচরণ রাজা সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারিলেন না, ইহা তাঁহার পৌরুষের অভিমানে প্রচণ্ড আঘাত হানিল। যাহাকে তিনি ফিরিয়া পাইবার জন্য যুদ্ধে নামিলেন, তাহাকে দ্বার হইতে ফিরাইয়া দিতেও দ্বিধা করিলেন না।

অবশেষে নাটকের গতি এবং ঘটনাসংস্থান এমন এক অবস্থায় উন্নীত হইল, যখন দেখি রাজা ও রানী পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী, উভয়ের মধ্যে এক গভীর বিরোধ সঞ্চার হইয়াছে। সম্মুখে কুমার ছিলেন বটে, কিন্তু আসলে সেই বিরোধ সুমিত্রাকে লইয়াই।

নাটকের শেষে দেখিলাম—রাজার সম্মুখেই রানী সুমিত্রা প্রাণ বিসর্জন দিলেন; ইহাকে আত্মবিসর্জনই বলা চলে। দীর্ঘদিন ধরিয়া উভয়ের মধ্যে বিরোধের বা সংঘাতের যে বীজ অঙ্কুররূপে দেখা দিয়াছিল, তাহা বিকশিত হইয়া পরিণতি লাভ করিল সুমিত্রার মৃত্যুর মধ্যে। লোকান্তরিতা সুমিত্রার চরণতলে নতজানু হইয়া রাজা বলিলেন—

> দেবী, যোগ্য নহি আমি তোমার প্রেমের,
> তাই বলে মার্জনাও করিলে না? রেখে
> গেলে চির-অপরাধী করে? ইহজন্ম
> নিত্য-অশ্রুজলে লইতাম ভিক্ষা মাগি
> ক্ষমা তব, তাহারো দিলে না অবকাশ?
> দেবতার মতো তুমি নিশ্চল নিষ্ঠুর—
> অমোঘ তোমার, কঠিন বিধান।

রাজা ও রানীর জীবনে একদা যে সমস্যা দিয়াছিল, তাহার সমাধান হইল এইভাবে।

বস্তুতঃ দেখা যাইতেছে, নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া রাজা ও রানীর—এই দুইটি জীবনের এক করুণ বেদনাঘন আলেখ্য রচনা করাই এই নাটকের লক্ষ্য। সমস্ত ঘটনাপ্রবাহ, নাটকীয় সংঘাত ও পরিণতি তাঁহাদের কেন্দ্র

করিয়াই ঘটিয়াছে। এই জন্য বলা যায়, এই নাটকের নামকরণ খুবই সার্থক হইয়াছে।

প্রসঙ্গতঃ একটি বিষয়ে আলোকপাত করা দরকার। এই নাটক রচনার চল্লিশ বছর পরে রবীন্দ্রনাথ এই নাটকটির যখন রূপান্তর ঘটান—তখন তাঁহার নামকরণ করেন 'তপতী'। 'রাজা ও রানী' নাটকের কেন্দ্রীয় এবং প্রধান চরিত্র সুমিত্রা—তাহার সূর্যকন্যা (তপতী) রূপটি সার্থকরূপে উদ্ঘাটিত করিবার জন্যই ঐ নাটক রচিত হয়। অর্থাৎ ঐ নাটকে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি সুমিত্রার দিকে, রাজার প্রতি নয়। কিন্তু এই নাটকে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি উভয়ের প্রতিই সমানভাবে নিবদ্ধ। এই দিক হইতেও 'রাজা ও রানী' নামকরণ তাৎপর্যপূর্ণ।

Thompson বলিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি তাঁহার 'Vehicle of ideas'। এই নাটকেও একটি সুস্পষ্ট বক্তব্য লক্ষ্য করা যায়। 'রাজা ও রানীর' ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলিয়াছেন—"সংসারের জমি থেকে প্রেমকে উৎপাটিত করে আনলে সে আপনার রস আপনি জোগাতে পারে না, তার মধ্যে বিকৃতি ঘটতে থাকে।"

বিক্রম সেই ভুল করিয়াছিলেন। তিনি বৃহত্তর জগৎ হইতে সুমিত্রাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে হারাইলেন। প্রেম কেবল নিজের ভোগের জন্য নহে, সংসারের বৃহত্তর জীবনের প্রতি তাহার এক কর্তব্য রহিয়াছে। সুমিত্রা রাজাকে বারবার সেই কর্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকের সন্ন্যাসীর মতো বিক্রমও বাস্তবের সীমাকে লঙ্ঘন করিয়াছিলেন বলিয়াই সুমিত্রাকে হারাইলেন।

বস্তুতঃ, রবীন্দ্রনাথ বলিতে চাহিয়াছেন যে, আত্যন্তিক প্রেমের পরিণতি কল্যাণকর হইতে পারে না এবং যে প্রেমের মধ্যে কল্যাণ নাই, সেই প্রেম কাম্য নহে। বিক্রমের প্রেম সেই অত্যান্তিক প্রেমের পরিচায়ক। এবং 'রাজা ও রানী নাটকে এমনি এক প্রেমের ভয়াবহ পরিণতির চিত্রই অঙ্কিত হইয়াছে।

২। রোমান্টিক ট্র্যাজেডি হিসাবে 'রাজা ও রানী' নাটকের বিচার কর।

। 'ভূমিকা' অংশ দ্রষ্টব্য।

৩। ঘটনা-সংস্থানের দিক দিয়া 'রাজা ও রানী' নাটকের বিশ্লেষণ কর।

উত্তর। 'ভূমিকা'-র অন্তর্গত প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৪। 'রাজা ও রানী' নাটকে রবীন্দ্রনাথের যে বিশিষ্ট বক্তব্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা বিশদভাবে আলোচনা কর।

উত্তর। 'ভূমিকা'র অন্তর্গত 'তত্ত্ব-বিশ্লেষণ' অংশ দ্রষ্টব্য। তাহার সহিত শেষে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি যোগ করিতে হইবে :

একথা যদিও ঠিক যে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি নাটকেই কোন-না-কোন বক্তব্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং এই নাটকও তাহার ব্যতিক্রম নহে, তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ তত্ত্বটি এই নাটকে মুখ্যরূপে দেখা দেয় নাই এবং নাটকীয় গতিকেও ব্যাহত করিয়া তুলে নাই, যেমন অন্য রূপক নাটকে দেখা যায়। সর্বোপরি, 'তপতী'র সহিত এই নাটকের তুলনা করিলেও বুঝা যাইবে যে, তপতী-তে কবির বক্তব্য অত্যন্ত প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু এই নাটকে অন্ততঃ তাহা প্রকট হইয়া উঠে নাই। তত্ত্ব একটা আছে বটে, তাহা তো কবি নিজেই 'ভূমিকা'য় বলিয়াছেন, নাটকে তেমন সমস্যা তো থাকিবেই, কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষণীয়, তাহার আড়ালে সমস্ত নাটকীয় চরিত্র বা ঘটনা-প্রবাহ ভারাক্রান্ত হয় নাই।

অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রমথনাথ বিশী মহাশয় রবীন্দ্র-নাটকের চরিত্রের মধ্যে 'রক্তাল্পতা' অনুভব করিয়াছেন। তাহা রূপক বা সাঙ্কেতিক নাটক, এমনকি তপতী সম্পর্কে সত্য হইলেও অন্ততঃ এই নাটকের প্রসঙ্গে তাহা প্রযোজ্য নয়। বিক্রম, দেবদত্ত, এমন কি,—কুমার ও ইলার মধ্যেও রক্তমাংসে গড়া স্পর্শকাতর হৃদয়ের স্পন্দন সহজেই অনুভব করা যায়। তাহাদের হাসিকান্না, সুখদুঃখ, ব্যথাবেদনার ঢেউ অন্তরকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। তাহাদের মধ্য দিয়া কবির বিশেষ বক্তব্য রূপায়িত হওয়া সত্ত্বেও অর্থাৎ টম্‌সনের ভাষায় 'Vehicle of ideas' হওয়া সত্ত্বেও ইহাদের মধ্যে জীবন-রসের আস্বাদ পাওয়া যায়। সুতরাং, একথা স্বীকার করা উচিত যে, 'রাজা ও রানী' নাটকে তত্ত্বের অতিরিক্ত এক বিচিত্র মানব-প্রেমের জীবনালেখ্য অঙ্কিত করা হইয়াছে। এইখানেই এই নাটকের সার্থকতা ও তাৎপর্য।

৫। 'রাজা ও রানীর' 'ভূমিকায়' রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"এই তত্ত্বকেই যে সজ্ঞানে লক্ষ্য করে লেখা হয়েছে তা নয়"—কোন্ তত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে! বিশদভাবে আলোচনা কর। ঐ তত্ত্বটি কি নাটকের রসহানি ঘটাইয়াছে?

উত্তর। ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তরটি প্রশ্নানুযায়ী সাজাইয়া লিখিতে হইবে।

এইভাবে শুরু করিতে হইবে: রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য নাটকের ভূমিকায় বলিয়াছেন—"সংসারের জমি থেকে প্রেমকে উৎপাটিত করে আনলে সে আপনার রস আপনি জোগাতে পাবে না, তার মধ্যে বিকৃতি ঘটতে থাকে।" অর্থাৎ এই নাটকের উপজীব্য হইল এক 'বিকৃত' প্রেমের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন।

মানব-জীবনের দুইটি দিক—সংকীর্ণ এবং বৃহৎ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সীমা এবং অসীম। তাছাড়া মানুষের মধ্যে রহিয়াছে দুইটি 'আমি'—ছোট এবং বড়। এই সংকীর্ণতা অথবা 'ছোট আমি' সর্বদাই মানুষকে জীবনকে খণ্ডিতরূপে দেখিতে চায় বলিয়াই মানুষ নিজেকে বৃহত্তর সংসার বা জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখে। কিন্তু খণ্ডিতরূপের মধ্যে তো সত্য নাই, সত্য নিহিত থাকে অখণ্ডের মধ্যে। কাজেই যে মুহূর্তে মানুষ নিজেকে এইভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া লয়, তখনই সে সত্যভ্রষ্ট হয়।

প্রেম সম্পর্কেও এই একই ধারণা পোষণ করিয়াছেন কবি। তাঁহার বক্তব্য হইল, যে, প্রেমের যথার্থ সার্থকতা সংসারের বৃহত্তর ক্ষেত্রে। 'রাজা ও রানী' নাটকে রবীন্দ্রনাথ এমনি এক প্রেমের চিত্র অঙ্কিত করিতে চাহিয়াছেন। সুমিত্রা ঐ মহৎ প্রেমের প্রতীক; বিক্রমের প্রেম তাহার বিপরীত।

৬। 'তপতী'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"অনেক দিন ধরে রাজা ও রানীর ত্রুটি আমাকে পীড়া দিয়েছে।...দেখলুম এমনতরো অসম্পূর্ণ সংস্কারের দ্বারা সংশোধন সম্ভব নয়। তখনই স্থির করেছিলুম এ নাটক আগাগোড়া নতুন করে না লিখলে এর সদ্‌গতি হবে না।"—এই উক্তির আলোকে 'রাজা ও রানী' এবং 'তপতী'-র একটি তুলনামূলক আলোচনা কর।

উত্তর। 'ভূমিকা'-র অন্তর্গত 'রাজা ও রানী' এবং 'তপতী'-র তুলনামূলক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৭। নাট্যশিল্পের বিচারে 'রাজা ও রানী' এবং 'তপতী'—কোন্ নাটকটিকে সার্থক বলা যায় ?

উত্তর। 'ভূমিকা'র অন্তর্গত এই দুইটি নাটকের যে তুলনামূলক আলোচনা করা হইয়াছে, তাহার সহিত নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি মিলাইয়া লিখিতে হইবে :

রবীন্দ্র-সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখি যে, রবীন্দ্রনাথ স্বরচিত রচনার প্রায়শঃই রূপান্তর ঘটাইয়াছেন : বিশেষতঃ কবিতা এবং নাটকের ক্ষেত্রে এই রূপান্তর প্রায়শঃই ঘটিয়াছে। 'রাজা ও রানী' নাটকেরও রূপান্তর ঘটিয়াছে এবং তাহাই হইল 'তপতী'—মূল নাটকের চল্লিশ বৎসর পরে রচিত।

কবির চোখে 'রাজা ও রানী' নাটকের কয়েকটি ত্রুটি তাঁহাকে দীর্ঘকাল ধরিয়া পীড়া দিয়াছিল। সেই অস্বস্তি এবং ত্রুটির হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্যই তিনি 'তপতী' রচনায় হাত দেন, একথা কবি 'তপতী'-র ভূমিকায় বলিয়াছেন। এখন, নাট্যশিল্পের বিচারে দেখিতে হইবে—কোন্ রূপটি সার্থক হইয়া উঠিয়াছে।

প্রথমেই এই দুইটি নাটকের সৌসাদৃশ্যের কথা উল্লেখযোগ্য। এই নাটকের কাহিনী বা আখ্যান অভিন্ন, মূল চরিত্রগুলি উভয় নাটকেই বিদ্যমান আছে। বৈসাদৃশ্যের মধ্যে প্রথমেই চোখে পড়ে দৃশ্যবিন্যাস। মূল নাটক অনুসরণ করিয়াছে শেক্সপীয়রের রোমান্টিক ট্রাজেডির পঞ্চমাঙ্ক রীতি, পক্ষান্তরে, 'তপতী'-র দৃশ্যবিন্যাস তদনুরূপ নহে। মঞ্চকলা প্রসঙ্গে 'তপতী'-র ভূমিকায় কবি যাহা বলিয়াছেন, তাহার আলোকেই এই নাটকের দৃশ্যবিন্যাস করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, মূল নাটকের কুমার-ইলার প্রসঙ্গ তপতী-তে আদৌ স্থান পায় নাই, ইলা চরিত্রটি বর্জিত, কুমারের চরিত্র নিতান্তই গৌণ। তাহার পরিবর্তে সংযোজিত হইয়াছে—নরেশ ও বিপাশার আখ্যান। তৃতীয়তঃ, তপতী-র দৃশ্যবিন্যাস সংহত, দৃশ্যগুলি অহেতুকভাবে পল্লবিত করিবার চেষ্টা নাই। চতুর্থতঃ, 'রাজা ও রানী' নাটকের তত্ত্বটি 'তপতী'-তে স্পষ্ট এবং প্রকটরূপে প্রতিভাত। পঞ্চমতঃ, 'তপতী'-তে সুমিত্রা চরিত্রের প্রতি কবির অত্যধিক দৃষ্টি থাকার জন্যই, তাহার অগ্নিশুদ্ধ তেজস্বিনী সূর্য-কন্যা-রূপটি ফুটাইয়া তোলার জন্যই নাটকের নামকরণ হইয়াছে—'তপতী'। মূল নাটকে সুমিত্রা চরিত্রটি এইভাবে প্রাধান্য পায় নাই।

উভয় নাটকের সৌসাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যগুলি দেখানো হইল। এখন বিচার্য, যে 'ত্রুটি' সংশোধন করিবার জন্য 'তপতী' রচনার প্রয়াস, তাহা কতদূর সার্থক হইয়াছে?

নাটকের মূল কথা Action, এবং নাটক ঘটনাপ্রধান শিল্প বলিয়াই নাটকে ঘটনাকে দূরে রাখিলে চলে না। সেই জন্যই, নাটকের প্রধান লক্ষ্য জীবনানুগ হওয়া। এই দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে দেখা যায়, তপতী-তে সেই ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া-সঞ্জাত, সংঘাত প্রায় নাই। দ্বিতীয়তঃ, চরিত্রগুলি সতাই "বক্তামতাদোষে দুষ্ট।" তৃতীয়তঃ, 'Pressure of thought' এতো বেশী, যে নাটকটি তাহাতে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। চতুর্থতঃ, মূল চরিত্র সুমিত্রাই যেন বড়ো বেশী অচেনা, প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে, তাহার মধ্যে জীবন-স্পন্দনের চিহ্নমাত্র পাওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। এই নাটকের স্বপক্ষে শুধু বলা যায় যে, যে-তত্ত্বটি রবীন্দ্রনাথ বলিতে চাহিয়াছেন, তাহা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে, নাট্যধর্মের দিক দিয়া এইগুলি নাট্যশিল্পের অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে। 'রাজা ও রানী'র কিছু ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তাহা নাট্যশিল্পের বিচারে সার্থক, কেননা, তাহা ঘটনাবর্তের সংঘাতে, জীবন-রসের বিচিত্র রূপায়ণে মানব-জীবনের এক অপূর্ব আলেখ্য হইয়া উঠিয়াছে—আর তাহাইতো সার্থক নাট্যশিল্পের লক্ষ্য ও উপজীব্য।

৮। "এর নাট্যভূমিতে রয়েছে লিরিকের প্লাবন, তাতে নাটককে করেছে দুর্বল। এ হয়েছে কাব্যের জলাজমি। ঐ লিরিকের টানে এর মধ্যে প্রবেশ করেছে ইলা এবং কুমারের উপসর্গ। সেটা অত্যন্ত শোচনীয়রূপে অসংগত।"—'রাজা ও রানী' নাটকের কুমার ও ইলার আখ্যানভাগ সম্পর্কে কবির এই অভিমত কতোখানি গ্রহণযোগ্য?

উত্তর। নাটক মূলতঃ ঘটনাপ্রধান বলিয়াই, তাহা বস্তুধর্মী (objective) শিল্প অর্থাৎ বাহিরের বস্তুগত জগতের উপর তাহার সাফল্য অনেকখানি নির্ভরশীল। মানুষের অন্তর্লোকে যে ভাবের পরিবর্তন ঘটে, মানবমনের সেই বিচিত্রলীলা কাব্যের বিষয়বস্তু হইলেও তাহা নাটকের উপজীব্য নয়। কারণ, মনের ঘাত'প্রতিঘাত যদি বাহিরে আত্মপ্রকাশ না করে, তবে

তাহার দ্বারা কোন ঘটনা সৃষ্টি হইতে পারে না। তাই, আবেগপ্রবণতা বা আবেগপ্রবণ-ভাব নাটকের বিষয়বস্তু হইয়া উঠিলে নাট্য-রস ক্ষুণ্ণ হইতে বাধ্য।

'রাজা ও রানী' নাটকের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, সমস্ত নাটকটি একটি অতিরেকী আবেগপ্রবণ প্রেমের উপর দাঁড়াইয়া আছে। একথা ঠিক যে, বিক্রমদেবের এই মাত্রাতিরিক্ত প্রেমাসক্তির জন্যই জটিলতা ও বিরোধ দেখা দিয়াছে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে, তাহা সৃষ্টি হইয়াছে বাইরের প্রতিক্রিয়া হইতে। সুমিত্রার সহিত বিক্রমের বিরোধ সৃষ্টি হইয়াছে তখনই, যখন বাহির হইতে প্রজাদের আর্তনাদ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে। সুতরাং বলা যায়—নাটকীয় আবর্ত সৃষ্টি হইয়াছে বাহ্যিক ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়াই।

কিন্তু আসলে সমস্ত নাটকটির মধ্যে এক গীতি-ধর্মিতার প্রবাহ অনুভব করা যায়। মায়ার খেলা, নলিনী অথবা মানসীর মধ্যে যে গীতিপ্রবণ কবিমানসের পরিচয় পাওয়া যায়, এই নাটক সেই ভাবমণ্ডলের প্রচ্ছায়ার মধ্যেই রচিত। এবং এই গীতিধর্মিতা আশ্রয় করিয়াছে এক আত্মগত প্রেম। বিক্রমের চরিত্র তথা সংলাপ বিশ্লেষণ করিলে সহজেই এই আত্মগত গীতিপ্রবণ প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। বিক্রম এই প্রেমের জন্যই বাহিরের জগৎ, সংসারের সীমা ও দায়িত্বকে অস্বীকার করিয়া অন্তঃপুরে আশ্রয় লইয়াছিলেন। স্বভাবতঃই এই প্রেম অন্তর্মুখী বলিয়াই গীতিধর্মী, এবং গীতিধর্মী বলিয়াই নাটকীয়তার অনুকূল নহে। রবীন্দ্রনাথ ইহাকেই বলিয়াছেন 'লিরিকের প্লাবন', সমস্ত নাটক জুড়িয়া ইহার প্রবাহ চলিয়াছে।

বস্তুতঃ, এই নাটকের নায়ক বিক্রমের মূলতঃ গীতিধর্মী, তাঁহার সংলাপে এই গীতিপ্রবণতা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এমনকি, রাজার অন্তরে দ্বন্দ্ব সুরু হইয়াছে, তখনও এই প্রবণতা প্রকাশ পাইয়াছে—

> কেন এত
> আত্মপীড়া! কেন এ কর্তব্য-কারাগার!
> তুই সখী অয়ি মাধবিকা, বসন্তের
> আনন্দমঞ্জরী! শুধু প্রভাতের আলো,
> নিশির শিশির, শুধু গন্ধ, শুধু মধু,
> শুধু মধুপের গান, বায়ুর হিল্লোল,

স্নিগ্ধ পল্লবশয়ন প্রস্ফুট শোভায়
সুনীল আকাশ-পানে নীরবে উত্থান—
তারপরে ধীরে ধীরে শ্যাম দুর্বাদলে
নীরবে পতন।

—এই ধরণের দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়া বলা যায় যে, এই নাটকের পটভূমি বা বিষয়বস্তু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য যথার্থ। যে প্রেম লইয়া বিরোধ সে প্রেম একান্তই আবেগপ্রবণ ও অন্তর্মুখী অর্থাৎ গীতিধর্মী।

অতঃপর কবি মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই লিরিকের টানেই প্রবেশ করিয়াছে ইলা এবং কুমারের উপসর্গ। তাহাও সত্য, কারণ, তাহাদের মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ এক সংহত কল্যাণময় ত্যাগনিষ্ঠ প্রেমের চিত্র অঙ্কিত করিতে চাহিয়াছেন। বিক্রম ও সুমিত্রার প্রেমের মধ্যে যে বিরোধ দেখা যায়, যাহার ফলে জটিলতা দেখা দিয়াছে, সেই বিরোধ বা জটিলতা ইলা-কুমারের প্রেমে আদৌ নাই। অর্থাৎ এই নাটকে পাশাপাশি দুইটি প্রেমের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। নাট্যধর্মের দিক দিয়া কিন্তু তাহা অবান্তর নহে। বরং বলা যায়, একদিকে যেমন তাহা রবীন্দ্রনাথের এক বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি বিক্রম-সুমিত্রার কাহিনীর সহিত সমতা বজায় রাখিয়া নাট্য-সৌষ্ঠব বর্ধন করিয়াছে। সুতরাং, ইলা-কুমারের উপাখ্যানকে 'উপসর্গ' বলিতে পারি না।

সর্বোপরি কবি বলিয়াছেন যে, ঐ উপাখ্যান 'শোচনীয়রূপে অসংগত।' বিষয়টি গভীর বিশ্লেষণ-সাপেক্ষ।

ঠিক বটে, প্রতি নাটকের নায়কের সমতুল্য সমশক্তিবান প্রতি-নায়কের অবতারণা করা হয় সংঘাতের চিত্রকে রূপ দিবার জন্য। এবং বাস্তবিকপক্ষে, বিক্রমের পার্শ্বে কুমারকে সত্যই ততখানি প্রতিনায়কের যোগ্যতাসম্পন্ন চরিত্র বলিয়া মনে হয় না। শেক্সপীয়রের নাটকে দেখি প্রতি-নায়কের চরিত্রের মধ্যেও এক অসাধারণ দৃঢ়তা রহিয়াছে। কুমারের মধ্যে সেই গুণ নাই বটে, কিন্তু আর-এক দিয়া তাহার চরিত্র এবং ভূমিকা অসাধারণ। সত্যই তাহার চরিত্রটি অসঙ্গতরূপে নাটকের মধ্যে প্রবেশ করে নাই। ত্যাগের মাহাত্ম্যে, প্রেমের মাহাত্ম্যে এবং তজ্জনিত ব্যক্তিত্বের আলোকে আলোকিত এই চরিত্রটি একান্ত অপরিহার্যও বটে, কারণ, তাহার

আত্মবলির মধ্য দিয়া সুমিত্রার আত্মদান তথা বিক্রমের আত্মশুদ্ধি ঘটিয়াছে। বিক্রমের প্রচণ্ড প্রেমের পার্শ্বে কুমারের ভূমিকা আদৌ ম্লান বলিয়া মনে হয় না, বরং অনিবার্যভাবে যখন তাহার জীবনাবসান ঘটিল, তখন তাহার নাটকীয় সার্থকতা ও তাৎপর্য অনুভব করিয়া বিস্মিত হইতে হয়। কাজেই বলা যায়, ইলা ও কুমারের উপাখ্যান হয়ত প্রকৃতির বিচারে অধিকতর গীতিধর্মী বা মেলো-ড্রামাটিক, কিন্তু তাই বলিয়া 'শোচনীয়রূপে অসংগত' নহে। কবির এই মন্তব্য যুক্তি-বিচারে গ্রাহ্য নয়।

'তপতী'-তে কুমার-ইলা প্রসঙ্গ বাদ পড়িয়াছে, তাহার বদলে আসিয়াছে নরেশ-বিপাশা, কিন্তু আমাদের মনে হয় তাহার কোন প্রয়োজন ছিল না।

৯। 'রাজা ও রানী' নাটকের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করিয়া তাহার মধ্যে যে কবিমানসের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার পরিচয় দাও।

উত্তর। 'ভূমিকার' অন্তর্গত 'বিষয়বস্তু ও কবিমানস' অংশ দ্রষ্টব্য।

১০। রবীন্দ্র-নাট্য-প্রবাহে 'রাজা ও রানী'র স্থান নির্ণয় কর।

উত্তর। 'ভূমিকা'-র অন্তর্গত 'রবীন্দ্রনাট্যের প্রকৃতি ও শ্রেণী বিভাগ' অংশ দ্রষ্টব্য।

১১। ঘটনা-সংস্থানের কৌশল বা প্লট-রচনার দিক হইতে 'রাজা ও রানী' নাটকের কাহিনী বিশ্লেষণ করিয়া দেখাও কীভাবে নাটকীয়তা বৃদ্ধি এবং পরিণতি লাভ করিয়াছে।

উত্তর। 'ভূমিকার অন্তর্গত' 'বিষয়বস্তু সংক্ষেপে' অংশ দ্রষ্টব্য। প্রয়োজন বোধে ঐ আলোচনা কিছু সংক্ষিপ্ত করা যাইতে পারে।

১২। নাটকীয় গঠন-কৌশলের দিক হইতে 'রাজা ও রানী' নাটকের শেষ দৃশ্যটির সার্থকতা প্রতিপন্ন কর।

উত্তর। সাধারণতঃ নাটকের সূচনায় কাহিনীর যে সূত্রপাত এবং বিরোধ অঙ্কুরিতরূপে দেখা দেয়, নাটকের শেষে তাহার একটা পরিণতি দেখা যায়। 'রাজা ও রানী' নাটকেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। নাটকের সূচনায় বিক্রম ও সুমিত্রার মধ্যে যে বিরোধ বা সংঘাত দেখিয়াছিলাম, এই নাটকের শেষ দৃশ্যে সুমিত্রার মৃত্যুর মধ্য দিয়া তাহার পরিণতি বা অবসান ঘটিল। কাজেই বলা যায়, এই দৃশ্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাৎপর্যও বটে।

কিন্তু প্রশ্ন হইল, এই দৃশ্যে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা নাটকীয় গঠন-

কৌশলের দিক হইতে কতখানি সার্থক। এই দৃশ্যের বিশ্লেষণ করিলে দেখি, বিক্রম কাশ্মীর জয় করিয়াছেন, এবং খবর পাইলেন যে, কুমার শিবিকার দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেছে। এমন সময় দেবদত্ত এবং শঙ্কর প্রবেশ করিল। শঙ্কর বিশ্বাস করিতে পারে না যে, সত্যই কুমার অপমানের বোঝা মাথায় লইয়া ধরা দিতে আসিতেছে। এমন সময় বাহিরে হুলুধ্বনি ও বাদ্য শোনা গেল—আসিয়া দাঁড়াইল রুদ্ধ দ্বার-শিবিকা। বিক্রম অধীর আগ্রহে কুমারকে আলিঙ্গন করিবার জন্য আগাইয়া গেলেন। দুয়ার খুলিয়া বাহিরে আসিলেন কুমারের ছিন্নমুণ্ড হস্তে রানী সুমিত্রা। সকলে বজ্রাহত হইল, শঙ্কর ছাড়া। ক্ষণকাল পরে সুমিত্রাও প্রাণত্যাগ করিলেন। এই মুহূর্তে ছুটিয়া ইলা প্রবেশ করিল, কুমারের ছিন্নমুণ্ড দেখিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িল। চন্দ্রসেন ধিক্কারে মাথার মুকুট ফেলিয়া দিল এবং রেবতীকে ভর্ৎসনা করিলে রেবতী বলিয়া গেল যে, ঐ রোষ চিরস্থায়ী হইবে না। সবশেষে বিক্রম নতজানু হইয়া সুমিত্রার পদতলে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।

এখন, গঠন-কৌশলের দিক থেকে এই ঘটনার বিচার করিলে প্রথমেই বলিতে হয়, কুমারের জন্য অধীর আগ্রহে বিক্রমের ব্যাকুল প্রতীক্ষা এবং সুমিত্রার আবির্ভাব নাটকীয়তার দিক হইতে সত্যই অনবদ্য। সুমিত্রার ঐরূপ আবির্ভাবের জন্য সত্যই কেহ প্রস্তুত ছিল না। ইহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সত্যই এক বিস্ময়কর নাটকীয় পরিবেশ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সুমিত্রার এই আবির্ভাব অপ্রত্যাশিত হইলেও অস্বাভাবিক বলা যায় না, ইহার ইঙ্গিত পূর্ববর্তী দৃশ্যেই রহিয়াছে। কাজেই, পূর্বাপর সূত্রে বিচার করিলে বলিতে হয় সুমিত্রার আবির্ভাব ও মৃত্যু অসংগত হয় নাই। সুমিত্রার মৃত্যু নাট্যধর্মের দিক দিয়াও সার্থক, এবং উদ্দেশ্যমূলক, কারণ, তাঁহার মৃত্যুর মধ্য দিয়াই বিক্রমের প্রায়শ্চিত্ত ঘটিয়াছে। শেক্সপীয়রের নাটক পাপীকেই তাহার স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, কিন্তু রবীন্দ্র-নাটকে পাপীর চেতনাকে উজ্জীবিত করিবার জন্য একজন নিষ্পাপকে আত্মবলি দিতে দেখি। এই নাটকেও সুমিত্রার মৃত্যু অনুরূপ তাৎপর্য বহন করিতেছে।

এই নাটকীয় গঠন-কৌশলের চমৎকারিত্ব আরো দুইটি ঘটনায় প্রকাশ পাইয়াছে। এক, রেবতীর প্রবেশ ও প্রস্থান এবং দুই, বিক্রমের ক্ষমাভিক্ষার

মধ্য দিয়া নাটকের সমাপ্তি—এই দুইটি রূপায়ণই সত্যই নাট্যরসের দিক হইতে অনবদ্য। রেবতীর চরিত্রে যে ক্রূরতা দেখিয়াছি, শেষ পর্যন্ত তাহা বজায় রহিয়াছে; ক্রূর হইলেও নাটকীয় চরিত্র হিসাবে এই চরিত্রটি বাস্তবিকই উল্লেখযোগ্য। নাটকটি শেষ হইয়াছে বিক্রমের ক্ষমাভিক্ষার মধ্যে—রোমান্টিক ট্রাজেডির বিচারে এই পরিণতি সত্যই সার্থক।

শেক্সপীয়রীয় রীতিতে রবীন্দ্রনাথ বিক্রমের মৃত্যু না ঘটাইয়া এক অসাধারণ শিল্প-কুশলতার পরিচয় দিয়াছে। বস্তুতঃ, বিক্রমকে এক অতৃপ্ত প্রেম ও অনুশোচনার অনির্বাণ অগ্নিতে দগ্ধ হইবার জন্য বাঁচিয়া থাকিতে হইল—ইহাই কি ট্রাজেডির রসকে ঘনীভূত করে নাই?

তবে এই দৃশ্যে, ইলার প্রবেশ এবং মূর্ছা কেমন যেন একটু মেলো-ড্রামাটিক বলিয়া মনে হয়। এই অংশটুকু এমনিই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত যে, মূল ঘটনার সহিত কিছুটা যোগসূত্র হারাইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

সে যাহাই হউক, আর-এক দিয়া এই দৃশ্যটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা দেখিতে পাই যে, এই দৃশ্যেই নাটকের মূল চরিত্রগুলির পরিণতি ঘটিয়াছে, এবং মেঘের আড়াল হইতে সূর্যালোকের মতো তাহাদের স্বমহিমা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। একদিকে যেমন সুমিত্রার ত্যাগনিষ্ঠ প্রেমের পরিণতি দেখা গেল, অন্যদিকে তেমনি বিক্রম-চরিত্রের মাহাত্ম্যও উদ্‌ঘাটিত হইল। বিক্রমের চরিত্রে নীচতা নাই, তাহার ভুল হইয়াছিল ঠিক, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাকে নীচ বলা যায় না। বস্তুতঃ, এক ক্ষুব্ধ অভিমানের বশবর্তী হইয়াই বিক্রম সর্বনাশের পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইহারই প্রতিক্রিয়ারূপে তাঁহাকে অনুতপ্ত হইতে দেখিয়াছি। ইলার প্রেমের পরিচয় পাইয়া তিনি প্রেমের যথার্থ স্বরূপ অনুভব করিয়াছেন। ট্রাজেডি এই যে, যখন তিনি অগ্নিশুদ্ধ হইয়া কুমার ও সুমিত্রার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন, সেই মুহূর্তেই চরম আঘাত আসিল—সুমিত্রাকে পাইয়াও পাইলেন না।

দেবদত্ত রাজার যথার্থ বন্ধু, শেষ পর্যন্ত তাহাকে রাজার পার্শ্বে তাঁহার জীবনের চরম দুঃসময়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখি। শঙ্করের আনুগত্য শেষ-পর্যন্ত অটুট থাকিতে দেখা গেল। চন্দ্রসেনও অনুতপ্ত হইল। এইভাবে দেখ, প্রধান চরিত্রগুলির পরিণতি এই দৃশ্যেই ঘটিয়াছে।

আঙ্গিকের দিক হইতে বিচার করিলে বলিতে হয়, এই নাটকের শেষ

দৃশ্যটি সমস্ত নাটকের স্বাভাবিক পরিণতির দায়িত্ব বহন করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং ঘটনা-সংস্থানের কৌশলের দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায়, ইহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের এক অসাধারণ নাট্যপ্রতিভার স্বাক্ষর রহিয়াছে।

১৩। "এই নাটকে যথার্থ নাট্যপরিণতি দেখা দেয়েছে যেখানে বিক্রমের দুর্দান্ত প্রেম প্রতিহত হয়ে পরিণত হয়েছে দুর্দান্ত হিংস্রতায়, আত্মঘাতী প্রেম হয়ে উঠেছে বিশ্বঘাতী।"—বিশ্লেষণ কর।

উত্তর। 'রাজা ও রানীর' ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই নাটক প্রসঙ্গে বলিয়াছেন।

নাটকীয়তার মূলে থাকে সংঘাত বা বিরোধ, এবং এই সংঘাত সৃষ্টি হয় দুই বিরুদ্ধ শক্তির মধ্য দিয়া।

এই নাটকের শুরু হইতেই দেখি, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, গোড়া হইতেই এক 'লিরিকের প্লাবন' প্রবাহিত হইতেছিল। সুতরাং তাহার মধ্যে নাটকীয়তার বীজ অল্পই ছিল। যদিও প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের মধ্যেই রাজা ও রানীর মধ্যে বিরোধের সূচনা দেখিতে পাই, তথাপি তাহা স্পষ্টভাবে বিরোধের রূপ লয় নাই। প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের শেষে অবশ্য তাহার ইঙ্গিত রহিয়াছে—

মহারাজ,
এখন সময় নয়,—আসিয়ো না কাছে—
এই মুছিয়াছি অশ্রু, যাও রাজ-কাজে!

কিন্তু তথাপি রাজা বিক্রম সুমিত্রার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিয়াছেন—

হায় নারী কী কঠিন হৃদয় তোমার!
কোন কাজ নাই প্রিয়ে, মিছে উপদ্রব।
ধান্যপূর্ণ বসুন্ধরা, প্রজা সুখে আছে,
রাজকার্য চলিছে অবাধে।

তাহার উত্তরে রানী সুমিত্রা বলিলেন—

ওই শোনো ক্রন্দনের ধ্বনি—সকাতরে
প্রজার আহ্বান। ওরে বৎস, মাতৃহীন

নোস্ তোরা কেহ, আমি আছি—আমি আছি—
আমি এ রাজ্যের রানী, জননী তোদের।

—সুমিত্রার এই রানী বা জননী-সত্তা অবশেষে জয়ী হইল এবং সুমিত্রার প্রিয়া-সত্তা গৌণ হইয়া পড়িল অর্থাৎ ইহার মধ্য দিয়াই রাজার সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষভাবে বিরোধের সূত্রপাত দেখা গেল।

প্রথম অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যে সুমিত্রা রাজাকে পুনরায় তাঁহার কর্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে সুমিত্রার অন্তর আত্মধিক্কারে জর্জরিত হইয়া উঠিয়াছে। পরবর্তী তৃতীয় দৃশ্যে সুমিত্রা রাজ্যত্যাগ করিলেন—রাজাকে কিছুতেই তিনি ফিরাইতে পারিলেন না। বস্তুতঃ, ইহার পরের দৃশ্যে অর্থাৎ চতুর্থ দৃশ্যে যখনই বিক্রমের কাছে রানীর পলায়ন-সংবাদ পৌঁছিয়াছে, তখনি তাঁহার কোমল প্রেমিক রূপ মুহূর্তের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া তাঁহার মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে এক হিংস্র সত্তা। প্রথমে তিনি পলাতক সুমিত্রার সন্ধানে লোক পাঠাইবার কথা ভাবিলেন, পর মুহূর্তেই তাহা মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন—

ফিরাও ফিরাও মন্ত্রী। স্বপ্ন ছুটে গেছে,
অশ্বারোহী কোথা তারে পাইবে খুঁজিয়া?
সৈন্যদল করহ প্রস্তুত, যুদ্ধে যাব,
নাশিব বিদ্রোহ।

—যথার্থ নাটকীয়তা দেখা গেল এই দৃশ্য হইতেই।

পরবর্তী দৃশ্যগুলিতে এই নাটকীয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিক্রমের প্রেমিক রূপ আর দেখিতে পাই না, উন্মত্ত অশ্বের মতো তিনি শক্তি দিয়া শত্রুকে সংহার করিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দেখি বিক্রম যুধাজিৎ, শিলাদিত্য প্রভৃতিকে বন্দী করিয়াছেন। শুধুমাত্র জয়সেন পলাতক। এই দৃশ্যেই হঠাৎ খবর আসিল রানী সুমিত্রা জয়সেনকে বন্দী করিয়া শিবির প্রান্তে অপেক্ষা করিতেছেন। যাহাকে তিনি বন্দী করিতে পারিলেন না, একজন নারী তাহাকে বন্দী করিল—পৌরুষের এই বিক্ষুব্ধ অভিমান শেষবারের মতো বিক্রমের সমস্ত কোমলতা হরণ করিয়া তাঁহাকে চরম হিংস্ররূপে রূপায়িত করিয়াছে—

সাক্ষাৎ! কাহার সাথে! রমণীর সনে
সাক্ষাতের এ নহে সময়।

ট্রাজেডি এই যে, এই সুমিত্রার জন্যই তিনি গভীরভাবে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

সুমিত্রাকে ফিরিতে হইল। বিক্রমের হৃদয়ের অন্তরালে যেটুকু প্রেম অবশিষ্ট ছিল, এই বিক্ষুব্ধ অভিমানের প্রচণ্ড আবর্তে তাহা ফুৎকারে অন্তর্হিত হইল—প্রেমিক বিক্রম হইয়া উঠিলেন হিংস্র, প্রচণ্ড ও ভয়ানক। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল উন্মত্ত বিক্রম তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া পরাজিত করিতে চাহিয়াছেন সুমিত্রাকে—যে সুমিত্রা একদা ছিল তাঁহার সারাদিনের, প্রতি মুহূর্তের আরাধ্যা নারী। এইভাবে 'আহত প্রেম বাত্যাহত পথিকের মতো বিক্রমকে বন্ধুর পথে টানিয়া লইয়া গিয়াছে, যে পথে প্রেম নাই, দয়া নাই, মমতা নাই—আছে শুধু হিংস্রতা, আছে প্রচণ্ডতা, আছে বিকৃত পৌরুষের ভীষণতা।

বিক্রমের প্রেমের মধ্যে যদিও সততা বা নিষ্ঠার অভাব ছিল না, তথাপি সেই প্রেম জীবনের বৃহত্তর কল্যাণ দ্বারা পরিবৃত হইবার অবকাশ পায় নাই। সুমিত্রা রাজাকে কল্যাণের পথেই পরিচালিত করিতে চাহিয়াছিলেন। বিক্রম সেই পথে পা দিলেন না বলিযাই সুমিত্রা তাঁহার প্রেম প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং তখনই বিক্রমের প্রেম আত্মঘাতী হইয়া উঠিল অর্থাৎ তাঁহাকে আত্ম-বিনাশের পথে লইয়া গেল। শেষে এই আত্মঘাতী প্রেমের কাছেই আরো দুইটি নিষ্পাপ প্রাণবলি দিতে হইল এবং অসংখ্য প্রজাদের আর্তনাদে আকাশ বাতাস মুখর হইয়া উঠিল। বস্তুতঃ, বিক্রমের আত্যন্তিক ভ্রান্ত প্রেম শুধু তাঁহাকেই আঘাত করে নাই, আরো অনেককে আঘাত করিয়াছে —অর্থাৎ "আত্মঘাতী প্রেম হয়ে উঠেছে বিশ্বঘাতী।"

বলা বাহুল্য, এই ভাবে নাট্যবিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, নাটকীয় পরিণতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য খুবই যুক্তিপূর্ণ। বস্তুতঃ, এই নাটকে দেখি—প্রেমিক বিক্রম হইয়া উঠিয়াছেন হিংস্র বিক্রম—এই রূপান্তরের মধ্যেই রহিয়াছে নাটকীয় সূত্র। তাই বলা যায়, আপন সৃষ্টি সম্পর্কে বিজ্ঞ সমালোচকের মতো রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যা খুবই সমীচীন ও তাৎপর্যপূর্ণ।

১৪। 'রাজা ও রানী' নাটকের জনতার দৃশ্যগুলির নাটকীয় তাৎপর্য, এবং তাহাদের চিত্র ও চরিত্রের সার্থকতা প্রতিপন্ন কর।

উত্তর। 'রাজা ও রানী', 'বিসর্জন', প্রভৃতি নাটকে জনতার দৃশ্য রহিয়াছে, তাহার ভূমিকা অপ্রধান হইলেও বিষয়বস্তুর দিক দিয়া বিবেচনা করিলে দেখা যায়—তাহার মধ্য দিয়া এক বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে। ঐ দৃশ্যগুলি একদিক দিয়া যেমন উদ্দেশ্যমূলক, তেমনিই মনস্তত্ত্বধর্মী; নায়ক-নায়িকার চরিত্রাঙ্কন ছাড়াও সাধারণ মানুষের জীবনালেখ্য রচনার ক্ষেত্রেও যে রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, এই দৃশ্যগুলি তাহার পরিচয় বহন করিতেছে।

এই নাটকেও একাধিক জনতার দৃশ্য রহিয়াছে। যেমন—

(১) প্রথম অঙ্ক—২য় দৃশ্য
(২) দ্বিতীয় অঙ্ক—৩য় দৃশ্য
(৩) তৃতীয় অঙ্ক—১ম দৃশ্য
(৪) পঞ্চম অঙ্ক—২য় দৃশ্য
(৫) " —৮ম দৃশ্য

এই জনতার দৃশ্যগুলি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক, জালন্ধরের প্রজাবৃন্দ এবং দুই, কাশ্মীরের প্রজাবৃন্দ। প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের দুই দৃশ্য জালন্ধরের জনতা লইয়া রচিত এবং বাকী দৃশ্যগুলি কাশ্মীরের প্রজাদের লইয়া।

জালন্ধরের পটভূমিকায় যে দুইটি জনতার দৃশ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহাদের চিত্র ও চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখি, তাহাদের মধ্য দিয়া দেশের সাধারণ লোকের জীবনালেখ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিক্রমের রাজকার্যে অবহেলার ফলে বিদেশী কাশ্মীরী নায়কবৃন্দ রাজ্যে প্রজাদের উপর যে কী ভীষণ অত্যাচার চালাইতেছে এবং কীভাবে তাহার প্রতিক্রিয়া সুরু হইয়াছে —প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের জনতার উপস্থাপনের মাধ্যমে তাহা লক্ষ্য করা যায়। প্রজারা এমনিই উৎপীড়িত যে, তাহারা সহ্যের শেষ সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—

কিনু নাপিত। ওরে ভাই, কান্নার দিন নয়। অনেক কেঁদেছি, তাতে কিছু হল কি?

স্পষ্টতঃই বুঝা যায়, তাহারা রাজার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করিতে চায়—

হরিদীন। সব বুঝলাম, কিন্তু যে রকম কাল পড়েছে, রাজা যদি শাস্তর না শোনে?

এবং—

অনেকে। (উচ্চৈঃস্বরে) তবে শাস্তর চুলোয় যাক্—অস্তর ধরো।

কিন্তু আসলে তাহারা দুর্বল। রবীন্দ্রনাথ নিপুণতার সহিত সাধারণ মানুষের মনস্তত্ত্ব রূপায়িত করিয়াছেন। দেবদত্ত যে মুহূর্তে তাহাদের জানাইল যে রাজার কানে তাহাদের বিদ্রোহের কথা পৌঁছিবে, তখনই তাহারা ভীত হইয়া পড়িল—

অন্য সকলে। ঠাকুর আমাদের মাপ করো, ঠাকুর, মাপ করো—

বাস্তবিকপক্ষে, এই ধরণের চিত্রগুলি সত্যই চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে রাজা ও রানী সম্পর্কে প্রজাদের ধারণা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়াছে—

স্ত্রী। ওগো, রানীই তো রাজাকে জাদু করে রেখেছে। আমাদের রাজা ভালো, রাজার দোষ নেই, ঐ বিদেশ থেকে এক রানী এসেছে—সে আপন কুটুম্বদের রাজ্য জুড়ে বসিয়েছে। প্রজার বুকের রক্ত শুষে খাচ্ছে গো।

—বলা বাহুল্য, নাটকীয় বিষয়বস্তুর দিক হইতে এই দৃশ্যটি গম্ভীর তাৎপর্যপূর্ণ কারণ দেখা যায়—রানীর রাজ্যত্যাগে এই চিত্রটি সহায়তা করিয়াছে।

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটি কাশ্মীরের প্রাসাদসম্মুখের রাজপথে সংঘটিত হইয়াছে। একদল সৈনিক নিজের মধ্যে দেশের কথা বলিতেছে। তাহাদের কথাবার্তা হইতে বুঝা যায় যে, তাহারা যুবরাজ কুমারকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য আগ্রহী। এইভাবে, তাহাদের মধ্য দিয়া কুমারের রাজ্যব্যাপী জনপ্রিয়তা ও তাহার চরিত্রের মাধুর্য ও মাহাত্ম্য রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে—

প্রথম সৈনিক। খুড়ো-মহারাজকে গিয়ে বলব, তুমি নেমে এসো। আমরা রাজপুত্তুরকে সিংহাসনে চড়িয়ে আনন্দ করতে চাই।

পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য এক দিক দিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিক্রমদেব কাশ্মীর জয় করিতে আসিতেছেন শুনিয়া কাশ্মীরে প্রজাদের মধ্যে তাহার প্রতিক্রিয়া কীভাবে দেখা দিয়াছে, এই দৃশ্যটি তাহারই পরিচায়ক—

দ্বিতীয়॥ না বেচলে কি আর রক্ষে আছে? এ দিকে জালন্ধরের সৈন্য এল বলে। সমস্ত লুটে নেবে।...

কিন্তু ইহাতে তাহারা ভীত নহে—তাহারা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার আশায় আনন্দোন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে—

দ্বিতীয়॥ তোরা যা ভাই। আমি তামাসা দেখে আসি। সার বেঁধে খোলা তলোয়ার হাতে যখন সৈন্য আসে আমার দেখতে বড়ো মজা লাগে।

তাহারাও কুমারকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য ব্যাকুল, এই দৃশ্যের মধ্য দিয়া বুঝিতে পারা যায়—কুমার কীভাবে সকলের অন্তর জয় করিয়াছে।

এই অঙ্কের অষ্টম দৃশ্যটি ঠিক জনতার দৃশ্য না হইলেও, তদনুরূপ। কুমারের দুই জন অনুচরের কথোপকথনের মধ্য দিয়া একদিকে যেমন বিক্রমের অত্যাচারের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি আর একদিকে কুমার-সুমিত্রার প্রতি তাহাদের অসাধারণ আনুগত্যের ছবিটিও ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বস্তুতঃ, অপ্রধান হইলেও এই দৃশ্যগুলি মূল আখ্যানের সহিত সম্পৃক্ত থাকিয়া এক বৃহত্তর সাধারণ মানুষের জীবনালেখ্য রচনা করিয়াছে। তাহাদের জীবন সমস্যা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনুগত্য, দুর্বলতা, সূক্ষ্ম পরিহাস ইত্যাদির চিত্র ও চরিত্র এইসব দৃশ্যগুলির মধ্য দিয়া ধরা পড়িয়াছে। এবং এইসব দৃশ্যের উপস্থাপনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের চরিত্র-সৃষ্টির অসাধারণ দক্ষতার আর এক দিক ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাদের সংলাপগুলি তাহারই পরিচায়ক।

সবশেষে দৃশ্যবন্ধের তাৎপর্যের দিক হইতে বিচার করিলে বলিতে হয়—এই দৃশ্যগুলি নাটকের ভাবগম্ভীর আবহাওয়া ও পরিবেশের মধ্যে দর্শক বা পাঠকের মনকে ক্ষণকালের জন্য বিরতি বা Relief দেয়। এই দৃশ্যগুলি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।

১৫। 'রাজা ও রানী' নাটকের নায়কের চরিত্র বা বিক্রমদেবের চরিত্রটির স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

উত্তর। 'ভূমিকা'র অন্তর্গত 'চরিত্র-বিশ্লেষণ' অংশ দ্রষ্টব্য।

১৬। 'রাজা ও রানী' নাটকের নায়িকার চরিত্র বা সুমিত্রার চরিত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটন কর।

উত্তর। 'ভূমিকা'র অন্তর্গত 'চরিত্র বিশ্লেষণ' অংশ দ্রষ্টব্য।

১৭। 'রাজা ও রানী' নাটকের সুমিত্রা এবং 'তপতী নাটকের সুমিত্রা চরিত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় কি? আলোচনা কর।

উত্তর সঙ্কেত। 'চরিত্র বিশ্লেষণ' অংশে সুমিত্রার চরিত্র ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তাহার সহিত নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি মিলাইয়া উত্তরটি লিখিতে হইবে:

আলোচ্য দুইটি নাটকেরই নায়িকা সুমিত্রা। 'তপতী' 'রাজা ও রানী'রই রূপান্তর। সেই রূপান্তরের জন্য যেসব পরিবর্তন ঘটিয়াছে, সুমিত্রার চরিত্রও তাহার অন্যতম। অবশ্য, আপাতদৃষ্টিতে তপতী-র সুমিত্রা চরিত্রের সঙ্গে মূল নাটকের কোন বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ে না কিন্তু একটু গভীর দৃষ্টিপাত করিলেই দেখা যায় যে, মূল নাটকের সুমিত্রার সহিত বেশ কিছু পার্থক্য রহিয়াছে।

প্রথমতঃ, মূল নাটকে সুমিত্রা-র প্রতি কবির বিশেষ দৃষ্টির প্রয়াস নাই, পক্ষান্তরে তপতী-তে সুমিত্রার প্রতিই কবির সমস্ত দৃষ্টি আবদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ, মূল নাটকে সুমিত্রার ত্যাগনিষ্ঠ ও জননী রূপ ফুটিয়া উঠিলেও তাহাই প্রধান হইয়া উঠে নাই কিন্তু তপতী-তে সুমিত্রাকে গোড়া হইতেই সেইভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে। সুমিত্রার অগ্নিশুদ্ধ উৎসর্গীকৃত 'তপতী' রূপ চিত্রিত করাই তাঁহার অভিপ্রায় এবং সেইজন্যই নাটকের নামকরণ করা হইয়াছে—'তপতী'।

তৃতীয়তঃ, মূল নাটকের সুমিত্রার মধ্যে যুগপৎ প্রিয়া ও জননী রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, পক্ষান্তরে 'তপতী'-র সুমিত্রার মধ্যে জননী রূপই বা তপতী-রূপই উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে; আগাগোড়া এই চরিত্রটি তাহারই আলোকে রচিত। সেইজন্যই 'তপতী'-র সুমিত্রাকে টাইপ চরিত্র বলা যায়। চতুর্থতঃ, মূল নাটকের সুমিত্রার মধ্যে প্রখর ব্যক্তিত্বের অভাব রহিয়াছে, যেমন দেখা যায় 'তপতী'র সুমিত্রার মধ্যে।

বস্তুতঃ, এইভাবে উভয় নাটকের সুমিত্রা চরিত্রটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, বাহ্যতঃ অভিন্ন হইলেও মনোধর্মের ও প্রকৃতির দিক দিয়া রীতিমতো পার্থক্য রহিয়াছে। অর্থাৎ তপতী-র সুমিত্রাকে এইদিক হইতে নব রূপায়ণই বলা সঙ্গত।

১৮। কুমার সেন ও ইলার চরিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে তাহাদের প্রেমের স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

উত্তর। 'ভূমিকা'-র অন্তর্গত 'চরিত্র বিশ্লেষণ' অংশ দ্রষ্টব্য।

১৯। 'রাজা ও রানী' নাটকের অপ্রধান চরিত্রগুলির স্বরূপ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

উত্তর। 'চরিত্র বিশ্লেষণ' অংশ দ্রষ্টব্য।

২০। দেবদত্ত চরিত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

উত্তর। 'চরিত্র-বিশ্লেষণ' অংশ দ্রষ্টব্য। তদতিরিক্ত নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি যোগ করিতে হইবে :

সংস্কৃত নাটকে রাজার 'প্রিয় বয়স্য' হিসাবে বিদূষক চরিত্রের মূল উপজীব্য কৌতুক রস।

দেবদত্তকে একদিক দিয়া বিদূষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে দেখি একটু পরিবর্তিত রূপে, নহিলে মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই।

বাস্তবিকপক্ষে, কৌতুক-পরিহাসের উজ্জ্বল স্নিগ্ধ আলোকে আলোকিত এই চরিত্রটিতে এক অসাধারণ স্বাদ রহিয়াছে। তাহার চরিত্রে কোথাও উগ্রতা নাই, ক্ষণকালের জন্যও তাহাকে উত্তেজিত হইতে দেখা যায় না, বরং উত্তেজনার কারণ ঘটিলেও তাহাকে সে উচ্চহাস্যে তুচ্ছ করিতে জানে। সে তরুণ ব্রাহ্মণ, যথার্থ পণ্ডিত বলিয়াই পাণ্ডিত্যের বৃথা অভিমান নাই। এইখানেই ত্রিবেদীর সহিত তাহার পার্থক্য এবং এই গুণেই সে রাজার হৃদয় যেমন জয় করিয়াছে, তেমনি রানী সুমিত্রারও একান্ত বিশ্বাসভাজন পাত্র হইয়া উঠিয়াছে।

নাটকের সুরু হইতেই তাহাকে রাজার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরূপে দেখি এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে এই বন্ধুত্বের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া সে ভীরু বা দুর্বল নহে। রাজার অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতেও সে কুণ্ঠিত হয় নাই, তীব্র ব্যঙ্গোক্তিতে ও ধিক্কারে রাজাকে দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়াছে—

> রাজ্যের সংবাদ রাজ্য আপনি দিয়েছে।
> ঊর্ধ্বস্বরে কেঁদে মরে রাজ্য উৎপীড়িত
> নিতান্ত প্রাণের দায়ে—সে কি ভাবে কভু
> পাছে তব বিশ্রামের হয় কোন ক্ষতি?

ভয় নাই মহারাজ, এনেছি কিঞ্চিৎ
ভিক্ষা মাগিবার তরে রানীমার কাছে।
ব্রাহ্মণী বড়োই রুক্ষ, গৃহে অন্ন নাই,
অথচ ক্ষুধার কিছু নাই অপ্রতুল।

আবার, বিক্রমের মূঢ় বিবেকহীন বুদ্ধির জন্যই তাহাকে যখন জয়সেনরা বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল, যখন সে বন্দীদশা হইতে পুনরায় বিক্রমের দেখা পাইল, তখন সে কোন অভিযোগই করে নাই—বরং বন্দীদশার সমস্ত অত্যাচার উচ্চহাস্যে তুচ্ছ করিয়া দিল—

তাই বটে মহারাজ, রত্ন বটে আমি!
অতি যত্নে বদ্ধ করে রেখেছিলে তাই।
ভাগ্যবলে পলায়েছি খোলা পেয়ে দ্বার,
আবার দিয়ো না সঁপি প্রহরীর হাতে
রত্নভ্রমে।

জীবনের কোন দুঃখই তাহার হাস্যোজ্জ্বল মূর্তিটিকে ম্লান করিতে পারে না, এমনিই তাহার প্রাণের প্রাচুর্য।

কিন্তু তাই বলিয়া যে তাহার মধ্যে মানবিক গুণের বা জীবনরসের অভাব রহিয়াছে, তাহা নহে। দেবদত্ত সত্যই রিক্ত। তাহার গৃহে যাহা সঞ্চিত থাকে, তাহা দুঃস্থ প্রজাদের বিলাইয়া দেয়, অথচ তাহাকে থাকিতে হয় উপবাস করিয়া। সংসারের কোন বন্ধনেই সে ধরা দিতে চায় না। অথচ, এমন এক নিরাসক্ত আপনভোলা মানুষের মধ্যে নদীর অন্তঃস্রোতের মধ্যে জাগিয়া আছে এক প্রেমিক সত্তা, যে তাহার স্ত্রীকে ভালোবাসে, বিরহে ব্যাকুল হয়—

সত্য কথা বলি মহারাজ,
বিরহ সামান্য ব্যথা নয়, এবার তা
পেরেছি বুঝিতে। আগে আমি ভাবিতাম
শুধু বড়ো বড়ো লোক বিরহেতে মরে।
এবার দেখেছি, সামান্য এ ব্রাহ্মণের
ছেলে, এরেও ছাড়ে না পঞ্চবাণ—ছোটো
বড়ো করে না বিচার।

—এইখানেই তাহার চরিত্রের বৈচিত্র্য, মাহাত্ম্য, ও পরিপূর্ণতা। বিক্রমের বন্ধুরূপে এই চরিত্রটিকে উপস্থাপিত করিয়া, মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ বিক্রম-চরিত্রের রুক্ষতাকে আবৃত করিতে চাহিয়াছেন। এই দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, দেবদত্ত-চরিত্রের উপস্থাপন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

২১। বিক্রমদেব ও কুমারসেন,—এই দুইটি চরিত্রের একটি তুলনামূলক আলোচনা কর।

উত্তর সঙ্কেত। 'চরিত্র বিশ্লেষণের' মধ্যে এই দুইটি চরিত্রের আলোচনা করা হইয়াছে পৃথক্‌ভাবে। সেই আলোচনা এবং নিম্নলিখিত আলোচনাটি মিলাইয়া উত্তরটি লিখিতে হইবে:

বিক্রমদেব জালন্ধরের রাজা, কুমারসেন কাশ্মীরের যুবরাজ; উভয়ের মধ্যে এক গভীর আত্মীয়তা রহিয়াছে অর্থাৎ উভয়ের সম্পর্কটি মধুর বলা যায়। অথচ, ঘটনার আবর্তে উভয়ের মধ্যে জাগিয়াছে গভীর বিরোধ—এবং তাহার জন্যই কুমারকে আত্মবিসর্জন করিতে হইয়াছে।

বিক্রমদেব নায়ক, নায়কোচিত গুণের অভাব নাই তাঁহার চরিত্রে। কুমার বয়সে তরুণ হইলেও প্রতি-নায়ক, বিক্রমের প্রতিদ্বন্দ্বী। সুমিত্রাকে লইয়া সংঘাত দেখা দিয়াছে; সুমিত্রাকে রক্ষা করিবার জন্যই কুমার সুমিত্রার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত বিক্রমের সমস্ত রোষ তাহার উপরেই পড়িয়া তাহাকে দগ্ধ করিয়াছে।

হয়ত একথা ঠিক যে, কুমারের চরিত্রে বাহ্যতঃ প্রখরতা, বলিষ্ঠতা, বা প্রচণ্ডতা নাই। তথাপি, তাহার মধ্যে রহিয়াছে এক গভীর ও প্রবল সত্যনিষ্ঠা—যাহার পার্শ্বে বিক্রম দাঁড়াইতে পারে না এবং এই সত্যনিষ্ঠ আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তই তাহার চরিত্রকে মহৎরূপে চিত্রিত করিয়াছে। তাহার চরিত্রের এই গুণের জন্যই কাশ্মীরের প্রজারা তাহাকে গভীরভাবে ভালোবাসিয়াছে। এবং এই সত্যনিষ্ঠার জন্যই সে সমস্ত দুঃখকে বরণ করিয়া শেষে প্রাণাবসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই।

অন্যদিকে, বলিষ্ঠতা সত্ত্বেও বিক্রমের চরিত্রের কোথাও এই মাধুর্য পরিলক্ষিত হয় না। পঞ্চম অঙ্কের শেষ দৃশ্যে অবশ্য অনুতপ্ত চিত্তে বিক্রমদেব কুমারকে আলিঙ্গন করিবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিয়াছেন কিন্তু কুমার-চরিত্রে যে স্বাভাবিক স্নিগ্ধতা আছে, তাহা বিক্রমের মধ্যে নাই।

তাঁহারা উভয়েই প্রেমিক, কিন্তু পার্থক্য আছে। বিক্রমদেবের প্রেম ভোগ-নিষ্ঠ বলিয়া সুমিত্রাকে বন্ধনের মধ্য দিয়া জয় করিতে চাহিয়াছে, সেই প্রেম আত্মঘাতী এবং শেষে বিশ্বঘাতী হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কুমারের প্রেম মুক্তির মধ্য দিয়া ইলাকে জয় করিতে চাহিয়াছে বলিয়াই ইলাকে গভীরভাবেই পাইয়াছে।

বস্তুতঃ, এই দুই চরিত্রের মধ্য দিয়া প্রেমের ঐ দুইটি দিক উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। এখানেই এই দুই চরিত্রের তাৎপর্য ও সার্থকতা।

২১। রেবতী-চরিত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

উত্তর। রেবতী চরিত্রটি এই নাটকের গৌণ চরিত্রের অন্যতম হইলেও তাহার এক স্বতন্ত্র স্থান রহিয়াছে। একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, চন্দ্রসেন এবং রেবতী-চরিত্রের মধ্যে যথাক্রমে Macbeth ও Lady Macbeth-এর প্রভাব পড়িয়াছে। Macbeth-কে Lady Macbeth যেমন পাপ-কার্যে প্ররোচিত করিয়াছিল, রেবতীও অনুরূপ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।

তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে যে মুহূর্তে সে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়, সেই মুহূর্তেই তাহার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়া উঠে—

> যেতে দাও মহারাজ। কী ভাবিছ বসি?
> ভাবিছ কী লাগি? যাক যুদ্ধে—তার পরে
> দেবতাকৃপায়, আর যেন নাহি আসে
> ফিরে।

ইহার পর মুহূর্তেই রেবতীর হিংস্র রূপ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—

> ক্ষুধিত মার্জার
> বসেছিলে এতদিন সময় চাহিয়া,
> আজ তো সময় এলো—তবু আজো কেন
> সেই বসে আছ।

Lady Macbeth-ও বলিয়াছে—

> Nor time nor place
> Did then adhere, and yet you would make both.
> They have made themselves, and their this fitness now
> Does unmake you.

এই দৃশ্যেই কুমার রেবতীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলে সে বলে—'কী হইবে মিথ্যা আশীর্বাদে!'

বস্তুতঃ, রেবতী কুমারকে সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য এমনই উন্মত্ত যে, পাপের সর্বশেষ স্তরে নামিলেও সে কুণ্ঠিত হয় না। আবার কূটনীতিতেও রেবতী রীতিমতো পারদর্শিনী। পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়—

> যুদ্ধসজ্জা? কেন যুদ্ধ সজ্জা! শত্রু কোথা!
> মিত্র আসিতেছে! সমাদরে ডেকে আনো
> তারে। করুক সে অধিকার কাশ্মীরের
> সিংহাসন। রাজ্যরক্ষা-তরে তুমি এত
> ব্যস্ত কেন? এ কি তব আপনার ধন?
> আগে তারে নিতে দাও, তার পরে ফিরে
> নিয়ো বন্ধুভাবে। তখন এ পররাজ্য
> হবে আপনার।

চন্দ্রসেনকে রেবতী এইভাবে বারবার হিংস্র পাপের পথে পা বাড়াইতে প্ররোচনা দিয়াছে। Lady Macbethও এমনি করিয়া Macbeth-কে পাপের অন্ধকারে ঠেলিয়া দিয়াছিল।

প্রথমে কুমার ইহাদের চিনিতে পারে নাই। কিন্তু পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই কুমার ও সুমিত্রার নিকট তাহার এই ঘৃণ্য চরিত্র স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাই সুমিত্রা তাহাকে তীব্র ধিক্কারে ঘৃণাভরে বলিয়া উঠে—

> ধিক্ পাপ! চুপ করো মাতা। নারী হয়ে
> রাজকার্যে দিয়ো না, দিয়ো না হাত। ঘোর
> অমঙ্গলপাশে সবারে আনিবে টানি,
> আপনি পড়িবে।

রেবতীর এই জঘন্য নীচ মনোবৃত্তির চরম পরিচয় পাওয়া যায়, যখন বিক্রমদেবকেও কুমারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছে। বিক্রমদেব ভাবেন নাই যে, রেবতীর মধ্যে এক হিংস্র কালনাগিনী বাস করিতেছে। তিনি ভাবিয়াছিলেন হয়ত কুমারের জন্য রেবতী ক্ষমা চাহিবে। কিন্তু অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে রেবতীকে বলিতে শুনিলেন—

এই শুধু! আর কিছু
নয়? অবশেষে মার্জনা করিবে যদি
তবে কেন এত ক্লেশে এত সৈন্য লয়ে
এত দূরে আসা!

এবং—

তবে কেন এত অস্ত্র এনেছ বহিয়া?
এত অসি শর?

তাহার চরিত্রের নাটকীয় বীভৎসতার চরম পরিচয় পাওয়া যায়, যখন সে বলে—

প্রজাগণ
লুকায়ে রেখেছে তারে; আগুন জ্বালাও
ঘরে ঘরে তাহাদের। শস্যক্ষেত্র করো
ছারখার। ক্ষুধা-রাক্ষসীর হাতে সঁপি
দাও দেশ, তবে তারে করিবে বাহির।

আপন স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য এমনি করিয়া রেবতী পাপের ও মনুষ্যত্বের অবমাননার গভীরতম পঙ্কে ডুব দিয়াছে। রেবতী এমনিই স্বার্থান্ধ যে, তাহার প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য সমগ্র দেশকে সর্বনাশের পথে ঠেলিয়া দিতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না।

শেষে চন্দ্রসেনের চরিত্রেরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু রেবতীর চরিত্রে কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। বিদায় লইবার আগে সে শেষবারের মতো উদ্যত ফণা তুলিয়া বিষ ছড়াইয়া গেল—

এ রোষ রবে না চিরদিন।

চন্দ্রসেন তাহাকে বলিয়াছে—'রাক্ষসী, পিশাচী' এবং দেখা যাইতেছে সেই রূপের কোন পরিবর্তন ঘটিল না। তাই বলা যায়, 'রাজা ও রানী'-নাটকে তাহার এক স্বতন্ত্র স্থান রহিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনার মধ্যে নারীর একটি রূপই নানাভাবে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে—তাহা কল্যাণময়ী-মূর্তি; যে ভাবেই দেখা যাক না কেন, নারীকে তিনি কখনোই নিছক মায়ামমতা-স্নেহ-প্রেমহীনা রূপে চিত্রিত করেন নাই। একমাত্র রেবতীই তাহার ব্যতিক্রম। তাই সমগ্র রবীন্দ্র-

সাহিত্যে তাহার একটি স্বতন্ত্র স্থান রহিয়াছে। সে তাহার নাটকীয় বীভৎস পৈশাচিক মূর্তি লইয়া পাঠক বা দর্শককে ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া দেয়।

সর্বোপরি, যদিও Lady Macbeth-এর প্রচ্ছায়ায় রেবতীর চরিত্র রচিত, তথাপি সে যেন Lady Macbeth কেও পাপের প্রতিযোগিতায় অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। তাহারা উভয়েই ক্রূর, হিংস্র এবং স্বার্থান্ধ। Lady Macbeth যখন পাগল হইয়া গেল, তখন তাহার জন্য পাঠক বা দর্শকের মনে করুণা ও সহানুভূতি জাগে। কিন্তু, ক্ষণকালের জন্যও রেবতীর বীভৎসতা মন্দীভূত হইল না। এইখানেই উভয়ের পার্থক্য। ভয় হয়, তাহার স্পর্শে বাতাসও বুঝি বিষাক্ত হইয়া উঠিবে!

[শেষ]

পাঠ্যতালিকা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—প্রেমের তুলনা ; ভাবোল্লাস , শচীমার বিলাপ ; অভাগিনীর আক্ষেপ , গৌরচন্দ্র , বর্ষাবিরহ ; খুল্লনার বারমাসী , দেবসভায় বেহুলা , লীলার বিলাপ , হবিহোড়ের বৃত্তান্ত , প্রসাদী (১ : মন তোর এত ভাবনা কেনে, ৪ : আর কাজ কি আমার কাশী) , মিত্রাক্ষর , রাবণ ও চিত্রাঙ্গদা , মেঘনাদ ও বিভীষণ , দিবাবসানে , আদিকবি , জীবন মরীচিকা , অলকাপুরী , কৃষ্ণার্জুন , বৈশাখ , জিজ্ঞাসা , হাসি অশ্রু , চেরিপুষ্প , জ্ঞান ও ভক্তি , রেবা , মাধবিকা , গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড্ , কবর ই নরজাহান , লোহার ব্যথা , কালাপাহাড , খণ্ডকপালী , জীবন-বন্দনা ।

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়—বংশীনাদ গৌড়েশ্বরের সভায় কৃত্তিবাস , শ্যামসুন্দর , প্রেমের তুলনা , ভাবোল্লাস , প্রতীক্ষমানা , মথুরার দূতী , শ্রীকৃষ্ণের রূপ , অভাগিনীর আক্ষেপ , দুশ্চর সাধনা , বর্ষাভিসার , খুল্লনার বারমাসী , শিবের সমুদ্রমন্থনে যাত্রা , রতি বিলাপ , প্রসাদী (১) সমুদ্রের প্রতি , মেঘনাদ ও বিভীষণ , ফাঁকি , স্বর্গ হইতে বিদায় , ভাষা ও ছন্দ , তাজমহল , কবর-ই-নূরজাহান , বসন্ত আগমনী , জীবন-বন্দনা , শ্রাবণ-বন্যা , মেরুর ডাক , কেতকী , মঞ্জীর , আর কিছু নাহি সাধ , কাশ্মীর ।

কেন্দ্রীয় মধ্যশিক্ষা পর্ষদ : দিল্লী—বাল্মীকি , মেঘনাদ ও বিভীষণ , আদিকবি , সখীর প্রতি শচী , জিজ্ঞাসা , ভাষা ও ছন্দ , পৃথিবী , ধরায় দেবতা চাহি , শ্রীক্ষেত্র , মাধবিকা , মহাকাল , বৈকালী , লোহার ব্যথা , খণ্ডকপালী , দুইটি সত্যবাণী , জীবন বন্দনা , মেরুর ডাক ।

মাধুকরী—[মধুকর (ভ্রমর)+অ তুল্যার্থে+ ঈ (স্ত্রীং) অথবা মধুকর+ষ্ণ, ইদমর্থে+ঈপ্] বি, মধুকরের মত নানাস্থান হইতে অর্থসঞ্চয়; ভিক্ষোপজীবীর পঞ্চস্থান হইতে ভিক্ষাহরণ; পঞ্চ গৃহে ভিক্ষা। বৈষ্ণবদের নিকট মাধুকরী অর্থে পঞ্চগৃহ হইতে ভিক্ষাগ্রহণরূপ বৃত্তি বুঝায় এবং ইহাই মাধুকরী শব্দের রূঢ়ি-অর্থরূপে প্রসিদ্ধ। কাব্যসংকলনের ক্ষেত্রে রূঢ়ি অপেক্ষা মৌলিক অর্থই প্রযোজ্য, কিন্তু সংকলনের স্বার্থে কাব্য-চয়নের বিনীত আদর্শও এক হিসাবে ভিক্ষাহরণ।

মাধুকরী-কাব্য সংকলন ঃ

মাধুকরী শব্দের অর্থ মধুকরের ন্যায় পঞ্চ স্থান হইতে সঞ্চিত বস্তু। মধুকর যেমন নানা পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া মধুচক্র রচনা করে, তেমনি কাব্য-রসপিপাসু ব্যক্তি ও সারস্বত উদ্যানের বহুতর কাব্যপ্রসূন হইতে 'কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু' আহরণ করিয়া এই কাব্যসংকলন নির্মাণ করিয়াছেন, ইহাই মাধুকরী নামের তাৎপর্য। উনবিংশ শতাব্দীর মহাকবি মধুসূদন বিশ্বসাহিত্যের রসসম্পদ আত্মগত করিয়া জাতীয় জীবনের আত্মপ্রকাশের আবেগ আপন অন্তরে অনুভব করিয়াছিলেন। ইহারই ফলশ্রুতি তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, তাঁহার নাটক-প্রহসনাদি। এইজন্য মেঘনাদবধ কাব্যের সূচনায় কবি তাঁহার মহাকাব্য রচনার প্রেরণাস্বরূপ বিশ্বের মহাকাব্যের পথিকৃৎদিগকে প্রণাম জানাইয়া কাব্য-বীণাপাণির উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনান্তে বলিয়াছেন,

'মাধুকরী'র অর্থব্যঞ্জনা

উর তবে উর, দয়াময়ি
বিশ্বরমে! গাইব মা বীররসে ভাসি
মহাগীত; উরি দাসে দেহ পদছায়া।
—তুমিও আইস, দেবী, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

সাহিত্যে সংকলনের রীতি সুপ্রাচীন। কোন বিশেষ কালের অথবা সাহিত্যের বিশিষ্ট কোনো শাখার সামগ্রিক রূপের সহিত উত্তরকালের বা সমকালীন পাঠকবর্গের পরিচয় সাধনই এই জাতীয় সংকলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইংরাজি সাহিত্যে anthology শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ পুষ্পগুচ্ছ বা মাল্যগ্রন্থন। সঞ্চিতা, সঞ্চয়িতা, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, কাব্যদীপালি ইত্যাদি নামকরণের মধ্যে সংকলনের অনুরূপ উদ্দিষ্ট

সাহিত্যে সংকলন

অর্থ নিহিত আছে। সংকলনের উদ্দেশ্য নানাবিধ হইতে পারে, যথা—(১) কোনো সাহিত্যিক গোষ্ঠীর সৃষ্টি ও তাহার প্রকৃতির সহিত পাঠকশ্রেণীর পরিচয়-সাধন; (২) কোনো সাহিত্য-আন্দোলনের গতি ও লক্ষণগুলি নির্দেশিত করা; (৩) সাহিত্যের কোনো একটি ধারার, যেমন, কাব্য, নাটক, রসরচনা, ছোটগল্প, ডিটেকটিভ গল্প ইত্যাদি, পরিচয়-দান; (৪) কোনো কাল-বিশেষের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ, যথা ষোড়শ শতাব্দীর সাহিত্য, বিংশ শতাব্দীর কবিতা ইত্যাদি, (৫) সাহিত্য-বিষয়ক কোনো মতবাদ, রুচি অথবা সাহিত্য-বিকাশের বিশেষ প্রবণতাকে মুখ্য করিয়া তোলা, যেমন মার্কস্‌-পন্থী সাহিত্য-সংকলন অথবা স্বদেশী-সাহিত্য; (৬) ব্যক্তি বিশেষের রচনা-চয়ন, (৭) রস-বিচার, সামাজিক তাৎপর্য, ধর্ম বা রাজনীতিঘটিত সঞ্চয়ন, (৮) বিশুদ্ধ সাহিত্যাস্বাদের নিমিত্ত কালানুক্রমিক রচনাসংগ্রহ ইত্যাদি। মাধুকরী কবিতা-চয়নিকা শেষোক্ত উদ্দেশ্যেরই দৃষ্টান্ত। তবে ইহার মধ্য দিয়া অন্যান্য উদ্দেশ্যের সাহিত্য অল্পবিস্তর পরিচিত হওয়া যায়।

সংকলনের বিবিধ উদ্দেশ্য

বাঙলা সাহিত্যের ধূসর অতীত কাল হইতে নানা উদ্দেশ্যে কাব্যসংকলনের প্রণালী প্রচলিত আছে দেখা যায়। চর্যাপদগুলি বৌদ্ধ সাধনভজনের পদচয়ন। বৈষ্ণব সাহিত্যে কবিগোষ্ঠী, বৈষ্ণব-কাব্যরীতি, দর্শন ও কাব্যের মতবাদ প্রচারার্থে চৈতন্যোত্তর যুগ হইতে একাধিক সংকলনগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। সংস্কৃত ও প্রাকৃত-অপভ্রংশেও সংগ্রহ-গ্রন্থের নমুনা দৃষ্ট হয়। কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়, সদুক্তিকর্ণামৃত, প্রাকৃতপৈঙ্গল, গাহা সত্তসঈ এইরূপ সংকলন-গ্রন্থ। মনসা-মঙ্গল কাব্যের বাইশা নামক একপ্রকার সংকলন গ্রন্থের কথা সাহিত্যের ইতিহাসে জানা যায়। সুতরাং সংকলন গ্রন্থের মাধ্যমে এক বা একাধিক ব্যক্তির প্রযত্নে জনসাধারণের রুচিকে উন্নত করা ও সাহিত্য-স্রষ্টাদের সমবেত সৃষ্টির সহিত পরিচয়-সাধন-চেষ্টা বাঙলা দেশে নূতন নয়। বিবিধ সংকলনের আবার নানাবিধ টীকা-ভাষ্যও প্রকাশিত হইয়াছে। অধিকাংশ বৈষ্ণব পদসংকলন কীর্তন-গায়কদের ব্যবহারিক প্রয়োজন করা হইয়াছিল।

আধুনিক যুগের শিষ্টরুচি পাঠক সাহিত্য-সংকলনের মধ্য দিয়া সংক্ষেপে কোনো কাল এবং সাহিত্যের নানা রূপান্তরের সহিত সহজে পরিচিত হইতে

পারেন বলিয়া এ-কালেই সাহিত্য-সংকলনের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাতে একদিকে যেমন সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিকাশের সূত্রটিকে অনুসরণ করা যায়, তেমনি নিরপেক্ষভাবে সমগ্র সৃষ্টির মূল্যায়ন সহজসাধ্য বলিয়া বোধ হয়। ভূয়সী রচনার বদলে প্রতিনিধিমূলক রচনার দ্বারা রচয়িতার প্রধান বৈশিষ্ট্যের সহিতও পরিচয় ঘটে, আবার অপ্রধান লেখকদেরও সৃষ্টিগুলি অনুপেক্ষিত থাকে না। এইভাবে একটি মিতায়তন সংকলনে অতীত-বর্তমান, দূরকাল ও সমকাল, সূর্য ও তারকা, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র, স্মরণীয় ও অনাদৃত একত্রে অবস্থান করে।

সংকলনের আধুনিক প্রয়োজন

প্রাচীন বাঙলা কাব্যের প্রতিষ্ঠাকালের কবি হইতে অধুনাতন বঙ্গ সাহিত্যের তরুণ কবি পর্যন্ত 'মাধুকরী' কাব্যসংকলনে স্থান পাইয়াছে। ইহাই 'মাধুকরী' কাব্যসংকলনের বৈশিষ্ট্য। ইহার সংকলন-কর্তা কবিশেখর কালিদাস রায় স্বয়ং কবি। রবীন্দ্রোত্তর বাঙলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে পল্লীপ্রীতি, বৈষ্ণব-ভাবাতুরতা, মাধুর্য ও অতীতপ্রীতির এক বিশিষ্ট সুর প্রবর্তনে তাঁহার কৃতিত্ব অবিসংবাদিত। তাঁহার কাব্যকবিতার মধ্য দিয়া বাঙালী সাহিত্যের যুগযুগবাহিত স্রোতস্বতীর ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার নিঃশব্দে প্রবাহিত হইয়াছে। বাঙলার সনাতন সংস্কৃতি ও বাঙালী ভাবধারার সুযোগ্য উত্তরসাধক তিনি। সুতরাং অতীত হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বাঙলা কবিতার আদর্শ সংকলনে তাঁহার নৈপুণ্য নিঃসংশয়িত। "কবিমনের সুকুমার স্পর্শে, বিধিদত্ত আত্মীয়তার অধিকার বলে কবিশেখর মহাশয় তাঁহার কবিভ্রাতৃগোষ্ঠীর অন্তরের নিগূঢ় পরিচয়টি নিজে জানিয়া পাঠককে জানাইয়াছেন।...প্রত্যেকটি লেখক তীর্থদেবতার ন্যায় অকৃত্রিম ভক্তি ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্যে সম্বর্ধনা লাভ করিয়াছেন। আমাদের মত যাহাদের তীর্থযাত্রার দুর্গম পথ অতিক্রম করিবার শক্তি নাই, অথচ যাহারা তীর্থযাত্রার পুণ্যসঞ্চয়ের প্রতি লোভাতুর, তাঁহারা কবিশেখর মহাশয়ের মানস-অনুসরণ করিয়া তাঁহার বিপুল সাধনার কিঞ্চিন্মাত্র ফলের অধিকারী হইবার প্রত্যাশী। প্রার্থনা করি, কবিশেখর মহাশয় সাহিত্যের নূতন নূতন তীর্থস্থানে আমাদের পরিচালিত করিয়া আমাদের মুগ্ধ অন্তরের নিকট নূতন নূতন তীর্থমাহাত্ম্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া

'মাধুকরী' সংকলন-প্রসঙ্গে

মাদৃশ ক্ষীণপুণ্য প্রাকৃতজনের সুকৃতি-বৃদ্ধির সহায়তা করিতে থাকুন।" [ডঃ শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ে'র পরিচায়িকা হইতে উদ্ধৃত।]

প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের দিগ্‌বলয়ঃ

সাহিত্য-সংস্কৃতির মধ্য দিয়া জাতির মানস-ইতিহাস অগ্রসর হয়। নদীমাতৃক যুদ্ধবিমুখ মৃত্তিকানির্ভর বাঙালী-জীবনের সনাতন জীবনধারা আবহমান কাল হইতে তাহার কাব্যচর্চা, পাঁচালি-মঙ্গলকাব্য—রামায়ণ-মহাভারত-পদাবলীর মধ্য দিয়া রক্ষিত হইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্য-পাঠের ফলে জাতীয় জীবনের সাংস্কৃতিক মানচিত্র রচনার বহুতর উপাদান আবিষ্কৃত হয়। বহির্জীবনে যতই পরিবর্তন ঘটুক না কেন, বাঙালী-জীবনের এক শাশ্বত অপরিবর্তনীয় বৈশিষ্ট্য, ইহাদের মধ্য দিয়া আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া বাঁচিয়া থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, প্রাচীন সাহিত্য-পাঠের প্রতি আধুনিক পাঠকের মনোযোগ ক্ষীয়মান হইয়া উঠিতেছে। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের উচ্চতর পরীক্ষার ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনেই তাহা সীমাবদ্ধ। ইহার অন্যতম কারণ হয়ত, আধুনিক কালের বুদ্ধিপ্রধান সাহিত্যের তুলনায় সেই সকল সাহিত্যের আকর্ষণহীনতা। এই বিষয়ে জনৈক শ্রদ্ধাভাজন পণ্ডিত-মনীষীর মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য—"প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের অনুশীলন আধুনিকপূর্ব যুগে সাধারণ লোকের মধ্যেই প্রচলিত ছিল—শিক্ষিত সমাজে ইহার তেমন আদর ছিল না। ক্বচিৎ দুই একজন রাজা নবাব বা রাজদরবারের লোকের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা কোনো কোনো লেখকের ভাগ্যে জুটিয়াছে সত্য, কিন্তু প্রায় সকলেরই আসল পৃষ্ঠপোষক জনসাধারণ। জনসাধারণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই প্রাচীন কবিগণ কাব্য রচনা করিতেন। জনসাধারণের আসরে তাঁহাদের কাব্য গীত বা পঠিতও হইত। তাহারা ইহা শুনিয়া আনন্দ লাভ করিত।

প্রাচীন সাহিত্য-পাঠের প্রয়োজনীয়তা

সাধারণ লোকের জন্য রচিত এই সাহিত্য স্বভাবতই শিক্ষিত সমাজের তৃপ্তি বিধান করিতে পারিত না। তাঁহারা সংস্কৃত বা ফারসীর মারফৎ তাঁহাদের সাহিত্যরস-পিপাসা পরিতৃপ্ত করিতেন—নিজেদের মাতৃভাষায় রচিত

গ্রন্থ তাঁহারা আলোচনার যোগ্য বিবেচনা করিতেন না। ইহা তাঁহাদের নিকট একরূপ অপাংক্তেয় ছিল। বিশাল সংস্কৃত ও ফারসী সাহিত্যের নিয়মিত পঠন-পাঠন, সংগঠন ও সমালোচনে তাঁহারা তাঁহাদের সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিতেন। একদিকে সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য প্রাদেশিক ভাষায় লঘু সাহিত্যসৃষ্টি হইয়াছে, অপরদিকে সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় উচ্চাঙ্গের লঘু সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে নানা বিষয়ে গুরুগম্ভীর গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। জ্ঞানাহরণের জন্য এই সব গ্রন্থ ছিল অপরিহার্য। বাঙলা বা অন্য প্রাদেশিক ভাষায় রচিত গ্রন্থ প্রধানত অবসর বিনোদনের যোগ্য ছিল। এই অবস্থায় বাঙলা ভাষায় রচিত সাহিত্য যথোচিত উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে অল্প শিক্ষিত সাধারণ লোকের মধ্যে ইহার আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকায় কালক্রমে নানারূপ বিকৃতি ও অশুদ্ধি ইহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। ফলে উচ্চশিক্ষার অঙ্গনে ইহার আসন নির্দিষ্ট হইলেও ইহা ছাত্র-সমাজে বা শিক্ষিত-মহলে তেমন সমাদর ও প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই। ছাত্রদের প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের আলোচনা পরীক্ষার প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ; প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যচর্চাকে যাঁহারা জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন এমন পণ্ডিতের সংখ্যা নগণ্য। অথচ নিছক সাহিত্যের দিক দিয়া এই সাহিত্যের মূল্য যাহাই হউক না কেন, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্বের দিক দিয়া ইহার মূল্য অবিসংবাদিত। প্রকৃত দেশকে যদি জানিতে হয়—দেশের জীবনধারার সঙ্গে যদি পরিচয় লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের দ্বারস্থ হইতে হইবে—ইহার প্রতিটি পংক্তি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করিতে হইবে—ইহার প্রকৃত পাঠ উদ্ধার করিয়া অর্থ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে হইবে।" [অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত সাহিত্য-পত্রিকায় প্রাচীন বাঙলা সাহিত্য-চর্চা প্রবন্ধ।]

খ্রীষ্টীয় নবম শতকের নিকটবর্তী সময়ে বাঙলা ভাষার নিজস্ব প্রকৃতি বিকাশ লাভ করে এবং আনুমানিক দশম শতকে সৃজ্যমান বঙ্গভাষায় বৌদ্ধসাধন-ভজনের গান চর্যাপদগুলি রচিত হয়। দশম হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই দীর্ঘ প্রায় এক সহস্র বৎসর বাঙলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগ সম্পূর্ণ কাব্যবৃত্ত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ইংরাজি সভ্যতার

প্রতিষ্ঠায় ও বিদেশী শাসনের ফলে জাতীয় জীবনের সর্বাত্মক পরিবর্তনে সাহিত্যে গদ্যরীতির প্রচলন ঘটে এবং পুরাতন কাব্যধারা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়। প্রাচীন কালে বাঙলার গ্রামগুলি ছিল স্বয়ংনির্ভর ও সীমাবদ্ধ। আঞ্চলিকতা অতিক্রম করিয়া গ্রামীন চিন্তা ও সম্পদ, মনীষা ও সংস্কৃতি কদাচিৎ বৃহত্তর জনগণমানসে ছড়াইয়া পড়িত। এযুগে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। শিক্ষিত, এমন কি অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও ছিল মুষ্টিমেয়। সমাজগুলি ছিল সামন্ততান্ত্রিক, মানুষের ব্যক্তিচেতনা সমাজের প্রভুত্বে নির্বাপিত ছিল। ধর্মচেতনা, দৈব-মাহাত্ম্য, অদৃষ্টে বিশ্বাস, পূজা অনুষ্ঠান, মঙ্গলাচার, মানুষের প্রাত্যহিক সংস্কার ও চর্যার অঙ্গীভূত ছিল। এই যুগের কবিরা ধর্মপ্রেরণাতেই কাব্য রচনা করিতেন, সর্ব নিরক্ষর জনসাধারণ তাহা সঙ্ঘবদ্ধভাবে শ্রবণ করিতেন। স্পষ্টতই লোকচেতনা ও জনসাধারণের বোধগম্য সহজ পৌরাণিক বিশ্বাস এই ধরণের সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রণ করিত। এইভাবে জনশ্রুতির মধ্য দিয়া গানের আকারে পরিবেশন করা হইত বলিয়া প্রাগাধুনিক বাঙলা কাব্য মুখ্যত ছন্দোবদ্ধ ও কাব্যবৃত্ত। গদ্য বুদ্ধির ভাষা, প্রয়োজনের ভাষা, মননশীলতা ও যুক্তির বাহন। কিন্তু মধ্যযুগীয় সাহিত্য যুক্তির বদলে অলৌকিকতা ও অন্ধবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা পাঠোপযোগী নয়, শ্রুতির মাধ্যমে প্রচারিত ছিল, সুলভ-প্রচার্য মাহাত্ম্য-প্রতিষ্ঠাই ছিল ইহাদের বিষয়। তাই এইগুলি স্বাভাবিকভাবেই কবিতার বাণীরূপ অবলম্বন করিয়াছে। চর্যাপদ হইতে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যের প্রায় সমগ্র অংশই সুরে তালে গীত হইত।

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য কাব্যবৃত্ত কেন

সাহিত্য সমাজ-জীবনের উপদর্পণ। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যও সমকালীন বাঙালী সমাজের ভাব ও ভাবনা আশা ও আকাঙ্ক্ষা চিন্তা ও চেতনার সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। গ্রামকেন্দ্রিক জীবনযাত্রা, ধর্মভাবাপন্নতা, জীবনরস রসিকতা, আদর্শবান বলিষ্ঠ পুরুষচরিত্রের অভাব, অলৌকিকতায় বিশ্বাস, ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রার্থনা—মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত এই বাঙালী জীবন-বৈশিষ্ট্যগুলি তৎকালীন বাঙালী সমাজেরই আলেখ্য। সাধারণত অল্প শিক্ষিত অথবা সংকীর্ণদৃষ্টি বাঙালী কবির জীবন-অভিজ্ঞতা সুদূর-প্রসারিত ছিল না বলিয়া

সাহিত্য ও সমাজ

তাঁহাদের কাব্যে প্রত্যক্ষদৃষ্ট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমাজের ও পারিবারিক জীবনের খুঁটি-নাটি বস্তু ও উপকরণের প্রতিফলন ঘটিয়াছে। অবশ্য বৈষ্ণব পদাবলীতে এই সমাজদৃশ্য অপেক্ষাকৃত কম, তুলনায় মঙ্গলকাব্য-পাঁচালিতে আমাদের বাস্তব সমাজেরই অবিসংবাদিত প্রাধান্য। এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞের অভিমত—

"সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, কোনও দেশের কোনও যুগের সাহিত্যই জাতীয় জীবনের সমগ্রতা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। কোনও যুগের সাহিত্য ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, তাহার পূর্ব-ইতিহাসের সহিত কিঞ্চিৎ সাধারণ পরিচয় এবং সেই বিশেষ যুগের জাতীয় জীবনের সমগ্রতার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রয়োজন রহিয়াছে"—[ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত।]

আধুনিক যুগের পূর্ব পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্য প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে ধর্মের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। এই সম্পর্কে পুনরায় জনৈক ইতিহাসকারের অভিমত সংকলন করা যাক—

ধর্ম ও সাহিত্য

"ধর্ম-সাহিত্য সংস্কৃত সাহিত্যের একটি অঙ্গমাত্র, কিন্তু বঙ্গ-সাহিত্যের শরীর। বাঙালীর জাতীয় জীবনই ইহার জন্য দায়ী। জাতীয় মন অপরিণত, সংকীর্ণ ও আদিম ধর্মভাবের ভাবুক। বৈষ্ণব, শাক্ত, সহজিয়া, বাউল প্রভৃতি ধর্মগোষ্ঠীর পরিচয়ই তাৎকালিক বাঙালীর প্রধান পরিচয়। কবি জনতারই অধীন, কাজেই কাব্য সাধারণত গোষ্ঠীগত ধর্ম-সাহিত্য। এমন কি বঙ্গ-সাহিত্য যেখানে গোষ্ঠী-বহির্ভূত বারোয়ারি সভার সাহিত্য, সেখানেও প্রাকৃত বা লৌকিক হইয়া উঠিতে পারে নাই, কবি সেখানে ইষ্টদেবতা বা কুলদেবতার পরিবর্তে আদিম গ্রামদেবতারই বন্দনা করিয়াছেন মাত্র, মানব-জীবনকে বড় করিয়া দেখাইতে পারেন নাই। বাঙালীর জাতীয় জীবনে ঘটনা-সংঘাত ছিল না তাহা নহে। কিন্তু রাজায় রাজায় যুদ্ধ, রাজপরিবর্তন, বিজয়ীর উৎপীড়ন, দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন প্রভৃতি বিপর্যয়কর ঘটনাও অদৃষ্ট-বিশ্বাসী বাঙালীর জাতীয় জীবনে কোনো পরিবর্তন আনে নাই। শম্বুকের মত ক্ষুদ্র পারিবারিক ও গোষ্ঠীগত জীবনের কঠিন আবরণের মধ্যে নিজেকে সংকুচিত করিয়া বাঙালী দীর্ঘ ছয়শত বৎসর একইভাবে চক্ষু বুজিয়া কাটাইয়াছে। যে জাতীয়তাবোধ সময় বিশেষে মানুষের মনে বিদ্রোহ, বিক্ষোভ ও অসন্তোষের বহ্নি জ্বালাইয়া তোলে এবং পুরাতন ভাব ও চিন্তার পরিবর্তন ঘটায়, প্রাচীন বাঙালীর জীবনে সেই জাতীয়তা-বোধেরই ছিল একান্ত অভাব। সেইজন্য প্রাচীন বঙ্গ-

সাহিত্য হইয়াছে বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে ক্লান্তিকর সাহিত্য। ইহাতে কোনো বিশেষ শতাব্দীর চিহ্ন নাই।" [তারাপদ ভট্টাচার্য—বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস]

খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর বহু পূর্ব হইতেই বাঙলা দেশ বৌদ্ধধর্মের দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। পালরাজগণ ছিলেন মহাযানী বৌদ্ধধর্মাশ্রিত। এই মহাযান বৌদ্ধধর্মের একটি শাখা সহজযান সম্প্রদায় বাঙলা দেশের চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, ইহার সহিত তন্ত্রমন্ত্র নানাপ্রকার লৌকিক আচার ও বিশ্বাস যুক্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বাঙলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদগুলি এই সহজযানী সম্প্রদায়ের দ্বারাই লিখিত হইয়াছিল। পরবর্তী কালে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব লুপ্ত হইলেও লোকচেতনায় ও লোকায়ত সাহিত্য-সংস্কারে, হিন্দুধর্মের পৌরাণিক অভিব্যক্তির মধ্যে এই বৌদ্ধধর্মের দু-একটি পদচিহ্নের সাক্ষাৎ মেলে। গোরক্ষ-বিজয় ও ময়নামতীর গানে, ধর্মমঙ্গল কাব্যে ও শূন্য পুরাণে, কিছু কিছু রাগাত্মিকা বৈষ্ণবপদে ও কড়চায় ইহার অঙ্গীভূত রূপটি পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তির প্রধান কারণ বাঙলা দেশে বৈষ্ণবতার প্রসার। রাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাস ও নিষিদ্ধ প্রণয়সম্পর্ক অবলম্বন করিয়া বহুদিন হইতেই একটি লৌকিক উপকথা-ছড়া গাথা জাতীয় সাহিত্য সমাজ-মানসে প্রচলিত ছিল। ইহার সহিত শ্রীমদ্‌ভাগবতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ-মাহাত্ম্য যুক্ত হইয়া ধীরে ধীরে একপ্রকার ভক্তিবাদ ধর্মের আকারে দেখা দিতে লাগিল এবং জয়দেব বিদ্যাপতির কাব্যসাধনার মধ্য দিয়া দেবতার প্রণয়লীলা একটি আধ্যাত্মিক মহিমায় উন্নীত হইয়া ভক্তি-সাহিত্যে পরিণত হইল। মালাধর বসু ভাগবতানুবাদ শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের দ্বারা এই প্রেমিকপ্রবর শ্রীকৃষ্ণের দেবায়ত রূপটি লোকচিত্তে আরও নিঃসন্দিগ্ধ বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইহার পর

বৈষ্ণব ধর্ম

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ঘটিল, প্রেমভক্তিবাদকে একটি ধর্মরূপে প্রচার করিয়া তিনি পরধর্মভীত পর্যুদস্ত মধ্যযুগের হীনবীর্য দেশবাসীকে বৈষ্ণবতায় দীক্ষা দিলেন। সংসারের সকল পাপ বেদনা অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে নিঃস্বার্থ ঐশ্চর্যবুদ্ধিহীন প্রেমবিতরণের ও নাম-মহিমা-কীর্তনের পরামর্শ দিলেন, আপনার গৌরাঙ্গসুন্দর দিব্য জীবনের কষ্টিপাথরে সচ্চিদানন্দ, করুণাঘন, প্রেমজ্যোতির্ময় ও মাধুর্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের হিরণ্যদ্যুতি প্রমাণ করিলেন। অসংখ্য শিষ্য ও অনুচরের বিপুল কীর্তনে, কাব্যে-সংগীতে, প্রচারে-বিশ্বাসে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম মধ্যযুগের নিষ্প্রাণ নদী-

খাতে তীরতরু-উন্মূলকারী আষাঢের কলনাদ প্রবাহিত হইল। অখিলপ্রেম-ফলপ্রদায়ী ভগবানের প্রণয়মাধুর্যের তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া শত শত পদ রচিত হইল, সন্ন্যাসব্রত মনীষীর ধ্যানমন্দিরে এই প্রেমতত্ত্বের দর্শনগ্রন্থ রচিত হইতে লাগিল। এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভগীরথ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অলৌকিক জীবন-মাহাত্ম্য অবলম্বনে জীবনী-সাহিত্য গড়িয়া উঠিল। সাহিত্যের বঙ্গোপসাগরের কূলপ্লাবী জোয়ারের উৎসব সুরু হইল। ষোড়শ শতাব্দী পূর্ণ করিয়া এই উৎসবের প্রাণোচ্ছ্বাস একটানা ধ্বনিত হইয়াছে, সপ্তদশ শতাব্দীতেও ইহার প্রাণাবেগে বিশেষ ভাঁটা পড়ে নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনা হইতে বঙ্গীয় চৈতন্য-সংস্কৃতির ক্ষয়িষ্ণুতার পট সুরু হইয়াছে।

কিন্তু বাঙলা দেশে কোনোদিনই একটিমাত্র ধর্ম সামগ্রিক জনচেতনায় একচ্ছত্রাধিপত্য করিতে পারে নাই। একই সঙ্গে একাধিক ধর্মের বৈশিষ্ট্য-গুলিকে আত্মসাৎ করিবার সহিষ্ণুতা বাঙালী সমাজের চিরকালই ছিল। একদিকে যেমন প্রেমের দেবতার নাম-কীর্তনে বাঙলা দেশ মুখরিত, ব্রাহ্মণ-শূদ্র-দ্বিজ-চণ্ডাল হরিভক্তির স্বর্ণডোরে আলিঙ্গিত হইতেছে, অন্যদিকে গ্রামের ক্ষীণালোক চণ্ডীমণ্ডপে ধর্মভীরু নিরক্ষর জনসাধারণের সম্মুখে শক্তিদেবতাদের প্রতিষ্ঠাতুর ভক্তিপ্রার্থী আত্মপ্রচার চলিয়াছে। একদিকে বিশুদ্ধ প্রেম অন্যদিকে বিশুদ্ধ সেবা, একদিকে বৈষ্ণব কাব্য অন্যদিকে মঙ্গলকাব্য, এই উভয় কোটিকে মিলাইয়াই প্রাগাধুনিক বাঙলা সাহিত্য। নিতান্ত সাধারণ শ্রমজীবী কৃষিনির্ভর বৃত্তিপালিত গৃহস্থ মানুষ চায় সম্পদ, বিত্ত ও ঐহিক সুখসমৃদ্ধি। তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া, পৌরাণিক নাম ও মহিমার বিবর্ণ ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া প্রচারলোলুপ বহু লোকায়ত শক্তিদেবতা বাঙালীর সুখদুঃখভঙ্গুর মৃত্তিকা-কোমল গৃহপ্রাঙ্গণ অধিকার করিয়া বসিলেন। দেবতা জুটিলে ভক্তের অভাব হয় না। খ্যাতিলিপ্সু কবিরা দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারের স্বপ্রাপ্ত দায়িত্ব স্কন্ধে লইয়া মঙ্গলকাব্য পাঁচালি লিখিতে সুরু করিলেন। নানা সৃষ্টি-রহস্যের সফেন বর্ণনার মধ্য দিয়া, এক একটি দেবতার উদ্ভবও শক্তিস্ফীতির পুলকসঞ্চারী ইতিহাসের মধ্য দিয়া তাঁহাদের ক্রমবর্ধমান প্রভুত্ব ও অপ্রতিহত দৈবীশক্তির লীলায়িত জয়গৌরব ঘোষণা করিয়া তাঁহার ডাক দিলেন ভয়ার্ত জনসাধারণকে, অবিশ্বাসের অঙ্কুর

শক্তিধর্ম

মঙ্গল কাব্যের স্বভাব

সমূলে উৎপাটিত করিয়া বিশ্ববরেণ্য দেবচরণে হৃদয়ের সকল নৈবেদ্য নিঃশব্দে নিবেদন করিতে। বিনিময়ে সাংসারিক সমৃদ্ধির অবিশ্বাস্য প্রাপ্তি সম্পর্কে বহু অসম্ভব কীর্তিকাহিনী প্রচারের লুব্ধ কৌতূহল সৃষ্টি করিয়া তাঁহারা মৃত্তিকা-ঘনিষ্ঠ সংসার জীবনে এইসব লৌকিক দেবদেবীর বিজয়াভিযানের বৈজয়ন্তী উড়াইয়া দিলেন। ঊর্ধ্বচারী দেবতাদের অখণ্ড প্রতাপ-প্রতিষ্ঠাই ছিল এই সকল কবিদের উদ্দেশ্য, কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল একান্তই এই কর্দমাক্ত জগতে। তাই তাঁহাদের কাব্যে দেবতার মহত্ত্ব-বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে নশ্বর মানুষের জীবনাচার ও বিশ্বাস, প্রাণতৃষ্ণা ও ক্ষুধাতুরতা, সংগ্রাম ও সংকল্পের এক অবিস্মরণীয় উপকরণ সঞ্চিত হইয়াছে। মানুষের দক্ষিণহস্তের পুষ্পার্ঘ্য সংগ্রহের কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনে ইন্দ্রলোকের মহামান্য দেবতাদিগকে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে, মর্ত্যমানবের জীর্ণ মৃৎকুটিরের আশেপাশে ছদ্মবেশে ঘুরিতে হইয়াছে অনুকূল সুযোগের অপেক্ষায়। অবশেষে বহু সন্দিগ্ধ অবহেলা ও উপেক্ষার অনমনীয় আত্মমহিমা চূর্ণ করিয়া দৈবানুগ্রহের কুশল-নিক্ষিপ্ত শায়কটি বিপন্নতার বক্ষ বিদ্ধ করিয়াছে। মানুষের দারিদ্র্যের ধূলিশয্যের পাশে দেবতার অমোঘ আশীর্বাদের প্রতিশ্রুতির বীজ উপ্ত করিয়া, অদৃষ্টাহত জীবনের সকল অসহায় আর্তনাদের অবসান ঘটাইয়া দেবতা তাহার অপ্রাকৃত জগতে স্বমহিমায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

ধর্মের প্রচার-প্রতিষ্ঠার কাব্য হইলেও মঙ্গল কাব্যগুলি জীবনেরই কাব্য। ইহলোকের দুঃখ ও ক্ষুৎ-পিপাসাই ইহাদের সকল অস্বাভাবিকতাকে আচ্ছন্ন করিয়া আজও আমাদের নিকট সমাদরের বস্তু হইয়া আছে। মঙ্গল কাব্যগুলির সঙ্গে রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদগুলিও জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এগুলি

মঙ্গলকাব্য
জীবনেরই কাব্য

খুব নিবিড় ভাবে কোনো ধর্মশাখার সহিত সংযুক্ত ছিল না বলিয়া বৈষ্ণব অথবা শাক্ত উভয় সম্প্রদায়ের কবিরাই তাঁহাদের ধর্মমাহাত্ম্যের নানা বিবরণ এই সকল কাব্যে অনুপ্রবিষ্ট করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বৈষ্ণব ও শক্তি ধর্ম ব্যতীত অন্যান্য আরও অপ্রধান লৌকিক ধর্ম অথবা পৌরাণিক ধর্ম একই পদ্ধতিতে নিজেদের প্রচারকাব্য ও প্রশংসাপত্র লইয়া জনসাধরণের সশ্রদ্ধ ভক্তি ও সম্ভ্রম বিশ্বাস অর্জনের চেষ্টা করিয়াছে। সহজিয়া বৈষ্ণবধর্ম নাথধর্ম শৈব-ধর্ম বাউলপন্থা—প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্য ইহাদেরই আত্মজীবনী।

মুসলমান বাঙালী কবিদের কিছু কিছু উপকথা-জাতীয় কাব্য, আদিরসাত্মক কয়েকটি উপাখ্যান, কিছু অলিখিত লোকসাহিত্য, গার্হস্থ্য জীবন-অবলম্বিত রামায়ণ-অনুবাদ [যদিও সেখানে শ্রীরামচন্দ্র দেবতার অবতার]—এইগুলি ছাড়া প্রচীন বঙ্গসাহিত্য সম্পূর্ণই ধর্মসাপেক্ষ। ধর্ম মন্দিরেব চত্বরে বসিয়াই কবিরা সে-যুগে সাহিত্যের চর্চা করিতেন। ইহজীবনের বৈপ্লবিক রূপান্তর, পারত্রিক কল্যাণ, মুমুক্ষা ও মৃতসঞ্জীবনীর বৈদ্যুতিক স্পর্শ না থাকিলে নিছক শ্রুতি-পরিতৃপ্তি ও নির্মল আনন্দেব জন্য কেহ সাহিত্য-পাঠ অথবা শ্রবণ করিত বলিয়া মনে হয় না।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যেব সাধাবণ লক্ষণ

খ্রীস্টীয় দশম হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সাহিত্যের ধাবাপথ অনেকবার পরিবর্তিত হইয়াছে, কিন্তু অনেকগুলি দিক হইতে বঙ্গসাহিত্যের সাধারণ স্বভাব ও লক্ষণগুলি প্রায় অপরিবর্তিতই আছে। এই লক্ষণগুলি সংক্ষেপে বিবৃত হইল—প্রথমত, সূচনা হইতে বিকাশ ও পরিণতি পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্য কাব্যবৃত্ত।

কাব্যময়তা

দ্বিতীয়ত, দেবমাহাত্ম্য-প্রচাব এবং ধর্মবিশেষের বিশ্বাস, উপাসনা ও আচারাদি প্রতিষ্ঠাই ইহাব মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। তবে কবিদের দৃষ্টি সর্বদা পৃথিবী-তন্নিষ্ঠ হওয়ায় ঈশ্বর এখানে সুখদুঃখবলয়িত মানবের মতই দেহধারী, তিনি মানুষেব মতই মিলনবিরহে ব্যাকুল অথবা ঈর্ষা-ক্রোধে উদ্দীপ্ত। তৃতীয়ত, পুরুষ চরিত্র অপেক্ষা নারীচরিত্রই মধ্যযুগীয় সাহিত্যে মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছে।

ধর্মবিশ্বাস

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে সজীব মূর্তি যদি কাহারও থাকে তবে সে কেবল বিদ্যার ও মালিনীব, সুন্দর চরিত্রে পদার্থের লেশমাত্র নাই। কবি-কঙ্কণ চণ্ডীর সুবৃহৎ সমভূমির মধ্যে কেবল ফুল্লরা এবং খুল্লনা একটু নড়িয়া বেড়ায়, নতুবা ব্যাধটা একটা বৃহৎ স্থাণুমাত্র এবং ধনপতি ও তাঁহার পুত্র কোনো কাজের নহে। বঙ্গসাহিত্যে পুরুষ মহাদেবের ন্যায় নিশ্চলভাবে ধূলিশয়ান এবং রমণী তাহার বক্ষের উপর জাগ্রত জীবন্তভাবে বিবাজমান"—[পঞ্চভূত : নরনারী]।

নারী-চরিত্র প্রাধান্য

এমন কি, সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলীতে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীরাধারই প্রাধান্য, তাঁহার রূপানুরাগ আক্ষেপ অভিসার ও বিরহ বেদনাই বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রামায়ণ মহাভারতগুলিতে নারী-চরিত্রের গৌরব ও মাহাত্ম্য তো প্রশ্নের অতীত।

চতুর্থত, সাধারণভাবে প্রাগাধুনিক বঙ্গসাহিত্য স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি নয়, পরমুখাপেক্ষী রচনা। রাজসভার নির্দেশে অথবা জনসভার উপরোধে কবিরা কাব্য লিখিয়াছেন, অথবা সম্প্রদায়গত অনুশাসনও গোস্বামী-গুরুদের নিয়ন্ত্রণ তাঁহাদের কাব্যরচনাকে স্বেচ্ছাচারী করিয়া তোলে নাই। সম্ভবত সেই কারণেই এই কাব্য-সাধনায় মননশীলতার অভাব, লোকশিক্ষা ও জনরুচির তৃপ্তি-বিধানের জন্য সুলভ কাব্যাঙ্কিক গ্রহণ, ইন্দ্রিয়ালু ভাবোচ্ছ্বাস, সহজ বিশ্বাসবাদের প্রতিষ্ঠা—এইসব লক্ষ্য করা যায়।

পরমুখাপেক্ষিতা

পঞ্চমত, কাহিনী, কায়ব্যূহ নির্মাণ, ভাষা-ছন্দ ও শব্দচয়নে সর্বত্রই একটি ক্লান্ত গতানুগতিক পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। মৌলিকতার অভাব ও অনুচিকীর্ষা সমগ্র মধ্যযুগীয় সাহিত্যের প্রকটতম লক্ষণ। কৃত্তিবাস-কাশীরামদাস সংস্কৃতের অনুবাদক, মঙ্গল কাব্যের কবিরা কেহই কাহিনী উদ্ভাবন করেন নাই। বৈষ্ণব কবিরা ক্রমান্বয়ে একই ভাবের উপর পদ রচনা করিয়াছেন।

পুচ্ছানুগ্রাহিতা

ষষ্ঠত, বিভিন্ন কাব্যের মধ্যে কতকগুলি বিষয়গত সাদৃশ্যও লক্ষণীয়। যেমন, সর্ব শ্রেণীর মঙ্গল কাব্যেই এক প্রকার সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা আছে, নানাবিধ দেবদেবী বন্দনা আছে। ইহা ছাড়া বারমাস্যা, নারীগণের পতিনিন্দা, ভোজন-রসিকতা ও খাদ্য-ব্যঞ্জনের বিস্তারিত বিবরণ, চৌতিশা, বিবাহ-বর্ণনা, দাম্পত্য-কলহ প্রভৃতি বিষয়ের পৌনঃপুনিক বর্ণনা যে কোনো প্রাচীন সাহিত্য পাঠকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

বিষয়গত পুনরাবৃত্তি

আদিযুগের সাহিত্য-পটভূমি ঃ

পূর্বেই বলা হইয়াছে, খ্রীষ্টীয় নবম-দশম হইতে খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যের আদিযুগ। দশম শতক হইতেই সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে লোকব্যবহার্য মাতৃভাষার ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছিল, এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। অবশ্য মাগধী অপভ্রংশের আবরণ বিদীর্ণ করিয়া বাঙলা ভাষার আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য তৎপূর্বেই সূচিত হইয়াছিল এবং সম্ভবত তখনও হিন্দী অসমীয়া ওড়িয়া মৈথিলী ভাষাগুলি প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য লাভ করে নাই।

বাঙলা ভাষার বিকাশ

বিভিন্ন প্রাচীন শিলালিপি দানপত্র প্রস্তরখণ্ডে এবং সর্বানন্দের অমর

কোষ-ভাষ্য টীকাসর্বস্ব গ্রন্থে কিছু কিছু বাঙলা শব্দের প্রয়োগ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু দশম শতকের পূর্বে সাহিত্যের বাহন হিসাবে বাঙলা ভাষার ব্যবহারের প্রামাণিক সাক্ষ্য পাওয়া যায় নাই বলিয়াই ঐতিহাসিকগণ স্থির-প্রত্যয় হইয়াছেন।

এই যুগের শ্রেষ্ঠকবি জয়দেব, তাঁহার কাব্য গীতগোবিন্দের ভাষা সংস্কৃত হইলেও ভাব প্রাকৃত-জনোচিত এবং ছন্দ অবহট্‌ঠের বলিয়া সৃজ্যমান বাঙলা ভাষা ও বাঙালী জীবনের লৌকিক চেতনায় ইহার সমধিক সমাদর ঘটিয়াছে।

জয়দেব ও গীতি কাব্য ধারা

কবিচাব্দ-চক্রবর্তীর সভা-সাহিত্যে সংস্কৃতের মৃদঙ্গ বাজিলেও ইহার অন্তরালশ্রুত গীতধ্বনিটিকে সুরমুগ্ধ বাঙালী তাহার যুগযুগবাহিত সংগীতোচ্ছ্বাসের সহিত একাত্ম অভিন্নতায় গ্রহণ করিয়াছেন। জয়দেবের মধুর কোমলকান্ত পদাবলী প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন ও নবীন, সংস্কৃত ও মাতৃভাষার সেতুবন্ধস্বরূপ। পরবর্তী কালের গীতরসাত্মক যাবতীয় কাব্য-কবিতা, বাঙলা অথবা অন্যান্য প্রদেশ-ভাষার সাহিত্য, বিশেষত বিপুলায়তন বৈষ্ণব কবিতাবলী জয়দেবেরই অধমর্ণ। জয়দেবই সর্বপ্রথম রাধাকৃষ্ণ প্রেমকে উপকথার ধূলিধূসরতা অথবা ভক্তিশাস্ত্রের নিষিদ্ধ প্রবেশাধিকার হইতে উদ্ধার করিয়া ভক্তপ্রেমিক হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

বাঙলা সাহিত্যের প্রাদিতম নিদর্শনগুলি চর্যাগীতিকা নামে পরিচিত, আনুমানিক মধ্য-নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর ভিতর রচিত হয়। অপভ্রংশের

চর্যাগীতিকোষ

অপসৃয়মান পর্ণপুটের নিম্নে স্বাধীনপ্রস্ফুট মাতৃভাষার এই কোরকগুলি মুকুলিত করার প্রাথমিক গৌরব বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের প্রাপ্য। জনসাধারণের নিকট হইতে তাঁহাদের সাধনরহস্য দুর্জ্ঞেয় রাখিবার জন্যই হোক অথবা নিজস্ব সম্প্রদায়ের কোনো নিগূঢ় নিয়ন্ত্রণ-বশতই হোক, সহজযানী সিদ্ধাগণ সন্ধ্যাভাষায় অর্থাৎ প্রতীতিগম্য এক প্রকার গুপ্তসংকেতবহ ভাষায় এই পদগুলি রচনা করেন। ইঙ্গিতবাচ্য সাধনতত্ত্বে ও পারিভাষিক শব্দে কণ্টকিত হইলেও পদগুলির মধ্যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও ধর্মানুভূতির যে গভীরতর ব্যঞ্জনা আছে, তাহারই গৌরবে সুদীর্ঘ কালসমুদ্র

চর্যাগীতির গৌরব

পার হইয়াও পদগুলি একালের মনীষা ও অনুসন্ধিৎসার তটে তরঙ্গাঘাত তুলিয়াছে। ভাষার অতীত তীরে সেখানে কাঙাল নয়ন ব্যর্থ প্রত্যাশায় প্রত্যাবর্তন করে বটে, কিন্তু ঈষচ্চমকিত

কাব্যাস্বাদের পাংক্তেয় আনন্দ হইতে বঞ্চিত হয় না। গৃহত্যাগী নির্বাণ-প্রয়াসী যোগসাধকদের তাত্ত্বিক সংকেতের কঠিন প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া নাম-গোত্রহীন পুষ্পের মত কাব্যরসের লতাগুল্ম ও বনকুসুম, সমস্ত অবরোধটিকে স্বচ্ছন্দ ভ্রমণের পক্ষে দুরতিক্রম্যতা মোচন না করিলেও, মুগ্ধ দিদৃক্ষার পথে বাধা সৃষ্টি করে নাই। ইহাই সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদগুলির কাঞ্চনকৃতিত্ব।

পরবর্তী কাব্যে চর্যার প্রভাব

আপাতদৃষ্টিতে চর্যাগীতিকার সহিত উত্তর কালের বাঙলা সাহিত্যের সংযোগ-সূত্র দৃশ্যমান না হইলেও চর্যাপদের প্রভাব পরবর্তী বাঙলা কাব্যে অন্তর্লীন ছিল। উত্তর পশ্চিম ভারতের মরমিয়া (মিষ্টিক) কবিদের গানে ও দোহায় চর্যাপদের ভাব ও ভাষার বহু চাঞ্চল্যকর সাদৃশ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। কবীর দাদূ নানক মীরাবাঈ-এর ভজন গানে এবং বাঙলা আউল-বাউল-দরবেশি সংগীতের মধ্য দিয়া সহজিয়া ধর্ম সাধনার গোপন সরস্বতী-প্রবাহ নিঃশব্দে তরঙ্গিত হইয়াছে। চর্যাগীতির অনেক রূপক-উৎপ্রেক্ষা-উপমা, সাদৃশ্যবাচক পংক্তি, দৃষ্টান্তমালা ও উদাহরণ দানের ভঙ্গিমা বহু পরবর্তী কালের অধ্যাত্মগীতি ও নিবন্ধে অনুসৃত হইয়াছে। বৈষ্ণব রাগাত্মিক পদাবলীতে চর্যাগীতের সাংকেতিক কাব্য প্রকাশরীতির অনুসরণ লক্ষিতব্য। লোকসাহিত্যের গোরক্ষপন্থীদের ছড়ায় চর্যাকবিদের একাধিক পদের অর্থসাদৃশ্য মেলে। বৈষ্ণব পদাবলীর রাগানুগা-সাধনার সঙ্গে চর্যাপদের 'মহারাগনয়' সাধনার ধ্বনি ও অর্থগত সারূপ্য তাৎপর্য-পূর্ণ। ধর্মঠাকুরের গাজন ছড়ায় চর্যাপদের কোনো-কোনো কবিতার ভাবধারা প্রতিধ্বনিত হইয়াছে।

ইহা ভিন্ন চর্যাপদকোষের বহিরঙ্গ অর্থাৎ পরিমিত মিল ও ছন্দোবদ্ধ বন্ধনের কাব্যরূপ অর্বাক্‌যুগের সাহিত্যে অনুবৃত্ত হইয়াছে। বৈষ্ণব গীতিকবিতা চর্যাগীতির মতই সুরতালযুক্ত গীতিবদ্ধ, উভয়ত্রই কবিভণিতাগ্রথিত কাব্যরূপ বাঙলা গীতিকবিতার অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতারই উদাহরণ। অন্ত্যানুপ্রাসের প্রয়োগ, পাদাকুলক ও কচিৎ ত্রিপদী ছন্দ পরবর্তী বাঙলা কাব্যের রূপটিকে বিশেষ করিয়া স্মরণ করাইয়া দেয়। চর্যাপদের ছন্দ হইতেই পরবর্তী বাঙলা কবিতার ছন্দের বিবর্তন ঘটিয়াছে।

দ্বাদশ-ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ শতকের সূচনা পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যের

কোনো লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। সদ্য-বিদেশী আক্রমণে দেশব্যাপ্ত বিশৃঙ্খলতা ও অরাজকতাই ইহার কারণ এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে। তবে পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে বিপুল-সমৃদ্ধ মঙ্গলকাব্য-ধারার নিদর্শন পাওয়া গেল, এ যুগে তাহার প্রস্তুতি হইতেছিল লৌকিক ছড়া-গাথা-উপকথা ব্রতগীতে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ডাক ও খনার বচনগুলিকে এই যুগেব সৃষ্টি বলিয়া অনুমান করা হয়। এই সময় হয়ত চণ্ডী-মনসা প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীব কাহিনী, রাধাকৃষ্ণ-প্রেমগীতিকা, রামায়ণ মহাভারতের উপাখ্যান নৃত্যগীতের সহযোগে অভিনীত হইত। সম্ভবত যাত্রাধর্মী কোনো গীতপালা লোকসমাজে প্রচলিত ছিল। ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কারেব সহিত নিঃসম্পৃক্ত লৌকিক ছড়া গানও জনপ্রিয় ছিল বলিয়া বোধ হয়। উচ্চবর্ণের সমাজে সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের সমাদর ও পঠনপাঠন ছিল। অন্তত বাল্মীকি-বেদব্যাসের কাব্য যে অত্যন্ত প্রিয়পাঠ্য ছিল তাহার প্রমাণ আছে। প্রাকৃত অপভ্রংশ কাব্যকবিতা এবং পৌরাণিক গল্পগাথা ধীরে ধীরে ভাষাসাহিত্যের বীজ বপন করিতেছিল। বিভিন্ন লিপিলেখ প্রশস্তিপত্র দাননামার মধ্য দিয়া এই যুগেব সংস্কৃতচর্চার একটি অভিজাত মননশীল আদর্শের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত কৃষ্ণলীলা, পৌরাণিক কাহিনী ও ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে যে প্রচুর পরিমাণে সংস্কৃত নাটক রচিত হইত তাহারও উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। তবে রাধাকৃষ্ণের বিলাস-কলার প্রভাবই হয়ত জনমানসে সর্বাধিক ছিল। এইজন্য পরবর্তী বাঙলা সাহিত্যে এই ধারারই চরম বিকাশ-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে।

অন্ধকাব যুগ

তথাপি প্রামাণিক উদাহরণ ব্যতীত আনুমানিক সিদ্ধান্তের দ্বারা ইতিহাসের বিশ্বাসযোগ্য অধ্যায় গড়িয়া ওঠে না। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতেই বাঙলা সাহিত্যের যথার্থ বিকাশপর্ব, উপকরণে ও রূপকরণে ইহার বহুশাখায়িত বৈচিত্র্যই পরবর্তী শতাব্দীর শিরায় শিরায় প্রাণরস সঞ্চারিত করিয়াছে। জনসাধারণের মনে বিজয়ী নরপতিদের সম্পর্কে আস্থার ভাব সূচিত হইয়াছে এবং লুণ্ঠনকারী আততায়ী যখন স্থায়িভাবে শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়াছে তখন এদেশের ভাষা-সাহিত্য ও মনীষার সহিত বিরোধের অবসান ঘটাইবার রাজনৈতিক শুভবুদ্ধির পরিচয় দিয়া বাঙালী জাতিও সংস্কৃতির স্বাভাবিক জীবনচক্র

বাঙলা সাহিত্যে মধ্যযুগ-সূচনা

অব্যাহত রাখিতে মনস্থ করিয়াছে। বাঙালী কবির নিশ্চিন্ত কাব্য-বীণায় গুণগ্রাহী বিধর্মীর নাম উচ্চারিত হইয়াছে। কাব্যের প্রেরণায় তাঁহাদের অনস্থয় আগ্রহের জয়ধ্বনি বাজিয়াছে। বাঙলা কাব্যের যথার্থ মধ্যযুগ তাই পঞ্চদশ শতাব্দী হইতেই।

পঞ্চদশ শতাব্দীর কাব্যধারা

তুর্কী আক্রমণোত্তর দুই শতাব্দীব মত কালপর্বে বাঙলা দেশের সারস্বত সাধনা সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয়-তথ্যহীন অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। অন্যান্য প্রতিবেশী প্রদেশগুলিতে তখনও হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি ও সাহিত্যের অব্যাহত চর্চা চলিতেছিল, কিন্তু ইতিমধ্যে বাঙলা দেশে দেবমন্দির লুণ্ঠিত হইয়াছে, পবিত্র বিগ্রহ ভূলুণ্ঠিত হইয়াছে, বিধর্মীর বর্শাফলকে বাঙলা সাহিত্যেব ছিন্নপৃষ্ঠা কলঙ্কিত হইয়াছে। ভীতদুর্বল রুগ্ন দেশবাসী ভগ্নগৃহদ্বারে মুদ্রিতনয়নে উপদেবতার শক্তিপ্রার্থনা করিতেছে। পলাতক সাধকরা নিরাপদ সীমান্ত-পারে নেপাল, মিথিলা, উড়িষ্যা অথবা কামরূপ-ঝাড়খণ্ডে আত্মগোপন করিয়াছে। ক্রমে মুসলমান শাসন জনসাধারণের গা-সহা হইয়া উঠিল, সম্রাট ও প্রজার মধ্যে সন্ত্রস্ত সন্দেহের অবসান ঘটিল, আবার জীর্ণ জনসভায় পাঁচালির মন্দিরা বাজিল, রাজসভায় লোককবির সমাদব হইতে লাগিল, বিপন্ন জাতি নূতন বিশ্বাসে ভাঙা বীণায় সুর বাঁধিল। শক্তিমান কবির আবির্ভাবে, বিশ্বাসে, জাতীয় চেতনায়, প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যে বাঙলাসাহিত্যের ইতিহাসে পঞ্চদশ শতাব্দী মধ্যযুগের নূতন অধ্যায় রচনা করিল। এই শতকের সাহিত্য-চর্চার একটি মোটামুটি পরিচয় এইরূপ—

তুর্কী আক্রমণ

পঞ্চদশ শতকের কাব্যসাধনা

মৌলিক সাহিত্য—ধামালী-নাটগীত : বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
পৌরাণিক অনুবাদ—ভাগবত-অনুবাদ : মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
রামায়ণ-অনুবাদ : কৃত্তিবাসের শ্রীরাম-পাঁচালি।

মঙ্গল কাব্য—মনসা-মঙ্গল : বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণ।
বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসা-বিজয় (?)

গীতি-সাহিত্য—চণ্ডীদাসের পদাবলী (?) ও অন্যান্য কয়েকজন পদকর্তার বৈষ্ণব পদ [বিদ্যাপতি মৈথিল কবি হইলেও বাঙলা সাহিত্যকে প্রভাবিত করিয়াছেন বলিয়া এই প্রসঙ্গে তাঁহার নামও স্মর্তব্য।]

পরিমাণের দিক দিয়া পঞ্চদশ শতাব্দীর সাহিত্যিক নিদর্শন বিপুল নয়, কিন্তু আত্মপ্রতিষ্ঠার আকুতি ও জাতীয় জীবনের মর্মচেতনা ইহার ভিতর দিয়াই নির্ভুলভাবে ধ্বনিত হইয়াছে। অন্যধর্মাশ্রিত শাসন-কর্তৃপক্ষের সাংস্কৃতিক আক্রমণ হইতে দেশ ও জাতিকে উদ্ধার করিবার প্রচ্ছন্ন ব্যাকুলতাই এই যুগের ধর্মপ্রচারমূলক সাহিত্যের মূল কথা। বাঙলা ভাষা তাহার ভাব-প্রকাশের চরম ক্ষমতায় উন্নীত হইয়াছে, দুর্গম সংস্কৃতের জটাজাল হইতে উদ্ধার করিয়া বাঙালী কবি রামায়ণ-ভাগবতের মাধুর্য-স্রোতকে বাঙালী জীবনের গাঙ্গেয় ধারায় পরিচালিত করিয়া এক দুর্লভ গৌরব স্থাপন করিয়াছেন। মঙ্গল-কাব্যের জীবন-চেতনায় ও বাস্তব-নৈপুণ্যে, দেবতা ও মানুষের দুঃসহ সংগ্রামে, মনুষ্যমহিমার অভ্রভেদী ব্যক্তিত্ব-প্রতিষ্ঠায় কবিদের লেখনী কার্পণ্য করে নাই। জীবনের সর্বাত্মক হতাশা ও মনুষ্য-মহিমার ম্লান লাঞ্ছনার দিনে তাঁহারা মানব-মানবীর গরিমায় অসীম রূপ সৃষ্টি করিয়াছেন, বিশ্বের লাবণ্যামৃত সঞ্চয় করিয়া প্রেমের মাধুরী-মূর্তি অঙ্কন করিয়াছেন, সকল ঘৃণা-বিদ্বেষ-অপমানের মুখে দুঃসাহসী প্রেমের জয়রব প্রচার করিয়াছেন।

বড়ু চণ্ডীদাস ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যের সূচনায় বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য-খানি স্থাপন করা যায়। মাত্র অর্ধশতাব্দীকাল এই কাব্যখানি সাহিত্য পাঠকদের নিকট সুপরিজ্ঞাত হইয়াছে এবং ইহাকে কেন্দ্র করিয়া বিস্ময় ও তিরস্কার, সম্মান ও প্রত্যাখ্যানের দ্বিধাকম্প্র সংশয় এখনও সম্পূর্ণ অবসিত হয় নাই। ইতিপূর্বে বাঙলা কাব্যসাহিত্যে মধ্যযুগের শিরোমণি ছিলেন পদকর্তা চণ্ডীদাস, কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কারের পর তাঁহার অবিতর্কিতপূর্ব প্রতিষ্ঠায় ভাঙন ধরিয়াছে এবং বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে সর্বাধিক দুঃসাধ্য এক চণ্ডীদাস-সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। তৎপূর্বে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পরিচয় গ্রহণের প্রয়োজন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যখানির প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিটি ১৩১৬ সালে স্বর্গত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় আবিষ্কার করেন এবং গ্রন্থের নাম না থাকায় ইহা শ্রীকৃষ্ণলীলা-রহস্যের কাহিনী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামেই চিহ্নিত হয়, সম্ভবত ইহার মূল নাম ছিল শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ। কবির নাম বড়ু চণ্ডীদাস, অথবা অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস, কাব্যের বিষয় পালা-গানের মত, কয়েকটি অধ্যায় বা খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক অনুদ্ভিন্নযৌবনা শ্রীরাধার চিত্তে কৃষ্ণকামনা বা প্রণয়ার্তি জাগ্রত করার বিষয় গীতিনাট্যের আঙ্গিকে ব্যক্ত। উক্ত গ্রন্থের সুপণ্ডিত সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় লিখিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বর্ণনীয় বিষয়ের পরিচয় এইরূপ—

গ্রন্থ-পরিচয়

"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গীতগোবিন্দের অনুকরণে রচিত গীতিনাট্য-শ্রেণীর গীতি-কাব্য। ইহার অধিকাংশ পদ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা অথবা বড়াইর (দূতী) উক্তি-প্রত্যুক্তি।··বর্ণনীয় বিষয় শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা। পুঁথির প্রাপ্ত অংশ ১৩শ খণ্ডে বিভক্ত। যথা—জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, কালিয়দমনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড, ও রাধাবিরহ [খণ্ড]। জন্মখণ্ডে দেবগণের প্রার্থনীয় ভূভার হরণের নিমিত্ত রাধাকৃষ্ণের জন্মলীলা বর্ণিত। তাম্বুলখণ্ডে রাধার অসামান্য রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক কামাচার আমন্ত্রণ-সূচক তাম্বুলাদি উপহার প্রেরণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ। দানখণ্ডে রাধালাভার্থ শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক দানীর অভিনয়, রাধাকৃষ্ণের মিলন। নৌকাখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের কাণ্ডারী বেশে গোপীগণকে যমুনা পার-করণ ও রাধাকৃষ্ণের যমুনা-বিহার। ভারখণ্ডে ভারবাহীরূপে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক শ্রীমতীর পসরা বহন। ছত্রখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক রাধার মস্তকে ছত্র ধারণ। বৃন্দাবনখণ্ডে গোপীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের বনবিলাস। যমুনাখণ্ডে গোপীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের জলক্রীড়া এবং শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক গোপীগণের বস্ত্রহরণ। হার খণ্ডে হার অপহরণ জন্য যশোদা-সমীপে শ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ। বাণখণ্ডে পূর্ব অভিযোগের প্রতিশোধ স্বরূপ শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের মদন-বাণত্যাগ, রাধার মোহ, বড়াইকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন ও শ্রীমতীর বিলাস-লীলা। বংশীখণ্ডে বংশীধ্বনি শ্রবণে রাধার উৎকণ্ঠা, রাধা কর্তৃক বংশী অপহরণ, কৃষ্ণের কাকুতি ও রাধার বংশী প্রত্যর্পণ। বিরহখণ্ডে রাধার বিরহ, রাধাকৃষ্ণের কেলি-বিলাস, শ্রীমতীর নিদ্রাবেশ ও শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমন।"

সংক্ষিপ্ত আখ্যান

বাঙলা সাহিত্যে ও বাঙালীর নিকট চণ্ডীদাসের জনপ্রিয়তা দীর্ঘকালের। চণ্ডীদাসের ভাবব্যাকুল রাধাকৃষ্ণ পদে বাঙালী চিরদিন মুগ্ধ হইয়াছে এবং চণ্ডীদাসকে তাহার অত্যন্ত আপনার কবি বলিয়া জানিয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কবি জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্য-জীবনী-প্রসঙ্গে কৃত্তিবাস, গুণরাজ খান এবং চণ্ডীদাসের নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন—

সমস্যার স্বরূপ

জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তারা করিল প্রকাশ॥

শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ শ্রীসনাতন গোস্বামী ভাগবতের একটি টীকায় 'শ্রীজয়দেব-চণ্ডীদাসাদিদর্শিত দানখণ্ড নৌকাখণ্ড' প্রভৃতি লীলার উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেই প্রথম এই দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের লীলা-মাহাত্ম্য আছে, জয়দেবে নাই। অথচ অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব পণ্ডিত কবি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে ক্ষণদাগীতচিন্তামণি নামক একখানি সুবৃহৎ পদাবলী-সংকলন গ্রন্থ রচনা করেন, ইহাতে চণ্ডীদাসের নামে কোনো পদ উদ্ধৃত হয় নাই। কিন্তু তাঁহার পরে যাহাদের বৈষ্ণবগীতিচয়ন পাওয়া যায় তাহাতে চণ্ডীদাসের অনেক পদ সংকলিত হইয়াছে। যেমন গীতচন্দ্রোদয় নামক নরহরি চক্রবর্তীর একটি প্রায়-সমকালীন পদ সংগ্রহে একটি পদে চণ্ডীদাস সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য পাওয়া যায়—

প্রাচীন গ্রন্থে চণ্ডীদাস প্রসঙ্গে

জয় জয় দয়াময় চণ্ডীদাস মণ্ডিত সকল গুণে।
অনুপম যাঁর যশ-রসায়ন গায়ত জগতজনে॥
নানোর গ্রামে নিশি সময়েতে বাসুলী প্রসন্ন হইয়া।
রাই-কানু নব চরিত রচিতে কহএ নিকটে গিয়া॥
শুনি ভাবে মনে জানি পুন দেবী কহে কি চিন্তহ চিতে।
সুখময়ী তারা ধুবিনী দরশে ফুরিবে বিবিধ মতে॥

নানোর বা নান্নুর গ্রামের সাধক কবি চণ্ডীদাস তারা [রামী ?] রজকিনীর প্রেমে উন্মত্ত হইয়া তাহাকে আপনার সাধনভজনের সঙ্গিনী করিয়া লইয়াছিলেন এবং 'রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম কামগন্ধ নাহি তায়' এইরূপ বিশুদ্ধ দৈব প্রণয়ের লীলাসংগীত রাধা-কৃষ্ণের নামে প্রচার করিয়াছিলেন। এই ধরণের জনশ্রুতি অষ্টাদশ শতকে

জনশ্রুতি

বাঙলার সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। জগন্নাথ দাস উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় ভক্ত-চরিতামৃত নামক একখানি গ্রন্থে চণ্ডীদাস সম্পর্কে এই ধরণের বহু অর্ধ-সত্য কাহিনী পরিবেশন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব যে জনৈক চণ্ডীদাসের পদে প্রীত হইতেন এবং জয়দেব ও বিদ্যাপতির পদের সহিত চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করিতেন, তাঁহার প্রাচীন জীবনীকারগণ এই বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথি আবিষ্কারের পর এই সমস্যাগুলির আবির্ভাব হইল—

সমস্যাবলী

(ক) চণ্ডীদাস-রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কোন্ সময়ে রচিত ?

(খ) এই চণ্ডীদাসের পদাবলীই কি শ্রীচৈতন্যদেব আস্বাদন করিতেন ?

(গ) চণ্ডীদাসের নামে যে মোটামুটি শ্রুতিমধুর ভাবহৃদ্য পদগুলি প্রচলিত সেগুলি তবে কাহার রচিত এবং তিনি কোন্ সময়ের কবি ?

এই সমস্যাগুলির সঙ্গে বহু উপসমস্যা যুক্ত আছে। যেমন, প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থে চণ্ডীদাসকে বাসলী-সেবক বলা হইয়াছে, বাসলী আদেশেই তিনি পদ রচনা করিয়াছেন। পদকর্তা চণ্ডীদাস সম্পর্কেও 'বাশুলী' দেবীর উপাসক জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। সুতরাং এই দুই বাসলী কি একই দেবী এবং চণ্ডীদাস একই কবি ? কিন্তু তাঁহার জীবন সম্পর্কে যে কিংবদন্তীগুলি লোকমুখে ভ্রাম্যমান, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থে তাহার কণামাত্রও উল্লেখ নাই। উভয় রচনা যদি একই কবির লেখনী-নির্গত হইত তবে, বিষয়গত অথবা ভাষাগত খানিকটা সাদৃশ্য থাকিত। কিন্তু চণ্ডীদাসের প্রচলিত আত্মনিবেদন ও আক্ষেপানুরাগাত্মক পদের সহিত সকামলীলার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দুস্তর ব্যবধান। একস্থানে রাধা জন্ম হইতে কৃষ্ণৈকপ্রাণা, উদাসিনী, যোগিনী, আর একস্থানে রাধা বনের যুবকের কাছে আপনাকে আত্মদানে একান্ত অনুৎসুকা। পদাবলীর চণ্ডীদাসে রাধাকৃষ্ণের দৈবতরূপ, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মানব-মানবী রূপ।

ভাষার দিক দিয়াও দুয়ের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য পার্থক্য রহিয়াছে। পদকর্তা চণ্ডীদাসের ভাষা সারল্যে, অকপট আত্মসমর্পণে, নারীর কমনীয় ছলনাহীন আবেগে নিতান্ত সহজ প্রাণস্পর্শী, সে ভাষা আধুনিক মৌখিক ভাষারই সমতুল্য। কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা প্রাচীনত্বে কণ্টকিত, উচ্চারণে বন্ধুর, প্রকাশভঙ্গিতে দুর্বোধ, অর্থগ্রহণে জটিল। জনপ্রিয়তা

পদকর্তা চণ্ডীদাসের ভাষাকে যুগে যুগে পরিবর্তিত ও সমকালীন করিয়া তুলিয়াছে আর লোকান্তরিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গোপন পুঁথিশালায় অবহেলায় আত্মরক্ষা করিয়া তাহার প্রাচীন রূপটি অবিকৃত রাখিয়াছে এরূপ ব্যাখ্যাও শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য লাগে না। কারণ কেবল দুর্বোধ্যতার আবরণ অপসারিত করিলেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা পদকর্তার অনুষঙ্গে সংযুক্ত হইয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বিবৃতিমূলক নাট্যপদ্ধতিতে রচিত। ইহার বৃহৎ বিস্তার ও সংলাপ-প্রাধান্য, ঘটনার দ্রুত গতিবেগ ও চরিত্র-চিত্রণ, বস্তুময়তা ও তথ্যাতিরেক ঠিক পদকর্তা চণ্ডীদাসের একান্তিক আবেগসর্বস্ব গীতরসপ্রধান পদের সহিত তুলিত হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনারীতি মঙ্গলকাব্য পাঁচালি নয়, ইহাও সংগীতনাট্য, কিন্তু এই গীতিময়তার স্তরে এমন একটি অমার্জিত প্রাচীন আদিম স্তরের দৃষ্টান্ত আছে যাহা পদকর্তা চণ্ডীদাস সম্বন্ধে অকল্পনীয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গীতিকবিত্ব

সর্বাপেক্ষা বড় কথা, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে যে দুই নায়ক-নায়িকার দুর্নিবার আকর্ষণের লীলাকে কাব্যের বিষয়ীভূত করা হইয়াছে, সেখানে ঐশ্বরিকতার কোনো ব্যাপারই নাই। রাধা অথবা কৃষ্ণ জন্মসূত্রে দেবতা হইলেও কর্মসূত্রে তাঁহারা সাধারণ ধূলি-পৃথিবীর আসক্তি-বিরক্তিযুক্ত মানুষ। যে দ্বিজ চণ্ডীদাস হীনবর্ণের অপাংক্তেয় নারীকে অসীম দেবতার মর্যাদা দিয়া তাহারই প্রেমের মধ্যে অপ্রাকৃত রহস্যের সন্ধান পান, তাঁহার পক্ষে অপ্রাপ্তবয়স্কা নারীর উপর পথিমধ্যে আক্রমণ ও তাহার কোমল অনভিজ্ঞ দেহের উপর পাশবিকতার শুষ্ক দাবীর সফেন বর্ণনার কথা কল্পনা করা যায় না। মোটামুটি বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে অশ্লীলতা ও গ্রাম্যতার প্রভূত উদাহরণ আবিষ্কার করা কঠিন নয়। শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক পুনঃপুন তাঁহার দৈবসংস্কারের উল্লেখ সত্ত্বেও তাঁহার চরিত্রের সেই তেজোময় সত্তার প্রতি আমাদের কোনো ভক্তিশ্রদ্ধার আবেদন জাগে না এবং চণ্ডীদাসের বৈষ্ণবতার কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ মেলে না। সুতরাং এই আদিরসাত্মক কাব্যখানিই কি চৈতন্যদেব কর্তৃক পরম-প্রীতিভরে জয়দেব-বিদ্যাপতির সহিত আস্বাদিত হইত? রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাই যথার্থ প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন,

"যে চণ্ডীদাসের ভাষার ধ্বনি এতকাল আমাদের কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া আকুল করেছে মোর প্রাণ"—এই ভাষা কি সেই চণ্ডীদাসের?

এতকাল ভবে আমরা যে ভাষার সুরে মুগ্ধ অভিভূত অবসন্ন হইতেছিলাম সে ভাষা কি চণ্ডীদাসের নিজের ভাষা নয়? তবে কি আমাদের চিরপরিচিত চণ্ডীদাস আর এই নবাবিষ্কৃত চণ্ডীদাস এক চণ্ডীদাস নহেন? চণ্ডীদাস কি দুইজন ছিলেন?" [শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মুখবন্ধ]

এই ধরণের সমস্যা আরও একাধিক আছে, তবে মূল সমস্যা প্রায় একই। সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ ও প্রাচীন সাহিত্যের রত্নাবিষ্ট গবেষকগণ এইগুলির সমাধানও নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু সবশ্রেণীর পাঠকের নিকট তাহা সন্তোষ-জনক অথবা বিশ্বাস্য হয় নাই। নতন কোনো চমকপ্রদ উপকরণ-ব্যতিরেকে তাহা সম্ভবও নয়, কারণ চণ্ডীদাস সম্পর্কে আমাদের ধারণাও অনেকখানি প্রাক্তন সংস্কার-বিশ্বাসের উপর জড়িত বলিয়া সেই ভিত্তিমূলকে শ্লথ করা প্রায়শ কষ্টকর। যুক্তির দাবি গ্রহণীয় মনে হইলেও অন্তরের প্রত্যয় যেন ঠিক পরাস্ত হইতে চায় না।

বড়ু চণ্ডীদাস ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্পর্কিত সমস্যাগুলির সম্ভাব্য মীমাংসা পর্যালোচনা করিলে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। যথা—

প্রথমত, নানা কারণে বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় আবিষ্কৃত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামক কাব্যখানিকে কৃত্রিম ও উপেক্ষণীয় কাব্য বলা যায় না। সুতরাং বড়ু চণ্ডীদাসের এই সম্পূর্ণাঙ্গ কাব্য এবং চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত স্বতন্ত্র রাধাকৃষ্ণ প্রেমবিষয়ক পদ সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই সারস্বত সৃষ্টি, দুই পৃথক

দুইজন চণ্ডীদাস

ব্যক্তির ভিন্ন মনন ও কাব্যশিল্পের পরিচায়ক। দুই কবির মেজাজ ও ভঙ্গি, বিষয় ও বিবরণের বৈপরীত্য বিচার করিলে চণ্ডীদাস নামে দুইজন কবির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য-খানির ভাষা [পুঁথির লিপিকাল ডঃ সুকুমার সেনের মতে অষ্টাদশ শতাব্দীর কোনো এক সময়, যদিও পূর্ববর্তী গবেষকগণ পুঁথিটিকেও অত্যন্ত প্রাচীন মনে করিতেন] চতুর্দশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর বাঙলা ভাষা হওয়াই সম্ভব। এই ভাষায় কিছু কিছু আধুনিক-কালে প্রচলিত বাঁকুড়া,

ভাষার প্রাচীনত্ব

মানভূম, ধলভূম এবং প্রত্যন্ত-উড়িয়া ভাষায় উপভাষাগত বৈশিষ্ট্য আছে, তবে তাহা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন যুগের নিদর্শনই হইতে পারে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যখানি প্রাক্-চৈতন্যযুগের চণ্ডীদাস নামক কোনো কবি কর্তৃক রচিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয়ত, এই চণ্ডীদাস বাসলীর উপাসক ছিলেন এবং অনন্ত ও বড়ু শব্দের দ্বারাও নিজের পরিচয় দিয়াছেন [যদি অনন্ত শব্দটি লিপিকরের প্রক্ষেপ না হয়]। এই কাব্যে চণ্ডীদাসের ব্যক্তিগত জীবন-সংক্রান্ত কোনো তথ্য নাই। কবি সংস্কৃতে মোটামুটি সুপরিজ্ঞাত ছিলেন, জয়দেবের কাব্য তাঁহার কাব্যের প্রেরণা হইয়াছিল। কাব্যের বিষয় তিনি তৎকাল প্রচলিত পুরাণ হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন, যদিও পুরাণ-বহির্ভূত অনেক প্রসঙ্গ তাঁহার রচনায় দৃষ্ট হয়। মনে হয়, রাধাকৃষ্ণের দেহকেন্দ্রিক প্রেমলীলা অবলম্বনে প্রচলিত কোনো তৎসাময়িক জনসাহিত্যের বিষয়বস্তুকেই তিনি কাব্যের আধারে বিবৃত করিয়াছেন।

জনসাহিত্যের কাব্যরূপ

তৃতীয়ত, খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতক হইতে কিংবা তাহারও পূর্ববর্তী কাল হইতে বাঙলা দেশে ও তাহার আশেপাশে সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ অথবা দেশী ভাষায় নৃত্যগীত-নাট্যাভিনয় সংবলিত এক প্রকার যাত্রা ধরণের রচনারীতি লোক-সমাজে প্রচলিত ছিল। ইহাকে নাটগীত বলা যায়। জয়দেবের গীতগোবিন্দ, মৈথিলী কবি উমাপতি উপাধ্যায়ের [বিদ্যাপতির শতবর্ষ পূর্ববর্তী] পারিজাত-হরণ, রায় রামানন্দের জগন্নাথ-বল্লভ নাটক প্রভৃতি এই ধরণের নাটগীতের প্রসক্তিতেই বড়ু চণ্ডীদাস তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনা করিয়াছিলেন। এই নাট্যপালার অন্তর্গত দানলীলা নৌকালীলা যোজনার সর্বপ্রথম কৃতিত্ব তাঁহারই এবং এই কারণেই ইহা সম্ভবত চৈতন্যদেবকে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

নাটগীত

চতুর্থত, কাব্যের বিষয়গত গ্রাম্যতার জন্যই হোক অথবা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের জনপ্রিয়তা সম্ভবত অল্পকালের মধ্যেই সমাধিস্থ হয় [চকিত-বিদ্যুদ্দীপ্ত-প্রতিভা কোনো পদকর্তা চণ্ডীদাসের আবির্ভাবই কি এই জনপ্রিয়তা লুপ্তির প্রধান উপলক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল?]। তবে চণ্ডীদাস নামের স্মৃতি লোকমুখে অক্ষুণ্ন থাকে এবং এই নামে পুণ্য জ্যোতির্ময় স্মৃতির আবহমণ্ডলে পরবর্তী কালের অনেক খ্যাত-অখ্যাত কবি আত্মনিলীন করিয়াছেন।

জনপ্রিয়তা লুপ্তি?

পঞ্চমত, চৈতন্যদেবের অব্যবহিত পূর্বে অথবা সমকালে চণ্ডীদাস নামক জনৈক পদকর্তার আবির্ভাবের ও জনপ্রিয়তা-লাভের অনুমান প্রায় অপরিহার্য হইয়া পড়ে। ইনিও সম্ভবত বাসলী অথবা বাশুলীর উপাসক ছিলেন এবং ইহারও জীবনে হয়ত এমন কিছু স্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহা সত্যমিথ্যার স্ফীতকুহেলি-জড়িত হইয়া কয়েক শতাব্দীর লোকশ্রুতিতে বিবর্ধিত হইতে থাকে। ইতিপূর্বে বড়ু চণ্ডীদাস তাঁহার সুসংবদ্ধ নাটপালার দ্বারা সমাজে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের ক্রমবিন্যস্ত ইতিহাসটিকে দৃঢ়-রেখাঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রাম্য ইতরতা ও সুলভ ভোগসর্বস্ব দেহকামনার পরিণাম-পৃষ্ঠাগুলিতে কৃষ্ণসঙ্গ-ব্যাকুলা রাধার যে দিগন্ত-বিদারী মর্মক্রন্দন উত্থিত হইয়াছিল তাহার ক্ষীয়মান রেশ এই পদকর্তা চণ্ডীদাস নিঃসংশয়িত বিলাপের সংগীতে বাজাইয়া দিলেন। পূর্বাভিনীত নাট্যকাব্যে কাপট্যের প্রতিনিধি অন্তর্হিত শ্রীকৃষ্ণ এখন প্রেমিকের বিশ্বস্ত অঙ্গীকারে মনোমোহন আত্মসমর্পণকারী রূপে প্রত্যাবর্তন করায় শ্রীকৃষ্ণের সুবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া, শ্রোতৃসমাজও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রহস্যের মধ্যে রচয়িতা-দ্বৈতের কোনো সমস্যা লক্ষ্য করিতে না পারিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

দ্বিতীয় চণ্ডীদাসের উদ্ভব

পদকর্তা চণ্ডীদাস প্রথম শ্রেণীর কবি হওয়া সত্ত্বেও প্রচলিত বড়ু চণ্ডীদাসের বক্ষ্যমাণ খ্যাতি-গৌরবের আশ্রয়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া আপনার আত্মপরিচয় ও অভ্রান্ত জীবনতথ্যগুলিকে যথাযথভাবে প্রচারের সুযোগ পান নাই। হয়ত তাঁহার কবিস্বভাবের মধ্যেই একটি অন্যমনস্ক ঔদাসীন্য ছিল, একটি অর্ধচেতন আত্মঅবহেলা ও অসতর্ক প্রসাধনহীনতা তাঁহার কবিস্বভাব হইতেই তাঁহার নায়িকা রাধিকার উপর আরোপিত হইয়াছে। তারপর সপ্তদশ শতাব্দী হইতে চণ্ডীদাসের নামে একটি অরাজকতার সৃষ্টি হইয়াছিল। সম্ভবত দুই চণ্ডীদাসের মিশ্র জনপ্রিয়তা চণ্ডীদাস নামটিকে একটি রহস্যময় পুণ্য বৈষ্ণবতীর্থে পরিণত করিয়াছিল এবং আত্মস্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ করিয়া অনেক অজ্ঞাতনাম কবি সেই তীর্থে আপনার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি নিঃশেষে দান করিয়াছেন। এই কাব্যদান-যজ্ঞে জ্ঞানদাস, বলরামদাস, শেখর প্রভৃতি জ্ঞানী কবির পদও তাই চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত রাগাত্মিকা পদাবলীর চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস প্রভৃতি অন্যান্য অনুরূপ উপাধি কবির অজস্র সৃষ্টি এই

পদকর্তা চণ্ডীদাসের কবিস্বভাব

একটি কবিনামের মোক্ষদায়ী তীর্থে মিলিত হইয়াছে। চণ্ডীদাস সম্পর্কিত অসংখ্য গালগল্প-জনশ্রুতি, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের সাক্ষাৎকার প্রভৃতি কাহিনীকে সুস্পষ্ট প্রমাণাভাবে ভিত্তিহীন বলাই শ্রেয় মনে হয়। নান্নুর অথবা ছাতনা প্রভৃতি অঞ্চলে চণ্ডীদাসের লীলাভূমি এই বিষয়েও কোনো নিশ্চিত প্রমাণের অভাব থাকায় এই সমস্যা অমীমাংসিতই আছে। তবে বিশেষজ্ঞের মতে চণ্ডীদাস সম্পর্কে নান্নুরের দাবী অবাস্তর, কারণ নান্নুরে যে দেবীমূর্তি আছে উহা বাশুলীর নয়। ছাতনার বাসলী-ঘটিত একটি প্রাচীন পুঁথিতে চণ্ডীদাসের নাম নাই। সুতরাং মূল কবি-সমস্যার সঙ্গে এই স্থান-ঘটিত সমস্যার যোগ না রাখাই বিধেয়। চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদাবলীতে একটিও গৌরচন্দ্রিকা নাই, আপাতত চণ্ডীদাসের চৈতন্যপূর্বত্বই ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে।

স্থান সমস্যা

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যখানি লিপিকরের হাতে অনেকটা পরিবর্তিত হইয়াছে এবং ইহার ফলে কিছু কিছু অসংগতিও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছে। বিরহখণ্ডে শ্রীরাধা মাধবকে অনুসন্ধান করিবার জন্য বড়াইকে ভাগীরথীকূলে যাইবার নির্দেশ দিয়াছেন। ভাগীরথীকূলে শব্দটি হইতে কোনো কোনো সমালোচক ইহা চৈতন্যোত্তর সময়ের ইঙ্গিত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। ইহা কষ্ট কল্পনা। লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ধোয়ী তাঁহার পবনদূতে ভাগীরথীতীরে রঘুকুলগুরু দেবতার পূজার্চনার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা তো চৈতন্যলীলার ইঙ্গিত বলিয়া বোধ হয় না।

চৈতন্যলীলার ইঙ্গিত

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের স্থূল অমার্জিত কাব্যরূপের মধ্য দিয়া বড়ু চণ্ডীদাসের চরিত্রায়ণ ক্ষমতার, নাট্যগ্রন্থন প্রতিভার ও জীবন-সম্পর্কে প্রৌঢ় অভিজ্ঞতার দুর্লভ নিদর্শন পাওয়া যায়। রাধাকৃষ্ণের দিব্য প্রেম সম্পর্কে বৈষ্ণব পদাবলীর যে স্মৃতি আমাদের চিত্তে সঞ্চিত, বড়ু চণ্ডীদাসের সঙ্গে তাহার কোনো সম্পর্ক নাই। এই কাব্যের নরনারীর মুখে ঐশ্বর্য ও ঐশ্বরিকতার প্রসঙ্গ থাকিলেও তাহারা সম্পূর্ণ মর্তলোকের অধিবাসী। তাহাদের অশালীন ভোগবাসনা ও জীবনতৃষ্ণা, কলহ ও অসংযম, বাক্‌পটুতা ও গ্রাম্য-আক্ষেপ সব মিলিয়া চরিত্রগুলিকে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের ঊর্ধ্বলোক হইতে, মানসসুরধুনীর পারাস্তর হইতে একেবারে ছায়াঘন নদী-মেখল গ্রাম বাঙলার পল্লীতে স্থানান্তরিত করে। ভাষা ও ভঙ্গিতে

বড়ু চণ্ডীদাসের প্রতিভা

আদিমতা সত্ত্বেও বড়ু চণ্ডীদাস যে গীতি-প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। রূপ-বর্ণনায়, প্রকৃতি-সৌন্দর্য-চিত্রণে, বিবদমান উক্তি-প্রত্যুক্তির ফাঁকে ফাঁকে তাঁহার রসঘন কৌতুকোচ্ছল গীতিপ্রবণ কবিপ্রতিভার উদাহরণ মুহুর্মুহু ক্ষরিত হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আঙ্গিকের সহিত যাত্রা, পাঁচালি ও মঙ্গল-কাব্যের অস্পষ্ট সাদৃশ্য ইহার রচনারীতিগত প্রাচীনত্বেরই মুদ্রাচিহ্ন রূপে পরিগণিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের নায়িকা 'চন্দ্রাবলী রাহী' সাগর ঘোষ ও পদুমার কন্যা। আর পদাবলীর রাধা বৃষভানুরাজকন্যা, চন্দ্রাবলী এখানে পৃথক নারী, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে রাধার প্রধান প্রতিপক্ষ, তবে পরকীয়া মধুর রসে চন্দ্রাবলী অপেক্ষা রাধার শ্রেষ্ঠত্বই বৈষ্ণব পদাবলীতে স্বীকৃত। বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে এই ধরণের কোনো পরকীয়া প্রেমের কায়ব্যূহ নাই। পদাবলীর মাধুর্য সখীদের ভূমিকায়, বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে সখী নাই, আছে জরতী বড়াই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আঙ্গিক পালা-কাব্যের, ইহা নাটকীয়তার আধারে পরিবেশিত, প্রচলিত পদাবলী কেবলই গীতিমূলক। বড়ু চণ্ডীদাস ঘটনার ক্রমানুসরণে কাব্যের বিষয় বিভাগ করিয়াছেন, যেমন তাম্বূল খণ্ড, বৃন্দাবন খণ্ড। পদাবলীতে ভাবানুযায়ী রস-পর্যায়ভেদ যেমন পূর্বরাগ, আক্ষেপানুরাগ ভাবোল্লাস।

প্রচলিত পদাবলী ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের তুলনা

বড়ু চণ্ডীদাস অপেক্ষাকৃত প্রাচীনযুগের কবি বলিয়া তাঁহার কোনো দার্শনিক পটভূমিকা ছিল না, তিনি লোকায়ত সমাজের নাট্যকৌতূহলকেই মুখ্যত চরিতার্থ করিয়াছিলেন। প্রচলিত পদাবলীতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের একটি বৃহৎ পটভূমিকা আছে। এমন কি, প্রাক্‌চৈতন্যযুগের কবি বিদ্যাপতি অথবা চণ্ডীদাসের পদেও শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমের প্রভু বলিয়া স্বীকার করা যায়। তাঁহাদের বৈষ্ণবময়তা, প্রেমের অপ্রাকৃত ঐশীলীলা, মানব-মানবীর তনুদেহে জ্যোতির্ময় বৃন্দাবনের মাধুরীস্ফুরণ এক মুহূর্তে ধূলিধূসর পৃথিবী হইতে এক অপরিচিত অমর্তলোকের বস্তুরূপে আমাদের দৃষ্টি ও চেতনাকে বিভ্রান্ত করে। তাহাদের পদে মানবিক প্রেম তাহার গভীর অতন্দ্র অতলস্পর্শী রহস্যানুভূতি ও অসীম সৌন্দর্যস্পৃহার দ্বারা এমন একটি অনির্বচনীয় মহিমা প্রাপ্ত হইয়াছে যে ইহা কোনো তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বা দার্শনিক বিশ্বাস-ব্যতিরেকেই আধ্যাত্মিক সৌরলোকে ঊর্ধ্বাভিসারী হইয়াছে। এইখানেই বড়ু চণ্ডীদাসের

সঙ্গে বিদ্যাপতি অথবা তাঁহার সমকালীন পদকর্তা চণ্ডীদাসের মুখ্য ব্যবধান। শেষ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া শ্রীরাধার গৃহবন্ধন উপেক্ষা করার যন্ত্রণাক্ত ব্যাকুলতা, অভ্যস্ত দিবাকাযে বিপর্যয় এবং সুদূর কৃষ্ণাভিমুখিতার দুরন্ত দুঃসাহস অনুভূত হইলেও, ইহা তাহার নবোন্মেষিত প্রেম না উত্তেজিত যৌবন-চেতনার পরিণাম তাহা বলা কঠিন। পলাতক শ্রীকৃষ্ণের জন্য বড়ুর রাধার অশ্রুসিক্ত হৃদ্‌বিদারণের মধ্যেও তাহার দেহকামনার কথা গোপন নাই।

চসার ও বড়ু চণ্ডীদাস

ভাষার শক্তি পরীক্ষা, লোকজীবনাভিজ্ঞতা ও চরিত্র চিত্রণের দিক দিয়া বড়ু চণ্ডীদাসের সহিত সীমাবদ্ধক্ষেত্রে ইংরাজ কবি চসারের তুলনা করা যাইতে পারে। নর্মান বিজয়ের পর ফরাসী ও ইংরাজি ভাষার সমন্বয়ে নির্মিত এক নূতন মিশ্র ভাষার বাক্‌সম্পদ ও প্রকাশপ্রণালীকে চসার কাব্যের ভূমিতে প্লাবিত করিয়া তাহাকে উবরা ও শস্যশ্যামল করিয়াছেন। তুর্কী আক্রমণের পর বাঙলা ভাষাও শিথিল অব্যবস্থায় মৃতকল্প ছিল, সম্ভবত বড়ু চণ্ডীদাসই তাহাকে একটি পূর্ণ কলেবর মৌলিক কাব্যরচনায় প্রয়োগ করিয়া তাহার ভাবপ্রকাশের শক্তি ও কাব্যরসের ব্যঞ্জনা ও নন্দনস্বাদ সৃষ্টির অসীম ক্ষমতার পরীক্ষা করিয়াছেন। এই কাব্যরূপের ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়াই যে পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে বাঙলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর বিকাশ ঘটিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বড়ু চণ্ডীদাস লোকজীবনের চারিত্রিক অভিজ্ঞতায় বিচক্ষণ ছিলেন। বস্তুনিষ্ঠা পর্যবেক্ষণশক্তি পরিহাসচেতনা কৌতূহলবিদ্ধ কাহিনী নির্মাণের ক্ষমতা মৃত্তিকাসন্নিধ জীবনের পঙ্ক ও ধূলিরেখাঙ্কিত গৃহভিত্তি চিত্রণে মধ্যযুগের আদিস্তরে তাঁহার সমতুল কবি নাই।

'মাধুকরী' কাব্যচয়নিকায় বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হইতে বংশীধ্বনি বিষয়ক দুইটি পদ, 'কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি' এবং 'সুসর বাঁশীর নাদ শুনিআঁ' উদ্ধৃত হইয়াছে।

ভাগবত-অনুবাদ ঃ মালাধর বসু

"রামায়ণ মহাভারতের সহিত তুলনায় বাঙালী মনে ভাগবত কাহিনীর আকর্ষণ একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির ছিল। বৈষ্ণব ভক্তিবাদের উৎস ও ভাবাদর্শের

দার্শনিক আশ্রয়রূপে ভাগবত প্রভাব বাঙালী সমাজে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতের মত ভাগবত-কথা বাঙালীর অস্থিমজ্জাগত জীবন-সংস্কারে পরিণত হয় নাই। চৈতন্য-প্রবর্তিত প্রেমভক্তিধর্মে দীক্ষিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ই প্রধানত তাহাদের ভাববিহ্বলতার পোষক তত্ত্বসমর্থনলাভের জন্য ভাগবত-পাঠের প্রেরণা পান। ভাগবতের রাধাকৃষ্ণ প্রেমাত্মক রসতত্ত্ব সমসাময়িক বৈষ্ণবগোষ্ঠী ইতিপূর্বেই শ্রীচৈতন্য-লীলাবিলাসের মাধ্যমে আস্বাদন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় যে অপরূপ রসমাধুরীময় দিব্য নাটক অভিনীত হইতেছিল তাহার জন্য শাস্ত্রীয় প্রমাণের বিশেষ আবশ্যক ছিল না। যাঁহারা ভাবতন্ময় গোরাকে দেখিয়া বা তাঁহার অপার্থিব রস-বিভোরতার কথা শুনিয়া জীবনে ধন্য হইয়াছিলেন তাঁহারা ভাগবতে বিবৃত কৃষ্ণপ্রেমলীলা কাহিনীর মধ্যে পরিচিত বিষয়ের ভাবোন্নয়ন-মহিমা অনুভব করিয়াছিলেন কিন্তু ঘটনার নূতনত্ব তাঁহাদের মনে বিশেষ কোনো রেখাপাত করে নাই। রামায়ণ-মহাভারতের সরল আখ্যানসমূহ যেমন প্রাকৃত জনসাধারণের মনোরঞ্জন করিয়াছে, তেমনি ইহাদের মাধ্যমে প্রচারিত ভক্তিবাদ সমস্ত তত্ত্বসীমা উত্তীর্ণ হইয়া এক স্বতঃস্ফূর্ত সুনিবিড় অধ্যাত্ম-প্রত্যয়াবেশে তাহাদের চিত্তকে রসাপ্লুত করিয়াছে। ভাগবতে কাহিনীর আবেদন গৌণ ও তত্ত্বের আবেদন মুখ্য বলিয়া ইহা প্রধানত পণ্ডিত সমাজের অনুশীলনের বিষয় হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত অজ্ঞ জনসাধারণ ভাগবতের বঙ্গানুবাদের রসাস্বাদন-শক্তি অর্জন না করিয়া পণ্ডিতের মৌখিক ভাষণ ও ব্যাখ্যার উপরেই বিশেষভাবে নির্ভর করিয়াছে। ইহার এক পরোক্ষ ফল হইয়াছে এই যে ভাগবতের কোনো অনুবাদ কৃত্তিবাস কাশীরামের অনুবাদ-গ্রন্থের মত ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও জাতীয় মর্যাদা লাভ করে নাই। সুতরাং ভাগবতের অনুবাদকার্যে কবিগণ বাঙালী মনোধর্ম ও জীবনরুচির আদর্শে মূলের সামগ্রিক রূপান্তরীকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই। তাঁহারা মূলের অনেকটা যথাযথ অনুসরণ করিয়াছেন ও উহার তত্ত্বপ্রাধান্য যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। ভাগবতের দুরূহ অধ্যাত্মতত্ত্বের লোকায়ত রুচিকর সরল সংস্করণ পূর্বেই পদাবলীসাহিত্য ও চৈতন্যজীবনীর মাধ্যমে অনেকটা সম্পাদিত হইয়াছিল বলিয়া উহার অনুবাদে আর সর্বজনবোধ্যতা ও রসতারল্যের আদর্শ অনুসরণ করিবার প্রয়োজন হয় নাই। ভাগবতের

অনুবাদ অচিরোদ্ভূত বাঙলা ভাষার শক্তিপরীক্ষার এক নূতন ক্ষেত্র রচনা করিল।" [বাঙলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়]

অনুবাদ সাহিত্য

কল্যাণকর্মের প্রথম কারয়িতাই দুষ্কর সাধনের গৌরবে কীর্তিমান। চন্দ্রচূড়-জটাজাল হইতে ভাগীরথী উদ্ধারের মত ভাষাপথ খনন করিয়া সংস্কৃত হ্রদ হইতে ভারত-রসের সুধাস্রোত এই তৃষিত বিমলবঙ্গে প্রবাহিত করার আদিকর্মিকদিগের নিকটও উত্তরকালের বাঙলা সাহিত্যের ঋণ ও কৃতজ্ঞতার শেষ নাই। ভাগবত-অনুবাদক মালাধর বসু সম্পর্কে ইহা বিশেষভাবে সত্য।

নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার ইতিহাসে দেখা যায়, মূল বা মাতৃকল্প ভাষার ঐশ্বর্যসম্পদ অনুবাদ করিয়া, পৌরাণিক আভিজাত্যের গৌরব-মাহাত্ম্যের তর্জমার দ্বারা প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্য সম্পদশালী হইয়াছে। ১৩শ শতাব্দীতেই প্রাচীন তেলেগু ভাষায় রামায়ণ-মহাভারতের ও ভাগবতের অনুবাদ হইয়াছে। ১৬শ শতাব্দীর মধ্যেই অসমীয়া ও ওড়িয়া ভাষায় মাধব কন্দলি ও শংকরদেব, সারলা দাস ও বলরাম দাস প্রমুখ কবি রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি ভারতজাহ্নবীকে আপন ভাষাখনিত পথে প্রবাহিত করিয়া জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে শস্যময়ী করিয়াছেন। মধুসূদন কাশীরাম দাসের মহাভারত অনুবাদকে যে ভাষায় প্রশস্তি করিয়াছেন, সমগ্র মধ্যযুগীয় অনুবাদ কাব্য সম্পর্কেই তাহা প্রযোজ্য। দৈনন্দিন ক্রিয়াচার ও উৎসব-সংস্কৃতির ভিতর দিয়া সংস্কৃত তাহার সমৃদ্ধ উপকরণ ও সাহিত্যকে উত্তরাধিকারসূত্রে রক্ষা

দেশ
প্রয়োজনীয়তা

করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু জনসাধারণের মর্মমূলে তাহার স্বচ্ছন্দ প্রবেশ বাধাগ্রস্ত। এই বৈপরীত্য-মোচনের ব্যাকুলতা অনুভব করিয়াই মহাপ্রাণ ব্যক্তিরা অনুবাদকার্যে মন দিয়াছিলেন। সম্ভবত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সহিত অব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইবার আশঙ্কাও এই অনুবাদের অন্যতম প্রেরণা ছিল। ইহা ভিন্ন বিদেশী আক্রমণে পর্যুদস্ত স্বধর্মভ্রষ্ট বাঙালী তাহার দুর্বল আত্মশক্তিহীন মেরুদণ্ডটিকে সজীব করিবার জন্য কোনো প্রাণাবেগপূর্ণ রসায়নের প্রতীক্ষা করিতেছিল। রামায়ণের গার্হস্থ্য জীবনাদর্শ, ভাগবতের ভক্তিবাদ, মহাভারতের কর্মবাদ তাহার অনভিজ্ঞ লোকায়ত জীবনকে নূতন

শক্তি ও সামর্থ্য দান করিবে, এই প্রতিজ্ঞায় লোক-শিক্ষক কবি রামায়ণ-ভাগবতের দুর্গম পৃষ্ঠাগুলিকে জনসাধারণের ভাষায় অনূদিত করিয়া দিলেন।

অনুবাদে বাঙালীর জীবনাদর্শ

কৃত্তিবাসী রামায়ণ অথবা মালাধর বসুর ভাগবতানুবাদ আক্ষরিকভাবে সংস্কৃতের বঙ্গানুবাদ হয় নাই এই কারণে। তাঁহাদের রামচরিত্র অথবা শ্রীকৃষ্ণজীবন শক্তি ও মাধুর্যে, বলশালিতা ও কোমলতায় বাঙালী জীবনেরই প্রতিনিধি হইয়াছে। মার্টিন লুথার যেমন বাইবেলের ভাষানুবাদ করিয়া মধ্যযুগের ইংলণ্ডে নূতন মানবমাহাত্ম্য-প্রধান খ্রীস্টধর্মের সংস্কারান্দোলনের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, মালাধর বসুও সেইরূপ ভাগবতের কৃষ্ণমহিমার বিজয়গাথা রচনা করিয়া বাঙলা দেশে প্রেমভক্তিবাদের জোয়ার-সম্ভাবনা জাগাইয়া দিলেন। সেই জোয়ার-তরঙ্গে হরিনামের বিজয়পতাকা উড়াইয়া অচিরকালের মধ্যেই করুণাঘন শ্রীচৈতন্য আবির্ভূত হইয়াছেন এবং এক ধর্ম রাজ্যপাশে খণ্ডছিন্ন বিক্ষিপ্ত জাতিকে মহৎ ঐক্যডোরে বাঁধিয়া তুলিয়াছেন।

বাঙলা দেশে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতেই রামচন্দ্রদেব যে বিগ্রহের মত পূজিত হইতেন তাহার প্রমাণ আছে। ধোয়ী কবি তাঁহার পবনদূত কাব্যে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। বাঙলা দেশের কবি গৌড় অভিনন্দ এবং সন্ধ্যাকর নন্দী তুর্কী আক্রমণের পূর্বেই রামায়ণ-অবলম্বনে দুইখানি রামচরিত রচনা করিয়াছিলেন। রামপালদেবের অনুগৃহীত সন্ধ্যাকর নন্দী নিজেকে 'কলিকাল-বাল্মীকি' আখ্যা দিয়াছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই দুইখানি রামায়ণ কাব্য জনসাধারণের জীবনের নিত্য সমাদরে পরিণত হয় নাই।

কৃত্তিবাস ও রামভক্তিবাদ

কৃত্তিবাসই সর্বপ্রথম উত্তর-ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষায় রামায়ণ অনুবাদ করিয়া জীবনবাণীর সূচীপত্রে জাতীয় আশাআকাঙ্ক্ষাকে গ্রথিত করিলেন। কৃত্তিবাসের পরে তুলসীদাস অবধী ভাষায় রামচরিতমানস অনুবাদ করিয়া উত্তর ভারতে রামভক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তর-ভারতীয় মানবিক আদর্শ ও পূর্ব-ভারতীয় প্রেমভক্তিকে কৃত্তিবাস মিলাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার অনুবাদ মধ্যযুগীয় বাঙলা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যে পরিণত হইয়াছিল। বাঙলা রামায়ণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই মন্তব্য করিয়াছেন—

"আমাদের দেশে রাধাকৃষ্ণের কথায় সৌন্দর্যবৃত্তি ও হরগৌরীর কথায়

হৃদয়বৃত্তির চর্চা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে ধর্মপ্রবৃত্তির অবতারণা হয় নাই, তাহাতে বীরত্ব মহত্ত্ব অবিচলিত ভক্তি ও কঠোর ত্যাগ স্বীকারের আদর্শ নাই।…রামায়ণ-কথায় একদিকে কর্তব্যের দুরূহ কাঠিন্য, অপরদিকে ভাবের অপরিসীম মাধুর্য একত্র সম্মিলিত।…তাহাতে সর্বপ্রকারের হৃদ্‌বৃত্তিকে মহৎ ধর্মনিয়মের দ্বারা পদে পদে সংযত করিবার কঠোর শাসন প্রচারিত। সর্বতোভাবে মানুষকে মানুষ করিবার উপযোগী এমন শিক্ষা আর কোনো দেশে কোনো সাহিত্যের নাই।"

মালাধর বসু

চৈতন্যাবির্ভাবের পূর্বে কুলীনগ্রাম ছিল বাংলাদেশে বৈষ্ণব প্রেমভক্তির অন্যতম পীঠস্থান, এই গ্রামে কিছুদিন যবন হরিদাস বাস করিতেন, অদ্বৈত আচার্য ও ঈশ্বরপুরীর দীক্ষাগুরু কৃষ্ণভক্ত মাধবেন্দ্র পুরী এই পথ ধরিয়াই প্রিয়-বিরহোন্মাদ-প্রকটিত-বিকার হইয়া দক্ষিণ-ভারতে যাইতেন গোপাল-সেবার জন্য চন্দন কাঠ আনিতে, এই গ্রামের 'শূকর চরায় ডোম সেহ কৃষ্ণ গায়' বলিয়া কৃষ্ণদাস প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যের নিকট এই গ্রামের জীবজন্তু পর্যন্ত বরণীয় ছিল। বাঙলা ভাষায় ভাগবতের প্রথম অনুবাদক কায়স্থকুলতিলক মালাধর বসু এই গ্রামে, এই প্রেম ভক্তিবাদের পূত ঐতিহ্যে অবগাঢ় হইয়া সম্ভবত পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে আবির্ভূত হন এবং পঞ্চদশ শতকের সপ্তম-অষ্টম দশকে ভাগবত-অনুবাদ সম্পূর্ণ করেন। গ্রন্থটি শ্রীকৃষ্ণবিজয় গোবিন্দবিজয় গোবিন্দমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণ-বিক্রম ইত্যাদি নামে পরিচিত। বৈষ্ণবদিগের অবশ্যপঠনীয় পরম ভক্তিশাস্ত্র ভাগবতের অনুবাদ বলিয়া ইহা বৈষ্ণব সমাজের নিত্যপূজ্য ও সমাদরের বস্তুতে পরিণত হইয়াছিল। মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে মালাধরই সর্বপ্রথম ভক্তির স্বর্ণসূত্রে জড়াইয়া লোককাব্য রচনা করিলেন। কৃত্তিবাস বড়ু চণ্ডীদাস প্রথমে কবি, মালাধর প্রথমে ভক্ত তৎপর কবি। মালাধরের কাব্যে 'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ' এই পংক্তিটি ভক্তিবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যকে গভীরভাবে অভিভূত করিয়াছিল। পুরাণ ও শাস্ত্রকথার ঐশ্বর্যবিভূতি ও বলদর্পী তেজস্বিতার কূটনৈতিক আবরণ হইতে শ্রীকৃষ্ণচরিত্রকে উদ্ধার করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবই তাঁহাকে প্রেমতৃষ্ণ ভক্তহৃদয়ে মধুর সেবার স্নিগ্ধচন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই মাধুর্যনন্দন শ্রীকৃষ্ণমূর্তির

প্রেমিকসর্বস্বতায় আগমনী মালাধরের কাব্যেই অনিবার্য যুগোৎকণ্ঠায় শ্রুতিগম্য হইয়াছিল।

-বিজয় শব্দটি মৃত্যুবাচক অর্থে ধরিয়া কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থশেষে কৃষ্ণের তনুত্যাগই ইহার উদ্দিষ্ট। প্রাচীন গ্রন্থে শোভাযাত্রা কীর্তিকথা অভিযান গৌরব অর্থেও বিজয় শব্দের প্রয়োগ আছে, এই অর্থে হয়ত শ্রীকৃষ্ণের গৌরবলীলাই এইরূপ নামকরণের নিহিত সংকেত। মঙ্গলকাব্যের দৈবমাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার সহিত ক্ষীণ-সাদৃশ্য সূত্রে গ্রথিত থাকার জন্যই এই পাঁচালি কাব্যের গোবিন্দমঙ্গল নাম হইতে পারে। জনৈক ইতিহাসকার আবার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে প্রচারিত শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের সম্মান-হানির সহিত যুক্ত করিয়া এই নামকরণের একপ্রকার ব্যাখ্যা দিয়াছেন—

গ্রন্থনাম তাৎপর্য

"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যে কৃষ্ণকলঙ্ক প্রচার করিয়াছে, তাহার 'কলঙ্কভঞ্জন' প্রয়োজন। রামায়ণের দ্বারা তাহা সম্ভব নয়। চৈতন্যপূর্ব বৈষ্ণব সমাজের মনোবেদনা তাই মালাধর বসুর ভাগবত-অনুবাদে শক্তি সঞ্চার করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পরাভূত কৃষ্ণমহিমা মালাধরের গ্রন্থে আবার বিজয়ী হইয়া অনুবাদ গ্রন্থের শ্রীকৃষ্ণবিজয় নাম করিয়াছে সার্থক"। [তারাপদ ভট্টাচার্য— বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস]।

সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ তথা পুরাণ-উপপুরাণের মধ্যে প্রাচীন ও মহৎ পুরাণ ভাগবত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ। বাঙলাদেশে সম্ভবত চতুর্দশ শতকের পূর্ব হইতেই ভাগবতের প্রচার হইয়াছিল। মূল ভাগবত দ্বাদশ স্কন্ধাত্মক, তিন শতকের অধিক অধ্যায়ে বিভক্ত, প্রায় অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকাবনদ্ধ। ইহাতে মহাভারত, গীতা, বিষ্ণুপুরাণ এবং অন্যান্য বহু পুরাণের প্রভাব আছে। ইহার রাসলীলা পরবর্তীকালে বিখ্যাত হইয়াছিল এবং বৈষ্ণব সমাজের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া একটি জাতীয় উৎসবে পরিণত হইয়াছিল। মালাধর বসু ভাগবতের মাত্র দশম ও একাদশ স্কন্ধের সারানুবাদ করিযাছিলেন এবং মঙ্গলকাব্যের আদর্শে যথাসম্ভব সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণের জন্মমৃত্যু-বিধৃত জীবনলীলার বিবরণ দিয়াছেন। অনুবাদের প্রয়োজনে মূল গ্রন্থের বহু উপকাহিনী পরিত্যক্ত হইয়াছে, দার্শনিক তত্ত্বালোচনা পরিমিত হইয়াছে, আবার দূরদর্শী পণ্ডিত-কবি লোক-প্রয়োজনে অন্যান্য পুরাণ হইতেও

ভাগবত ও শ্রীকৃষ্ণবিজয়

প্রাসঙ্গিক অংশ সংকলন করিয়াছেন। মূলের কাব্যসৌন্দর্য ভাষাকাঠিন্য যথাসম্ভব প্রাকৃত পাঠকের বুদ্ধি ও হৃদয়গ্রাহ্য করিবার চারুতায় মালাধর বসু নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। সমালোচকের মতে—

"প্রকৃতপক্ষে মালাধর হইতেছেন ভক্তকবি এবং তাঁহার কবিতা ভক্তিমূলক। তাঁহার ভক্তি সজীব ও সত্যবস্তু। উহা সকাম নয়, ভোগমুখী নয়, তাহা নিষ্কাম অহৈতুকী ভক্তি। তাহাব একদিকে জগৎ-বৈরাগ্য অন্যদিকে সত্যকার কৃষ্ণাসক্তি। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের সমস্ত কাহিনীর মধ্যে মালাধরের এই শ্রদ্ধাভক্তির ফল্গু অলক্ষ্যে প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং অনুকূল ক্ষেত্র পাইয়া মধ্যে মধ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল ক্ষেত্রে অনুবাদেব নির্লিপ্ত নৈর্ব্যক্তিক মনোভাব নহে, কবিব ব্যক্তিগত সজীব সক্রিয় চিত্তই স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে। রাসলীলার পূর্বে যখন কৃষ্ণ গোপীদিগকে ধর্মোপদেশ দিয়া নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, তখন গোপীদের উত্তরেব মধ্যে কেবল ভাগবতকার নয়, কবির নিজের জীবনার্তিও প্রকাশ পাইয়াছে—

ভক্তিবাদী কবি

শিশুকাল হৈতে সেবি তোমার চরণ।
তবু না করিলে দয়া শ্রীমধুসূদন॥ ..."

[তারাপদ ভট্টাচার্য—বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস]

মালাধর বসু গৌড়েশ্বর রুকনুদ্দীন বারবক্ শাহ কর্তৃক গুণরাজ খান উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহাব পিতার নাম ভগীরথ, মাতার নাম ইন্দুমতী। কবির পুত্র সত্যরাজ খান এবং রামানন্দ বসু তাঁহার পৌত্র। রামানন্দ শ্রীচৈতন্যের দ্বারা অনুগৃহীত হইয়াছিলেন এবং কবি হিসাবেও তাঁহাব খ্যাতি ছিল। শ্রীকৃষ্ণবিজয় পাঁচালি কাব্য, মহাকাব্যের অনুবাদে মালাধর ইহাকে অন্য কোনোরূপ অপ্রচলিত আঙ্গিকে রূপায়িত করেন নাই, লৌকিক কাব্যের জনধন্য রীতিই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে। আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন যে, তিনি পণ্ডিতের মুখে ভাগবৎ-পুরাণ শুনিয়া এবং ব্যাসের স্বপ্নাদেশ পাইয়া এই অনুবাদকার্যে অগ্রণী হইয়াছেন। একটি পাণ্ডিত্যগর্ভ দুরনুধাবনীয় গ্রন্থকে জনসাধারণের মর্মগ্রাহী ভাষায় রূপান্বিত করা মালাধরের প্রশংসাধন্য কাজ।

কাব্যরীতি ও আঙ্গিক

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের বৃন্দাবন-দ্বারকা-মথুরাকে আচ্ছন্ন করিয়া শ্যাম-তৃণাদৃত

বিহঙ্গকলধ্বনিত সুপারি-নারিকেল-কুঞ্জশোভিত বাঙলা দেশের ভৌগোলিক চিত্র প্রায়ই চোখে পড়ে। কংসনিসূদন দৈত্যারি ঐশ্বর্য্য-বিশাল শ্রীকৃষ্ণ যেখানে গোপীকান্ত রাসবিহারী নটবর-কান্তিতে পরিণত হইয়াছেন সেখানে পর্বতসানুদেশের উপকণ্ঠে বাঙলার মৃৎকুটিরই গড়িয়া উঠিবে। যমুনা এখানে স্বচ্ছতোয়া ভাগীরথী-গঙ্গার নামান্তর মাত্র। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য।

বাঙালী সুলভ ভাব

সংস্কৃত সাহিত্যের রত্নভাণ্ডারকে জনসমক্ষে মাতৃভাষায় উন্মুক্ত করার উপচিকীর্ষাই অনুবাদ সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। ইহার সহিত ছিল মহৎ কাব্যের জীবনাদর্শ ও বাণীর দ্বারা আমাদের ধূল্যবলুণ্ঠিত সম্মানকে পুনরুদ্ধারের কামনা, পারিবারিক ও গার্হস্থ্য আদর্শকে সংগঠিত করার প্রেরণা-সংগ্রহ, নির্জিত প্রণয়রিক্ত হৃদয়মরুত্বের অবসান ঘটাইয়া দৈববিশ্বাসের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও ভক্তিকুসুমের বীজ বপন করা। কিন্তু এই সকল দিক দিয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণের সহিত মালাধরের ভাগবতানুবাদের তুলনা হইতে পারে না। রামায়ণের বিশ্বভৌম সৌভ্রাত্র ও সাংসারিক জীবনের সঞ্জীবনী ভাগবতে ছিল না। তাই অনুবাদ কাব্য হিসাবে অন্যান্য শাখার সহিত ভাগবতের জনপ্রিয়তা কিঞ্চিৎ ন্যূনতা-প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহার সম্ভাব্য কারণগুলি এইরূপ—

ভাগবতের জনপ্রিয়তা কম কেন ?

প্রথমত, ভাগবত বৈষ্ণবদিগের সবশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ এবং প্রতি বৈষ্ণবের অবশ্যপাঠ্য। সুতরাং ভাগবতের অনুবাদের জনপ্রিয়তা কেবল বৈষ্ণব সমাজেই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। সাধারণ কাব্যরসপিপাসু গৃহস্থ পাঠকের কাছে ভাগবত কৃত্তিবাসী রামায়ণের স্থান অধিকার করিতে পারে নাই।

দ্বিতীয়ত, শ্রীকৃষ্ণের অসুরবিজয় বা বৃন্দাবনলীলা সাধারণ পাঠকের কোনো গার্হস্থ্য জীবনের আবশ্যিক আদর্শরূপে উপস্থাপিত হয় নাই, কেবল একটি সম্প্রদায় বিশেষের আচরণীয় রূপেই ইহার প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছিল। ভাগবতের বৃন্দাবনলীলায় রাধার ও কোনো অপরিহার্য স্থান নাই বলিয়া পদাবলীর প্রেমের যে নিষ্কলুষ সৌরভ তাহাও ভাগবতানুবাদ হইতে জনসাধারণ লাভ করিতে পারে নাই।

তৃতীয়ত, মালাধরের কৃতিত্ব ছিল প্রথম অনুবাদকের কিন্তু তিনি

কৃত্তিবাসের মত প্রতিভাশালী ছিলেন না, কবিত্বশক্তিতে তাঁহার রচনা দীন। ভাগবতের পরবর্তী অনুবাদকগণও উৎকৃষ্ট ক্ষমতাধর ছিলেন না।

চতুর্থত, নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবদের নিকট ভাগবত অবশ্য পঠনীয় ধর্মগ্রন্থরূপে স্বীকৃতি পাইলেও ভাগবতের অনুবাদ সে স্থান পূরণ করিতে পারে নাই। অধিকাংশ অনুবাদই অপৌরাণিক কাহিনীতে, ভাগবত-বহির্ভূত ঘটনার বিবৃতিতে পূর্ণ হওয়ায় ইহাতে মূলের বিশুদ্ধি ছিল না, তাই বৈষ্ণব সমাজেও কোনো অনুবাদ জাতীয় গ্রন্থের মর্যাদা দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই।

পঞ্চমত, মধ্যযুগেব জাতীয় কাব্য মঙ্গলকাব্য। এই কাব্য বাস্তবজীবনের কাহিনীতে প্রত্যক্ষদৃষ্ট চরিত্রে বস্তুতান্ত্রিক বর্ণনায় কবিত্বে ঐহিক জীবনের তৃষ্ণায় সাধারণের কাছে প্রভূত সমাদরের বস্তু হইয়া উঠে। ভাগবত অনুবাদ কাব্যগুলিও অচিরে মূলগত বিশুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া মঙ্গলকাব্যের অনুসরণে কৃষ্ণমঙ্গলকাব্যে পরিণত হয়। ফলে সেইগুলি মঙ্গলকাব্য অথবা ভাগবতানুবাদ —কোনোটিই না হইয়া মধ্যবর্তী এক ধরণের নিরালম্ব রচনায় পর্যবসিত হয়।

ষষ্ঠত, বৈষ্ণব পদাবলীর জনপ্রিয়তা ও ব্যাপ্তি, সুরপ্রাণতা ও উৎকৃষ্ট কবিত্বও ভাগবতের জনপ্রিয়তা হ্রাসের অন্যতম কারণ হইয়া থাকিবে।

'মাধুকরী' সংকলনে শ্রীকৃষ্ণবিজয় হইতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শিরোনামায় ['বৃন্দাবন মাঝে যবে বংশীনাদ পুরে'] কয়েকটি গীতভাবাত্মক চরণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

রামায়ণ-অনুবাদ ঃ কৃত্তিবাস

মধুসূদন তাঁহার চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে বলিয়াছেন, 'কৃত্তিবাস কীর্ত্তিবাস কবি, এ বঙ্গের অলংকার'। কৃত্তিবাসের রামায়ণ অনুবাদ যুগ যুগ ধরিয়া বঙ্গের গ্রামে-নগরে লোকালয়ে-তীর্থে সাধারণ মানুষের গার্হস্থ্য আদর্শ ও ভক্তির প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে। বাল্মীকি রামায়ণ সম্পর্কে মহাকবি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন—

যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ দ্যুলোকে প্রচরিষ্যতঃ
তাবদ্ রামায়ণী কথা ভূলোকে প্রচরিষ্যতি।

বাঙালী-সমাজের মধ্যযুগীয় মহাকবি কৃত্তিবাসের কাব্য সম্পর্কেও অনুরূপ মন্তব্য করা যায়। পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

"বাঙালীর জাতীয় জীবন-গঠনে যাঁহাদের দিব্য-অবদান অবিস্মরণীয়, তাঁহাদের মধ্যে কৃত্তিবাস অন্যতম। কৃত্তিবাসের প্রচার এবং প্রভাবের কথা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। উড়িষ্যা হইতে কামরূপ এবং রাজমহল হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত কৃত্তিবাসের রামায়ণ প্রচারিত হইয়াছিল। বাঙালীর ঘরে ঘরে কৃত্তিবাসী রামায়ণ পঠিত হইত। পশ্চিমবঙ্গের এমন কোনো হিন্দুপ্রধান গ্রাম দেখি নাই, যেখানে প্রতিসন্ধ্যায় কৃত্তিবাসের নাম উচ্চারিত হইত না। এই সেদিনও সন্ধ্যায় গ্রামের পথে বাহির হইলেই মুদির দোকান, কলুর ঘানি-ঘর, জেলে মালার বাড়ি, মধ্যবিত্তের চণ্ডীমণ্ডপ ও ধনীর প্রাসাদ, আচণ্ডাল ব্রাহ্মণের গৃহে সর্বত্রই শুনিতাম—

কৃত্তিবাসের জনপ্রিয়তা

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন গীত রামায়ণ॥

সেকালের কবিগণকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। প্রথম—অভিনব ভাবধারার প্রবর্তক, জাতির জীবনে নূতন ইতিহাসের রচয়িতা, ইতিহাসের নিয়ামক। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ু চণ্ডীদাস এই শ্রেণীর কবি। দ্বিতীয়—জাতির জীবনবীণায় যে সংগীত ঝঙ্কৃত হইতেছিল, উচ্চগ্রামে সুর বাঁধিয়া সেই সংগীতেরই জনগণমুগ্ধকারী গায়ক। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি কৃত্তিবাস।

আবির্ভাব কাল

সমাজে সেদিন বিপর্যয় দেখা দিয়াছিল। তুর্কী অধিকারে গৃহের মধ্যেও বিশৃঙ্খলার উদ্ভব ঘটিয়াছিল। অসহায় অত্যাচারিতকে উদ্বুদ্ধ করিতে জাতির সংহতির জন্য পুরুষ সমাজে যে পৌরুষ, যে সততা, যে সৌহার্দ্য, যে ভ্রাতৃত্ব, তেজোবীর্য এবং ত্যাগের প্রয়োজন ছিল, বিধর্মীর বলাৎকার এবং প্রলোভনের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার্থে বাঙলার রমণীগণের মধ্যে যে দার্ঢ্য, যে সাহস, সহিষ্ণুতা এবং সতীত্বের মর্যাদাবোধের প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল কৃত্তিবাস সেই প্রয়োজনের পরিপূরক গায়করূপেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। হিন্দী ভক্তকবি নাভাজী দাস তাঁহার অমূল্য বৈষ্ণব-চরিত গ্রন্থ ভক্তমালে তুলসীদাসের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, কলি-কলুষ নাশের জন্য

বাল্মীকি তুলসীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। মুসলমান ধর্মের সঙ্গে সংঘাতের ফলে বিপর্যস্ত হিন্দুসমাজ ও ধর্মকে রক্ষার জন্য ভারতের সর্বত্রই যে সমস্ত ভক্তকবি এবং পৌরাণিক রামায়ণ কথার পুনঃপ্রচার করেন, তাঁহাদের সকলকেই আমরা বাল্মীকির অবতার বলিতে পারি। কৃত্তিবাসও এইরূপ একজন অবতার। আপন হৃদয়-দর্পণে এই কবি সমাজের যে প্রতিচ্ছবি দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহার রামায়ণে তাহারই আলেখ্য অঙ্কিত রহিয়াছে। বাঙালী রামায়ণরূপ দর্পণে আপনার প্রাণের প্রতিচ্ছায়া দর্শনে নবভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। তাইতো কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙলায় এত জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। কৃত্তিবাসের দশরথ কৌশল্যা রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন সীতা বাঙালীর একান্তই আপনার জন। কৈকেয়ী মন্থরা রাবণ কুম্ভকর্ণ সকল সমাজে সবকালেই আছেন। কিন্তু রাম লক্ষ্মণ ভরতকে কি সব দেশে সকল সময়ে পাওয়া যায়? শ্রীরামের পিতৃমাতৃ-ভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ, পত্নীপ্রেম, ত্যাগ, ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘ্নের ভ্রাতৃভক্তি, ত্যাগ ভ্রাতৃ-বধূর প্রতি মাতৃজনোচিত সম্ভ্রম, হনুমানের প্রভুভক্তি, সীতার ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, সতীত্ব নিষ্ঠা—কৃত্তিবাসের কল্যাণে বাঙলার গৃহে গৃহে প্রচারিত হইয়াছিল। বাঙালী আপন আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পাইয়াছিল বলিয়াই কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙালীর এত প্রিয়।…

'বাল্মীকির অবতার'

কৃত্তিবাসের প্রভাব কমিয়া আসিতেছে। গায়কের দল বিরল হইয়া আসিয়াছে। পল্লীর হিন্দু গৃহে পাঠক প্রতি সন্ধ্যায় আজি আর রামায়ণোচ্চারণে গ্রামকে পবিত্র করে না। তথাপি গ্রামে গেলে বৈশাখের পুণ্য দিনে কচিৎ কোনো হিন্দু পল্লীবালার কণ্ঠে আজিও হয়ত শুনিতে পাওয়া যাইবে—

সীতার মতন সতী হব
রামচন্দ্র পতি পাব
কৌশল্যার মত শাশুড়ী হবে
দশরথের মত শ্বশুর হবে
পতির কোলে পুত্র দোলে একগলা গঙ্গা জলে
মরণ হোক হরির চরণতলে॥

উত্তর ভারতের খ্যাতনামা কবি তুলসীদাস ভিন্ন কৃত্তিবাসের মত আর কেহ আচণ্ডাল নবনারীর এমন প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারেন নাই।"

[কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ, সম্পাদকের বিবরণ]

কৃত্তিবাস তাঁর আত্মবিবরণীতে লিখিয়াছেন, সংসারে আনন্দ লইয়া আইলা কৃত্তিবাস। কৃত্তিবাসের জন্মঘটনা তাহার পারিবারিক সংসারে যে আনন্দ-বার্তাই বহন করুক না কেন, ইতিহাসের পণ্ডিতমহলে এই জন্মবৃত্তান্ত কিন্তু খুব একটা আনন্দের বিষয় নয়। কৃত্তিবাসের জীবৎকাল কয়েকটি সন্দিগ্ধ বিশ্বাস ও অসমর্থিত অনুমানের উপর দোদুল্যমান রহিয়াছে। এই অনুমানের ভিত্তি কৃত্তিবাসের নামে প্রচারিত একটি আত্মপরিচয়। জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্য-মঙ্গলে কৃত্তিবাসের নামোল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং জয়ানন্দের আবির্ভাবকাল ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ হইলে কৃত্তিবাস পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে অথবা ষোড়শ শতকের প্রথমদিকে জীবিত ছিলেন। মুকুন্দরাম ফুলিয়ার নামোল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু কৃত্তিবাসের নাম করেন নাই।

কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয়

কৃত্তিবাসের নামে প্রচারিত আত্মবিবরণীতে প্রকাশ, ফুলিয়াগ্রাম জগতের বন্দ্য, তাহার দক্ষিণ-পশ্চিমে গঙ্গাস্রোত। এই গ্রামেই কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষ 'বেদানুজ' মহারাজার পাত্র নারসিংহ ওঝা বসতি-স্থাপন এবং বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। তাঁহার তিন পৌত্রের প্রথম পুত্র যশস্বী ধার্মিক বহুগুণময়। মুরারির সাত সৌভাগ্যবান পুত্রের মধ্যে বনমালী কৃত্তিবাসের পিতা, মাতার নাম মালিনী। পুণ্য অথবা পূর্ণ মাঘ মাস রবিবার শ্রীপঞ্চমী তিথিতে কবির জন্ম হয়, কৈশোরে পদ্মা পার হইয়া তিনি বিদ্যাশিক্ষা করিতে যান। সরস্বতী তাহার শরীরে অধিষ্ঠান করেন, নানা ভাষা নানা ছন্দ মুখ হইতেই স্ফুরিত হয়। রাজা গৌড়েশ্বরের নিকট নানা জ্ঞানরসময় শ্লোক পাঠ করিয়া কৃত্তিবাস বিস্ময়ের উদ্রেক করেন। পুলকিত এবং গুণাবিষ্ট গৌড়েশ্বর—

ধন আজ্ঞা কৈল রাজা ধন নাহি লই।
যথা যথা যাই আমি গৌরব সে চাহি॥

অতঃপর গৌরবভূষিত কবি রামায়ণ অনুবাদ সুরু করিলেন। কবির ভাষায়—

মুনিমধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে বাখানি কৃত্তিবাস গুণী॥

বাপ মায়ের আশীর্বাদ গুরুর কল্যাণ।
বাল্মীকি প্রসাদে রচে রামায়ণ গান ॥
সপ্তকাণ্ড কথা হয়, দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাইতে কৈল কৃত্তিবাস পণ্ডিত ॥

আত্মবিবরণীটিকে কেন্দ্র করিয়া নানাবিধ কৌতূহল সৃষ্টি হইয়াছে এবং বিবিধ গবেষণাও হইয়াছে, অনেকেই সামগ্রিকভাবে ইহার অকৃত্রিমত্বেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। আত্মবিবরণীর বিস্তারিত আয়োজন, কবির মহতী আত্মমর্যাদার উল্লেখ, রাজসভার বিস্ফারিত বর্ণনায় কেবল রাজনামের অনুল্লেখ, জন্মবার লগ্ন মাস ইত্যাদির বর্ণনা দিয়া কেবল বৎসরটি সম্পর্কে নীরবতা বস্তুত বিস্ময়কর। মোটামুটি সেই সকল জটিল সমস্যার মধ্যে অনুপ্রবেশ না করিয়া বলা যায়, কৃত্তিবাস সম্ভবত পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদে বর্তমান ছিলেন এবং উত্তরবঙ্গের কোনো হিন্দু নরপতির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। অসাধারণ জনপ্রিয়তার ফলে পরবর্তী অসংখ্য গায়ক ও কবির রচনার প্রলেপে কৃত্তিবাসের মূল রচনা হারাইয়া গিয়াছে বলিলেই চলে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার লিখিয়াছেন—

আত্মবিবরণীর সমালোচনা

"কৃত্তিবাসের কাব্যের মূলের কথা দূরে থাক তেমন প্রাচীন রূপও পাই নাই। হয়ত সে ভালই হইয়াছে। গায়ন-লিপিকারেরা কৃত্তিবাসের বাণীকে আপন কণ্ঠে বরণ করিয়া লইয়া পুরুষে পুরুষে তাহাতে নবীনতার সোনার কাঠি ছোঁয়াইয়া আসিয়াছেন। জাহ্নবীর প্রবাহের মত সে রামকথা কালের বাঁকে বাঁকে ঘুরিয়া ফিরিয়া বাঙালী মানুষের জীবনে আনন্দ সরসতা জোগাইয়া আসিয়াছে। কৃত্তিবাসের কাব্য যাহাদের হাতে বারে বারে নবকলেবর ধারণ করিয়া ফিরিয়াছে তাহাদের একজনের কথাতেই কবির পরম পুরস্কার—

কৃত্তিবাসের চিরন্তনত্ব

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সকরুণ বাণী।
হিয়া তোলপাড় করে চক্ষে পড়ে পানি ॥"

[ডঃ সুকুমার সেন—বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস]

কৃত্তিবাস সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠরত্ন, বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম

উৎকৃষ্ট মহাকাব্য বাঙলায় অনুবাদ করিলেও ইহাকে তিনি মহাকাব্যের আকারে পরিবেশন করেন নাই, তৎকালীন পাঁচালি কাব্যের আঙ্গিকেই ইহাকে তিনি লোককান্ত করিয়া তুলিয়াছেন। রাজসভার নির্দেশ উপলক্ষ হিসাবে তাঁহার শিরোধার্য ছিল কিন্তু মাতৃবাক্‌পিপাসু জনসাধারণকে প্রত্যক্ষ স্মরণে রাখিয়াই জীবনশিল্পী কৃত্তিবাসের কাব্যসাধনা সার্থক হইযাছে। তাই বাল্মীকি যেখানে ধর্মের বিধিবিধানের সূক্ষ্ম নির্দেশ দিয়াছেন, তত্ত্বকথা-ভারাক্রান্ত সেই অংশ তিনি অপ্রয়োজনে পরিত্যাগ করিয়াছেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা-বিস্তৃত, ঘটনাপুঞ্জ-সমৃদ্ধ ভাষার ব্যূহ ভেদ করিয়া জীবনের শাশ্বত প্রাণধারাটিকেই তিনি অবিনশ্বর ভাষা ও ছন্দে ধ্বনিত করিয়াছেন। বাল্মীকির রামায়ণের ভারতীয় চরিত্র তাই কৃত্তিবাসের লেখনীতে বাঙালী চরিত্রে রূপান্তরিত। সমালোচক যথার্থই বলিয়াছেন—

পাঁচালির আঙ্গিক

"কৃত্তিবাসী রামায়ণের দশরথ বাঙলারই স্ত্রৈণ বৃদ্ধ, রাম পত্নীগত প্রাণ বাঙালী যুবক, সীতা লজ্জাবনতা বাঙালী বধূ, রাবণ বাঙলারই লম্পট দুর্বৃত্ত এবং মুনিঋষিরা ভীরু ঔদরিক বাঙালী ব্রাহ্মণ। মূল রামায়ণের ক্ষত্রিয় বীর্য, ব্রাহ্মণ্য তেজ, বাগ্‌দত্ত প্রেম, নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা ও অন্তর্গূঢ় ভক্তি কৃত্তিবাসী রামাযণে অনুপস্থিত, তৎপরিবর্তে ইহাতে দেখা দিয়াছে বাঙালীর জাতীয় ভাবপ্রবণতা, ভীরুতা, বাগ্‌যুদ্ধ স্থূল পরিহাস ও ইনাইযা-বিনাইয়া ক্রন্দন! দোষে গুণে সমস্ত বঙ্গীয়তা নিঃশেষে প্রকাশিত হইয়াছে এই কাব্যে"।

বাঙালী জীবনের দর্পণ

[তারাপদ ভট্টাচার্য—বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস]

সুতরাং কৃত্তিবাসী রামায়ণের এই দুই মেরু—একদিকে সর্বকালীন মনুষ্য-মহিমার অপ্রতিহত জয়গৌরব, অন্যদিকে সীমাবদ্ধ দেশকালের প্রতিবিম্বন, কৃত্তিবাসের প্রতিভা লক্ষরেখার ন্যায় এই দুই বিপ্রতীপ ভূসংস্থানকেই সংযুক্ত করিয়াছিল। এই সম্পর্কে জনৈক মনীষী লিখিয়াছেন—

"এমন কতকগুলি উপাখ্যান বিশ্ব-মানবের রস-সর্জনার ভাণ্ডারে সুপ্রাচীন কাল হইতেই বক্ষিত হইয়া আছে, যেগুলি অমর, যুগযুগান্তর ধরিয়া যেগুলি মানুষের চিত্তকে রসাভিষিক্ত করিয়া আসিতেছে, এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পারিপার্শ্বিকে যেগুলি বিভিন্ন দেশে নবকলেবর ধারণ করিলেও মূল কথাবস্তুকে

অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহার আভ্যন্তর মহত্ত্বের অবদান আপামর সাধারণের নিকট পৌঁছাইয়া দিতেছে। রামায়ণের উপাখ্যান সমগ্র বিশ্বমানবের চিত্তের রসায়ন-স্বরূপ এইরূপ কতকগুলি উপাখ্যানের মধ্যে অন্যতম প্রথম শ্রেণীর উপাখ্যান"।

[ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভূমিকা]

বাল্মীকি রামকথাকে জনসাধারণের জীবন-সংস্কৃতি হইতে সংকলন করিয়াছিলেন এবং বাল্মীকি ব্যতীত আরও অন্যান্য মনীষীর সংকলিত অন্য ধরণের রামায়ণ কথাও প্রচলিত ছিল। অদ্ভুত রামায়ণ, অধ্যাত্ম-রামায়ণ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের নাম এই প্রসঙ্গে মনে পড়িবে। ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় রামকথার বিচিত্র বিবর্তন ঘটিয়াছে, দক্ষিণভারতীয় ভাষায় তাহার এক রূপান্তর ঘটিয়াছে। তুলসীদাসের রামায়ণের সহিত কৃত্তিবাসের রামায়ণের গুরুতর বৈসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। এমন কি, বহির্ভারতে, ভারতের নিকটবর্তী প্রত্যন্ত ভারতবর্ষে, ভারতসংস্কৃতি-প্লাবিত দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ইন্দোচীন শ্যাম কম্বোজ সিংহল ইন্দোনেশিয়া মালয় যবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতাগত রামায়ণী কথা বিস্ময়কর বিবর্তন লাভ করিয়াছে।

অন্যান্য রামায়ণ

বাল্মীকির রামায়ণ অপেক্ষা ব্যাসের নামে প্রচলিত পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ড-অন্তর্গত রামায়ণ কাহিনীকেই কৃত্তিবাস যেন ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। কেবল কৃত্তিবাস নন, পরবর্তী বাঙালী রামায়ণ অনুবাদক প্রায় সকলেই ভাবানুবাদ করিয়াছেন এবং ইচ্ছামূলক কাহিনী পরিবর্তন ও অন্যতর উপাদান-সংযোজনের স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভূমিকায় যথার্থই মন্তব্য করিয়াছেন—

রামায়ণী কথার ব্যাপ্তি

"রাম-কথা আকাশের আলো ও বাতাসের মত দেশের মানুষেরই মনকে পরিব্যাপ্ত করিয়া বিরাজ করিয়া আসিয়াছে। কবিরা সহজভাবে চোখের জ্যোতি ও নাসিকার শ্বাসের মত রামায়ণ-কথা নিজ নিজ চিত্তে গ্রহণ করিয়া ও পুরাণ-পাঠক এবং রামায়ণ-গায়কের দ্বারা প্রচারিত নানা পুণ্যময় প্রাচীন আখ্যায়িকা বা ঘটনা-সমাবেশ দ্বারা, ইহার পরিপুষ্টি করিয়া, নূতনভাবে দেশের জনগণের মধ্যে রামায়ণ-কথার প্রবাহকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়াস করিয়া গিয়াছেন"।

কৃত্তিবাসও তাই বাল্মীকি রামায়ণের সহিত পদ্মপুরাণ এবং বৌদ্ধ ও জৈন রামায়ণকে অনুসরণ করিয়াছেন। আবার কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রাপ্ত পুঁথিগুলির মধ্যে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের রচনাপদ্ধতিতে পার্থক্য লক্ষিত হয়। পূর্ববঙ্গের পুঁথিগুলিতে বাল্মীকি-রামায়ণের অনুগামিতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের পুঁথিতে তদতিরিক্ত বৈষ্ণবপ্রভাব দেখা যায়। দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি সমালোচকগণ মনে করেন যে, কৃত্তিবাসের রামায়ণ শাক্ত ও বৈষ্ণবগণ কর্তৃক কালক্রমে ইচ্ছামত পরিবর্তিত হইয়াছে। রত্নাকর দস্যু বৃত্তান্ত, তরণীসেন-মহীরাবণ-অহিরাবণ বধ, বীরবাহুর যুদ্ধবিবরণ, রাবণবধের প্রাক্কালে রামচন্দ্রের দুর্গোৎসব, মৃত্যুর পূর্বে রাবণকর্তৃক রামচন্দ্রের প্রতি রাজনৈতিক উপদেশ, হনুমানকর্তৃক মন্দোদরীর নিকট রাবণের মৃত্যুবাণোপায়-সংগ্রহ, লব-কুশের যুদ্ধবৃত্তান্ত প্রভৃতি উপাখ্যান বাল্মীকির রামায়ণে নাই, কৃত্তিবাস অন্য সূত্র হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। আবার বাল্মীকি-বর্ণিত কার্তিকেয়ের জন্মবিবরণ, বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের বিরোধ, বিশ্বামিত্রের তপোবল, অম্বরীষের যজ্ঞ—এইগুলি কৃত্তিবাসী রামায়ণে নাই।

কৃত্তিবাসের মৌলিকত্ব

সুতরাং কৃত্তিবাস বাল্মীকির রামায়ণের হুবহু অনুবাদ করেন নাই, কবি বহু স্থানেই বাল্মীকি-প্রদর্শিত পথ ত্যাগ করিয়া নূতন পথে তাঁহার কল্পনার স্যন্দন পরিচালিত করিয়াছেন। চরিত্র-চিত্রণ ও ঘটনা-বর্ণনায়, বাঙালী জীবনের আবেগভূয়িষ্ঠ রসাবেদন সৃষ্টিতে, সৃজনীপ্রতিভায় কৃত্তিবাসই যথার্থ 'কলিকাল-বাল্মীকি'। বাল্মীকির চরিত্রগুলি আপন দৃঢ়তায় ও গভীর আত্মবিশ্বাসে সমুন্নত। ইহার নায়ক ব্যূঢ়স্কন্ধ বীরপুরুষ শ্রীরামচন্দ্র, বজ্র ও কুসুমগুণে সমীকৃত। কৃত্তিবাসী রামায়ণে তিনি দূর্বাদলশ্যাম মাত্র, তাঁহার বীরত্ব ও বৈরাগ্যের মহিমা বর্জিত হইয়াছে। মূল রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের ভয়াবহ মূর্তি রাক্ষসদের প্রাণে ত্রাসসঞ্চার করিত। কিন্তু ভাবপ্রবণ বাঙালী কবি কৃত্তিবাস রামচন্দ্রকে স্নিগ্ধতনু স্নেহপ্রবণ বাঙালী যুবার বেশে অঙ্কিত করিয়াছেন। রামলক্ষ্মণের সৌহার্দ্য, কৌশল্যার শোকবেদনা, রাজমহিষী সীতার গৃহস্থবধূসুলভ ব্রীড়াবনত মাধুরী একান্তভাবে বাঙালী ভাবাপন্ন হইয়া মূল রামায়ণ অপেক্ষা মধুরতর হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত রামচন্দ্র ভক্তবৎসল ও অধম-পাতকীতারণে রূপান্তরিত হওয়ায় কৃত্তিবাসের কাব্যে রামভক্তি ও কৃষ্ণভক্তি একাকার হইয়া গিয়াছে, রামগৌরবের সহিত নামগৌরব

বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস

সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। ইহাকেই রবীন্দ্রনাথ শান্তরসাস্পদ গৃহধর্ম বলিয়াছেন।

মঙ্গলকাব্য ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ

কালধর্মে প্রতিবেশী হইলেও মঙ্গলকাব্যগুলির তুলনায় কৃত্তিবাসের রামায়ণ অনেক উৎকৃষ্ট রচনা। মঙ্গলকাব্যগুলিতে যে সকল লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য কাহিনী ও মর্তে পূজা-প্রচারের আয়োজন বিবরণ আছে, উহাতে দেবতার অপ্রাকৃত মহিমায় হীনতার গ্লানিমা লাগিয়াছে, কিন্তু সেই তুলনায় মর্ত্যের মানবমানবীরাও এমন কিছু মনুষ্যমহিমায় উন্নত ঈর্ষণীয় হইয়া উঠেন নাই। চন্দ্রধর একটি বিরল ব্যতিক্রম এবং বেহুলা খুল্লনা প্রভৃতি নারী চরিত্রগুলি রামায়ণের সীতা চরিত্রের আদর্শেই পরিকল্পিত। মঙ্গলকাব্যগুলি দেবতার নিকট মানুষের নতিস্বীকারের কথাই শেষ পর্যন্ত প্রচার করিয়াছে। এই নতজানু ভক্তিবাদের মধ্য দিয়া বাঙালীর চারিত্রিক সংস্কার-উন্নয়নের, গৃহধর্ম-বিকাশের কোনো শিক্ষা হয় নাই। এইজন্য সমাজে প্রচায় দেবতাদের প্রতিষ্ঠার অপনোদনে মঙ্গলকাব্যগুলির জনপ্রিয়তাও হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে বাঙালীর গৃহধর্মের সর্বজনীন আদর্শকেই প্রাধান্য দান করা হইয়াছে বলিয়া অদ্যাপি ইহার গৌরব লঘু হয় নাই। তাহা ছাড়া, মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর মধ্যে বিশেষ জটিলতা নাই। সমগ্র ঘটনা-বিন্যাস ও গ্রন্থি-পরিকল্পনার মধ্যে দেবতার ঈর্ষা বা রোষ প্রণোদিত অশুভবুদ্ধির ফলেই যাহা কিছু জটিলতা ও সমস্যার সৃষ্টি হয় বলিয়া সেই গ্রন্থি মোচনের রহস্য জিজ্ঞাসা ও শেষ পর্যন্ত নির্বাচিত ভক্তের উপর দেবতার স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠাতেই গ্রন্থ পরিসমাপ্ত। কিন্তু রামায়ণ কাহিনীর মধ্যে কাহিনীর কৌতূহল শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে, ইহার বিপুল কাহিনী ও অসংখ্য ঘটনাবিন্যাসের মধ্য দিয়া শ্রোতৃসমাজের শুশ্রূষা শেষ পর্যন্ত অতৃপ্ত থাকে। বিভিন্ন উপকাহিনী ও খণ্ড আখ্যানের ভিতর দিয়া রামায়ণ একটি বৃহত্তর সমাজের কাহিনীগত উৎকণ্ঠা চরিতার্থ করে। ইহার মূল ঘটনাবস্তুর মধ্যেও নিয়তির অপ্রতিবিধেয় রহস্যের এমন একটি করুণ পটক্ষেপ ঘটে, যাহা সমগ্র কাহিনীকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া জনচিত্তে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে।

প্রতিভার দিক দিয়া উভয় কবির বিচার অসংগত হইলেও, অনুবাদ কাব্য

হিসাবে মালাধর বসু ও কৃত্তিবাসের কাব্যগ্রন্থদ্বয়ের একটি সাধারণ বিচার করিলে দেখা যাইবে, উভয় রচনাই মধ্যযুগীয় বাঙালী ইতিহাসের এক নবজাগ্রত জাতীয় সংস্কৃতির মুখবন্ধস্বরূপ। উভয় কবিই সংস্কৃত কাব্যভাণ্ডারের নিয়মিত পর্যটক ছিলেন এবং মনীষা ও ঐতিহ্যচেতনা, রসবোধ ও শিক্ষাদাননীতির উচ্চাদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের কয়েক শতাব্দীর মধ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্য রচিত হয় নাই, সুতরাং মাতৃভাষায় জাতীয় সংস্কৃতির অনুশীলনের পথ অবরুদ্ধই ছিল। অথচ মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্যে, প্রাদেশিক চেতনায় ও ঐক্যকামনায় বাঙালী জাতির মধ্যে কোনো সাংস্কৃতিক বন্ধন রচিত হয় নাই। কৃত্তিবাস বা মালাধর বসু নিতান্ত কৌতূহলবশত রামায়ণ-ভাগবত অনুবাদে প্রবৃত্ত হন নাই। রামায়ণ-ভাগবতের মত গ্রন্থ সেকালে শিক্ষিত গৃহস্থের নিত্যপাঠ্য ছিল। কিন্তু অশিক্ষিত বিপুল জনসাধারণ যে এই ভাবরস হইতে বঞ্চিত ছিল, ইহা তাঁহারা অনুভব করিয়াছিলেন। হয়ত আরও অনেকেই করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের আত্মবিশ্বাস ছিল না। এই ব্যাপারে কৃত্তিবাস ও মালাধর বসু উভয়েই স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত ও অন্য-নিরপেক্ষভাবে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, যুগের উৎকণ্ঠা-কম্পিত অঙ্গুলি একই সঙ্গে তাঁহাদের চিত্তবীণার তারে ঝঙ্কার তুলিয়াছিল। কেবলমাত্র কাহিনীক্ষুধা চরিতার্থ করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না, প্রমাণ, তাঁহারা কেহই নিষ্ঠাপূর্ণ অনুবাদক নন, ভাবানুবাদক। কাহিনী-কৌতূহল নিবারণের জন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থের অভাব ছিল না। কিন্তু ভাগবতের মত শাস্ত্রজাতীয় গ্রন্থের গল্পরস একেবারেই ক্ষীণ, ইহা বিশ্বাসীর চিত্ত ব্যতীত কথাগ্রাসী শুশ্রূষাকে তৃপ্ত করিতে পারিত না। কৃত্তিবাস রামায়ণে অনেক বাল্মীকি-বহির্ভূত উপকাহিনী সংযোজিত করিয়াছেন কিন্তু ইহাতেও তিনি আপন কবিধর্মের অনুকূল করিয়া নূতন চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন।

মালাধর ও কৃত্তিবাস

উভয় কবিই সংস্কৃত

জাতীয় সংস্কৃতির মুখবন্ধ

কৃত্তিবাস ও মালাধর বসুর মধ্যে লোক-কবিত্বের লক্ষণ আরও কয়েকটি তথ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন, 'লোক বুঝাইতে কৈল কৃত্তিবাস পণ্ডিত'। মালাধর বসুও লিখিয়াছেন, 'লোক নিস্তারিতে কহি পাঁচালি রচিয়া'। উভয় কবিই মহাকাব্যিক অথবা ধ্রুপদী ক্লাসিক্যাল কাব্যাঙ্গিক পরিত্যাগ করিয়া সহজপাঠ্য

লোক-কবিত্ব-লক্ষণ

পাঁচালির আঙ্গিক গ্রহণ করিয়াছেন। দুজনেই সম্পূর্ণ গ্রন্থের অনুবাদ করেন নাই, কৃত্তিবাস সম্ভবত কয়েকটি খণ্ডের অনুবাদ করেন এবং মালাধর বসু ভাগবতের কয়েকটি স্কন্ধের অনুবাদ করেন। দুইজনেই মূল কাব্যের সৌন্দর্যময় প্রকৃতি বর্ণনা তত্ত্বপ্রাধান্য ও দার্শনিকতা যথাসম্ভব বর্জন করিয়াছেন। কৃত্তিবাসের হাতে অযোধ্যা-দণ্ডক-লঙ্কা বাঙালীর চণ্ডীমণ্ডপ-গ্রামান্ত-কুঞ্জবন এবং অপরিচিত কাল্পনিক নগরের সম্ভাব্য চিত্র মাত্র।

বাঙালী ভাবধারা

মালাধরের হাতে বৃন্দাবন মথুরার ভৌগোলিক অবস্থান যেখানেই হোক না কেন, বাঙলার মানচিত্রেই তাহাদের নির্ভুল বিন্যাস। দুইজনেই নায়ক-চরিত্রের পৌরাণিক ধৃতবীর্য মহিমা অপেক্ষা দুর্বাপেলব বাঙালী-সুলভ মাধুর্য আরোপ করিয়াছেন। দুইজনের কাব্যেই নারীর বিশেষ ভূমিকা আছে। রামায়ণ সীতার দ্বারা, শ্রীকৃষ্ণবিজয় সখী ও গোপীদের দ্বারা বিশেষভাবে সৌন্দর্যখচিত। কৃত্তিবাস ও মালাধর বসু দুজনেই কোনো না কোনো রাজসভার সংস্কৃতিপ্রিয় নরপতির দ্বারা সম্বর্ধিত ও অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত মালাধরের কাব্য ভক্ত বৈষ্ণব সমাজে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে, আর সর্বপ্রকার ধর্মসংস্কারের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া কৃত্তিবাসের রামায়ণ সমগ্র বাঙলাদেশে ছড়াইয়া পড়ে।

মঙ্গলকাব্য

খ্রীঃ পঞ্চদশ শতক হইতে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যে লৌকিক অথবা পৌরাণিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য-প্রতিষ্ঠা বিষয়ক এক জাতীয় পাচালি কাব্যই মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত। প্রাগাধুনিক বাঙলা সাহিত্য সর্বতোভাবে ধর্মাশ্রিত এবং সেই ধর্মাতুরতা এই মঙ্গলকাব্যগুলিতেই

সংজ্ঞা ও স্বরূপ

বিশেষভাবে দৃশ্যমান। তুর্কী আক্রমণের অব্যবহিত পরে এবং পঞ্চদশ শতকের মধ্যে সম্ভবত বাঙালীর ধর্ম বিশ্বাসে কয়েকজন লৌকিক দেবতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। অনার্য সমাজের আচার-অনুষ্ঠান ও দেবদেবীর আর্যীকরণের যুগে সম্ভবত ইহারাও সমাজের উচ্চকোটীর ধর্মাদর্শ ও অনুষ্ঠানে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিল। দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া এই সকল দেবদেবীর পূজা হয়ত বাঙালীর সন্ধ্যাদীপচিহ্নিত গৃহপ্রাঙ্গণে, শঙ্খধ্বনির

মাঙ্গলিক উচ্চারণে, নারীর কঙ্কণ-ঝঙ্কারে সীমাবদ্ধ ছিল; নারী সমাজের মধ্যে হয়ত তাহাদের নিজস্ব ব্রতগীত গাথা-উপকথা ছড়াজাতীয় মাহাত্ম্যকীর্তি প্রচারিত ছিল। সাহিত্য ও সংস্কৃতির অবক্ষয়ী শূন্যতার যুগে এই সকল নারী-সমাজে ভাসমান বিষয়গুলি সঞ্চয় করিয়া কোনো কবিযশঃপ্রার্থী মঙ্গলকাব্যের বীজ বপন করেন। বিক্ষিপ্তভাবে পরিচিত এবং প্রতি গৃহের নিত্য-উচ্চারিত এই সকল নারীমহলের ব্রতকথাগুলি কাব্যরূপ লাভ করায় দৈনন্দিন জীবনে কাব্যচর্চা ও কৃষ্টি-অনুশীলনের একটি প্রশস্ত পথ উন্মুক্ত হইয়া উঠিল। উদ্ভব ও উৎসের মুদ্রাচিহ্ন বহন করিয়া মঙ্গলকাব্যগুলি তাই নারী ও নারীত্বের প্রাচীন স্মৃতি বহুলাংশে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। এইগুলির অন্তর্নিহিত গার্হস্থ্য জীবনের খুঁটিনাটি বর্ণনা, আচার-আচরণীয়, অনুষ্ঠান-উপচারাদি একান্তই নারী-সমাজের পর্যবেক্ষণী দৃষ্টির দ্বারা আলোকিত। ইহাদের মধ্যে নারী চরিত্রই সতীত্বে সেবায় ত্যাগে সহিষ্ণুতায় মহিমান্বিতা ও অনুকরণীয়া হইয়া উঠিয়াছে। নারী দেবীর সহিত পুরুষ ভক্তের অপ্রসন্ন সম্পর্কের পরিণামে ভক্তের আত্মসমর্পণ যেন রূপকার্থে নারীসমাজের নিকট পুরুষ সমাজের আধিপত্য স্বীকারেরই কাহিনী।

মঙ্গলকাব্যে নারীসমাজ

কিছু কামনা করিয়া যে অনুষ্ঠান সমাজে চলে তাহাকে ব্রত বলা হয়। আমাদের দেশে দ্বিবিধ ব্রত প্রচলিত আছে, কতকগুলি শাস্ত্রীয় ব্রত আর কতকগুলি শাস্ত্রের ভাষায় যোষিৎ-প্রচলিত বা মেয়েলি ব্রত, যাহার একাংশ হইল কুমারী ব্রত আর একাংশ নারী ব্রত। নারী ব্রতে শাস্ত্রীয় ব্রত এবং মেয়েলি ব্রত সংমিশ্রিত হইয়াছে। জনসাধারণের চিত্তে অসংগঠিত বিক্ষিপ্ত সমাজ-পরিবেশের প্রাথমিক অবস্থায় হিন্দুধর্মের জটিল অনুষ্ঠান ও নানা দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে তন্ত্র এবং পুরাণকে ব্রতের ছাঁচ দিয়া রচনা করা হইয়াছে। কবিতা চিত্র উপাখ্যান গদ্য পদ্য ও মণ্ডনশিল্প ব্রতের উপাদান।

ব্রতগীতের প্রভাব

বাঙলা সাহিত্যের আদি-মধ্যযুগে বিভিন্ন শাক্ত দেবদেবীকে কেন্দ্র করিয়া আখ্যায়িকামূলক প্রচারপন্থী যে ধর্মভূমক কাব্য সাহিত্য প্রচলিত ছিল তাহাই মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্যের আদি ইতিহাস সুরু হইয়াছে পঞ্চদশ শতাব্দী

হইতে। প্রাচীনতম বাঙলা সাহিত্য চর্যাপদের সমকালীন কোনো মঙ্গলকাব্য পাওয়া যায় নাই। তবে বাঙলা দেশে দ্বাদশ শতক হইতে যে রাষ্ট্র বিপর্যয় এবং তজ্জনিত অন্ধকার যুগ সুরু হইয়াছিল, তাহারই পটভূমিকায় কোনো লৌকিক ধর্মবিশ্বাস হইতে এই মঙ্গলকাব্যগুলি জন্মলাভ করিয়াছিল। ডঃ সুকুমার সেন লিখিয়াছেন—

"সংস্কৃত সাহিত্যে বিরহ প্রধানও পুরুষের তরফে; প্রাদেশিক সাহিত্যে তথা বৈষ্ণব গীতিকাব্যে বিরহ একান্ত ভাবে নারীর পক্ষে। ইহার কারণ বোধহয় এই যে, প্রাদেশিক সাহিত্যের বিষয়গুলি প্রথমে মেয়েলি ছড়া বা গান হইতে গৃহীত হইয়াছিল"। [বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস]

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলির মূলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লৌকিক বিশেষত নারীপ্রধান সমাজের ব্রতগীত ছড়া ও নানাবিধ যোষিৎ-প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠানের প্রাধান্য ছিল। অবশ্য ইহার দ্বারা প্রমাণ হয় না যে, ব্রতগীতগুলিই পরবর্তী যুগে মঙ্গলকাব্যে পুষ্টিলাভ করিয়াছে। কিন্তু অনুমিত হয় যে, দেবদেবী-মাহাত্ম্য-সূচক মঙ্গলকাব্য লেখার প্রেরণা দেবী-মাহাত্ম্যের মুখ্য উপাসিকা মহিলা-সমাজের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবতে প্রাক্‌চৈতন্যযুগের বঙ্গ গৃহস্থের যে চিত্র আছে তাহাতে এই ধরণের নারী-ব্রত-মুখাপেক্ষী দেবদেবীর পূজার্চনার কথা আছে। মঙ্গলকাব্যগুলির সুসংবদ্ধ কাহিনী, চরিত্রের একটানা ছকে-ফেলা গতি-প্রকৃতি, কাব্য রচনার আদ্যন্ত পালা-বিন্যাস প্রমাণ করে যে, এই ধরণের পূর্বপ্রচলিত এবং বহুল-প্রচারিত কোনো ক্ষুদ্রাকার গীতকথারই এইগুলি ক্রমবিকশিত সংস্করণ। বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করিলেও মনে হয়, মঙ্গলকাব্যে নারী সমাজের স্পন্দনই অধিকতর শ্রুতিগোচর।

মঙ্গলকাব্যে নারী-প্রাধান্য

মঙ্গলকাব্যের আরাধ্য দেবতাদের অধিকাংশই স্ত্রী দেবতা। শুধু ধর্মদেবতা সত্যনারায়ণ কালু রায় ও দক্ষিণ রায় ভিন্ন অন্য কোনো পুরুষ দেবতা বিশেষ নাই। চরিত্রগুলির মধ্যে স্ত্রী চরিত্রই প্রধান, কেবল চাঁদ সদাগর ব্যতীত উল্লেখযোগ্য পুরুষ চরিত্র নাই। সনকা বেহুলা রম্ভাবতী খুল্লনা—ইহাদের দুশ্চর তপস্যা ও দুঃখ-ভোগের মূলে স্ত্রী দেবতাদেরই প্রতিষ্ঠা ও গৌরব ধ্বনিত হইয়াছে। সুতরাং নারী সমাজই মঙ্গল কাব্যের দেবতাগণের পূজাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাঁচাইয়া

রাখিয়াছে। নারী সমাজের রক্ষণশীলতা ধনপতির দেবীঘটে পদাঘাতের শাস্তি-স্বরূপ নানাবিধ অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়াছে; সেই কল্পিত আশঙ্কার উপরই চণ্ডীমঙ্গলের উত্তরখণ্ডের কাহিনী পরিকল্পনা। এই জন্য প্রতিটি মঙ্গলকাব্যের সুর একান্ত ঘরোয়া, ইষ্টদেবতার বৃহত্তর পরিবার-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হওয়াই তাহার প্রমাণ।

মঙ্গলকাব্য কাহিনীমুখ্য পাঁচালি, ইহার প্রতি পৃষ্ঠায় স্ত্রীসুলভ লোক-স্বভাব ব্রতগীতের উদ্ভবজনিত চিহ্ন হিসাবে বিদ্যমান আছে। সনকার মনসা পূজা খুল্লনার চণ্ডী পূজা তৎকালীন মেয়েলি পূজা বলিয়াই চাঁদ ও ধনপতির ক্রোধের কারণ হইয়াছিল। ভাসানের সময় বেহুলা মনসার ব্রত পালন করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে রন্ধন গৃহের প্রাধান্যে, নারী-গণের পতিনিন্দায়, বারমাস্যা ও নারীর সতীত্ব-পরীক্ষার ব্যাপারে অনুমিত হয় মঙ্গলকাব্যগুলি প্রকৃতপক্ষে যোষিৎ-জীবনেরই আত্মস্মৃতি। ছড়া গান নারী সমাজের একটি বিশিষ্ট প্রবণতা, মঙ্গলকাব্যের নানাস্থানে ছড়ার দৃষ্টান্ত ছড়াইয়া আছে। মেয়েলি সমাজে পূজিত লালিত চর্চিত হওয়ার জন্য পরবর্তীকালে এই কাহিনীগুলি সুসংবদ্ধ কাব্যরূপ লাভ করিবার সময় গঠনপত্রে, ঘটনা-অন্তরালে, আচার-অনুষ্ঠানে প্রাক্তন স্বভাবগুলি বর্জন করিতে পারে নাই।

মঙ্গলকাব্যে আর্য-অনার্য সংস্কৃতি

হয়ত মঙ্গলকাব্যে নারীসমাজের এই প্রভাব-প্রাধান্যের পশ্চাতে অনার্য সংস্কৃতির সুস্পষ্ট লক্ষণ আছে। কারণ স্ত্রীদেবতার প্রাধান্য অনার্য সংস্কারেরই বিশিষ্ট স্বভাব এবং তন্ত্রে নারীশক্তিকেই শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হইয়াছে। চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যের দেবী চণ্ডী যে প্রথমে আরণ্যক দেবী ছিলেন এবং ব্যাধসমাজের পূজাপ্রার্থী হইয়াছিলেন ইহার কাহিনীতে সেই আদিম অনার্য জীবনের প্রত্যক্ষ বৈশিষ্ট্যগুলি বিদ্যমান আছে। ধর্মমঙ্গলের শূন্য পুরাণে, মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টিতত্ত্বে ও অন্যান্য বহুস্থানে বহু দুজ্ঞের্য় বিশ্বাস ও আচারানুষ্ঠানের বর্ণনা আছে যাহা ঠিক পৌরাণিক বিশ্বাসসম্ভূত বলিয়া মনে হয় না। আর্য-অনার্য সংস্কৃতির মিশ্র উপাদানেই পূর্বভারতের এই প্রত্যন্ত আর্দ্র অঞ্চলগুলিতে একপ্রকার সমন্বয়ধর্মী মিশ্র সংস্কৃতি ও ধর্মচেতনা গড়িয়া উঠিয়াছিল। মঙ্গলকাব্যগুলিতেই তাহার সমধিক প্রতিফলন ঘটিয়াছে। আর্য সংস্কৃতির ধর্ম আত্মশক্তি-প্রধান, পৌরুষ ও ব্যক্তিত্ব-উদ্বোধক। অনার্য-সংস্কৃতি নারীশক্তি-প্রধান। দেবতার

ক্রোধ প্রতিহিংসাই ইহাতে মুখ্য, দুজ্ঞেয় রুষ্ট প্রকৃতির সহিত আদিম সমাজের জাদু-মন্ত্র-বিশ্বাস জড়িত। ভক্তিবাদ সম্পূর্ণ আর্যসংস্কৃতি হইতে প্রবেশ করিয়াছে। বৃক্ষ শিলা দেবতার পীঠস্থান, এই বিশ্বাসও অনার্য ধর্মের লক্ষণ। ঘটস্থাপন, সিন্দুর লেপন, আম্রপল্লব, স্ত্রীআচার, আনুষ্ঠানিক মন্ত্রাদি, হাঁস-মুরগি বলিদান প্রভৃতি ছোটখাট আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে মঙ্গলকাব্যগুলিতে অবৈদিক লোকায়ত ধর্মবিশ্বাসের কী বিপুল চিহ্ন ছড়ানো আছে ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। মনসার সর্প-বাহন বা প্রতীক চিহ্ন, চণ্ডীর গোধিকারূপ-ধারণ ও সিংহবাহিনী মূর্তি, লক্ষ্মীর পেঁচক-প্রতীক, এইগুলির মধ্যে কোনো আদিম সমাজের টোটেম ও ট্যাবু পদ্ধতির পরিচয় নিহিত আছে। সর্প, ব্যাঘ্র, বিড়াল, হংস অরণ্যপ্রধান বঙ্গদেশে বহুদৃষ্ট জীবজন্তু। সর্পদেবতা মনসা, ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায়, কুম্ভীরদেবতা কালু রায়, বিড়ালদেবতা ষষ্ঠী, রাসভদেবতা শীতলা, হংসদেবতা সুবচনী এই আদিম আরণ্যক জীবনের অভ্রান্ত সাক্ষ্য বহন করিয়া আমাদের চিন্তা ও চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। বাঙলার শিব তো সম্পূর্ণরূপে অনার্য কৃষিপ্রধান সমাজের দেবতা। শ্রীকৃষ্ণের গোপীকান্ত লীলাবিলাসী আদিরসাত্মক রূপের সহিত ইন্দ্রিয়ালু জীবন-রসপ্রধান অনার্য জীবনের যোগ কতখানি তাহা গবেষণার বিষয়। অষ্ট্রিক দ্রাবিড়ীয় ভোটব্রহ্মী ইত্যাদি নানা মঙ্গোলীয় জাতি ও কৌমগত ধর্মবিশ্বাস আর্য সংস্কৃতির সহিত মিশ্রিত হইয়া বাঙালীর মিশ্র জীবন-চেতনাকে গড়িয়া তুলিয়াছে এবং মঙ্গলকাব্যগুলিতে সেই মিলনের ইতিহাস নিহিত আছে। এই মিলনের প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে তুর্কী আক্রমণ ও মুসলমান রাজশক্তির শাসন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আত্মশক্তিতে আস্থা হারাইয়া বাঙালী তখন ক্রমশ দৈবনির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছিল। তখনই সমাজের উচ্চ-নীচ সর্বশ্রেণীর মানুষ এক বৃহত্তর শক্তির অপ্রতিহত ছত্রতলে নিরাপদে আশ্রয় খুঁজিয়া জীবনের সকল অনিশ্চয় হতাশা ও জড়ত্বের অবসান ঘটাইতে চাহিয়াছে। মঙ্গলকাব্য-গুলিতে তাহারই পরিচয় নিহিত।

"বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী ও মঙ্গলকাব্য বাঙালীর ভক্তিময় মানসিকতার ত্রিবিধ প্রকাশ। বৈষ্ণব পদাবলীতে বাঙালী মনের ভক্তিতে রূপান্তরিত মধুর প্রেমকল্পনা উহার ঊর্ধ্বাভিসারী জীবন সাধনার প্রেরণারূপে উহাকে এক অপরূপ ভাবমুগ্ধতার স্বর্গলোকে অধিষ্ঠিত করিয়াছে। শাক্ত

পদাবলীতে দুর্যোগময় বাস্তব জীবনের ঘনঘটার মধ্যে বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায়, মাতৃরূপে পরিকল্পিত দৈবী শক্তির করুণা ও অভয়বাণী একান্তনির্ভর ভক্তহৃদয়ে বারবার দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণব ও শাক্ত এই উভয়বিধ পদাবলীতেই একাগ্র ভক্তিসাধনার ফলরূপেই অন্তরে এক দুর্লভ অধ্যাত্ম প্রত্যয়ের স্থির দীপশিখা ভাস্বর হইয়াছে। কিন্তু সাধারণ বাঙালী গৃহস্থের ভোগলিপ্সা ও সুখমসৃণ জীবনচর্যা কোনো কোনো নূতন দেবতার আশ্রয়ে যে কুণ্ঠিত সুবিধাবাদমূলক তৃপ্তি খুঁজিয়াছে, সেই সাংবাদিকতার খাদ মিশানো দেবানুগ্রহযাচ্ঞাই মঙ্গলকাব্যের মধ্যে রূপ পাইয়াছে।

মানুষের সহিত দেবতার নূতন সম্পর্ক-স্থাপন-প্রয়াসের এই তিনটি ধারার মধ্যে কালক্রমের দিক দিয়া মঙ্গলকাব্যই সর্বাগ্রবর্তী। যে তিনটি নূতন দেব-দেবী ধর্মঠাকুর মনসা ও চণ্ডী—প্রধানত মঙ্গলকাব্যে পূজ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন—তাঁহারা অনার্য-কল্পনা-প্রসূত ও অহিন্দু-উৎস-সম্ভূত মনে হয়। ধর্মঠাকুর বিষ্ণুর ছদ্মবেশে আত্ম-গোপন করিলেও তিনি স্পষ্টত হিন্দুধর্ম-প্রভাবিত পরবর্তী যুগের বৌদ্ধধর্মের আদিদেবতা ও তাঁহার পূজাপদ্ধতি বৌদ্ধ আচার-অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত। মনসা দেবী ধূলিশায়ী সরীসৃপ হইতে অর্বাচীন যুগের ভয়মিশ্র-ভক্তির তাগিদে দেবমণ্ডলীতে সদ্য-উন্নীত। তাঁহার হিংস্রতা, অকারণ-উদ্দীপ্ত আক্রমণ-স্পৃহা ও বাসস্থানের রহস্যময় গোপনতা মানুষের কল্পনাকে এরূপ নিবিড়ভাবে আবিষ্ট করিয়াছে যে, সে আমাদের চোখের সামনেই প্রাণিজীবন হইতে দেবমর্যাদায় আরূঢ় হইয়াছে।...আদিম যুগের বর্বর মানুষের প্রতিবেশ সম্বন্ধে অনির্দেশ্য ভীতিবোধ, জাতি চিহ্নরূপে নাগের যে বিশেষ মর্যাদা ও কোনো কোনো পুরাণে উহাদের দেবতার নিকটাত্মীয়রূপে পরিচিতি—অতীত মানবগোষ্ঠীর এই সমস্ত অস্পষ্ট স্মৃতি ও সংস্কার মনসার দেবীরূপে প্রতিষ্ঠার মূলীভূত কারণ।..মঙ্গলকাব্যে পুরাণের অনুস্মৃতি নাই, আছে লোক-জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-নির্ভর ও লোক-আখ্যায়িকা-ভিত্তিক নব পুরাণ-মহিমার সৃষ্টি।

চণ্ডীর উদ্ভব-রহস্য আরও জটিল ও মিশ্র প্রকৃতির।...মাতৃশক্তির আরাধনা আর্যেতর মানবগোষ্ঠীর মধ্যে হয়ত প্রথম প্রচলিত ছিল। কিন্তু বেদ তন্ত্র প্রভৃতি সুপ্রাচীন আর্যধর্মগ্রন্থও অতি পুরাকালেই এই বিশ্বব্যাপিনী মাতৃ-চেতনার স্ফুরণটি স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। মাতৃকল্পনার সমীকরণ-শক্তির

নিকট আর্য ও অনার্য জীবন দর্শনের ভেদটি সহজেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। সুতরাং চণ্ডীদেবী যখন মঙ্গলকাব্যে আবির্ভূত হইলেন, তখন তাঁহার পরিকল্পনার মধ্যে আর্য ও অনার্য এই দুই ভাবধারারই সমন্বয় লক্ষিত হয়। মাতৃমহিমানুভূতির সার্বভৌমত্ব মাতৃসত্তার দেবীরূপে সহজ প্রতিষ্ঠা, মাতৃ-করুণার একই প্রকারের অহেতুক অজস্রতা এই সমীকরণ-প্রক্রিয়াকে নিবিড়তর করিয়াছে। তথাপি চণ্ডীদেবীর অনার্য-উদ্ভব তাঁহার পূজার শাস্ত্র-নিরপেক্ষ সরল রীতি তাঁহার খামখেয়ালী আতিশয্য প্রভৃতি লক্ষণের দ্বারা সাব্যস্ত হয়। জাতিতে হীন বৃত্তিতে হেয় ও প্রায় সম্পূর্ণভাবে ধর্মের লৌকিক অনুষ্ঠানবর্জিত ব্যাধ-সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহার পূজার প্রবর্তন, চণ্ডীর স্বর্ণ-গোধিকার ছদ্মবেশ-গ্রহণ ও কালকেতুর দাম্পত্য জীবনে বিপর্যয় ঘটাইবার স্থূলরুচি কৌতুকপ্রয়াস—এ সবই দেবীর অনার্য উদ্ভবের পরিপোষক প্রমাণ। কালকেতুর অবোধ বিস্ময়ে স্ফীত দুইটি চোখে, তাহার শর-সন্ধানোদ্যত বাহু-যুগের স্তম্ভিত অসাড়তায় তাহার দারিদ্র্য ও অজ্ঞান-সংকুচিত বিমূঢ় বোধ-শক্তিতে, তাহার আকস্মিক সম্পদ ও ততোধিক আকস্মিক বিপৎপাতের অস্থির আবর্তনে ও স্বপ্নসুলভ অনিশ্চয়তায় যে-দেবীর মহিমা অস্পষ্টভাবে প্রতিবিম্বিত, তিনি নিশ্চয়ই চণ্ডী-তন্ত্রশাস্ত্রে অভিনন্দিতা, সূক্ষ্ম দার্শনিক-মননোদ্ভবা, ষোড়শোপচারে সম্পূজিতা ও বিদগ্ধ ভক্তমণ্ডলীর দ্বারা বিশ্বের মূলশক্তিরূপে স্তূয়মানা মহামায়া নহেন। হয়ত মঙ্গলকাব্যে মাতৃতত্ত্বের এই প্রাকৃতজনোচিত রূপান্তরে একটি গূঢ় ভক্তিরহস্য ব্যঞ্জিত হইয়াছে।"

[ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা]

মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেবমাহাত্ম্য ঘোষণা সত্ত্বেও জীবনের জয়রব ইহার প্রতি পৃষ্ঠায় কান পাতিলে শোনা যায়। মাটির মানুষের পূজা পাইবার জন্য বিশ্বাধিষ্ঠাত্রী দেবতার কাঙালপনাকে কবিরা গোপন করিয়া রাখেন নাই।

দেবতার কাঙালপনা

এই কাব্যে দেবতা পৃথিবীর জীর্ণকুটীরে সামান্য আশ্রয় লাভ করিবার জন্য তাঁহার সমস্ত দৈবমাধুরী সংবরণ করিয়া ভিক্ষাপ্রার্থী উৎকণ্ঠায় মর্ত্যের আনাচে-কানাচে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। এই কাব্যের নায়ক-নায়িকা সাধারণ মানুষ, তাহারা আপন বাহুর শ্রমে, কায়ক্লেশে অথবা বিচক্ষণ ব্যবসায়ের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। তাহাদের জীবনতৃষ্ণা ও সংগ্রাম, দিনযাত্রা ও দাম্পত্য আদর্শ, তাহাদের কলহ ও ক্রন্দন, ক্ষুধা ও সম্পদ-

স্পৃহা, লোভ ও কপটতার কোনো বৃত্তিই কবির অজ্ঞাতকল্পনার সৃষ্টি নয়। বিশ্বের সৃষ্টিরহস্যের মূলীভূত শক্তির জয়গৌরব ঘোষণা করিয়া এই কাব্যের সূত্রপাত হয়। কিন্তু অচিরকালের মধ্যে কবি নায়িকার রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া গোপনে তুচ্ছ শাকের ঘণ্টের ঘ্রাণ অনুভব করেন, কোলাহলপূর্ণ বিবাহ-বাসরে কান পাতিয়া নারী সমাজের কর্ণে-কর্ণে-অনুচ্চকণ্ঠে প্রবাহিত রসিকতার ভাষাটুকু শুনিয়া লন। ব্যাধের অর্ধগলিত জীবচর্মের আসনের পাশে যাইতে যাইতে দুর্গন্ধ নিবারণের জন্য নাসিকায় বস্ত্রাবরণ দেন। এই কাব্যে ঈর্ষা ও কলহ, শঠতা ও ধূর্ততা, নির্বুদ্ধিতা ও আলস্যের যে চরিত্ররূপ আছে, তাহা মধ্যযুগীয় বাঙালী সমাজের অতি বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতিস্বরূপ। প্রাত্যহিক মঙ্গলাচারের ছোটখাট বিশ্বাস ও সংস্কারের বর্ণনায়, গার্হস্থ্য জীবনের খুঁটিনাটি উপকরণের নিপুণ বিবৃতিতে, চক্ষুষ্মান কবিদের বস্তুরসরসিকতার পর্যাপ্ত নিদর্শন পাওয়া যায়। এখানে স্বর্গের কথায়, অলৌকিকতার প্রতীতি উৎপাদনে, দেবচরিত্র সৃষ্টিতে কবিদের কৌতূহলের অভাব নাই, কিন্তু তাহা শেষ পর্যন্ত ভীতি ও বিস্ময় উদ্রিক্ত করিলেও বিশ্বাস জাগাইতে সক্ষম হয় নাই। বৈষ্ণব ও শাক্ত কবি দেবতার নিকট অপ্রাকৃত মাধুরী-আস্বাদনের ও পদসৌন্দর্য-অনুধ্যানের প্রার্থনা করিয়াছেন। কিন্তু মঙ্গলকাব্যগুলির ভিতর দিয়া দুঃখ-দৈন্যপীড়িত অভাবগ্রস্ত মানুষ ঐহিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সম্পদ বিত্ত প্রার্থনা করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণবিরহে ভক্ত হৃদয়ের সর্বশূন্যতা-বোধ অকারণ বেদনার-অশ্রু-প্লাবনে তুলসী মঞ্চ ভাসাইলেও তাহার মধ্যে একটি উৎকেন্দ্রিক অস্বাভাবিকত্ব আছে। দিন যাপনের দুর্বিষহ গ্লানির মধ্যে এই অলৌকিক বিলাপগীতি ঠিক সর্বজনসাধ্য বলিয়া মনে হয় না। ইহার জন্য সাধনার দুর্গম কঠোরতা ও দীক্ষার দুশ্চর ব্রত পালন করিতে হয়। রাজনন্দিনী সীতার দৈবাহত দুঃখে শ্রোতার দীর্ঘশ্বাস অনেকটা অনুকম্পাজনিত। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের বারমাস্যায় রিক্তসুখ মানুষের অন্নাভাব অর্থাভাবজনিত কাতরতা এক মুহূর্তে জীবনের বিপন্ন অস্তিত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এখানে বাস্তব সংসার তাহার সহস্র ধূলিধূসর পদচিহ্ন লইয়া উপস্থিত, কবিরা তাহাকে ঊর্ধ্বচারী কল্পনায় মণ্ডিত

নায়ক-নায়িকার সাধারণত্ব

বস্তুজ্ঞানের চিত্র

মানুষের ঐহিকতা

স্বর্গীয় দেবতার উপর ইতর মনুষ্য-সমাজের প্রভাব

করেন নাই। এখানে শিবের উদর-পরায়ণ ভোজনলোলুপতা, অন্নপূর্ণার সংগতিহীনতার দীর্ঘশ্বাস, চণ্ডীর সপত্নীসুলভ বৈমাত্র-ঈর্ষা মানুষের ইতর বস্তুজীবন হইতেই দেবচরিত্রে সংক্রামিত হইয়াছে। এই বাস্তবচেতনা ও মানবজীবনাসক্তির জন্যই মঙ্গলকাব্যগুলি সাংসারিক দুঃখতাপলাঞ্ছিত মনুষ্য-সমাজে এত জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। মঙ্গলকাব্য দেবতার মাহাত্ম্য-প্রতিষ্ঠার কাব্য হইলেও এ দেবতা স্বর্গভ্রষ্ট।

এখন মঙ্গলকাব্যগুলির কায়গঠনগত কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ ও এইগুলির ভিতর প্রকীর্ণ মধ্যযুগীয় সমাজ-জীবনের উপকরণগুলি সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এই সম্পর্কে 'বাঙলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা' হইতে প্রাসঙ্গিক অংশ সংকলিত হইল—

"মোটামুটি এই জাতীয় রচনা চারি অংশে বিভক্ত থাকে। প্রথম অংশে বন্দনা। এই অংশে নানা দেবদেবীর বন্দনা করা হয়। এই বন্দনা একান্ত-ভাবে অসাম্প্রদায়িক। ইহাতে শুধু যে ইষ্ট দেবতার বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের দেবদেবীর বন্দনাই হইত তাহা নয়, হিন্দুমুসলমান-নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর উপাস্যদের প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হইত।

দ্বিতীয় অংশ—গ্রন্থরচনার কারণ বর্ণনা। ইহার মধ্যে কবির আত্মপরিচয় থাকিত। প্রায় সব মঙ্গলকাব্যই যে স্বপ্নাদেশ বা দৈবনির্দেশে রচিত হইয়াছে —তাহা উল্লিখিত হইয়াছে।

তৃতীয় অংশ—দেবখণ্ড। পৌরাণিক দেবতার সহিত লৌকিক দেবতাদের সম্বন্ধ স্থাপনই ইহার মূল কথা। এই অংশে শিবের সম্বন্ধেও প্রাধান্য লক্ষণীয়।

চতুর্থ অংশ—নরখণ্ড এবং আখ্যায়িকার বর্ণনা। দেবতার পূজা-প্রচারের জন্য কোনো কোনো দেবতা ও স্বর্গবাসীর শাপভ্রষ্ট হইয়া নরলোকে জন্মগ্রহণের বর্ণনা আছে। চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু-ফুল্লরা, দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র ও পুত্রবধূ নীলাম্বর ও ছায়া, মনসামঙ্গলের বেহুলা-লক্ষ্মীন্দর উষা-অনিরুদ্ধ।

এই নরখণ্ড বর্ণনার মধ্যে আরও কয়েকটি আঙ্গিক আছে। মুখ্যত নায়িকাদের বারমাসের সুখদুঃখের কাহিনীর বর্ণনামূলক 'বারমাস্যা'-অংশ এই আঙ্গিকের অন্যতম। এতদ্ব্যতীত 'চৌতিশা' অর্থাৎ বিপন্ন নায়ক-নায়িকা কর্তৃক চৌত্রিশ আখরযোগে ইষ্টদেবের স্তুতি, নায়িকার সজ্জা ও রন্ধন-প্রণালী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।"

মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে মধ্যযুগের সমাজ জীবনের নানাবিধ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উদ্ধৃত হইল—

"বেশভূষা-অলংকারের মধ্যেও এই সময়ে সুরুচি ও উন্নত শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভ্রান্ত বাঙালীদের পোষাক—'একখানি কাচিয়া পিন্ধে আর একখানি মাথায় বান্ধে আর একখানি দিল সর্ব গায়'। মেয়েরা পশ্চিমাদের মত কাঁচুলি পরিতেন। বিশেষত উৎসব-সময়ে ইহার ব্যতিক্রম ছিল না। মেঘডম্বুরাদি নানা রকমারি শাড়ির নাম পাওয়া যায়। নিম্ন-শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা পরিত 'খুঞার বসন'। শাখা ও স্বর্ণালংকারের নাম পাওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে ফুলের গহনার প্রতিও আগ্রহ দেখা যায়। পুরুষদের হাতে বলয়, কানে সোনার কুণ্ডল থাকিত। লম্বা চুল বাথা পুরুষগণেরও সৌন্দর্যবর্ধক ছিল। 'পরম সুন্দর লখাইর দীর্ঘ মাথার চুল। জ্ঞাতিগণ ধরি নিল গাঙুড়ির কূল'। নাগর জীবন সম্বন্ধে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম লিখিয়াছেন—'নগরে নাগরজনা কানে লম্বমান সোনা বদনে গুবাক হাতে পান। চন্দনে চর্চিত তনু হেন দেখি যেন ভানু তসর রঙ্গন পরিধান'। কানাড়ী প্রভৃতি নানা ছন্দে খোঁপা বাঁধিতেন মেয়েরা।

বিদ্যাচর্চা উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। টোলের অধ্যাপক ব্রাহ্মণই হইতেন এবং উঁহাদের ব্যাকরণ-প্রীতি অধিক ছিল। স্ত্রীলোকের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন বেশি ছিল না। তবে কেহ কেহ সামান্য কিছু জানিতেন।

দেশে বণিকদিগের খানিকটা খ্যাতি ছিল। সমুদ্রযাত্রার যে-সব বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা শোনা কথা বলিয়াই মনে হয়। বাণিজ্য-বহর নৌকাতে চলিলেও তাহা যে সমুদ্রপার হইয়াছে, বর্ণনা দ্বারা তাহা বোঝা যায় না। দ্রব্য বিনিময় হইত। কড়ি দিয়া সাধারণত কেনা-বেচার রীতি ছিল। পণ্য-মূল্যের তালিকা দেখিয়া জিনিসপত্র অত্যন্ত সুলভ ছিল বলিয়া মনে হয়।

যুদ্ধের বর্ণনা যেগুলি পাওয়া যায়, তাহা অনেকখানি কৃত্রিম। যথার্থ বীরত্ব তাহার মধ্যে নাই। বাঙালী সৈনিক ছিল এবং নানা জাতির মধ্য হইতে সৈন্য সংগৃহীত হইত। বড় রকমের যুদ্ধের বর্ণনা মঙ্গলকাব্যে নাই। ধর্ম-মঙ্গলের যুদ্ধগুলি অতিপ্রাকৃত-প্রভাবপুষ্ট বর্ণনা।

রাজনৈতিক পরিবেশে যে একটা ভয়াবহ অনিশ্চয়তার পরিস্থিতি বা ব্যাপক মাৎস্যন্যায় প্রচলিত ছিল তাহা মনে করিবার কারণ নাই। মুসলমান

ডিহিদার ও নবাবগণ ক্ষেত্রবিশেষে বিধর্মীদের উপর অত্যাচার করিতেন। বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল ও মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে তাহার আভাস আছে। কিন্তু তাহা কদাচ অরাজকতা সৃষ্টি করে নাই। স্থানীয় ও সাময়িক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম কালকেতুর নগর-পত্তন-পালার যে নিখুঁত বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহাতে যে বিভিন্ন জাতির জীবনযাত্রার ছবি দিয়াছেন, তাহাতে একটা নূতন সমাজ-সংগঠন ও বিরুদ্ধ উপাদানের সমন্বয়ের এক সুনিশ্চিত আভাস মিলে। ইংরেজ-যুগ পর্যন্ত যে সমাজ-ব্যবস্থা ও রীতি প্রচলিত ছিল, তাহার যে প্রথম ভিত্তিপত্তন ষোড়শ শতকে হয়, মুকুন্দরামের মঙ্গলকাব্য হইতে আমাদেব এই প্রতীতিই জন্মে। ঘর-গৃহস্থালির কথা, বহু-বিবাহের বিষয়, সতীনের জ্বালা, বশীকরণের ঔষধ করিবার চেষ্টা ইত্যাদি নানা বিষযেব বিচিত্র বিবরণ আছে। ভাবতচন্দ্রেব আমলে আসিযা গ্রাম্য জীবনের সরলতা নাগর বিলাসিতার রুচি দ্বাবা অভিভূত হইয়াছে দেখা যায়। অন্যান্য মঙ্গলকাব্য হইতে এই কাবণে ভাবতচন্দ্রের কাব্য অনেকখানি অভিজাত। তাহা হইলেও বাঙালী জাতিব অন্তরের সাধারণ কথাটি ভারতচন্দ্রের মধ্যে ভাষা পাইয়াছে 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।' অর্থাৎ মোটাভাত মোটা কাপড়ের প্রাচুর্যপূর্ণ সহজ সরল জীবনই তখন অনভিজাত সমাজের প্রধান কাম্য ছিল।" [ডঃ শ্রীকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা]

বিশ্বের মূলীভূত কারণ শক্তিকে মাতৃকাশক্তি রূপে উপাসনা করা বাঙলার ধর্মসাধনার একটি আদিম বৈশিষ্ট্য, অনেকে দক্ষিণ ভারতীয় জাতীয় সংস্কারের সহিত ইহার সাদৃশ্য অন্বেষণ করিয়াছেন। হয়ত এই জাতীয় মাতৃতান্ত্রিক সংস্কাব অনার্য অস্ট্রিক ও দ্রাবিড সভ্যতারই প্রাচীন লক্ষণ। মনসা এইরূপ মাতৃশক্তির বিগ্রহ। কৌমশাসন-বিন্যস্ত সমাজে মনসা বাস্তুদেবতা আরোগ্যের দেবতা ও সম্পদের দেবতারূপে একীভূত হইয়া গিয়াছেন। আবোগ্য-পুষ্টির দেবতারূপে বৈদিক সাহিত্যে সরস্বতী গৌরী ও বাক্‌দেবতাব নাম পাওয়া যায়। আবার পূর্বভারতীয় মহাযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে জাঙ্গুলী নামে এক সর্পদেবীর অস্তিত্বের সন্ধান মেলে। এই জাঙ্গুলী দেবীর পূজোপকরণ, বৌদ্ধ সাধনমালা গ্রন্থে-নিবদ্ধ মন্ত্রাদির সহিত পরবর্তী কালে মনসা-পূজার সাদৃশ্য গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। দক্ষিণ ভারতে সর্পপূজার দেবীর নাম

মনসা দেবীর ইতিকথা

মঞ্চাম্মা (Manchamma) অর্থাৎ মন্‌চা মাতা। ইহা হইতেই মনসা আসিয়াছে অথবা মনসার নামান্তর মন্‌চা কিনা সুনির্দিষ্টভাবে বলা কঠিন। তবে বাঙলা দেশের মনসা দেবীর পিছনে বহু সংস্কার, জাতি ও সমাজগত বিশ্বাস এবং নৃতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের মিশ্রণ ঘটিয়াছে। সর্পপূজারী দ্রাবিড়ীয় সভ্যতা এবং সর্প-প্রভাবান্বিত অষ্ট্রিক ও তিব্বতব্রহ্মী জাতির প্রাচীনতর প্রভাব মনসা দেবীর উপর থাকিতে পারে। তবে প্রাচীন আর্যশাস্ত্রেও মনসা দেবীর অস্তিত্ব দেখা যায়। কশ্যপের মানস সৃষ্টি হিসাবে মনসা নামকরণের পৌরাণিক ব্যাখ্যা ঠিক যুক্তিসংগত মনে হয় না। পদ্মপুরাণ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ দেবীভাগবতে মনসা শব্দটি পাওয়া যায়। ভারত সরকারের পুরাতাত্ত্বিক বিবরণে বীরভূমে একাদশ শতাব্দীর মনসামূর্তির সাক্ষাৎ মেলে।

ঋগ্‌বেদে রুদ্রের ক্রোধকে বলা হইয়াছে মনা, ইনিও মনসা নামের সহিত সমীকৃত হইয়া গিয়াছেন। সরস্বতী ও শ্রী পৌরাণিক শাস্ত্রে যথাক্রমে কমলা ও পদ্মা হইয়াছেন, এইরূপ গবেষণাও এক্ষেত্রে একেবারে ভিত্তিহীন বলিয়া মনে হয় না। সরস্বতীর সহিত মনসার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। তবে শেষ পর্যন্ত মনসা তাঁহার সকল পৌরাণিক আর্যদেবতাগত বৈশিষ্ট্য হারাইয়া বাঙলার জনসমাজে, সর্পঅধ্যুষিত নদীকলধ্বনিত পঙ্কিল পলিবিধৌত দেশে নাগ-দেবতা রূপেই অপ্রতিহত প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। দেবতার যাহা কিছু ক্রোধ ও প্রতিহিংসা, তুচ্ছতম বিরোধিতা ও ন্যূন-গণনীয় স্পর্ধার বিরুদ্ধে দৈবী মাহাত্ম্যের যাহা কিছু ক্রূর প্রতিবিধিৎসা, অসহায় মানবজীবনকে নিষ্প্রাণ ক্রীড়াপুত্তলীর মত খেলাইবার যাহা কিছু নির্মম ইচ্ছা, সব সংহত হইযা যদি কোনো নারীমূর্তি ধারণ করে তাহাই মনসা নামে অভিহিতা হইয়াছে। মন্ত্রে ও শাস্ত্রে ইহার যে রূপমূর্তি অলংকার ও বাহনেরই উল্লেখ করা হোক না কেন, অকারণ ক্রোধই ইহার বাহন, আততায়ী প্রতিহিংসা ইহার অলংকার, ভীতি ইহার রূপমূর্তি, নির্দ্বিধ আত্মসমর্পণ ইহার মন্ত্র। সরীসৃপের নিঃশব্দ কুটিল পদ-সঞ্চারে প্রতিরোধের লৌহকঠিন ছিদ্রের মধ্য দিয়া অদৃশ্য গোপনতায় ইহার পদসঞ্চার, শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের কমনীয় তনুদেহে প্রেমচুম্বনের মত নিবিড় করিয়া ইনি গরলধারা ঢালিয়া দেন। এক মুহূর্তেই সমস্ত উৎসব, শোভাযাত্রা ও লাবণ্য মৃত্যুর হিমশীতল আলিঙ্গনে ঢলিয়া পড়ে। সকল মানবিক দুঃসাহস ও সবল বাহুর বলিষ্ঠ আস্ফালনের উপর দৈবী রোষের এক করাল ছায়া ধীর-নৈঃশব্দ্যে

সঞ্চারিত হইয়া যায়। ইহাই মধ্যযুগের শক্তিদেবতার মধ্যে মনসার যথার্থ স্বরূপ।

চৈতন্য ভাগবতের সাক্ষ্যে জানা যায়, চৈতন্য আবির্ভাবের পূর্বে বাঙলাদেশের গৃহে গৃহে বিষ্ণু-উপাসনা অপেক্ষা মনসা বা বিষহরির উপচারবহুল অর্চনা হইত। হয়ত মনসামঙ্গলের কাহিনীটিও তৎকালে প্রচলিত ছিল। দক্ষিণভারতে প্রচলিত কাহিনীর সহিত বাঙলাদেশের মনসামঙ্গল কাহিনীর গভীর সাদৃশ্য আছে এবং বাঙলা দেশের প্রতিবেশী অঞ্চলগুলিতেও দীর্ঘকাল প্রচলিত মনসা-কাহিনী বাঙলা দেশের কাহিনীরই অনুরূপ, কেবল নামে চরিত্রে ঘটনায় ঈষৎ রূপান্তরে স্থানকালগত পরিবর্তন ঘটিতে পারে। অথচ এরূপ কোনো কাহিনী, চাঁদ সদাগর-বেহুলা-লখীন্দরের আখ্যান সংস্কৃত পুরাণ-মহাভারতে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে, ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে প্রচলিত অথচ মোটামুটি অবিচ্ছিন্ন এইরূপ একটি কাহিনী বিভিন্ন দেশের লোকসাহিত্যে তথা মৌখিক সাহিত্যে ছড়া বা ব্যালাড-আকারে প্রচারিত ছিল। পরে মহাভারতের নানা কাহিনী ও অন্যান্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত ইতস্তত কাহিনী ইহাতে সংযোজিত হয় এবং তুর্কী আক্রমণের পর কোনো ক্ষমতাসম্পন্ন কবির দ্বারা ইহাকে পঠনীয় রূপদান করা হয়। বাঙলা দেশে প্রচলিত হইয়া এই কাব্যে মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য প্রাকৃত স্বভাবগুলি সংলগ্ন হইয়াছে। ইহার দেবখণ্ড ও নরখণ্ড এই পর্যায়-ভেদের দ্বারা মনসার কার্যকলাপ একটি জন্মের সমগ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং বৃহৎ দেবপরিবারের গোষ্ঠীভুক্ত হইয়া শিবপার্বতীর বিবাহ ও সংসারজীবনযাত্রা, তাহাদের দাম্পত্য জীবনে মনসার অভ্যুদয়ে জটিল সন্দেহ ও কলহপরায়ণতা, মনসার বনবাস ও প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির ক্রমোন্মেষ ইত্যাদি কাহিনীগত বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইয়াছে। নানা কবির হাতে নানা প্রাদেশিক আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত হইয়া মনসামঙ্গল ধীরে ধীরে এক পৌরাণিক মহিমা প্রাপ্ত হইয়াছে।

কাহিনী

মনসামঙ্গল উপাখ্যানে দুইটি আখ্যান পরস্পর সংসক্ত। একটি মনসা-চাঁদ সদাগরের আর একটি নেতা শংকর গারুডীর কাহিনী। দ্বিতীয় কাহিনীটি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন হইলেও চাঁদ সদাগরের সহিত মনসার মানবিক সংগ্রামের অমর উপাখ্যানটি যুগযুগবাহিত কৌতূহল ভীতি ও শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময়

লইয়া অধিকতর জনপ্রিয় হইয়াছে। মনসা-চাঁদসদাগরের কাহিনী উত্তরে পর্বতসানু বাঙলা হইতে পূর্বে পশ্চিমে বিহার হইতে আসাম ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকা সুর্মা-উপত্যকায় জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। কবি নারায়ণ দেব চাঁদ সদাগরের স্ত্রী সনকাকে 'বেহারিয়া রাজার কন্যা' বলিয়াছেন, দ্বিজবংশীদাসের কাব্যেও মাণিক্যপাটলী দেশের গন্ধ বণিকের উল্লেখ পাটলীপুত্র বা পাটনার স্মারক মনে হয়। বিহারের গ্রামাঞ্চলে এই কাহিনীর অস্বাভাবিক জনপ্রিয়তা ও এই সকল তথ্যের দ্বারা অনেকেই চাঁদ-বেহুলার কাহিনীকে বিহারোদ্ভূত বলিয়া মনে করেন। অনেকে দাক্ষিণাত্যেও ইহার মূল নির্ণয় করিতে চান। তবে ইহার বীজ যে দেশের সংস্কৃতি হইতে আসুক না কেন, বাঙলা সাহিত্য তাহার উদ্ভিদ্যমান বর্ণৈশ্বর্য ও ভাবসম্পদ লইয়া, মানবিক আবেদন ও কাব্যস্পৃহার দ্বারা কয়েক শতাব্দী যাবৎ মনসামঙ্গল কাহিনীকে গড়িয়া তুলিয়াছে। অঙ্কুরোদ্গমের প্রথম হইতে ইহাকে জাতীয় ব্যাকুলতার বারিসিঞ্চনে, লোকায়ত জীবনতৃষ্ণার সূর্যালোকে সুপুষ্ট পল্লবিত করিয়াছে। দৈবনিপীড়িত অদৃষ্টলাঞ্ছিত অথচ পৌরুষ ও আত্মশক্তিতে অনুপ্রাণিত হইবার সঙ্কল্পে দৃঢ় বাঙালী পরিবারের সমীপবর্তী প্রাঙ্গণে বর্ধিত হইয়া ইহা উত্তরাধিকার সূত্রে বাঙালী জীবনের বহুতর প্রজন্মকে মনুষ্যত্ব ও প্রতিকূল নিয়তির শিহরণসঞ্চারী রহস্যময়-পরিণামী এক জীবনরস দান করিয়া আসিয়াছে। মনসামঙ্গলের পূজাপদ্ধতি, দেবীর উৎস-সন্ধান, কাহিনীর বীজানুসন্ধিৎসা এইগুলি তত্ত্বজিজ্ঞাসুদের অধিকারে রাখিয়াও আমরা বলিতে পারি, বিভিন্ন বিবিধ ও বিচিত্রকে সৃষ্টিমূলক ঐক্যসূত্রে বাঁধিয়া বাঙালী তাহার সাহিত্যসৃজনের মৌলিক প্রতিমা রচনা করিয়াছে এই মনসামঙ্গলে। চাঁদ সদাগরের দৃঢ় ব্যক্তিত্বের করুণ উপসংহারে, বেহুলার সতীত্বের করুণ একনিষ্ঠায় বাঙালী সমাজের স্পন্দন একান্তভাবেই অনুভূত হয়।

চাঁদসদাগর কাহিনীর জনপ্রিয়তা

কাহিনীর সঙ্গীযতা

বস্তুত মনসামঙ্গলগুলি বাঙলার মৃৎসৃষ্ট পদার্থ, বাঙলাদেশের মাটির সম্পদের মতই তাহা জাতীয় ঐতিহ্যে লালিত হইয়াছে। লোকায়ত জীবনযাত্রা উহার আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভীতি ও বিশ্বাসের সহিত এইগুলির সর্বাধিক যোগ দেখিতে পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর মর্তে আত্মপ্রতিষ্ঠার কাহিনীই মঙ্গলকাব্যের কাহিনী।

লোকায়ত জীবনের কাব্য

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মঙ্গল দেবদেবীরা এই মর্তের আভিধানিক অর্থ জানিতেন না, তাঁহাদের মর্ত সীমাবদ্ধ অঞ্চল। মুষ্টিমেয় লোকসমাজ, শিথিলপ্রদত্ত পূজোপহার এবং সন্ত্রস্ত-উচ্চারিত দেবনামেই তাঁহাদের মর্ত ও মর্তাভিষানের সীমা নির্ধারিত হইয়াছে। মঙ্গল দেবতাদের পূজাপ্রচার বাঙলাদেশের অঞ্চল বিশেষের প্রাকৃতিক ভৌগোলিক সংস্থানের সঙ্গে অভ্রান্তভাবে জড়িত ছিল। এইজন্য মঙ্গলকাব্যগুলি একান্তভাবে আঞ্চলিকতার দ্বারা খণ্ডিত কাব্য, ইহারা সমগ্র দেশ-চেতনার জাতীয় সংহতিতে আসন লাভ করিতে পারে নাই। ধর্মমঙ্গলের দেবতা কেবল বীরভূম বা রাঢ় অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর এক সম্প্রদায়ের মধ্যেই তাঁহার বিশ্ববিজয়কে পরিচালিত করিয়াছেন। চণ্ডীমঙ্গল এবং মনসামঙ্গলের কাহিনী বহুল-প্রচারিত হইলেও এক একটি অঞ্চলেই ইহাদের সার্বভৌম বিস্তার ঘটিয়াছে। সাম্প্রদায়িকতা সত্ত্বেও বর্ণনির্বিশেষে লোকসমাজের মধ্যে নির্বিচার প্রেমধর্ম বিতরণের আদর্শহেতু বৈষ্ণব সাহিত্য সর্ববাঙলায় জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু মঙ্গলকাব্যগুলির পক্ষে এই আঞ্চলিকতা অতিক্রম করা সম্ভবপর হয় নাই। মনসামঙ্গল কাব্য কাহিনীর সর্বজনীন আবেদনে ও অসামান্য চরিত্রসৃষ্টিতে আঞ্চলিকতার গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারিয়াছিল। তবে বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন কবির হাতে তাঁহাদের স্থানীয় ভাষা, সংস্কার প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদির প্রভাব ইহাতে দৃষ্ট হয়।

মঙ্গলকাব্যের আঞ্চলিকতা

অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের তুলনায় মনসামঙ্গল কাব্য প্রাক্‌চৈতন্য যুগেই যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল এবং খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ন ছিল। পক্ষান্তরে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রকৃত প্রচার ষোড়শ শতাব্দীতে এবং ধর্মমঙ্গলের প্রচার সপ্তদশ শতাব্দীতে সুরু হইয়াছিল। সুতরাং মনসামঙ্গল কাব্য-শাখা অন্য মঙ্গলকাব্যের প্রভাব-নিরপেক্ষ হইয়াই চৈতন্য-পূর্ব যুগে একটি নিজস্ব কাহিনী ধারা, আঙ্গিক এবং ভাষাগত সংহতি লাভ করিয়াছিল। মঙ্গল-কাব্যের ইতিহাস প্রতিকূল সমাজে দেবতা বিশেষের বলপূর্বক অনুপ্রবেশ ও প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। কেবল এই বৈশিষ্ট্যটি একমাত্র মনসামঙ্গলেই সুরক্ষিত হইয়াছে। চণ্ডীমঙ্গলে সমাজে চণ্ডীকে প্রতিষ্ঠার জন্য এতখানি প্রাতিকূল্য ও মনুষ্যবিশেষের প্রতিরোধ শক্তির সম্মুখীন হইতে হয় নাই।

চৈতন্য-পূর্ব যুগের মনসামঙ্গল

কিন্তু চৈতন্যপূর্ব যুগে বিকশিত হইবার জন্য মনসামঙ্গল কাব্যগুলি চৈতন্য-সংস্কৃতির সর্বাত্মক ঐক্যানুভূতি, প্রেমধর্ম ও সহিষ্ণুতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। ইহার কাব্যদেহ গঠনে এক প্রকার শিথিল আদর্শহীন এলায়িত ভঙ্গি, রুচিদুষ্টতা ও গ্রাম্যতা চোখে পড়ে যাহা চণ্ডীমঙ্গলে অনুপস্থিত। মনসার ক্রুরতার অতিরেক, অন্য ধর্ম সম্পর্কে সামান্যতম সহনশীলতার অভাব, দেবতার কল্যাণময়ী রূপের বদলে নিষ্ঠুর হৃদয়হীন প্রতিহিংসা ও সর্বনাশসাধনের পাশবিক উল্লাস, এইগুলি চৈতন্যোত্তর যুগের মঙ্গলকাব্যে ততটা সম্ভব ছিল না। চৈতন্যপর যুগের মনসামঙ্গলে চরিত্রের আদর্শ আরও উন্নত হইয়াছে; ভাষা ও ছন্দে এবং শৃঙ্খলা ও পারিপাট্য আসিয়াছে, উৎকৃষ্ট প্রতিভার স্পর্শে তাহা প্রায় জাতীয় কাব্যের মর্যাদাপ্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাকচৈতন্য যুগের কবি বিজয় গুপ্তের সহিত সপ্তদশ শতাব্দীর কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের তুলনা করিলেই তাহা প্রমাণিত হইবে।

মনসামঙ্গলে রামায়ণের প্রভাব

উৎসে বন্ধুর পার্বত্য গুহামুখ হইতে ক্ষীণ-স্রোত নির্ঝরিত হইলেও পর্বত-বাহিনী নদী উপত্যকায় আসিয়া সমতটপ্লাবিত অন্যান্য জলধারার সহিত মিলিত হইয়া সমুদ্রগামিনী শস্যশালিনী ও তৃষ্ণাবারিণী হয়। মঙ্গলকাব্যগুলিও লোকায়ত জীবনের সংস্কার বিশ্বাস আদিম অনার্য-সমাজের অনার্য আচার-মন্ত্র-জাদু ইত্যাদি হইতে নির্গত হইলেও পরবর্তী কালে পৌরাণিক কাব্য-শাস্ত্র ইত্যাদির দ্বারা পরিপল্লবিত হয়। মনসামঙ্গলেও পুরাণ ও রামায়ণ-মহাভারতাদির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মঙ্গলকাব্যগুলি আদিম নারী-সমাজের ব্রতগীত ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে সৃষ্ট হইলেও মঙ্গলকাব্যের নারী চরিত্রগুলি ব্যাপকভাবে সীতা-চরিত্রের আদর্শে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা ছাড়া মনসামঙ্গলে বিচ্ছিন্নভাবে রামায়ণের ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়।

বিজয় গুপ্ত

মনসামঙ্গলের অন্যতম প্রাচীন কবি পূর্ববঙ্গের বিজয় গুপ্ত গৌড়াধিপতি হোসেন শাহের সমসাময়িক ছিলেন এবং সম্ভবত পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশকে তাঁহার কাব্যরচনা করেন। ইনি পূর্ববর্তী এবং মনসামঙ্গলের আদি কবি বলিয়া গৃহীত হরি দত্তের কাব্যের ছন্দোভ্রষ্টতা ও শিথিলতার কঠোর সমালোচনা করিয়া তাঁহার কাব্য সূচনা

করিয়াছেন। বিজয় গুপ্তের রচনা খণ্ড খণ্ড ভাবে পাওয়া গিয়াছে। পূর্ববঙ্গের প্রাচীনতম মনসামঙ্গল-রচয়িতাদের অন্যতম হইতেছেন নারায়ণ দেব, কিন্তু তাঁহার আবির্ভাবকাল সংশয়াচ্ছন্ন। তাঁহার আত্মপরিচয়ে প্রাচীনত্বের স্পর্শ আছে কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ তাঁহাকে পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ শতকের কোন্ স্থানে ফেলিবেন এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পান নাই। সম্ভবত কবির উপাধি ছিল সুকবিবল্লভ এবং তাঁহার কাব্য বঙ্গসীমা অতিক্রম করিয়া সুদূর আসাম পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। মঙ্গলকাব্যের ঐতিহাসিক অনুমান করিয়াছেন যে নারায়ণ দেবের কাব্যে পৌরাণিক আখ্যানের বিস্তারিত বর্ণনা, এবং গীতিকা-লক্ষণের জন্য নারায়ণ দেবকে প্রাক্‌চৈতন্যদেবের কবি বলা সংগত। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'বাঙলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা'-গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

নারায়ণ দেব

"তাঁহাকে পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে আবির্ভূত বলিয়া ধরিয়া লইলে কোনো মারাত্মক ভুলের মধ্যে পড়িতে হইবে না। তিনি এবং তাঁহার প্রায় সমকালীন কবি বিজয় গুপ্ত মনসামঙ্গলের বিভিন্ন চরিত্র-পরিকল্পনা, নানা আখ্যান ও পুরাণ-কাহিনীর সমাবেশ, উহার সমাজচিত্র, নীতিগত মান, অধ্যাত্মভাবনা ও জীবনদর্শন—এই সমস্ত উপাদানের যথাযথ বিন্যাসে উহার একটি সামগ্রিক রূপ স্থির করেন ও ইহার বহু-শতাব্দীব্যাপী অগ্রগতি ও আত্মবিস্তারের একটি সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ করেন।...তাঁহারা যে আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রসারিত মনসামঙ্গলের নবরূপের স্রষ্টা তাহা নিশ্চিত।"

মনসামঙ্গলে করুণ রস সৃষ্টিতে এবং হাস্যরস সৃষ্টিতে যথাক্রমে নারায়ণ দেব ও বিজয় গুপ্তের কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। বিজয়গুপ্ত বস্তু-বর্ণনায়, পারিপার্শ্বিক তথ্য বিবৃতিতে, চরিত্রচিত্রণে, সমাজচৈতন্যে যথার্থই মঙ্গলকাব্যের কবি, পক্ষান্তরে নারায়ণ দেবের মধ্যে একদিকে যেমন ব্যালাড-জাতীয় কাব্যের প্রবণতা অন্যদিকে রামায়ণ-জাতীয় কাব্যের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে।

নারায়ণ দেব ও বিজয় গুপ্ত

বিজয় গুপ্তের দেবদেবী চরিত্রগুলি মঙ্গলকাব্যের স্বভাবধর্মে মানবিক চরিত্র মাত্র, তাহাদের দেবত্বে ঐশ্বর্যবিভূতি অমর্তগরিমা অলৌকিক ক্ষমতা যতদূর সম্ভব অপসারিত হইয়াছে এবং মনুষ্যসুলভ দোষ দুর্বলতার অধীন হইয়া তাঁহারা সমকালীন লোকায়ত

বিজয় গুপ্তের বৈশিষ্ট্য

জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছেন। বিজয় গুপ্তের শিবদুর্গা যেন বাঙালী দম্পতী, মুকুন্দরামের সূক্ষ্ম বাস্তবতা কৌতুকপরায়ণতা ও চরিত্রচিত্রণক্ষমতার প্রাক্‌সূত্র বিজয় গুপ্তের কবিধর্মে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। খণ্ড চিত্র ও পার্শ্বচরিত্র, প্রতিবেশ ও পরিস্থিতির প্রতি সতর্ক পর্যবেক্ষণশক্তি বিজয় গুপ্তের কাব্যে দৃশ্যের তথ্যপূর্ণ শোভাযাত্রা-সমাবেশ ঘটাইয়াছে।

বিপ্রদাস

মনসামঙ্গলের আর একজন প্রাচীন কবি পশ্চিমবঙ্গের বিপ্রদাস পিপিলাই সম্ভবত বিজয় গুপ্তের সমসাময়িক, কিন্তু এই সম্পর্কেও ঘোরতর মতবিভেদ আছে।

মনসামঙ্গলের স্বরূপধর্ম

মনসামঙ্গলে একই সঙ্গে যেমন লোকসাহিত্যের লক্ষণ আছে তেমনি বিভিন্ন কবির ব্যক্তিত্বপ্রধান সাহিত্য-চেতনা, শাস্ত্রজ্ঞান, পৌরাণিকতারও প্রভাব আছে। মনসামঙ্গল আঞ্চলিক কাব্য হইয়াও জাতীয় কাব্য আবার বিষয়বস্তুর গুরুত্বে ইহা একপ্রকার স্থানীয় মহাকাব্যও বটে।

মনসামঙ্গল ও লোকসংস্কৃতি

মনসার মাতৃপরিচয়হীন অনৈসর্গিক জন্মবৃত্তান্ত আদিম সমাজের অলৌকিক বিশ্বাস ও লোকচেতনার লক্ষণ। রূপকথা-উপকথা ও লোকসাহিত্যে এইরূপ আখ্যান প্রভৃত দৃষ্ট হয়। মনসাপূজার উৎস বৈদিক সংস্কৃতি নয়, লোকসংস্কৃতি। লোকসংস্কার প্রতীক ব্যবহার করে, মূর্তিপূজা করে না। মনসা পূজার প্রতীক নাগঘট। বাঙলার ব্রতগীতে মনসা ও বেনে বউ কাহিনী প্রচলিত। সাঁওতাল পরগণায় কামরু ওঝার কাহিনী, নেতা-শংকর কাহিনীর অনুরূপ। লোকসংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য সমন্বয়ধর্মিতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা—এই কারণে বিভিন্ন ধর্মের তত্ত্বগত সূক্ষ্মতা অস্বীকার করিয়া একটি ধর্মসহিষ্ণুতা ও উদার মতৈক্য স্থাপন ও বিভিন্ন পরস্পর-বিবদমান দেবতাকে একটি বৃহত্তর সম্পর্ক-যুক্ত দেব-পরিবারের গোষ্ঠীভূত করার পরিকল্পনা দৃষ্ট হয়। মনসামঙ্গলে মনসা আপনার পূজা প্রচারের জন্য শৈব চাঁদ সদাগরের সহিত জীবনমরণ পণ করিয়াছেন, কিন্তু জন্মসূত্রে মনসা শিবেরই কন্যা। চণ্ডীর নামান্তর কেতকা, কেতকা আবার মনসারও নাম, কিন্তু চণ্ডীর সহিত মনসার বিরোধ। এই দিক দিয়া নিরঞ্জনপন্থীদের ছড়া, ধর্মমঙ্গল কাহিনী, চণ্ডীমঙ্গল, শৈবনাথ কাহিনী, গোরক্ষ বিজয় এবং ময়নামতীর গানের সহিত মনসামঙ্গলের সূক্ষ্ম

সংযোগ আছে। অথচ পরধর্ম-অসহিষ্ণু আপন মাহাত্ম্যের অসূয়ায় আত্মপ্রচার ইহাই মঙ্গলকাব্যগুলির বহিরঙ্গ স্বভাব।

ইন্দ্রিয়গম্যতা বা প্রত্যক্ষজ্ঞান (empiricism) লোকায়ত দর্শনের বৈশিষ্ট্য। মনসামঙ্গলের কবিরাও বাস্তব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষের জগতে পর্যটন করিয়াছেন। বাস্তবজ্ঞানের বাহিরে গেলেই তাঁহারা রূপকথার জগতে উপনীত হন। মনসামঙ্গলের ভাসান অংশে, লখীন্দরের সর্পবাসর অংশে গীতিকা ও ছড়ার লক্ষণ আছে, অন্যত্র প্রহেলিকা ধাঁধা ইত্যাদি লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য আছে। এতদ্ব্যতীত সপত্নীর বিদ্বেষ, শেষ সন্তানের সাফল্য, সতীত্ব পরীক্ষা, মৃত্যুর পর পুনর্জীবন এইগুলিও লোকসাহিত্যে পুনঃপুন দৃষ্ট হয়।

ইন্দ্রিয়গম্যতা

মনসামঙ্গলের মধ্যে শক্তির কাছে শিব পরাভূত, ইহা এক হিসাবে সত্য, অমঙ্গলের দেবী মঙ্গলকে এখানে চূর্ণ করিয়াছেন, এইরূপ সমালোচনাও মঙ্গলকাব্য সম্পর্কে করা হইয়াছে। বস্তুত মধ্যযুগের ধর্মভাবপূর্ণ শক্তিভীত মানুষের সমাজে এইরূপ হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ একস্থানে বিষয়টি ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন—

শিব ও শক্তি

"বাঙলার মঙ্গলকাব্যগুলির বিষয়টা হচ্ছে এক দেবতাকে তার সিংহাসন থেকে খেদিয়ে দিয়ে আরেক দেবতার অভ্যুদয়।…যেখানে ধর্মের হিসেব পাওয়া যায় না, সেখানে শিবের পরিচয় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। মানুষ যদি তখনো সমস্ত দুঃখ এবং পরাভবের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলতে পারে, আমি সব সহ্য করব তবু কিছুতেই একে দেবতা বলে মানতে পারব না, তা হলে মানুষের জিত হয়। চাঁদ সদাগর কিংবা ধনপতির বিদ্রোহের মধ্যে কিছুদূর পর্যন্ত মানুষের সেই শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। অবশেষে দুঃখের যখন চূড়ান্ত হল, তখন শিবকে সরিয়ে রেখে শক্তির কাছে আধমরা সদাগর মাথা হেঁট করল।… যে আত্মা অমর সে আপন প্রতিষ্ঠা থেকে নেমে এসে ভয়কে, মৃত্যুকে দেবতা বলে আপনার চেয়ে বড় বলে মানলে। এইখানেই শক্তির সকলের চেয়ে বড় পরিচয় পাওয়া গেল"। [বাতায়নিকের পত্র। কালান্তর]

রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য ও ব্যাখ্যা

কিন্তু তৎসত্ত্বেও দেবতার কাছে মনুষ্যত্ব ও পৌরুষের মস্তক অবনয়নের মধ্যে হীনবীর্য পুরুষের শেষ সমাধি রচিত হয় নাই। পরাজয়ের চরম ক্ষণেও

ভগ্নমেরু পুরুষ বামহস্তে দেবতার চরণে শুষ্ক পূজাপুষ্প নিবেদন করিয়াছেন, তাহা প্রসন্নপ্রদত্ত নয়। দেবী ইহা জানিয়াও কেবল তাহার দেবী মর্যাদার হানিকর অশোভন জিদ শেষ পর্যন্ত বজায় রাখিবার জন্য তাহাতেই শান্ত হইয়া কর্মান্তরে অথবা নিশ্চিন্তে স্থানান্তরে গিয়াছেন।

মনসা ও বেহুলা

একদিকে মানুষের নিকট ভক্তি আদায়ের জন্য দেবতার বিস্ময়কর শ্রম ও চতুরতা, অন্যদিকে অপদেবতার অত্যাচারের বিরুদ্ধে মঙ্গলের উপাসক মানুষের দার্ঢ্য ও অনমনীয় পৌরুষ, ইহাই মঙ্গলকাব্যের মানবিক আবেদন। বিশেষত সতীত্বে সাধ্বীত্বে নিদারুণ দুঃখের অসহনীয় অভিঘাতে পর্যুদস্ত হইয়া এই কাব্যের নায়িকা বাসর-ঘরের স্রকৃচন্দন সুসজ্জিত মৃত স্বামীকে যে অনমনীয় নিষ্ঠায় পুনর্জীবিত কবিযাছে তাহার কাছে মনসার চরিত্র ম্লান হইয়া গিয়াছে।

মৈথিল কবি বিদ্যাপতি ও বাঙলা সাহিত্য

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিদ্যাপতির নাম অপরিহার্যসূত্রে আসিয়া পড়ে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মিথিলার হিন্দু নরপতির আশ্রয়ে থাকিয়া সংস্কৃত অবহট্‌ঠ ও মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চা করিলেও সবকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকবি বিদ্যাপতি তাহার প্রতিভায় প্রতিবেশী বঙ্গদেশকে এক অভিনব ভাবকল্পনার প্রভাবে আন্দোলিত করিয়াছেন। বিদ্যাপতির মৈথিল ও ভগ্ন অবহট্‌ঠে রচিত রাধাকৃষ্ণ পদ বাঙলা বৈষ্ণব গীতিকবিতার ধারাকে অকস্মাৎ বেগবতী করিয়া তুলিয়াছে। রাধাকৃষ্ণের লোকায়ত দেহকামনাশ্রিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রেমকে বিদ্যাপতি তাঁহার দিব্য জ্যোতির্ময় প্রতিভা-প্রভাবে দেহকামনার ঊর্ধ্বে উন্নীত করিয়া নন্দনকাননের সামগ্রী করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই বাঙালী কবিরা সেই সংকেত অনুসরণ করিয়া কদম্বকাননে প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিকে নিখিল বিশ্বের মাধুর্যবিগ্রহ ভগবানের আহ্বানধ্বনিতে তর্জমা করিয়াছেন।

বাঙলা সাহিত্যে বিদ্যাপতির প্রভাব ও স্থান

বিদ্যাপতি বাঙলা দেশের কবি জয়দেবকেই মুখ্যত তাঁহার প্রেমগীতিকাচর্চার গুরুরূপে বরণ করিয়াছিলেন বলিয়া বাঙালী কবিরা বিদ্যাপতির মধ্য দিয়াই জয়দেবের কাব্যেব এক নূতন অলোকসামান্য তাৎপর্য

আবিষ্কার করিয়াছেন। বিলাস-কলাকুতূহলের দ্বারপ্রান্ত দিয়া জয়দেবের কাব্যে ভাববৃন্দাবনের যে হরিনামাঙ্কিত অন্দরমহলের দিকে বাঙালী সাধকের দৃষ্টি আক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা বিদ্যাপতিরই শিক্ষাপ্রভাবে। পঞ্চদশ শতাব্দীর বাঙলায় তুর্কী অধিকার প্রসৃত হওয়ায় হিন্দু সংস্কৃতি ও শিক্ষার কেন্দ্রগুলি উৎসন্ন হইয়াছিল বলিয়া বাঙালী শিক্ষার্থীরা প্রতিবেশী হিন্দুরাজ্যে বিদ্যা ধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতি চর্চায় যাত্রা করিতেন। এই সূত্রে মিথিলা ও বিহারে প্রচলিত বিদ্যাপতির সুললিত প্রেমসংগীতগুলি তাঁহারা দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় কণ্ঠলগ্ন করিয়া আনিতেন। তাহারই প্রেরণায় বাঙলা দেশে অনুরূপ গীতিকবিতাচর্চায় জোয়ার উপস্থিত হয় এবং বিদ্যাপতির মধুর কোমল-কান্ত-পদাবলীর ভাষার উপর ভিত্তি করিয়া বাঙলা আবহট্‌ঠ ও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার সংমিশ্রণে কবিদের অজ্ঞাতসারে স্বাভাবিকভাবেই এক নূতন দিব্যপ্রেমের কবিভাষার উদ্ভব হয়, যাহা ব্রজবুলি-নামে পরিচিত। করুণাবতীর্ণ প্রেমঘন শ্রীচৈতন্যদেব বিদ্যাপতির ব্রজলীলার পদগুলি নিবিষ্টচিত্তে আস্বাদন করিতেন এবং সেগুলির প্রাকৃত শুক্তি উন্মোচন করিয়া উহাদের অভ্যন্তরে অনন্ত প্রেমব্যাকুলতার দুর্লভ রত্নের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাহার ফলে বাঙলাদেশে বিদ্যাপতির সমাদর অভূতপূর্বরূপে প্রবর্ধিত হয় এবং প্রেমের কবি বিদ্যাপতি ভক্তসাধকের শ্রদ্ধানিবিড় দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণভক্তির আকাশে উজ্জ্বল শুকতারারূপে আবির্ভূত হন। ক্রমে বিদ্যাপতি শিবসিংহ হরিসিংহের শুভ্র মর্মরখচিত রাজসভা হইতে স্থানান্তরিত হইয়া ভক্তশ্রেষ্ঠ মহারাজরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। অসংখ্য বাঙালী পদকর্তা বিদ্যাপতির নামের পবিত্র তীর্থে আপনার ক্ষীণ-দীন মহৎ-ক্ষুদ্র কাব্যনৈবেদ্য নিঃশেষে নিবেদন করিয়াছেন। বিদ্যাপতির নামে এদেশে নানাবিধ সম্ভব-অসম্ভব জনশ্রুতি কিংবদন্তী গড়িয়া উঠিয়াছে, মিথিলার ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করিয়া বিদ্যাপতি বাঙলার মানস উপত্যকায় অমরতায় অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। এইজন্য বিদ্যাপতির নাম বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযুগীয় ইতিহাসে এক অপরিহার্য প্রসঙ্গ।

বিদ্যাপতির জনপ্রিয়তার লক্ষণ

বিদ্যাপতি একাধারে কবি ও আইনজ্ঞ, স্মার্ত নিবন্ধকার ও ঐতিহাসিক, ভূবৃত্তান্ত লেখক ও ধর্মকর্মের ব্যবস্থাদাতা, শিক্ষক ও কথাসাহিত্যিক ছিলেন। বিষ্ণুশর্মার মত গল্পের ভিতর দিয়া নীতি শিক্ষা দিবার জন্য তিনি 'পুরুষ

পরীক্ষা' রচনা করেন। তাঁহার সংস্কৃত "লিখনাবলী" যাহাকে বলে model letter-writing, 'কীর্তিলতা' 'কীর্তিপতাকা'র মত ঐতিহাসিক উপন্যাস অবহট্‌ঠে কম লেখা হইয়াছে। স্মৃতি-শাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও বিশ্লেষণী বুদ্ধির পরিচয় নিহিত আছে 'শৈবসর্বস্বসার', 'দান বাক্যাবলী 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' প্রভৃতি গ্রন্থে। 'বিভাগসার' তাঁহার আইনজ্ঞানের পরিচয় দেয়। 'ভূপরিক্রমা' গ্রন্থে মিথিলা হইতে নৈমিষারণ্য পর্যন্ত ভূভাগের তীর্থ বিবরণ আছে। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার ব্যুৎপত্তি, অবহট্‌ঠ ভাষায় সুললিত কাব্য রচনায় অনায়াসদক্ষতা লাভ এবং মাতৃভাষা মৈথিলে গীতসৃষ্টির স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষমতা বিদ্যাপতিকে মধ্যযুগের এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বে পরিণত করিয়াছে।

বিদ্যাপতির বহুমুখী প্রতিভা

বাঙলা দেশেই বিদ্যাপতির পদ সর্বাধিক পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং বাঙলা দেশেই বিদ্যাপতির গুণগ্রাহিতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং বাঙালী কবিরাই তাঁহাকে নির্বিচারে অনুসরণ করিয়াছেন। ফলে পরবর্তীকালে বিদ্যাপতি-পদের অকৃত্রিমত্ব নির্ণয়ে গভীর সংশয় দেখা দিয়াছে। তবে বিদ্যাপতির অনুকারী কবিবৃন্দ প্রায় সকলেই চৈতন্যোত্তর যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ফলে তাঁহাদের রচনায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ও দর্শনের প্রভাব কিছু পরিমাণে দেখা যায়। বিদ্যাপতির পদে সখীর ভূমিকা চৈতন্যোত্তর যুগের মত নয়, ভণিতাও পরবর্তী কবিদের তুলনায় ঈষৎ অন্যরূপ।

বিদ্যাপতির চৈতন্য পূর্বত্ব

বিদ্যাপতি প্রেমের কবি, সৌন্দর্যের কবি, তবে দীর্ঘায়ু জীবনে অসংখ্য পদরচনায় তাঁহার প্রেমভাবনা ও সৌন্দর্যচেতনায় একটি ক্রমপরিণতির ভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার জীবনীকার ও পদসংগ্রাহকগণ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে বিদ্যাপতির ভিন্ন বয়সের পদ নিরূপণে আংশিক সাফল্য লাভ করিয়াছেন, তেমনি তাঁহার কবিধর্মের মধ্যে একটি মানস অভিব্যক্তির স্তরপরম্পরাও লক্ষ্য করিয়াছেন। এই বিবর্তন প্রেম হইতে ভক্তিতে, দেহকামনা হইতে অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে, স্থূল প্রাকৃত জীবন চেতনা হইতে অপ্রাকৃত প্রেমের স্বর্গীয় ঐশ্বর্যে। যৌবনের মদির আনন্দে বয়ঃসন্ধির লীলায়িত বর্ণনা, বসন্তের বর্ণসমারোহে প্রণয়ের প্রগলভ চাঞ্চল্য, মদির সুধামুখীর চকিত কটাক্ষ—এইগুলির প্রতি আকর্ষণ

বিদ্যাপতির কবিধর্মের বিবর্তন

যৌবনের ধর্ম। কিন্তু পরিণত বয়সে যৌবনের তারল্য যখন প্রগাঢ়তা লাভ করিয়াছে, জোয়ারের উচ্ছ্বাস যখন স্তিমিত হইয়াছে তখন বিরহ বেদনার অন্তহীন গভীরতায় পূর্ববর্তী প্রেমের সকল অস্থির লীলাবিভ্রম ও বিলোল কটাক্ষ অপসারিত হইয়া গিয়াছে। মিলনের কবি তখন মাথুরের কবি হইয়া পড়িয়াছেন। তখন উদ্বেল বসন্তের পুষ্পসমারোহকে আচ্ছন্ন করিয়া বর্ষার নিবিড় বাদলসমারোহ নায়িকার হৃদয়মন্দিরের ছবিবিহীন নিঃসীম শূন্যতাকে দুঃসহ করিয়া তুলিয়াছে।

বিদ্যাপতি সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা এই যে, তিনি সুখের কথায় বড়, দুঃখের কথায় নয়। একথা সত্য, বিদ্যাপতির বিপুলায়তন রচনায় শৃঙ্গার ও রূপৈশ্বর্য, মিলনোল্লাস ও দেহকান্তি বর্ণনা, প্রেমের মাদকতাপূর্ণ আকর্ষণ ও নারীর অস্থির প্রণয়চাতুরী প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু সার্বভৌম বিরহ বেদনা সঙ্গীতে, দূর-দুর্গম দুঃখপথে কঠিন অভিসার রচনাতেও সমগ্র মধ্যযুগে তাঁহার সমকক্ষতা কম ছিল। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাপতি এক অসামান্য তুলনারহিত কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন। প্রতিভার পূর্বার্জিত সংস্কারে প্রেমকে তিনি দেহসীমা হইতে উদ্বর্তিত (Sublimated) করিয়া দিয়াছিলেন। বৈষ্ণব কাব্যসমালোচক শ্রীকালিদাস রায়ের ভাষায়—

বিদ্যাপতির প্রেমের স্বরূপ

ইহা mystic appeal না হইতে পারে কিন্তু ইহার transcendental ও universal appealকেও উপেক্ষা করা যায় না" [প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য]।

বিদ্যাপতি প্রধানত সৌন্দর্যের শাস্ত্রীয় কবি। প্রেম অপেক্ষা প্রেমিক-প্রেমিকার রূপ বর্ণনার ভাষায় তিনি কৃপণতা করেন নাই। তাঁহার সৌন্দর্য-সন্ধানী দৃষ্টি বিশ্বের সৌন্দর্যলোক হইতে নির্যাস আহরণ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতি সম্পর্কে একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন—

"বিদ্যাপতির রাধা অল্পে অল্পে মুকুলিত ও বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। সৌন্দর্যে ঢল ঢল করিতেছে।…বিদ্যাপতির রাধা নবীনা নবস্ফুটা।… দূরে সহাস্যে সতৃষ্ণ লীলাময়ী, নিকটে কম্পিতা শঙ্কিতা বিহ্বলা।…সদ্যোবিকচ হৃদয় সহসা আপনার সৌরভ আপনি অনুভব করিতেছে।…এখনো প্রেমে বেদনা অপেক্ষা বিলাস বেশি।"

বিদ্যাপতির রাধা

শেষ পর্যন্ত বিদ্যাপতির রাধা সম্পর্কে এই মন্তব্য সত্য নয়। বিদ্যাপতির রাধা প্রেমসূত্রের অতলস্পর্শী গভীরতায় অবগাহন করিয়াছে।

বিদ্যাপতি মিথিলার রাজবংশে সভাকবি রূপে বিভিন্ন নরপতির আশ্রয়ে সুদীর্ঘকাল অসংখ্য পদ রচনা করিয়াছিলেন। তাহার প্রথম জীবনের পদগুলিতে যে সকল রাজনামচিহ্ন আছে সেইগুলিই পদের আনুমানিক রচনাকালের পরিচয়। শিবসিংহের নামাঙ্কিত পদে বয়ঃসন্ধির সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ, যৌবনাগমের নিপুণ সৌন্দর্যসন্ধানী বিশ্লেষণ লক্ষ্য করা যায়। রাধার শরীরে কৈশোর ও যৌবনের সীমারেখাটির অতর্কিত বিলোপ ও যৌবনাভ্যুদয়ের ধীরসঞ্চারী রহস্যময় পদবিক্ষেপটিকে কবি অসংখ্য পদে মুগ্ধসৌন্দর্যে নিরীক্ষণ করিয়াছেন। এমন কি আজ ও গতকালের দেখায় যে লক্ষণীয় পার্থক্য আছে রূপসন্ধানী কবির কাছে তাহা অগোচর নাই। জোয়ারের উদ্দাম কলোচ্ছ্বাসের মত যৌবন যেন একরাত্রেই অসহায় শৈশবকে আক্রান্ত ও পরাস্ত করিয়া আপনার বিজয়ী পতাকা উহার উপর প্রোথিত করিয়া দিয়াছে। বিশ্বের অলংকার মন্থন করিয়া কবি তাঁহার সোনার প্রতিমাকে প্রসাধিত করিয়াছেন। বাস্তব-কল্পনায় মেশানো এই তনুশ্রীকে শোভন-সজ্জায় সাজাইবার জন্যে জীবন ও গ্রন্থ উভয় ভাণ্ডার শূন্য হইয়া গেছে, কিন্তু কবির বিস্ময় শেষ হয় নাই।

সৌন্দর্য ও যৌবনের কবি

প্রধানত লৌকিক অলংকার শাস্ত্র এবং প্রেমের স্বাভাবিক জীবনসূত্র অবলম্বন করিয়া বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের যে পর্যায়গুলি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাই চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব কবিরা নির্বিচারে আত্মসাৎ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের দার্শনিক তত্ত্বানুসারে কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধিকা অনন্ত-যৌবনা, তাঁহার কৈশোর বা প্রৌঢ়ত্ব নাই, সুতরাং পরবর্তী কবিরা বিদ্যাপতি-বর্ণিত বয়ঃসন্ধি বর্জন করিয়াছেন। তথাপি তাঁহারা ইহারই প্রভাবে প্রেমাবতার রাধাভাবিত লাবণ্যতনু গৌরাঙ্গ-সুন্দর চৈতন্যদেবের বয়ঃসন্ধি বর্ণনা করিয়াছেন। এখানেও বিদ্যাপতির প্রভাবই নিঃসংশয়িতভাবে কার্যকরী হইয়াছে। ইহা ছাড়া নারীর স্নানবর্ণনা, জলের ঘাটে সদ্যস্নাতা সিক্তবসনা শীকরদীপ্তচিকুরা রাধার সহিত রূপতৃষ্ণ কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার, প্রেমের অতৃপ্ত অন্তহীন আক্ষেপানুরাগ-উপলব্ধি, ঘন

গৌড়ীয় বৈষ্ণব কাব্যের উপর বিদ্যাপতির প্রভাব

দুর্যোগময়ী পটভূমিকায় রাধার দুরন্ত দুঃসাহসিক অভিসার, বর্ষণ মুখরিত শ্রাবণ সন্ধ্যায় বিরহিণী রাধার আকুল ক্রন্দন—এই সকল বিষয় বৈষ্ণব কবিরা বিদ্যাপতির নিকট হইতেই উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছেন। মানের বৈচিত্র্যসৃষ্টিও বিদ্যাপতিরই কৃতিত্ব, এক্ষেত্রেও অনেক চৈতন্য কবিরা বিদ্যাপতির নিকট অধমর্ণ।

বিদ্যাপতি বৈষ্ণব ছিলেন না, সুতরাং বৈষ্ণবীয় ভাবধারার আভ্যন্তরীণ প্রেরণা তাঁহার মধ্যে ছিল না। রাজসভার পরিবেশে বর্ধিত, রাজকীয় বৈদগ্ধ্যে পরিশীলিত, রস অলংকার ও কামশাস্ত্রে সুঅধীতী কবি সভাসদ ও রাজন্যবর্গের মনোরঞ্জনের জন্যই হয়ত কাব্যচর্চা করিয়াছিলেন। ফলত তাঁহার কাব্যে ব্যক্তি-জীবনের প্রেরণা থাকাও বিচিত্র নয়। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের নামে এই প্রেম-কবিতাগুলিকে নিবেদিত করার পশ্চাতে তিনটি কারণ অনুমেয়। প্রথমত, সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগে, এমন কি, জয়দেবেরও পর হইতে সাধারণভাবে প্রেমকবিতা রচনার মুখ্য অবলম্বন ছিল রাধামাধব গোপীকানাই। দীর্ঘকাল যাবৎ রাধাকৃষ্ণের নিষিদ্ধ সমাজ-বন্ধন-বিরোধী প্রেমকথার লৌকিক জনপ্রিয়তাই হয়ত ইহার মূলে ছিল। দ্বিতীয়ত, প্রেমকবিতা রচনার জন্য প্রেমের তীব্রতায় আরও অন্তরঙ্গ আবেগ ও গভীরতা সঞ্চার করিবার জন্য সেইসময় সমগ্র মধ্যযুগে সেইগুলি দেবদেবীর বকলমে লেখা হইত। তৃতীয়ত, বিদ্যাপতির কুলদেবতা ছিলেন হরপার্বতী। কিন্তু হরপার্বতীর প্রেমে রোমান্টিকতার অবকাশ অপেক্ষাকৃত কম। সেই দিক দিয়া পরকীয় নিষিদ্ধমধুর যৌবনচঞ্চল প্রেমের উপযুক্ত নায়ক নায়িকা হিসাবে রাধাকৃষ্ণের নাম উত্তরাধিকার সূত্রে আরও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

রাজসভার কবি বিদ্যাপতি

রাধাকৃষ্ণের প্রেমের লৌকিক ঐতিহ্য

অভিসার পদে বিদ্যাপতির কৃতিত্বকে চৈতন্যোত্তর কবিরাও ম্লান করিতে পারেন নাই। বিদ্যাপতির অভিসার পদেই রাত্রির বিপদসংকুল পরিবেশে রাধার দুর্দমনীয় পথ-চলার ভিতর সূক্ষ্ম অধ্যাত্মব্যঞ্জনা আরোপিত হইয়াছে। ভাষাবিজ্ঞানী গ্রীয়ার্সনের মতে এইগুলিতে first yearnings of the soul after God প্রকাশ পাইয়াছে। অভিসারের পূর্বপ্রস্তুতি ও কৃচ্ছ্রসাধনায়,

অভিসার পদের আধ্যাত্মিকতা

অঙ্গসজ্জায় ও গুরুজনের নিষেধ এড়াইবার কঠিন চেষ্টায় রাধা তমসাবৃত পঙ্কিল সর্পাকুল পথে বাহির হইয়াছে, কেবল অন্তরের প্রেমপ্রদীপের আলোকশিখায় উদ্ভাসিত হইয়া। ইহা কেবল লৌকিক প্রেমের আকর্ষণে সম্ভব নয়। সুতরাং এই কারণেই রসজ্ঞ বোদ্ধা শ্রীচৈতন্যদেব বিদ্যাপতির পদে গূঢ়তর অধ্যাত্মব্যঞ্জনা লাভ করিয়াছিলেন।

বসন্তের বর্ণনায় কবি যেমন রূপবিহ্বলতা ও সৌন্দর্যসম্ভোগ স্পৃহা উজাড় করিয়া দিয়াছেন। তেমনি বিরহপদে কবির রসগাঢ়তার ও ঘন অনুভূতির তীব্রতার পরিচয় আছে। একদিকে আতপ্ত মিলনোৎকণ্ঠা, অন্যদিকে বিরহের দিগন্তবিদীর্ণ আকুলায়িত ক্রন্দন, উভয়কেই কবি স্পর্শ করিয়াছিলেন। অপূর্ব এই প্রেম, যেমন স্নেহ তেমনি বিরহ—

প্রেমের নূতন ব্যঞ্জনা

> ভণই বিদ্যাপতি অপরূপ নেহ।
> জেহন বিরহ হো তেহন সিনেহ॥

এই অপরূপ প্রেমেরই কবি বিদ্যাপতি।

বিদ্যাপতি মৈথিল কবি, চণ্ডীদাস বাঙালী কবি, কিন্তু বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযুগে এই দুই কবির বৈষ্ণবপ্রাণতা, রাধাকৃষ্ণের প্রেমমন্দিরে এই দুই কবির নৈবেদ্য-অর্পণ অবিস্মরণীয় হইয়া আছে। বিদ্যাপতি ব্যক্তিগত জীবনে শৈব ছিলেন, কিন্তু যুগের এক অনিবার্য প্রেরণায় এবং মানসিক ভক্তি বিহ্বলতায় পরম মাধুর্যময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার বৈচিত্র্য তাঁহার রচনায় স্ফুরিত হইয়াছে। চণ্ডীদাস সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অস্পষ্ট ও নানাবিধ সমস্যাজড়িত। তথাপি পদকর্তা হিসাবে যে চণ্ডীদাসের নাম মোটামুটি একটি স্থির প্রত্যয়ভূমিতে স্থাপিত সেই চণ্ডীদাস প্রাকচৈতন্যযুগেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা হয়। তিনি বাশুলী বাসলী বা বাগেশ্বরীর উপাসক ছিলেন এবং তাঁহার ভাববিদ্ধ জীবনের সকল সাধনা ও সারস্বত সিদ্ধি প্রেমধন কৃষ্ণের চরণে দান করিয়াছেন।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস

বিদ্যাপতি অজস্র বিষয়ের রচয়িতা এবং তাঁহার পদসংখ্যাও বিস্ময়কর সমৃদ্ধ হইলেও কেবল রাধাকৃষ্ণের প্রেমপ্রসঙ্গে তাঁহার অসংখ্য পদ মিথিলা ও বাঙলা দেশে ব্যাপক জনসমাদর লাভ করিয়াছিল এবং বাঙলা দেশের ভাবালু চিত্তে

রোমান্টিক কবিতার ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিল। চৈতন্য-আবির্ভাবের পর আংশিক বিদ্যাপতির পদের অনুসরণে এবং তৎসহ পূর্বাগত সংস্কৃত-প্রাকৃত প্রেমকবিতার ঐতিহ্যে বাঙলা ভাষায় সুবৃহৎ বৈষ্ণব গীতিকবিতা গড়িয়া উঠিয়াছে। অবহট্‌ঠ ও মৈথিলের ভগ্নভিত্তির উপর ব্রজবুলি নামক একটি কৃত্রিম কাব্যভাষার বহুরত্নকক্ষ সৌধ নির্মাণে বাঙালী কবিশিল্পীরা যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহার প্রেরণারূপেও বিদ্যাপতি চিরস্মর্তব্য। বিদ্যাপতি লৌকিক প্রেমকেই হয়ত রাধামাধবের নামে সমর্পিত করিয়াছেন। লোকায়ত প্রণয়-তৃষ্ণা তাঁহার কাব্যের পশ্চাতে অন্তর্ভূত হয়, কিন্তু তাহা অচিরেই ঈশ্বরাভিমুখী হইতে পারিয়াছে।

পক্ষান্তরে চণ্ডীদাসের পদ-ব্যতিরিক্ত অন্যান্য সৃষ্টি না থাকিলেও পদসংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়। তিনি বাঙলা ভাষাতেই তাঁহার পদাবলী নির্মাণ করিয়াছেন। ব্রজবুলি পদ একটিও লেখেন নাই। আবার তাঁহার ভাষায় এমন একটি অনলংকৃত নিরাভরণ স্বাভাবিক সরল অকৃত্রিমত্ব আছে যাহা বিদ্যাপতির পদে মেলে না। এইজন্য পরবর্তী বৈষ্ণব কবিতায় বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাস দুইজনে দুই স্বতন্ত্র কাব্যরূপের স্রষ্টা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন।

প্রাক্‌চৈতন্যযুগের কবি বলিয়া বিদ্যাপতি অথবা চণ্ডীদাস কাহারও নামে গৌরলীলার পদ পাওয়া যায় না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত ও বিশ্বাস, তত্ত্ব ও দার্শনিকতা হইতে দুইজনেই মুক্ত ছিলেন। চণ্ডীদাস সম্পর্কে জনশ্রুতি এই যে তিনি লৌকিক নারীর প্রেমকেই ভগবৎ অভিমুখী করিয়া তুলিয়াছিলেন।

বিদ্যাপতির রাধা অল্পে অল্পে মুকুলিত হইয়াছেন, চণ্ডীদাসের রাধার জন্ম হইতেই যোগিনী, কৃষ্ণের নাম শ্রবণেই তাঁহার অঙ্গে গৈরিক বাস চণ্ডীদাসের রাধার বয়ঃসন্ধির চিত্র নাই। বিদ্যাপতির রাধা বিদগ্ধা কলারসিকা চতুরা নাগরিকা, প্রগল্‌ভা ও বিলাসকুতূহলী। চণ্ডীদাসের রাধা স্বল্পবাচী, তাপসিনী সরলা ভীরু। তিনি আক্ষেপানুরাগের নায়িকা, অভিসারিকা নন। বিদ্যাপতির কৃষ্ণ বিদগ্ধ কলানায়ক, চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ 'জলদবরণ কানু দলিত অঞ্জনতনু'।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"বিদ্যাপতির প্রেমে যৌবনের নবীনতা, চণ্ডীদাসের প্রেমে অধিক বয়সের প্রগাঢ়তা আছে। চণ্ডীদাস গম্ভীর এবং ব্যাকুল, বিদ্যাপতি নবীন এবং মধুর।"

প্রেমের বিচিত্র প্রকার ভেদে, মিলনোল্লাস রসোদ্গারে বিদ্যাপতি প্রথম শ্রেণীর কবি ; চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠত্ব অনুরূপভাবে বিরহের অনুভূতি-সৃজনে। মানের পদে বিদ্যাপতির নায়িকা কুটিল কটাক্ষে প্রণয়ীর কাতর অনুনয় প্রার্থনা উপভোগ করেন, চণ্ডীদাসের রাধিকা বঞ্চনার গভীর বাস্তব নৈরাশ্যে অভিশাপ দেন, 'আমার পরাণ যেমতি করিছে তেমতি হউক সে'। বিরহ পদে বিদ্যাপতি লোকায়ত জীবনের প্রেমকে দেবমার্গে উন্নীত করিয়াছেন, কিন্তু চণ্ডীদাসের বিরহপদ সেই তুলনায় অনুল্লেখযোগ্য।

মোটের উপর বিদ্যাপতি রাজসভার কবি, সুবুদ্ধিবিলাস ও ঐতিহ্যচেতন, আলংকারিক ও রূপনিষ্ঠ। চণ্ডীদাস জনসভার কবি, ভাববিদ্ধ ও ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত নিবিড় প্রেমে আত্মাবগাঢ়। ভাবোল্লাসের পদে বিদ্যাপতির 'আজু রজনী হাম ভাগে গমাযলুঁ'র পাশে চণ্ডীদাসের 'বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে' নিষ্প্রভ মনে হয়। কিন্তু আপেক্ষানুরাগে ও প্রেমবৈচিত্ত্যে চণ্ডীদাস শ্রেষ্ঠ। বিদ্যাপতির রাধা নায়িকা, চণ্ডীদাসের নায়িকা ভক্ত। কারণ বিদ্যাপতি কবি, চণ্ডীদাস সাধক-কবি।

চৈতন্যপর যুগের বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে বিদ্যাপতিকে সচেতনভাবে অনুসরণ করিয়াছিলেন গোবিন্দদাস কবিরাজ। ইনিও রসশাস্ত্র অলংকারকে রাধা-কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার কাজে সুনিপুণভাবে ব্যবহার করিয়াছেন, ইনিও সৌন্দর্য-বিলাস, বৈদগ্ধ্য, আলংকারিকতা, ভাষা ও ছন্দের ঋজুকাঠামো গ্রহণ করিয়া-ছিলেন, এমন কি ইনি ব্রজবুলি ব্যতীত সম্ভবত বাঙলা ভাষায় পদই রচনা করেন নাই। তবে গোবিন্দদাস ভক্ত কবি এবং গৌড়ীয় দর্শনের নিষ্ঠাবান অনুসারক বলিয়া তাঁহার প্রেমের পশ্চাতে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ বিদ্যমান। বিদ্যাপতির রাধা অনেকক্ষেত্রে লৌকিক জগতের ধনীকন্যা অথবা সুবদনী নারী, গোবিন্দ-দাসের রাধা সর্বদাই তত্ত্বময়ী নারী—কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি এবং বিশেষভাবে শ্রীচৈতন্যদেবের ভাববিগ্রহ। অভিসারের পদে বৈচিত্র্য সৃষ্টি এবং তত্ত্বগভীরতার আরোপে তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই, কিন্তু এ ব্যাপারেও বিদ্যাপতিই তাঁহার গুরুজন। এমন কি বৈষ্ণব কবিতার রসজ্ঞ সমালোচক সতীশচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন—

"বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও রচনার লালিত্যে ছন্দের

ঝঙ্কারে এবং অনুপ্রাস শ্লেষাদি নানাবিধ বিচিত্র অলংকার প্রয়োগের নৈপুণ্যে গোবিন্দদাস বিদ্যাপতিকে পরাস্ত করিয়াছেন। বিদ্যাপতির রচনা অনেকাংশ কালিদাসের রচনার ন্যায়, গোবিন্দদাস কবিরাজের রচনা মাঘ বা শ্রীহর্ষের রচনার ন্যায়।"

ইহা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও গোবিন্দদাস যথার্থ বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য।

কবিতা পাঠ

শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী : দ্বিজ চণ্ডীদাস

ভূমিকা

মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি পদকর্তা চণ্ডীদাস দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণিতায় যে-সকল রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ লিখিয়াছেন, তাহা হইতেই 'শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী' পদটি উদ্ধৃত হইয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে দুইজন চণ্ডীদাসের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল বলিয়া ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন, একজন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস, আর একজন খণ্ড পদাবলীর কবি দ্বিজ চণ্ডীদাস [ঐতিহাসিক আলোচনা দ্রষ্টব্য]।

কবি পরিচয়

বড়ু চণ্ডীদাস লোকপুরাণ অবলম্বনে নাটগীতের আঙ্গিকে রাধাকৃষ্ণের পালা লিখিয়াছেন, কয়েকটি খণ্ড বা অধ্যায়ে, কাহিনী সূত্রে, নাটকীয়তা ও গীতিপ্রাণতার যুগপৎ সম্মিলনে তাহা মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি। আর পদকর্তা চণ্ডীদাস প্রেমের ভাবপর্যায় অনুসারে কেবল গীতিময় পদ লিখিয়াছেন। বড়ু চণ্ডীদাস এক হিসাবে জয়দেবকে এবং পদকর্তা চণ্ডীদাস বিদ্যাপতিকে কাব্যের আকার-আয়তনের দিক দিয়া অনুসরণ করিয়াছেন। দুজনে প্রায় একই কালের কবি হইলেও উভয়ের কাব্যপ্রণালীর মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য আছে।

বড়ু চণ্ডীদাস ও দ্বিজ চণ্ডীদাস

দ্বিজ শব্দ ব্রাহ্মণ্যত্ব-নির্দেশক। জন্মের পর উপবীত-গ্রহণরূপ সংস্কার হয়; বলিয়া ব্রাহ্মণকে দ্বিজ বলা হয়। চণ্ডীদাস ব্রাহ্মণরূপেই আপনার পরিচয় নির্দেশ করিয়াছেন, যদিও চণ্ডীদাস শব্দের শেষ দুই অক্ষর শূদ্রত্বের উপাধি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এখানে চণ্ডীর সেবক বা অনুগত এই অর্থে দাস শব্দটিকে গ্রহণ করিতে হইবে। চণ্ডীদাস কবির আসল নাম নাও হইতে পারে। দ্বিজ শব্দের দ্বারাই তিনি হয়ত বিশিষ্টরূপে তাঁহার জাতিত্ব নির্দেশ করিয়াছেন।

কবিনাম ব্যাখ্যা

ভণিতায় দ্বিজ ব্যবহারের কারণ

চণ্ডীদাসের জীবন-কাহিনী সম্পর্কে যে সকল কিংবদন্তী ও জনশ্রুতি আছে, তাহাতে দেখা যায় তিনি ব্রাহ্মণ ও বাসলীর পুরোহিত ছিলেন, কিন্তু অস্পৃশ্যা শূদ্রাণীর সহিত প্রণয়াসক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া সমাজের কোপে পতিত হইয়াছিলেন। ইহা সত্য হইলে হয়ত কাব্যরচনায় এই কারণেই চণ্ডীদাস দ্বিজ শব্দের দ্বারা আপনার বংশগত শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান প্রকাশ করিয়াছেন। রামপ্রসাদ বৈদ্য হওয়া সত্ত্বেও দ্বিজ ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন। চণ্ডীদাস নামের পূর্বে বাঙলা সাহিত্যে দ্বিজ দীন বড়ু প্রভৃতি বিভিন্ন শব্দ পাওয়া গিয়াছে। মহাভারতের উদ্যোগপর্বের পঞ্চম অধ্যায়ে দ্রুপদ বলিয়াছেন—

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নরেষ্বপি দ্বিজাতয়ঃ॥

"ভূতসমূহের মধ্যে প্রাণী শ্রেষ্ঠ, প্রাণীর মধ্যে বুদ্ধিজীবী, বুদ্ধিজীবীদের ভিতর নর এবং মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেন ব্রাহ্মণগণ।"

আলোচ্য কবিতাটির বিষয় কুলবধূ শ্রীরাধিকার নিকট কদম্ব-কুঞ্জ হইতে নিনাদিত প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি এবং তজ্জনিত গৃহবন্ধা অথচ কৃষ্ণসমর্পিতপ্রাণা নায়িকার আক্ষেপ। পদটির বিষয়বস্তু বিচার করিলে ইহাকে প্রচলিত বৈষ্ণব পদাবলীর পূর্বরাগের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

কবিতার বিষয়

মিলনের পূর্বে নায়ক-নায়িকার পরস্পরের দর্শন অথবা শ্রবণের দ্বারা পুলকানুভূতি, রূপবিহ্বলতা ও অনুরাগ সঞ্চারকেই পূর্বরাগ বলে। পূর্বরাগ দুই প্রকার, দর্শনজাত এবং শ্রবণ-সঞ্জাত। দর্শনজাত পূর্বরাগ সাক্ষাৎ দর্শন, চিত্রপট-দর্শন অথবা স্বপ্নদর্শন হইতে

পূর্বরাগের সংজ্ঞা

উপজাত হইতে পারে। আবার শ্রবণজাত পূর্বরাগের উপলক্ষ সখী, দূত, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বা গায়ক মুখে শ্রবণ অথবা বংশীধ্বনি শ্রবণ হইতে পারে। আলোচ্য পদটিতে বংশীধ্বনি শ্রবণের দ্বারাই নায়িকার চিত্তে পূর্বরাগের সঞ্চার হইয়াছে।

পূর্বরাগের কবি চণ্ডীদাস

দ্বিজ চণ্ডীদাস পূর্বরাগ পর্যায়ে আরও কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পদ রচনা করিয়াছেন। 'সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম' 'রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা' এই দুইটি সুপরিচিত পদের প্রথমটিতে নাম-শ্রবণে রাধার পূর্বরাগ-সংস্কার এবং তজ্জনিত লালসা-উদ্বেগ-বৈয়গ্র্য প্রভৃতি দশ দশার বর্ণনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পদটিতেও কবি সখীর মুখ দিয়া রাধার পূর্বরাগ-বঞ্চিত হৃদয়ের ঔদাসীন্য ও কৃষ্ণকাতরতার অবস্থা বিবৃত করিয়াছেন। 'ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার' পদে রাধার অন্তঃপুর-লাঞ্ছিত জীবনে কৃষ্ণপ্রেমজনিত বিহ্বলতার এক অনবদ্য রেখাচিত্র আছে। তবে চণ্ডীদাসের পূর্বরাগ প্রচলিত বৈষ্ণব কবির পূর্বরাগ অপেক্ষা স্বতন্ত্র। পূর্বরাগ অনুরাগের প্রথম স্তর, কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধা নাম-শ্রবণে অথবা বংশীধ্বনি-শ্রবণেই কৃষ্ণের জন্য এমন উদ্বিগ্ন-ব্যাকুলা হইয়া পড়েন যে মনে হয় তিনি জন্ম হইতেই কৃষ্ণ-অন্তঃপ্রাণা। চণ্ডীদাস রাধার এই ব্যগ্র মাধবমুখিতার লক্ষণ দেখিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন,

চণ্ডীদাসের রাধার ভক্ত লক্ষণ

নাম পরতাপে যার ঐছন করল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।

নামের জোরেই যাহার এই অবস্থা, অঙ্গস্পর্শে না জানি তাহার কী দশা হইবে। চণ্ডীদাসের রাধা বংশীধ্বনি শুনিয়া আহারে বিরতি দেন, ভূষণ খসাইয়া ফেলেন, যোগিনীবেশ ধারণ করিয়া গৃহ আর প্রাঙ্গণে উদ্বেগকাতর দীর্ঘশ্বাসে ঘুরিয়া বেড়ান। ইহা প্রথম প্রেমের মুগ্ধা নায়িকার লক্ষণ নয়, পদাবলীতে ইহা প্রেমতন্ময় প্রগাঢ় অনুরাগিণী নায়িকার লক্ষণ। এই কারণেই চণ্ডীদাসের রাধার প্রেমে সহজেই ঈশ্বরে আত্মনিবেদিতা ভক্তের লক্ষণ লক্ষ্য করা যায়। এইখানেই চণ্ডীদাসের সহিত অন্যান্য বৈষ্ণব কবির পার্থক্য।

ভাবার্থ

শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া গৃহে অন্তরীণ রাধা সখীর প্রতি অনুযোগ-সহকারে বলিতেছেন, অবলা কুলবধূ রাধার নিকট কৃষ্ণের বাঁশী গরলসদৃশ, তাহা মদির আকর্ষণের ছদ্মবেশে বন্দিনী জীবনকে ব্যাকুলবিষে আচ্ছন্ন করে অথচ তাহা প্রকাশ করিবার উপায় নাই বলিয়া অন্তরে গুমরাইয়া দেহ বিদ্ধ করিতে থাকে। সর্পদংশনের মত এই বাঁশী কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া চেতনা আচ্ছন্ন করিয়াছে, প্রাণ অবশ করিয়াছে। ইহার নিষ্ঠুর অপ্রতিরোধনীয় আকর্ষণ কোনো অনুনয়, কুলাবরোধ, সংসারযাতনা স্বীকার করে না। তাই অভিমানে ক্ষুব্ধ হইয়া রাধা এই বংশীর নিন্দা করিয়া বলিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ বঙ্কিম, তাঁহার বাঁশীও তাই সরলতা ত্যাগ করিয়া বক্রতা শিক্ষা করিয়াছে, কারণ সঙ্গদোষে শশীও কলঙ্কিত হয়।

পদের বিশ্লেষণ

আলোচনা

বৈষ্ণব কাব্যসাহিত্যে দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদাবলী সারল্যে, অকৃত্রিমতায়, সৌন্দর্যে ও গভীরতায় চিরকাল পাঠককে মুগ্ধ করিয়াছে। চণ্ডীদাস রূপবিভোর নন, ভাবতন্ময় কবি-রূপেই প্রসিদ্ধ। তাঁহার কবিতায় আধুনিক যুগের ব্যক্তিত্বপ্রধান গীতিকবিতার মূর্ছনা আছে, অর্থাৎ এক হিসাবে তাহা যেন রাধার কণ্ঠে কবিরই কথা। আক্ষেপানুরাগ ও আত্মনিবেদন, ব্যাকুলতা ও সর্বস্ব ত্যাগের নিত্যবেদনায় তাহা সম্প্রদায়-বিশেষের সীমা উত্তীর্ণ হইয়া যায়। এইজন্য তাহা রোমান্টিকতা হইতে মিষ্টিকতায়, সৌন্দর্য হইতে রহস্যে, যুক্তি হইতে ভক্তিতে যাত্রা করে। তিনি আত্মবিস্মৃত আবেগে কৃষ্ণের নামে দেহ-মনআদি সমর্পণ করিয়া বসিয়াছেন। তিনি অলংকারে-উপমায়-ভাষায় তাঁহার কাব্য-দেহ প্রসাধিত করেন না। নিরাভরণ বাক্‌ভঙ্গি ও হৃদয়ের স্বতোৎসারিত আবেগ তাঁহার কবিতার স্বভাবসৌন্দর্য। আলোচ্য পদেও সেই লক্ষণগুলি বিদ্যমান।

আলোচনা ও কাব্য সৌন্দর্য

আলোচ্য কবিতার বিষয়বস্তু শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী হইলেও প্রকারান্তরে ইহা বংশীধ্বনির উৎস শ্রীকৃষ্ণবদন তথা লাবণ্যসুন্দর মধুররসের বিগ্রহ নরবপু ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই বন্দনা। ইহা ব্যাজস্তুতি, নিন্দাচ্ছলে প্রশংসা। শ্রীকৃষ্ণ যমুনাকুঞ্জে

কেলিকদম্বে বংশীধ্বনি করেন, ইহা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের মর্মমূলে গিয়া প্রবেশ করে, যেখানে যত অভাগিনী প্রেমবিরহিতা ভক্তিপ্রাণা নারী আছে, তাহাদের তৃষিত অন্তরে কৃষ্ণের প্রতি এক দুরন্ত অনিবার্য আকর্ষণ জাগাইয়া তোলে। ভক্তিশাস্ত্রে ইহাকে বলা হইয়াছে ঈশ্বরের আহ্বান-সংকেত। শ্রীমদ্‌ভাগবতেও শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির কথা আছে [মাধুকরী-সংকলনের মালাধর বসু রচিত শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি পদ দ্রষ্টব্য]। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাস ও এই বংশীধ্বনি অবলম্বনে একটি খণ্ড রচনা করিয়াছেন— বংশীখণ্ড [মাধুকরী-অন্তর্গত বড়ু চণ্ডীদাসের বংশীনাদে নামক প্রথম দুইটি পদ দ্রষ্টব্য]। বৈষ্ণব পদাবলীতে এই বংশীধ্বনি অবলম্বনে অসংখ্য পদ রচিত হইয়াছে। লোকসাহিত্যে কালার বাঁশী একটি প্রিয় প্রসঙ্গ। এমন কি, একালের কবিও এই বংশীধ্বনির দিব্য-সংকেতকে কাব্যে প্রয়োগ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের রাজা ও রানী নাটকে আছে—

আলোচ্য কবিতার গূঢ় তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি

ধর্মশাস্ত্রে ও সাহিত্যে

সখী ঐ বুঝি বাঁশী বাজে বনমাঝে কি মনোমাঝে ॥
যাব কি যাবনা মিছে এ ভাবনা
মিছে মরি লোকলাজে
কে জানে কোথা সে বিরহ হুতাশে
ফিরে অভিসার-সাজে ॥

রবীন্দ্রনাথের আর একটি সুপরিচিত সংগীতাংশ—

আধুনিক কবির কাব্যে

মরিলো মরি আমার বাঁশীতে ডেকেছে কে।
ভেবেছিলেম ঘরে রব কোথাও যাব না—
ওই-যে বাহিরে বাজিল বাঁশী বলো কী করি ॥

পিলু-বাঁরোয়ায় এই পুরাতন কথাটি আধুনিক যুগের ভাষায় গাহিয়াছেন আর একজন কবি গীতকার—

কে আবার বাজায় বাঁশী এ ভাঙা কুঞ্জবনে !
হৃদি মোর উঠল কাঁপি চরণের সেই রণনে।…

আজি মোর শূন্য ডালা কি দিয়ে গাঁথব মালা
কেন এই নিঠুর খেলা খেলিলে আমার সনে ?
হয় তুমি থামাও বাঁশী নয় আমায় লও হে আসি,
ঘরেতে পরবাসী থাকিতে আর পারিনে।

[অতুলপ্রসাদ]

দ্বিজ চণ্ডীদাসের কৃতিত্ব

দ্বিজ চণ্ডীদাসই শ্রীকৃষ্ণের পঞ্জর-বিদীর্ণকারী, অভ্যাসাগত জীবনে বিপর্যয়-স্বষ্টিকারী বংশীধ্বনির প্রবল আকর্ষণের সবশ্রেষ্ঠ কাব্যকার। কিন্তু তাঁহার রাধা অন্তঃপুরচারিণী, অবরুদ্ধা, কুলনন্দিনী, চতুর্দিকে শাসন ও নিয়ন্ত্রণের কঠোর তর্জনী, অথচ ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতির নিষ্ঠুর আহ্বান সব কিছু উপেক্ষা করিয়াই অসহায় সমাজভীতা নারীর নিকট উপস্থিত হয়। জীবনের সেই মর্মান্তিক অসহনীয়তার আক্ষেপই রাধার কণ্ঠে এখানে চমৎকারভাবে ব্যঞ্জিত হইয়াছে। যে আহ্বান বন্ধনকে অস্বীকার করিতে শিক্ষা

কাব্য সৌন্দর্য

দেয়, অভ্যস্ত বন্দীদশা নিমেষে চূর্ণ করিবার মন্ত্রসংকেত জানাইয়া দেয়, সকল কলুষিত সমাজপেষণভার সহসা মুক্ত করিতে চায়, সেই আহ্বানের জয় গৌরবই কবির কাম্য। কিন্তু রসসম্মত করিয়া তাহা হঠকারী বংশীধ্বনির প্রতি অনুযোগ আকারে বিবৃত হইয়াছে। ইহাতেই কবিতাটির কাব্যসৌন্দর্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বড়ু চণ্ডীদাস ও দ্বিজ চণ্ডীদাস উভয়েই প্রাক্‌চৈতন্যযুগের কবি হইলেও উভয়ের পদের ভাষাগত প্রভেদটি লক্ষ্য করিবার মত। পঞ্চদশ শতাব্দীর ভাষা আধুনিক ভাষার তুলনায় অনেক বেশি প্রাচীন ও দুর্বোধ্য, অপরিচিত শব্দসংবলিত ও জটিল হওয়া উচিত, কিন্তু আলোচ্য পদে দুই একটি শব্দ ব্যতীত প্রাচীনত্বের লক্ষণ বিশেষ নাই। ইহার সম্ভাব্য কারণ, বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য

ভাষা

জনপ্রিয়তা হারাইয়া এক স্থানে এতকাল নিশ্চল হইয়া ছিল, কিন্তু পদাবলীর চণ্ডীদাসের ভাষা লোকমুখে পরিচিত হইয়া আধুনিক যুগের ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার একটি চরণে স্পষ্টতঃ কথ্য ভাষার ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইয়াছে ['মুরলী সরল হয়ে বাঁকার মুখেতে রয়ে শিখিয়াছে বাঁকার স্বভাব'] ইহা প্রাচীনত্বের লক্ষণ নয়। তবে এই বিষয়ে নিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়।

রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ

কালা গরলের জ্বালা—শ্রীকৃষ্ণের শ্যামলশোভন নীলকজ্জল দেহসুষমার জন্য পদাবলীতে তাঁহাকে চিকণকালা, কালাচাঁদ, কালশশী, কালা, কালিয়া ইত্যাদি শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হইয়াছে। জ্ঞানদাসের পদে আছে 'পাসরিতে নারি কালা কানুর পিরিতি।' বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও কৃষ্ণের গাত্রবর্ণের কৃষ্ণত্বের বিশেষ উল্লেখ আছে। কৃষ্ণ কালো রঙের গুণগৌরব ব্যাখ্যা করিলে রাধা রুষ্ট হইয়া বলিয়াছেন—

'কাল শরীর কাহ্নাঞি কাল তোর মন।'

সেই কালো কানাইয়ের ভাসিয়া-আসা বংশীরব রাধার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, ইহা মাধুর্যের পরিবর্তে শরীরে যেন তীব্র বিষপ্রবাহ বিস্তার করিল, তাই গরলের জালায় রাধার অঙ্গ জরজর হইয়াছে। গরল শব্দের দ্বারা এখানে অস্পষ্টভাবে সর্পের আভাস আছে [পরে দ্রষ্টব্য]।

অবলা—নারীকে অবলা বলা হয় পুরুষের তুলনায় তাহার শারীরিক বলের অপেক্ষাকৃত অভাব, কোমলতা ও অসহায়তার জন্য।

মুঞি—উত্তম পুরুষ একবচন, মধ্য বাঙলার ব্যবহার। তুলনীয়—'মুঞি তো অতি অধম লিখতে না জানি ক্রম'—নরহরি। সম্ভবত, উত্তম পুঃ ৩য়া 'ময়া'> * ময়েন> * মএঁ, মোএঁ, মুইঁ>মুঞি, মোঞ> মুই (আধুনিক উপভাষা)।

বৌহারী—কুলবধূ। সংস্কৃত বধূটি শব্দের অপভ্রংশ। বৌয়াড়ী, বৌয়ারী শব্দও পাওয়া যায়। তুলনীয়, 'কার বহুড়ী বাসন মাজে পুকুর ঘাটে ব্যস্ত কাজে' —সত্যেন্দ্রনাথ।

কালা গরলের···বৌহারী—বাক্য এখানে সম্পূর্ণ ব্যক্ত নয়, অথচ যুক্তির ক্রমটি স্পষ্ট! রাধা বলিতেছেন, বিপদ একটি নয় অনেক। প্রথমত, কৃষ্ণের বংশীধ্বনি, সুতরাং তাহার বিষক্রিয়া সর্পাপেক্ষা দুঃসহ ও মর্মান্তিক, তাহার উপর প্রেমিকের আহ্বান হইয়া আসিয়াছে বলিয়া উহা অসহায়া নারী জীবনে শোচনীয় বিপর্যয় সৃষ্টি করে। সর্বোপরি, সেই নারী আবার অপরের গৃহে বন্দিনী কুলবধূ সুতরাং তাহার নিরুপায়তা ও চরম যন্ত্রণা সহজেই অনুমেয়। কত স্বল্প কথায় পরকীয়া নারীর বিপন্ন অনুরাগটিকে কবি ব্যক্ত করিলেন! তুলনীয়,

একে কুলকামিনী তাতে কুহু যামিনী
ঘোর গহন অতি দূর।
আর তাহে জলধর বরিখয়ে ঝরঝর
হাম যাওব কোন পুর ॥ [গোবিন্দদাস]

অন্তরে মরম ব্যথা—অপ্রকাশের বেদনা। কুলবধূর পক্ষে নিষিদ্ধ প্রেমের কথা প্রকাশ করা যায় না, অথচ অবরুদ্ধ থাকায় ইহা আরও বেদনাদায়ক। অন্তর ও মরম প্রায় সমার্থক কিন্তু এখানে 'মরম' শব্দটি ব্যথার গোপনে লালিত প্রিয়ত্বের সংকেতবাহী।

গুপতে—গুপ্ত শব্দের স্বরভক্তিজাত রূপ, এখানে 'গোপন ব্যথায়' অর্থে।

বংশী দংশিল—ধ্বনি শ্রুতিগম্য হইলেও তাহা সুরের প্রবাহ, সুতরাং সেই ব্যবহারিক তারল্যের আভাসে চণ্ডীদাসের রাধা তাহাকে বিষক্রিয়ার সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। এখানে বংশীর দংশনের দ্বারা স্পষ্টতই সর্পাঘাতের ইঙ্গিত করা হইল। বংশী ও দংশনে যে কেবল অনুপ্রাস সৃষ্টি হইয়াছে তাহা নয়। সর্পের ব্যঞ্জনা গভীরতর। সংগীত যদি অঙ্গে বৈকল্য ঘটায়, দেহ অসাড় ও অকর্মক করে তবে তাহা বিষক্রিয়ার সদৃশ, সুতরাং সর্পের ব্যঞ্জনা স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, সর্প নিঃশব্দে আসিয়া অকস্মাৎ দংশন করে। সকলের অগোচরে কেবল গৃহাবরুদ্ধা রাধার নিকট আততায়ী রূপে আগত এই বংশীও অতর্কিতে তাহাকে বিহ্বল করিয়াছে। সর্পের বিষ সামান্য ছিদ্রের মধ্যে দিয়া সমগ্র অবয়ব বিষদুষ্ট করে, বাঁশীর সুরও কর্ণের সামান্য ছিদ্রের মধ্য দিয়া সমগ্র শরীরে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। এখানে অতিশয়োক্তি অলংকার হইয়াছে।

ডাকিয়া চেতন হরে—অচৈতন্যের চেতন ফিরাইবার জন্য তাহাকে ডাকিতে হয়। কিন্তু বংশীর প্রাথমিক কাজ আহ্বান হইলেও এখানে ডাকের দ্বারাই চেতনা লুপ্ত হয়। ইহা কার্যের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া।

তন্ত্রমন্ত্র কিছুই না মানে—বংশীর নিজস্ব কোনো বিচার বুদ্ধি বা বিবেচনা শক্তি নাই, তাহা বাদকের ইচ্ছানির্ভর কিন্তু এখানে রাধা বংশীধ্বনিকেই তাঁহার জীবন বিপর্যয়ের কর্তা বলিয়াছেন। সে অবিমৃষ্যকারী, সংসারের নিয়মকানুন, কুলতন্ত্র স্বীকার করে না।

মুরলী সরল···বাঁকার স্বভাব—শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভঙ্গমুরারি হইয়া কদম্বতলে বংশী বাজান, তিনি বঙ্কিম, আর তাঁহার প্রবল আকস্মিক প্রেমের জন্য নিন্দার্থে তিনি রাধার নিকট বাঁকা। কিন্তু আলোচ্য পদে রাধার অনুযোগ তো কৃষ্ণের প্রতি নয়, তাহার বাঁশীর প্রতি। বাঁশী সরল বাঁশের দ্বারা নির্মিত হইলেও কৃষ্ণের সঙ্গদোষে তাহারও সরলতার অভাব ঘটিয়াছে স্বভাবে সেও কপট ও কুলবধূ-ছলনাকারী হইয়াছে।

সঙ্গদোষে···লাভ—শ্রীকৃষ্ণের মুখস্পর্শেই বাঁশীর এই দৌরাত্ম্য, ইহাই কবির ব্যাখ্যা বা কৈফিয়ৎ। অকলঙ্ক জ্যোৎস্নাবিদায়িনী শশী যদি রাহুগ্রস্ত হয়, তবে তাহার জ্যোৎস্না অপহৃত হয়, শশী হয় মসিময়ী, কৃষ্ণ-বর্ণা। কৃষ্ণের অধরস্পৃষ্ট হইয়া বংশীও তাহার মাধুর্যগুণ হারাইয়া বিষবৎ ক্রিয়া লাভ করিয়াছে। সুতরাং কবি বলিতেছেন, আক্ষেপ বা অনুযোগ করিয়া কি হইবে, ইহা সঙ্গদোষেরই ফল।

ব্যাখ্যা—[রূপতত্ত্ব বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]।

প্রশ্ন—১. দ্বিজ চণ্ডীদাসের কবিধর্ম বিশ্লেষণ করিয়া বংশীধ্বনির স্বরূপ নির্ণয় কর [আলোচনা দ্রষ্টব্য]

২. দ্বিজ চণ্ডীদাস ও বড়ু চণ্ডীদাসের পদের তুলনা কর [ইতিহাস অংশ দ্রষ্টব্য ও পরবর্তী কবিতার আলোচনা দ্রষ্টব্য]।

প্রেমের তুলনা : দ্বিজ চণ্ডীদাস

ভূমিকা :

আলোচ্য কবিতাটির বিষয়, পদাবলী সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার অভ্যন্তর রহস্য ও তাঁহাদের প্রেমের অনির্বচনীয় অনুপমত্ব। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে অপ্রাকৃত প্রেমের যুগল মূর্তি রাধামাধব। মাধব প্রেমসর্বস্বতনু ঈশ্বর, রাধা তাঁহারই হ্লাদিনী শক্তি, তাই উভয়ের মধ্যে নিত্যসম্পর্ক। রাগের চরম অবস্থা অনুরাগ, অনুরাগের শেষ অবস্থা মহাভাব, রাধা তাই মহাভাব-স্বরূপিনী। কিন্তু অনুরাগের এই

বৈষ্ণব মতে প্রেম

তাত্ত্বিক ব্যখ্যা দ্বিজ চণ্ডীদাসের জানার কথা নয়, কারণ তিনি প্রাক্‌চৈতন্য যুগের কবি। তাই তাঁহার পদটি সাধারণভাবে প্রেমের অন্তহীন রহস্য ও মিলনের অন্তরালশায়ী গভীর অতৃপ্তির একটি মানবিক স্ফুরণ হইতে রচিত বলা যায়। সেই হিসাবে ইহা প্রেমের তুলনা মাত্র নয়, প্রেমের সংজ্ঞাও বটে।

চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত আছে, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহাব উপরে নাই। আলোচ্য পদেও চণ্ডীদাস নৈসর্গিক উপমানের তুলনায় উপমেয় মানব-মানবীর প্রেমকেই শ্রেষ্ঠত্বের আসনে উন্নীত করিয়াছেন। অবশ্য এই প্রেম নিতান্তই লৌকিক জৈবজীবনের নয়, ইহার আধার রাধাকৃষ্ণ তাই তাহা স্বভাবতই জ্যোতির্ময় দিব্যপ্রেমে পরিণত হইয়াছে।

প্রকৃতির মধ্যে মানব-জীবনের পূর্ণতার আদর্শ লক্ষিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা যথার্থ নয়। প্রকৃতির বস্তুসমূহের সহিত মনুষ্য-শরীরের সৌন্দর্যের তুলনা করা হয়। প্রকৃতি সৌন্দর্যের আধার, তাহার বিচিত্র সৌন্দয মানব-জীবনের উপর আরোপ করা হয়। এমন কি প্রকৃতির মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক পর্যন্ত বিদ্যমান। চন্দ্রের সহিত কুমুদিনী, সূর্যের সহিত কমলিনী, চন্দ্রেব সহিত চকোর, ভ্রমরের সহিত পুষ্পের নিত্যসম্পর্ক কল্পনা কবা হইয়া থাকে। কিন্তু আলোচ্য কবিতায় দ্বিজ চণ্ডীদাস কবি-প্রসিদ্ধিগত সেই সকল প্রেমসম্পর্কের মধ্যেও ত্রুটি বা অপূর্ণতা আবিষ্কার করিয়া তুলনায় রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে শ্রেষ্ঠতার এক সীমাহীন আদর্শে উপস্থিত করিয়াছেন।

প্রকৃতি ও মানব জীবন

ইহা পদাবলীতে অনুরাগ-অংশে প্রেমবৈচিত্ত্য-বিভাগের পদ। প্রেমের গৌরব প্রতিষ্ঠাই ইহার উদ্দেশ্য।

ভাবার্থ

রাধাকৃষ্ণের তুলনারহিত প্রেমের রহস্য সখীকে বিস্মিত করিয়াছে। সখীমুখে কবি সেই পরিপক্ব ঘনীভূত অনুরাগের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিতেছেন যে, এরূপ প্রেম কোথাও দেখাও যায় নাই, শোনাও যায় নাই। বিনাপ্রয়াসে হৃদয়ের সহিত হৃদয় এখানে সংবদ্ধ, গভীর মিলনের মধ্যে আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় এই প্রেম ক্রন্দমান, মুহূর্তের অদর্শন ইহা সহ্য করিতে অক্ষম। জলাভাবে যেরূপ

ভাবার্থ

মৎস্যের প্রাণধারণ অসম্ভব সেইরূপ ইহারাও একে অপরের অস্তিত্ব ব্যতীত বাঁচিতে পারে না। দুগ্ধ তাপে উত্তাল হইলে জলসিঞ্চনে তাহা শান্ত হয়, সুতরাং দুগ্ধ ও জলের প্রেমের সুস্থিরতার সহিত ইহাদের প্রেমের কিঞ্চিৎ তুলনা চলে। সূর্য ও কমলের প্রেম গভীর হইলেও হিমস্পৃষ্ট কমলের জন্য সূর্যের উদ্বেগ নাই। জলদ তাহার নিত্যপ্রিয়া চাতককে সময় না আসিলে এক বিন্দু বারি বর্ষণের দ্বারা শান্ত করে না। পুষ্প তাহার দয়িত ভ্রমরের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইতে পারে না। চন্দ্র-সুধামুগ্ধ চকোর ও চন্দ্রের মধ্যেও বৈষম্য বর্তমান। সুতরাং সমগ্র ত্রিভুবনের মধ্যে সর্বাঙ্গসুন্দর নিরুপম এই রাধাকৃষ্ণের প্রেম, ইহাই চণ্ডীদাসের সিদ্ধান্ত।

আলোচনা

আলোচ্য পদে চণ্ডীদাস নিতান্ত সহজ ভাষায় প্রচলিত কয়েকটি কবি-প্রসিদ্ধির উদাহরণ দিয়া রাধাকৃষ্ণের নিত্য প্রেমের এক অপরূপ ভাবচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণ সাধারণ নায়ক-নায়িকা নয়, তাহাদের প্রেমে তাই অমরলোকের অনন্ত গভীরতা। প্রেমের যাহা কিছু চিরন্তনত্ব, অনুরাগের যত কিছু গভীরতা, আকর্ষণের মধ্যে যতখানি অতীন্দ্রিয়তা থাকা সম্ভব, রাধাকৃষ্ণ যেন সেই সকলের মূর্তিমান বিগ্রহ। এই প্রেম তাই ক্ষণবিচ্ছেদকাতর, তিলার্ধ-বিরহে ত্রিভুবন শূন্য বোধ হয়, নিমেষের অদর্শন এখানে যুগব্যবধান মনে হয়—'মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা'। আধুনিক কবির রচনাতেও প্রেমের এই অস্বস্তিবোধ ও অনন্ত আকুলতার পরিচয় আছে, ইহাকেই বলা হয় রোমান্টিকতা। প্রেমের স্বভাবই এই, তাহা প্রতি মুহূর্তেই নূতন, আবার তাহাতে অনন্তের আবেগ ও জন্মজন্মান্তরের স্মৃতি নিহিত। বৈষ্ণব কবি বলেন,

আলোচনা

প্রেমের রহস্যময় স্বভাব

> লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
> তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

আর আধুনিক কবি বলেন,

> আমরা দুজন ভাসিয়া এসেছি
> যুগল প্রেমের স্রোতে,
> অনাদিকালের হৃদয় উৎস হতে। [রবীন্দ্রনাথ—মানসী]

'দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া' পংক্তিটি প্রেমের এই চিরঅতৃপ্ত রহস্যময় অনির্দেশ্য স্বভাবে চিহ্নিত হইবার জন্ত একালের রোমাণ্টিক চেতনার ধ্রুবপদরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা যেন রবীন্দ্রনাথের 'দুজনে মুখোমুখী গভীর দুখে দুখী'র মত। এই দিক হইতে চণ্ডীদাসকে ঠিক বৈষ্ণব পদাবলীর নয়, আধুনিক কবিস্বভাবের অনুবর্তী মনে হয়। প্রাকৃতিক প্রেমের প্রথাগত দৃষ্টান্তগুলির কষ্টিপাথরে তিনি এই মানবিক প্রেমের স্বর্ণাভ জ্যোতিকে আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। সূর্য ও কমলের প্রেমের প্রসিদ্ধি থাকিলেও তাহা অহেতুক, কারণ যে প্রেমে একজনের সুখদুঃখ আর একজনের সুখ-দুঃখ হইয়া উঠে না, তাহা কিরূপে আদর্শ প্রেম হইবে? অর্থাৎ এখানে সুখ-দুঃখের অনুভূতি রাধাকৃষ্ণের মধ্যে সমান ভাবে সঞ্চারিত ইহাই কবির অভিপ্রেত। জলদ ও চাতকের সহিত তুলনায় কবি এইরূপ তাহাদের সাময়িকত্ব এবং রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের নিত্যতাই প্রমাণ করিয়াছেন। পুষ্প এবং ভ্রমরের সম্পর্কের মধ্যে একজনের স্বার্থই নিহিত, ইহাতে উভয়ের আগ্রহ সমান নয়, কিন্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেম উভয়ের সমান আকর্ষণে কম্পিত। সুতরাং সমগ্র বিশ্বভুবনে এই অনবদ্য অতুল প্রেমের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া চণ্ডীদাস প্রেমকে মধ্যযুগের কুসংস্কার ও ধর্মকেন্দ্রিকতার মধ্যে এক মহান স্থান দান করিয়াছেন।

চণ্ডীদাসের আধুনিকত্ব

কবিতাটি পয়ারছন্দে রচিত এবং ভাষায় প্রাচীনত্বের সামান্য লক্ষণ আছে।

রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ :

পিরীতি—প্রীতি শব্দের সরলীকৃত [স্বরভক্তি] রূপ। বৈষ্ণব পদাবলীতে, বিশেষত চণ্ডীদাসের পদে (আসলে সহজিয়া পদে) পিরীতি প্রেম শব্দের বিকল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন,

'পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
এত দুখ দিল মোরে'
'পিরীতি বলিয়া একটি কমল
রসের সায়র মাঝে'
'পিরীতি সুখের সায়র দেখিয়া
নাহিতে নাহিলাম তায়' ইত্যাদি।

পরাণে পরাণে বাঁধা আপনা আপনি—জন্মসূত্রেই উভয়ের হৃদয় সংসক্ত, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে ইহাকে বলা হয় রাগাত্মিক প্রেম। রাধাকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি, সুতরাং এই প্রেম একমাত্র তাহার পক্ষেই সম্ভব। জীবের প্রেম রাগানুগ বা সাধনলব্ধ। কিন্তু প্রাক্‌চৈতন্য চণ্ডীদাসের পক্ষে এই তত্ত্ব অজানা ছিল। তিনি গভীরতম প্রেমের স্বাভাবিক প্রেরণাবশতই ইহা লিখিয়াছেন।

দুহুঁ কোরে···বিচ্ছেদ ভরিয়া—নিবিড় মিলনের মধ্যেও তৃপ্তি নাই, পরস্পর সান্নিধ্যের মাঝখানে তিলমাত্র ব্যবধানও গভীর বিচ্ছেদের কারণ হয়। ইহা ঠিক জৈবিক অনুভূতি নয়, প্রেমের অন্তহীন গভীরতা ও রহস্যবোধের সঙ্গে এই নৈরাশ্য ও অতৃপ্তি যুক্ত থাকে। চাওয়া ও পাওয়ার নিত্য বৈষম্যের মত গভীর নৈকট্যের মধ্যে যেখানে ভোগস্পৃহা অপেক্ষা আচ্ছন্ন-বিচ্ছেদের স্বতন্ত্র ক্রন্দন জাগিয়াছে সেইখানেই প্রেমের যথার্থ পরীক্ষা। রাধাকৃষ্ণের প্রেম সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

জনু—যেন, সদৃশ; প্রাচীন বাঙলা ব্যবহার। তুলনীয়, 'জলদবরণ কানু দলিত অঞ্জন জনু'—চণ্ডীদাস। মৈথিলীতে জনু—যেন না। তুলনীয়—'দয়া জনু ছোড়বি মোয়'—বিদ্যাপতি।

কবহুঁ—কখনও, ইহাও মৈথিলীর প্রভাবজাত। **দুহুঁ**—দুই, শব্দটি মৈথিলীতে ব্যবহৃত হয়। চণ্ডীদাস ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেন নাই, বাঙলাই তাঁহার কবিতার ভাষা। কিন্তু তৎকাল-প্রচলিত মৈথিলী-বাঙলা শব্দগুলি প্রয়োগ করিয়াছেন।

কোথা না শুনিয়ে—প্রাচীন বাঙলা ভাবকর্মবাচ্যের ব্যবহার (Passive voice)।

উথলি উঠিল···ধীর—তাপোচ্ছ্বসিত দুগ্ধ জলসিঞ্চনে শান্ত হয়। **চাতক জলদ কহি**—চাতক ও জলদ নায়িকা ও নায়ক সম্পর্কে প্রসিদ্ধ। **ভানু কমল ·····চণ্ডীদাস কহে**—কাব্যে নায়ক-নায়িকার প্রেমের অবিচ্ছিন্নতা ও গভীরতার সহিত উপমা দিবার জন্যই ভানু-কমল, চাতক-জলদ, কুসুম-মধুপ ও চকোর-চাঁদের পরিকল্পনা। এইজন্য এইগুলিকে বলা হয় কবি-প্রসিদ্ধি। কিন্তু এখানে চণ্ডীদাস কবি-প্রসিদ্ধিগুলির সম্বন্ধ-কল্পনার অন্তঃসারশূন্যতা আবিষ্কার করিয়াছেন। সুতরাং আলোচ্য পদের ভঙ্গি বিশ্লেষণাত্মক ও যুক্তিক্রমী। ইহা ব্যতিরেক অলংকারের দৃষ্টান্ত।

ব্যাখ্যা :

তুহুঁ কোরে তুহুঁ -যায় যে মরিয়া

বক্ষ্যমাণ পংক্তিগুলি দ্বিজ চণ্ডীদাসের 'প্রেমের তুলনা' এই অনুরাগ-সংজ্ঞামূলক পদটির অন্তর্গত। কবি সখীমুখে রাধাকৃষ্ণের অতুলনীয় প্রেমের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। শৃঙ্গার দুই প্রকার, সম্ভোগাত্মক ও বিপ্রলম্ভ। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেমের নিবিড় মিলন-সম্ভাবনার মধ্যেও অচিরসম্ভব বিচ্ছেদের নিদারুণ আশঙ্কা বর্তমান। এই প্রেম দুইজনকে গভীর অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়াও তৃপ্তিদান করিতে পারে নাই, ইহার অন্তরে আছে এক গভীর নৈরাশ্য, অনন্ত বিরহের সদা-বহমান সংশয়। তাই প্রতি মুহূর্তে পরস্পর পরস্পরকে হারাইবার ভয়ে কম্পমান, তিলার্ধ অদর্শনে এই প্রেম ক্রন্দনে মুহ্যমান হইয়া পড়ে। আধুনিক কবিদৃষ্টিতে ইহাকে বলা যায় রোমাণ্টিক প্রেম, যাহা তৃপ্তির মধ্যে অতৃপ্তি, মিলনের মধ্যে বিরহ, সুখের মধ্যে বেদনার অনুভূতি সৃষ্টি করে। বৈষ্ণব কবি ইহার মধ্যে দিব্য সত্তার স্পর্শ অনুভব করেন, কারণ এই প্রেম জৈব নহে। তুলনীয়, 'নিমিষে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি।'

কি ছার -চণ্ডীদাস কহে—[রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]।

প্রশ্ন ১। দ্বিজ চণ্ডীদাস-রচিত 'প্রেমের তুলনা' কবিতা অবলম্বনে বৈষ্ণবীয় প্রেমের স্বরূপ নিরূপণ কর। [ভূমিকা ও আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য]

প্রশ্ন ২। দ্বিজ চণ্ডীদাসের কবিধর্মের পরিচয় দান কর। [ঐতিহাসিক আলোচনা ও ভূমিকা দ্রষ্টব্য]

ভাবোল্লাস : বিদ্যাপতি

ভূমিকা :

বিদ্যাপতির এই পদটি বৈষ্ণব পদাবলীতে ভাবোল্লাস ও মিলন পর্যায়ের। সংকলয়িতা প্রচলিত পদাবলীর সংকেতটিকেই কবিতার শিরোনামায় ব্যবহার করিয়াছেন। পদটিতে মৈথিলী ভাষার লক্ষণ অপেক্ষা বাঙলা ভাষার বৈশিষ্ট্যই বেশি করিয়া চোখে পড়ে, কিন্তু ইহা যে মৈথিলী কবি রচিত তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলা তৃতীয়

আলোচ্য পদটির সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের সম্পর্ক

পরিচ্ছেদে আছে সন্ন্যাস-গ্রহণের পর শান্তিপুরে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব নিত্যানন্দ গোঁসাই এবং অদ্বৈত আচার্য সমভিব্যাহারে এই পদটি গান করিতে করিতে ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন—

এই পদ গাই হর্ষে করেন নর্তন।
স্বেদ কম্প অশ্রু পুলক হুংকার গর্জন ॥
ফিরি ফিরি কভু প্রভুর ধরেন চরণ।
চরণে ধরিয়া প্রভুরে বলেন বচন ॥
অনেক দিন মোরে বেড়াইলে ভাণ্ডিয়া।
ঘরে পাইয়াছি এবে রাখিব বান্ধিয়া ॥
এত বলি আচার্য আনন্দে করেন নর্তন।
প্রহরেক রাত্রি আচার্য কৈল সংকীর্তন ॥
প্রেমের উৎকণ্ঠা প্রভুর নাহি কৃষ্ণসঙ্গ।
বিরহে বাড়িল প্রেম-জ্বালার তরঙ্গ ॥

ভাবোল্লাস-এর ব্যাখ্যা

ভাবোল্লাস-শব্দটি উত্তরকালের বৈষ্ণব-আলংকারিকদের সৃষ্টি হইলেও ইহা প্রেমেরই স্বাভাবিক বিকাশের পরিণতি। দীর্ঘ অদর্শনজনিত বিরহের পর নিঃসঙ্গা নায়িকার কাছে দয়িতের আগমন যে বিপুল অশ্রুপুলক সহর্ষবেদনা ও ব্যাকুল আবেগের সৃষ্টি করে তাহাই ভাবোল্লাস। কিন্তু পদাবলীতে এই পুনর্মিলন বাস্তব সংযোগ নয়, ইহা বিরহবিদীর্ণ হৃদয়ের কাছে কবির কল্পনাসৃষ্ট মিলনের অধ্যাস (illusion) রচনা, তাই ইহার নাম ভাবসম্মিলন। তাই তাহার উল্লাস দৈহিক নয়, তাহা ভাবোল্লাস। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রাক্‌চৈতন্য যুগে হয়ত নায়ক-নায়িকার প্রত্যক্ষ মিলনের মদির আনন্দকেই কাব্যের বিষয় করিয়াছিলেন। তিলার্ধ অদর্শন যেখানে মৃত্যুর নামান্তর, সেই প্রেমের পক্ষে দীর্ঘ প্রবাসের দুঃসহ গভীর বজ্রাঘাততুল্য বেদনা তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন নাই, তাই মিলনের শুভ কল্যাণ মুহূর্তটিকে তাঁহারা সম্ভব করিয়াছেন। তাই একদা বিরহনিশার অবসানে শুভ মিলনের মঙ্গল লগ্নটিকে তাঁহারা কাব্যে ধরিয়া রাখিয়াছেন। বিদ্যাপতির 'কি কহব রে সখী' পদটি সেই মিলনেরই পদ। কিন্তু চৈতন্যোত্তর পদাবলীতে ইহার উপর তত্ত্ব আরোপিত হইয়াছে।

ভাবার্থ

দীর্ঘ বিরহের পর প্রিয়তমের আগমন-উল্লাসে পুলকিতা রাধা সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, বহুকাল পরে মাধব আমার মন্দিরে আসিয়াছেন, এই আনন্দের সীমা নাই। বিরহকালে পাপিষ্ঠ সুধাকর তাহার জ্যোৎস্না কিরণের দ্বারা বিরহতাপ বর্ধিত করিয়াছিল, এক্ষণে প্রিয়মুখ দর্শনে তাহা সম্পূর্ণ অপনোদিত হইল। একদা-সমীপবর্তী প্রিয়তমকে নির্ধন বলিয়া অবহেলা করার ফলে বিরহের অদর্শনে প্রেমিকের দুর্মূল্যতাব উপলব্ধি হইয়াছে। তখন তাহাকে অনায়াসে বিদেশে যাইবার অনুমতি দিয়াছি এখন অঞ্চলপূর্ণ মহাবস্ত্রের বিনিময়েও এই বিচ্ছেদ-বেদনা বরণ করিতে ইচ্ছা করি না। [বহু বেদনার অভিজ্ঞতায় বুঝিয়াছি যে] প্রিয়তম শীতের গাত্রাবরণ, গ্রীষ্মের বাতাস, বর্ষার ছত্র অথবা নদীর তরণীতুল্য। বিদ্যাপতি ও এই মিলনের সাক্ষী হইয়া লাবণ্যময়ী রমণী-শ্রেষ্ঠাকে বলিতেছেন, এইরূপই হয়, সুজন ব্যক্তির দুঃখ দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

ভাবার্থ

আলোচনা

কেবল প্রাক্‌চৈতন্য যুগের নয়, সমগ্র মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বিদ্যাপতি স্বল্প কয়েকটি চরণের চকিত শব্দচ্ছটার মধ্যে প্রেমের এক অলোকসামান্য আবেগ, বিরহের মর্মভেদী বেদনা, মিলনের দুঃসহ উল্লাস, বসন্তের বিপুল বর্ণসমারোহ কিংবা যৌবনের বাকস্তম্ভিত রহস্যচেতনা অনায়াসে সঞ্চার করিয়া দিতে পারেন। যেখানে প্রেম যৌবনের রক্তিম দাড়িম্বরাগে বিকশিত, যেখানে রমণী তাহার সৌন্দর্যময়ী সত্তা লইয়া অন্তরের অন্তরতমের সহিত ঘনমিলনের জন্য প্রতীক্ষিতা সেখানে বিদ্যাপতির ভাষা রাজকীয় ঐশ্বর্যে বিহ্বল। সৌন্দর্যে, উপমাচাতুর্যে, বিলাস কলা-কৌতূহলে, মুখের কথায়, ইন্দ্রিয়চেতনায় তাঁহার তুল্য কবি নাই। ভাবসম্মিলন ও ভাবোল্লাস বস্তুত তাঁহারই সৃষ্টি। আলোচ্য সংক্ষিপ্ত পদের পরিমিত চরণে একটি বিরহকাতরা রমণীর দীর্ঘশূন্যতার অবসান-ঘোষণার আনন্দ-সংবাদটি কবি কত সামান্য কথায় অসামান্য ব্যঞ্জনাসৃষ্টির দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। এইজন্যই শ্রীচৈতন্যদেব পদটি গান করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের

আলোচনা

ভাবোল্লাসের স্রষ্টা বিদ্যাপতি

সহিত অথবা বাঞ্ছিত ব্যক্তির সহিত মিলনসুখ উপভোগ করিতেন। 'হমার মন্দির যব আওব কান', 'হরি যব আওব গোকুলপুর', 'আজু রজনী হাম ভাগে গমায়লুঁ'—এইগুলিও বিদ্যাপতির সুবিখ্যাত ভাবোল্লাসের পদ।

ভাবসম্মিলনের পদ দ্বিজ চণ্ডীদাসও রচনা করিয়াছেন ['বঁধু কী আর বলিব আমি', 'বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে', 'বঁধু ছাড়িয়া না দিব তোরে' প্রভৃতি]।

চণ্ডীদাসের সঙ্গে বিদ্যাপতির ভাবোল্লাসের তুলনা

কিন্তু চণ্ডীদাসের পদে রাধা সেই আক্ষেপানুরাগেরই রাধা, তাঁহার সরল উৎকণ্ঠা, আত্মসমর্পণের অকুণ্ঠ আবেগ, আনন্দপ্রকাশের ভাষাহীন 'ব্যাকুলতা বিদ্যাপতির রাধার মত নয়। বিদ্যাপতির রাধা বিরহে যে গভীর হৃদয়ভেদী বেদনা অনুভব করিয়াছেন, তাহা সুকৌশলে ব্যক্ত করিতে পারেন। বিদ্যাপতির রাধামাধব প্রেমের উপযুক্ত পাত্রপাত্রী, তাই কবি বলেন, 'সুজনক প্রেম দিবস দুইচারি।' পরবর্তী কালে এই ভাবসম্মিলন অবলম্বন করিয়া ভক্ত বৈষ্ণব নিত্য-বৃন্দাবনে নিত্যরাগের পরিকল্পনা করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট রাধাকৃষ্ণ একই দেহ সুতরাং বিচ্ছেদ সত্য নয়, মিলনই সত্য। জ্ঞানদাসের পদে আছে—

তোমায় আমায় একই পরাণ
ভালে সে জানিয়ে আমি।
হিয়ায় হৈতে বাহির হইয়া
কিরূপে আছিলা তুমি॥

কিন্তু বিদ্যাপতির পদে এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা নাই। নিতান্ত দেহবিচ্ছিন্ন দীর্ঘ

জীবনাশ্রিত ভাবোল্লাস

বিরহের পর মিলনের যে ব্যগ্র মানবিক কামনা, অতৃপ্ত অদর্শনের পর দৃষ্টিবিনিময়ের যে শরীরী রোমাঞ্চ, তিনি তাহারই কাব্যকার। আলোচ্য পদে মিলনের কলকণ্ঠ আবেগ ও উচ্ছ্বসিত হর্ষকে এত নিবিড় সংযমে প্রকাশ করা বিদ্যাপতির পরিণত শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক।

রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ :

ওর—সীমা, অন্ত, কিনারা; মধ্যযুগে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত। তুলনীয়, 'রূপের নাহিক ওর'—চণ্ডীমঙ্গল। **কহব**—মৈথিলী ও ব্রজবুলির উত্তম পুরুষ

ভবিষ্যৎ বাচক শব্দ। **কি কহব… ওর**—সখী, আমার আনন্দের সীমার কথা কী বলিব। এই সীমাহীন আনন্দের সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তির দ্বারাই রাধা তাঁহার দীর্ঘ বিরহের অবসান ঘোষণা করিলেন। **চিরদিনে**—দীর্ঘকাল পরে এই অর্থ। কিন্তু এই শব্দটির আর একটি গোপন ব্যঞ্জনাও আছে। বিচ্ছেদ-বিরহ সত্য নয়, রাধাকৃষ্ণের নিত্যমিলনই সত্য ও শাশ্বত, সুতরাং তাই 'চিরদিনে মাধব মন্দির মোর।' এ মন্দির বাহ্যিক অর্থে গৃহ হইলেও হৃদয়-মন্দির। লক্ষ্য করিবার বিষয়, পদটিতে রাধার পরকীয়া-রূপ স্পষ্ট নয়। অর্থের জন্য স্ত্রীই স্বামীকে বিদেশে পাঠাইতে বাধ্য হয়, এইরূপ সংকেত এখানে অস্বীকার করা যায় না।

পাপ সুধাকর যত দুখ দেল—চন্দ্রের কিরণ প্রেমের আনন্দের উপর সুধাবর্ষণ করে, কিন্তু বিরহিনীর নিকট তাহা তুবিষহ, যেহেতু উহা প্রেমের স্মৃতি উদ্দীপক এবং বিরহ ক্লেশের বিবর্ধক। তাই এতকাল চন্দ্রের কিরণ তাঁহার নিকট অনলসদৃশ ছিল। **পিয়ামুখ দরশনে তত সুখ ভেল**—প্রিয়তমের মুখ সন্দর্শনে চন্দ্রকিরণদগ্ধ বেদনা সম্পূর্ণ প্রশমিত হইল। প্রকারান্তরে বলা হইল, প্রিয়মুখ চন্দ্রের ন্যায় সুধাসার, চন্দ্রস্নিগ্ধ। তাহার দর্শনেই বেদনা নিবারিত হয়, নয়ন মুগ্ধ হয়—এমন কি পাপ বিদূরিত হয়।

নির্ধন বলিয়া পিয়ার না কৈলুঁ যতন—রাধা আক্ষেপ করিতেছেন, পূর্বে কৃষ্ণের কোনো রত্নসম্পদ নাই বলিয়া তাহার অযত্ন করিয়াছেন। নির্ধন শব্দের গভীরতর ব্যঞ্জনায় বলা হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণ প্রেমসর্বস্ব, তাঁহার দেহে ঐশ্বর্যচিহ্ন নাই : তিনি মাধুর্যসার মাত্র। তাই মূল্যবান ধনের তুলনায় তিনি নির্ধন। **অব হাম…বড় ধন**—এক্ষণে রাধা অনুভব করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের তুল্য রত্ন আর নাই। বিরহের বিনিময়ে প্রেমিক আজ নূতন মূল্য লইয়া দুর্ভাগ্য-পীড়িতার কাছে আবির্ভূতা হইয়াছেন। **অব হাম**—এমন আমি [ব্রজবুলি ও মৈথিলী শব্দ-ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য]। **জানলুঁ**—উত্তম পুরুষ অতীত। **পিয়া**—প্রিয় অর্থে [আদরার্থে]। **পাও**—পাই, উত্তম পুরুষ, বর্তমান। **পাঠাও**—পাঠাই, উত্তম পুরুষ, বর্তমান। **আঁচল ভরিয়া…না পাঠাও**—রাধা বলিতেছেন, বিরহ-বেদনার অসহনীয়তা সম্পর্কে কোনোরূপ অভিজ্ঞতা ছিল না বলিয়া প্রিয়তমকে বিদেশে প্রেরণ করিতে বাধা দিই নাই। কিন্তু এখন অঞ্চলপূর্ণ [অর্থাৎ বিপুল পরিমাণে] মহামূল্য রত্নসম্পদের বিনিময়েও হৃদয়-

নিধিকে হৃদয়-বহিত কবিব না, দূরদেশেব কথা তো বলাই বাহুল্য। **ওড়নি**— গাত্রাবরণ, তাপবর্ধক অঙ্গাচ্ছাদন। **গিরিস**—গ্রীষ্ম হইতে। **বাও**—বাত বা বাতাস। **বরিসা**—বর্ষা। **নাও**—নৌকা। **শীতের ওড়নি···দরিয়ার নাও**—প্রবাসী প্রিয়তমের বিপ্রলম্ভে বাধা দীর্ঘকাল শেলবিদ্ধ চিত্তে মৃতকল্প হইয়াছিলেন। আজ তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, প্রেম ক্ষণ-অদর্শন সহ্য করিতে পারে না। প্রিয়তম শীতার্ত ব্যক্তিব নিকট গাত্রাবরণ, গ্রীষ্মের বাতাস, বর্ষাব মস্তকাববণ এবং তটিনীর তবণীর ন্যায় অপরিহার্য। **বরনারী**—নারী-শ্রেষ্ঠা, সম্ভ্রমাত্মক উক্তি। **ভণয়ে·· বরনারী**—রাধার ভাবসম্মিলনের আনন্দোচ্ছ্বাসে কবি তাঁহাকে সম্ভ্রমেব সহিত সম্বোধন করিতেছেন। বৈষ্ণব পদাবলীব কবিবা সখী বা অনুচরেব মত নায়ক-নায়িকার সুখ-দুঃখে, অংশগ্রহণ করেন। বিরহের বিলাপে মিলনের আশ্বাস দেন, মিলনের দিনে নায়িকার আনন্দে অংশ গ্রহণ করেন। কারণ প্রেমিক-সত্তম মাধব তো কেবল বাধাব হৃদয়-মন্দিরেই উপাস্য নন, তিনি তো ভক্ত কবিরও চিৎবিগ্রহ [চৈতন্যোত্তর কবিদেব ক্ষেত্রে বিশেষ করিযা ইহা সত্য]। **সুজনক**—সুজন বা সৌভাগ্যবান ব্যক্তিব। ষষ্ঠীর ক প্রত্যয়, মৈথিলী ব্রজবুলি, ওড়িয়া-হিন্দী-অসমীয়া ইত্যাদি ভাষার বৈশিষ্ট্য। **সুজনক···চারি**—সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তির দুঃখ দীর্ঘস্থায়ী হয না। তাহা অচিরেই মিলন-সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। বিদ্যাপতি ভাবোল্লাসেব মদির মুহূর্তে এই আশাবাদেব সুর বাজাইয়া দিয়াছেন। অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, 'সুজনক প্রেম হেমসমতুল'—সুজনের প্রেম স্বর্ণের মত দিনে দিনে কান্তি বৃদ্ধি করে।

ব্যাখ্যা :

পাপ সুধাকর ভেল

আলোচ্যমান চরণদ্বয় কবিকুলরাজ বিদ্যাপতির ভাবোল্লাস-নামাঙ্কিত রাধামাধবের মিলন বিষযক পদের প্রথমাংশ। ইহা বিরহ অবসানে মিলন-সুখ-উল্লসিতা রাধার বিহ্বল আনন্দোচ্চারণ। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর মাধব আবার রাধিকার মন্দিরে সমাগম করিয়াছেন। তাহারই মুগ্ধ আবেশে অপনীত-বেদনা নায়িকা তাঁহার বিরহস্মৃতির পর্যালোচনা করিতেছেন। প্রিয়বিরহিত জীবনে জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীগুলি ছিল তাঁহার নিকট

অভিশপ্ত। যে চন্দ্রকিরণ সুশীতল, তাহার সুধা একমাত্র রাধারই নিঃসঙ্গ মিলনবঞ্চিত জীবন দগ্ধ করিত। সেই পাপিষ্ঠ দুঃখকর চন্দ্রের অভিশাপের আর সুযোগ রহিল না, এখন প্রিয়মুখ-দর্শনে সেই পরিমাণ আনন্দই উপজাত হইয়াছে। প্রেমিকের মুখও চন্দ্রের তুল্য এবং আনন্দপ্রদ, সুতরাং চন্দ্রের নিকট রাধার আর ভয় বা দুঃখ পাইবার আশঙ্কা নাই। অর্থাৎ এখন যৌবন তাঁহার নিকট দুর্বহ নয়, তাহা সহজেই বহনীয়।

তুলনীয়, সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হোউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥ [বিদ্যাপতি]

(এখন) কোকিল আসিয়া করুক গান।
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান॥
মলয়-পবন বহুক মন্দ।
গগনে উদয় হউক চন্দ॥ [চণ্ডীদাস]

নির্ধন বলিয়া· ··**বড় ধন**—[রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]

আঁচল ভরিয়া···**না পাঠাও**—[রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]

শীতের ওড়নি ···· **দরিয়ার নাও**—[রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]

প্রশ্ন ১। ভাবোল্লাস শব্দের স্বরূপ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া ভাবোল্লাস পদটির কাব্যসৌন্দর্য নিরূপণ কর ও বিদ্যাপতির কবি-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দাও। [ভূমিকা ও আলোচনা দ্রষ্টব্য]।

ষোড়শ শতাব্দীর কাব্যধারা

পঞ্চদশ শতাব্দীর পঞ্চদশী বাঙলা কাব্যধারা ষোড়শ শতাব্দীতে পূর্ণিমাতে উপনীত হইয়াছে, একযোগে দাহ ও দীপ্তি, লাবণ্য ও সমৃদ্ধি প্রকাশ পাইয়াছে তাহার অঙ্গে। পূর্ববর্তী যুগের অপরিণত শাখাগুলি পরিপুষ্ট হইয়াছে, নূতন শাখা-প্রশাখার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু ইহাই ষোড়শ শতকের একমাত্র

পরিচয় নয়। শাখা-উপশাখার পত্রঘনতার অন্তরালে নবজীবনের মৌসুমী চঞ্চলতার যে প্রাণবন্যা জাগিয়াছে তাহাতেই পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের পার্থক্য স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রাণ-প্রাচুর্যের মূলে রহিয়াছে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের অলোকরঞ্জনী প্রতিভা। নদীয়া-নবদ্বীপের গৈরিকবর্ণ লীলাক্ষেত্র হইতে সমগ্র বঙ্গে এবং বহির্বঙ্গেও তিনি তাঁহার মাধুরীপূত জীবনের মধুর সৌগন্ধ্য বিকিরিত করিয়া দিয়াছিলেন। এই সঞ্চরমান কল্পতরুর অযাচিত প্রেম-রতনফল-বিতরণে মুমূর্ষু অবসন্ন জাতি সেদিন পরম-বিস্ময়ে আপনাকে আবিষ্কার করিয়াছিল। কয়েক শতাব্দীর জাড্য ও সুপ্তি-জড়িমা হইতে জাগ্রত হইয়া বাঙালী সেদিন মহৎ মনুষ্যত্বের মহিমায় প্রেমে-ভক্তিতে জীবনকে গড়িয়া তুলিবার দীক্ষা লইল। ধর্মের গোষ্ঠীগত আধিকারিতা নয়, লীলাময় ঈশ্বরের সর্বাতিশায়ী চৈতন্যে আবিষ্ট হইয়া একটি জাতি তাহার নির্জীব প্রাণশক্তিকে পুনরুদ্ধার করিল, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে ধর্মজীবনে চরিত্রাদর্শে এই অভিনব বৈপ্লবিক বিদ্যুৎসঞ্চারই জাতীয় জীবনে চৈতন্যাবদানের মুখ্য ফলশ্রুতি। যে সাহিত্য ছিল একটি প্রাদেশিক ভাষার আঞ্চলিক কলকাকলি, তাহাতে সর্বকালের ব্যবস্থা যুক্ত হইল। বাঙলা সাহিত্যে ও বাঙালী জীবনে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব সম্পর্কে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনাংশটি উদ্ধারযোগ্য—

ষোড়শ শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য

"শ্রীচৈতন্যের জন্ম ও জীবনলীলা শুধু বাঙলার নয়, সমগ্র ভারতের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা। পৃথিবীতে সংঘটিত আর কোনো ঘটনাই জাতীয় জীবনে এত সুদূর ও বদ্ধমূল প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। চৈতন্যধর্মের ভাবপুষ্ট জাতি যেন নূতন জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। তাহার জীবনযাত্রায় তাহার কর্মে ও মনন-চিন্তনে, তাহার কাব্যসাহিত্যে, তাহার সমাজআদর্শ সংগঠনে ইহার প্রভাব অক্ষয় হইয়া আছে। পৃথিবীর কোন এক ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া এক ভক্তির উচ্ছ্বাস এত ভালবাসার আত্মীয়তাবোধ, দেবত্বের এত নিকট স্পর্শ, অন্তরের এত আলোড়ন, কবিত্বের এত অফুরন্ত নির্ঝর, অলংকার দর্শন ও বিধি-রচনার এমন আশ্চর্য মনন-শক্তি, ধর্মচেতনার এমন প্রগাঢ় অনুভূতি ও ধর্মানুষ্ঠানের

শ্রীচৈতন্যদেব

এমন আন্তরিক সাধনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে কিনা সন্দেহ। গৌরাঙ্গলীলা যেমন একদিকে আমাদের সমস্ত জীবনকে ঊর্ধ্বায়িত করিয়াছে, তেমনি আমাদের বাস্তব-চেতনা ও ইতিহাস বোধকেও উদ্দীপ্ত করিয়া আমাদের দিনলিপি (diary), জীবনী (biography) প্রভৃতি নানা নূতন ধরণের সাহিত্যসৃষ্টি করিতেও প্রেরণা দিয়াছে। তাহা ছাড়া, চৈতন্যযুগে যত অধিকসংখ্যক কবি-প্রতিভার উন্মেষ ঘটিয়াছে, কাব্যের সঙ্গে ধর্মানুভূতি ও সমাজ-কল্যাণ-সাধনের যত নিবিড়-সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে, এমন আর অন্য কোন যুগে সম্ভব হয় নাই। দুই শতাব্দীর মধ্যে বাঙালীর কণ্ঠে যত গান ধ্বনিত হইয়াছে তাহার ধর্মপ্রচার ও সমাজ-সংগঠনে যত উৎসাহ দেখা দিয়াছে তাহার মনন-শক্তির যত বিচিত্র প্রকাশ তাহার অন্তর ঐশ্বর্যের পরিচয় দিয়াছে এমন আর কখনও হয় নাই। সুতরাং চৈতন্যোত্তর যুগকে বাঙালীর সাহিত্য ও সমাজ-জীবনের স্বর্ণযুগ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে"।

জীবনে ও সাহিত্যে চৈতন্য-প্রবাহ

[বাঙলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা]

ষোড়শ শতাব্দীর সাহিত্যপ্রবাহ মুখ্যত তিনখাতে প্রবাহিত হইয়াছে, বৈষ্ণব কাব্য, মঙ্গল কাব্য ও অনুবাদ কাব্য। ষোড়শ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙলা কাব্যের ধারাটি মোটামুটি অক্ষুণ্ণ ছিল। কাব্যের বিষয়বস্তু যাহাই হোক না কেন, রীতি-প্রকৃতি ও আঙ্গিকের ভিতর দিয়া সামগ্রিক এই শতাব্দীর সাহিত্য সৃষ্টিকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়, গীতিমুখ্য ও আবৃত্তিমুখ্য কবিতা, প্রথমটি প্রচলিত নাম পদাবলী, দ্বিতীয়টির পাঁচালি। পদাবলীর বিষয় বিভাগ করিলে চার ধরণের শ্রেণী পাওয়া যায়। রাধাকৃষ্ণ পদাবলী, গৌর-পদাবলী, ভজন-পদাবলী ও রাগাত্মিক পদাবলী। পাঁচালি কাব্য আবার দুই শ্রেণীর, দেবকাহিনীমূলক ও প্রণয়কাহিনীমূলক। প্রণয়কাহিনীমূলক পাঁচালি দেবকাহিনী পাঁচালির অনুকরণে ও প্রতিক্রিয়ায় সপ্তদশ শতকেই প্রধানত রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। ষোড়শ শতকের পাঁচালিগুলি ছিল আবার দুই জাতীয়—পৌরাণিক বিষয়াশ্রিত ও মৌলিক বিষয়াশ্রিত। পৌরাণিক পাঁচালিতে সংস্কৃত-পুরাণ-ইতিহাস-কাব্য-কাহিনীর অনুবাদ [রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত] ছিল বিষয়গত অবলম্বন। ইহাদের মধ্যে ভাগবত ও রামায়ণের অনুবাদ পঞ্চদশ শতকেই সূচিত

হইয়াছিল। লোকসমাজে দেবতামাহাত্ম্য-কাহিনী অবলম্বনে পূর্বযুগে মৌলিক পাঁচালি মনসামঙ্গলের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটিয়াছিল, ষোড়শ শতকে সুরু হইল চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার। ধর্মমঙ্গল কাব্যধারা ষোড়শ শতকে কিছু রচিত হইয়াছিল কিনা নিশ্চিত প্রমাণাভাবে বলা সম্ভব নয়।

কিন্তু ষোড়শ শতকে পাঁচালির আর একটি নূতন শাখার আবির্ভাব ঘটিল, ইহা অনুবাদ অথবা মৌলিক কাহিনী-অবলম্বনে নয়, ঐতিহাসিক জীবন্ত-মানুষের জীবৎবৃত্তান্ত অনুসরণে, ইহার নাম চরিত-সাহিত্য। চৈতন্যদেবের অধ্যাত্মপূত মহৎ দেহধারণ-লীলার প্রতি এই যুগের বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টি এই কাব্যগুলির প্রতি পৃষ্ঠায় নিহিত আছে। একটি মর্ত্যলোকের ক্ষীণায়ু তনুদেহে ঐশীশক্তির আশ্চর্য স্ফুরণ দর্শনের অভিজ্ঞতা হইতেই এই জাতীয় কাব্যের সূচনা। তারপর চৈতন্যপ্রবর্তিত ধর্মের প্রচার-উদ্দেশ্যে এই চরিতশাখার প্রচলন ও ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। এই ধরণের কাব্যকে ঠিক পাঁচালি বলাও সংগত নয় কারণ পাঁচালির ভক্তিরস এখানে সমতুল হইলেও জীবনী কাব্য রামায়ণ-ভাগবত মঙ্গলকাব্যের মত বৃহত্তর সমাজের সান্ধ্যপাঠের সামগ্রী হইয়া উঠিতে পারে নাই। চৈতন্য-জীবনীর মধ্যে কোন কোনটি পাঠ্য-নিবন্ধও ছিল। তথাপি আকার-আয়তনে রচনাগত আদর্শে এইগুলি মঙ্গলকাব্য-ভাগবত-রামায়ণের পরিপূরক রূপেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। বৃন্দাবনদাস তাহার চৈতন্যচরিতকে ভাগবতের সাদৃশ্যেই পরিকল্পিত করিয়াছিলেন, গ্রন্থের নাম চৈতন্য-ভাগবতই তাহার প্রমাণ। চৈতন্যজীবনীর সহিত মঙ্গল নামটিও বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে। আবার চৈতন্য-জীবনের আখ্যানে রামায়ণের বর্ণনা-বিবৃতিমূলকতা, বিষয়ভেদে রামায়ণের মত অধ্যায় রচনা [সপ্তকাণ্ডের মত চৈতন্য-জীবনীকে আদ্য মধ্য ও অন্ত্যলীলায় বিভক্ত করা, পরিচ্ছেদ নির্দেশ করা] এইগুলি চরিত-সাহিত্যে রামায়ণের প্রভাব। অন্তরঙ্গ প্রভাব আরও আছে। ভাষা ও ছন্দের দিক দিয়াও এইগুলি পূর্বকথিত কাব্যরীতিকে অতিক্রম করিয়া নূতন সৃষ্টি হইয়া উঠে নাই [হয়ত কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত ঈষৎ ব্যতিক্রম]। তাই চৈতন্য-চরিত গ্রন্থাদি প্রচলিত পাঁচালি

চরিত-সাহিত্য এ যুগের নূতন সৃষ্টি

জীবনী কাব্য কি পাঁচালি শাখাভুক্ত?

চরিতসাহিত্য ও মঙ্গলকাব্য

চরিতসাহিত্য ও রামায়ণ

কাব্যের মধ্যেই গ্রহণীয়। রামায়ণ-ভাগবতে রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ পাঁচালি কবির হাতে ভক্ত-বৎসল দেবতা। রামচন্দ্র কেবল অধম পাপী ভক্তের উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ। তাই রামায়ণ-মহাভারতে মঙ্গলকাব্যগুলির মত অলৌকিকতার ছড়াছড়ি। অথচ সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের নায়ক ছিলেন আদর্শ মনুষ্য। শৌর্যে বীর্যে গুণে গরিমায় তাহাদের দেবতা বলিয়া ভ্রম হইয়াছে মাত্র। কিন্তু মধ্যযুগের কবিরা তাহাদের সম্পূর্ণ দেবাবতার করিয়া তুলিয়াছেন। রামচন্দ্র তাই তুলসীচন্দনলিপ্ত-বিগ্রহ ভক্তবৎসল ও করুণার আধার। মানুষ শ্রীকৃষ্ণকে বৈষ্ণব কবিরা দেবমন্দিরে স্থাপন করিয়া তাঁহার আরাধনা করিয়াছেন। ঠিক একই আচ্ছন্ননয়নে ভক্ত বৈষ্ণবের কাছে শ্রীচৈতন্য হইয়াছেন দেবতার মর্তাবতার, বিশেষ করিয়া শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপস্থ ভক্তদের কাছে। তাঁহাদের হাতে চৈতন্যচরিত তাই অপ্রাকৃত লীলাভাসে, অলৌকিকতায়, তত্ত্বের প্রক্ষেপে ও অন্ধবিশ্বাসে পাঁচালি কাব্য হইয়া উঠিয়াছে। কোনো কোনো চৈতন্যজীবনীতে চৈতন্যের চতুর্ভুজ ও ষড়্‌ভুজ-ধারণেরও উল্লেখ আছে। সেখানেও দেবদেবীর বন্দনা, নমস্ক্রিয়া, নারীগণের পতিনিন্দা, বারমাস্যা, খাদ্যদ্রব্য ও রন্ধনের বিতানিত বর্ণনা মঙ্গলকাব্যের স্পষ্ট স্মারক। বৃন্দাবনদাস, জয়ানন্দ ও লোচনদাস তাঁহাদের চরিতকাব্যে রাগরাগিণীর উল্লেখ করিয়াছেন।

চরিত সাহিত্যে পাঁচালীর সুস্পষ্ট আঙ্গিক

প্রাক্‌চৈতন্য ও চৈতন্যপরবর্তী যুগের কাব্যে একটি ভেদরেখা মৌলিক বলিয়া দৃষ্টি আক্ষিপ্ত করে। পূর্বশতকের কবিগণ আধুনিক অর্থে ব্যক্তিত্ববাদী ছিলেন বটে, কিন্তু তাহাদের একটি একক স্বাতন্ত্র্য ছিল। বিদ্যাপতি কিংবা চণ্ডীদাস, মালাধর কিংবা কৃত্তিবাসের কাব্য হইতে তাহার প্রমাণ মেলে। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর কবিবৃন্দ, বিশেষত বিপুলসংখ্যক বৈষ্ণব কবিরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য হারাইয়া একটি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মধ্য ধীরে ধীরে লীন হইতেছেন। একটি নিয়ন্ত্রক-সমাজ, ধর্ম ও আদর্শের মানদণ্ড দিয়া, কবিদের স্বাধীন স্ফুরণ ও স্বাতন্ত্র্যবাদী কবিকৃতিকে পরিচালিত করিতেছে। এই গোষ্ঠীর শাসনে কবিতায় একটি সার্বভৌমত্ব, শুচিশীলিত নিষ্ঠা, কাব্যোন্নয়নের নির্ধারিত আদর্শ প্রকাশ পাইয়াছে। সেইসঙ্গে সীমাবদ্ধ পরিবেশে বিশ্বাস-গৃহীত বিষয়ের চারুতা-

সৃষ্টিতে, প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের মধ্য দিয়া কবিরা মৌলিকত্ব প্রকাশের কঠিন দায়িত্ব পালন করিয়াছেন।

চৈতন্যদেব ছিলেন রাধাভাবের মূর্ত বিগ্রহ, বৈষ্ণবগণের বিশ্বাস ছিল তিনি শ্রীরাধার অঙ্গকান্তি এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ব্যাকুলতার মূর্তিমান নররূপ ছিলেন। সুতরাং সমকালীন কবিবৃন্দ তাঁহাকে দেখিয়াই কাব্যরচনা করিয়াছেন, অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের কবিদের স্মৃতিপটে প্রাক্তন যুগের ভাবস্থির মূর্তিটির ঔজ্জ্বল্য ম্লানতর হয় নাই। সুতরাং অস্বাভাবিক কল্পনা তাঁহাদের রচনাকে অতিমাত্রায় বিবর্ণ কিংবা বায়বীয় করে নাই, এবং এই আদর্শের ঐক্যবশত কবিদের চরিত্রসৃষ্টি ও প্রেমবর্ণনা সাধর্ম্যমূলক হইয়াছে। এইভাবে রাধার প্রভাব শ্রীচৈতন্য ও চৈতন্যদেবের প্রভাব শ্রীরাধিকাকে গড়িয়া তুলিয়াছে।

কেবল চৈতন্য নয়, তাঁহার আবির্ভাবে যে বৈষ্ণব দর্শন ও অলংকার শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাও এই যুগের কাব্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইহাও জাতীয় ঐক্যসৃষ্টির প্রধান সহায়ক ছিল। প্রাক্‌চৈতন্য যুগে বৈষ্ণব গীতিকবিতা ছিল কিন্তু কোনো দর্শন ছিল না। ষোড়শ শতকেই বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ চৈতন্যদেবের জীবনচর্যা ও বাণীকে অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণব দর্শন-শাস্ত্র রচনা করিলেন যাহাতে রাধাতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্ব গোপীতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইল। এই যুগের কবিগণ এই তত্ত্ব অবলম্বন করিয়াই কাব্য রচনা করিলেন। অলংকারশাস্ত্র রচনা করিয়া তাহার আলোকে কবিতার ভাবব্যূহ রচনাও এই শতকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

বাধাবন্ধহীন অনুরাগের প্রতীকরূপে রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার জনপ্রিয়তা সুপ্রাচীন কাল হইতে ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাঙলা দেশে

ষোড়শ শতকের পদাবলী সাহিত্য

সাহিত্যে এবং সাহিত্যব্যতিরিক্ত অন্যান্য শিল্পে, লোক-সংগীতে, ভাস্কর্যে কৃষ্ণলীলার ইঙ্গিত খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিক হইতেই পাওয়া যায়। ১০ম হইতে ১২শ শতকের মধ্যে সংস্কৃত প্রাকৃত অপভ্রংশের খণ্ড খণ্ড কবিতায় রাধাকৃষ্ণের প্রণয় প্রসঙ্গের নানাবিধ উল্লেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে। হয়ত গোড়া হইতেই এই সকল কবিতার মধ্য দিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা অপেক্ষা লোকায়ত প্রণয়-স্বভাবই জনমানসে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কালক্রমে ভাগবতোক্ত ঈশ্বর-কৃষ্ণের সহিত একীভূত হইয়া এই সকল প্রেমগীতিকার নায়ক অনুরক্তি ও ভক্তির যুগপৎ

মাহাত্ম্যে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। লৌকিক প্রেমের সহিত আধ্যাত্মিকতার মিশ্রণে জগদীশ্বর বিষ্ণুর প্রেমলীলার অভিনয়-সৃষ্টিতে বাঙালী কবিদের বিশেষ কৌতূহল ও উৎসাহ দেখা যায়। হয়ত প্রাক্‌চৈতন্য যুগের কবিদের নিকট শ্রীকৃষ্ণের গোপীপ্রেম তাঁহার লীলায়িত ভগবৎসত্তারই একটি বিচিত্র স্ফুরণ রূপে প্রতিভাত হইয়াছিল, রাধিকা সেখানে ভক্তিপাত্র হিসাবে গৌণস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ক্রমে প্রেমিকশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের গোপীমুখ্যা রাধিকার প্রতি আকর্ষণই তাঁহাকে ভক্তহৃদয়ে অভ্রান্ত আনুগত্যের শুকতারারূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। জয়দেবের কাব্যেই লৌকিক নারীত্ব হইতে রাধিকা প্রেম ও ভক্তির স্বর্ণহারমণ্ডিত হইয়া দেবত্বের আসনে বিরাজিতা হইয়াছেন এবং বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস জয়দেবের ধারাকেই আরও নিঃসংশয়িত-ভাবে উজ্জ্বলতর করিয়াছেন। চৈতন্যদেব কর্তৃক আস্বাদিত হওয়ায় এই সময়কার বৈষ্ণব পদগুলি ক্রমশ আদিরসের অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া ভক্তির শুচিস্নিগ্ধ পাদপীঠে উন্নীত হইয়াছিল। সুতরাং প্রাক্‌চৈতন্য বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে প্রধানত লৌকিক প্রেমের পটভূমিকাতেই স্থাপন করা হইয়াছে। কোথাও কোথাও ভক্তিপ্রাণতার সুরটি বাজিলেও তাহার পশ্চাতে গূঢ় আধ্যাত্মিকার ব্যঞ্জনা আবিষ্কার করা যায় না। অধিকাংশ স্থানে কৃষ্ণের মাধুর্যও ঐশ্বর্যরূপ মিশ্রিত হইয়া গেছে। চৈতন্যোত্তর যুগের কবিরাও ঐশ্বর্যকে পরিহার করিয়াছেন। প্রাক্‌চৈতন্য কবিদের অভিসার বর্ণনা, পূর্বরাগ, বয়ঃসন্ধি প্রভৃতি পর্যায়ক্রম, বাসকসজ্জিকা খণ্ডিতা প্রভৃতি নায়িকালক্ষণ আলংকারিক রীতিসম্মত হইয়াই কাব্যের আসরে প্রবেশ করিয়াছে। পরবর্তী বৈষ্ণব কবিরা সম্পূর্ণ ভাবে এই ঐতিহ্য আত্মসাৎ করিয়া ইহার উপর গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সিদ্ধান্ত ও দার্শনিক তত্ত্ব আরোপ করিয়াছেন। প্রাক্‌চৈতন্যযুগের কবিতা কাব্যরূপেই প্রধানত পরিচিত, চৈতন্যোত্তর যুগের কবিতা কীর্তনগানের ঐতিহ্যের প্রবর্তক। প্রাক্‌চৈতন্য কবিতায় সারল্য ও স্পষ্টতা, চৈতন্যোত্তর কবিতায় অর্থজটিলতা ব্যঞ্জনা ও ছন্দের কারুকার্য, সাংকেতিকতা ও ভাষার দ্যুতি, শব্দসচেতনতা ও গোষ্ঠীকেন্দ্রিকতা দেখা দিয়াছে।

জয়দেবের প্রভাব

প্রাক্‌চৈতন্য প্রেমের স্বরূপ

চৈতন্যসমকালীন কবিরা শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষ জীবনস্পর্শ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, তাহাদের রচনায় সেই বিস্ময় ও আনন্দের দ্বিধাহীন

গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদে ষোড়শ শতাব্দীর দৃষ্টিভঙ্গি

স্বীকৃতি আছে। চৈতন্যদেবের ব্যক্তিগত অধ্যাত্মচেতনামণ্ডিত দিব্য জীবনাবেশ যাঁহাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সামগ্রী ছিল, তাঁহারা রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়-মহিমা অপেক্ষা সেই দিব্যজীবনের বর্ণনা, তাঁহার সামাজিক জীবনের বিবরণ দিতেই উৎসাহ বোধ করিয়াছেন। তাঁহার বাল্য ও কৈশোর জীবনের বর্ণনা, তাঁহার গৃহত্যাগ ও সন্ন্যাস জীবন, এই সকল বিষয়ই ষোডশ শতকের মধ্য-ভাগের কবিবৃন্দের রচনায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। অর্থাৎ সমসাময়িক কবিদের হাতে রাধাভাবদ্যুতিসম্পন্ন কৃষ্ণস্বরূপ চৈতন্যের বর্ণনাময় রূপ তখনও গৌরচন্দ্রিকায় পরিণত হয় নাই। তখনও পর্যন্ত বৃন্দাবনের গোস্বামীরা ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বা উজ্জ্বলনীলমণি জাতীয় শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করেন নাই বলিয়া ষোডশ শতকের কবিদের উপর শাস্ত্রীয় তত্ত্বগভীরতা তীব্র নয়। সুতরাং ইহা নিশ্চিত বলা যায় যে, চৈতন্যসমকালীন কবিরা তত্ত্ব সাগরের তীরে দাঁড়াইয়া চৈতন্যদেব ও রাধাকৃষ্ণ লীলা দর্শন করিয়াছেন। কিন্তু চৈতন্যোত্তর কবিরা তত্ত্বসমুদ্রে অবগাহন করিয়া ও দার্শনিক সিদ্ধান্তে নিমজ্জিত হইয়া কাব্য-মন্ত্রপাঠ করিয়াছেন। সমকালীন কবিরা চৈতন্যদেবকে ঐশীভাবাপন্ন মানবরূপে দেখিয়াছেন—যে মানব তাঁহার জীবৎকালেই দেবতার অমর মহিমায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ষোডশ শতকের শেষভাগের ও সপ্তদশ শতকের কবিদের কাব্যে চৈতন্যদেবের এই মানব রূপটি ক্রমশ নিষ্প্রভ হইয়া গেছে। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের দ্বারা প্রচারিত অবতারতত্ত্ব চৈতন্যদেবকে সম্পূর্ণভাবে রাধাভাবে ভাবিত করিয়া তুলিয়াছে। ফলে চৈতন্যপরবর্তী কবিরা আর গৌরলীলা লিখিতে পারেন নাই, গৌরচন্দ্রিকা লিখিয়াছেন। বৃন্দাবনের দার্শনিকগণের সিদ্ধান্ত ও তত্ত্বপ্রচারই চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিতাকে গভীরভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। কিন্তু চৈতন্যসমকালীন কবিরা নদীয়া-নবদ্বীপের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া চৈতন্য-দেবকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখিয়াছিলেন। অথচ সে দেখায় ভক্তির অভাব ছিল না। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

চৈতন্যদার্শনিকতা ও আলংকারিকতা

কলিযুগে ধর্ম হয় হরিসংকীর্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন॥

এই কহে ভাগবতে সর্বতত্ত্বসার।
কীর্তন নিমিত্ত গৌরচন্দ্র অবতার॥

গৌরলীলা

এই বিশ্বাসেই চৈতন্য সমকালীন কবিরা গৌরচন্দ্রের লীলা দেখিয়াছেন ও বর্ণনা করিয়াছেন। নরহরিদাসের ভাষায়—

গৌরলীলা দরশনে ইচ্ছা বড় হয় মনে
ভাষায় লিখিয়া সব রাখি।
মুঞি তো অতি অধম লিখিতে না জানি ক্রম
কেমন করিয়া তাহা লিখি॥...
গৌর-গদাধরলীলা আদ্রবে করয়ে শিলা
কার সাধ্য করিবে বর্ণন।
সারদা লিখেন যদি নিরন্তর নিরবধি
আর সদাশিব পঞ্চানন॥

গৌরলীলাদর্শনের এই চাক্ষুষ পুলক ও বিস্ময়, আকাশচারী বিদ্যুতের এই স্থির-দীপ্তির অবিস্মরণীয় স্মৃতিকেই সমকালীন কবিরা মোটামুটি ধরার চেষ্টা করিয়াছেন। কীর্তনিয়া গোবিন্দ ঘোষের একটি পদ—

হেদেরে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও
বাহু পসারিয়া গোরাচান্দেরে ফিরাও॥

বংশীবদনের পদ অনুরূপ বাস্তব জীবনাবেগে স্ফুরিত। নয়নানন্দ, বাসুদেব ঘোষ, মাধব ঘোষ, মুরারি গুপ্ত, নরহরি সরকার, গোবিন্দ আচার্য, রামানন্দ বসু, শিবানন্দ সেন, মুকুন্দ দত্ত, পরমানন্দ গুপ্ত প্রভৃতি নদীয়ালীলার সহচর কবিবৃন্দের রচনায় চৈতন্যদেবের শ্রদ্ধাঘন ঐতিহাসিক জীবনমূর্তি ধৃত হইয়াছে। শ্রীরূপ গোস্বামী, রঘুনাথদাস গোস্বামী, অনন্ত আচার্য, দেবকীনন্দন, নয়নানন্দ মিশ্র প্রভৃতি কবিবৃন্দ চৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের পর তাঁহার সংস্রবে আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের রচনায় চৈতন্যের পরবর্তী জীবনের চিত্রগুলি নির্ভরযোগ্য সততা লাভ করিয়াছে।

কবিবৃন্দ

উত্তর ষোড়শ শতকের কবিদের মধ্যে আছেন বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ এই তিন চৈতন্যজীবনীকার, ভাগবতানুবাদক মাধবাচার্য

ও কৃষ্ণদাস এবং পদকর্তা বলরাম দাস ও জ্ঞানদাস। ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে অন্তিম লগ্নে বৈষ্ণব কাব্যধারায় নূতন তরঙ্গাবেগ সঞ্চার করেন গোবিন্দদাস কবিরাজ, সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। ইহা ছাড়া এই পর্যায়ে আরও ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য, গোবিন্দ চক্রবর্তী, নরোত্তম ঠাকুর, বসন্ত রায়, বল্লভদাস, চম্পতি, শ্যামানন্দ, রায়শেখর প্রভৃতি কবিকুল।

রামদাস পরবর্তী কবিবৃন্দ

মাধুকরী কাব্য সংকলনে বাসুদেব ঘোষ, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস কবিরাজ ও রায় শেখরের কয়েকটি বৈষ্ণব কবিতা পাঠ্যতালিকায় নির্দিষ্ট হইয়াছে।

ষোড়শ শতাব্দীর কাব্যমহীরুহের অন্যতম প্রধান শাখা চণ্ডীমঙ্গল এবং এই কাব্যরীতির সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম সমগ্র মধ্যযুগের অন্যতম প্রথম শ্রেণীর কবি। মুকুন্দরাম একটি লৌকিক ধর্মমূলক কাহিনীকে সাহিত্যের প্রসাদগুণে মণ্ডিত করিয়া তাহাকে জাতীয় কাব্যের রূপ দান করিয়াছেন। মুকুন্দরাম ও তাঁহার সমকালীন কবি দ্বিজ মাধবের মঙ্গলচণ্ডীর গীত ষোড়শ শতাব্দীর অষ্টম দশকের কাছাকাছি সময়ে লিখিত হয়। তখন পদাবলীর ভাবস্রোতে বাঙলাদেশ মেদুর হইয়া উঠিয়াছে, নামকীর্তন ও প্রেমধর্মে, হরিভক্তিবিলাস ও কৃষ্ণ-রতিকুতূহলে সমগ্র জাতি আচ্ছন্ন। এই প্রসঙ্গে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য গ্রন্থে কবিশেখর কালিদাস রায় লিখিয়াছেন—

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ধারা

"বাঙালী যে দেবীর নিকট ধনধান্য চাহিয়াছে, সংকট হইতে পরিত্রাণও চাহিয়াছে, যাঁহাকে নানাভাবে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছে তিনিই মঙ্গলচণ্ডী। শ্রীচৈতন্যদেবের বহুপূর্ব হইতে চণ্ডীমঙ্গলের মূল আখ্যানটি পাঁচালির আকারে চলিয়া আসিতেছিল। ভক্ত বৃন্দাবনদাস লৌকিক কামনামূলক ধর্মের অতিরিক্ত প্রভাবে প্রকৃত ধর্মের মর্যাদাহানি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,

তৎকালীন সমাজ ও ধর্ম

ধর্ম কর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে ॥

মনসামঙ্গলের গান ও চণ্ডীমঙ্গলের গান বাঙলা দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছিল। লোকে এই গানে প্রচুর আনন্দও পাইত।"

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সম্পর্কে একটি সাধারণ পরিচয় ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনা হইতে উদ্ধৃত হইল—

"চণ্ডীমঙ্গলের বৈশিষ্ট্য উহার দ্বিকোটিক পরস্পর-অসংপৃক্ত আখ্যানভাগ, উহার দেবতা-মানুষের অপেক্ষাকৃত মৃদু সংঘাত ও অনায়াস মিলন, উহার দেবীপ্রকৃতির আর্য ধর্মের মাতৃশক্তিতে ত্বরিত রূপান্তর ও বহুমুখী বিস্তার, উহার শিথিল দেবশাসনের অবকাশে সমাজ-চেতনার স্বাধীন স্ফুরণ, সর্বোপরি দেবমহিমা বর্ণনার গতানুগতিকতার মধ্যে প্রতিভার অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব, বন্যপশুকুলের রক্ষয়িত্রী হইতে পশুপীড়ক ব্যাধের সম্পদদাত্রী ও সেখান হইতে ধনী বণিক পরিবারের মেয়ে-মহলের পূজাপাত্রী-দেবীর এই ক্রম-বিবর্তনের মধ্যে কোনো যোগসূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ব্যাধ ও বণিক কাহিনীদ্বয় কেমন করিয়া একসূত্রে গ্রথিত হইল, দেবীর এই সামাজিক উন্নয়ন কেমন করিয়া সম্ভব হইল, ব্যাধসমাজে যে দেবী নির্বিবাদে গৃহীত হইয়াছিলেন, বণিক সমাজে তিনি স্ত্রী-দেবতা বলিয়া কেন অবহেলিতা ও প্রত্যাখ্যাতা হইলেন এই সব প্রশ্নের কোনো উত্তর মিলে না। কালকেতু উপাখ্যানে যিনি স্বর্ণগোধিকা, ধনপতি আখ্যানে তিনি গজলক্ষ্মীর ছদ্মবেশধারিণী সামুদ্রিক মরীচিকায় রূপান্তরিত হইয়াছেন। কলিঙ্গরাজের রাজ্যে যিনি প্লাবন আনিয়াছিলেন, তিনি কেবল স্বপ্নাদেশ দ্বারা যেমন কালকেতু তেমনি ধনপতি-শ্রীমন্তের কারামুক্তি-সাধন করিয়াছেন। যেমন কালকেতুর নগর-প্রতিষ্ঠায় তেমনি ধনপতির পারিবারিক দ্বন্দ্ব-মীমাংসায় তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁহার নিজস্ব দেবমহিমার গণ্ডীতে তিনি স্থির আসনের আশ্বাস পাইলেই ভক্তের অন্যান্য ব্যাপারে তিনি স্বাভাবিক পরিণতির পথে কোনো বাধা দেন না। তাঁহার শাস্তির মধ্যে যেমন হিংস্র আতিশয্য নাই, তাঁহার কৃপার মধ্যেও সেইরূপ অপরিমিত দাক্ষিণ্যের অভাব। তাঁহার ক্রোধ প্রভাত-মেঘের ন্যায় ক্ষণিক বিপর্যয় বনাইয়া তোলে, তাঁহার প্রসাদও সেই স্বল্পবর্ষণ মেঘকে গলাইয়া আবার সূর্যকরোজ্জ্বল আকাশ-নীলিমাকে অবারিত করে।

চণ্ডীমঙ্গলের দুই আখ্যান

পশু ও বণিক সমাজের দেবী

দেবতার অনুচিত প্রভাবমুক্ত এই কাব্যজগতে সেইজন্য সমাজ-জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত লীলা, উহার মৃদুবায়ুচঞ্চল নৃত্যশীল তরঙ্গভঙ্গ, উহার বঙ্কিম কটাক্ষের

দ্যুতি ও তির্যক পরিহাসের ঝিলিক। এমন কি এই স্নিগ্ধ পরিহাসের আওতা হইতে স্বয়ং দেবীও বাদ যান নাই। দেবতা সম্বন্ধে মানুষের মনোভাব যে ভীতি-সম্ভ্রম, এমন কি ভক্তির আতিশয্য হইতে মুক্ত হইয়া সহজ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেই তাহার প্রমাণ। দেবতা মানুষের জীবনের উপর ছায়াপাত করিয়াছেন, কিন্তু তাহাকে সম্পূর্ণ আড়াল করিয়া দাঁড়ান নাই। ধর্ম ও মনসামঙ্গলে সমাজ আছে, কিন্তু বিচ্ছিন্ন পারিবারিক সংস্থায় বিভক্তরূপে ইহাদের মধ্যে সমাজের স্থূল সত্তা আছে, সূক্ষ্ম প্রাণরস নাই, উহার কিছুটা বস্তুপরিচয় আছে, কিন্তু স্বচ্ছন্দ বিকাশের ছন্দ নাই। চরিত্রের দিক দিয়া ধর্মমঙ্গলের লাউসেন, ইছাই ঘোষ, কলিঙ্গা, কানড়া, মহামদ, কালু, লখাই প্রভৃতি কেহ বা অতিমানবিক, কেহ কেহ বা একমুখীন কর্তব্যনিষ্ঠা ও দুষ্প্রবৃত্তির শৃঙ্খলে দৃঢবদ্ধ। মনসামঙ্গলে চাঁদ সদাগর, সনকা, লখীন্দর, বেহুলা মাছমারা গোদা, পতিনিন্দাকারিণী পুরনারীগণ সবই যেন একটি কঠিন প্রথাগত সমস্যার বন্ধনে আড়ষ্ট বা উহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ায় আস্ফালনশীল। সহজ, সমস্যামুক্ত প্রাণলীলা ইহাদের কাহারও মধ্যে দেখা যায় না।

সমাজ চিত্র

চণ্ডীমঙ্গল ও অন্যান্য মঙ্গলকাব্য

চণ্ডীমঙ্গলের সমাজচিত্র ও চরিত্রকল্পনায় বহিরবয়ব ও অভ্যাস-সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে একটি অন্তর-চেতনা ও প্রাণলীলা-দ্যোতনারও পরিচয় আছে। সমাজ এখানে একটি বিচিত্র সত্তায় সংহত ও একটি অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়ের আধাররূপে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। কালকেতু ও তাহার পিতামাতার অভ্যস্ত জীবনযাত্রার চারিদিকে রীতি-নীতি-আচারে দৃঢবদ্ধ, কেন্দ্রীভূত জীবনোদ্দেশ্যে স্থিরলক্ষ্য, অস্তিত্বের আনন্দে ও গোষ্ঠী-সংহতিবোধে উচ্ছল একটি বৃহত্তর ব্যাধসমাজের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। গুজরাট শহরে নবনগরপত্তনের বর্ণনায় আমরা বৃত্তিবিন্যস্ত, বিভিন্ন জাতির কর্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে সচেতন, ব্যাপকতর সংশ্লেষবিধৃত এক নূতন সমাজের প্রাণস্পন্দন অনুভব করি। চাঁদ সদাগরের বেণে সমাজের কথা শুনি, কিন্তু উহার সক্রিয়তার বিশেষ কোনো নিদর্শন পাই না। কিন্তু ধনপতির স্বজাতীয়েরা মোটেই নিষ্ক্রিয় বা উদাসীন নয়, তাহারা সমাজ-বিধিরক্ষার জন্য অত্যুৎসাহী, কুৎসায় মুখর, দণ্ডে

সক্রিয় জীবনাবেগ সম্পন্ন সমাজ

নির্মম, সন্দেহে তীক্ষ্ণ। এখানে সমাজ-শাসন দেবশাসনের উত্তরাধিকারীরূপে ক্ষুদ্রতর মানুষ ও পরিবারের নিয়ন্ত্রণভার নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছে।

চরিত্র-পরিকল্পনায় শ্রেষ্ঠত্ব

চরিত্র পরিকল্পনায় চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। মুরারি শীল ভাঁড়ু দত্ত দুর্বলা দাসী, ইহারা আপন প্রাণদীপ্তিতে স্বয়ং সমুজ্জল। ইহারা দেবতার ছাড়পত্র বা কোনো নীতির অনুশাসন হাতে লইয়া সংসারে প্রবেশ করে নাই—বাঁচিবার জন্মগত অধিকার, স্ব-ইচ্ছার স্বাধীন প্রেরণা, অবিমিশ্র জীবনানন্দ লইয়াই ইহারা আমাদের নিকট আবির্ভূত হইয়াছে। ইহারা কোনো উদ্দেশ্যের বাহন নয়, কোনো বলিষ্ঠতর শক্তির করদ প্রজা নয়, কোনো দৈবঘটনার পুচ্ছতাড়িত অসহায় ক্রীড়নক নয়—অসংবরণীয় প্রাণবেগ-চাঞ্চল্যেরই অনিবার্য অকারণ প্রকাশ। ইহারা আখ্যানের পিছনের দরজা দিয়া আসে নাই, আসিয়াছে জীবনসমারোহের সিংহদ্বার দিয়া। ইহারা একতাল কাদা নয়, এক কণা বহ্নিস্ফুলিঙ্গ যাহাকে নিভান যায় না বা আবর্জনাস্তূপে নিক্ষেপ করা যায় না। কালকেতু ফুল্লরা জাতিতে অন্ত্যজ ব্যাধ হইলেও

চিরতরঙ্গিত প্রাণের খেলা

প্রাণৈশ্বর্যে শাশ্বত অভিজাতবংশীয়। তাহারা সাহিত্যের প্রথানুযায়ী নায়ক-নায়িকা নয়, তাহাদের প্রবল জীবননিষ্ঠা, জীবনরস-উপভোগের একান্ত স্পৃহাই তাহাদের জন্য এক অলংকার শাস্ত্র-বহির্ভূত রাজাসন রচনা করিয়াছে। আশ্চর্যের কথা এই যে, যখন তাহারা চণ্ডীর অনুগ্রহে সত্যিকার রাজারানীর

কালকেতু-কাহিনী

পদে উন্নীত হইয়াছে তখন তাহাদের নৈসর্গিক রাজদীপ্তি নিষ্প্রভ হইয়াছে তবু কালু যুদ্ধে পরাজয়ের পর ধান্যগুহায় লুকাইয়া নিজ অনির্বাণ প্রাণমহিমার শেষ ঝলক বিকীর্ণ করিয়াছে। মাংসের পশরাহীন ও বারমাসী দুঃখচক্রের সহিত অসংশ্লিষ্ট রানী ফুল্লরাকে আমরা চিনিতে পারি না। শ্রীমন্তের সহিত সিংহল রাজকন্যা সুশীলার বিবাহ গতানুগতিক রোমান্স-অনুসারী। কিন্তু ধনপতি খুল্লনার প্রতি যে প্রেম

ধনপতি কাহিনী

নিবেদন করিয়াছে তাহা তাহার প্রাণের উদ্বৃত্ত ভোগ-লালসা ও রূপাসক্তিরই প্রত্যক্ষ ফল। পায়রা-উদ্ধারের ছলে হৃদয়-অধিকারের দাবী এই নূতন প্রাণোচ্ছলতা ও অধিকারবোধ হইতে উদ্ভূত। লহনা ও খুল্লনার নির্যাতন-লাঞ্ছিত সপত্নী বিদ্বেষটি আমাদের সাধারণ

পারিবারিক জীবনের মাত্রা অতিক্রম করিয়াছে। খুল্লনার উপর অত্যাচার ও তাহার সতীত্বপরীক্ষা পৌরাণিক আতিশয্য-প্রভাবিত। তথাপি গঙ্গা-দুর্গার সপত্নী-কোন্দলের সহিত তুলনায় লহনা-খুল্লনার ঈর্ষাবিকৃত সম্পর্কটি অধিকতর বাস্তবধর্মী।

কিন্তু চণ্ডীমঙ্গলের সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য এই ধারায় মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র এই দুই অসাধারণ কবিপ্রতিভার আকস্মিক আর্বিভাব। দৈব-প্রভাবাবিষ্ট জনকল্পনার সমুদ্রতীরে বিকীর্ণ শতশত রুত-উদ্ভাসিত ও যুগে-যুগে বিবর্তিত আখ্যান-শুক্তিমালার মধ্যে যে কেমন করিয়া এই দীপ্তিসমুজ্জ্বল মৌক্তিক যুগলের জন্ম হইল, তাহা প্রতিভারহস্যের একটি অনুদ্ঘাটিত সত্য। হাজার কবির হস্তক্ষেপজীর্ণ লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্ধ সংস্কারে মলিন, চিরতরে নির্ধারিত আখ্যান-কাঠামোর মধ্যে এই দুইজন কবি কেমন করিয়া প্রচুর জীবনরস-সঞ্চয়ের অবকাশ পাইলেন, জীবন্ত চরিত্র-সংযোজনার প্রেরণা পাইলেন তাহা সত্যই এক পরমাশ্চর্য ব্যাপার।

প্রতিভাশালী কবি

চণ্ডীদেবী এক অনার্য ব্যাধনন্দনকে কৃপা করিয়াই চণ্ডীমঙ্গলের কবিদিগকে এক অপরিচিত বিষয়ের সন্ধান দিয়াছেন। তিনি অরণ্যপশুবৃন্দের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে মানুষের অন্তরবেদনা-প্রকাশের এক নূতন রূপকপদ্ধতি কবিদের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। নূতন নগর প্রতিষ্ঠার ব্যাপদেশে তৎকালীন বাংলা দেশে নূতন স্মৃতিশাস্ত্রানুযায়ী নব সমাজ-সংগঠনের উপলক্ষটি যুগের দাক্ষিণ্য বলিয়াই মনে হয় ও সমাজসচেতন কবিগোষ্ঠী এই দাক্ষিণ্যের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। এইরূপে নূতন উপাদানপুষ্ট কবিপ্রতিভা আবার এই উপাদানকেই অবলম্বন করিয়া ইহাদের মধ্যে জীবনরস স্ফুরণ ও শিল্পকলা-মণ্ডনের শাশ্বত সৌন্দর্যরূপটি ফুটাইয়া তুলিয়াছে।" [বাঙলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা]

অন্তর্বেদনা প্রকাশের নূতন রূপক

সুতরাং মঙ্গলকাব্য ধারার ইতিহাসে চণ্ডীমঙ্গলের ব্যতিক্রান্ত মৌলিকতা তাহার জীবন নিষ্ঠা ও মৃৎসচেতনতায়। চণ্ডীদেবীর বীভৎস উগ্ররূপখানি সংবৃত হইয়া তখন পৌরাণিক কল্যাণশ্রী শান্তরূপের সহিত মিলিয়া যাইতেছিল। দেবতা ও মানবের হীন প্রতিযোগিতার বদলে কেবল বিপন্ন ভক্তের আহ্বানে সাড়া দিবার উপলক্ষে মর্তে অবতীর্ণ হইবার পরিকল্পনাই দেবীচরিত্রের পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সমাজ এই

চণ্ডীমঙ্গলের মৌলিকতা

কাব্যে তাহার প্রতিদিনের তাচ্ছিল্যলিপ্ত বস্তুভার লইয়া উপস্থিত, জীবন এখানে আতিশয্যবর্জিত লোকায়ত, গৃহ এখানে সপত্নীকলহে মুখরিত, পথঘাট এখানে জলৌকা সর্প-সঙ্কুল, সংসার এখানে সহস্র বাধাবন্ধন-সংস্কার-নিষেধে তর্জনী-ধারী। জনৈক ইতিহাসকারের ভাষায়—

"বাঙালীর সুখদুঃখ, সামাজিক দলাদলি, কুসংস্কার, বারমাস্যা, রন্ধন-প্রণালী ভোজ্য-তালিকা, বেশভূষা, বিবাহবিধি, পরনিন্দা প্রভৃতি অতি সাধারণ ব্যাপারকেও চণ্ডীমঙ্গলে আস্বাদ্য করিয়া তোলা হইয়াছে। ··বঙ্গসাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গলের প্রধান দান বাস্তবপ্রিয়তা ও মানবমুখিতা। এইদিক দিয়া চণ্ডীমঙ্গল আধুনিক রিয়ালিস্টিক উপন্যাসের সগোত্র। চণ্ডীমঙ্গলের কবি দেবতার দোহাই দিয়া যথেচ্ছাচার করেন নাই, বর্ণনীয় ঘটনাকে যথাসম্ভব যুক্তিগ্রাহ্য ও বিশ্বাসযোগ্য করিবারও চেষ্টা করিয়াছেন।··চণ্ডীমঙ্গলে লৌকিক অলৌকিক সমস্ত ব্যাপকই মানববাচক, পরিচিত মানবীয় আচরণের দ্বারাই কবিগণ সমস্ত কিছু ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। চণ্ডীমঙ্গলের পশুসভা ছদ্মবেশী মনুষ্যসভা মাত্র। সমাজ সচেতন দৃষ্টি ভঙ্গিতেও চণ্ডীমঙ্গল কাব্য বিশিষ্ট। এই সমাজ চেতনা কবির বাস্তববাদিতারই ফল।··চণ্ডীমঙ্গলের রস বাস্তব জীবনরস হইলেও তাহা প্রায়ই কৌতুকমিশ্রিত।··মানব চরিত্রে মহত্ত্ব-আবিষ্কার নয়, ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভণ্ডামি, প্রতারণা, ধূর্ততা, অতিরিক্ত-সরলতা, মূর্খতা প্রভৃতি বিচিত্র প্রকার অসংগতি প্রদর্শন করিয়া ইহাতে পরিহাস-কৌতুক উৎপাদন করা হইয়াছে।"

দৈনন্দিন জীবন

বাস্তবতা

মানবিক-জীবন

চরিত্র

[তারাপদ ভট্টাচার্য—বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস]

এই সকল স্বভাব ও গুণ, ধর্ম ও বিশিষ্টতা মুকুন্দরামের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। ধর্মবিশ্বাসে পঞ্চোপাসক ব্রাহ্মণ এবং মনোধর্মে বৈষ্ণব ভাবাপন্ন হইয়াও মুকুন্দরাম যে চণ্ডীমঙ্গলকাব্য রচনার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল তাহার একমাত্র কারণ 'কাল্ট্'-বিশেষের প্রচার উদ্দেশ্য নয়, বরং একটি সর্বজনপ্রিয় কাহিনীর মধ্য দিয়া আপন কবিস্বভাবের অনুশীলন ও যুগচেতনা। এই দিক দিয়া চণ্ডীমঙ্গলই তাঁহার প্রতিভাপ্রকাশের সর্বোত্তম বাহনরূপে বিবেচিত হইয়াছিল। ইহার

কবিস্বভাবী মুকুন্দরাম

সমাজীকৃত বাস্তবমুখী মানবতার রূপটিকে অবলম্বন করিয়া তিনি কৌতুকপ্রাণ জীবনোচ্ছল একটি আখ্যায়িকা কাব্যের বিস্তৃত সূচীপত্র রচনা করিলেন। অন্ধ বিশ্বাস-প্রবণতা, সান্দ্রভক্তির আধ্যাত্মিকতা ও দৈবানুগ্রহলিপ্সার অতিরেক তখনও পর্যন্ত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যকে একান্ত সাম্প্রদায়িক কাব্যে পরিণত করে নাই। মুকুন্দরাম তাঁহার কাব্যে একটি শিষ্টরুচি পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ধর্মমঙ্গলের মত দেবখণ্ডে বা সূচনাংশে অতিরিক্ত অহেতুক তত্ত্ববর্ণনার প্রক্ষেপ ঘটান নাই। ভাষা ও সাহিত্য লক্ষণের দিক দিয়া তাঁহার চণ্ডীমঙ্গলকে ষোড়শ শতাব্দীর স্বর্ণ-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু বলা হয়।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অন্যতম কবি দ্বিজ মাধব বা মাধব আচার্যও ষোড়শ শতাব্দীতেই আবির্ভূত হইয়াছিল এবং সম্ভবত মুকুন্দরামের সমকালেই মঙ্গলচণ্ডীর গীত রচনা করিয়াছিলেন। দ্বিজ মাধব মুকুন্দরামের মত উচ্চ-প্রতিভ ছিলেন না। কিন্তু সংক্ষিপ্ত পরিসরে, মিতবাক্ চরণে ও পরিস্ফুট রেখার চরিত্রায়নে চণ্ডীমঙ্গল কাহিনী দুইটির সুনিরূপিত আখ্যান রচনা করিয়াছিলেন। উভয়ের রচনায় দেবী-পরিকল্পনায় ও কাহিনী গ্রন্থনে পার্থক্য আছে, তবে উভয়ের কবিস্বভাবেই বৈষ্ণব প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। দ্বিজ মাধব তাঁহার কাব্যে প্রচুর বৈষ্ণব পদ [বিষ্ণুপদ নামে অভিহিত] সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, যাহা অন্য কোনো মঙ্গলকাব্যেই দেখা যায় না। বাস্তবতা ও পর্যবেক্ষণনৈপুণ্যের সহিত কৌতুক পরিহাস ও জীবনরস-বোধ মুকুন্দরামের মত দ্বিজ মাধবের তীক্ষ্ণ ও ব্যাপক ছিল না, ইহা ভিন্ন তাঁহার কাব্য পূর্ববাঙলার প্রত্যন্ত অঞ্চল হইতে সর্ববঙ্গীয় জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল কিনা সন্দেহের বিষয়। তবে দ্বিজ মাধব যদি মুকুন্দরামের দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া থাকেন এবং মুকুন্দরামের পূর্ববর্তী কবি হন, তবে মুকুন্দরামকে দ্বিজ মাধবেরই ক্রমবিকশিত সংস্করণ বলা যাইতে পারে।

দ্বিজ মাধব

মুকুন্দরাম ও দ্বিজ মাধবাচার্য

শচী-মার বিলাপ ঃ বাসুদেব ঘোষ

ভূমিকা

সুপ্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া কবি বাসুদেব ঘোষের শচী-মার বিলাপ পদটির বিষয়-বস্তু চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণোদ্দেশ্যে মধ্যরাত্রে গোপন গৃহত্যাগের পর তাঁহার

জননী শচীর মাতৃহৃদয়ের অশ্রুকাতর ব্যাকুলতা। কৈশোর-কাল হইতেই নবদ্বীপনিবাসী সুদর্শন সুচরিত ব্রাহ্মণ-সন্তান গৌরাঙ্গের

বিষয়বস্তু

জীবনে দিব্য ভাবাবেশের উদয় হইয়াছিল এবং নবদ্বীপ নদীয়ার অধিবাসীরা তাঁহাকে ভালবাসিত। ভাগবত পাঠ ও হরিনাম সংকীর্তনে কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্তের সঙ্গে যুবক নিমাই নবদ্বীপ মুখরিত করিয়া রাখিতেন। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত বিবাহ দিয়া নিমাইকে গৃহনিষ্ঠ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভগবৎ-প্রেমাতুর আদিষ্ট জীবনে যখন একবার কৃষ্ণের আহ্বান আসিয়াছে তাহাকে নিবারণ করা যায় না। নিত্যানন্দ-হরিদাসের সহিত হরিনামে মাতিয়া গৌরাঙ্গদেব মাতার স্নেহবন্ধন, প্রেয়সীর প্রীতিপাশ ছিন্ন করিয়া গৃহত্যাগ করিলেন। আপামর নবদ্বীপবাসীর নয়নপুত্তলী হৃদয়রঞ্জন গৌরাঙ্গদেব নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিলে ঘরে ঘরে বেদনার রোল পড়িয়াছিল। সমকালীন কবিতায় সংগীতে জীবনীতে চৈতন্যের গৃহত্যাগ-কাহিনী নিবিড় বেদনার বর্ণরাগে অঙ্কিত হইয়াছে। এমন কি আধুনিককাল পর্যন্ত মানবিক আবেদনের দিক দিয়া নিমাই-সন্ন্যাস-ঘটনা সর্বশ্রেণীর শ্রোতাকে অশ্রুঘন করিয়া তোলে। শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ-লীলার সহচর সুগায়ক বাসুদেব নিমাইয়ের গৃহত্যাগের পরে অকস্মাৎ

নামকরণ

শূন্যগৃহের নিঃসীম বেদনায় ভাঙিয়া-পড়া শচীমাতার বিলাপকাতর রোদনী মূর্তিটিকে কয়েকটি স্বল্পাক্ষর রেখায় আলোচ্য পদে চিত্রিত করিয়াছেন।

বাসুদেব ঘোষ, মাধব ঘোষ এবং গোবিন্দ ঘোষ, পদ রচনায় ও সুমধুর গানে এই তিন ভ্রাতা-সহচর নিমাইচন্দ্রের প্রিয়ভাজন ছিলেন, চৈতন্যচরিত গ্রন্থে এইরূপ উল্লিখিত আছে। প্রভুর আদেশে নিত্যানন্দ যখন হরিনাম-প্রচারার্থে গৌড়ে যান, তখন বাসুদেব মাধব তাঁহার সঙ্গে

কবি-পরিচয়

ছিলেন। চৈতন্য-চরিতামৃত, চৈতন্য-ভাগবত প্রভৃতি জীবনগ্রন্থে সর্বত্রই বাসুদেব ঘোষের সুকণ্ঠ ও গৌরলীলাকীর্তনে পারংগমতার প্রশংসা আছে। দেবকীনন্দনের একটি পদে আছে,

শ্রীবাসুদেব ঘোষ বন্দিব সাবধানে।
গৌরগুণ বিনা যেই নাহি অন্য জানে ॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজের স্তুতি আরও হৃদ্য—

বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে।
কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে॥

বাসুদেব গৌরচন্দ্র-বিষয়ক পদগুলি মহাপ্রভুর ঐতিহাসিক জীবনের তথ্যপূর্ণ বর্ণনায়, প্রত্যক্ষদর্শীর প্রাণস্পর্শী সাক্ষ্যে, তাঁহার প্রথম জীবনের গ্রাহ্য বিবরণে বিশেষ মূল্যবান। সম্ভবত তিনি চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস-গ্রহণের সময় উপস্থিত ছিলেন না, কিন্তু গৃহত্যাগের পূর্ব ও পরবর্তী ঘটনার সহিত পরিচিত ছিলেন। শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার বিকীর্ণমূর্ধজা বিলাপ, নবদ্বীপবাসীর রোরুদ্যমান দুরদৃষ্টের নিখুঁত বর্ণনায় তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কাজ করিয়াছে ইহা নিঃসন্দেহ। পদকল্পতরুতে বাসুদেবের ৯৫টি এবং গৌরপদতরঙ্গিণীতে তাঁহার ১৩৭টি পদ আছে। তাঁহার অধিকাংশ পদই চৈতন্যলীলা-বিষয়ক ; নিমাইজীবনের বাল্য ও যৌবন বর্ণনা। তিনি চৈতন্যজীবনকে কৃষ্ণলীলার আদর্শে অঙ্কিত করিয়াছেন। গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের দান, নৌকা ইত্যাদি লীলার অনুসরণে তিনি চৈতন্যের জীবনেও অনুরূপ লীলার আরোপ করিয়াছেন। মাধুকরীতে সংকলিত শচী-মার বিলাপ [বিষয়ানুযায়ী নামকরণ সংকলন-কর্তার] পদটির গৌরপদতরঙ্গিণী নামক সংকলন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। পরবর্তী বিষ্ণুপ্রিয়ার বিলাপ পদটি ও বাসুদেবের চৈতন্যসন্ন্যাস-বিষয়ক পদেরই অন্তর্গত। 'শচী-মার বিলাপ' মূল পদে সূচনায় অতিরিক্ত দুইটি চরণ ছিল—

সুধা খাটে দিল হাত বজ্র পড়িল মাথাত
বুঝি বিধি মোরে বিড়ম্বিল।
করুণা করিয়া কান্দে কেশ বেশ নাহি বান্ধে
শচীর মন্দিরের কাছে গেল॥

কয়েকটি গ্রন্থে এই পদের সঙ্গে আরও কয়েকটি পংক্তি পাওয়া যায়। যথা—

পড়িয়া ধরণী তলে শোকে শচী কাঁদি বলে
লাগিল দারুন বিধি বাদে।
অমূল্য রতন ছিল কোন বিধি হরি নিল
পরাণ-পুতলী গোরাচাঁদে॥

অঙ্গের অঙ্গদ বালা গোরাচাঁদের কণ্ঠে মালা
খাট পাট সোনার ঝুলিচা
সে সব রহিল পড়ি গৌর মোর গেল ছাড়ি
আমি প্রাণ ধরি আছি মিছা। ইত্যাদি

চৈতন্য-ভাগবত ও চৈতন্য-মঙ্গল গ্রন্থে গোরাচাঁদের সন্ন্যাস-গ্রহণের বিস্তৃত আলোচনা আছে এবং সমকালীন পদকর্তাগণও এই বিষয়ে অসংখ্য পদ লিখিয়াছেন। গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ-সংকলন গৌরপদতরঙ্গিণীতে চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস-সংক্রান্ত পদ ৫৩টি এবং শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার বিকল্প পদের সংখ্যা ৩৪টি। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের নিকট চৈতন্যের রাধাভাবদ্যোতিত প্রেমচিক্কণ মধুর জীবনই উপাদেয় ছিল। কিন্তু নবদ্বীপের অনুচর-প্রতিবেশী-সখা-আত্মীয়দের দল চৈতন্যদেবের গৃহত্যাগের মত করুণ ঘটনাটিকে কিছুতেই ভুলিতে পারে নাই। মাতৃক্রোড়ছিন্ন পলাতক প্রাণপুত্রের জন্য তাঁহাদের বসুধালিঙ্গিত ক্রন্দন মধ্যযুগের আকাশ বাতাসকে উন্মথিত করিয়াছিল। শচী এই সংবাদ শুনিয়া কাঁদিয়া বলিয়াছেন—

চৈতন্য জীবন প্রসঙ্গে

না যাইও ওরে বাপ মায়েরে ছাড়িয়া।
পাপ জীউ আছে তোর শ্রীমুখ দেখিয়া॥
ধর্ম বুঝাইতে বাপ তোর অবতার।
জননী ছাড়িয়া কোন ধর্ম বা বিচার॥
তুমি ধর্মময় যদি জননী ছাড়িবা।
কেমন জগতে তুমি ধর্ম বুঝাইবা॥ [চৈতন্য-ভাগবত]

তারপর সেই নিদারুণ দুর্যোগের রাত্রির পরদিবস—

নিজজন পরিজন শচী বিষ্ণুপ্রিয়া॥
মূর্ছিত হইয়া পড়ে অঙ্গ আছাড়িয়া॥
শচীদেবী কান্দে কোলে করি বিষ্ণুপ্রিয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া মরা যেন রহিল পড়িয়া॥ [লোচনদাস]
তখন সে হায় হায় করে সর্বলোক।
পরম নিন্দুক পাষণ্ডীও পায় শোক॥ [বৃন্দাবনদাস]

এই হৃদয়বিদারক আর্তনাদের সুরে সংগীত রচনা করিয়া সমকালীন যে সকল কবি এই নিষ্ঠুর ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন তাহাদের মধ্যে

গোবিন্দ ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ, লোচনদাস, বংশীবদন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। নিমাই-পরিত্যক্ত নবদ্বীপের মাথুর বেদনায় রক্তাক্ত-বক্ষ কবির এই অপরূপ সংগীতটি আজও অসামান্য মাধুরী বর্ষণ করে—

হেদে গো নদীয়াবাসী কার মুখ চাও।
বাহু পসারিয়া গোরাচাঁদেরে ফিরাও॥

ভাবার্থ—শেষরাত্রে অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গে শয্যায় প্রিয়তমকে দেখিতে না পাইয়া শ্বশ্রূমাতা শচীর শয়নদ্বারে উপস্থিত হইয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে নিমাইপত্নী বজ্রাহতা বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাইয়ের অন্তর্ধানের কথা বলিতেই, অর্ধজাগ্রতা জননী উদ্‌ভ্রান্ত ব্যাকুলতায় অসংবৃত বেশে প্রদীপ লইয়া গৃহ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন, কিন্তু নিমাইয়ের সন্ধান পাইলেন না। নিমাই নিমাই বলিয়া পাগলিনী শচীমাতা পুত্রবধূর সহিত পথে নির্গতা হইলে, ত্বরিতে নদীয়ার অধিবাসী নিমাইয়ের জন্য আকুল হইয়া ছুটিয়া আসিল। পথিক দেখিয়াই সকলে উৎকণ্ঠচিত্তে তাহাকে প্রশ্ন করে নিমাইকে কেহ দেখিয়াছে কিনা, জনৈক পথিকের মুখে সংবাদ পাওয়া গেল একাকী নিমাই কাঞ্চননগরের পথে গিয়াছে। কবি বাসুদেব নিমাইয়ের আসন্ন মস্তক-মুণ্ডনের আশঙ্কায় কাতর হইয়া এই পদ লিখিতেছেন।

আলোচনা—শ্রীচৈতন্যদেবের অলৌকিক ভাববিদ্ধ জীবনের বর্ণনা আছে তাঁহার জীবনচরিত কাব্যে। এইগুলিকে ঘটনার সহিত তত্ত্ব, জীবনের সহিত অবতারবাদ, প্রত্যক্ষের সহিত বিশ্বাস, সম্ভাব্যের সহিত অলৌকিকত্ব যুক্ত হইয়া মধ্যযুগের একটি বিশিষ্ট আখ্যায়িকা কাব্যশাখা গড়িয়া তুলিয়াছে। কিন্তু চৈতন্যদেবের ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি বর্ণনা, দৈনন্দিন কার্যকলাপ, আবেশ ও আবেগের মুহূর্তচকিত চিত্র-সম্বলিত যে সকল প্রত্যক্ষদর্শী পদ সমকালীন কবিদের দ্বারা রচিত হইয়াছে, কাব্যমূল্যে ও মানবিকতায় সেইগুলি বহুমূল্য। এই সকল রচনার কবিবৃন্দ আখ্যায়িকার কবি ছিলেন না, তাঁহারা চৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনের কয়েকটি স্মরণীয় লগ্নকেই সংগীতের অবিস্মরণীয় আকৃতিতে ধরিয়া রাখিয়াছেন। চৈতন্যদেবের জীবনবর্ণনা হইলেও এইগুলির ভিতর দিয়া বাস্তব-অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন কবিদের বেদনা ও দীর্ঘশ্বাস, ব্যর্থতা ও কাতরতা ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া এইগুলি গীতিকবিতা হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের বিষয়বস্তু দীর্ঘকালের

আলোচ্য পদের গীতিধর্মিতা

নয়, কয়েকটি অশ্রুঘন মুহূর্তের, ঘটনার তথ্যবিবরণ অপেক্ষা উহার নির্যাস-টিকেই কবি সংকলন করিয়াছেন। এইজন্য আলোচ্য পদগুলি বৈষ্ণবগীতি-কবিতার অন্তর্ভুক্ত হইয়া কীর্তনিয়াদের কণ্ঠে কণ্ঠে বহু শতাব্দীর ঘাটে ঘাটে পরিভ্রমণ করিয়াছে, বাঙালীর চিরকালের প্রিয় হৃদয়অমৃত-মথিতকায় গৌরাঙ্গদেবের জীবনের সর্বাপেক্ষা বিষাদকরুণ ঘটনার স্মৃতিতে অবোধপূর্ব বেদনা ও অনুকম্পা জাগাইয়া তুলিয়াছে। বৈষ্ণব কবিদের হৃদয়রসে সিক্ত হইয়া দুর্ভাগ্যপীড়িতা শচীমাতা ও ব্যর্থকামা বিষ্ণুপ্রিয়া সর্বকালের মনোমন্দিরে অধিষ্ঠিতা হইয়াছেন।

বাসুদেব ঘোষ চৈতন্যের সন্ন্যাসজীবন-কাহিনী ও গৃহত্যাগের দুঃখে শোক-সন্তপ্তা মাতা ও পত্নীর পরম কারুণ্যময় জীবন-বর্ণনায় ষোড়শ শতাব্দীর অন্যতম উল্লেখযোগ্য পদকর্তা। বিষয়ের নিজস্ব বিষণ্ণতায় তাঁহার পদে এমন একটি মানবিক করুণ রসের সঞ্চার হইয়াছে যাহা রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমলীলার পদে অথবা রাধাভাবময় চৈতন্যদেবের গৌরচন্দ্রিকা পদে দৃষ্ট হয় না। নিতান্ত পরিচিত শব্দযোজনায়, সহজ প্রচলিত বাক্‌প্রয়োগে, ক্রন্দন ও কাতরতার একটি বাস্তব রস সৃজনে তাঁহার কবিত্বের নিঃসংশয়িত পরীক্ষা হইয়াছে। বাসুদেবের সংগীত সম্পর্কে কৃষ্ণদাস কবিরাজের প্রশস্তিবাক্য 'কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে' কেবল তাঁহার সুধাকণ্ঠের জন্যই নয়, অবশ্যই তাঁহার এই সকল করুণরসসঞ্চারী পদগুলির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে। মোটের উপর, শচী-মার বিলাপ পদের কয়েকটি পংক্তির মধ্য দিয়া চৈতন্যদেবের নবদ্বীপলীলার প্রত্যক্ষদর্শী পার্ষদ ও ভক্ত বাসুদেব ঘোষ চৈতন্যের গৃহত্যাগের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া মুখ্যত তাঁহার জননী শচীদেবীর ও গৌণত নবদ্বীপবাসীগণের আর্ত কাতরতার যে চিত্রটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহার বাস্তবতা ও মানবিকতা কবিত্বগুণসমৃদ্ধ হইয়া আমাদের অন্তর স্পর্শ করে।

বাসু ঘোষের কবিত্ব ও কৃতিত্ব

রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ

শচীর মন্দিরে—শচীদেবীর শয়নগৃহে। **ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া**—নিমাইয়ের নিঃশব্দ গৃহত্যাগ বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট হৃদয়-বিদারক ঘটনা হইলেও শ্বশ্রূমাতার নিকট ইহা প্রকাশে বিষ্ণুপ্রিয়ার স্বাভাবিক সম্ভ্রম ও সৌজন্য-প্রকাশে

কবি সতর্ক। অথচ তাঁহার আকস্মিক সর্বনাশের গভীরতম অভিব্যক্তি পরবর্তী চরণেই আছে। **শয়ন মন্দিরে ছিল**—চৈতন্যজীবনীকার লোচনদাস পূর্বরাত্রে চৈতন্যদেব যে বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত রঙ্গরসে রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা দিয়াছেন। এই পংক্তির মধ্য দিয়া ঈষৎ পূর্বকালে চৈতন্যের নিশ্চিত অবস্থান ও অতর্কিত অদর্শনের রহস্যদ্যোতক বিস্ময়-বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে। **নিশা-অন্তে**—চৈতন্যদেব আসন্ন-প্রভাতে গৃহত্যাগ করেন ও কেশব-ভারতীর নিকট দীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে কাটোয়ায় যাত্রা করেন। **মোর মুণ্ডে ··পাড়িয়া**—সাধ্বী রমণীর প্রিয় স্বামীর সন্ন্যাস-গ্রহণ বজ্রপাততুল্য, বিষ্ণুপ্রিয়ার এই করুণ আক্ষেপ পরিবেশ ও চরিত্রের সহিত সুসংগত। **গৌরাঙ্গ ··শচীমাতা**—শচীমাতা গৌরাঙ্গদেবের কথা চিন্তা করিতে করিতে সারারাত্রি বিনিদ্রপ্রায় কাটাইয়াছেন, সুতরাং এই দুঃসংবাদে তিনি ত্বরিতে শয্যাত্যাগ করিলেন। চৈতন্যজীবনী অনুসারে শ্রীচৈতন্যদেব পূর্বাহ্লেই মাতৃদেবীকে তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণের সংকল্প জানাইয়াছিলেন, এবং ইহা শুনিয়া শচী তাঁহাকে এই ইচ্ছা হইতে নিবৃত্ত হইবার অনুরোধ করেন [ভূমিকা দ্রষ্টব্য]। **আলু থালু · মুখের কথা**—এই নিদারুণ সংবাদে শচীর উদ্‌ভ্রান্ত ব্যাকুলতার চিত্র তাঁহার বিপর্যস্ত বেশবাসে লক্ষিতব্য। **তুরিতে**—ত্বরায়, ব্রজবুলি প্রয়োগ ; তুলনীয়, 'তুরিতে আইলা ভাসুর বাড়ি'—চণ্ডীমঙ্গল। **ইতি উতি**—ইতস্ততঃ, এদিক ওদিক , তুলনীয়, 'পাগলের মত কভু ইতি উতি ধায়' —গোবিন্দদাসের কড়চা। **তুরিতে ··নিমাই বলিয়া**—নিমাইয়ের অন্তর্ধানে মাতার বিহ্বল বিত্রস্ত অনুসন্ধান, বিস্রস্ত বসনে উন্মাদিনীর মত বহির্গমন ও উচ্চকণ্ঠে নিমাইকে নাম ধরিয়া আহ্বানের মধ্যে একটি বাস্তবতা ও গভীর বিষাদ নিহিত আছে। এই ধরণের বর্ণনা সমকালীন পদে আরও আছে। তুলনীয়—

গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে নিদ্রা নাহি রাত্রিদিনে
মালিনী বাহির হৈয়া ঘরে।
সচকিতে আসি কাছে দেখে শচী পৈড়া আছে
অমনি কাঁদিয়া হাতে ধরে॥

উথলিল হিয়ার দুখ মালিনীর ফাটে বুক
ফুকরি কাঁদয়ে উভরায়।
দুহুঁ দোহাঁ ধরি গলে পড়িয়া ধরণীতলে
তখনি শুনিয়া সবে ধায়॥

[প্রেমদাস]

যারে তারে পুছয়ে বারতা—রোরুদ্যমানা শচীমাতা ও অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার দুঃখবেদনা সকলেই ভাগ করিয়া লইয়াছে, সকলেই পথে বহির্গতা হইয়া একে অপরকে নিমাইয়ের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছে। **একজন… কোথা**—পথে কোন পথিককে দেখিলে ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় অনেকে মিলিয়া তাহাকেই প্রশ্ন করে গৌরাঙ্গদেবকে কেহ যাইতে দেখিয়াছে কিনা। ইহার ভিতর দিয়া একদিকে যেমন নিমাইয়ের প্রতি সমগ্র নদীয়াবাসীর হৃদয়ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ও গভীর ভালবাসার পরিচয় আছে তেমনি নিঃশব্দ রাত্রে নিমাইয়ের গৃহপরিত্যাগের নিষ্ঠুর ঘটনায় নাগরিকগণের আকস্মিক বিভ্রান্তি ও বিমূঢ়তাও সুন্দরভাবে আভাসিত হইয়াছে। তুলনীয়, বৃন্দাবনদাসের পদ—

কাঁদে সব ভক্তগণ হইয়া অচেতন
হরি হরি বল উচ্চৈঃস্বরে।
কিবা মোর ধনজন কিবা মোর জীবন
প্রভু ছাড়ি গেলা সবাকারে॥

বাসু…মুড়ায়—পদকর্তা বাসু ঘোষ শেলবিদ্ধ হৃদয়ে আক্ষেপ করিতেছেন পরমপ্রিয় শ্রীগৌরহরি বোধহয় এইবার সন্ন্যাসমন্ত্রদীক্ষিত হইয়া মস্তক-মুণ্ডন করিবেন। চৈতন্যের মস্তক-মুণ্ডনের ব্যাপারে তাঁহার স্বজন-পরিজন-প্রতিবেশীদের যে গভীর উদ্বেগ ও আশঙ্কা ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ইহার কারণও চৈতন্য-ভাগবতে বৃন্দাবনদাস উল্লেখ করিয়াছেন—

কেহ বলে সে সুন্দর চাঁচর চিকুরে।
আর মালা গাঁথিয়া কি না দিব উপরে॥
কেহ বলে না দেখিয়া সে কেশবন্ধন।
কেমতে রহিব এই পাপিষ্ঠ জীবন॥

সে কেশের দিব্য গন্ধ না লইব আর।
এত বলি শিরে কর হানয়ে অপার ॥……

বাসুদেব ঘোষ তাই এই পদে নদীয়াবাসীর সেই বিপন্ন বিষাদেরই প্রতিধ্বনি করিয়া তাঁহার পদ সমাপ্ত করিয়াছেন। গৃহ-পরিত্যাগের নিবিড় বিমর্ষের মধ্যেও এই মস্তক-মুণ্ডনের আশঙ্কায় কবির কাতরতায় যে বিশেষ আধিক্য লক্ষ্য করা যায় তাহা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ব্যতীত হইতে পারে না। বাসুদেব ঘোষের আর একটি বিখ্যাত পদের প্রথম ছত্র স্মরণীয়—

কি লাগিয়া দণ্ড ধরে অরুণবসন পরে
কি লাগিয়া মুড়াইল কেশ।

ব্যাখ্যা—

শচীর মন্দিরে ··বজর পাড়িয়া—আলোচ্য চরণদ্বয় শ্রীচৈতন্য-সহবাসধন্য সুকণ্ঠ কীর্তনিয়া-কবি বাসুদেব ঘোষের নিমাই-সন্ন্যাস-বিষয়ক পদ শচী-মার বিলাপের উপক্রম-অংশ। শেষ রজনীতে অকস্মাৎ শূন্য শয্যা দেখিয়া হতচকিত অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাই-জননীর শয়ন-গৃহের দ্বারপ্রান্তে হতাশ ক্রন্দনে লুটাইয়া পড়িয়াছেন, স্বামী-অন্তর্ধানের নিদারুণ দুঃসংবাদ জানাইয়া—এই চিত্রটিই আলোচ্য ছত্রগুলির মধ্য দিয়া হৃদয়মথিত কারুণ্যে উদ্ভাসিত হইয়াছে। বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রেমতৃপ্ত সুখনিশির আকস্মিক অবসান হইয়াছে, শয়নমন্দিরে নিদ্রাবিষ্ট নিমায়ের সহসা অদর্শনে জগৎ তাঁহার কাছে শূন্যবৎ হইয়াছে, অথচ নারীর স্বাভাবিক সংকোচে তিনি উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিতে পারিতেছেন না, তাই শশ্রূমাতার দ্বারপ্রান্তে ধীরে ধীরে উপনীতা হইয়া মৃদু অথচ রুদ্ধকণ্ঠে এই শোচনীয় দুঃসংবাদ নিবেদন করিলেন। নিমাইয়ের গৃহপরিত্যাগ তাঁহার সৌভাগ্যের শিরে অসহনীয় বজ্রাঘাত-তুল্য, এই স্বল্পাক্ষর মন্তব্যেই তাঁহার নিরুদ্ধ হৃদয়ের বিদীর্ণ বেদনা অপূর্ব ভাষায় কবি প্রকাশ করিয়াছেন।

তুলনীয়,

এথা বিষ্ণু প্রিয়া চমকি উঠিয়া
পালঙ্কে বুলায় হাত।
প্রভু না দেখিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
শিরে করে করাঘাত ॥

বাসু কহে··· ··মস্তক মুড়ায়—[রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ-দ্রষ্টব্য।]

প্রশ্ন ১। শচী-মার বিলাপ অনুসরণে গৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাস-গ্রহণোদ্দেশ্যে গৃহ-পরিত্যাগের পর শচী-মাতার উদ্‌ভ্রান্ত বেদনার চিত্রটি নিজ ভাষায় অঙ্কন কর।—[ভূমিকা ও আলোচনা দ্রষ্টব্য]।

প্রশ্ন ২। চৈতন্যদেবের জীবৎ-কাহিনী বর্ণনায় বাসুদেবের কৃতিত্ব শচী-মার বিলাপ পদেই ফুটিয়া উঠিয়াছে, আলোচনা কর। [ভূমিকা ও আলোচনা দ্রষ্টব্য।]

প্রশ্ন ৩। 'নিমাইয়ের গৃহত্যাগ ও সন্ন্যাসগ্রহণ গৌরবিষয়ক বৈষ্ণব কবিতায় এক মর্মান্তিক করুণ ঘটনা। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও মানবিকতার বর্ণসম্পাতে ষোড়শ শতাব্দীর চৈতন্য-সমকালীন কবিরা তাহা হৃদয়রক্তরাগে অঙ্কিত করিয়াছেন'। পঠিত কবিতা অবলম্বনে আলোচনা কর।—[ভূমিকা ও আলোচনা দ্রষ্টব্য]।

অভাগিনীর আক্ষেপ : জ্ঞানদাস

ভূমিকা

উত্তর-ষোড়শ শতকের বৈষ্ণব কবিকুল-গোষ্ঠীর অন্যতম মধ্যমণি জ্ঞানদাস প্রেমের গভীর রহস্য-প্রকাশে, রূপানুরাগে, প্রেমের অন্তহীন আক্ষেপ ও অতৃপ্ত বেদনাপ্রকাশে একটি নবতর ঐতিহ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। জ্ঞানদাস রাধাকৃষ্ণ-লীলাকে যতটা বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের দিক হইতে দেখিয়াছেন, ততটা দেখিয়াছেন প্রেমের স্বাভাবিক মানব-স্বভাব হইতে, মানবিক প্রেমের স্বভাব-সংগত গভীর রহস্যানুচারিতার দিক হইতে। তাই প্রেমের মধ্যে যে নিত্য-অনুভূত অনির্বাপ্য চিরবিরহের দীপশিখা জ্বলে তিনি তাহারই জ্যোতিতে তাঁহার নায়ক-নায়িকাকে অঙ্কন করিয়াছেন। জ্ঞানদাস নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন এবং বৈষ্ণব অলংকার-শাস্ত্রসম্মত সর্বপ্রকার পদের দাবীই তিনি মিটাইয়াছেন। তথাপি তাঁহার পদে একটি আধুনিক ব্যক্তিতান্ত্রিক গীতি-কবির ও রোমান্টিক কবিপ্রকৃতির পরিচয় মেলে। যে হৃদয়-অনুরাগ আতপ্ত-মিলনের মধ্যেও শাশ্বত দীর্ঘশ্বাসে বিপন্ন, যে প্রেম পরম

জ্ঞানদাসের ঐতিহ্য

জ্ঞানদাসের প্রেমের মানবিক স্বভাব

আধুনিক রোমান্টিকতা

রমণীয় মুহূর্তেও শঙ্কিত বিচ্ছিন্নতার কাল্পনিক বেদনায় কম্পমান, যে আলিঙ্গন আবেগের সীমাতটে দাঁড়াইয়াও অবগাহনমুখী, জ্ঞানদাস তাহারই কবি। তাঁহার রূপদিদৃক্ষায় গভীর অতৃপ্ত নৈরাশ্য, অসমাপ্তির খণ্ডিত বিলাপ, অপরিশোধিত সাধনার উদ্দাম ক্রন্দনে তাহা বিষণ্ন। তাহার প্রেমে সুখ নাই, তাহা নিত্য কাতর। প্রাপ্তি ও প্রত্যাশার বৈপরীত্যে, ইচ্ছা ও ঘটনার অপ্রতিরোধ্য অসংগতিতে, অবস্থা ও হৃদয়ের সমান্তরাল দূরত্বে তাহার প্রেম সবদাই আক্ষেপ মাত্র। এই রোমান্টিক আক্ষেপই জ্ঞানদাসের নায়িকার কণ্ঠে অভিব্যক্ত হইয়াছে। প্রচলিত পদাবলীর আক্ষেপানুরাগমূলক পদের অন্তর্গত বলিয়া ইহা অভাগিনীর আক্ষেপ নামে চিহ্নিত। এ আক্ষেপের বিষয় প্রেম, উপলক্ষ শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু আধার রাধা। রাধার প্রণয়জনিত নৈরাশ্য-ব্যর্থতার বিলাপের জন্যই স্বগত-উক্তির নায়িকার পক্ষে অভাগিনী বিশেষণ সংগতিপূর্ণ।

আক্ষেপের কবি জ্ঞানদাস

কবিতার শীর্ষনাম-সংকেত

আক্ষেপানুরাগ শব্দটি বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের অন্তর্গত। ইহা প্রেমের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। প্রেমবৈচিত্ত্য বা অনুরাগ তিন প্রকার, রূপানুরাগ (রূপের জন্য ব্যাকুলতা, রূপ দর্শনের বিস্মিত অভিজ্ঞতা, অতৃপ্ত রূপাস্বাদন ইত্যাদি), আক্ষেপানুরাগ (এক প্রকার প্রেমের অতৃপ্তিজনিত আক্ষেপ, প্রত্যাশিত প্রাপ্তির অসম্ভাব্যতা ও তজ্জনিত দুরদৃষ্টের জন্য আক্ষেপ), এবং রসোদ্গার (সদ্যউপভুক্ত সুখাস্বাদের স্মৃতি-রোমন্থন)। কিন্তু সামগ্রিকভাবে ইহা সাধারণ মানব-মানবীর প্রেম সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়, সকল প্রেমের সার-প্রেম কৃষ্ণরতির ইহা লক্ষণ, পরিণামে ইহা ভক্তিরস। যিনি স্বয়ং গোকুলের অধিপতি, অখিল ব্রহ্মাণ্ডকে যিনি আপনার দিকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আকর্ষণ করিতেছেন তাহার প্রেমের স্বরূপ স্বভাবতই অনন্ত-রহস্যময়, সুতরাং এই কারণেই বৈষ্ণব দর্শন ও কাব্যে আক্ষেপানুরাগের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। ইহার বিশেষত্বে বলা হইয়াছে—

বৈষ্ণব মতে আক্ষেপানুরাগ

কৃষ্ণঞ্চ মুরলীঞ্চৈব আত্মনঞ্চ সখীন প্রতি
দূত্যাং ধাতরি কন্দর্পে তথা গুরুগণাদিষু ॥

অর্থাৎ কৃষ্ণ, তাঁহার মুরলী, রাধার আপনার সত্তা, সখী, দূতী, বিধাতা, কন্দর্প, গুরুজন সকলের প্রতি আক্ষেপ।

আলোচ্য পদে জ্ঞানদাসের রাধা আপনার ব্যর্থ অদৃষ্টের প্রতি আক্ষেপ জানাইয়াছেন। কিন্তু এখানে আক্ষেপের মধ্যে অপরের প্রতি কোনো গঞ্জনা নাই, কেবল আপনার দুর্ভাগ্য ও দুরদৃষ্টের জন্য কপালে বক্ষে করাঘাত করিয়াছেন, আত্মগ্লানিতে মরিয়াছেন, কিন্তু তথাপি কোনও অভিমান অথবা অপরের প্রতি ক্ষোভ নাই। ইহাই যথার্থ প্রেমিকার লক্ষণ। এই অনুতপ্ত আক্ষেপের মধ্য দিয়া কিন্তু একটি সত্য গোপন থাকে না, তাহা কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপ। যাহার সহিত প্রণয় সম্পর্ক আশা ও প্রাপ্তির মধ্যে এ হেন বিষম অসংগতি সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার প্রেমের সীমা নিরূপণ করা যায় না। আক্ষেপানুরাগের পদে চণ্ডীদাসের ও জ্ঞানদাসেরই শ্রেষ্ঠত্ব। তাঁহাদের কাব্যে এই ব্যাপারে একটি সাধর্ম্য আছে। উভয়ের নায়িকাই প্রেমের গভীর অসীম বিস্ময় ও বেদনাদায়ক রহস্যে প্রতি মুহূর্তেই নিষ্পেষিতা হইয়া সেই দুর্বহ দুঃসহ প্রেমের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দেন। চণ্ডীদাসের মত জ্ঞানদাসের রাধাও অবলা গুরুজন-পরিবৃতা নারী, সুতরাং লোকনিন্দা, গঞ্জনা ও শাসনের মধ্যে সংগুপ্ত প্রেমে স্বভাবতই অতৃপ্তি বৃদ্ধি পায় অথচ প্রত্যাবর্তনের উপায় নাই। সুতরাং তখনই চণ্ডীদাসের রাধা বলেন—

জ্ঞানদাসের রাধা

চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের আক্ষেপানুরাগ

বন্ধু সকলি আমার দোষ।
না জানিয়া যদি কর্যাছি পিরীতি
কাহারে করিব রোষ॥

রাধা একস্থানে তাহার নিরুপায় অসহায় দুর্ভাগ্যকে উপমা দিয়া বলিয়াছেন—

শঙ্খ বণিকের করাত যেমন
আসিতে যাইতে কাটে।

চণ্ডীদাসের রাধার আক্ষেপে দেশান্তরী হইবার বাসনা আছে, তাঁহার আত্ম-ধিক্কারে বেদনা ও জ্বালা দুইই আছে। যেমন,

সই কে বলে পিরীতি ভালো
হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া
কাঁদিতে জনম গেল ॥
কুলবতী হৈয়া কূলে দাঁড়াইয়া
যে ধনী পিরীতি করে।
তুষের অনল যেন সাজাইয়া
এমতি পুড়িয়া মরে ॥

জ্ঞানদাসের অভাগিনীর আক্ষেপ ইহারই পরিপূরক। তাই জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসেরই ভাবশিষ্য।

জ্ঞানদাসের ভাষা

জ্ঞানদাস বাঙলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করিয়াছেন, তবে বাঙলা বুলিতেই তাঁহার প্রেম-প্রকাশের স্বাভাবিকত্ব। এই প্রসঙ্গে কবিশেখর কালিদাস রায়ের আলোচনা দ্রষ্টব্য—

"চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির প্রভাব জ্ঞানদাসের রচনায় খুব বেশি। বিদ্যাপতির পদাবলী হইতে কবি ছন্দ, ভাষা-বিন্যাস, উপমা-ভঙ্গি, বর্ণনা-ভঙ্গির আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। খাঁটি বাঙলা ভাষায় রচিত পদাবলীতে চণ্ডীদাসের প্রভাব খুব বেশি। চণ্ডীদাসের গভীর আকৃতি জ্ঞানদাসের পদাবলীতে বারবার প্রতিফলিত হইয়াছে। কোন কোন স্থলে চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের ভাব, ভাষা প্রায় অভিন্ন।

চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস

চণ্ডীদাসের প্রভাব জ্ঞানদাসের রচনায় এত বেশি যে জ্ঞানদাসের অনেক পদ চণ্ডীদাসের নামে এবং চণ্ডীদাসের অনেক পদ জ্ঞানদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে।" [প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য]

ভাবার্থ

ভাবার্থ

সমাজ ও সংসারের শাসন-তর্জনে অবরুদ্ধা রাধা কৃষ্ণ প্রেমে উন্মাদিনী হইয়া সেই অসহায় বিপন্ন প্রেমের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। যেন তিনি সুখ-প্রাপ্তির জন্য গৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন, যাহা অনলদগ্ধ হইল, কপালবৈগুণ্যে অমৃত সাগর স্নানের পক্ষে গরল-সদৃশ হইল। কর্মদোষে শীতলচন্দ্র দুঃসহ তাপ-বিকিরণকারীতে, উচ্চ স্থানে

আরোহণ অতলগহ্বরে নিক্ষেপে, লক্ষ্মীপ্রাপ্তির বাসনা দারিদ্র্যে ও সম্পদ-হানিতে, তৃষ্ণা-নিবারক মেঘ বজ্রাঘাতে পরিণত হইয়াছে। প্রেম কল্যাণপ্রদ ও সুখাবেশময় হইয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানদাস তাঁহার রাধার হইয়া বলিতেছেন, কানুর প্রেম মরণাধিক শেলের মত।

আলোচনা

প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির অমীমাংসিত বৈষম্য-সৃষ্টিই প্রেমের অন্যতম স্বভাব। ইহা নিত্য অস্বস্তি ও ব্যর্থ সম্ভাবনার সৃষ্টি করে। এই আক্ষেপমূলক প্রেমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জ্ঞানদাসের এই পদটি সমগ্র বাঙলা কাব্যের সর্বকালের একটি শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা। পদটি রাধারই উক্তি, কারণ আক্ষেপ বৈষ্ণব কবিতায় রাধার দিক হইতেই [অভাগিনীর আক্ষেপ এই অর্থেই সার্থক-নামা], কিন্তু ইহা যেন কবিরও উক্তি। রাধার আত্মবেদনা ও ক্ষোভের সহিত কবি একাত্ম হইয়া গিয়াছেন, তাই ইহা একটি সার্থক গীতিকবিতার লক্ষণে ভূষিত। কেবল রাধারই নয়, আশা ও প্রাপ্তির বৈপরীত্যের অভিজ্ঞতা তো সর্বজনীন মানব-স্বভাবেরই অন্তর্গত। সুখের স্বপ্ন ভাগ্যের নিষ্ঠুর বঞ্চনায় ভস্মীভূত হইয়া যায়, শান্তিপ্রাপ্তির ইচ্ছা দুর্বহ গ্লানিতে পূর্ণ হইয়া উঠে, অদৃষ্টের দুর্জ্ঞেয় বিধানে আমাদের ক্ষণিক আনন্দের উপর বিষাদের কালো মেঘ ঘনাইয়া আসে। দৈবের সেই অদৃষ্টপূর্ব বিড়ম্বনার আভাস যেমন এই পদটিতে আছে, তেমনি কৃষ্ণপ্রেমের ফলে অভাগিনী রাধার উন্মত্ততার কথাও আছে। যে নারী সমাজবন্ধনভীরু, গৃহাবদ্ধা, সংস্কার-নিষেধে বন্দিনী, তাহার কাছে অপ্রতিরোধনীয় কৃষ্ণপ্রেম যে অসহনীয় অথচ নিরুপায় অন্তর্জ্বালার সৃষ্টি করে তাহাকেই জ্ঞানদাসের লেখনী স্বল্পবাক্ অথচ গভীর ব্যঞ্জনাময় চরণে প্রকাশ করিয়াছে। কৃষ্ণপ্রেমের যে নিয়ত-অনির্বাপ্য সুখহীন তৃষা তাহা কয়েকটি অনুপম উদাহরণে চমৎকার ভাবে ব্যঞ্জিত হইয়াছে। কানুর পিরীতি একদিকে 'চন্দনের রীতি ঘষিতে সৌরভময়', অন্যদিকে তাহা 'মরণ অধিক শেল'। সেই প্রেম আরাম হইতে, সুখস্পৃহা হইতে জাগাইয়া দেয়। এ যেন আধুনিক কবির ভাষা—

আলোচনা

সর্বকালের একটি শ্রেষ্ঠ গীতি-কবিতা

কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপ

বক্ষে তোমার বাজে বাঁশি সেকি সহজ গান ?

রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ

সুখের লাগিয়া·· পুড়িয়া গেল—জ্ঞানদাসের রাধা বলিতেছেন যে তিনি সুখপ্রাপ্তির নিমিত্ত গৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন, আকস্মিক গৃহদাহে তাহা ভস্মীভূত হইল। **অমিয়া-সাগরে**—অমৃত-সমুদ্রে, অর্থাৎ এমন কিছুতে যেখানে অবগাহন করা, আত্মনিমজ্জন করা আরামদায়ক। **সিনান**—স্নান। **সকলি গরল ভেল**—সেই অমৃত-সমুদ্র সহসা বিষ-সমুদ্রে পরিণত হইল। **ভেল**—শব্দটি 'হইল' অর্থে প্রাচীন বাঙলায় ও মধ্য বাঙলায় এবং ব্রজবুলিতে ব্যবহৃত। **সুখের লাগিয়া··গেল**—মানুষ গৃহ রচনা করে শান্তিপূর্ণ অবস্থানের জন্য, কিন্তু আকস্মিক অগ্নিসংযোগে গৃহদাহ হইলে মানুষ নীড়বঞ্চিত হইয়া শূন্য আকাশের নীচে অসহায় আশ্রয়হীন দিবসযাপন করে। কৃষ্ণের প্রেম ছিল সেই নীড়ের স্বপ্নের মত, এখন দেখা যাইতেছে তাহা অভাগিনীকে আশ্রয়হীনা করিয়াছে। **অমিয়া·ভেল**—সুখনিবাসে বহ্নিযোগ না হয় দৈববিপাক, কিন্তু অমৃত-সমুদ্রে স্নান করিতে গিয়া যদি তাহা গরল-সমুদ্রে পরিণত হয় তবে তাহা আপনার দুর্ভাগ্যেরই ফলমাত্র। **কি মোর করমে লেখি**—রাধা এই বৈপরীত্য-দর্শনে হতাশ হইয়া আপনার কর্মফল ও দুরদৃষ্টের কথাই বিস্মিত বিষণ্ণ হইয়া চিন্তা করিতেছেন। **শীতল বলিয়া··দেখি**—চন্দ্রের কিরণ স্নিগ্ধ বলিয়া তাহা উপভোগ করিতে গিয়া রাধা স্পষ্ট আতপ্ত সূর্যকিরণ অনুভব করিলেন। ইহা অসম্ভব ব্যাপার, কিন্তু কপালদোষে সবই সম্ভব হইয়াছে। **সেবিনু**—সেবা করিলাম। **নিচল**—নিম্নভূমি, এখানে অধঃপতনের সংকেত। **উচল**—পর্বত, উচ্চভূমি ; এখানে উন্নত আদর্শ বুঝাইতেছে। **নিচল··জলে**—আপনার দৈন্যদশা অধঃপতন দূর করিবার জন্য উন্নত আদর্শকে বরণ করিলাম, কিন্তু এখন তাহা অতল জলের মত বোধ হইতেছে। **লছিমী**—লক্ষ্মী, সম্পদের অধিদেবী। **বাঢ়ল**—বৃদ্ধি পাইল। **হেলে**—অবহেলায়। **লছিমী··হেলে**—আপনার দৈন্য দুর্দশা দূরীকরণের জন্য রাধিকা লক্ষ্মীদেবীর প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, ইহাতে সম্পদ তো ঘটিলই না, পরন্তু দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইল। এমন কি, যাহা একমাত্র মাণিকতুল্য ছিল, অর্থাৎ যে নিরুপদ্রব অবস্থা পূর্বে ছিল বলিয়া মনে হইতেছে, উচ্চাকাঙ্ক্ষার ফলে তাহাও তিনি অবহেলায় হারাইয়া হৃতসর্বস্ব হইলেন। **পিয়াস···গেল**—পিপাসা নিবারণের জন্য লোক মেঘের প্রয়াসী হয়,

রাধাও হইয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেম জলভারাবনত মেঘ হইলেও তাহার সহিত অবিচ্ছিন্ন যে বজ্র তাহারই আঘাতে রাধা হতচৈতন্য হইলেন। **মরণ অধিক শেল**—এখানে কৃষ্ণের প্রেমকে, যাহা পূর্ববর্ণিত এতগুলি আশাভঙ্গের কারণ, জ্ঞানদাস মরণাধিক শেল বলিয়াছেন। মৃত্যু একবারই প্রাণহানি ঘটায়, কিন্তু এই প্রেম পুনঃপুন প্রাণসংশয় ঘটায়, তাই ইহা মরণ-অধিক। সূক্ষ্ম অর্থে ইহা মৃত্যুর অতীত। তুলনীয়, 'মৃত্যুমাঝে ঢাকা আছে যে অন্তহীন প্রাণ'—রবীন্দ্রনাথ।

অভাগিনীর আক্ষেপ কবিতায় জ্ঞানদাসের রাধা যে সকল বৈপরীত্য-ফলপ্রসূ দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহার দুরদৃষ্টের বিবরণ দিয়াছেন, কাব্যালংকার শাস্ত্রে তাহা বিষম অলংকারের নিদর্শন। কারণ ও কার্যের বিরূপতা, কারণ হইতে ইচ্ছানুরূপ ফলের পরিবর্তে অবাঞ্ছিত ফল লাভ হইলে বিষম অলংকার হয়। আলোচ্য কবিতাটিও "ইচ্ছানুরূপ ফলের স্থলে অবাঞ্ছিত এবং দুঃখময় ফলাগমের লক্ষণযুক্ত বিষম অলংকারের চমৎকার উদাহরণ।"

[শ্যামাপদ চক্রবর্তী—অলংকারচন্দ্রিকা]

বৈষ্ণব পদসংকলনে জ্ঞানদাসের এই পদটির অনুরূপ আর একটি পদ চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া যায় (অনেকের মতে 'সুখের লাগিয়া' পদটিও চণ্ডীদাসের রচনা)—

ধিক রহু জীবনে যে পরাধিনী জীয়ে।
তাহার অধিক ধিক পরবশ হয়ে॥
এ পাপ কপালে বিহি এমতি লিখিল।
সুধার সাগর মোরে গরল হইল॥
অমিয় বলিয়া যদি ডুব দিলুঁ তায়।
গরল ভরিয়া কেনে উঠিল হিয়ায়॥
শীতল বলিয়া যদি পাষাণ কৈলাম কোলে।
এ দেহ-অনল-তাপে পাষাণ সে গলে॥
ছায়া দেখি বসি যাই তরুলতা বনে।
জ্বলিয়া উঠয়ে তরু লতাপাতা সনে॥
যমুনার জলে যদি দিয়ে হায় ঝাঁপ।
পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ॥...

ব্যাখ্যা

সুখের লাগিয়া···গরল ভেল—উদ্ধৃত পংক্তিযুগল ষোড়শ শতকের বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাসের আক্ষেপানুরাগমূলক পদ অভাগিনীর আক্ষেপ হইতে উদ্ধৃত। কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী দুর্ভাগ্যপীড়িতা রাধা তাঁহার প্রণয়জাত আশা-ভ্রষ্টতার অভিজ্ঞতা কয়েকটি নিপুণ উদাহরণের মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। আক্ষেপানুরাগ বৈষ্ণবীয় প্রেমের একটি পর্যায়, ইহার মধ্য দিয়া নায়িকা তাঁহার দুরদৃষ্ট, সখী, গুরুজন কৃষ্ণ, কৃষ্ণের বংশীধ্বনি এইগুলির প্রতি আক্ষেপ প্রকাশ করেন। অর্থাৎ কুলবন্দিনী পরাধীনা নায়িকা প্রেমিক-শ্রেষ্ঠের আহ্বানে সাড়া দিয়াছেন। কিন্তু শাসনবন্ধন উপেক্ষা করিতে পারিতেছেন না, ইহাতে তাঁহার মর্মজ্বালা বৃদ্ধি পাইতেছে। তাই তিনি আপনার ভাগ্যকেই ইহার জন্য দায়ী করিতেছেন। ইহাই আক্ষেপানুরাগ।

অভাগিনী রাধিকার দুর্ভাগ্য এমনই শোচনীয় যে, তাঁহার সুখস্বপ্নে নির্মিত নীড় অগ্নিদগ্ধ হইয়া গেছে, অমৃত-সমুদ্রে অবগাহন করিয়া অপার্থিব আনন্দ লাভ করিবেন ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অঙ্গস্পর্শে সেই অমৃত সাগর বিষময় হইয়াছে। যেন তিনিই দুর্ভাগা, তাঁহারই কলুষ স্পর্শে গৃহের আশ্রয় লুপ্ত হইযাছে, সমুদ্র বিষবৎ হইয়াছে। ইহার প্রাথমিক অর্থ, পরকীয়া অবলা রাধার বন্দী হৃদয়-বেদনা এবং সাংকেতিক অর্থ, কৃষ্ণপ্রেম এমনই বিচিত্র যে তাহা সকল সুখস্পৃহা, আরামের বাসনা, শান্তির প্রত্যাশা বিলুপ্ত করে। তাহা আশ্রয়হীন করে, অমৃত হইতে গরলে নিক্ষেপ করে, এইভাবে তাহা প্রত্যাশার বিপরীত ফলদান করিয়া হৃদয়কে সচকিত করিয়া তোলে। এই ধরণের অপ্রত্যাশিত বৈপরীত্যমূলক ফলের দ্বারা কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপ-নির্ণয় পদাবলীতে প্রচলিত আছে। বিদ্যাপতির পদে আছে 'বাঁশী নিশাসে গরল তনু ভোর'। চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন, 'সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি দুখ যায় তার ঠাঁই'। গোবিন্দদাসের পংক্তি, 'শীতল যমুনাজল অনল সমান ভেল'।

টীকা—গৃহ নির্মাণ ও গৃহদাহ, সমুদ্রাবগাহন ও গরলবোধ এখানে উক্ত ব্যাপার দুটিকেই বুঝাইতেছে না, অনুরূপ অভিজ্ঞতাকে বুঝাইতেছে। ইহা বিষম অলংকারের দৃষ্টান্ত। আনল—মধ্য বাঙলা উচ্চারণ।

কি মোর······হারালুঁ হেলে—[রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]।

পিয়াস লাগিয়া······অধিক শেল—অভাগিনীর আক্ষেপ কবিতায়

আলোচ্য সমাপ্তিচরণের মধ্য দিয়া জ্ঞানদাসের রাধা তাঁহার ব্যর্থ প্রত্যাশায় দুরদৃষ্ট আক্ষেপ নিবেদন করিয়াছেন। কৃষ্ণপ্রেম তাঁহাকে আশাভ্রষ্ট করিয়াছে, আকাঙ্ক্ষার বিপরীত ফল দান করিয়াছে, তাঁহাকে সকল সুখ-সম্ভোগের নীড় হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া নিঃসীম অতৃপ্ত দুঃখে নিরাশ্রয়া করিয়াছে। প্রেমরিক্ত জীবনে কানুঅনুরাগের ধারাবর্ষণে শান্তি মিলিবে এই প্রবল উৎকণ্ঠায় রাধা চাতকের মত শ্যামল কৃষ্ণের দিকে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু জলদের নিকট জলের পরিবর্তে তিনি বজ্রদহন পাইয়াছেন, ইহাই তাঁহার সেবার পুরস্কার। রাধিকা এই অপ্রত্যাশিত আশা-বঞ্চনার কারণ বুঝিতে না পারিয়া এতক্ষণ আপনার কলঙ্ক-লাঞ্ছিত অদৃষ্টকেই ধিক্কার দিতেছিলেন, কিন্তু জ্ঞানদাস ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন, কৃষ্ণের প্রেম মরণাধিক শেলের মত, উহা যখন একবার বক্ষে বিদ্ধ হয় তখন সুখাবেশ লুপ্ত হয়, তখন পঞ্জর বিদীর্ণ হয়, দুঃখদাহিকা শক্তিই এ প্রেমের স্বভাব। ইহা আরামের জন্য নয়, সকলে ইহার যোগ্য নয় (একমাত্র হ্লাদিনী, রাধিকাই ইহার যোগ্য, এইরূপ ব্যঞ্জনা)। ইহা মৃত্যুর অধিক, কারণ ইহা অনন্ত দুঃখের অভিজ্ঞতায় চৈতন্যকে জাগ্রত করে।

অনুরূপ প্রেমের সংজ্ঞা পদাবলীতে অপরিচিত নয়। চণ্ডীদাসের বহু-পরিচিত, 'পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর এত দুখ দিল মোরে' পংক্তি ব্যতীত নিম্নলিখিত স্তবকটি প্রসঙ্গত স্মরণীয়—

> কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি
> ঘষিতে সৌরভময়।
> ঘষিয়া আনিতে হিয়ায় লইতে
> দহন দ্বিগুণ হয়॥

প্রশ্ন ১। অভাগিনীর আক্ষেপ কবিতায় 'আক্ষেপের' স্বরূপ নির্ণয় করিয়া পদকর্তা জ্ঞানদাসের কবিবৈশিষ্ট্যের পরিচয় দাও।—[আলোচনা দ্রষ্টব্য।]

শ্রীগৌরচন্দ্র : গোবিন্দদাস কবিরাজ

ভূমিকা

গোবিন্দদাস কবিরাজ চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রেষ্ঠ কবি। কবিত্বের সহিত দার্শনিকতা, ভাবের সহিত ভাষার ঘনপিনদ্ধ কায়যোজনা, মাধুরীর সহিত

বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্বসংযোগ করিয়া, হৃদয় ও বুদ্ধির উপভোগ্য পদাবলী রচনায় তাঁহার সমকক্ষ প্রতিভা সর্বকালেই দুর্লভ। পদাবলী-কাব্যধারায় তিনজন গোবিন্দদাসের সন্ধান পাওয়া যায়, ইহাদের মধ্যে কবিশ্রেষ্ঠ গোবিন্দদাসের উপাধি কবিরাজ। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের লেখকের মতে—

কবি পরিচয়

"গোবিন্দদাস একজন মহাকবি। ইঁহার পদাবলীর কবিত্ব ভক্তির আতিশয্যে অভিভূত হয় নাই। ফলে ইঁহার পদে কবিত্বের অবাধ স্ফুরণ হইয়াছে।' গোবিন্দদাসের কবিত্ব প্রাণের গভীর আকূতির স্বতঃস্ফূত বিকাশ নয়—সেজন্য বিরহের কবি চণ্ডীদাসের কবিত্ব-মহিমা তিনি লাভ করিতে পারেন নাই। গোবিন্দদাসের কবিতায় ভাবানন্দের সহিত বোধানন্দের মিলন ঘটিয়াছে। পদরচনাকে ইনি আর্টের পর্যায়ে উত্তীর্ণ করেন। কবিতার বহিরঙ্গের সৌষ্ঠব-সাধনে কবির কোথাও অঙ্গহানি নাই। যেমন ছন্দের বৈচিত্র্য, তেমনি পদ-বিন্যাসের চাতুর্য, তেমনি ভাবপ্রকাশের কৌশল, তেমনি আলংকারিকতা"।

মহাকবি গোবিন্দদাস

চণ্ডীদাসের সহিত তুলনা

[কবিশেখর কালিদাস রায়]

গোবিন্দদাস সম্ভবত প্রথম জীবনে শাক্ত ছিলেন, প্রৌঢ় বয়সে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন এবং ব্রজলীলার পদ-রচনার রুদ্ধ মুখ উন্মুক্ত হইয়া যায়। সংস্কৃতে তাঁহার বিচক্ষণ অধিকার ছিল। জয়দেব ও বিদ্যাপতি তাঁহার কাব্যগুরু ছিলেন। বহু সংস্কৃত কবিতার ভাবকণিকায়, চূর্ণক শ্লোকে, রসঘন মন্তব্যের সানন্দ তর্জমায়, অলংকার-উপমায়, বৈদগ্ধ্যে বিলাসে তাঁহার পদাবলী সর্বাঙ্গখচিত। সম্ভবত জীবনে তিনি একটিও বাঙলা পদ লেখেন নাই, লিখিলেও সুঠাম-সমৃদ্ধ ব্রজবুলিই ছিল তাঁহার অনায়াস-আচরিত কাব্যভাষা। জীবিতকালেই মনীষী ও বিদগ্ধসভায় তাঁহার প্রতিষ্ঠা এবং জনপ্রিয়তা ঘটিয়াছিল। বিদ্যাপতির মতই তিনি বসন্তের হিল্লোলে যৌবনের উন্মাদ আবেশে সৌন্দর্যে বিলাসে তাঁহার কাব্যকে সজ্জিত করিয়াছেন, এমন কি বিদ্যাপতির অনেক পদ তিনি পূরণ করিয়াছিলেন বলিয়া সমকালীন

সংস্কৃত প্রভাব

বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস

কবিরা তাঁহাকে দ্বিতীয় বিদ্যাপতি আখ্যা দিয়াছিলেন। রূপানুরাগ, রূপোল্লাস, রসালস, প্রেম-বিহ্বলতা, মিলনোৎকণ্ঠা ও স্বপ্নদর্শনের পদে গোবিন্দদাস কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার চূড়ান্ত কীর্তি ও খ্যাতির মূলে আছে তাঁহার অভিসার ও গৌরচন্দ্র-বিষয়ক পদগুলি। অভিসারের দুরন্ত দুঃসাহস ও পথের দুর্গম দুঃখের বিতানিত আয়োজন, রাধার অতন্দ্র কৃচ্ছ্রসাধনা ও অভিসারের বিচিত্র পর্যায়, মিলনের রুদ্ধবাক্ সাধনা ও প্রতীক্ষার নিশ্চল বেদনা, এ সকলই গোবিন্দদাসের কবিতায় উচ্চাঙ্গের শিল্পকৌশলমণ্ডিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। আবার গৌরচন্দ্রের উপর রচিত পদেও তিনি অতুলনীয়। পুনশ্চ কবিশেখর কালিদাস রায়ের মন্তব্য উদ্ধার যোগ্য—

গোবিন্দদাসের প্রিয় বিষয়

অভিসারের কবি

"গৌরচন্দ্রিকার পদে গোবিন্দদাসের সমকক্ষ কেহ নাই। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক, তাঁহারা স্বচক্ষে শ্রীচৈতন্যের লীলা, তাঁহার ভাব-বিহ্বলতা, তাঁহার ভুবনমোহন রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাঁহারা গৌরাঙ্গের লীলাবিলাসের কথা লিখিয়াছেন, তাহাতে প্রেমভক্তির গভীরতা, সরলতা, ভাবাকুলতা ও মাধুর্য আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেগুলির অধিকাংশই কবিতার রসপদবীতে উঠে নাই। সেগুলির তুলনায় শ্রীচৈতন্যোত্তর যুগের লোচনদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ও বলরাম দাসের গৌরচন্দ্রিকার পদাবলী সাহিত্যের দিক হইতে উৎকৃষ্টতর। ইহাদের মধ্যে আবার গোবিন্দদাসের পদগুলি রূপে রসে ছন্দে ঝঙ্কারে কলাপারিপাট্যে শ্রেষ্ঠ"। [প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য]

গৌরচন্দ্রিকার শ্রেষ্ঠত্ব

আলোচ্য পদটি গোবিন্দদাস কবিরাজের গৌরচন্দ্র-বিষয়ক একখানি শ্রেষ্ঠ পদ। গৌরাঙ্গদেবের ভাবস্ফুরিত দিব্যাবেশময় জীবনই ইহার বিষয়।

একটি চন্দনতরু অপাংক্তেয় বৃক্ষরাজিকে পবিত্র করে; শত চন্দনতরুর পবিত্রতা লইয়া মহাপ্রভু চৈতন্যদেব রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে সুবাসিত করিয়াছেন। তাঁহার হিরণ্যগর্ভ জীবনের তেজস্ক্রিয়তায় সমগ্র মধ্যযুগ উদ্দীপ্ত হইয়াছে, তাই চৈতন্যদেবের দিব্য জীবনের স্মরণ-কীর্তনের দ্বারাই রাধাকৃষ্ণের প্রেমকবিতার যথার্থ উপক্রমণিকা। এইজন্যই এই জাতীয় পদের নাম গৌরচন্দ্রিকা। রাধার প্রেমের মাধুর্য আস্বাদ করিবার জন্য এবং রাধা কৃষ্ণের যে প্রণয়স্বাদ গ্রহণ করেন তাহার

গৌরচন্দ্রিকার উদ্দেশ্য

স্বরূপ লইবার জন্য সচ্চিদানন্দ ভগবান শ্রীকৃষ্ণই রাধাভাবদ্যুতিশবলিত [অথবা সুবলিত] হইয়া রাধার দেহকান্তি লইয়া মর্তে গৌরাঙ্গদেবের রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। গৌরাঙ্গদেবের জীবনের লীলায়িত ছন্দে, তাঁহার অলৌকিকতার স্ফুরণে ও আবেশে এই সত্যেরই সমর্থন মেলে। রাধার মতই তিনি কৃষ্ণ-বিরহে উন্মত্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহার জীবনে ও দেহে পদাবলীর নায়িকা লক্ষণগুলিই দেখা দিয়াছে। অন্তত ভক্তের চক্ষে গৌরাঙ্গদেব কৃষ্ণ-বিরহিত মিলনোৎকণ্ঠ রাধারই কায়ব্যূহ। সুতরাং রাধার মতই বৈষ্ণব ভক্তগণ তাঁহার পূর্বরাগ আক্ষেপানুরাগ মাথুরের চিত্র আঁকিয়াছেন। ক্রমে এই বিশ্বাস তাঁহার সমকালীন কবিবৃন্দ ও ভক্ত হইতে যুগান্তরে সংক্রামিত হইয়া গিয়াছে এবং গৌরাঙ্গদেবের এই অপ্রাকৃত রসাবেশময় জীবন লইয়া অসংখ্য পদ রচিত হইয়াছে। গৌরাঙ্গজীবনের ভাবাবেশ লইয়া রচিত পদগুলি বৃন্দাবন-লীলায় রাধাকৃষ্ণের অনুরূপ ভাবাবেশের সাদৃশ্যে কল্পিত বলিয়া গৌরপদগুলি সদৃশ বৈষ্ণব পদগুলিরই উপক্রমণিকা। এই কারণেই এইগুলিকে গৌরচন্দ্রিকা বলে।

রাধাভাবিত চৈতন্য

গৌরচন্দ্রিকার নাম-তাৎপর্য

গোবিন্দদাসের শ্রীগৌরচন্দ্র পদটি এই অর্থে একটি গৌরচন্দ্রিকা এবং পদটি আংশিক বিরহিনী রাধার ভাব-সাদৃশ্যে রচিত, তবে ইহার সহিত পূর্বরাগেরও সাদৃশ্য আছে।

গোবিন্দদাসের শ্রীগৌরাঙ্গ পদটি ব্রজবুলিতে রচিত। ব্রজবুলি একটি কৃত্রিম ভাষা, রাধাকৃষ্ণ পদ রচনাতেই ইহা ব্যবহৃত হইত। মধ্যযুগে প্রাকৃত-ভাঙা এক প্রকার সুললিত অবহট্‌ঠ কাব্যের ভাষা হিসাবে জনপ্রিয় ছিল, ইহার সহিত মৈথিলী হিন্দী বাঙলা প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষার শব্দ মিশাইয়া এই ব্রজবুলির জন্ম হইতে থাকে। বিদ্যাপতির মৈথিলী অবহট্‌ঠে মিশ্রিত রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক কবিতাগুলি বিকৃত হইয়া বাঙলা দেশে এই নূতন ভাষার ভিত্তি প্রস্তুত করে এবং চৈতন্যোত্তর যুগের কবিরা ব্যাপকভাবে এই ব্রজবুলির চর্চা করিতে থাকেন। রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবনে এই ভাষাতেই কথা বলেন, এইরূপ কাল্পনিক বিশ্বাস [ব্রজের বুলি =ব্রজবুলি] হইতেই ব্রজবুলির জনপ্রিয়তা। তদ্ব্যতীত, এই ভাষা সর্বজন-বোধ্য কিন্তু সুমধুর, ইহার ছন্দ আবৃত্তির ও কীর্তনের পক্ষে উপযোগী, এইরূপ

ব্রজবুলি

অন্যান্য কারণও ব্রজবুলির কাব্যভাষারূপে প্রসারের কারণ। গোবিন্দদাসের মত শিল্পকুশল সচেতন কবি ব্রজবুলির মধ্য দিয়া কবিতার আর্টকে উন্নত পরিচ্ছন্ন ও সমৃদ্ধ করিয়াছেন। জ্ঞানদাস, বলরামদাস, চম্পতি, রায়শেখর, জগদানন্দ প্রমুখ কবিবৃন্দ ব্রজবুলিতে পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন।

ভাবার্থ

বৈষ্ণব ভক্তভাবুক পদকর্তা গোবিন্দদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যের ভাবাবিষ্ট জীবনের একখানি অনিন্দ্যসুন্দর আলেখ্য আঁকিয়াছেন। চৈতন্যদেবের মেঘসদৃশ নয়ন হইতে অশ্রু পতনে ও দেহের স্বেদ-ক্ষরণে গৌরাঙ্গতনু রোমাঞ্চিত ও পুলকিত হইতেছে। এই নটবর গৌরকিশোর মূর্তি যেন সুরধুনীতীরে সঞ্চরমান উজ্জ্বল কল্পতরু। তাহার শ্রীচরণকমলে ভ্রমরের ন্যায় ভক্তগণ সমাবিষ্ট, তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া সাধু ও অসৎ সকলেই সর্বদা তাঁহার প্রতি মুগ্ধ হইয়া ধাবিত হয়। তিনি প্রেমরত্ন বিতরণ করিয়া সকলের মনোবাঞ্ছা সর্বদাই পূর্ণ করিতেছেন কিন্তু তাঁহার চরণে কেবল গোবিন্দদাসই দীন হীন ও বঞ্চিত হইয়া রহিলেন।

ভাবার্থ

আলোচনা

বৈষ্ণব পদাবলীর গৌরচন্দ্রিকা-বিষয়ক পদগুলিতে করুণাঘন মাধুর্যবিগ্রহ চৈতন্যদেবের ভাবজ্যোতির্ময় জীবনের যে অপরূপ চিত্রগুলি বৈষ্ণব কবিগণ অঙ্কিত করিয়াছেন, এযুগে তাহা বিস্ময়কর লাগে। একজন ঐতিহাসিক পুরুষের রূপগুণ লইয়া এই পদগুলি মানবিকতায় সমৃদ্ধ, সৌন্দর্যে মহান, ভালবাসায় এমন গভীর। অবতারবাদে বিশ্বাস ভারতীয় ধর্মে নূতন কথা নয়, কিন্তু একজন দেবকল্প ব্যক্তির প্রতি কয়েক শতাব্দীর মানুষের এত স্নেহ, এত প্রেম, এত অন্তরঙ্গতা, এত বিস্ময় কে কবে দেখিয়াছে? বিশ্বের সৌন্দর্যসার দিয়া তাঁহার অঙ্গ সুবাসিত করিয়াছেন কবিবৃন্দ, জীবনের সমগ্র মমতা দিয়া তাঁহার চিত্র আঁকিয়াছেন। ইহার সহিত তাঁহাদের নিজস্ব ধর্ম-বিশ্বাস, গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের দার্শনিক তাৎপর্য, গৌরচন্দ্রিকা রচনার সূক্ষ্ম উদ্দেশ্যও যুক্ত হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেম যে নিতান্ত সাধারণ মানুষের আকর্ষণ নয়, ইহা প্রমাণ করিবার জন্যই যেন তাঁহারা চৈতন্যচরিত বন্দনা

আলোচনা

গৌরচন্দ্রিকা পদের উদ্দিষ্ট পুরুষ

করিয়া লইতেন। গৌরাঙ্গের মুকুরেই তাঁহারা রাধামাধবের লীলা দর্শন করিয়াছেন।

এই ধরণের গৌরচন্দ্রিকায় গোবিন্দদাস কবিরাজ অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। ধর্মে তিনি বৈষ্ণব, সুতরাং তাঁহার ধর্মজীবনের আদিগুরুর প্রতি অর্ঘ্য নিবেদন তাঁহার আধ্যাত্মিক কর্তব্য ছিল। কিন্তু কেবল এই কর্তব্যবোধের দ্বারাই কোনো মহৎ সৃষ্টি হইতে পারে না। চৈতন্যদেবকে তিনি প্রত্যক্ষ করেন নাই, এই বেদনা বক্ষে লইয়া আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া তিনি সেই নিত্যকালের পরমপ্রিয় মানুষটির চিত্র আঁকিয়াছেন। তাঁহার সকল সারস্বত সাধনা তাই সেই না-দেখা মানুষটিকে ঘিরিয়া মুকুলিত হইয়াছে। তাঁহার মনোভূমিই চৈতন্যের জন্মস্থান হইয়াছে, যাহা নবদ্বীপ-নদীয়া হইতে সত্য। মহামানবের স্তবগানে তিনি তাঁহার কলস্বর ছন্দ ও ব্যঞ্জনাগভ ভাষাকে নিয়োগ করিয়াছেন, কীর্তনের মূর্ছনায় ক্ষণস্থায়ী নরজন্মকে মহৎ মর্যাদা দান করিয়াছেন।

গোবিন্দদাসের গৌরচন্দ্রিকা

চৈতন্য-সমকালীন কবিরা চৈতন্যদেবের ব্যক্তিগত জীবনের বহু ঘটনাদির উল্লেখ করিয়া পদ রচনা করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস-গ্রহণ ও মস্তকমুণ্ডন, নীলাচলে যাত্রা, শান্তিপুরে আগমন প্রভৃতি ঘটনাকে বেদনার রসে সিক্ত করিয়া একপ্রকার গৌরলীলার পদ রচিত হইয়াছে [শচী-মার বিলাপ পদের আলোচনা দ্রষ্টব্য]। কিন্তু গৌরচন্দ্রিকা ঠিক এই জাতীয় পদ নয়। গৌরচন্দ্রিকা পদের উদ্দিষ্ট চৈতন্যের ঘটনাগত জীবন নয়, ভাবগত জীবন। জীবনের শেষ দ্বাদশ বৎসরে তাহার জীবনে রাধাভাবের লক্ষণগুলি সুপ্রকট হইয়াছিল এবং রাধাপ্রেমের অনুকরণে তাঁহার জীবনে কৃষ্ণবিরহের উন্মাদনা সূচিত হইয়াছিল ভক্তগণ ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ইহাই গৌরচন্দ্রিকা পদের বিষয়বস্তু। ক্রমে ক্রমে গৌরচন্দ্রিকা রচনা একটি আবশ্যিক প্রথায় পরিণত হয়। চৈতন্যদেব এইরূপ লীলা অভিনয় করিয়াছিলেন, ইহা স্বতঃসিদ্ধ ধরিয়া উত্তরকালের কবিরা চৈতন্যদেবের কোনো না কোনো ভাবাবেশের চিত্র আঁকিয়াছেন। রাধার মানের পদ রচনা করিতে গিয়া চৈতন্যদেবের মানের চিত্র অঙ্কন করা হইল, কারণ 'বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর'। ইহাই পরবর্তীকালের গৌরচন্দ্রিকায় বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আলোচ্য পদটিতে গোবিন্দদাস

চৈতন্যের ভাবগত জীবন

চৈতন্যদেবের ভাবপ্লুত জীবনের একটি বিশ্বস্ত চিত্রই রচনা করিয়াছেন। চৈতন্যজীবনী গ্রন্থে চৈতন্যদেবের অন্ত্যলীলায় এইরূপ চিত্রের অভাব নাই। চৈতন্য চরিতামৃতের অন্ত্যলীলায় নানাস্থানেই এই চিত্র আছে—

চৈতন্য-জীবনী গ্রন্থে চৈতন্যের অনুরূপ ভাবাবেশ-চিত্র

এতেক বিলাপ করি প্রেমাবেশে গৌরহরি
সঙ্গে লঞা স্বরূপ রামরায়
কভু নাচে কভু গায়, ভাবাবেশে মূর্ছা যায়
এইরূপে রাত্রিদিন যায়॥

অলংকারশাস্ত্রে ভাবাবেশের যেরূপ স্তম্ভ স্বেদ রোমাঞ্চের উল্লেখ আছে, প্রভুর জীবনেও তাহাই হইত। অন্ত্যলীলার দশম পরিচ্ছেদে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিতেছেন,

এই পদে নৃত্য করে পরম আবেশে।
সব লোক চৌদিকে প্রভুর প্রেমে ভাসে॥
বোল বোল বলেন প্রভু বাহু তুলিযা।
হরিধ্বনি করে লোক আনন্দে ভাসিয়া॥
সঘন পুলক যেন শিমুলের তরু।
কভু প্রফুল্লিত অঙ্গ কভু হয় সরু॥

কিন্তু এত নিপুণ জীবন্ত বর্ণনা সত্ত্বেও গোবিন্দদাস যে চৈতন্যদেবকে প্রত্যক্ষ করেন নাই, এই দুঃখ তিনি ভুলিতে পারেন নাই। তাই যে চরণের মধুলোভে অসংখ্য ভ্রমর গুঞ্জন করিয়াছে, যে জীবনের সৌরভে সুরের সহিত অসুর পর্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছে, হতভাগ্য গোবিন্দদাস তাঁহার স্পর্শ পাইলেন না—

চৈতন্য-অদর্শনের খেদ

তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত গোবিন্দদাস রহু দূর।

এই ব্যক্তিগত বেদনাতেই কবিতাটি কেবল তত্ত্বের বিগ্রহ নয়, গীতিকবিতা হইয়া উঠিয়াছে।

রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ

নীরদ-নয়নে—অবিরল ভাবাশ্রু-মোচনহেতু নয়ন দুইটি মেঘের সহিত অভিন্ন হইয়াছে। **পুলক-মুকুল-অবলম্ব**—চোখের জলের প্লাবনে দেহে রোমাঞ্চ-পুলকের মুকুল অঙ্কুরিত হইতেছে, দেহ এখানে তরুতুল্য। **মুকুল-**

অবলম্ব—মুকুলের অবলম্বন অর্থাৎ তনু-তরু। **স্বেদ-মরন্দ**—স্বেদ বা ঘর্মরূপ পুষ্পমধু (=মরন্দ)। **স্বেদ-মরন্দ**····· **কদম্ব**—নয়নে শ্রাবণের বাদল সিঞ্চন হইতেছে। এ ধারা লৌকিক শোকের নয়, কৃষ্ণবিরহের অর্থাৎ প্রেমের, তাই দেহ ভাবে-পুলকে বৃক্ষের মত রোমাঞ্চিত হইতেছে, ধীরে ধীরে ভাবাবেশের কদম্ব-কোরক ফুটিতেছে। শরীরের স্বেদ (শ্রমজনিত নয়, পুলকজনিত বলিয়া) সেই ভাবকদম্বের ক্ষরিত বিন্দু বিন্দু মরন্দ বা পুষ্পমধুর তুল্য। **কদম্ব**—বহুবচনাত্মক শব্দরূপেও গণ্য হইতে পারে, অর্থাৎ ভাবকদম্ব—ভাবসমূহ। তুলনীয়,

> নিশসি নিহারসি ফুটল কদম্ব।
> করতলে বদন সঘন অবলম্ব॥
> খেনে তনু মোড়সি কবি কত ভঙ্গ।
> অবিরল পুলক-মুকুল ভরু অঙ্গ॥···
> ভাব কি গোপসি গুপত না রহই।
> মরমক বেদন বদন সব কহই॥ [গোবিন্দদাস]

চুয়ত—ক্ষরিত (হইতেছে), ব্রজবুলি প্রয়োগ। তু-বাঙলা 'চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়া'। **পেখলুঁ**—দেখিলাম, ব্রজবুলির অতীত উত্তম পুরুষ। **নটবর**—শ্রীকৃষ্ণের নামান্তর। তুলনীয়,

> ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি।
> নটবর বেশ পাইল কথি॥ [চণ্ডীদাস]

গৌর-কিশোর—কিশোর-বয়স্ক গৌরাঙ্গদেব। চৈতন্য-জীবনী অনুসারে ইহা চৈতন্যদেবের কৈশোর জীবনের বর্ণনা নয়, কিন্তু ভক্তের চক্ষে তাঁহার সমাধিস্থ ভাবাবেশময় গৌরাঙ্গসুন্দর মূর্তিখানি একই সঙ্গে নটবর ও গৌর, অর্থাৎ কৃষ্ণ ও রাধার যুগ্মরূপ। তাই তিনি ভাববৃন্দাবনের চিরকিশোর বা নবযুবক। **কি পেখলুঁ**···**কিশোর**—এই অশ্রুগলিত ভাববিদ্ধ রূপখানি রচনা করিয়া কবি নিজেই তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন, দেখিয়া মুগ্ধ ধন্য বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছেন ইহা তিনি কী দেখিলেন ? **অভিনব**··**উজোর**—এক আশ্চর্য স্বর্ণময় অভীষ্ট-পূরণকারী বৃক্ষ, সুরধুনীতীরে উজ্জ্বলভাবে সঞ্চরণ করিতেছেন। বিরোধ ও বিরোধের অবসানে এখানে আলংকারিক কবিত্ব সৃষ্টি হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যদেব জীবন্ত ঈশ্বর, তিনি প্রেমের ভাণ্ডার, প্রার্থীকে সর্বপ্রকার অভীষ্ট দান করিয়াছেন, তাই কল্পতরুসদৃশ। কিন্তু কল্পতরুও বৃক্ষ, সে অচল। আর চৈতন্য মহাপ্রভু সতত-সঞ্চরমান হেমকান্তি কল্পবৃক্ষ, ইহাই অভিনব। পুরাণ-কথিত কল্পতরু বাস্তবে দেখা যায় না, ইহা স্বর্গনদীর ধারেই মুকুলিত হয়, কিন্তু কবির কল্পতরু ভাগীরথীতীরে [নবদ্বীপে] জীবন্ত ও উজ্জ্বল এবং হরিনামে নৃত্যপরায়ণ হইয়া আছেন। তুলনীয়, কালীনাম-কল্পতরু হৃদয়ে রোপন করেছি [রামপ্রসাদ]। **সঞ্চরু**—সঞ্চরণ করে, ব্রজবুলি প্রয়োগ। তুলনীয়, খরতর বেগ সমীরণ সঞ্চরু চঞ্চরীগণ কক রোলে [বিদ্যাপতি]। **চঞ্চল··ভোর**—শ্রীচৈতন্যদেব হেমকান্তি জংগম কল্পবৃক্ষ হইয়া বিচরণ করিতেছেন, তাঁহার নিকট করুণা প্রেম পাইবার জন্য তাঁহার কমলতুল্য শ্রীচরণ-যুগলে পুষ্পাকৃষ্ট ভ্রমরের মত কত শত ভক্ত বিভোর হইয়া আছে ও তাঁহার গুণগান করিতেছে। ভক্ত-পরিবৃত কীর্তনরত চৈতন্যদেবের এই মূর্তিটি তাঁহার জীবনী গ্রন্থেই আছে। **ঝঙ্করু**—ঝঙ্কৃত হয়, এখানে, ভ্রমরগণের ন্যায় গুঞ্জন করে, ব্রজবুলি প্রয়োগ। **পরিমল···অগোর**—চৈতন্যের গুণে মুগ্ধ হইয়া কি সাধু কি অসাধু সকলেই তাঁহার দিকে ধাবিত হয়, একবার তাঁহাব সংস্পর্শে আসিলে সবদা সেখানেই অজ্ঞান বিহ্বল হইয়া থাকে অর্থাৎ পাপীতাপীদিগকে সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার কবিবাব তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা ছিল, জগাই-মাধাইয়ের ঘটনা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। **ধাবই**—ধাবিত হয়। **রহত**—থাকে। **অগোর**—অজ্ঞান, মূর্ছিত, এখানে মোহিত অর্থে। তুলনীয়,

হেরইতে গো ধনী মোর।
অব তিন ভুবন অগোর॥ [বিদ্যাপতি]

প্রেমরতন ফল বিতরণে—মহাপ্রভু কল্পতরু সদৃশ, কিন্তু তিনি মানুষের বৈষয়িক প্রার্থনা পূরণ করেন না, তিনি নিখিল জগৎকে হরিনাম শিক্ষা দিয়াছেন, যাহা সর্বতাপঘ্ন, তিনি প্রেম শিক্ষা দিয়াছেন যাহা বিঘ্নবিনাশক। সেই প্রেমই তাঁহার দান, ইহাই তাঁহার জীবনকল্পতরুর শ্রেষ্ঠ ফল। এই পঞ্চম পুরুষার্থের দ্বারাই তিনি অখিল মানুষের পিপাসা হরণ করিয়াছেন, মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছেন। অর্থাৎ ইহাই মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্য। **তাকর··· রহু দূর**—তাঁহার সেই ভক্তভ্রমর-ঝঙ্কৃত সুবাসুর-চৈতন্যলোপকারী কমলতল হইতে একমাত্র গোবিন্দদাসই বঞ্চিত হইয়া দূরে রহিলেন। ইহা যুগপৎ

বৈষ্ণবীয় বিনয় এবং কবির বাস্তব অদর্শন-জনিত আক্ষেপের পরিচায়ক। [অন্য একটি ব্যাখ্যা আছে। ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ, জীব তাঁহার অংশ। জীবের ভক্তি রাগানুগা, দূর হইতে স্মরণ কীর্তন তাহার কাজ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরেরই অবতার, তাই গোবিন্দদাস যেন জীবের মতই দূর হইতে রাগানুগা সাধনায় তাঁহাকে স্মরণ করিতেছেন]।

ব্যাখ্যা

নীরদনয়নে···ভাবকদম্ব—আলোচ্য পংক্তিনিচয় চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিকুলগুরু কবীন্দ্র গোবিন্দদাস কবিরাজের গৌরচন্দ্রিকা পদ শ্রীগৌরচন্দ্র হইতে উৎকলিত। এখানে কৃষ্ণবিরহার্তিতে ভাবাবিষ্ট গৌরাঙ্গদেবের অশ্রুবিগলিত সাত্ত্বিক ভাবের একটি রমণীয় মূর্তি অঙ্কিত করা হইয়াছে। মহাপ্রভুর নয়ন আজ মেঘাবৃত, ঈশ্বরবিরহে কাতর হওয়ায় তিনি অশ্রুসিক্ত, তাঁহার নয়নবারি দেহ প্লাবিত করিতেছে। গৌরাঙ্গসুন্দর কমনীয় দেহে সেই বিন্দু বিন্দু জলসিঞ্চনে স্তম্ভ স্বেদ রোমাঞ্চ প্রভৃতি মানব-সুলভ সাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ হইতেছে। পদকর্তার কল্পনানেত্রে ইহা একটি বরষার নবজলপুষ্ট পুলকমুকুলিত তরুর ন্যায় বোধ হইতেছে। ভাবাবেশে দেহ আচ্ছন্ন হইলে স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও মূর্ছা এই অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়। বিরহের এই দিব্যোন্মাদ মূর্তিটি গৌরচন্দ্রের জীবনে রাধাভাবের বিকাশ বলিয়াই বৈষ্ণবগণ মনে করেন।

টীকা—রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য।

[ইহা কেবল ভক্তের কল্পনামাত্র নয়, চৈতন্যের জীবনে ইহা বাস্তব সত্য ছিল। তাঁহার জীবনীগ্রন্থে ঈশ্বরবিরহে এই ভাবাবিষ্ট মূর্তি পুনঃপুন অঙ্কিত হইয়াছে। স্বয়ং গৌরাঙ্গদেব একটি জীবনবাণীতে বলিয়াছেন—

> নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা।
> পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥

—"হে ভগবন! তোমার নামগ্রহণে কোন্ সময় আমার নয়ন হইতে অশ্রু বিগলিত হইবে, কোন্ সময় গদগদকণ্ঠে তোমার নাম উচ্চারণ করিব, এবং সমস্ত দেহ পুলকিত হইবে।"

আলোচ্য পদটি যেন এই শ্লোকেরই ভাষ্যমাত্র।]

কি পেখলুঁ··উজোর—বক্ষ্যমাণ চরণগুলি গোবিন্দদাস কবিরাজের রাধাভাবকান্তিময় গৌরচন্দ্রের বর্ণনা শ্রীগৌরচন্দ্র হইতে উদ্ধৃত। কবি ভাব-তন্ময় হৃদয়ে করুণানিবিড় মহাপ্রভুর অশ্রুস্বেদরোমাঞ্চ-বিভোর যে বিরহজনিত সাত্ত্বিকভাবের রূপ-মূর্তিখানি দর্শন করিয়াছেন তাহারই ধ্যানে বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছেন, এ-অপূর্ব রূপ কোন সৌভাগ্যবশত তিনি দর্শন করিলেন! নত্যবিবশ গৌরবর্ণ যৌবনসম্পন্ন প্রভুর দেহখানি হরিনামকীর্তনে উন্মত্ত, কোনো পার্থিব ভক্তের প্রার্থনাই তিনি অপূর্ণ রাখেন না। তাঁহার নিকট উপনীত হইলে সকলের সব কামনা চরিতার্থ হয়। দেহের বর্ণে এবং বিশুদ্ধিতায় ও পবিত্রতায় তিনি স্বর্ণকান্তি, তাই তিনি হেম-কল্পতরু। কিন্তু নন্দনবনের কল্পতরু অভীষ্ট ফল প্রদান করিলেও নিশ্চল বৃক্ষ, স্বর্গের সুরধুনী-তীরে তাহার কাল্পনিক অবস্থান। আর এই জীবন্ত নৃত্যপরায়ণ কল্পতরু আশ্চর্যজনকভাবে মর্তের সুরধুনী তথা নদীয়া-প্রান্তের ভাগীরথীতীরে [কিংবা চৈতন্যের শেষ জীবনের চিত্র হইলে বৃন্দাবনের যমুনাতীরে] উজ্জ্বল হইয়া সঞ্চরমান আছেন। এই মূর্তি দর্শন করা কি পরম বিস্ময়ের ব্যাপার নয়?

টীকা—কল্পতরু—পুরাণমতে এক কল্প পরে যে তরু সমুদ্রগর্ভে লীন হয়। কিন্তু জনশ্রুতি আছে, স্বর্গে একজাতীয় বৃক্ষ আছে যাহার নিকট প্রার্থনামাত্রই প্রত্যাশিত বস্তু লাভ হয় বা সবপ্রকার অভীষ্ট পূরণ হয়। মহাপ্রভুকে কল্পতরুর সহিত তুলনা করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবি তাঁহার স্বর্গীয়ত্ব যেমন প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তেমনি তাঁহার করুণা ও প্রেমের বদান্যতাও বুঝাইলেন।

চঞ্চল চরণ··অগোর—বৈষ্ণব কাব্যে দ্বিতীয় বিদ্যাপতিরূপে প্রখ্যাত কবিরাজ গোবিন্দদাসের রচিত সাত্ত্বিক ভাবাবিষ্ট গৌরাঙ্গের বন্দনা শ্রীগৌরচন্দ্র পদ হইতে চয়িত আলোচ্য পংক্তিগুচ্ছে মহাপ্রভুর হরিনামোন্মত্ত কীর্তনবিলাসী ভক্তসমাবিষ্ট মূর্তিটি উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে। চৈতন্যদেব দিব্য আবেশে কৃষ্ণবিরহে প্রকটিত-বিকার। নয়নে গলদশ্রু, দেহে ভাবকদম্বের রোমাঞ্চ, কণ্ঠে কীর্তন, অঙ্গে নৃত্যের হিল্লোল। অসংখ্য ভক্ত তাঁহার কৃপাধন্য হইবার জন্য মধুলুব্ধ ভ্রমরের মত তাঁহার শুভ্র-সুদর্শন কমলতুল্য চরণযুগলকে বেষ্টন করিয়া নামকীর্তন ও প্রভুর গুণগান করিতেছে; ইহাই যেন ভক্তভ্রমরগণের গুঞ্জন বা ঝঙ্কার। এমন কি কেবল সাধু সাত্ত্বিকগণ নয়, অসৎ দুষ্ট প্রকৃতির লোকও

চৈতন্যের নিকট আসিয়া অবিশ্বাস্যভাবে তাহাদের স্বভাব পরিবর্তন করিয়াছে ; পরিণামে তাঁহার ভক্ত হইয়া মুগ্ধের মত তাঁহারই চরণে আকৃষ্ট ও মূর্ছাতুর হইয়া রহিয়াছে। এমনই সেই চরণের সৌরভ, তথা সেই ব্যক্তিত্বের মধুর আকর্ষণ , এমনই তাঁহার গুণ।

টীকা—রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য।

[এইরূপ বর্ণনা অতিরঞ্জিত নয়। চৈতন্যজীবনীকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য চরিতামৃতের একটি শ্লোকে বলিয়াছেন—

চৈতন্য-চরণাম্ভোজ-মকরন্দ লিহঃ সতাং
ভজে যেষাং প্রসাদেন পামরোঽপি অমরো ভবেৎ ॥ [অন্ত্যলীলা, ৭ম]

—"যে সাধুদিগের প্রসাদে পামর (অধম)ও দেবতুল্য হইতে পারে, সেই চৈতন্যচরণপদ্মের মকরন্দাস্বাদ-গ্রাহী সাধুদিগকে ভজনা করি।"]

অবিরত ···**বহুদূর**—রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য।

টীকা—[চৈতন্য-চরণ হইতে বঞ্চিত হইবার এই শিক্ষা বৈষ্ণব কবিদের স্বভাবসিদ্ধ। চৈতন্যদেবই শিক্ষা দিয়াছেন, যথার্থ বৈষ্ণবকে তৃণাপেক্ষা সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু হইয়া হরিকথা কীর্তন করিতে হইবে। তাই গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন,

প্রেমধনের ধনী কয়ল অবনী বঞ্চিত গোবিন্দদাস।

কিন্তু ইহাদের ভিতর দিয়া গোবিন্দদাস যে জীবৎকালে চৈতন্যদেবকে চাক্ষুষ দেখিতে পাইলেন না, এই বাস্তব আক্ষেপটি তীব্রভাবে ব্যক্ত হইতেছে। যিনি অখিল ভুবনকে রসসাগরে ভাসাইলেন, দুর্ভাগা গোবিন্দদাসই তাহা হইতে বঞ্চিত রহিলেন—

যে রসে ভাসি অবশ মহিমণ্ডল
গোবিন্দদাস তহিঁ পরশ না ভেলি ॥]

প্রশ্ন ১। গৌরচন্দ্রিকা পদের উদ্দেশ্য ও উপলক্ষ বর্ণনা করিয়া গোবিন্দদাস কবিরাজের শ্রীগৌরচন্দ্র পদটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। [ভূমিকা ও আলোচনা দ্রষ্টব্য।]

প্রশ্ন ২। শ্রীগৌরচন্দ্র পদটির মধ্য দিয়া গৌরাঙ্গের ভাবজীবনের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহার বিবরণ দাও এবং এই জাতীয় পদের কাব্যমূল্য ও তাৎপর্য নিরূপণ কর।—[আলোচনা দ্রষ্টব্য।]

বর্ষাবিরহ : রায়শেখর

ভূমিকা

রায়শেখর ষোড়শ শতাব্দীর অন্যতম বিশিষ্ট পদকর্তা এবং তাঁহার অনেক পদ বিদ্যাপতির নামে অবগুণ্ঠিত হইয়া আছে। বৈষ্ণব কবিতায় কবিশেখর রায়শেখর শেখর ইত্যাদি একাধিক ভণিতা একই ব্যক্তিত্বের নামভেদ বলিয়া মনে করা হয়। ডঃ সুকুমার সেন তাঁহার আসল নাম দৈবকীনন্দন সিংহ বলিয়াছেন, কিন্তু এইরূপ অনুমানও প্রত্যয়গ্রাহ্য হইয়া উঠে নাই। অতএব, তাঁহার সময়কালও নিশ্চিত-ভাবে জানা যায় না। পদকল্পতরু নামক বৈষ্ণব পদসংকলন গ্রন্থের ভূমিকায় ইহার সম্পাদক পণ্ডিত সতীশচন্দ্র রায় শেখরের অনেকগুলি পদ বিদ্যাপতির ছদ্মগৌরব হইতে উদ্ধার করিয়া শেখরের নামে সমর্পণ করিয়াছেন। রায়শেখর বাঙলা ও ব্রজবুলি দুই ভাষাতেই পদ রচনা করিয়াছেন, অভিসার-বিরহ ও বাৎসল্যের পদে তাঁহার ভাষা ও ছন্দ সুগঠিত, সুললিত ও সুগভীর। মনে হয় বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসই তাঁহার কাব্যাচার্য ছিলেন, সুতরাং বিদ্যাপতির সহিত তাঁহার পদের মিশ্রণ অস্বাভাবিক নয়।

কবিপরিচয়

রায়শেখর ও বিদ্যাপতির অভিন্নতা-সমস্যা

কিন্তু আলোচ্য বর্ষাবিরহ পদটি রায়শেখরের রচনা কিনা এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। এ পর্যন্ত পদটি বিদ্যাপতির নামেই প্রচলিত [মাধুকরী-সংকলয়িতা পদটীকায় ইহা উল্লেখ করিয়াছেন]। 'কাজর রুচিহর রয়নি বিশালা' নামক রায়শেখরের একটি পদে ভণিতায় আছে শেখর অভিসারিকা রাধার সংকেতকুঞ্জে যাত্রাকালে তাঁহার আভরণ বস্ত্রাদি বহন করিয়া পশ্চাদনুগামী হইয়াছেন। অভিসারের নিঃসঙ্গ গোপনতার মধ্যে পদকর্তার এই অলংকার-বহন-সমভিব্যাহার ঠিক প্রাক্‌চৈতন্য যুগের লক্ষণ নয়, ইহা চৈতন্যদেবের সপার্ষদ অভিসার-লীলাভিনয়েরই স্মারক। কিন্তু আলোচ্য পদে এইরূপ কোনো আভ্যন্তর-বিশিষ্টতা ইহার চৈতন্যোত্তরত্ব প্রমাণের সহায়ক নয়। ডঃ সুকুমার সেনের যুক্তি—

বর্ষাবিরহ—কবি কে?

আভ্যন্তরের প্রমাণ?

"পদটি সর্বপ্রথম মিলিয়াছে সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে পীতাম্বর দাসের

শেখরের ভণিতায় প্রাপ্তি

অষ্টরস ব্যাখ্যায়। সেখানে শেখরেরই ভণিতা। এ ভণিতা অন্যত্রও মিলিয়াছে—

ভণহুঁ শেখর কইছে বঞ্চব সো হরি বিনু ইহ রাতিয়া।

একটি পুরানো পদসংগ্রহ পুথিতে পাঠান্তর পাইতেছি,

ভণয়ে শেখর কৈছে গোঙাব কাহ বিনু এহো রাতিয়া॥"

তথাপি ইহা শেখরের কিনা এক কথায় নিরূপিত হয় না, কারণ পুরাতন

পাঠান্তর

বহু পুথিতেই জ্ঞানদাসের পদ চণ্ডীদাসের ভণিতায় আছে, ইহা সংগ্রহকর্তার অনবধানতা হইতে পারে। আর 'এহো রাতিয়া' [ইহ রাতিয়া] দিন রাতিয়ার স্থলে বসিলেই ইহা শেখরের রচয়িতা-যশ পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। কবিশেখর কালিদাস রায় লিখিয়াছেন,

"বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত ভরা বাদর মাহ ভাদর পদটির 'বিদ্যাপতি কহ কৈসে গমাযব' স্থলে 'ভণহু শেখর কৈসে গোঙাযব' পাঠ যে হরেকৃষ্ণবাবু ও

শেখরের সপক্ষে সমালোচক

সুকুমারবাবু [হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুকুমার সেন] পুথিতে পাইয়াছেন, তাহাই যথার্থ মনে হয়। এই পদের ভাব ছন্দ ও ভাষার সঙ্গে বিদ্যাপতি নামে প্রচলিত বর্ষাবিরহের ঐ পদটির এমনই সগোত্রতা আছে যে, উহাকে শেখরের পদ বলিয়াই মনে হয়।" [প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য]

কিন্তু ইহাও আলোচনার পক্ষে সুস্পষ্ট যুক্তি নয়, অনুমান মাত্র। পক্ষান্তরে এই পদটি এ পর্যন্ত বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত হইবারই বা কারণ কী?

আলোচ্য পদে মেঘমন্দ্রিত উত্তালবর্ষণে হৃদয়মন্দিরে প্রতীক্ষমাণা বিরহিণীর যে বিশ্বব্যাপ্ত বিলাপগাথা নিপুণ হস্তে রচিত হইয়াছে ইহা বিদ্যাপতির মত উচ্চাঙ্গের কবির পক্ষেই সম্ভব। বিদ্যাপতির অসংখ্য বর্ষাবিরহ পদে আলোচ্য

বিদ্যাপতির সপক্ষে সমালোচক

পদের অনুরূপ আবহ, ভাব ও শব্দের ব্যবহার আছে। ইহার সংক্ষিপ্ত অথচ মর্মভেদী শোকের ঘনীভূত কাব্যরূপটি বিদ্যাপতির মত বাচংযত কবির পক্ষেই উপযুক্ত মনে হয়। তবে পদাবলীতে অপ্রধান বহু কবির নামে এমন অনেক পদ আছে যেগুলি ব্যঞ্জনাগত ভাবপ্রকাশে, প্রেমের সূক্ষ্মতা চিত্রণে, অনুপম অলংকারে প্রথম

শ্রেণীর কবিপ্রসূত মনে হয়। ওষধির মত ক্ষণকালের কবিবৃন্দ যেন দুই একটি চকিত-রচিত সংগীতেই তাঁহাদের সকল সাফল্য নিঃশেষে উজাড করিয়া দিয়াছেন। শেখর অবশ্য সেই তুলনায় যশোভাক্ কবি, একাধিক রসপর্যায়ে তাঁহার সাফল্য কালোত্তীর্ণ। সুতরাং এ ক্ষেত্রে বর্ষাবিরহের এই পদটি তাঁহার রচিত হওয়া আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। বরং অনুমান অপেক্ষা প্রাচীন পুথিতে প্রাপ্ত নির্ভর যোগ্য সাক্ষ্যকেই পুনঃপ্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত মাধুকরী-সম্পাদক গ্রহণ করিয়াছেন।

বর্ষা চিরকালই বিরহের উদ্দীপক, মানুষের নিঃসঙ্গতাকে আতুর করিয়া প্রবাসের বেদনাকে উন্মথিত করিয়া বিরহের চারিপাশে সে একটি নিঃসীম হাহাকার জাগাইয়া তোলে। কালিদাস মেঘদূত কাব্যে বলিয়াছেন, মেঘ দর্শনে সুখী ব্যক্তির চিত্তে আনমনা ভাব জাগে, আর যাহার প্রিয়জন দূরে আছে তাহার তো কথাই নাই। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,

বর্ষা বিরহের উদ্দীপক

"বর্ষাকালে সকল লোকেরই কিছু-না-কিছু বিরহের দশা উপস্থিত হয়—এমন কি প্রণয়িনী কাছে থাকলেও হয়।"

সীতাহরণের পর শূন্য অরণ্যবাসে সমাগত প্রথম বর্ষায় এই ব্যাকুল বিরহ রামচন্দ্রকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। এই বিরহের বিদীর্ণ বিলাপ অবলম্বন করিয়াই কালিদাস মেঘদূত রচনা করেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে এই 'তিমির দিগ্‌ভরি ঘোর যামিনী'র অশ্রুপাতে রাধার অন্তরলোকের কৃষ্ণবিহীন শূন্যতা উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। রায়শেখরের পদটি সেই বর্ষা-কালোচিত বিরহের। এখানে ভরা ভাদরের বাদল বরিষণে রাধার শূন্য-মন্দির-যাপনের কারুণ্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাই কবিতার নাম বর্ষাবিরহ।

কবিতার নামকরণ

আলোচ্য পদটি রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ছিল এবং অল্প বয়সেই ইহাতে তিনি নিজস্ব সুরারোপ করিয়াছিলেন। শ্রাবণ সন্ধ্যা নামক একটি প্রবন্ধে এই কবিতাটির যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তিনি তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল—

"এই যে এই মুহূর্তেই শ্রাবণের ধারাপতনে সন্ধ্যার আকাশ মুখরিত হয়ে উঠেছে এ আমাদের কাছে তার সমস্ত কাজের কথা গোপন করে গেছে।

প্রত্যেক ঘাসটির এবং গাছের প্রত্যেক পাতাটির অন্নপানের ব্যবস্থা করে দেবার জন্য সে যে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে আছে, এই অন্ধকার সভায় আমাদের কাছে এ কথাটির কোনো আভাসমাত্র সে দিচ্ছে না। আমাদের অন্তরের সন্ধ্যাকাশেও এই শ্রাবণ অত্যন্ত ঘন হয়ে নেমেছে, কিন্তু সেখানে তার অপিশের বেশ নেই—সেখানে কেবল গানের আসর জমাতে, কেবল লীলার আযোজন করতে তার আগমন। সেখানে সে কবির দরবারে উপস্থিত। তাই ক্ষণে ক্ষণে মেঘমল্লারের সুরে কেবলই জেগে উঠেছে—

'বর্ষাবিরহে'র রবীন্দ্র-ব্যাখ্যা

তিমির দিগ্‌ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া

প্রহরের পর প্রহর ধরে এই বার্তাই সে জানাচ্ছে, ওরে তুই যে বিরহিণী, তুই বেঁচে আছিস কী করে, তোর দিনরাত্রি কেমন করে কাটছে।

সেই চির দিনরাত্রির হরিকেই চাই, নইলে দিনরাত্রি অনাথ। সমস্ত আকাশকে কাঁদিয়ে তুলে এই কথাটা আজ আর নিঃশেষ হতে চাচ্ছে না।...

আজ কেবলই মনে হচ্ছে, এই যে বর্ষা এতো এক সন্ধ্যার বর্ষা নয়, এ যেন আমার সমস্ত জীবনের অবিরল শ্রাবণ ধারা। যতদূর চেয়ে দেখি, আমার সমস্ত জীবনের উপর সঙ্গীহীন বিরহ সন্ধ্যার নিবিড় অন্ধকার—তারই দিগ্‌দিগন্তরকে ঘিরে অশ্রান্ত শ্রাবণের বর্ষণে প্রহরের পর প্রহর কেটে যাচ্ছে ; আমার সমস্ত আকাশ ঝরঝর করে চলছে কৈসে গোঙায়বি হরি বিনে দিন রাতিয়া।"

[শ্রাবণসন্ধ্যা—শান্তিনিকেতন প্রবন্ধমালা]

আলোচ্য কবিতাটি ব্রজবুলিতে রচিত, যে-কারণে বিদ্যাপতির সহিত ইহা সন্দিগ্ধভাবে মিশিয়া গিয়াছিল। ইহার ছন্দ ধ্বনি-প্রধান, সপ্তমাত্রিক [যেমন, 'পুরানো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে'], দীর্ঘস্বরকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুই মাত্রা করা হইয়াছে [গোবিন্দ-দাস কবিরাজের শ্রীগৌরচন্দ্র কবিতায় আলোচনা দ্রষ্টব্য]।

ভাষা ও ছন্দ

ভাবার্থ—মেঘাবৃত-ভাদ্র গগন হইতে অবিরাম ধারাপতন যখন কৃষ্ণহীন শূন্য ভবনের নিঃসঙ্গতাকে তীব্রতর মর্মভেদী করিয়া তুলিয়াছে, তখন অশ্রুপ্লাবিত কণ্ঠে রাধা সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,

পদবিশ্লেষণ

সখী আমার দুঃখের সীমা নাই, ভাদ্র মাস এবং ভরা বাদলের দিনেই আমার মন্দির প্রিয়হীন। দিগন্ত-ব্যাপ্ত মেঘের গর্জন, চতুর্দিক-ব্যাপ্ত বর্ষণ কিন্তু প্রিয়তম এখন বিদেশে; অথচ প্রেমের অধিদেবতা দারুণ শরে বিদ্ধ করিতেছে। অসংখ্য বজ্রপাত-ধ্বনিতে মত্ত ময়ুরী যখন আনন্দ-নৃত্য করিতেছে, হৃষ্ট দাদুরী ও ডাহুকীর ডাকে আমার তৃষ্ণার্ত বক্ষ বিদীর্ণ হইতেছে। অন্ধকারে রাত্রি তমসাচ্ছন্ন, চঞ্চল বিদ্যুৎপংক্তি গগন ভেদ করিতেছে, শেখর রাধার স্বরে কণ্ঠ রাখিয়া বলিতেছেন. এমন সঘন রাত্রি হরি-ব্যতীত কেমন করিয়াই বা অতিবাহিত হয়!

আলোচনা

বাহিরের বর্ষা মানুষের অন্তর্লোকে প্রবেশ করিয়া হৃদয়ের অনির্দেশ্য মিলনোৎকণ্ঠাকে জাগাইয়া দেয়—বুদ্ধিতে ইহার ব্যাখ্যা হয় না কিন্তু নিত্যকালের মানব-অভিজ্ঞতায় ইহা একান্ত সত্য। নিবিড় সুখ ও তৃপ্তির মধ্যে শ্রাবণ-মেঘের পথিক ছায়া এক অকারণ বিষাদের সুর ধ্বনিত করিয়া তোলে, জীবনের চারপাশে এক পরম প্রিয়ের জন্য ব্যাকুলতা জাগাইয়া দেয়। ইহা কেবল বৈষ্ণব ধর্মের কথা নয়, ইহা মানব-ধর্মেরই কথা, বৈষ্ণব কবি তাহাকেই রাধাকৃষ্ণের রূপকে প্রকাশ করিয়াছেন।

পদের আলোচনা

ব্যক্তির অন্তরের এই নৈর্ব্যক্তিক শূন্যতাবোধের এমন দিগন্ত-বিদারী আর্তশ্বাস পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতার লক্ষণ, এই লক্ষণ রায়শেখর নামাঙ্কিত বর্ষাবিরহ পদে আছে। এই কারণেই কোনো তথ্য-প্রমাণ-ব্যতিরেকেই এতকাল পর্যন্ত পদটি বিদ্যাপতির বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। প্রেমের এই গভীর অন্তরশায়ী একাকীত্ব, বর্ষার পটভূমিকায় হৃদয়ের এই নিবিড় বিরহ যে-কবি অন্তরঙ্গভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন তিনি যে প্রেমের শাখাজটিল গহন অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রেমের রহস্য ও দুষ্প্রবেশ্য গোপনতার এবং উহার আলোছায়াকম্পনের এইরূপ

পদটিতে শ্রেষ্ঠ কবিতার লক্ষণ

শেখরের কবিধর্ম

লীলায়িত চিত্র শেখরের অন্যান্য পদে বিশেষ নাই। মুখ্যত শৃঙ্গার নয়, বাৎসল্যই তাঁর কবিজীবনের ধ্রুবপদ, তাই এরূপ একটি বিবহের পদরচনার কৃতিত্ব বিদ্যাপতিকেই দান করিতে ইচ্ছা করে।

পদের আভ্যন্তর প্রমাণেও ইহা যে শেখরেব না হওয়া সম্ভব তাহা অনুমান করা যায়। মত্ত বর্ষণপ্লাবিত প্রকৃতির জৈব কোলাহলে চিত্তের বিদীর্ণতা বিদ্যাপতির অসংখ্য পদে দৃষ্ট হয়। এখানে রাধার বিলাপে কৃষ্ণের বিদেশ-অবস্থানের ইঙ্গিত আছে, মথুরা-যাত্রার ইঙ্গিত নাই। প্রবাসী স্বামীর বা প্রিয়জনেব আগমন-সম্ভাবনা ঘোষণা করে বলিযা মেঘ প্রোষিতভর্তৃকার নিকট প্রিয়, মেঘদূতে কালিদাস তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং সেই প্রত্যাশা-ভঙ্গের বেদনাই বর্ষাবিরহ হইলে ইহা প্রাক্‌চৈতন্য যুগের বিরহের স্বভাবই ব্যক্ত কবিতেছে। এখানে বাধার নির্জন জীবনের বেদনার কারণরূপে কামের উল্লেখ আছে, অর্থাৎ দৈহিক সান্নিধ্যের অভাবই যেন তাঁহাব ক্রন্দনের হেতু, এইরূপ ব্যাখ্যাও প্রাক্‌চৈতন্য যুগেব লক্ষণ বলিয়া মনে হয়। তবে এই বিষযে কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অসম্ভব।

রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ

সখি হামারি ··নাহি ওর—বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত পদটির প্রথম ছত্র ছিল—এ সখি হামারি ইত্যাদি, ইহাতে ছন্দ রক্ষা হয়। **হামারি**—আমার। **ওর**—সীমা। **এ ভর বাদর···মোর**—এমন নিবিড় বর্ষণ, যাহা হৃদয়ের চারপাশে মিলনের আকৃতি সৃষ্টি করে, এখন ভাদ্রমাস যাহা বর্ষার পরিপূর্ণ অবস্থা—অথচ এমন দিনেই আমার মন্দির (গৃহ) শূন্য। সখির উপস্থিতি সত্বেও এ শূন্যতা যে প্রিয়তমের জন্যই, তাহা বোঝা যাইতেছে। তুলনীয়,

বিরহিণী মর্মে-মরা মেঘমন্দ্র স্বরে—
নয়নে নিমেষ নাহি
গগনে রহিত চাহি
আঁকিত প্রাণের আশা জলদের স্তরে।
[সেকাল ও একাল—মানসী]

ঝম্পি—ঝাঁপিয়া, চতুর্দিক আবৃত করিয়া। **ঘন**—মেঘ। **গরজন্তি সন্ততি**—

সতত গর্জন করিতেছে। **ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া**—ভুবন ভরিয়া বৃষ্টিপাত হইতেছে। **কান্ত**—প্রিয়তম। **পাহুন**—প্রবাসী, বিদেশে অবস্থানকারী, পথিক, সংস্কৃতে প্রাঘুণ। **কাম**—কামদেব, প্রেমের দেবতা। **কাম·· হন্তিয়া**—নিষ্ঠুর মদন দারুণ শরে আমাকে বিদ্ধ করিতেছে। শকুন্তলা দুষ্মন্তকে পত্র লিখিয়াছিলেন—

'হে কঠিন, তোমার হৃদয় আমি জানি না, কিন্তু নিষ্ঠুর মদন তোমাতে অনুরক্ত আমার চিত্তকে দিবারাত্র বিদ্ধ করিতেছে।' **হন্তিয়া**—হনন করিতেছে এইরূপ অর্থ। **কুলিশ ··মাতিয়া**—কত শত কুলিশপাতের শব্দে মোদিত হইয়া ময়ূর উন্মত্ত নৃত্য করিতেছে। **কুলিশ**—বজ্র। **মোদিত**—আনন্দিত। **দাদুরি**—ভেক। **ডাহুকী**—বর্ষার এক প্রকার পাখী। **ফাটি যাওত ছাতিয়া**—এই সকল বর্ষার জীবের আনন্দিত ডাকে আমার চিত্ত বেদনায় বিদীর্ণ হইতেছে। **ন থির···পাঁতিয়া**—বিদ্যুতের পংক্তিসকল 'ন থির' অর্থাৎ চঞ্চল, দ্রুতসঞ্চারী বিদ্যুৎপংক্তি। **কৈছে নিরবহ**—কিরূপে নির্বাহ বা অতিবাহিত করিব। **ইহ রাতিয়া**—এইরূপ রাত্রি। **ভণয়ে শেখর·· রাতিয়া**—'কৈছে গোঙায়ব' স্থলে 'কৈছে নিরবহ' কোথা হইতে পাইয়াছেন, তাহা সংকলয়িতা জানান নাই, কারণ পুরাতন সংকলনে এই শব্দটি নাই।

ব্যাখ্যা

সখি হামারি ·মন্দির মোর—আলোচ্য পংক্তিনিচয় পদকর্তা রায়শেখরের বর্ষাবিরহ গীতিকবিতায় ভাদ্রের প্রাবৃট্ সমারোহে কৃষ্ণবিহীন শূন্য পৌরভবনে সখীর প্রতি বিরহিণী রাধিকার বিষণ্ন বিলাপোক্তি। বর্ষার নিশীথ রাত্রির বাদলধারা অবিরল ধারায় ঝরিতেছে, কিন্তু কান্তের আগমন-সম্ভাবনা না থাকায় ইহা মিলনোৎকণ্ঠাকেই বাড়াইয়া তুলিতেছে। এইরূপ পরিপূর্ণ বর্ষণমুখর রাত্রে প্রেমিকার হৃদয়ে স্বভাবতই এক গভীর আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়, 'এমন দিনে তারে বলা যায়'। সংসারের অন্যান্য দিন কর্মের জন্য, প্রয়োজনের জন্য। কিন্তু এই অবকাশগ্রস্ত ধারাপ্লাবিত ভাদ্রের নিঃসঙ্গ মুহূর্তে হৃদয়ে এক ব্যাকুলতা জাগে, নিবিড় একান্ত মৌনী হৃদয়ের অশ্রুতপূর্ব কথা দয়িতের নিকট বলিতে ইচ্ছা করে। রাধিকার পক্ষে ইহা সম্ভব নয়, কারণ তাঁহার গৃহ প্রিয়-অভাবে শূন্য। তাই তাঁহার সীমাহীন দুঃখের অনুভূতি সখীর নিকট

রাধিকা প্রকাশ করিতেছেন। সখীর উপস্থিতি সত্বেও রাধিকার গৃহের এই শূন্যতা যে আরও অন্তরঙ্গতম কোনো প্রিয়জনের জন্য এবং সে প্রিয়জন যে একমাত্র মাধব, ইহা ব্যঞ্জনায় বোঝা যাইতেছে। সংযত ভাষা, সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে যে কী গভীর করুণ বেদনা সঞ্চার করা যায় এই অংশটি তাহারই উদাহরণ।

তুলনীয়, ভাদ্রের পূর্ণ বর্ষণে হৃদয়ের শূন্যতা-বোধ ও উৎকণ্ঠার কথা এ-যুগের কবি কণ্ঠেও বাণীরূপ লাভ করিয়াছে। যথা—

অন্তরে আজ কী কলরোল
দ্বারে দ্বারে ভাঙল আগল
হৃদয় মাঝে জাগল পাগল
আজি বাদরে
আজ এমন করে কে মেতেছে
বাহিরে ঘরে॥ [রবীন্দ্রনাথ]

ঝম্পি ঘন···শর হানিয়া—বর্ষাবিরহে কবি রায়শেখর সখীর প্রতি রাধিকার করুণ আক্ষেপের মধ্য দিয়া বর্ষণঘন ভাদ্রের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও রাধার যন্ত্রণা-কাতর হৃদয়ের একটি নিপুণ শব্দভেদী চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। রাধার শূন্য মন্দিরের নিঃসঙ্গতার দুঃসহ বেদনাকে তীব্রতর করিয়া তুলিতেছে মুহুর্মুহু প্রচণ্ড দিগ্‌ব্যাপ্ত মেঘের গর্জন, চতুর্দিক আবৃত করিয়া প্রবল অবিশ্রাম বৃষ্টিপাত। কিন্তু যে সময় চতুর্দিকের এই ঘন জলধারার মধ্যে হৃদয়ের একান্ত গোপন কথা কর্মহীন প্রহরে প্রিয়জনের নিকট প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে ঠিক সেই সময়েই তাঁহার প্রিয়তম দূর প্রবাসে আছেন। বর্ষায় প্রবাসী প্রিয়জন অবকাশে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে কিন্তু রাধার ক্ষেত্রে তাহা হয় নাই বলিয়াই তাঁহার অভিমান ও বেদনা এত তীব্র। কিন্তু প্রেমের দেবতা মদনদেব তো তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিতেছেন না, তিনি তীক্ষ্ণ প্রেমের শর নিক্ষেপ করিয়া বিরহিণীর তাপ বৃদ্ধি করিতেছেন. এমনই নিষ্ঠুর তিনি।

টীকা—আলোচ্য অংশে প্রেমের অধিপতিরূপে কামের উল্লেখ হইতে অনুমিত হয় ইহা প্রাক্‌চৈতন্য যুগের বিদ্যাপতির রচিত। চৈতন্যোত্তর কবিতার আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধি ও দেহাতীত প্রেমের ব্যঞ্জনা এখানে নাই।

কুলিশ কত··· ·যাওত ছাতিয়া—বরিষণ-মুখরিত ভাদ্ররাত্রির নির্জন অবকাশে শূন্য প্রিয়হীন ভবনে রাধিকার বিদীর্ণ হৃদয়ের হাহাকার বর্ষার বহিঃপ্রকৃতির দ্বারা তীব্র হইয়া উঠিয়াছে, বর্ষাবিরহ পদে রায়শেখর তাহারই একটি নিপুণ আলেখ্য রচনা করিয়াছেন। যখন আকাশ তাহার নিরবচ্ছিন্ন ধারাপাতে পৃথিবীর প্রতি আনত হইয়া পড়িয়াছে তখন রাধিকার প্রিয়তম বিদেশে, নিষ্ঠুর মদনদেবের শরে তাঁহার হৃদয় তাই মুমূর্ষু। ইহার উপর বাহিরের প্রকৃতি উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছে। প্রচণ্ড মেঘগর্জন ও বজ্রধ্বনিতে মত্ত হইয়া ময়ূর-ময়ূরী পুলকে নৃত্য করিতেছে, ভেক ও ডাহুকীর তীব্র চিৎকারে চতুর্দিক মুখরিত। যে বৃষ্টির অশ্রান্ত বর্ষণে জীবজগতে পুলকহিল্লোল ও মত্ততার সঞ্চার তাহাই মানবীর হৃদয়ে দুঃসহ দুঃখের কারণ, তাই বৃষ্টির এত প্রাবল্যেও রাধার চিত্ত বিরহে তৃষিত, তাহা যেন দুঃখে বিদীর্ণ হইতেছে।

টীকা—বিদ্যাপতির পদসংগ্রহে এই ধরণের বিরহাত্মক বর্ষার বহু চিত্র আছে। যেমন,

সজনি আবে হমে মদন অধারে।
শূন মন্দির পাউস কে যামিনী
কামিনী কি পরকারে॥

—"সজনি, এখন আমি মদনের শরের লক্ষ্য, শূন্য মন্দির, বর্ষারাত্রি, কামিনী কী করিবে"? ডাহুকী-দাদুরী রবের কথাও পাওয়া যায়। যথা—

ভাদর মাস বরিষ ঘন ঘোর
সভ দিক কুহকএ দাদুল মোর।

—"ভাদ্রমাসে ঘোর বৃষ্টি, চতুর্দিকে দর্দুর ও ময়ূর রব করিতেছে।" আর একটি পদে—

ফিরি ফিরি উতরোল ডাক ডাহুকিনী
বিরহিণী কৈসে জীবই॥

—"ফিরিয়া ফিরিয়া ডাহুকী ডাকিতেছে, বিরহিণী কিরূপে জীবন ধারণ করিবে?" তুলনীয়, ভেকের ডাক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ—

"এই ব্যাঙের ডাক নববর্ষার মত্তভাবের সঙ্গে নহে, ঘনবর্ষার নিবিড় ভাবের সঙ্গে বড় চমৎকার খাপ খায়।" [কেকাধ্বনি, বিচিত্র প্রবন্ধ]

তিমির দিগ্‌ভরি···ইহ রাতিয়া—বিরহ-কাতর ভাদ্র শর্বরীতে কৃষ্ণশূন্য রাধিকার নিঃসঙ্গ হৃদয়ের মর্মবেদনা ব্যক্ত করিয়া বর্ষাবিরহ পদের অন্তিম চরণ-গুলিতে রায়শেখর এরূপ অন্ধকার চঞ্চল রাত্রেই কৃষ্ণের সহিত রাধার মিলনের অপরিহার্যতার ইঙ্গিত দিয়াছেন। সখীর নিকট আক্ষেপোক্তিতে রাধা বর্ষণমত্ত বহিঃপ্রকৃতির আনন্দ-পুলকের সহিত আপন তৃষ্ণার্ত হৃদয়ের দগ্ধ বেদনার তুলনা করিতেছেন। কান্তের প্রবাস-বাসের সুযোগে মদনদেবের নিষ্ঠুর শরসন্ধান, অরণ্যে দাদুরী ডাহুকীর কলরব ও ময়ূরের নৃত্য সবই যেন বিরহ তীব্রতর করিয়া তুলিতেছে। ইহার উপর অন্ধকার সূচীভেদ্য নৈশ গগনে বিদ্যুতের পংক্তিসকল দ্রুত আকাশটিকে শতখণ্ড করিয়া দিতেছে। এমন একটি রাত্রি সব দিক দিয়াই অন্তরঙ্গের সহিত গভীর কণ্ঠে আলাপের অবকাশ রচনা করে ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। রাধার সহিত আবেগে কণ্ঠযুক্ত করিয়া তাই কবিশেখরও পুনরুক্তি করিতেছেন, এমন রাত্রি হরি ব্যতীত কিরূপে কাটাইবে? প্রিয়জন না থাকিলে কোন মানব এমন মিলনোৎসুক অধীর রাত্রি অতিবাহিত করিবে? দুজনের পক্ষে যাহা মধুর ও দ্রুত-নিঃশেষিত, একজনের পক্ষে তাহা দুঃসহ ও দুরতিক্রম্য।

টীকা—এই অংশটির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে আলোচনায় উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য দ্রষ্টব্য। তুলনীয়—

> তুমি যদি না দেখা দাও কর আমায় হেলা
> কেমন করে কাটে আমার এমন বাদল বেলা। [রবীন্দ্রনাথ]

প্রশ্ন ১। বর্ষাবিরহ কবিতাটি এতকাল পর্যন্ত বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত ছিল। ইহা যে বিদ্যাপতির নয়, এরূপ প্রমাণের স্বপক্ষে কী যুক্তি আছে?—[ভূমিকা ও আলোচনা দ্রষ্টব্য।]

প্রশ্ন ২। 'বিরহের সহিত বর্ষার যোগ বৈষ্ণব পদাবলীতে গভীর, ইহা রায়শেখরের পদে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে'—বর্ষাবিরহ কবিতা অবলম্বনে আলোচনা কর।—[ভূমিকা ও আলোচনা দ্রষ্টব্য।]

খুল্লনার বারমাসী : দ্বিজ মাধবাচার্য

ভূমিকা

ষোড়শ শতাব্দীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অন্যতম কবি দ্বিজ মাধবাচার্য মুকুন্দরামের প্রায় সমকালেই পূর্ববঙ্গে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং সম্ভবত ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মঙ্গলচণ্ডীর গীত রচনা সমাপ্ত করেন। তবে এই বিষয়েও সন্দেহ আছে এবং সাম্প্রতিক গবেষণায় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে শেষ ভাগ পর্যন্ত কোন্ সময় মুকুন্দরাম তাঁহার কাব্য রচনা করেন তাহা প্রমাণিত হয় নাই। স্বভাবতই দ্বিজ মাধব সম্পর্কেও ধ্রুব বিশ্বাস দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। তবে মুকুন্দরাম ও দ্বিজ মাধবের কাব্যের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ ভেদরেখা আছে। অনেকে মনে করেন, দ্বিজ মাধবের কাব্য অপরিণত ও বিচ্ছিন্নতার লক্ষণযুক্ত, ইহা গীতপালাত্মক, সুতরাং কোনো প্রাক্তন ব্রতগীতেরই সংস্কৃত রূপ মাত্র। তাঁহার কাব্যের নাম সারদাচরিত, তবে ইহা মঙ্গলচণ্ডীর গীত নামেই পরিচিত হইয়াছে। চণ্ডীমঙ্গলের দুইটি কাহিনী, কালকেতু-ফুল্লরা-চণ্ডী কাহিনী এবং ধনপতি-শ্রীমন্ত কাহিনী। দ্বিজ মাধব দুইটি কাহিনীই সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন। কালকেতুর কাহিনীর মত চণ্ডী পরবর্তী কাহিনীতে পশু বা ব্যাধ-সমাজের নয়, বণিক-সমাজে প্রতিষ্ঠাতুরা। বণিকশ্রেষ্ঠ ধনপতি প্রথম স্ত্রী লহনার ভগ্নী খুল্লনার প্রণয়াসক্ত হইয়া তাহাকে বিবাহ করে এবং বিবাহের পর বিদেশ যাত্রা করে। তারপর দুই ভগিনী-সপত্নীর নিরুদ্বিগ্ন জীবনে কলহের বীজ বপন করিল দুর্বলা দাসী, তারপর খুল্লনার প্রতি লহনার নির্যাতন সীমা ছাড়াইতে লাগিল। এ হেন দুর্যোগে খুল্লনার জীবনে চণ্ডীর আশীর্বচন বর্ষিত হইল এবং বিবাদও প্রায় প্রশমিত হইল, ধনপতিও গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তখনই খুল্লনা স্বামীর প্রিয়সম্ভাষণের উত্তরে তাহার পূর্বতন জীবনের লাঞ্ছনার কথা নিবেদন করিয়াছে। সেই বিবৃতিই দ্বিজ মাধবের খুল্লনার বারমাসী।

কবিপরিচয়

কাহিনী ও উৎস

মঙ্গলকাব্যে বারমাস্যা অর্থাৎ নায়িকার মুখ দিয়া বার মাসের দুঃখের বিজ্ঞাপন প্রায় অপরিহার্য একটি কাব্যোপকরণ। মধ্যযুগের অন্যান্য কাব্যেও

এই বারমাসীর পদসঞ্চার ঘটিয়াছে, রামায়ণে চৈতন্য জীবনীতে পদাবলীতে এই ধরণের বারমাসীর অভাব নাই। প্রকৃতির সহিত মানুষের একদিকে যেমন পুলকের সম্পর্ক, অন্যদিকে আদিম মানবের সংগ্রাম চলিয়াছে প্রকৃতির ভীষণতার সঙ্গে। মানুষ সভ্য হইয়া প্রকৃতিকে দমন করিতে পারিলেও এখনও দারিদ্র্য বা বিরহের ছিদ্র দিয়া সেই আদিম প্রকৃতি আমাদের দুর্বল আর্তস্বভাবে এক অস্বস্তিকর দুঃখের সৃষ্টি করে, ইহাই বারমাসী সংগীতের বিষয়বস্তু। সম্ভবত লোকসাহিত্য বা লোক-সংগীত হইতেই বারমাসী মধ্যযুগের সাহিত্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছে। বহির্বঙ্গে আদিবাসীদের মধ্যে বিহার প্রদেশের কোনো কোনো অঞ্চলের লোকসংগীতে ইহার সন্ধান মেলে। পাটনা জেলার ভূমিহার ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও রাজপুত পরিবারের মহিলারা চৌমাসী বা ছয়মাসী গাহিয়া থাকে। বিষয় ভেদে বারমাসী পাঁচ প্রকার, (ক) আনুষ্ঠানিক (খ) কৃষিকর্ম-সংক্রান্ত, (গ) কাহিনীমূলক; (ঘ) বিচ্ছেদ-মূলক, (ঙ) পরীক্ষামূলক। আধুনিক কালের কবিরাও বুদ্ধিপ্রধান দৃষ্টিতে প্রাচীন বারমাসী-কাব্যের আঙ্গিক অনুসরণ করিয়াছেন। কবিশেখর কালিদাস রায়, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বিষ্ণু দে প্রভৃতির হাতে নূতন বারমাসী রচিত হইয়াছে।

বারমাসী

লোকসংগীতের প্রভাব

শ্রেণী বিভাগ

মুকুন্দরামের ফুল্লরার বারমাসীর সহিত দ্বিজ মাধবাচার্যের খুল্লনার বার-মাসীর তুলনা করা যাইতে পারে। উভয় কবিতাই নায়িকার কণ্ঠে তাঁহাদের দিনযাপনের দুর্বিষহ দুঃখ ও প্রাণধারণের কঠিন গ্লানির আক্ষেপ—কিন্তু উভয় রচনার উৎস ও উপলক্ষগত পার্থক্যটি মনে রাখিবার মত। দুঃখ দৈন্যে পীড়িত হইলেও নিরুদ্বিগ্ন দাম্পত্য জীবনে ফুল্লরাই ছিল সম্রাজ্ঞী, সেখানে তাহার স্বামীর প্রেমের আর একজন নবাগতা অংশভাগিনীর অবাঞ্ছিত অধিকার রোধ করাই তাহার বারমাসীর মূল প্রেরণা। নারীর কাছে দাম্পত্য জীবনে একনায়িকাতন্ত্রই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান, সুতরাং গভীর দুঃখের ভয় দেখাইয়া ভুবনমোহিনীকে নিরস্ত করিবার করুণ আকৃতিটুকু ফুল্লরার দুঃখ-বর্ণনার সহিত যুক্ত হইয়া ইহাকে বড়ই উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। তাহার সংসার-জীবনের গভীর

বারমাসী রচনায় মুকুন্দরাম ও দ্বিজ মাধব

মুকুন্দরামে কারুণ্যের সহিত কৌতুক

অনটন ও মুখব্যাদিত দারিদ্র্য অবিশ্বাস্ত হয় নাই, কিন্তু অচিরবিদায়ী এই দারিদ্র্যের কষ্টিপাথরে ফুল্লরার স্বামী প্রেমের কষিত হৈমরেখাটি উজ্জ্বলতর হইয়াছে। ফুল্লরার প্রতি মাসের জীবনসংগ্রাম যতই কঠিন ও দুর্বহ বোধ হোক না কেন, ইহার সহিত একটি অসহায়া নারীর সপত্নী-ভীতি অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়িত। অর্থাৎ পুনবাবৃত্ত দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের অন্তরালে একটি সপত্নী-আশঙ্কার সহিত সংগ্রামের প্রাণপণ প্রয়াস পাঠক চক্ষে আরও কৌতুকপ্রদ হইয়া উঠিয়াছে। ইহা যেন সমগ্র অংশটির অশ্রুজলের সরোবরে কবির কৌতুকের স্বর্ণকিরণসম্পাত।

খুল্লনার বারমাসী এই বৈচিত্র্য হইতে মুক্ত, ইহা নিতান্তই বারমাসী। স্বামীর অদর্শনে দাসীর ষড়যন্ত্রে সন্তবিবাহিতা রূপযৌবনসম্পন্না কিন্তু নিরীহা খুল্লনার উপর প্রথমা পত্নীর অত্যাচার নিতান্তই যন্ত্রণাদায়ক। দিনের পর দিন ছিন্নবাসে অন্নক্লেশে শারীরিক উৎপীড়নে খুল্লনা লবই উদ্‌যাপন করিয়াছে, রুদ্ধবাক্ হৃদয়ের সেই পুঞ্জীভূত স্তম্ভিত অভিমান স্বামীর প্রণয়সম্ভাষণে বিগলিত ধারায় ঝরিয়া পড়িয়াছে। ক্রন্দনে-বিলাপে তাই নির্দোষ হৃদয়ের এই দুঃখের অভিজ্ঞতা কেবল করুণ রসেরই সঞ্চার করে, ফুল্লরার বারমাস্যার মত কোনো সকৌতুক কৌতূহলের সৃষ্টি করে না। সপত্নী-সমস্যা দুই কবিতারই সূত্র, সপত্নীর অসম্ভব সম্ভাবনায় সতী নারীর জীবন কত অসহায় হইয়া পড়ে ইহাই প্রথম কবিতার পরিহাস আর দ্বিতীয় কবিতায় সপত্নীর বাস্তব সমস্যা রূপায়িত।

দ্বিজ মাধবে বাস্তবতা ও ঘনীভূত দুঃখ

একটি ব্যাপারে দ্বিজ মাধবের খুল্লনার বারমাস্যা ও ফুল্লরার বারমাস্যায় মূলত প্রভেদ আছে। ফুল্লরা দেবীর কাছে যে ক্লেশের বিবরণ দিয়াছিল তাহা প্রধানত দারিদ্র্যের, ক্ষুধার, প্রাণধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন-সামগ্রীর। সমাজ-ইতিহাসের জন্য ইহা মূল্যবান তথ্য। কিন্তু প্রকৃতির বিরুদ্ধে ফুল্লরার ক্রমাগত অভিযোগ এবং প্রকৃতিকে বারমাস আপনার শত্রু গণনা করার পশ্চাতে বারমাসীর একটি গতানুগতিকতা সহজেই অনুমেয়। পক্ষান্তরে খুল্লনার অভিযোগ একটি জীবন্ত মানুষের বিরুদ্ধে, সুতরাং প্রকৃতি অপেক্ষা মানব জীবনকেই এখানে প্রাধান্য দান করা হইয়াছে।

ভাবার্থ

স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগে প্রথমা পত্নী লহনার প্ররোচনায় ও ষড়যন্ত্রে অসহায়া খুল্লনা দীর্ঘকাল যে অসহ দুঃখভোগ করিয়াছে, প্রত্যাগত স্বামীর সাদর সম্ভাষণে ও কুশল সমাচারে তাহা সহসা এক নিঃশ্বাসে সে প্রকাশ করিতেছে। যে দুঃখের দীর্ঘায়িত অভিজ্ঞতা তাহার পঞ্জরে ক্ষত সৃষ্টি করিয়াছে তাহা সহৃদয়তার সহিত শ্রবণের জন্য স্বামীকে সে অনুরোধ করিতেছে। স্বামীর বিদেশ যাত্রা বৈশাখে, তখন হইতেই তাহার কষ্ট অঙ্কুরিত হইয়াছে সপত্নীর হাতে অপমানের দ্বারা। তারপর তাহার অঙ্গবাস কাড়িয়া ছিন্ন কন্থায় আপ্যায়ন, জ্যৈষ্ঠ মাসে (ছাগল চরাইতে বাধ্য করিয়া) অনভিজ্ঞার পক্ষে দুর্বিষহ তাপভোগ, আষাঢ়ে প্রচণ্ড ক্ষুধা ও আত্মধিক্কার, শ্রাবণের মেঘবৃষ্টির দিন অনিয়ন্ত্রিত মেঘসমূহ লইয়া তাহার বিপন্ন অবস্থা ও বন্ধুর পথে মূর্ছিত হইয়া পড়া, ভাদ্রে গহন বনে গমন ও একাকী জোঁকের কামড় সহ্য করা, সে একটানা বলিয়া গিয়াছে। তারপর আশ্বিনে আনন্দময়ীর শুভাগমনে যখন সকলের সুখোদয়-সম্ভাবনা, খুল্লনার যথাপূর্বং তথা পরম্ অবস্থা। কার্তিকে স্বজনহীন অবস্থায় ক্ষুৎপিপাসায় খুল্লনা ভূলুণ্ঠিত হইয়া থাকিত, অন্নাভাবে বনফল খাইত। অগ্রহায়ণে শীতবস্ত্র প্রার্থনা করিতে সপত্নী তাহাকে দৈহিক লাঞ্ছনা করিল, ফলে পৌষের কঠিন হিম তাহাকে কম্পিত ও জীর্ণ করিয়া ফেলিত। মাঘের তীব্রতম শীত যেন তাহাকে রোমে রোমে শোষণ করিত, এই সময় ধনপতির পত্নী ছিন্নবাসে ঢেঁকিশালায় শয়ন করিত ও প্রভাতের সূর্যতাপে আরাম পাইত। ঋতুপতি ফাল্গুনে আবার তাহার বিরহবেদনাও দেখা দিত। চৈত্র মাসে উপবনে নয়, তাহাকে ছাগল লইয়া গভীর আরণ্যে কাটাইতে হইয়াছে, এমনই বিড়ম্বনা। একমাত্র সহায় ছিলেন তাহার ভবানী। এখন ভবানীর কৃপায় সতিনী তাহাকে সমাদরে গৃহে ফিরাইয়াছে, কিন্তু স্বামীর আগমনেই তাহার সকল দুঃখাশঙ্কা বিদূরিত হইল। স্বামীর নিকট খুল্লনার এই আক্ষেপ ও অভিমান অন্তরাল হইতে লহনা শুনিতে পাইল।

পদবিশ্লেষণ

আলোচনা

কবিত্বের আলোচনা

দ্বিজ মাধবের কবিত্বখ্যাতি মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যের রাজাধিরাজ মুকুন্দরামের যশঃম্লান করিতে পারে নাই, কিন্তু সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে মুকুন্দরামের সহিত তিনি তুলনীয় হইবার যোগ্যতা

রাখেন। মুকুন্দরামের কল্পনাশক্তি, কাব্যগঠনে নৈপুণ্য, চরিত্র নির্মাণ-ক্ষমতা, ভাষার উপর অধিকার, সমাজ চৈতন্য, ব্রাহ্মণ্য আদর্শ, রুচিশীলতা ও পর্যবেক্ষণশক্তি মাধবের তুলনায় উৎকৃষ্ট ছিল। কিন্তু বস্তুবর্ণনায়, কাহিনীর সর্বত্র একটি দ্রুত বর্ণনাশক্তিতে, সংক্ষিপ্তরেখ চরিত্রচিত্রণে মাধবাচার্যও একেবারে অপাংক্তেয় ছিলেন না। পরন্তু মুকুন্দরাম অপেক্ষা তিনি বৈষ্ণব প্রভাবে অধিকতর আপন্ন ছিলেন এবং তাঁহার রচনায় গীতিপ্রবণতা মুকুন্দরামের আখ্যানধর্মিতার বিপরীত ছিল, গ্রন্থের বিভিন্ন অংশে ছোট ছোট বিষ্ণুপদ যোজনায় ইহা প্রমাণিত। দ্বিজ মাধবের বাস্তববোধ মুকুন্দরামের মত সংবদ্ধ ছিল না, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে [যেমন কালকেতুর বিবাহ] তিনি মুকুন্দরামের মত ব্রাহ্মণ্য আদর্শে ব্যাধ-সমাজের সংস্কারকে পরিশীলিত না করিয়া তাহার স্বাভাবিক অবিকৃত বস্তুরূপটিই চিত্রিত করিয়াছেন। যুদ্ধ বর্ণনায়ও দ্বিজ মাধবের বাস্তবতা বেশি। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, "দ্বিজ মাধবের ফুল্লরা মুকুন্দরামের ফুল্লরার মত লজ্জানতা সুন্দরী গৃহস্থ বধূ নয়, এই ফুল্লরার জিহ্বা অসংযত, সংযমশীলতা ও শরমের বিকাশ নাই। কিন্তু মাধবাচার্যের লহনা ও খুল্লনা ততদূর পরিষ্কার চরিত্র নয়, উহারা মুকুন্দের লহনা খুল্লনার রেখাপাত মাত্র" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)।

মুকুন্দরাম ও দ্বিজ মাধবাচার্য

বৈষ্ণব প্রভাব

নারী চরিত্র

দ্বিজ মাধবের খুল্লনা চরিত্র বৈশিষ্ট্যবর্জিত। লহনার হাতে তাহার নির্যাতন, ধনপতির নিকট অনুযোগ ও দুঃখবর্ণনায় চরিত্রটি গতানুগতিকতা অবলম্বন করিয়াছে, পক্ষান্তরে লহনা চরিত্রের সপত্নীকাতর ঈর্ষাপরায়ণতা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। খুল্লনা এখানে মঙ্গলকাব্যের দুঃখ-নির্যাতন-সহিষ্ণু typical নারী। বরং শ্রীমন্তের জন্মের পর খুল্লনার মাতৃমূর্তিতে যশোদাসুলভ বাৎসল্যের সঞ্চারে মৌলিকতা আছে। তবে খুল্লনার নির্যাতনে কবি বাস্তবনিষ্ঠা দেখাইয়াছেন। মুষ্টিপ্রমাণ খুদের ভাত, পোড়া কলার মূল, ঢেঁকিশালে বাড়িয়া দিয়া ভাঙা নারিকেলের মালায় লহনা তাহাকে জল দিতেছে, সেই সামান্য অন্ন আবার ধূমগন্ধকটু এবং পিপীলিকা-অধ্যুষিত, এই সকল দৃশ্য অনুকম্পা-উদ্দীপক সন্দেহ নাই। বনে ব্রাহ্মণীর নিকট খুল্লনা অবস্থানিবেদন করিয়াছে—

খুল্লনা চরিত্র

দুঃখবর্ণনার বাস্তবতা ও করুণরস

দিন অবসানে খুদের অন্ন খাই।
ঢেঁকিশালে খইঞা পাতি রজনী গোঁয়াই॥

ইহা ধনপতির নিকট বিবৃত বারমাস্যা অপেক্ষাও করুণ।

রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ

কহিতে সে…বিন্ধে ঘুণে—অর্থাৎ সে সকল দুঃখের স্মৃতি বর্ণনা করিতে গেলে কীটদষ্ট কাষ্ঠের মত বক্ষ বিদীর্ণ হয়। **মাধবীতে**—বৈশাখ মাসে; মাধব মানেই বৈশাখ মাস, তাহা হইতে স্ত্রীলিঙ্গ মাধবী। **মাধবীতে…কষ্টের অঙ্কুর**—ধনপতির প্রবাসযাত্রা হইতেই খুল্লনার নির্যাতনের সূত্রপাত, কিন্তু বারমাসীর নিয়মানুযায়ী বৈশাখ হইতেই তাহার দুঃখসহনের অঙ্কুর উপ্ত হইয়াছে। **লাঘব**—অপমান। **সতা**—সপত্নী; তুলনীয়, গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি—ভারতচন্দ্র। **আভরণ**—অলংকারাদি। **ভগন বসন**—ছিন্ন পরিধেয়, ব্যবহৃত বস্ত্রাদি। **প্রচন্ড…পড়ে**—সুখে লালিতা কন্যা খুল্লনাকে লহনা ছাগল চরাইবার ভার দিয়াছিল, তাই মাঠে গ্রীষ্মের খররৌদ্রে আগুন্ত সূর্যকিরণে অনভিজ্ঞ তরুণী কী নিদারুণ ক্লেশ অনুভব করিয়াছে, তাহারই বিবরণ দিতেছে। **আষাঢ়ে…মন্দগতি**—মেঘাবগুণ্ঠিত আষাঢ়ে সূর্যের কিরণ স্তিমিত, যেন তাহার প্রচণ্ড কিরণপ্রদায়ী রথের গতি মন্দীভূত হইয়াছে। **আষাঢ়ে…ক্ষিতি**—এখানে বক্তব্য জ্যৈষ্ঠের খর পীড়াদায়ক রৌদ্রতাপ আষাঢ়ে অন্তর্হিত হইলেও তখন ক্ষুধাজনিত উদরতাপ খুল্লনাকে ভূলুণ্ঠিত করিয়া দিত। **হেন সাধ…জাতি যাই**—সম্পন্ন গৃহের অন্তঃপুরচারিণীর এই দুর্গতির জন্য তাহার মনে হইত জাত্যন্তর গ্রহণ করিতে, অথবা কোনো নিম্নবৃত্তি অবলম্বন করিতে, তাহা হইলে এত মনঃকষ্ট থাকিত না। **ঝিমলী**—বৃষ্টিধারা অর্থে, উৎস অজ্ঞাত। দ্বিজ মাধবের ফুল্লরার বারমাসীতেও আছে, 'শ্রাবণে মাসেতে ঘন বরিখে ঝিমানি।' **সৌদামিনী মালী**—বিদ্যুতের মালা বা পংক্তি। **ছেলী**—ছাগল, মূল অর্থ ছাগলী, তুলনীয়,

আষাঢ়ে পূরিত মহী নবমেঘের জল।
ছেলী চরাইতে বামা নাহি পায় স্থল॥ [মুকুন্দরাম]

ছিন্নভিন্ন…চারিভিত—মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ-চমকে ভীত হইয়া ছাগলের পাল চতুর্দিকে বিভ্রান্ত ও ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ে। **চারিভিত**—চতুর্দিক, প্রাচীন

বাঙলায় ভিত্তি শব্দটি দিক অর্থে ভিত। **চলিতে · মুর্ছিত**—কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথে ছিন্নভিন্ন ছাগলগুলি পুনরায় ধরিয়া আনিতে গিয়া খুল্লনার পদস্খলন হয় ও সে মূর্ছিত হইয়া পড়ে। নারীর পক্ষে এই ধরণের অনভ্যাসজনিত কঠিন কাজের অসহনীয় বেদনা সহজেই করুণার সঞ্চার করে। **কানন·· একা**—গহন অরণ্যে ছাগল চরাইতে কেবল একাকিনী খুল্লনা অবস্থান করে; তুলনীয়—

রাধা সঙ্গে বাস আমারে নৈরাশ
আমি বঞ্চি একাকিনী। [চণ্ডীদাস]

অথবা, কৈছনে বঞ্চব ইহ দিনরজনী। [বিদ্যাপতি]

গহনে ··জলৌকা—বৃষ্টিসিক্ত গহন বনে খুল্লনার অঙ্গে জোঁকের অত্যাচার চলে, তুলনীয়, কত শত খায় জোঁক নাহি খায় ফণী [ফুল্লরার বারমাসীতে মুকুন্দরাম]। **আশ্বিন মাসেতে ··চিন্তা ভয়**—আশ্বিন মাস শারদোৎসবের কাল, বাঙলার শ্রেষ্ঠ আনন্দোৎসবে অন্তত একবার নিরানন্দ দেশ উৎসবে মাতে, দুর্গার আগমনের আনন্দে সকলের চিন্তা ভাবনা ভয় সাময়িকভাবে অপসারিত হয়। **গিরি-সুতা-সুত মাসে**—হিমালয়ের কন্যা পার্বতী, তাহার পুত্র কার্তিক, সুতরাং কার্তিক মাসে। **গিরিসুতা···সম্মুখ**—খুল্লনার কার্তিক মাসের দুঃখ অব্যক্তই থাকে, কারণ সংসারে শাশুড়ী ননদ নাই যে সকলের নিকট আপন মর্মবেদনা প্রকাশ করিয়া লঘু হইবে। দ্বিজ মাধবের ফুল্লরার বারমাসীতে অনুরূপ ভাষাই আছে—

গিরি-সুতা-সুত মাসে শুন মোর দুঃখ।
পাড়া পড়শী নাই বোলাইতে সম্মুখ॥

দাণ্ডাইতে—দাঁড়াইতে, তুলনীয়, 'ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার [চণ্ডীদাস]। **অগ্রহায়ণ···শেষ**—অগ্রহায়ণ মাসে শীতের প্রথম আগমনে আসন্ন শীত কি উপায়ে কাটিবে ইহা চিন্তা করিতে গিয়াই খুল্লনার দেহ শীর্ণ হইয়া উঠে। **দেহের···কারণ**—শীত নিবারণের জন্য দেহের আচ্ছাদন বা বস্ত্র প্রয়োজন; ইহাই সে সতিনীকে অনুরোধ করিয়াছিল, এখানে লক্ষণীয় যে, শীত নয়, সপত্নীপ্রদত্ত লাঞ্ছনাই খুল্লনার বারমাসীর মূল বৈশিষ্ট্য। **হেমন্ত**—হিম বা শীত।

ওষ্ঠ···হুতাশন—সর্বাঙ্গ শীতে যখন প্রকম্পিত হয় তখন অগ্নিতাপের ইচ্ছা জাগে ; তুলনীয়, মাধবাচার্যের ফুল্লরার উক্তি—

অধর যে অঙ্গ মোর কম্পিত সঘন।
অরণ্যের কাষ্ঠ আনি পোহাই হুতাশন ॥

মাঘ···শোণিত—মাঘ মাসের শীত অতি গুরুতর, মনে হয় তাহা যেন রোমকূপের মধ্যে বিদ্ধ হয় এবং হিমশীতল চুম্বনে শরীরের তপ্তরক্ত পান করিয়া লয় ; কবির ফুল্লরার বারমাসীতেও এই দুই ছত্র আছে। **ক্ষৌমবাস···রবির জালে**—লহনা খুল্লনাকে ঢেঁকিশালে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করিয়াছিল। সেখানে নিদারুণ শীতে সে কেবল ক্ষুদ্র অঙ্গবাস পাতিয়া শয়ন এবং প্রভাতে সূর্যকিরণে শীত নিবারণ করিত। **ক্ষৌম**—রেশমি বস্ত্র, এখানে ক্ষুদ্র, অথবা মোটা কাপড অর্থে। তুলনীয় ফুল্লরার উক্তি—

খুইঞা পাতিয়া থাকি বিভাবরী কালে।
রজনীর শীত মোর খণ্ডে রবির জালে ॥ [দ্বিজ মাধব]

ফাল্গুন···আপনা সংগতি—ফাল্গুন মাসে ঋতুরাজ বসন্তের পুষ্পিত সমাগম ঘটে, সকলেই আপন প্রিয়জনসহ মিলন উপভোগ করে (দ্বিতীয় চরণের অর্থ স্পষ্ট নয়)। **ভ্রমরের···নাদে**—ফাল্গুন মাসে কুসুমিত কাননে ভ্রমর সমাগম ঘটে এবং কোকিলের কুহুরব শোনা যায়, ইহারা বসন্তের সমাগম-ঘোষক এবং প্রেমের উদ্দীপক। **মনসিজ শরে···দগধে**—বসন্তাগমে পুষ্পকাননে ভ্রমরগুঞ্জনে ও কোকিলের ডাকে কামদেব বিরহীচিত্তে পুষ্পশর নিক্ষেপ করেন, তাহাতে প্রোষিতভর্তৃকা খুল্লনার হৃদয় দগ্ধ হয়। **মধুমাসেতে··· ভবানী**—খুল্লনার দুঃখ অবগত হইয়া এইবার চণ্ডী তাহাকে সাহায্য করিতে আসেন, তাই খুল্লনা সে কথা স্বীকার করিতেছে। দেবী খুল্লনার নিদ্রার সুযোগ লইয়া তাহার ছাগলগুলি হরণ করেন এবং পদ্মাকে দিয়া আপনার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন, ইহার পর লহনার স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। **সতিনী সদাগর**—ভবানীর বরাভয় পাইবার পর স্বপ্নে দেবীর আদেশ পাইয়া লহনা ও তাহাকে সমাদরে গৃহে তুলিয়াছে এবং ধনপতিও প্রত্যাবর্তন করিয়াছে, খুল্লনার দুঃখের অবসান ঘটিয়াছে বলা যায়।

ব্যাখ্যা

ক্ষণে ক্ষণে অন্য জাতি যাই—মঙ্গলচণ্ডীর গীত রচয়িতা দ্বিজ মাধবাচার্যের কাব্যে স্বামীর অনুপস্থিতিতে সপত্নী-নির্যাতিতা খুল্লনার সাংবাৎসরিক দুঃখবিবরণী খুল্লনার বারমাসী হইতে উদ্ধৃত চরণগুলিতে বিদেশ-প্রত্যাগত স্বামীর নিকট খুল্লনার আষাঢ় মাসের দুঃখের অভিজ্ঞতা বর্ণিত হইয়াছে। সপত্নীর নিষ্ঠুরতায় বর্ষণসিক্ত আষাঢ় মাসে অভাগিনী খুল্লনা ছাগল চরাইতে বনে প্রান্তরে যায়, কিন্তু ক্ষুৎপিপাসাকাতর অনভ্যস্তা নারীদেহ মাটিতে দুর্বল হইয়া লুটাইয়া পড়ে। এইরূপ বারবার মাটিতে পদস্খলিত হইয়া সে উঠিতে চেষ্টা করে। অদৃষ্টের এই করুণ পরিহাসে তাহার মনে হয় সে জাত্যন্তর গ্রহণ করিবে। গৃহস্থ ভদ্র নারীর পক্ষে এই হীনবৃত্তি গ্রহণ অপেক্ষা নিম্নতর সমাজে স্বেচ্ছাপূর্বক অন্তর্ভুক্ত হওয়া তাহার কাছে বরণীয় মনে হইতেছে।

ছিন্নভিন্ন হই যে মূর্ছিত—আলোচ্য অংশে সপত্নীর দ্বারা লাঞ্ছিতা খুল্লনা তাহার শ্রাবণ মাসের অভিজ্ঞতা বিদেশাগত স্বামীর কাছে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ব্যক্ত করিতেছে, খুল্লনার বারমাসী কবিতায় মঙ্গলচণ্ডীর গীতকার দ্বিজ মাধব ইহা নিপুণ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অন্তঃপুরচারিণী খুল্লনা লহনার আদেশে অরণ্যে ছাগল চরাইতে বাধ্য হইয়াছে ; ইহাতে তাহার দুঃখের সীমা নাই। শ্রাবণের অন্ধকার আকাশ বিদীর্ণ করিয়া সগর্জনে বিদ্যুতের ঝিলিক মুহুর্মুহু প্রকাশ পায়, তখন ভীত সন্ত্রস্ত ছাগলের দল চতুর্দিকে পলায়ন করে। তাহাদের ধরিতে গিয়া পিচ্ছিল পথে অসহায়া দুর্বলা রমণী আছাড় খাইয়া পড়ে এবং জ্ঞান হারাইয়া ফেলে, ইহাই তাহার বারমাসের দুঃখের ইতিহাসে শ্রাবণ মাসের পরিচ্ছেদ।

টীকা—ছেলী—রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য।

উছটি—উচ্চাটন হইতে, আছাড়, চরণাগ্রে আঘাত ও পদস্খলন , তুলনীয়, ঘর হৈতে বারি হৈতে লাগিল উচট [মুকুন্দরাম]।

প্রশ্ন ১। বারমাসী কবিতার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ পূর্বক খুল্লনার বারমাসী কবিতায় বর্ণিত খুল্লনার দুঃখের অভিজ্ঞতার একটি ভাষাচিত্র অঙ্কন কর। —[ভাবার্থ ও আলোচনা দ্রষ্টব্য।]

প্রশ্ন ২। মুকুন্দরামের সহিত দ্বিজ মাধবের কাব্যপ্রতিভার তুলনা কর এবং উভয় কবির বারমাসীর বিচার কর। [ভূমিকা ও আলোচনা দ্রষ্টব্য।]

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর কাব্যধারা :

পুরাতন শতকের ঐতিহ্য আত্মসাৎ করিয়া নূতন ঐতিহ্যের অঙ্কুরোদ্গম করিয়া সপ্তদশ শতক বাঙলা সাহিত্যে আবির্ভূত হইল। ষোড়শ শতকের ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি এই শতকে স্মৃতিমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে, সাহিত্যে বৈচিত্র্যের চিহ্ন নাই, উল্লেখযোগ্য প্রতিভা দৃষ্ট হয় না, গতানুগতিকতা ও পুনরাবৃত্তিই এই শতাব্দীর লক্ষণ। তবে পুরাতন যুগের অবসানে পুরাতন মূল্যবোধ ও বিশ্বাস, প্রাচীন সংস্কার ও আচার-অনুশাসনের ভিত্তি শিথিল হইযা আসিতেছিল, সাহিত্যে তাহার প্রভাব পড়িয়াছে। পূর্বতন শতকের সাহিত্যধারা এযুগে প্রায় সবই প্রবাহ রক্ষা করিয়াছে, নূতন কয়েকটি উপশাখারও সূচনা হইয়াছে। চৈতন্যদেবের জ্যোতিঃপুঞ্জ কালের দিগন্তে তখনও বিলীন হয় নাই চৈতন্য-সংস্কৃতির পুণ্য প্রভাবে বাঙালীর রুচি উৎকৃষ্ট সাহিত্যে পরিচ্ছন্ন চিন্তা পরিশীলিত হইয়াছে।

১৭ শতকেব লক্ষণ

পদাবলী চর্চা প্রায় লোকসংস্কৃতির অঙ্গীভূত হইয়াছে, কীর্তনের আপ্লুত কণ্ঠ সুরবৈচিত্র্যে কবিসম্প্রদায়ে বিষয়ের বৈচিত্র্যহীনতায় এই শতকের সাহিত্যসৃষ্টির প্রায় অর্ধাংশ জুড়িয়া। একদিকে লোকধর্মে ও বৈষ্ণবধর্মে মিশ্রণ ঘটিতেছিল, অন্যদিকে পুরাতন ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজেব বক্ষণশীলতাও বৃদ্ধি পাইতেছিল। দেশের চতুর্দিকে নানাপ্রকার সহজিয়া লোকধর্মশাখা বৃদ্ধি পাইতেছিল। মুসলমান সংস্কৃতির সহিত হিন্দু সংস্কৃতির মিশ্রণ এই যুগের একটি বীক্ষণীয় স্বভাব। মুসলিম কবিগণ বাঙলা সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করিতেছিলেন, ফলে কিছু কিছু ধর্মনিরপেক্ষ কাব্য রচিত হইতেছিল। বৈষ্ণব ধর্মাশ্রিত কাব্যের মধ্যে কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের জের তো ছিলই, চৈতন্য জীবনীর সহিত অন্যান্য ভক্তমহাত্মদের জীবনীও রচিত হইতে লাগিল। পূর্ববর্তী শতকে রচিত বৈষ্ণব নিবন্ধগুলি এইবার ব্যাপকভাবে অনূদিত হইতে লাগিল সাধারণ বৈষ্ণব সমাজে প্রচারের নিমিত্ত। রামায়ণ অনুবাদ উপযুক্ত

পদাবলী চর্চা

হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতিব মিলন

পূর্বতন ধাবা ও নূতন সৃষ্টি

প্রতিভাধর কবির হাতে বৈচিত্র্যলাভ করে নাই, কিন্তু তাহার বদলে মহাভারতের অনুবাদ ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, কাশীরাম দাসের মত কবির আবির্ভাব ঘটিল। মঙ্গলকাব্য শাখায় দুইটি পরিবর্তন ঘটিল, প্রথমত, ধর্মমঙ্গল নামক নূতন এক মঙ্গলকাব্যের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইল, দ্বিতীয়ত, অপ্রধান লৌকিক অসংখ্য দেবদেবীর নামে মঙ্গল-ব্রতগীতি-পাঁচালি রচিত হইতে লাগিল। নাথপন্থা-যোগপন্থার নামেও লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটি সুবিপুল গাথাজাতীয় সাহিত্যের পুষ্টি ঘটিয়াছে এই শতকে।

মহাভারত

ধর্মমঙ্গল

মোটের উপর সপ্তদশ শতাব্দী বৈশিষ্ট্যে অভিনব ও দৃষ্টি-বিভ্রম-সম্ভব নয়। এখনও পুরাতন সাহিত্যের ধর্মকেন্দ্রিকতা, দৈবমাহাত্ম্য বিশ্বাস ও অলৌকিকতা, মনুষ্যত্বের অসম্মান ও পুরুষত্বের অমর্যাদার কলঙ্ক অপনোদিত হয় নাই। সাহিত্যে পুচ্ছানুগ্রহিতা, গোষ্ঠীকেন্দ্রিকতা, ব্যক্তিনিরপেক্ষতা ও প্রথানুগামিতা বর্তমান আছে, পুরাণের অন্ধ স্তাবকতা ও সমাজশাসনের নিয়ন্ত্রণ হইতে যুগরুচি মুক্ত হয় নাই। ব্রজবুলির ব্যাপক চর্চা, ফারসী শব্দের প্রয়োগ-বাহুল্য, ক্বচিৎ অন্যান্য বিদেশী শব্দের প্রয়োগ ব্যতীত ভাষাসংস্কারে কোনো নূতনত্ব নাই। তবে সকল সাহিত্য শাখাতেই একটি গণতান্ত্রিক মনোভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে, মঙ্গলকাব্যে দেবতার ভীতিপ্রসারক শাসনদণ্ডের চৌম্বকশক্তি লঘু হইয়াছে, ভক্তির তীব্রতা অনেকটা শিথিল সংস্কারে পরিণত হইয়াছে। চৈতন্য জীবনীর মত অন্যান্য মহাপুরুষচরিত্রকে জীবনীকাব্যের অধিকারে আনয়ন, অপদেবতাস্থানীয় শক্তিগুলির উপর মঙ্গলকাব্য রচনা পূর্বতন যুগের বিশ্বাসের একনায়কত্বকে দুর্বল করিয়া দিয়াছে বলা যায়। দেশের সর্বত্র কেন্দ্রীয় শাসনের তীক্ষ্ণদৃষ্টি সজাগ ছিল না বলিয়া স্থানীয় শাসকদের প্রভুত্ব যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে তেমনি বিদেশী বণিকদের বাণিজ্যসূত্রে আনাগোনা ঘটিতেছে। মোটের উপর সপ্তদশ শতাব্দী অষ্টাদশ শতকীয় যুগসন্ধির ক্ষীণ প্রস্তুতির অস্পষ্ট সংকেত সূচনা করিয়াছে।

পুরাতন যুগের স্বভাবগুলি

ভাষাগত বৈশিষ্ট্য

গণতান্ত্রিকতা

অষ্টাদশ শতাব্দী ইতিহাসে সর্বাধিক চমকপ্রদ অধ্যায়। ইহা একদিকে যেমন ক্লান্ত পুরাতনের ধূসরিত পথচলার অবসান, অন্যদিকে তেমনি আসন্ন

নবযুগের ধীরশ্রাব্য পদধ্বনিতে প্রত্যাশিত। এইজন্য এই শতাব্দীর যুগপৎ লক্ষণ সংশয় ও বিশ্বাস, নৈরাশ্য ও ঐহিকতা, অবক্ষয় ও ভক্তি। এই শতক কেবল সপ্তদশ শতকের সমাধির উপর অন্ত্যেষ্টির ঘণ্টাধ্বনি করে নাই, ইহা সমগ্র পূর্বতন আট শতাব্দীর গতানুগতিক সাহিত্য সৃষ্টির বিষণ্ণ বিদায়ের তোপধ্বনি করিয়াছে। পূর্ব যুগের উৎপীড়ক দেব-অঙ্গে এই যুগের অবিশ্বাসী কবি যেন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছে, অন্তঃসারশূন্য ভক্তির বিপণিগাত্রে সংশয়বাদের বিজ্ঞাপন ঝুলাইয়া দিয়াছে। প্রাক্তন শতাব্দী-প্রচারিত দেবতার অলৌকিকতায়, কামনা পূর্তির অবিশ্বাস্য ক্ষমতায়, দারিদ্র্যের স্থানে রাজকীয় ঐশ্বর্যদানের ক্ষমতায়, সবপ্রকার বিপন্মুক্তির দৈব অঙ্গীকারে, পার্থিব জীবনে অপরিমেয় সুখ ও শান্তিদানের প্রস্তাবে, শত্রু পক্ষের সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্নীকরণের প্রতিশ্রুতিতে, মানুষের ব্যাপক সংশয় জাগিয়াছে বলিয়াই এই যুগকে সংশয়বাদের যুগ বলা যায়। ইহাই সাহিত্যে আধুনিকতার প্রত্যুদ্গমন।

আঠারো শতকের সংশয়বাদ

এই যুগন্ধর আধুনিকতার নির্বন্ধ ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে, রামানন্দ যতির চণ্ডীমঙ্গলে, রামানন্দ ঘোষের রামায়ণ অনুবাদে, রামকান্ত রায়ের ধর্মমঙ্গলে, রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়নে নিহিত আছে। একদা উৎসব-পার্বণমুখরিত, নিয়মনিষ্ঠ, কিন্তু অধুনা-পরিত্যক্ত, আগাছাসমাকীর্ণ প্রাসাদে এক দিবসের জন্য কোলাহল-মুখর বালকদের বনভোজনের মতই ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যের জীর্ণ আঙ্গিকে ক্ষণস্থায়ী চাপল্যের সকৌতুক বনভোজন করিয়াছেন। রসিকতা বিদ্রূপ শৃঙ্গার-বিলাস ও বৈদগ্ধ্যে তাঁহার কাব্যে অলৌকিকতা ও অন্ধ বিশ্বাস দিবালোকে ভৌতিক চেতনার মত অন্তর্হিত হইয়াছে। দেবতা এখানে কখনও বার্ধক্যের অক্ষমতায় উপহাসের, কখনও স্নিগ্ধ মাতৃত্বে দর্শনের পাত্র হইয়াছেন, অবিশ্বাস্য প্রার্থনার নয়। দেশের সর্বত্র বৈদেশিক আগন্তুকদের সন্দিগ্ধ পদক্ষেপ, কেন্দ্রীয় শাসনের ক্রমবৃদ্ধ ঔদাসীন্য, আভ্যন্তরীণ দুর্যোগ, মন্বন্তর, বর্গীর অত্যাচার, বিত্তবানদের সম্পদের অনিশ্চয়তা এক আসন্ন সর্বনাশ রজনীর মহাকাব্যের সূচীপত্র রচনা করিতেছিল। তাহারই উপান্তে বসিয়া, এই যুগে ব্যক্তিতান্ত্রিকের বিপন্ন

বিভিন্ন সাহিত্যে সংশয়বাদের দৃষ্টান্ত

ভারতচন্দ্রের আধুনিকতা

জাগরণ অবলম্বন করিয়া আর এক প্রকার ভক্তিবাদ, মাতৃচরণে স্থির প্রত্যয়, বিশ্বজননীর অকৈতব স্নেহপ্রাপ্তির আকৃতি জাগিতেছিল। পূর্বতন মঙ্গলকাব্যের স্বার্থবুদ্ধিতাড়িতা দেবীর বদলে বিশ্বসৃষ্টির মূলীভূত আদ্যাশক্তির প্রতি এযুগের বিশ্ববিদ্ধ কবিচিত্ত ব্যাকুল বিস্ময় ও বিনিদ্রভক্তি লইয়া দৃষ্টি দিয়াছেন। আখ্যানের ক্লান্ত পুনরুক্তি নয়, ভীতিপ্রদ জিগীষার শিহরণ সঞ্চার নয়, কেবল মাতৃনামোচ্চারণের পুলকে গলদশ্রু হওয়া, কেবল সংগীতের প্রবাহে ভাসিয়া যাওয়ার মধুর আনন্দে এ যুগে যে নূতন মানব-মুখী বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে তাহারই উপর উত্তরকালের আধুনিকতার ভবন নির্মাণ হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

আধুনিকতার আর এক লক্ষণ ব্যক্তি-তান্ত্রিক ভক্তি ও বিশ্বাস

মাধুকরী সংকলনে ১৭শ শতকের কবি কাশীরাম দাসের মহাভারত পাঁচালি অনুবাদ, শ্যামদাসের গোবিন্দমঙ্গল, কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল ও বৈষ্ণব কাব্যের কবি (মূলত অনুবাদক) যদুনন্দন দাসের পদাবলী হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতকের পদকর্তাদের মধ্যে আছেন জগদানন্দ, শশিশেখর, ও রাধামোহন ঠাকুর, ধর্মমঙ্গলের কবি ঘনরাম চক্রবর্তী, শিবায়ন-রচয়িতা রামেশ্বর ভট্টাচার্য, অন্নদামঙ্গলের কবি ভারতচন্দ্র এবং শাক্ত পদকর্তা রামপ্রসাদ সেন। অনেকের মতে মৈমনসিংহ গীতিকাগুলি সম্ভবত সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকেই রচিত হইয়াছিল।

দেবসভায় বেহুলা : ক্ষেমানন্দ কেতকাদাস

প্রাক্‌চৈতন্য যুগে মনসামঙ্গল কাব্য প্রাদুর্ভূত হইলেও অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সমগ্র বাঙলা দেশে ইহা জনপ্রিয় ছিল এবং কাহিনীর আভ্যন্তর কারুণ্যে, দৈব ও মানবাত্মার নিষ্ঠুর সংগ্রামের রহস্যে, নারীজীবনের সবেদন আবেদনে মনসামঙ্গল আসমুদ্র হিমাচল প্রায় জাতীয়-কাব্যের মর্যাদালাভ করিয়াছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে পশ্চিমবঙ্গের কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ 'রচনা গৌরবে ও প্রচার বাহুল্যে' মনসামঙ্গলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। কেতকাদাস উপাধি, [মনসার নাম কেতকা, কবি তাঁহার অনুগত, এই অর্থে] ক্ষেমানন্দই আসল নাম, এইরূপ ধারণাবশত সংকলয়িতা লিখিয়াছেন ক্ষেমানন্দ কেতকাদাস। কিন্তু ক্ষেমানন্দ উপাধিরূপে বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে, অতএব কেতকাদাসই কবির মূল নাম বলিয়া মনে হয়। কেতকাদাসের কাব্যে একদিকে যেমন চৈতন্য-সংস্কৃতির প্রভাবে বিশুদ্ধ রুচি ও পরিচ্ছন্ন সাহিত্যিক আদর্শ রক্ষা পাইয়াছে, সেইরূপ কৃত্তিবাস ও মুকুন্দরামের রামায়ণ ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াও কেতকাদাস ভাষা ও সাহিত্যের দিক দিয়া তাঁহাদের যোগ্য উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। তাঁহার বেহুলার পাতিব্রত্য সীতার আদর্শেই পরিকল্পিত।

কবি-পরিচয়

কেতকাদাস বর্ধমান নিবাসী ছিলেন এবং সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে শেষভাগের মধ্যে তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। সরলতা, সহৃদয়তা, কারুণ্য, নারীচরিত্রের মাধুর্য সৃষ্টি, কাহিনীর আদ্যন্ত দৃঢ় সংবদ্ধতা ও কৌতূহল রক্ষা তাঁহার কাব্যের প্রধান গুণ।

লৌহবাসরে লখীন্দরের সর্পাঘাত-মৃত্যুর সহিত চাঁদ সদাগর মনসার বিরুদ্ধে তাহার উদ্ধত অনমনীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার শেষ অবলম্বন হারাইয়াছে, আত্মিক দিক হইতে তাহার পরাজয়ই ঘটিয়াছে। দৈব ও পুরুষকারের দ্বন্দ্ব আপাতত অবসিত হইয়া এইবার কাহিনীতে বেহুলার প্রাধান্য ঘটিয়াছে। ইহা সমগ্র কাহিনীর সংগ্রাম-ক্রোধ-প্রতিহিংসার রৌদ্রতাপের মধ্যে কারুণ্যের ছায়া-বীথি। বেহুলার দীর্ঘ ভাসান যাত্রা ও দেবসভায় উপস্থিত হইয়া লখীন্দরের প্রাণসংগ্রহ ব্যাপারে অপ্রাকৃত ঘটনা আছে, কিন্তু সতীত্বের প্রতিজ্ঞার স্পর্শে ইহা বিশ্বাসযোগ্য। ভাসান যাত্রার দীর্ঘপথে বেহুলার ধৈর্য-পরীক্ষা, নদীর ঘাটে ঘাটে নানা প্রলোভন, পচনশীল মৃতদেহের পাশে পাতিব্রত্যের অকম্পিত মহিমা কবিদের বর্ণনায় জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পর স্বর্গসভায় কাপড় পরিষ্কার করিয়া প্রবেশাধিকার, দেবসভায় নৃত্যগীতের দ্বারা দেবতাদের মনোরঞ্জন, পার্বতী কর্তৃক বেহুলার পিতৃকথা বলায় শিবের চৈতন্য, মনসা-

কবিতার উৎস ও পূর্বসূত্র

কর্তৃক লখীন্দর হত্যার অভিযোগ-অস্বীকার, লখীন্দরের প্রাণসংগ্রহ ও দম্পতির মর্ত্যে প্রত্যাবর্তন—বিষয়ের দিক দিয়া অনেকখানি অবাস্তব মনে হইলেও বেহুলা চরিত্রকে পরীক্ষা-সাধনা ও কঠিন তপস্যার মধ্য দিয়া উজ্জ্বল করিবার জন্যই এইগুলি পরিকল্পিত হইয়াছে। আলোচ্য 'দেবসভায় বেহুলা' লখীন্দরের মৃতদেহ লইয়া গাঙুড়ের জলে ভেলা ভাসাইয়া বেহুলার স্বর্গে প্রবেশ এবং দেবতাদের সভায় উপস্থিত হইবার অংশ।

মনসামঙ্গল চরিত্রপ্রধান কাব্য, ইহার একদিকে দেবতা-মানবের কঠোর আত্মমর্যাদার অনমনীয় বৈরিতা, অন্যদিকে মাধুর্যে-সাধ্বীত্বে-কোমলতায় ভূষিত এক অপূর্ব নারী চরিত্র। মানব সংসারের স্নেহ প্রেম সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপর দৈবরোষের কালো ছায়া অপ্রতিরোধ্য নিয়তির মত যত ঘনাইয়া আসিয়াছে ততই নশ্বর মানুষের জীবন-তৃষ্ণা সুখ দুঃখ উজ্জ্বলতর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। ক্রূর দেবতার ঈর্ষা প্রতিহিংসা বীভৎস ষড়যন্ত্রের পটভূমিকায় মৃত্তিকার লীলানাট্যটি মধুর হইয়া উঠিয়াছে। এখানে কুটিল ঈশ্বরের বিষক্রিয়ায় অসহায় শিশুপুত্র মৃত্যুর কোলে নীল হইয়া ঢলিয়া পড়ে, বিবাহের পুষ্পসজ্জাময় বাসর গৃহে আততায়ী শমনের গোপন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এক মুহূর্তে উৎসবের দীপ নিভিয়া যায়, শ্রমসঞ্চিত কষ্টার্জিত ঐশ্বর্যের সপ্তডিঙা দুরদৃষ্টের ফুৎকারে ডুবিয়া যায়, রাজপুত্র ছিন্নকন্থা পরিয়া শ্মশানের অঙ্গার-আসনে মূর্ছিত হইয়া পড়েন। ইহাতে দেবতার কল্যাণী মূর্তির বদলে মুমূর্ষু মানব-জীবনের ক্ষণস্থায়ী মমতাই স্থায়িভাবে শ্রোতার চিত্তে বেদনার অশ্রুজল ঘনাইয়া তোলে। তারপর নারীর প্রেম ও মাধুর্যই শেষ পর্যন্ত দৈবী ক্রোধের কঠিন তুষার বিগলিত করিয়াছে, সুবদনীর একনিষ্ঠা ও সাধনার তাপে অদৃষ্টের বন্ধুর ভূমিতে কল্যাণ ও মঙ্গলের ফুল ফুটিয়াছে, ইহাই মনসামঙ্গলের মানবিকতা।

মনসামঙ্গল চরিত্র-প্রধান কাব্য

দৈবরোষে জীবনের আকস্মিক পরিসমাপ্তি

বেহুলার ভূমিকা

অন্যান্য মনসামঙ্গলের কবিদের হাতে মনসার প্রতিহিংসা-পরায়ণতা ও দুর্ধর্ষ চাঁদ সদাগরের দৃঢ় পৌরুষের সংঘর্ষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, কিন্তু কেতকা-দাসের কাব্যে বেহুলারই প্রাধান্য। প্রাণোচ্ছলতায় নৃত্যে-সংগীতে এই চঞ্চলা

নববধূ এক মুহূর্তেই আমাদের মন হরণ করে। মৃত স্বামীর পুনর্জীবন লাভের জন্য তাহার সুদীর্ঘ ক্লেশাক্ত নিঃসঙ্গ অভিযান, মৃত্যুর বিরুদ্ধে প্রেমেরই এক অসাধারণ বিজয় কাহিনী। এইদিক দিয়া দেবসভায় নৃত্যগীত আপাতদৃষ্টিতে বিসদৃশ মনে হইলেও ইহা সতী বেহুলার জীবনের এক কঠিনতম পরীক্ষাও বটে। চিত্তের নিভৃত অন্তঃপুরে পুণ্য সতীত্বের অনির্বাণ দীপশিখা জ্বালাইয়া, সর্বপ্রকার লজ্জা, ভূমূর্ছিত শোক ও সুদীর্ঘ অনাহারের ক্লেশ উপেক্ষা করিযাও বেহুলা নৃত্যগীতের দ্বারা দেবতার মনোরঞ্জন কবিতে ইতস্তত করে নাই। সতীসাবিত্রী ও সীতাই তাঁহার জীবনেব আদর্শ হইলেও সহিষ্ণুতায় ও অবিশ্বাস্য দুঃখে পরীক্ষিত এই মহনীয় চবিত্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দশটি নাবী চবিত্রেব অন্যতমা হইবাব যোগ্যা। কেতকাদাসের কাব্যের বৈশিষ্ট্য এইরূপ একটি অসাধাবণ চবিত্র সৃষ্টিতে।

দেবসভায় বেহুলার রূপক-তাৎপর্য

ভাবার্থ

অশেষ কৃচ্ছ্রসাধন ও বিনিদ্র প্রতীক্ষায় স্বামীর গলিত মৃতদেহ ভেলায় ভাসাইয়া পতিব্রতা বেহুলা বহুক্লেশে দেবসভায় প্রবেশ কবিয়াছে, স্বামীব পুনর্জীবন লাভের অটল প্রতিজ্ঞায়। বরপ্রার্থনাব জন্য দেবতার মনোরঞ্জন করিতে বেহুলা নৃত্যগীত সূচনা করিল, মৃদঙ্গ মন্দিরা সহযোগে অবগুণ্ঠিতা হাস্যমুখীব সেই তাললয়সমন্বিত নৃত্য ময়ূরীর এবং সংগীত কোকিলেব সঙ্গে তুলনীয়। তাহার মঞ্জীর-ধ্বনিত কিঙ্কিণী-শিঞ্জিত কবতাল-যুক্ত ঘূর্ণায়মান নৃত্যভঙ্গিমা দেববাজেব নিকট হইতে প্রাণপতিব জীবনলাভের জন্যই। কখনও মবালের মত মন্দগমনা, ছন্দে চরণ পড়িতেছে, মুখে পূর্ণিমাব স্নিগ্ধাভা ; খোলধ্বনিব সহিত বেহুলার নৃত্যের মধুর বোলে স্বর্গবাসী মোহাচ্ছন্ন হইলেন, তাঁহারা একদৃষ্টিতে তালভঙ্গহীন ত্রিভঙ্গ-রঙ্গিণী এই প্রমত্ত ময়ূরীকে নিরীক্ষণ করিয়া উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিলেন। শিব দিব্য দিয়া অভয়দানপূর্বক তাহার পূর্বপবিচয় ও নৃত্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন নৃত্যক্লান্ত বেহুলা সভাস্থ সকলের নিকট পূর্ববৃত্তান্ত বর্ণনা করিল। মনসামঙ্গল গান করিয়া ক্ষেমানন্দ-কবি তাহার কাব্যের নায়কের প্রতি মনসার কৃপা প্রার্থনা করিতেছেন।

ভাবার্থ ও পদবিশ্লেষণ

আলোচনা

দৈবাহত অদৃষ্ট-নিপীড়িত মানবজীবনের বিষণ্ণ বিলাপ ও মর্ত মানুষের স্নেহপ্রেমলীলার কাব্য মনসামঙ্গল। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ মনসামঙ্গলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। কিন্তু দেবসভায় বেহুলার নৃত্যগীত অংশটি মনসামঙ্গল কাব্যের অথবা কেতকাদাসের রচনার প্রতিনিধিমূলক অংশ নয়। তথাপি এই অংশের একটি গুরুত্ব আছে। নারীর কল্যাণী ইচ্ছা ও লাবণ্যের কাছে, তাহার চিরঞ্জীবী প্রেম ও পাতিব্রত্যের কাছে, দেবতার অবারণ ক্রোধ এবং অহেতুক প্রতিহিংসাও অবনত হয়, ইহাই আলোচ্য অংশের মর্মবাণী। আপাতদৃষ্টিতে, একটি নারী বাসরশয্যায় তাহার জীবনের সকল সৌভাগ্যের অবসান ঘটাইয়া স্বামীর মৃতদেহ কলার মান্দাসে ভাসাইয়া, দীর্ঘদিন অনাহারে অনিদ্রায় শোকে দুঃখে প্রলোভনে কাটাইয়া দেবতার দ্বারপ্রান্তে আসিয়াছে স্বামীর প্রাণভিক্ষার জন্য।

দেবসভায় বেহুলা অংশের মর্মবাণী

সেই করুণ শোকাচ্ছন্ন অবস্থায় একটি নারীর পক্ষে নৃত্য-গীতের আয়োজন নিষ্ঠুর অমানবিক অত্যাচার তাহাতে সন্দেহ নাই। এই বিসদৃশ ব্যবস্থার জন্য মনসামঙ্গলের কবিদের উপর বুদ্ধিগ্রাহী পাঠক চিত্ত বিরূপ হইতে পারে। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে ইহার একটি গভীর তাৎপর্য আছে। সাধ্বী নারীর কঠিনতম পরীক্ষার রূপক হিসাবেই এই নৃত্যগীতের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। অন্তরে শোকের স্তম্ভিত সমুদ্র, বাহিরে বিলাস-বিভ্রমের কটাক্ষ—এই বৈপরীত্যের মধ্য দিয়া তাহার প্রদীপ্ত আত্মবিশ্বাস, অবিস্মরণীয় সতীত্ব ও দুর্দমনীয় প্রতিজ্ঞাই বড় হইয়া উঠিয়াছে। মঙ্গলকাব্যের কবিরা লোকসমাজে নারীর চরিত্র-মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাহাদের অকল্পনীয় দুশ্চর পরীক্ষায় উত্তীর্ণা করিয়াছেন, খুল্লনার সতীত্ব পরীক্ষা, বেহুলার ধৈর্যের পরীক্ষা সীতার অগ্নিপরীক্ষা অপেক্ষাও জ্যোতির্ময়। ইহাতে একপক্ষে যেমন নারীর মহনীয় চরিত্রগৌরব দেদীপ্যমান হইয়া উঠে, অন্যপক্ষে সকল বাসনা-কামনার উর্ধ্বে স্বর্গীয় দেবতাদের চরিত্র সম্বন্ধেও সন্দেহ জাগে। যে দেবতাগণ মুমূর্ষু বেহুলার লাস্যবেশ ও মনোমোহন নৃত্যছন্দে মোহিত হইয়াছেন তাঁহারা

নৃত্যগীতের বাহ্যিক অসংগতি

গভীর তাৎপর্য

নারীচরিত্রের অসাধারণ গৌরব

নামেই দেবতা, আসলে তাঁহারা রূপমুগ্ধ পুরুষ-সমাজ, তাহাদের কাছে নীতি, আদর্শ বা মনুষ্যত্বের মূল্য নাই। সুতরাং দেবসভায় নৃত্যগীত অংশে কেতকাদাস দেবতার তুলনায় মর্ত-নারীকেই অপ্রাকৃত গৌরবে ভূষিত করিয়াছেন।

দেবতা ও মানব

আরও একদিক হইতে দেবসভায় বেহুলা অংশের তাৎপর্য আবিষ্কার করা যায়। বেহুলা অশেষবিধ তপশ্চারণ ও গভীর সহিষ্ণুতার পর দেবসভায় উপনীত হইয়াছে, কেবল স্বামীর প্রাণ-সংগ্রহের জন্যই নয়। বৃহত্তর দেবসমাজেও বিচার আছে এবং সেখানে দেবতার ইতর প্রতিশোধ ও ক্রোধ চরিতার্থ করার উগ্রতা বৃহত্তর দেবত্বের মানদণ্ডে অপরাধযোগ্য বলিয়া তাঁহার বিচার হয়। বেহুলাকে সেই বিচারসভায় উপনীত করার পশ্চাতে পৃথিবীর অত্যাচারক্লিষ্ট বিচারবঞ্চিত মানুষের ন্যায়পরায়ণতার জন্য অবচেতন কামনাই যেন প্রতিফলিত হইয়াছে। শিব এই দেবসভার সর্বোত্তম বিচারক, তাঁহার আদেশে বেহুলা নৃত্য থামাইয়াছে এবং শিব তাহাকে অভয় দিয়া তাহার আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ইহা পার্থিব শাসনব্যবস্থারই বিকল্প মাত্র তাহাতে সন্দেহ নাই।

পার্থিব বিচারসভার রূপক

মঙ্গলকাব্যে বেহুলা, অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের নারীর তুলনায় ঈষৎ স্বতন্ত্র প্রকৃতির, কাহিনীর সূচনায় তাহার জন্মের পূর্বসূত্রে দেখা যায় সে শাপভ্রষ্টা দেবনারী, স্বর্গের উষা। অন্যদিকে অল্প বয়স হইতেই তাহাকে নর্তকী বলা হইয়াছে। সুতরাং দেবসভায় নৃত্যগীতের ব্যাপারে তাহার পূর্বজীবনের শিক্ষাই বিকাশলাভ করিয়াছে বলিয়া সমগ্র কাহিনীর ভূমিকায় ইহা অসংগত লাগে না।

নর্তকী বেহুলা

রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ

দেবতা…নাচনী—কাহিনীর পূর্বসূত্র অনুযায়ী স্বর্গের দেবসভায় উপনীত হইলে বেহুলাকে দেবতাদের সম্মুখে নৃত্যের আদেশ করা হয়। তখন বেহুলা সবাদ্য নৃত্য আরম্ভ করে। মৃদঙ্গ মন্দিরা নৃত্যের সহায়ক বাদ্যযন্ত্র। সংগীত শাস্ত্রে নারীর নৃত্যের নাম লাস্য। কেতকাদাস কেবল বেহুলাকে নাচনী অর্থাৎ নর্তকীই বলেন নাই, বেহুলার নৃত্যের ভাবভঙ্গিমার যে বর্ণনা দিয়াছেন

তাহাতে প্রমাণিত হয় বেহুলা এই বিদ্যায় পূর্বপটীয়সী ছিল। কেতকাদাসের কাব্যে অন্যত্র আছে—

গজেন্দ্রগামিনী বামা রূপে যেন তিলোত্তমা
বেহুলা নাচনী তার নাম।

নাচনী—হিন্দী নাচনীয়া হইতে। **যতেক ধ্বনি**—অন্তরে স্বামীশোকে ও পথশ্রমে মুমূর্ষু হইলেও বেহুলা অনায়াস ভঙ্গিমায় নৃত্য করিতেছে। যে দেবসভা অপ্সরাদের নৃত্যের আসর, যেখানে উর্বশীর সামান্যতম তালভঙ্গ দেবতাগণ মার্জনা করেন না এবং ইহার ফলে মর্তে অভিশপ্ত হইয়া তাহার নরজন্ম ভোগ করিতে হয়, সেই দেবসভায় নৃত্য-পারংগমা বেহুলার মৃদঙ্গমন্দিরা-সহযোগে নৃত্য দেখিয়া ও গীত শুনিয়া দেবগণ মুগ্ধ-বিস্মিত, তাঁহাদের মনে হইতেছে, ইহা যেন মনুষ্যনৃত্য নয়, মেঘদর্শনে ময়ূরের স্বাভাবিক নৃত্যের মত, বসন্তের কোকিলের স্বতঃস্ফূর্ত কুহুধ্বনির মত। **ঘন ঘন বদন দেখায়**—বেহুলার নৃত্য ভঙ্গিমার পটুত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে এই ছত্রে। তালের ছন্দে চরণবিক্ষেপ নৃত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং কটাক্ষ, বিভ্রম; অঞ্চলে বদন আবৃত করা এইগুলি লাস্যনৃত্যেরই লক্ষণ। **মুখে গায় বায়**—একদিকে বাদ্যকরের হস্তে খদিরকাষ্ঠ-নির্মিত পাখোয়াজের বোল অন্যদিকে বেহুলার মুখে তাহারই পুনরাবৃত্তি বেহুলার নৃত্যপারদর্শিতারই পরিচয়। সম্ভবত কাংস্যধাতুর বদলে খদিরকাষ্ঠের বাদ্যযন্ত্রে নৃত্যের যে বোল ধ্বনিত হয় তাহা নৃত্যের গাম্ভীর্য সৃষ্টির পক্ষে উপাদেয়। **আগুতে ঘুঙ্গুর**—নৃত্যের বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা করা হইতেছে। পটীয়সী নর্তকীর ন্যায় বেহুলা একবার সম্মুখে একবার পশ্চাতে, বারবার আবর্তিত দেহে নৃত্য করিতেছে, তাহার চরণ-বিক্ষেপে ঘুঙুরের শব্দ হইতেছে। **করে কাংস্য ··বাজে**—কাঁসা-নির্মিত খঞ্জনী জাতীয় বাদ্যধ্বনি-বিশেষের ধ্বনি শুনিয়া বেহুলা নৃত্য করিতে করিতে তাহার তারিফ করিতেছে (অথবা আপন করেই খঞ্জনী বাজাইতেছে) কটিতে দেহছন্দে কিঙ্কিণী বাজিতেছে। **প্রাণপতি·জীয়াইবে কাজে**—আপনার প্রিয়তম স্বামীর পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে। **এক দৃষ্টে···সুরপুরে**—বেহুলার অপরূপ নৃত্যভঙ্গিমা এবং তাহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রী দেখিয়া নন্দনলোকের দেবতাগণ একদৃষ্টিতে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। অর্থাৎ মানবীর রূপগুণ দেখিয়া স্বর্গের দেবতারাও মুগ্ধ হইয়াছেন। **নাহি হয়······যেন ফিরে**—

বেহুলার উচ্চাঙ্গ নৃত্য-নৈপুণ্য তাঁহাদের বিস্ময় ও আনন্দের কারণ হইয়াছে। এইরূপ নির্ভুল নৃত্যছন্দে তাঁহাদের মনে হইতেছে বেহুলা যেন নারী নয়, কোনো প্রমত্ত ময়ূর বেহুলার বদলে নৃত্য করিতেছে। **রঙ্গে···বিনোদিনী**—নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গির দ্বারা বেহুলা নৃত্য করিতেছে ও তৎসহযোগে গানও গাহিতেছে। **ত্রিভঙ্গ**—বঙ্কিম, বক্র। **নৃত্যগীতে নাচনী**—বেহুলার নৃত্য-গীতে সকল দেবতাই মুগ্ধ হইলেন এবং একবাক্যে বেহুলার নৃত্যকুশলতার প্রশংসা করিলেন। **দিয়া দিব্য**—অর্থাৎ শপথ করিয়া। **দেবতা করিছ ভয়**—শিব বেহুলার নৃত্য সমাপ্তির পর বেহুলাকে অভয় দিয়া, শপথ করিয়া, অর্থাৎ প্রয়োজন হইলে প্রতিকার করিবেন এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া, তাহার স্বর্গে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। (বেহুলার নৃত্য যেন স্বর্গসভায় তাহার অভিযোগ-পেশের সেলামি, ইহার পর একথা পেশ করিবার সুযোগ মিলিয়াছে)। **নৃত্যগীতে দেয় ক্ষমা**—নৃত্যগীতে ক্ষান্ত হইয়া এইবার তাহার সকল করুণ ক্রন্দনের ইতিহাস পেশ করিতে প্রস্তুত হইল। **নায়কেরে হও বরদাতা**—বেহুলা আলোচ্য অংশে প্রাধান্য লাভ করিলেও মনসামঙ্গল কাব্য চাঁদ সদাগর ও মনসার সংঘর্ষের কাব্য। চাঁদের অনমনীয় শৈব-সাধনার জন্যই মনসার ক্রোধ ও প্রতিশোধ, কবি তাই তাঁহার নায়কের প্রতি মনসার করুণা ও বর প্রার্থনা করিতেছেন।

ব্যাখ্যা

দেবতা সভায়·······ধ্বনি—ব্যাখ্যার অংশটি মনসামঙ্গলের সপ্তদশ শতকীয় দক্ষ কবি ক্ষেমানন্দ কেতকাদাসের মনসামঙ্গল অন্তর্গত দেবসভায় বেহুলার সূচনাংশ। চাঁদসদাগর-মনসার প্রতিদ্বন্দ্বিতার শেষ করুণ পরিণাম বিবাহ বাসরে লখীন্দরের মৃত্যুর পর বিবাহ-সজ্জা লইয়া ঐ মৃতদেহের সহিত বেহুলা দীর্ঘকষ্টভোগের পর দেবসভায় আসিয়াছে স্বামীর পুনরুজ্জীবনের প্রত্যাশায়। দেবতাসভায় তাহার প্রবেশা-ধিকার লাভ করিতে হইল নৃত্যগীতের দ্বারা দেবতাদের মনোরঞ্জন করিয়া। বেহুলা পূর্বে নর্তকী ছিল, দেবসভায় তাই নৃত্যগীতের পরীক্ষায় সে অনায়াসে দেবতাদের চিত্তহরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। মৃদঙ্গমন্দিরা সহযোগে তাহার অনায়াস গীত ও নৃত্যভঙ্গিমা দেখিয়া দেবতাগণের মনে হইতেছে ইহা কোনও

মানবীয় শিক্ষার্জিত শিল্প নয়, ইহা যেন অরণ্যের ময়ূরের স্বভাবসংগত নৃত্য কিংবা কোকিলের স্বতঃস্ফূর্ত কুহুধ্বনি। অর্থাৎ নৃত্যগীতে বেহুলার পূর্ব দক্ষতা ও নৈপুণ্যেরই ইঙ্গিত আলোচ্য ছত্রগুলির মধ্য দিয়া সূচিত হইয়াছে।

করে কাংস্যকরতাল ·····জীয়াইবে কাজে।

মৃত স্বামী লইয়া দেবসভায় চাঁদ সদাগরের পুত্রবধূ সদ্য-বিধবা বেহুলা নৃত্য-গীতের পরীক্ষা দিতেছে, এই চিত্রটি মনসামঙ্গলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ক্ষেমানন্দ কেতকাদাসের দেবসভায় বেহুলা অংশ হইতে উদ্ধৃত। পূর্ব জীবনে নৃত্যগীত-কুশলা বেহুলা অনায়াস ভঙ্গিমায় বাদ্যযন্ত্রসমাহারে নানা ছন্দে অপরূপ নৃত্যে দেবতাদের মনোহরণ করিতেছে। কাংস্য খঞ্জনীর সহিত তাহার সুমেল চরণপাত, কটিদেশে দেহাবর্তনের সহিত মধুর কিঙ্কিণীরব, তাহার নৃত্য-নৈপুণ্যের পরিচায়ক হইলেও সদ্য-বিধবা শোকাকুলা বেহুলার পক্ষে ইহা বিসদৃশ মনে হইতে পারে। কিন্তু বেহুলা দেবতাদের আদেশেই নৃত্যগীতে অংশ গ্রহণ করিতেছে, ইহা তাহার সহিষ্ণুতা ও কষ্টের এক কঠিনতম পরীক্ষা। তাহার অন্তরে পাতিব্রত্যের প্রদীপ্ত শিখা, সেই শিখার আলোকেই অনিদ্রায় অনাহারে দীর্ঘ পথ গলিত শবদেহের সহিত সে নিঃসঙ্গ নৌকায় ভাসিয়া আসিয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্রের সম্মুখে তাহার লাস্যনৃত্যের পশ্চাতে তাহার অন্তরের সেই শোককাতর কারুণ্যের প্রতিই কবি ইঙ্গিত করিয়াছেন। নানাপ্রকার রঙ্গবিলাস-বিভ্রমের পরীক্ষায় বেহুলা তাহার প্রাণপতিকে পুন-রুজ্জীবিত করিবে ইহাই তাহার কঠিনতম প্রতিজ্ঞা। আলোচ্য অংশে সাধ্বী বেহুলার চরিত্র একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে কবি উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন।

একদৃষ্টে ··· যেন ফিরে।

বক্ষ্যমাণ অংশটি ক্ষেমানন্দ কেতকাদাসের মনসামঙ্গল অন্তর্গত দেবসভায় বেহুলার দ্বিতীয় স্তবক-সূচনা। স্বামীর পুনরুজ্জীবনের জন্য সাধ্বী বেহুলা অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া দেবতাদের সম্মুখে নৃত্যগীতের পরীক্ষা দিয়া দেবতাদের মনোরঞ্জন করিতেছে, দেবতাগণ বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া বেহুলার নৃত্যভঙ্গিমা নিরীক্ষণ করিতেছেন। স্বর্গের দেবসভা উর্বশী-মেনকাদের নৃত্য-রঙ্গভূমি, সেখানে অপ্সরাদের সুকৌশল নৃত্যে তালভঙ্গ হইলে সুরপতিগণ ক্ষমা করেন না, শাপগ্রস্ত হইয়া তাঁহারা মর্তে মানবজন্ম গ্রহণ করেন। এহেন

আসরে বেহুলার নির্ভুল নৃত্য দেবতাদের কৌতূহল আনন্দ ও বিস্ময়ের কারণ হইয়াছে। তাঁহাদের মনে হইতেছে ইহা কোনো মানবীর শিক্ষার্জিত শিল্প নয়, যেন আরণ্যক উন্মাদনায় বনময়ূরের স্বতঃস্ফূর্ত নৃত্য। তাই তাঁহাদের চিত্তে রঙ্গ বৃদ্ধি পাইতেছে। [তুলনীয়,

> সুরলোকে নৃত্যের উৎসবে
> যদি ক্ষণকাল তরে
> ক্লান্ত উর্বশীর
> তালভঙ্গ হয়
> দেবরাজ করে না মার্জনা।
> পূর্বার্জিত কীর্তি তার
> অভিসম্পাতের তলে হয় নির্বাসিত।
> আকস্মিক ত্রুটি মাত্র স্বর্গ কভু করে না স্বীকার॥
>
> রোগশয্যায়—রবীন্দ্রনাথ]

প্রশ্ন ১। ক্ষেমানন্দ-কেতকাদাসের কবিতা অবলম্বনে দেবসভায় বেহুলার একটি ভাষা-চিত্র অঙ্কন কর। [ভূমিকা ও আলোচনা দ্রষ্টব্য।]

প্রশ্ন ২। ক্ষেমানন্দ কেতকাদাসের কাব্যে বেহুলাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, মনসা নয়—এইরূপ অভিমতের কারণ কী? দেবসভায় বেহুলা কবিতা অবলম্বনে ক্ষেমানন্দের বেহুলার চরিত্র অঙ্কন কর।

[আলোচনা দ্রষ্টব্য।]

প্রশ্ন ৩। সদ্য-বিধবা শোকাকিনীর পক্ষে নৃত্যগীত বিসদৃশ, কিন্তু দেব-সভায় বেহুলার নৃত্য গভীর তাৎপর্য-মণ্ডিত—এই মন্তব্যটি বিচার কর। [আলোচনা দ্রষ্টব্য।]

লীলার বিলাপ ঃ ময়মনসিংহ গীতিকা

ভূমিকা

ময়মনসিংহ গীতিকা পূর্ববঙ্গে দীর্ঘকাল-প্রচারিত কতকগুলি গাথা বা ব্যালাড, তাহারই অন্যতম 'লীলা-কঙ্ক' নামক একটি জনপ্রিয় গাথা হইতে আলোচ্য লীলার বিলাপ কবিতাটি সংকলিত হইয়াছে। মূল পালাগুলি জনসাধারণের মধ্যে প্রথাগত গায়কদের মাধ্যমে গীতাকারে প্রচলিত ছিল, সম্প্রতি শিক্ষিত পাঠকদের দৃষ্টি এইগুলির দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। এইগুলি লোকসাহিত্যের লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া ইহাদের রচয়িতা কে জানা যায় না। লীলা-কঙ্কও তাই ময়মনসিংহ গীতিকার অজ্ঞাতনামা কবিদের সৃষ্টি, ইহার কবিপরিচয় সভ্যসমাজের নিকট হারাইয়া গিয়াছে।

উৎস ও রচয়িতা-পরিচয়

সমাজ চিরকালই দ্বিকোটিক, একদিকে তাহার শিক্ষা সংস্কৃতি আদর্শ, অন্যদিকে শিক্ষাহীন নিরক্ষর অসংস্কৃত জনসাধারণ। সাহিত্য-সংস্কৃতি-সংগীত উচ্চকোটিরই সৃষ্টি, অজ্ঞ শিক্ষাহীন নিরক্ষর জনসাধারণ তাহা শ্রবণ করে মাত্র। কিন্তু এই বৃহত্তর বিপুল সমাজের নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, কৃষ্টি ও সভ্যতা, সাহিত্য ও সংগীত আছে। তাহাদেরও আনন্দ-বেদনা, শ্রম ও অবকাশ দিয়া গড়িয়া-ওঠা এই সাহিত্যই লোকসাহিত্য। ইহা নিরক্ষর কিন্তু স্বভাবপ্রতিভ লোক-কবির সৃষ্টি, তাই ইহার রচয়িতারা রচনার নিম্নে তাহাদের নামের স্বাক্ষর চিরকালের মত ঘুচাইয়া দিয়াছেন। লোকসাহিত্যের রচয়িতা তাই এক হিসাবে সমাজই। বহু জননীর কণ্ঠে কণ্ঠে নির্মিত হইয়া হয়ত এক শতাব্দী ধরিয়া একটি ছড়ার জন্ম হয়, কত উৎকণ্ঠ শিশুশ্রোতার বিস্ফারিত শ্রুতির কাছে কত যুগ ধরিয়া একটি রূপকথার সৃষ্টি হয়। ক্ষীণ কোনো ঐতিহাসিক স্মৃতি জনশ্রুতি কিংবদন্তী অবলম্বন করিয়া কোনো এক বা একাধিক উৎসাহী গায়কের হাতে পল্লবিত হইয়া কত যুগ পরে একটি পালাগান বা ব্যালাডের উৎপত্তি ঘটে। এই ভাবে প্রাচীন কোনো স্থানীয় ঘটনার স্মৃতিমাত্র অবলম্বন করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর অল্প পূর্বে কিংবা পরে লোক-কবির হাতে এই ময়মনসিংহ গীতিকাগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল।

লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা

লোকসাহিত্য সমাজের সৃষ্টি

ময়মনসিংহ গীতিকাগুলির লোকসাহিত্য-লক্ষণ স্পষ্ট। প্রথমত, এইগুলি নিরক্ষর কবিসমাজের অজ্ঞাতনামা সৃষ্টি লোকসাহিত্যের ব্যালাড-জাতীয় রচনা। দ্বিতীয়ত, ইহাতে রামায়ণ-পুরাণের প্রভাব থাকিলেও তাহা আরোপিত, ধর্মনিরপেক্ষতাই লোকসাহিত্যের এই জাতীয় রচনার বৈশিষ্ট্য। তৃতীয়ত, লোকসাহিত্য অশিক্ষিতপটু স্বভাবকবির রচনা বলিয়া ইহা লিখিত হয় না, মুখে মুখে প্রচারিত হয়, সময় বিশেষে পরবর্তী কবি বা গায়ক দল বা গবেষকের হাতে ইহা সংকলিত হয় মাত্র। লোক-সাহিত্যে গাথা বা গীতিকা, গীতি, ছড়া, রূপকথা, ধাঁধা ইত্যাদি নানা বিভাগ থাকে, ময়মনসিংহ গীতিকা গাথা-জাতীয় রচনা। অসামাজিক বিয়োগান্ত প্রেম-কাহিনী ইহাদের অবলম্বন হইয়া থাকে এবং গীতোদ্দেশ্যে রচিত হয়। আলোচ্য লক্ষণগুলি ময়মনসিংহ গীতিকায় আছে।

ময়মনসিংহ গীতিকা

গীতিকা লক্ষণ

লীলা-কঙ্কের কাহিনী নিতান্তই একটি স্বাভাবিক পারিবারিক কাহিনী, ইহাতে অবাস্তবতা নাই, অবিশ্বাস্য ঘটনাও কিছু নাই। কিন্তু মানবিক আবেদন ও করুণ রসে ইহা আধুনিক উপন্যাস অথবা ছোট গল্পের মত সবশ্রেণীর পাঠক বা শ্রোতার হৃদয় হরণ করে। অল্পবয়সে পিতামাতা হারাইয়া ব্রাহ্মণ-সন্তান কঙ্ক প্রথমে এক চণ্ডাল-দম্পতি ও পরে লীলার পিতা ব্রাহ্মণ সমাজপতি গর্গের দ্বারা প্রতিপালিত হয় এবং যৌবনে লীলার সহিত প্রণয়াবদ্ধ হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে কঙ্ক এক পীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করায় বিক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণ সমাজের কুৎসা ও ক্রোধের ভয়ে এবং কুপিত গর্গের জিঘাংসা হইতে আত্মরক্ষার জন্য কঙ্ক দেশান্তরী হইল।

লীলা কঙ্কের কাহিনী ও কবিতার প্রেক্ষাপট

ক্রমে কঙ্কহীন জীবন লীলার পক্ষে দুঃসহ হইল, তাহার বিলাপে আকাশ ব্যথিত হইল, অনুতপ্ত গর্গ কঙ্কের অনুসন্ধানে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে বিরহিণী লীলা অন্তিম শয়ানে কঙ্কের দর্শনের শেষ অতৃপ্ত বাসনা লইয়া চিরতরে নয়ন মুদ্রিত করিল। কঙ্ক প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিল শ্মশানে অঙ্গার ও চিতাভস্মে লীলার স্মৃতি দগ্ধ হইতেছে, পুনরায় বৈরাগী হইয়া কঙ্ক নিখিল বিশ্বে হারাইয়া গেল।

আলোচ্য লীলার বিলাপ কবিতা কঙ্কের পলায়নের পর দীর্ঘ-বিরহে শীর্ণকায়া লীলার আক্ষেপোক্তির অংশ। সুতরাং নামকরণ বিষয়োপযোগী হইয়াছে।

ভাবার্থ

গর্গের ক্রোধে ভীত হইয়া কঙ্কের নিরুদ্দিষ্ট হইবার পর দীর্ঘ-বিরহে তাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া লীলা বিলাপ করিতেছে। কঙ্কের অদর্শনে তাহাদের ক্রীড়াকাননের ফুলগুলি ঝরিয়া যাইতেছে। বিরহিণী লীলা বিশ্বপরিক্রমণকারী সূর্যদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে, তাঁহার সর্বত্রগামী আলোকরশ্মির সাহায্যে কঙ্কের সন্ধান লাভ করিয়া তিনি যেন তাহাকে লীলার বার্তা জানান এবং স্বভূমিতে ফিরাইয়া আনেন। নানাদেশে বিচরণকারী বিদেশী মাঝিমাল্লাদের সম্বোধন করিয়া লীলা বলিতেছে, কঙ্কবিরহে লীলার উন্মাদদশা, তাহার দিবসযামিনীর নিশ্চলতা এবং তাহার আসন্ন মৃত্যুর সম্ভাবনা যেন তাহারা কঙ্ককে জানাইয়া তাহাকে গৃহে আনে (১ম স্তবক)।

নদীকে সম্বোধন করিয়া লীলা বলিতেছে, নদীর উপকূলে তাহাদের বহু দিবসের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অনুরাগ ও হৃদয়বিনিময়ের স্মৃতি নদীর অজানা নাই। উজানবাহিনী নদী কত দেশেই তো যায়, সে কি কখনও কঙ্কের বাঁশী শুনিতে পায় নাই? নদী কোন পাহাড়-পর্বতেই কি তাহার সাক্ষাৎ পায় নাই? এখন কঙ্কের বিরহে হতভাগিনী লীলার নিশ্বাসে নদী শুকায়, শিলা অশ্রুজলে গলিয়া যায়: তাহাও বেশিদিন নয়, ক্রমেই সে মৃত্যুসমীপা হইতেছে, এখন মুমূর্ষু দুই দৃষ্টিতে কঙ্কের দুটি চরণদর্শনের বাসনার কথাটি যেন নদী কঙ্কের সন্ধান করিয়া তাহাকে জানাইয়া দেয় (২য়-৩য় স্তবক)।

কঙ্কের সহিত অতন্দ্র নৈশযাপনের সাক্ষী চন্দ্র-তারাকে ডাকিয়া লীলা বলিতেছে সপ্ত সাগরতীরে অচল পর্বতে ঊর্ধ্বলোকে যাহাদের স্বাচ্ছন্দ্য-বিহার তাহারা লীলার নয়নরত্নের সন্ধান বলিয়া দিক। কঙ্কের নিরুদ্দেশ যেন নিদ্রার সুযোগে লীলার অঞ্চল হইতে দুর্লভ মাণিক্য-অপহরণ; তাহারই অনুসন্ধানে লীলার অশ্রুবাষ্পে রজনী আচ্ছন্ন হইয়াছে। ক্রন্দনে তাহার নয়ন অন্ধ হইয়াছে, তাহার হৃদয়পিঞ্জরের পাখী যেখানে উড়িয়া গিয়াছে, পাখা থাকিলে লীলা তাহারই অনুসরণ করিত (৪র্থ স্তবক)।

একইভাবে লীলা দিবসরাত্রির সাক্ষী তরুলতাকে কঙ্কের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিয়াছে। পিঞ্জরবদ্ধ সারীশুককে কঙ্কের পূর্বকৃত স্নেহযত্ন স্মরণ করাইয়া দিয়া কঙ্ককে ভুলিয়া যাইবার জন্য তাহাদের অনুযোগ করিতেছে। গৃহ-পরিত্যাগের পূর্বে কঙ্ক তাহাদের নিকট তাহার ঠিকানা বলিয়া গেছে কিনা ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া লীলা সারীর কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া তাহার পাখার সাহায্যে উড়িয়া লীলাকে কঙ্কের উদ্দেশ জানাইবার জন্য মিনতি করিতেছে। সম্পদকালে যে বিহঙ্গ কঙ্কের দ্বারা প্রতিপালিত সে এখন পূর্বকৃত কৃতজ্ঞতাবশত সর্বত্র অনুসন্ধান করিয়া কঙ্কের সন্ধান সংগ্রহ করুক এবং তাহার বার্তা বহন করিয়া লীলার সংকট নিবারণ করিয়া তাহাকে বাঁচাক, এই অনুরোধ করিয়া লীলা সেই পক্ষীকে পিঞ্জরমুক্ত করিয়া দিল (৫ম-৬ষ্ঠ স্তবক)।

আলোচনা

ময়মনসিংহ গীতিকা শিষ্ট সাহিত্যের অন্তর্গত না হইলেও কাব্যগুণে, চরিত্রচিত্রণে, আন্তরিকতায় বাঙলা সাহিত্যের পরম গৌরবের সামগ্রী। পল্লী বাঙলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে সভ্যতাবর্জিত কোলাহলহীন নিরক্ষর সমাজে অশিক্ষিত গ্রামীণকবির কণ্ঠে ইহার যে সুর উদ্‌গীত হইয়াছিল, তাহার সন্ধান পাইয়া আজ বিশ্বের সুধীজন বিস্মিত হইয়াছেন। লীলা-কঙ্কের কাহিনীটি ময়মনসিংহ গীতিকার একটি শ্রেষ্ঠ পালা এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অনুরূপ প্রেমবিষয়ক বিয়োগান্ত ব্যালাডগুলির অন্যতম। একটি অতি সাধারণ কাহিনী,

লীলা-কঙ্কের কাহিনীর ট্র্যাজিক আবেদন

অত্যন্ত পরিচিত দুই কিশোর-কিশোরীর গ্রাম্য চরিত্র; সমাজ-শাসনে তাহাদের তরুণ প্রেমের পথে আসিয়াছে গভীরতম বাধা। আশৈশব দুঃখে লালিত কঙ্ক প্রাণভয়ে তাহার জীবনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে পলায়ন করিয়াছে। তারপর যখন সে ফিরিয়া আসিয়াছে, তখন লেলিহান চিতাগ্নিতে তাহার প্রিয়তম অভাগিনী লীলা মৃত্যু-মিলনের রক্তিম বাসরশয্যায় শায়িতা। একটি স্বপ্নভঙ্গের বেদনায়, একটি তরুণ মধুর বাসনার আকস্মিক সমাপ্তিতে, সমাজশাপের নিশ্বাসে একটি কচি মুকুলের অকাল-মৃত্যুতে, আমাদের চোখ অশ্রুসজল হইয়া উঠে। এইখানেই গীতিকাটির সার্থকতা।

লীলার বিলাপ গীতিকাংশে কঙ্ক চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় না, ইহা কঙ্কের গৃহ পরিত্যাগের পর প্রতীক্ষাক্লিষ্টা দুর্ভাগ্যলাঞ্ছিতা লীলার বিলাপ।

লীলার চরিত্র

লীলার অশ্রুসিক্ত বেদনা, দীর্ঘ-বিরহে তাহার মৃতকল্প দীর্ঘশ্বাস, কঙ্কের শেষদর্শন লাভের জন্য জীবজগৎ ও জড়-জগতের নিকট হিতাহিতজ্ঞানশূন্য মিনতি এসবই তাহার চরিত্রের গভীর প্রেম ও আন্তরিক সরলতার নিদর্শন। ময়মনসিংহ গীতিকার নারী চরিত্রগুলি ত্যাগে সহিষ্ণুতায় প্রেমে আত্মদানে দুঃখে সাধ্বীত্বে বাঙলা সাহিত্যের পরম বিস্ময়। সামান্য কৃষিজীবী জীবনের ভগ্ন মৃত্তিকা-কুটিরে যে কত শত সতী সাবিত্রী দময়ন্তী সীতা বেহুলা শৈব্যা আজও বাঁচিয়া আছে, তাহার সন্ধান আমরা রাখি না, এই সকল গীতিকার পল্লীকবিরা রাখিতেন। ইহাদের জীবন অবলম্বনে মহাকাব্য নাটক রচিত হয় নাই, কদাচিৎ লোককবির ভাঙা বীণায় এইরূপ দুই-একটি অমার্জিত বিশৃঙ্খল অশ্রুঘন গীতিকা রচিত হইয়াছে। ময়মনসিংহ গীতিকার মহুয়া, মলুয়া, কঙ্ক, মদিনা, চন্দ্রাবতী প্রভৃতি নারী-চরিত্রগুলির ঔজ্জ্বল্যেই গীতিকাগুলির মহিমা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অধিকাংশ গীতিকার নারীচরিত্রই প্রেমের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছে, কঠিন বিরহে দগ্ধ হইয়াছে, দস্যুর দ্বারা নির্যাতিত হইয়াছে সে দস্যু শাসকই হোক বা সমাজই হোক, কিন্তু তাহাদের প্রেম ও পাতিব্রত্যকে ম্লান করিতে পারে নাই। শেষ পর্যন্ত প্রণয়ভাজনের সহিত তাহাদের মিলন হয় নাই, তাহাদের অর্ধসমাপ্ত জীবনের করুণ দীর্ঘ-শ্বাসে বাঙলার লোকসমাজ চিরকাল অশ্রুপাত করিয়াছে, চিরকাল করিবে।

ময়মনসিংহ গীতিকার নারী চরিত্র

লীলা-কঙ্ক আখ্যায়িকা হইতে উদ্ধৃত লীলার বিলাপে অভাগিনী লীলা এই গীতিকার একটি ছিন্নমূল ভূলুণ্ঠিতা লতা। মিলনের পূর্বেই তাহার জীবনের সকল বক্তিম আশা মরীচিকা-গ্রস্ত হইয়াছে, তাহার আতুর স্বপ্নে বিরহের তপ্ত অগ্নি লাগিয়াছে। তাহার করুণ ক্রন্দন অরণ্যের তরুলতা, আকাশচারী দূরস্থিত গ্রহ-নক্ষত্র, প্রবহমান নদী-স্রোত, নিশ্চল পর্বত ও পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীকেও যেন স্পর্শ করিয়াছে। কৃষ্ণ মথুরায় গেলে রাধার মাথুর বেদনাও এমনই তীব্র ছিল, কিন্তু বৈষ্ণব কবি শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণকে ফিরাইয়া আনিয়া 'ভাবসম্মিলন' ঘটাইয়াছেন। কিন্তু গীতিকার লোক-কবি এইরূপ কল্পনার দ্বারা তাহার নায়িকাকে

পদাবলীর বিরহের সহিত তুলনা

মিথ্যা সান্ত্বনা দেন নাই। গীতিকার নায়িকা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষা বক্ষে ধারণ করিয়া ক্ষীণতনু শীর্ণতর কবিয়া বঞ্চনার মৃত্যুশয়নে অন্তিম নিশ্বাস ফেলিয়াছে। তাই আদর্শবাদী বৈষ্ণব কবিতা অপেক্ষা এই লোকসাহিত্য অনেক বেশি বাস্তব ও করুণ।

লীলার বিলাপে লোকসাহিত্যের লক্ষণ

লীলাব বিলাপ গীতিকাংশটি একদিকে যেমন বিরহিণী বমণীব আর্ত বিলাপে মানবিক-আবেদন-সম্পন্ন এবং সাহিত্যের অনুরূপ বিরহ-বিলাপেব সহিত তুলনীয়, অন্যদিকে ইহাতে একান্ত ভাবেই একটি লোকসাহিত্যেব লক্ষণ আছে যাহা অন্যান্য সাহিত্যের তুলনায় ইহাব স্বাতন্ত্র্যেরই দ্যোতক। প্রথমত, লীলার বিলাপ (এবং সম্পূর্ণ ময়মনসিংহ গীতিকাই) কাব্যেব ভাষা ও ছন্দে বচিত নয়, ইহা ছড়াব ছন্দে ও আঞ্চলিক অর্থাৎ পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় রচিত।

ছড়াব ছন্দ ও আঞ্চলিক ভাষায় বচিত

লোকসাহিত্য একান্তই আঞ্চলিক এবং মৌখিক বলিয়া কাব্যেব ছন্দ অথবা শিষ্ট সাহিত্যের ভাষা এখানে দেখা যায় না। দ্বিতীয়ত, লোকসাহিত্যে সবকিছু যুক্তির দ্বারা বিচার্য হয় না। ইহা বাস্তব জীবনের কাহিনী হইলেও এমন একটি জগতে কাহিনীকে টানিয়া আনে যেখানে জড়পদার্থও মানুষের জীবনে প্রভাব বিস্তাব কবে। ইহাতে জীবজন্তু প্রাণিসমাজেবও একটি ভূমিকা আছে। তাহারা কথা বলিতে পাবে অথবা মানুষেব কথা বুঝিতে পাবে;

যুক্তিহীনতা

মানুষেব সুখদুঃখে অংশ গ্রহণ কবে, সান্ত্বনা ও সমবেদনা জানায়। লীলা তাহার নিঃসঙ্গ কষ্টহীন বেদনায় বিদীর্ণ হৃদয়ে জড়জগৎ প্রাণিজগতের সহানুভূতি প্রার্থনা করিয়াছে, সূর্য চন্দ্র নদী তরুলতার কাছে মিনতি কবিয়াছে। ইহা যথার্থ লোকসাহিত্যের লক্ষণ।

একই চবণের পুনরুক্তি

তৃতীয়ত, লোকগাথা-লোকগীতি শ্রুতিনির্ভর বলিয়া ইহাতে এক কিংবা একাধিক চবণ অথবা একজাতীয় ভাষা পুনঃপুন আবৃত্তি কবা হয়। ইহাতে শ্রোতার মনে একটি আবেগ সৃষ্টি হয়। যেমন, সূর্যের প্রতি লীলার অনুনয়—

লাগাল পাইলে তারে আমার কথা কহিও।

বিদেশী নাবিকদের প্রতি মিনতি—

লাগাল পাইলে কঙ্কে আনিয়া কহিও।

নদীর প্রতি লীলার অনুরোধ—

লাগাল পাইলে তারে কইও লীলার কথা।

চতুর্থত, বিভিন্ন লোকসাহিত্যে একই প্রকার ভাবপ্রকাশের রীতি পুনরাবৃত্ত হয়। যেমন,

একজাতীয় ভাব প্রকাশ

এমন নিষ্ঠুর বিধি নাহি দিল পাখা—
উড়িয়া বন্ধুর সঙ্গে করিতাম দেখা।

এই প্রকার ছত্র বাঙলা লোকসাহিত্যে অসংখ্যবার ব্যবহৃত হইয়াছে।

পঞ্চমত, লোকসাহিত্যের গীতিকাগুলিতে কৌতূহলপূর্ণ কাহিনীর ফাঁকে ঘন রসাবেশময় গীতিঅংশ থাকে। লীলা-কঙ্ক কাহিনীটি ঘটনার উত্তেজনায় গতিবেগপূর্ণ, ইহা প্রতি মুহূর্তে শ্রোতাকে নাটকীয় সংঘাতে পরবর্তী ঘটনার প্রতি আগ্রহী করিয়া রাখে। কিন্তু আলোচ্য লীলার বিলাপটি কাহিনীর আবর্তনকে সহসা থামাইয়া দিয়া লীলার বিলাপের গীতিপ্রবাহে কাহিনীকে মন্থর ও শ্রোতাকে ভাবাবিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। ইহার আগাগোড়া প্রায় একই ধরণের উক্তি, বিলাপের ভঙ্গিটি বর্ণনাপ্রধান নয়, আবেগপ্রধান।

কাহিনীর ফাঁকে গীতি-অংশ

রূপতত্ত্ব বিশ্লেষণ

১ম স্তবক। তোমার মালঞ্চে ফুল বাসি হৈয়া যায়—লীলা ও কঙ্ক নিতান্ত বাল্য বয়স হইতে একত্রে লালিত-পালিত হইয়াছে, একই কুটিরে বর্ধিত, একই কাননে খেলা করিয়াছে। আজ কঙ্কের অভাবে সেই উপবনে তাহাদের উভয়ের পরিচিত পুষ্পগুলি শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। **পূবেতে···নি গো পাও**—পূর্ব-দিগন্তে উদিত হইয়া পশ্চিম দিগন্তে অস্তায়মান ব্রহ্মাণ্ড-চংক্রমণকারী সূর্যের পক্ষে অনায়াসে কঙ্কের সন্ধান পাওয়া সম্ভব ইহাই লীলার স্থির বিশ্বাস। **অন্ধাইর**—অন্ধকার (পূর্ব বাঙলার ময়মনসিংহ অঞ্চলের উপভাষায় লীলার বিলাপ রচিত এইজন্য ভাষায় সর্বত্র পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার ছাপ আছে)। **এমন··· সর্বদেশে**—সূর্যদেব তমোবিনাশী, বিশ্বের সর্বত্র তিনি অন্ধকার দূর করেন, সকল তমসার উপর তাঁহার আলোক-রশ্মিপাত ঘটে, তিনি সকল দেশেই কিরণ বিস্তার করেন। সুতরাং কঙ্ক যে দেশেই থাকুক, যেখানেই লুকাইয়া থাকুক, সূর্যদেবের কাছে গোপন থাকা সম্ভব নয়, ইহাই তাহার

বক্তব্য। **কহিও···দিনমণি**—সূর্য যে কেবল সর্বত্রগামী ও তিমিরঘ্ন তাহাই নয়, সূর্য আমাদের নিকট পূজনীয় দেবতাও ; সুতরাং লীলা সূর্যকে কেবল অনুরোধই করিতেছে না, দিবসাধিপতির নিকট বাঞ্ছাপূরণের প্রার্থনাও করিতেছে। **আলোকে···আনিয়ো**—সূর্যদেব যদি তাহার সন্ধান পান, তবে তাঁহার আলোকরশ্মির সাহায্যে যেন স্বদেশে ফিরাইয়া আনেন, অর্থাৎ কঙ্ক যদি অন্ধ হইয়া পথ হারাইয়া বসিয়া থাকে সূর্যদেব যেন তাহাকে পথ চিনাইয়া দেন। **পাহাড়ে পর্বতে যাও তরণী বাহিয়া**—পূর্ব ময়মনসিংহের যে অঞ্চলে এই সকল গীতিকার জন্ম, তাহা সমতট নয়, সেখানে প্রকৃতি পর্বতবন্ধুর, যেখানে নদীগুলি অধিকাংশই পর্বতবাহিনী তীব্রবেগা। হয়ত তাহারই জন্য পাহাড পর্বতের উল্লেখ। সাধারণভাবে 'পাহাড়ে পর্বতে যাও' অর্থ 'দুর্গম অঞ্চলে যাও' এইরূপও বুঝাইতে পারে। **দিবস না যায় মোর না পোহায় রাতি**—বিরহে প্রতি মুহূর্ত দীর্ঘ বোধ হয়, সুতরাং লীলার দিবসরজনীগুলি অনতিক্রান্ত নিশ্চলতার দ্বারা তাহাকে পীড়িত করে। তুলনীয় বিরহে বিদ্যাপতির নায়িকার উক্তি, কৈছনে গোঙব ইহ দিনরজনী।

২য় স্তবক। **দরিয়া**—দরিয়া ও নদী সমার্থক শব্দ। **শুন শুন··মনের ব্যথা**—নদীবিধৌত পূর্ব বাঙলার মাটিতেই গীতিকার জন্ম, সুতরাং নদীর সহিত ইহার চরিত্রগুলির সম্পর্ক স্বভাবতই গভীর ও অন্তরঙ্গ। ইহার উপর লীলা ও কঙ্ক দীর্ঘকাল নদীর উপকূলে তাহাদের কৈশোরের রঙিন কল্পনাজাল বুনিয়াছে, লীলাখেলা করিয়াছে। সুতরাং অবিচ্ছিন্ন সাহচর্যবশত নদী লীলার অন্তর্বেদনা জানিবে, ইহাই লীলার স্বাভাবিক বিশ্বাস। **কোথা শুনি · বাঁশীর গান**—দেশবিদেশে প্রবহমানা নদীর পক্ষে দূরপ্রবাসী কঙ্কের সন্ধান পাওয়া সম্ভব এই অনুমানে লীলা তাহাকে ব্যাকুল হইয়া প্রশ্ন করিতেছে, নদী কঙ্কের পরিচিত বংশীধ্বনি শুনিতে পাইয়াছে কিনা। লীলা-কঙ্ক পালায় কঙ্কের বাঁশী বাজানোর উল্লেখ আছে—

> বাথানে যখন বাজে কঙ্কের মোহন বেণু।
> উচ্চ পুচ্ছে ছুটে আসে গোষ্ঠের যত ধেনু॥

নদীর নিকটও এই বংশী একান্ত পরিচিত, কারণ

> কঙ্কের বাঁশী শুনে নদী বহে উজান বাঁকে।

৩য় স্তবক। নিশ্বাসে…আছে লীলা—কঙ্কের বিরহে লীলা মুমূর্ষু; তাহার আতপ্ত নিশ্বাসে এমন কি নদী পর্যন্ত বাষ্প হইয়া যায় অর্থাৎ তাহার জ্বালাময় দুঃখে অস্তব অগ্নিতুল্য; তাহার অশ্রুজলের প্লাবনে এমন কি কঠিন শিলা পর্যন্ত দ্রবীভূত হইয়া যায়। এইরূপে কোনোমতে প্রাণধারণ করিয়া বাঁচিয়া আছে লীলা, এই অভিজ্ঞতাপ্রসূত সংবাদটি যেন নদী কঙ্ককে সাক্ষাতে জানায়। **সেও তো…কালি**—কিন্তু এইরূপ জীবন্মৃত হইয়াও লীলা অধিক দিন জীবিত থাকিতে পারিবে না, শীঘ্রই তাহার মৃত্যু আসন্ন। **মরবার ·চরণ**—লীলার অনিবার্য মৃত্যুর প্রাক্কালে অন্তিম সাধ, একবার মুমূর্ষু দুটি নয়নের দ্বারা কঙ্কের চরণ দর্শন করা। মিলনের আশাভঙ্গে মৃত্যুপূর্বে প্রিয়তমের চরণদর্শনের এই শেষ মিনতিটুকু লীলার স্নিগ্ধ রমণীয় নারীত্বের একটি করুণ মধুর দৃষ্টান্ত।

৪র্থ স্তবক। রজনীকালের…তারা—লীলা ও কঙ্কের প্রাক্তন জীবন-যাত্রায় তাহাদের উল্লসিত গীতিময় বহু বিনিদ্র রজনীর সাক্ষী আকাশের চন্দ্র তারকার নিকট লীলা তাহার হৃদয়পাত্রের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতেছে। **সপ্ত সাগর ··নিশাকালে**—ভৌগোলিক দিক হইতে সপ্ত সাগর এবং অচল পর্বতের কোনো বিশিষ্ট তাৎপর্য নাই; আকাশের গ্রহ নক্ষত্রাদি যে অনন্ত আকাশে বিচরণ করে ইহাই লীলার অভিপ্রেত। **নিশীথে রতন**—কাহিনী অনুযায়ী, ক্রোধপরায়ণ গর্গ কঙ্ককে হত্যা করিতে উদ্যত জানিয়া লীলাই কঙ্ককে পলায়ন করিতে উপদেশ দিয়াছিল, কিন্তু সে ভাবিতে পারে নাই কঙ্কের যাত্রা চিরকালের মত হইবে। প্রেমিকের এই আকস্মিক অন্তর্ধান তাহাকে বিমূঢ় হতচকিত করিয়া দিয়াছে। ইহা কেবল কঙ্কের স্বেচ্ছা-গমন নয়। যেন লীলার একমাত্র অমূল্য রত্ন তাহার অঞ্চলে আবদ্ধ ছিল, তাহার নিদ্রার সুযোগে তস্কর ইহা অপহরণ করিয়াছে। প্রেমিকের এই বিচ্ছিন্নতা নিদ্রাভঙ্গে তাহাকে সর্বরিক্ততার বেদনায় ভূলুণ্ঠিত করিয়া দিয়াছে। **সে রত্ন…পোহাই**—কঙ্কই লীলার জীবনের একমাত্র অমূল্য সম্পদ ছিল, তাহার নিদ্রাবশের সুযোগে অপহৃত সেই রত্ন অনুসন্ধান করিতে করিতে তাহার দীর্ঘ দুঃখ-নিশি অতিবাহিত হইতেছে। **কোন দেশে…পাখী**—কঙ্ক যেন তাঁহার জীবন-পিঞ্জরের পক্ষী, খাঁচা হইতে নিরুদ্দেশে উড়িয়া গিয়াছে।

৫ম স্তবক। দিবস·· তরুলতা—যে উপবনে লীলাকঙ্কের মধুর মুহূর্তগুলি কাটিত, সেই উপবনের তরুলতাদের সম্বোধন করিয়া লীলা তাহাদের প্রেমের

সাক্ষ্য মানিতেছে। **আর যদি···কি বলে?**—উপবনের তরুলতাদের সহিত কঙ্কের মধুর সৌহার্দ্যের কথা স্মরণ করিয়া বিদায়ের পূর্বে কঙ্ক তাহাদের নিকট তাহার সম্ভাব্য ঠিকানা জানাইয়া গেছে কিনা লীলা তাহাই প্রশ্ন করিতেছে।

৬ষ্ঠ স্তবক। ক্ষীর-সর···বিস্মরণ—গৃহপালিত পিঞ্জরাবদ্ধ শুকসারীকে কঙ্ক পূর্বে যে স্নেহ দান করিয়াছিল তাহার প্রতিদান স্বরূপ শুকসারীর উচিত ছিল কঙ্কের উদ্দেশ বলিয়া দেওয়া। রূপকথায় শুকসারী মানুষের ভূতভবিষ্যৎ বলিয়া দিতে পারে, তাই এক্ষেত্রে লীলা তাহাদেরই নিকট কঙ্কের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিয়াছে। তুলনীয়—

পিয়াল ফুলের বনে পিয়ার ভ্রমরা।
পিয়া বিনে মধু না খায় ঘুরি বুলে তারা॥ [গোবিন্দদাস]

ঝটিতি—দ্রুতবেগে। **ফিরায়ে···ঝটিতি**—রূপকথায় শুকসারী অসাধ্য সাধন করিতে পারে, লীলা সেই বিশ্বাসেই পোষা জীবমনকে মুক্ত করিয়া কঙ্কের সাক্ষাৎ লাভ করিতে ও তাহাকে স্বরায় ফিরাইয়া আনিতে অনুরোধ করিতেছে। **সম্পদ · জুয়ায়**—একদা সৌভাগ্যের দিনে কঙ্ক তাহার প্রিয় শুকসারীকে সর্বদা পালন করিত। এখন লীলার অনুরোধে না হোক, পালকের প্রতি পূর্বসেবার কৃতজ্ঞতার-বশত তাহাদের উচিত কঙ্কের সন্ধান সংগ্রহ করা, যেহেতু তাহাদের অসাধ্য কিছু নাই। এখন কঙ্কের ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় থাকা তাহাদের উচিত নয়। **না জুয়ায়**—যোগ্য হয় না। **পৃথিবী লীলার প্রাণ**—বায়ুগতি শুকসারী পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে পারে, সুতরাং তাহাদের পক্ষে কঙ্কের হদিশ সংগ্রহ করা কঠিন নয়। লীলা কঙ্ককে সশরীরে ফিরাইয়া আনিবার কথা নয়, কেবল তাহার সংবাদ সংগ্রহ করিবার অনুরোধই জানাইতেছে। তাহাতেই তাহার মুমূর্ষার অবসান হইতে পারে।

ব্যাখ্যা

নাগাল পাইলে···দেশেতে আনিয়ো [প্রথম স্তবক]—আলোচ্য পংক্তিযুগল অজ্ঞাতনামা কবি-রচিত লীলা-কঙ্ক নামক লোকগীতিকার অংশ লীলার বিলাপ হইতে উদ্ধৃত। প্রিয়তম কঙ্কের দেশত্যাগের পর দীর্ঘ প্রতীক্ষায় আশাহত লীলা বিরহ-বিদীর্ণ হৃদয়ে বিশ্ব-পরিভ্রমণকারী সূর্যের প্রতি কঙ্কের সংবাদ আনিবার মিনতি জানাইয়াছে এই ছত্রগুলিতে। উদয়াস্ত-বিচরণশীল

তিমিরবিনাশী দিনপতি সর্বত্র অন্ধকার দূর করেন সুতরাং কঙ্ক অন্তত তাঁহার নিকট আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারিবে না। আর যদি কঙ্ক দৃষ্টি হারাইয়া ফেলে, অথবা স্বভূমির ঠিকানা হারাইয়া ফেলে, তবে করুণাময় সূর্যদেব যেন তাঁহার আলোকরশ্মির সাহায্যে কঙ্ককে গৃহে ফিরাইয়া আনেন। ইহাই সূর্যের নিকট লীলার কাতব অনুনয়।

সূর্যের প্রতি সম্বোধন, সূর্যদেব তাঁহার বিশ্বপর্যটনের কর্মচক্রে লীলার প্রিয়তমেব সন্ধান সংগ্রহ করুন, এই ধরণেব অনুবোধ একান্তই লোকসাহিত্যের একটি লক্ষণ। লোকসাহিত্যে নায়িকার মর্মবেদনা-প্রকাশে অচেতন জড়জগৎ ও জীবজগৎও অংশগ্রহণ কবে।

কত দেশে···সেই বাঁশীর গান [দ্বিতীয় স্তবক]—ময়মনসিংহ গীতিকার অন্তর্গত অজ্ঞাতনামা কবি-রচিত বিয়োগান্ত লীলা-কঙ্ক আখ্যানের অন্তর্ভুক্ত লীলার বিলাপ হইতে উদ্ধৃত বক্ষ্যমাণ দুই পংক্তিতে কঙ্ক-বিরহে উন্মাদিনী লীলার মনোবেদনা ও নদীর নিকট নিরুদ্দেশ কঙ্কের জন্য সন্ধান-ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে। সূর্য ও বিদেশী মাঝিদের নিকট কঙ্কের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিয়া লীলা তাহাদের বহুদিবস-রজনীর মিলনালাপের প্রতিবেশী ও সহচরী নদীর নিকট কঙ্কের ঠিকানা জানিতে চাহিতেছে। এই নদীর তীরেই তাহাদের বাস ছিল, নদীব প্রান্তে নদীর কলধ্বনিতে তাহাদের বহু অনুরাগ উৎকণ্ঠা মাখানো। বস্তুত নদীই তাহাদের প্রণয়ের সাক্ষী, তাহাদের অনুরক্ত হৃদয়ের খবর তাহার অজানা নাই। নদী দেশে দেশে প্লাবিত হইতেছে, দূর দূরান্তরে ধাবিত হইতেছে, সুতরাং যত দূরেই কঙ্ক আত্মগোপন করুক, নদী হয়ত তাহার সংবাদ পাইতে পারে। এই নদীর তীরে বসিয়া কঙ্ক কতদিন বাঁশী বাজাইয়াছে, তাহা শুনিয়া নদী উজানবেগে বহিয়াছে। সুতরাং কঙ্কের সাক্ষাৎ না পাক, পরিচিত বংশীধ্বনি শুনিতে পাইলে নদী তাহার সন্ধান আবিষ্কার করিতে পাবিবে, ইহাই লীলার বিশ্বাস।

নিশ্বাসে শুকায়···আছে লীলা [তৃতীয় স্তবক]—প্রসঙ্গসূত্র প্রথম ব্যাখ্যার মত।

প্রীতিবিরহ ও মৈত্রীবিরহে লীলা উন্মাদিনী হইয়া একবার বিশ্ব-পরিভ্রমণকারী সূর্যের নিকট একবার দূরপ্রবাহিনী তটিনীর নিকট তাহার

প্রিয়তম কঙ্কের উদ্দেশ সন্ধান করিতেছে। যে নদী-তীরের শষ্পতটে লীলা ও কঙ্কের অনেক মধুর মুহূর্ত প্রেমালাপে কাটিয়াছিল, যে নদী তাহাদের উভয়ের তরুণ কল্পনা ও অনুরাগের প্রত্যক্ষ সাক্ষী, সেই নদীর নিকট লীলা সকাতরে অনুরোধ করিয়াছে, যে দুর্গম অঞ্চলে নদীর ধারা প্রবাহিত হয় সেখানে কঙ্কের সাক্ষাৎ পাইলে নদী যেন তাহাকে লীলার মুমূর্ষু অবস্থার কথা নিবেদন করে। কঙ্কের বিরহে লীলা এখন আসন্ন মৃত্যুর পদধ্বনি গণনা করিতেছে। বিরহে তাহার সকল শরীর আতপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার নিশ্বাসবায়ু এতই উষ্ণ যে তাহা নদীর জলধারাকে বাষ্পীভূত করিয়া তোলে, তাহার তপ্ত অশ্রুপ্লাবনে কঠিন শিলা পর্যন্ত দ্রবীভূত হইয়া যায়। তাহার দেহে প্রাণের লক্ষণমাত্র আছে, অন্যথায় ইহাকে মানসিক মৃত্যু বলা যায়। অর্থাৎ লোককবি লীলার এই উক্তির মধ্য দিয়া বলিতে চাহিতেছেন সমগ্র নদীর শীতল বারিও লীলার বিরহ জ্বালা প্রশমিত করিতে পারে না। তাহার চোখের জলে পাষাণ পর্যন্ত গলিয়া যায় কিন্তু নিষ্ঠুর কঙ্ক তাহার সন্ধান রাখে না। যাহার বিরহে নারী মৃত্যুর মুখে আসিয়া উপনীত তাহার জন্য সেই পুরুষ উদাসীন কেমন করিয়া থাকে ?

নিশীথে নিদ্রার···নিয়াছে রতন [চতুর্থ স্তবক]—ময়মনসিংহ গীতিকার লীলা-কঙ্ক গাথার অন্তর্গত লীলার বিলাপ নামক সার্থকনামা গীতিকাংশে লোককবি এই দুই আশ্চর্য চরণের মধ্য দিয়া অভাগিনী লীলার প্রেম ও প্রত্যাশাভঙ্গের দুরপনেয় বেদনা ব্যক্ত করিয়াছেন। কঙ্কের সহিত লীলার প্রণয় বাল্য হইতে অঙ্কুরিত হইয়া তাহার নবীন যৌবনে প্রস্ফুটিত মুকুলিত হইয়াছে, কিন্তু দৈববিড়ম্বনায় কঙ্কের গৃহত্যাগে ও পুনরায় ফিরিয়া না আসায় সেই প্রণয় অর্ধপথেই সমাপ্ত হইয়াছে। দীর্ঘকালের এই প্রেমে লীলা এ পর্যন্ত কোনো আঘাত পায় নাই। সহসা কঙ্কের অন্তর্ধানে তাহার সেই নিশ্চিত বিশ্বাসভঙ্গের বেদনা তীব্র হইয়া বাজিতেছে। অদৃষ্ট যেন তাহার অঞ্চলে গ্রন্থিবদ্ধ প্রেমিকটিকে দুর্লভ রত্ন মনে করিয়া তাহার নিশ্চিত নিদ্রার সুযোগে অপহরণ করিয়া লইয়াছে। প্রেম ও প্রেমিককে দরিদ্রের একমাত্র দুর্লভ রত্নসামগ্রীর সহিত এবং প্রেমিকের আকস্মিক অন্তর্ধানকে তস্কর-কর্তৃক রত্ন অপহরণের সহিত তুলনা এখানে একটি কাব্যশ্রী লাভ করিয়াছে। হৃতসম্পদ দরিদ্রের এই অসতর্কতাজনিত অনপনেয় খেদ ও সম্পত্তিলুপ্তির

চরম রিক্ততা লীলার প্রণয়ী-বঞ্চিত দুর্ভাগ্যের সহিত সুনিপুণভাবে উপমিত হইয়াছে।

প্রশ্ন ১। ময়মনসিংহ গীতিকার অন্তর্গত লীলার বিলাপ কারুণ্যে ও মানবিকতায় একটি উৎকৃষ্ট গীতি-কাব্য—আলোচনা কর।—[ভূমিকা ও আলোচনা দ্রষ্টব্য।]

প্রশ্ন ২। লীলার বিলাপ এই গীতিকাংশে লোকসাহিত্যের লক্ষণ কী পরিমাণে আছে নিরূপণ কর এবং কবিতাটির কাব্যসৌন্দর্য নির্ণয় কর।—[ভূমিকা ও আলোচনা দ্রষ্টব্য।]

প্রশ্ন ৩। 'লীলা যেন ভূলুণ্ঠিতা লতা। সে সরলতার খনি, প্রেমসরসীর একটি নিষ্কলঙ্ক পদ্ম। তাহার রূপটি পল্লীকবির সুগভীর আন্তরিক মমতায় মাখা'—লীলার বিলাপ কবিতা অবলম্বনে উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

ময়মনসিংহ গীতিকার অন্তর্গত লীলাকঙ্ক নামক যে পালাটি হইতে লীলার বিলাপ কবিতাটি গৃহীত হইয়াছে তাহা সৌন্দর্যে কবিত্বে ও ট্রাজিক আবেদনে সর্বকালের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। এই কাহিনীর নায়ক ব্রাহ্মণ-সন্তান কঙ্ক অল্পবয়সে পিতামাতৃহীন হইয়া চণ্ডাল দম্পতীর নিকট পালিত এবং পরে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত গর্গের আশ্রয়ে মানুষ হয় এবং গর্গের কন্যা লীলার সহিত আবাল্য স্নেহে-ক্রীড়ায় বর্ধিত হইয়া তরুণ বয়সে পরস্পর পরস্পরকে হৃদয় সমর্পণ করে। কিন্তু ইতিমধ্যে পীরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলে সমাজে কঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থিত হয় এবং কুপিত গর্গ তাহার কন্যার সহিত কঙ্কের প্রণয়সংবাদ গোচরীভূত হইয়া কঙ্কের প্রাণবধের সংকল্প করেন। তখন লীলার পরামর্শে কঙ্ক পলায়ন করে। তারপর দীর্ঘ অদর্শনে বিরহে লীলার জীবন শুষ্ক হইয়া গেল, তাহার ব্যাকুলতর বেদনা বাতাসে নিশ্বসিত এবং অশ্রু আকাশে গড়াইয়া পড়িল। ধীরে ধীরে ক্লান্ত ধৈর্যসমাপ্ত লীলা শেষনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। ইতিমধ্যে অনুতপ্ত গর্গ পুত্রবৎ পালিত কঙ্ককে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বৃথাই চেষ্টা করিতেছিলেন। কঙ্ক যখন প্রত্যাবর্তন করিয়াছে তখন লীলার কোমল শীর্ণদেহ চিতাগ্নিতে বিলীন হইতেছে। নিঃসঙ্গ কঙ্ক বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া তীর্থে চলিয়া গেল।

এই সাধারণ আতিশয্যবর্জিত নিত্যসম্ভব কাহিনী লীলার অরুণ প্রেম, করুণ আশাভঙ্গ ও তরুণ জীবনের আকস্মিক পরিসমাপ্তির বেদনায় উজ্জ্বল। লীলার বিলাপ কবিতাংশে লীলার সুকোমল জীবনের আর্তনাদ আমাদের অন্তর স্পর্শ করে। অভাগিনী লীলা প্রতীক্ষার চরম সীমায় উপনীতা হইয়াছে, তাহার ধৈর্য বাঁধ ভাঙিয়া প্লাবিত হইয়াছে। চেতন-অচেতনের জ্ঞানশূন্য হইয়া সে বিশ্বের সবকিছুর নিকট কাতরকণ্ঠে তাহার জীবন-যৌবনের একমাত্র অধিপতির সন্ধান প্রার্থনা করিয়াছে। যে সূর্য প্রাতঃসন্ধ্যা পৃথিবী পর্যটন করে, যে দূর আকাশের চন্দ্রতারকা নিশীথ রাত্রে তাহাদের অতন্দ্র ক্রীড়ার মৌনী সাক্ষী ছিল, যে নির্জীব তরুলতা তাহাদের প্রণয়োপবনের সহচর, যে নদী তাহাদের সকল কলরব-কৌতুকের পার্শ্বগামিনী ছিল, সকলের নিকট তাহার মিনতির শেষ নাই। কঙ্কের দীর্ঘ অদর্শনে তাহার পঞ্জর বিদীর্ণ হইয়াছে, তাহার সুকুমার তারুণ্যের দ্বারে মৃত্যুর অশুভ পদধ্বনি শোনা যাইতেছে। কেবল শেষ বিদায়ের পূর্বে তাহার দুঃখের ইতিহাস শুনিয়া যদি কঙ্ক কেবল তাহার দুইটি শ্রীচরণ লীলাকে দর্শন করাইতে আসে এই আকাঙ্ক্ষায় তাহার কাতর প্রার্থনা চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়াছে। এমন কি গৃহপালিত সারীশুককে পর্যন্ত সে মুক্তি দিয়াছে এই কম্পিত ব্যগ্র আশায় যদি তাহারা কঙ্কের পূর্বকৃত যত্ন স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতাবশত তাহার সন্ধান পায়।

লীলা একবারের জন্যও কঙ্ককে ভৎর্সনা করে নাই, তাহার বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতা ও নারীবধের অভিযোগ করে নাই। সে কেবল বারবার তাহার দৈববিড়ম্বিত জীবনের উল্লেখ করিয়াছে—

নিশীথে নিদ্রার ঘোরে ছিলাম অচেতন—
অঞ্চল খুলিয়া চোরে নিয়াছে রতন॥

তাহার এই সহিষ্ণুতা ও আত্মবিলাপ, প্রেমের দুঃখে মৃত্যুবরণের এই কঠিন তপস্যা আমাদের অশ্রুসজল করিয়া তোলে। তাহার সরলতা, গ্রাম্যজীবনের পটভূমিকায় নারীত্বের এই ত্যাগ ও পবিত্রতা শিষ্ট সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নারী-চরিত্রগুলির সহিতই তুলনীয়। এইজন্যই তাহাকে ভূলুণ্ঠিতা লতা বলা যায়। লতার মতই তরুণ ও অকলঙ্ক কিন্তু মুকুলিত হইবার পূর্বেই অচরিতার্থ আশা ও অতৃপ্ত সাধনা লইয়া অস্ফুট অবস্থায় সে বিদায় লইতে চলিয়াছে।

ময়মনসিংহ গীতিকার লোককবিগণ বিশ্বসাহিত্য পাঠ করেন নাই, প্রত্যক্ষদৃষ্ট সমাজ ও পারিপার্শ্বিক গার্হস্থ্য জীবনই ছিল তাহাদের আদর্শ। তাহারই মধ্যে বাস্তব কল্পনায় মিশ্রিত করিয়া তাহারা যে কয়টি আদর্শ নারী চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাদের প্রেম, পবিত্রতা, সাধ্বীত্ব, সহিষ্ণুতা ও ত্যাগের অবিশ্বাস্য মহিমা আমাদের বিস্মিত করে। মহুয়া, মলুয়া, লীলা, চন্দ্রাবতী এইরূপ চরিত্র। ইহারা কেহই জীবনে নারীত্বের পূর্ণ প্রাপ্তিতে মণ্ডিত হয় নাই, সকলেই অসমাপ্ত নদীর মত মরুভূমিতে হারাইয়া গিয়াছে, অর্ধস্ফুট ফুলের মত ঝরিয়া গিয়াছে, ছিন্নমূল লতার মত ভূলুণ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের প্রেমের জ্যোতি, ত্যাগের দীপ্তি, সহিষ্ণুতার মহিমা, সাহিত্যে শাশ্বত হইয়া আছে। লীলা তাহাদেরই মধ্যমণি।

হরিহোড়ের বৃত্তান্ত : ভারতচন্দ্র রায়

ভূমিকা

ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগসন্ধির আকাশে লগ্নবদলের নক্ষত্র। মঙ্গলকাব্যের ধারায় অন্নদামঙ্গল রচনা করিলেও ভারতচন্দ্রের কাব্যে মঙ্গলকাব্যের নাভিশ্বাস উঠিয়াছে। ইহার জীর্ণ আঙ্গিক ও দেবমাহাত্ম্য প্রচারের পূর্বতন অন্ধ বিশ্বাস এই কাব্যে এক শিথিল অন্তঃসারশূন্য ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

কবি-পরিচয়

এক বিচিত্র ঘটনাবহুল জীবনের অধিপতি ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতকের প্রথম দশকে আবির্ভূত এবং পলাশীর যুদ্ধে ভারতের রাহুগ্রস্ত স্বাধীনতাসূর্যের শেষ অস্তগমনের তিন বৎসর পর তিরোহিত হইয়াছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি থাকিয়াই ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল রচনা করেন। পাণ্ডিত্যে বহু ভাষাজ্ঞানে বৈদগ্ধ্যে রসিকতায় বুদ্ধিমুখ প্রতিভায় ভারতচন্দ্র আধুনিকপূর্ব যুগের চমকপ্রদতম ব্যক্তিত্ব। নবযুগের সূর্যোদয় তিনি প্রত্যক্ষ করেন নাই

কিন্তু প্রতিভার স্বাভাবিক ভবিষ্যগ্রাহিতায় তিনি ইহার ব্রাহ্মীমুহূর্তের গায়ত্রী-জপ করিয়াছেন। দেবতার অলৌকিক মহিমা ও মানুষের সন্ত্রস্ত মর্তজীবনে তাঁহার অবিশ্বাস্য আধিপত্য স্থাপনের বদলে দেবতার মানবসম্বন্ধ স্নিগ্ধশ্রী কল্যাণীয় রূপচিত্রায়ণে এবং প্রয়োজনমত প্রাক্তন অন্ধভক্তিবাদের অন্ত্যেষ্টি ঘোষণায় তাঁহার লেখনী কার্পণ্য করে নাই। ঝকঝকে বুদ্ধির শাণিত তরবারি, তাহাতে আবার কারুকার্য করা, মাঝে মাঝে মাণিক্যের কুচি সূর্যালোকে ঝলসাইয়া ওঠে, ইহাই ভারতচন্দ্রের কাব্যের যথার্থ রূপক। এক অন্তর্জলি সভ্যতার মুমূর্ষু মুহূর্তে দেশের চারিদিকে যে বিলাসিতা ও পঙ্কিলতার, অনিশ্চয় নৈরাশ্য ও ক্ষণস্থায়ী স্ফীতির আয়োজন চূড়ান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, ভারতচন্দ্র তাহারই তরঙ্গশীর্ষে বসিয়া যুগের রাগিণী ধ্বনিত করিয়াছেন। ভক্তির বদলে সংশয়, অলৌকিকতার বদলে স্বাভাবিকতা, আধ্যাত্মিকতার স্থানে ঐহিকতা, দেবতার বদলে মানুষ, ক্রন্দনের স্থলে কৌতুক ইহাই তাঁহার কাব্যের ধর্ম ছিল।

ভারতচন্দ্রের অভিনবত্ব

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের তিনটি খণ্ড, প্রথম খণ্ড শিবায়ন বা দেবীমঙ্গল, দ্বিতীয় খণ্ড কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান এবং তৃতীয় ভাগ মানসিংহ-প্রতাপাদিত্য-ভবানন্দ উপাখ্যান অর্থাৎ অন্নপূর্ণা-পূজা প্রচার-উপলক্ষে কবির পোষ্টা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বংশপ্রশস্তি।

কাব্যের বিভাগ

কাব্যের প্রথম খণ্ডে সতীর দেহত্যাগ, উমাজন্ম, শিবের সহিত বিবাহ ও দাম্পত্য জীবন, অন্নপূর্ণা-মূর্তিধারণ, কাশী-প্রতিষ্ঠার কাহিনী আছে। অন্নপূর্ণা জরতীবেশে ব্যাসকে ছলনা করিবার পর কুবেরের অনুচর বসুন্ধরের মাধ্যমে মর্তে আপন পূজা প্রচারের ব্যবস্থা করিলেন। গঙ্গার পশ্চিম ও গাঙ্গিনীর পূবতীরবর্তী বড়গাছি গ্রামের অধিবাসী দরিদ্র বিষ্ণুহোড়ের গৃহে দেবীর ইচ্ছায় কুবের অনুচর বসুন্ধর হরিহোড় পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিল। দেবীর কৃপায় ঘুঁটের ব্যবসায়ে হরিহোড় বিত্তশালী হইল এবং দেবী অবশেষে তাহার আবাস হইতে ঝাঁপি লইয়া গাঙ্গিনী পার হইয়া ব্রাহ্মণ রামের পুত্র ভবানন্দ মজুমদারকে অনুগ্রহ করিলেন।

হরিহোড়ের বৃত্তান্ত অংশের উৎস

হরিহোড়ের বৃত্তান্ত ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের একটি সামান্য অংশ এবং উহার প্রতিনিধিমূলক রচনাও নয়। তথাপি এই অংশের মধ্য দিয়াই ভারতচন্দ্রের মৌলিক কবিপ্রতিভার বিস্ময়কর চমৎকারিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। এই কাহিনীর পূর্বসূত্রটি নিম্নরূপ—

সম্পূর্ণ কাহিনী

কৈলাসেতে অন্নপূর্ণা শংকর লইয়া।
বিহারে রহিলা বড় সানন্দ হইয়া॥
জয়া বিজয়ারে কন সহাস বদনে।
নরলোকে মোর পূজা প্রকাশে কেমনে॥
কহিছে বিজয়া জয়া ভবিষ্যৎ বাণী।
কুবের তোমার পূজা করিবেন জানি॥
বসুন্ধর নামে তার আছে সহচর।
দিবেক পুষ্পের ভার তাহার উপর॥
রমণী সম্ভোগ তার কাননে হইবে।
সেই অপরাধে তুমি তারে শাপ দিবে॥
মনুষ্য হইবে সেই হরিহোড় নামে।
ধন বর দিবে তুমি গিয়া তার ধামে॥
তাহা হৈতে হইবেক পূজার সঞ্চার।
কুবেরের সুতে শাপ দিবা পুনর্বার॥
ব্রাহ্মণ হইবে সেই ভবানন্দ নামে।
হরিহোড়ে ছাড়ি তুমি যাবে তার ধামে॥
দিল্লি হৈতে রাজা দিয়া পূজা লবে তার।
তাহা হৈতে হইবেক পূজার প্রচার॥
তার বংশে হবে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়।
সংকটে তারিবে তুমি দেখা দিয়া তায়॥
তাহা হৈতে পূজার প্রচার হবে বড়।
হাসিয়া কহেন দেবী এই কথা দড়॥
কহিছে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।
হরিহোড় প্রসঙ্গ শুনহ ইতঃপর॥

কুবেরের অনুচর বসুন্ধর এবং তাহার পত্নী বসুন্ধরা কুবেরের পূজার পুষ্প চয়ন করে। একদা চৈত্র শুক্লাষ্টমীতে অন্নদার পূজার জন্য পুষ্প চয়ন করিবার জন্য বসুন্ধর কুঞ্জবনে উপনীত হইলে সেই ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদলশোভিনী বাগিচায় বসুন্ধরা উপচয়িত পুষ্পের দ্বারা দেবীর পূজার বদলে আপনার লীলাকৌতুকে উহা ব্যবহারের জন্য স্বামীকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিল। বসুন্ধরের নিষেধ সত্ত্বেও বসুন্ধরা দেবীর আরতির পুষ্পার্ঘ্যের দ্বারা দেহের রতির গুরুত্ব দানের ফলে বসুন্ধর অগত্যা সেইসকল সংগৃহীত ফুলে শয্যা পাতিল। ফলে পূজার ফল দেবতার চরণে না দিয়া মানুষের লীলা-সামগ্রী হইল। ইহাতে দেবী কুপিত হইলেন এবং বসুন্ধরকে মর্ত্যজীবনে অভিশপ্ত করিলেন। তখন ভস্মীভূত মদনের জন্য রতির বিলাপের মত বসুন্ধরার বিলাপে দেবীর দয়া উপজিত হইল। দেবী বলিলেন—

বসুন্ধরের পূর্বজীবন

হযে মোর ব্রতদাস মোর পূজা পরকাশ
মরতে ভুবনে কর গিয়া।
লোকে ব্রত পরবাসি পুন হবে স্বর্গবাসী
আমি সঙ্গে রব নিরন্তর॥
শুনি বসুন্ধর কয় ইহা যদি সত্য হয়
তবে মোর মরতে কি ভয়।
তব অনুগ্রহ যথা কৈলাস কৌশল তথা
চতুর্বর্গ সেইখানে হয়॥

অতঃপর তনুত্যাগ করিয়া বসুন্ধর-বসুন্ধরা বসুন্ধরা-অভিমুখে যাত্রা করিল, দেবী কৌতূহলবশত তাহাদের আগে আগে চলিলেন। এইখানে মৃন্ময় পৃথিবীর প্রতি, জন্মভূমির প্রতি, ভারতচন্দ্রের যে অপূর্ব মমতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা প্রাগাধুনিক বাঙলা সাহিত্যে তুলনারহিত। স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা মর্তে নশ্বর অথচ দুঃখসুখঝঙ্কৃত মধুর পার্থিব জীবন যাপন করিতে আসেন—

মর্তজন্ম

কর্মভূমি ভূমণ্ডল ত্রিভুবনে সার।
কর্মহেতু জন্ম লৈতে আশা দেবতার॥
সপ্তদ্বীপ মাঝে ধন্য ধন্য জম্বুদ্বীপ।
তাহাতে ভারতবর্ষ ধর্মের প্রদীপ॥

ভারতচন্দ্রের পৃথ্বীচেতনা

তাহে ধন্য গৌড় যাহে ধর্মের বিধান।
সাধ করি যে দেশে গঙ্গার অধিষ্ঠান॥
দেশ:চেতনা বাঙ্গলায় ধন্য পরগণা বাগুয়ান।
" তাহে বড়গাছি গ্রাম গ্রামের প্রধান॥
পশ্চিমে আপনি গঙ্গা পূর্বেতে গাঙ্গিনী।
সেই গ্রামে উত্তরিলা অন্নদা তারিণী॥

সেই গ্রামের সর্বাপেক্ষা দুঃখীর গৃহে বসুন্ধর পুত্র-রূপে জন্মগ্রহণ করিবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া গ্রামের দীনতম ব্যক্তিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন অন্নপূর্ণা। তখন পদ্মিনী নাম্নী এক শীর্ণকায়া দুঃখিনীর সাক্ষাৎ পাইলেন—

অন্নবিনা কলেবরে অস্থিচর্মসার।
গেঁয়ে লোক দিয়াছে পদ্মিনী নাম তার॥
আয়তের চিহ্ন হাতে লোহা একগাছি।
মুখগন্ধে পদ্মিনীর সদা উড়ে মাছি॥

সেই সর্বপরিত্যক্ত শীর্ণাস্থি রমণীর স্বামী বিষ্ণুহোড় ঘুঁটে বিক্রয় করিয়া খায়, গ্রামের লোক ইহাদের বাতাস পর্যন্ত এড়াইয়া চলে। ভুবনমনোমোহিনী এই 'সবার অধম দীনের হতে দীনে'র কুটিরেই তাহার আসন পাতিলেন, তাহাকে বর দিলেন, তাহার শতচ্ছিদ্র ভগ্নকুটিরে কুবেরানুচর হরিহোড় রূপে ভূমিষ্ঠ হইল।

ভাবার্থ

দুর্ভাগ্যগ্রস্ত পিতামাতার আনন্দের কারণ হইয়া ভূমিষ্ঠ হইবার পর যথা-সময়ে হরিহোড়ের জাতসংস্কার, ষষ্ঠীপূজা, অন্নপ্রাশন হইল ও ক্রমে শৈশব হইতে প্রাপ্তবয়স্কে পরিণত হইল, পিতার উপজীবিকাই সে গ্রহণ করিল। বনে ঘুঁটে সংগ্রহ করিয়া সে পিতামাতার ভরণপোষণ করে। একদা জয়া-বিজয়ার সহিত কৌতূহলে ভ্রমণকালে সিংহবিমানবাহিনী অন্নপূর্ণা হরিহোড়কে দেখিতে পাইয়া পূর্বকথা স্মরণ করিয়া তাহার নিকট বৃদ্ধার বেশে আবির্ভূত হইলেন এবং অরণ্যের সকল কাঠখড়-ঘুঁটে আপনি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া দিলেন। সেইদিন হরিহোড় কিছুই জোগাড় করিতে না পারিয়া রোরুদ্যমান চোখে অন্ধকার দেখিল। তখন

পদবিশ্লেষণ

বৃদ্ধাবেশিনী দেবী তাঁহার সঞ্চিত ঘুঁটেগুলি বহন করিয়া বৃদ্ধার গৃহে বহিয়া লইতে হরিহোড়কে অনুরোধ করিলেন এবং পারিশ্রমিক বাবদ তাহার অর্ধাংশ দিবার প্রস্তাব করিলেন। কুব্জদেহা বৃদ্ধা আগে আগে চলিলেন, হরিহোড় ঘুঁটের ঝুড়ি লইয়া তাঁহার অনুগামী হইলে, পথে হরিহোড়ের গৃহ পড়িতে বৃদ্ধা সেইখানে বিশ্রামের জন্য আশ্রয় লইলেন। ইহাতে হরিহোড় বিপন্নবোধ করিল, কারণ তাহার জীর্ণ সংকীর্ণ কুটিরে বৃদ্ধ পিতামাতার সহিত চতুর্থ ব্যক্তির স্থান সংকুলান হয় না। একজন অতিথিকে অন্নদানের সংস্থানও তাহার নাই। বিপন্ন হরিহোড়ের অসহায় অবস্থা দেখিয়া দেবী অচিরে তাহার দুঃখ-মোচনের বরদান করিলেন।

আলোচনা

অন্নদামঙ্গল কাব্য নামে মঙ্গলকাব্য হইলেও এই কাব্যে পূর্ববর্তী মঙ্গল-কাব্যের মত পূজাপ্রত্যাশী দেবতার সহিত অনিচ্ছুক মানুষের ঔদ্ধত্যজনিত সংগ্রামের কাহিনী নাই। দেবতা এখানে চণ্ডী নন, তিনি বরপ্রদায়িনী অন্নপূর্ণা, সাধারণ মানুষের মৃৎকুটিরে অসহায় ভগ্ন গৃহভিত্তির উপর তাঁহার হৈম আসনখানি পাতিয়াছেন। স্বভাবতই হরিহোড়ের কাহিনীর সহিত মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কালকেতুর গৃহে দেবীর আগমনের কথা স্মরণে আসে। কিন্তু মুকুন্দরামের চণ্ডী মঙ্গলকাব্যেরই দেবী। তিনি কালকেতুর গৃহে ছদ্মবেশে আসিয়াছেন কিন্তু সেখানে তাঁহার সৌন্দর্যময়ী রূপ, ভারতচন্দ্রের কাব্যে তাঁহার জরতী রূপ। বিশ্বপালিনী অন্নপূর্ণার এই কুব্জপৃষ্ঠ ভগ্নমেরু চলৎশক্তিহীন বৃদ্ধারূপ অঙ্কন করার মধ্যেই পূর্ববর্তী মঙ্গলকাব্যের তুলনায় ভারতচন্দ্রের আধুনিকতার লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়াছে। কবি ইচ্ছা করিলে দেবীর সম্মুখে পদ্মিনীর অর্থাৎ হরিহোড়ের দুর্ভাগিনী জননীর একটি ফেনায়িত বারমাসীর অবতারণা করিতে পারিতেন, কিন্তু এই জীর্ণ গতানুগতিক আঙ্গিকও সযত্নে পরিহার করিয়াছেন। মুকুন্দরামের গৃহে দেবী তাঁহার দশপ্রহরণধারিণী জ্যোতির্ময়ী রূপ সংবরণ করিলেও, নবযৌবনপ্রদীপ্ত অনিন্দ্যসুন্দর তনুদেহের অপার্থিব লাবণ্যে কালকেতুর পত্রাচ্ছাদিত পতনোন্মুখ গৃহ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাও বেশিক্ষণের জন্য নয়, কালকেতু-ফুল্লরার প্রতীতি

মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র

চণ্ডী ও অন্নপূর্ণা

উৎপাদনের জন্য দেবী তাহাদের সম্মুখে তাঁহার স্বর্ণমণ্ডিত দশভুজা রূপখানিই উন্মোচিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতচন্দ্রের দেবী তাঁহার ঘুঁটে-কুড়ানী জরতী রূপটিকে অলৌকিক মহিমায় সামান্যক্ষণের জন্য রূপান্তরিত করিয়াছিলেন মাত্র। কালকেতুকে দেবী বহুমূল্য হীরক অঙ্গুরী এবং সপ্তকুম্ভ মোহর দান করিয়াছিলেন। এখানে দেবী হরিহোড়ের গৃহে আসন পাতিয়াছেন, তাহার সংকুলানহীন গৃহে অন্নগ্রহণ করিয়াছেন, তারপর তাঁহার অপরিসীম মমতায় ও পরিত্যাজ্য ঘুঁটে সোনার ঘুঁটেতে পরিণত হইয়াছে। ঈশ্বরী পাটনীর সেঁউতিতে চরণ রাখিবার পর তাহার কাষ্ঠ-সেঁউতিও এইরূপ স্বর্ণাভ হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা অলৌকিকতা নয়, অলৌকিকতার প্রত্যয় মাত্র। বিশ্বজননী কল্যাণীমূর্তিতে যদি আমাদের পাণ্ডুর ভগ্নভবনে পদার্পণ করেন, তবে সেই অভাবনীয় বিস্ময়ে আমাদের দৈন্যের মেঘপুঞ্জের প্রান্তে সৌভাগ্যের স্বর্ণরেখা দেখা দেয়, ইহাই এই সকল অলৌকিকতার যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা।

দেবীর আচরণে বাস্তবধর্মিতা

বাস্তবতা, কৌতুক-পরিহাস, স্বচ্ছন্দ বাণী-বিগ্রহ রচনা, সাবলীল চরিত্র-অঙ্কন অলৌকিকতার বদলে যুক্তিবাদ, ভক্তির স্থানে স্বাভাবিকতা-সৃষ্টি ভারতচন্দ্রের কাব্যের এই মূল স্বভাব হরিহোড়ের বৃত্তান্ত অংশেও অভাব নাই। জগজ্জননীর দৃষ্টি এখানে মর্ত্যের দীনতমের কুটিরে নিপতিত হইয়াছে, বিশ্বত্রাতার আশীর্বাদ লাভ করিবার একমাত্র যোগ্যতা যাহার দারিদ্র্যের চরম অবস্থা। মর্ত্যাবতীর্ণ দেবী যে ভূমিশায়ী নিরন্নের পর্ণকুটিরের জন্যই লালায়িত, এই দৃষ্টি গতানুগতিক মঙ্গলকাব্যের কবির পক্ষে সম্ভব নয়। ইহা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিরই ফলশ্রুতি। কালকেতুর ব্যাধজীবনেও দুঃখের প্রতুলতা ছিল কিন্তু তাহাকে ভক্ত শ্রেণীভুক্ত করার পশ্চাতে দেবতার ইতিহাসের একটি গূঢ়তর অভিপ্রায় ছিল। পুরাগত উক্ত কাহিনীর দ্বারা দেবী যে আরণ্যক পশুসমাজের অধিষ্ঠাত্রী ছিলেন তাহারই সামাজিক ইঙ্গিত নিহিত। সুতরাং কালকেতুকে নায়করূপে নির্বাচন করা মুকুন্দরামের মৌলিক কল্পনা নয়। কিন্তু হরিহোড়কে দেবীর কৃপাপাত্র করার পশ্চাতে ভারতচন্দ্রের স্বকপোলকল্পিত উদ্‌ভাবনী শক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। কালকেতু বৃত্তিতে নিষাধ হইলেও তাহার

দারিদ্র্যের চরম রূপ

ভারতচন্দ্রের মৌলিকতা

জীবিকা ও বৃত্তির জন্য সামগ্রিক সমাজে সে কৃপাপাত্র ছিল না। এখানে হরিহোড় সমাজের কৃপাপাত্র, উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে তাহার বাস। তাহার মাতা রূপেগুণে পদ্মগন্ধা বলিয়া পদ্মিনী নয়, বস্ত্রাভাবে পদ্মপত্র পরিধান-হেতু পদ্মিনী, তাহার ধুলিধূসর দেহে রুক্ষকেশে বাস্তব দারিদ্র্যের একটি করুণ প্রলেপ আছে, যাহা রাজসভার কবিকেও আকর্ষণ করিয়াছে, ইহাই বিস্ময়ের। তাহার মুখে মক্ষিকা উড়িয়া আসে, মধুকর নয়। তাহা ছাড়া—

ভারতচন্দ্রের চরিত্রচিত্র

বাহাত্তরে কায়স্থ বলিয়া গালি আছে।
বসিতে না পাই ভাল কায়স্থের কাছে॥
এমন দুখিনী আমি আমারে কে ডাকে।
সুখী লোক আমার বাতাসে নাহি থাকে॥

জীবন সম্পর্কে এই মোহমুক্ত বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিকেই আধুনিকতার লক্ষণ বলা যায়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবীর মায়ায় অরণ্য কুয়াশাঘন হইয়াছিল বলিয়া কালকেতু সেদিন শিকার পায় নাই, ইহাও প্রাক্তন মঙ্গল-কাব্যের দৈবীমায়ার এক চিরাচরিত পদ্ধতি। কিন্তু এখানে দেবী স্বয়ং অরণ্যের ঘুঁটে খড় কাঠ সংগ্রহ করিয়া স্তূপীকৃত করিয়া রাখিলেন, বিশ্বকল্যাণীকে ঘুঁটে-কুড়ানী করার এই অভিনব পরিকল্পনাই ভারতচন্দ্রের যুগোচিত আধুনিকতা। পতিব্রতা ফুল্লরার গৃহে কালকেতুর পত্নীত্বের দাবী লইয়া চণ্ডীদেবীর উপস্থিতির মধ্যে যে অস্বস্তিকর বৈপরীত্য আছে, হরিহোড়ের নিকট মাতামহী-বয়সী বৃদ্ধাসাজে দেবী যেন সেই পূর্বতন বৈপরীত্যের সংশোধন করিয়াছেন। সপত্নীত্বের অধিকারের বদলে ঘুঁটের অধিকার লইয়া স্বার্থপর হরিহোড়ের সহিত এক জরতীর কৌতুকপূর্ণ বিরোধ অবাস্তবতার বিন্দুমাত্র সংশয় লইয়া আমাদের বিভ্রান্ত করে না, বরং ইহার পরিহাসদীপ্ত বাস্তবতা ভারতচন্দ্রের সবল লেখনীর অভ্রান্ত স্বাক্ষররূপে আমাদের বিস্মিত ও পরিতৃপ্ত করে। দাম্পত্য জীবনের পূর্ণ কর্তৃত্ব হস্তান্তরিত হওয়ার জন্যই ফুল্লরার দুর্ভাবনা ছিল, কিন্তু হরিহোড়ের নিরুপায়তা তদপেক্ষা যুক্তিসংগত বলিয়া মনে হয়—

চণ্ডীর দৈবী মায়া ও অন্নপূর্ণার যুক্তিপূর্ণ আচরণ

অতিথি আপনি হবে উপোসী কেমনে রবে
অন্নের সংযোগ মোর নাই।

হেন ভাগ্য নাহি ধরি অতিথি সেবন করি
এই বেলা দেখ আর ঠাঁই ॥
এই দেখ বৃদ্ধ বাপ অন্ন বিনা পান তাপ
বৃদ্ধ মাতা বিনা অন্নে মরে।
গেল চারিপ'র দিন অন্ন বিনা আমি ক্ষীণ
যমযোগ্য অতিথি এ ঘরে ॥

ইহা পবিত্র অতিথি-সৎকারের কর্তব্যভ্রষ্টতার বিলাপ মাত্র নয়, ভয়াবহ দারিদ্র্যের শাপে মৃতকল্প মানুষ এখানে ছদ্মবেশী দেবতাকে যমযোগ্য অতিথি বলিয়া সম্বর্ধনা করিয়াছে, এই দুঃসাহস ভারতচন্দ্র ব্যতীত অন্য কোন্ কবি পাইতে পারেন?

মঙ্গলকাব্যের শেষ কবি

বস্তুত ভারতচন্দ্রের হাতেই মঙ্গলকাব্য সমাপ্ত হইয়াছে। ভারতচন্দ্র যেন রীতিমত শঙ্খধ্বনি হরিসংকীর্তন শোভাযাত্রা এবং প্রভূত বিলাসিতার সহিত মঙ্গলকাব্যকে তাহার চিতাশয্যায় শায়িত করিয়া দিয়াছেন। এখন বৃদ্ধা পিতামহীর অলক্তরাগরঞ্জিত চরণচিহ্নটি সযত্নে সঞ্চয় মাত্র! অন্নপূর্ণা এখন মধ্যবিত্তের গৃহপ্রতীক ঝাঁপি লইয়া গঙ্গাপার হইয়া পশ্চিম বঙ্গের গ্রামে লোকালয়ে পরিভ্রমণ করিতেছেন। অচিরকালের মধ্যেই তিনি শাক্ত-পদাবলীর স্নেহঘন মাতৃমূর্তি ও শারদ প্রভাতের উমায় রূপান্তরিত হইবেন। ভক্তিলোভাতুরা প্রতিহিংসা-পরায়ণা মঙ্গলকাব্যের দেবীকে আর্দ্র হৃদয়োত্তাপে গলাইয়া অষ্টাদশ শতকের কবিবৃন্দ তাঁহাকে প্রসন্নময়ী, করুণারূপিণী, দয়ারূপেন সংস্থিতা, আনন্দময়ী করিয়া তুলিয়াছেন। ভারতচন্দ্রে তাহারই সূচনা। হরিহোড়ের

ভারতচন্দ্রের অন্নপূর্ণা অন্নদা

নিকট অবির্ভূতা দেবীর এই পরিচয়কেই সমগ্র অন্নদামঙ্গল কাব্যে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের কাব্যে ঈশ্বরী পাটনীর সেই সুপরিচিত প্রার্থনা, আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাত এবং হরিহোড়ের আক্ষেপ—

এই দেখ বৃদ্ধ বাপ অন্ন বিনা পান তাপ
বৃদ্ধ মাতা অন্ন বিনা মরে

একই উৎস হইতে নির্গলিত। বিপন্ন মধ্যবিত্তের ক্ষুধা মিটাইতেই যেন এই যুগে চণ্ডীর অবতার, ইহাই সম্ভবত ভারতচন্দ্রের অবচেতন বিশ্বাস ছিল। তাঁহার কাব্যের নামকরণে, অন্নপূর্ণামঙ্গল অন্নদামঙ্গল এই শব্দগুলিতে, কি তাহারই ব্যঞ্জনা পাওয়া যায় না? ঠিক একই সময় রামপ্রসাদও প্রসাদী মাধুর্যে গান ধরিয়াছেন,

অন্ন দে গো অন্ন দে গো, অন্নদে।

পরবর্তীকালের উপর ভারতচন্দ্রের প্রভাব

উনবিংশ শতাব্দীর আধুনিকতায় প্রাচীন সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সহিত পরিচয়, ইংরাজি শিক্ষা, নবযুগের বিদ্রোহী চেতনা বাঙালীকে অতীত হইতে একেবারে বিশ্বের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করিল। কাব্যে-সাহিত্যে-উপন্যাসে-নাটকে বাঙলা সাহিত্যে যুগান্তরের সূচনা হইলেও উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে ভারতচন্দ্রের প্রভাব ছিল বিস্ময়কর। এমন কি, মধুসূদনের মত প্রতীচ্যমুখী কবিও 'কৃষ্ণ নগরের সেই লোকটাকে' স্মৃতি হইতে মুছিতে পারেন নাই। অতি-আধুনিক যুগেও প্রমথ চৌধুরীর মত বুদ্ধিজীবী কবি স্বীকার করিয়াছেন, ভারতচন্দ্র ফরাসী দেশে জন্মগ্রহণ করিলে বদলেয়ার হইতে পারিতেন। এইখানেই ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব। মধুসূদন অন্নদামঙ্গল কাব্যের নায়ক ভবানন্দকে উপলক্ষ করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বাঙলা দেশেরই অন্তর্গূঢ় বাণী—

তব বংশ যশোঝাঁপি—অন্নদামঙ্গল—
যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে,
রাখে যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডলে।

[অন্নপূর্ণার ঝাঁপি—চতুর্দশপদী কবিতাবলী]

রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ

প্রথম স্তবক। অন্নদার··হইল—কুবেরানুচর বসুন্ধর ও তাঁহার স্ত্রী বসুন্ধরা প্রভু কুবেরের অন্নদা পূজার নিমিত্ত সংগৃহীত পূজাকুসুমগুলিকে আপনার লীলাকৌতুকে ব্যবহার করার জন্য অন্নদার দ্বারা মর্তলোকে দেহ-ধারণের অভিশাপ পাইয়াছিল [ভূমিকা দ্রষ্টব্য]—

অন্নপূর্ণা ক্রোধমনে শাপ দিল দুইজনে
যেমন করিলি দুরাচার।

মরত ভুবনে যাও মনুষ্য শরীর পাও
ভারতের এই যুক্তি সার ॥

মনুষ্য-শরীর-ধারণের সম্ভাব্য যন্ত্রণার কথা চিন্তা করিয়া বসুন্ধর বিলাপ করিলে অন্নদা অভয় দিয়া বলেন—

হয়ে মোর ব্রতদাস মোর পূজা পরকাশ
মরত ভুবনে গিয়া কর।
লোকে ব্রত পরকাশি পুন হবে স্বর্গবাসী
আমি সঙ্গে বর নিরন্তর ॥

এইজন্য কবি হরিহোড় নামধারী বসুন্ধরকে অন্নদার দাস বলিয়াছেন। হরিহোড়ের মাধ্যমেই অন্নদা মর্তে তাহা পূজা প্রচার করিয়াছিলেন। **দেখিয়া বাড়িল**—হরিহোড়ের পিতার নাম বিষ্ণুহোড় এবং মাতার নাম পদ্মিনী। তাহারা দীর্ঘকাল অপুত্রক ছিল, পদ্মিনীকে দর্শন দিয়া দেবী তাহাকে পুত্রবর দান করিয়াছিলেন। হরিহোড়ের জন্ম তাই তাহাদের নিকট অসীম আনন্দের কারণ হইল। এই পুত্র-জন্মের বিবরণ দিয়াছেন কবি পূর্ব পরিচ্ছেদে—

ক্রুত হয়ে বসুন্ধর ধরে বসুন্ধরা ॥
পুত্র দেখি সুখ বাখিবাবে নাহি ঠাই।
ধরি তোলে তাপ দেয় হেন জন নাই ॥
আপনি দিলেন হুলু নাড়ীচ্ছেদ করি।
দুঃখেতে স্মরিয়া হরি নাম দিলা হরি ॥

ষষ্ঠীপূজা…বাপ-মায়ে—পুত্র-জন্মের পর হরিহোড়ের নামে ষষ্ঠীপূজা, অন্নপ্রাশন যথাসময়ে সম্পন্ন হইল এবং হরিহোড় শৈশব অতিক্রম করিয়া যৌবনে উপনীত হইল। দারিদ্র্যের সংসারে দুঃখবিঘ্ন বহন করিয়া হরিহোড় পিতার জীবিকা গ্রহণ করিল। বনেজঙ্গলে কাঠ-ঘুঁটে সংগ্রহ করিয়া সেইগুলি বিক্রয় করা এবং তাহার দ্বারা পিতামাতার ভরণ-পোষণ করাই তাহার কাজ। লক্ষ্য করিবার বিষয়, ভারতচন্দ্র হরিহোড়ের জন্ম হইতে যৌবন পর্যন্ত কালের বর্ণনা এক চরণেই সমাপ্ত করিয়াছেন। মুকুন্দরাম কালকেতুর জন্মের পর তাহার ষষ্ঠীপূজা নামকরণ অন্নপ্রাশন বাল্যক্রীড়ার বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন।

আধুনিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন কবি মূল কাহিনীর পক্ষে অনাবশ্যক বোধে তাহা বর্জন করিয়াছেন। **একদিন…দেখিতে**—এখানেও পূর্ববর্তী মঙ্গলকাব্যের তুলনায় অন্নদামঙ্গলের মৌলিকত্ব প্রকট। এখানে হরিহোড অন্নদার দাস হইয়া ভূমিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও অন্নদা তাহার কথা বিস্মৃত হইয়াছেন, সিংহবাহিনী হইয়া আকাশমার্গে জয়াবিজয়া এই দুই সখীর সহিত কৌতুহলবশত ভ্রমণ করিতে করিতে হরিহোডকে দেখিতে পাইলেন। **মায়া করি হইলেন বুড়ী**—পূর্ববর্তী মঙ্গলকাব্যে দেবীরা প্রয়োজনে নানা বেশ ধারণ করিতেন, তন্মধ্যে তরুণীবেশই প্রধান। কিন্তু ভারতচন্দ্রের অন্নদা পুনঃপুন বৃদ্ধাবেশ ধারণ করিযাছেন। প্রৌঢবয়স্কা যষ্ঠিধারিণী বলিরেখায়িত জরতীমূর্তি আঁকিতে ভারতচন্দ্রের জুড়ি নাই। এই বেশেই অন্নদা ব্যাসকে ছলনা করিয়াছিলেন আবার এই বেশেই তিনি হরিহোডের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। ব্যাসের নিকট তাঁহার মূর্তিটি এইরূপ—

মায়া করি মহামায়া হইলেন বুড়ী।
ডানি করে ভাঙা লড়ি বাম কক্ষে ঝুড়ি ॥
ঝাকড মাকড চুল নাহি আঁদি সাঁদি।
হাত দিলে ধুলা উড়ে যেন কেয়াকাঁদি ॥…
বাতে বাঁকা সর্বঅঙ্গ পিঠে কুঁজভার।
অন্ন বিনা অন্নদার অস্থিচর্মসার ॥
শত গাঁটি ছিঁড়া টেনা করি পরিধান।
ব্যাসের নিকটে গিয়া কৈলা অধিষ্ঠান ॥
ফেলিয়া ঝুপড়ি লড়ি আহা উহু কয়ে।
জানু ধরি বসিলা বিরসমুখী হয়ে ॥

জড়াইয়া—অর্থাৎ একত্রে জোগাড় করিয়া। **হরি হরি স্মরে হরি**—বিপদে হরিহোড় পুনঃপুন হরি অর্থাৎ ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিল। **বুড়ী মজাইল দহে**—অতল জলে ডুবাইল অর্থাৎ আজ সমূহ বিপদ উপস্থিত করিল। **অনুপায়**—উপায়হীনতা। **কোথা হৈতে…আমার**—বনের কাঠ-ঘুঁটে সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করাই হরিহোডের জীবিকা, কিন্তু ইহাতে এই প্রথম তাহার জীবিকায় প্রতিযোগিনীর আবির্ভাব ঘটিল বলিয়া হরিহোড়ের সর্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। **কাড়ি…দেখি পার**—শক্তিহীনা বৃদ্ধার

নিকট হইতে বলপূর্বক কাঠ-ঘুঁটে কাড়িয়া লওয়া যায়, কিন্তু অবস্থাদৈন্যে হরিহোড় বিবেকশূন্য হয় নাই, তাই সবলে তাহার প্রার্থিত বস্তু হরণ করিলে বৃদ্ধা যে অভিসম্পাত দিবে ইহা চিন্তা করিয়া সে অনুরূপ পাপকার্য হইতে ক্ষান্ত হইল ; সুতরাং নিরুপায় অনাথের আর্তনাদ ব্যতীত তাহার আব কী করিবার আছে !

দ্বিতীয় স্তবক। বৃদ্ধ পিতা…কিবা ফল—একদিন বনে কাঠ-ঘুঁটে সংগ্রহ করিতে না পাবিলে হরিহোড়ের দুর্দশার শেষ নাই, কাবণ বৃদ্ধ পিতামাতা অন্নাভাবে থাকিবে। এইজন্য তাহার আক্ষেপের শেষ নাই, তাহাব সমগ্র জীবনের উপর অনুতাপ জন্মাইল এবং আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিল। ইহাতে কোনো ছলনা বা ভাণ নাই। **ছল করি লাগিলা কহিতে**—দেবী হরিহোড়ের অসহায় বিপন্ন অবস্থা অনুভব করিলেন এবং মনোভাব গোপন করিয়া তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন। **কাঠ-ঘুঁটে…মোরে লয়ে**—দেবী কৌশলে হরিহোড়কে সাহায্য করিবার জন্য তাহার সংগৃহীত দ্রব্যগুলি তাহার দূরস্থিত ঘরে পৌছাইয়া দিতে অনুরোধ কবিলেন এবং ইহার বদলে তাহার দ্রব্যাদির অর্ধাংশ হরিহোড়কে প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। **হরিহোড়…ঘুঁটে ঝুড়ি**—বৃদ্ধার উৎপাত না ঘটিলে এসকল ঘুঁটে-কাঠ হরিহোড়েরই অধিকারভুক্ত হইত, এখন ইহা বহন করিলে অন্তত অর্ধাংশ লাভ হইবে, ইহা চিন্তা করিয়া হরিহোড় সত্বর ঐগুলি মাথায় তুলিয়া লইল। **বাতে কুঁজে…বুড়ী**—হরিহোড় ঝুড়ি মাথায় তুলিলে বৃদ্ধা বাতগ্রস্ত কুব্জ দেহে কোনোক্রমে যষ্ঠি-সম্বল করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। **সাঁঝ হৈলা সেইখানে যেতে**—বৃদ্ধা এতই চলৎশক্তিহীনা যে অল্পদূর যাইতে যাইতেই সন্ধ্যা আসিয়া পড়িল, নিকটে হরিহোড়ের গৃহে তিনি অবস্থান করিলেন। ইহা দেবীর ইচ্ছাতেই ঘটিয়াছে। **রেতে**—রাত্রিতে।

তৃতীয় স্তবক। কহিলা মধুর স্বরে—বৃদ্ধার ছলনার মধ্য দিয়া তাহার মঙ্গলময়ী দেবীর রূপটিকে ভারতচন্দ্র ভুলিতে দেন নাই। তাই তাঁহার কণ্ঠস্বরে মাধুর্য ঝরিয়া পড়িতেছে। **কহিলা…তোর ঘরে**—ঘটনাচক্রে জরৎকায়া বৃদ্ধা অশক্ত হইয়াই যেন আর চলিতে না পারিয়া এবং রাত্রি আসায় হরিহোড়ের গৃহে আশ্রয় লইতেছেন, কিন্তু ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত : হরিহোড়ের মাধ্যমেই তিনি পূজা প্রচার করিবেন, তাহার গৃহেই তিনি তাই আসন

পাতিলেন। **হরি বলে এ হবে কেমনে**—সাময়িক বিশ্রামের জন্য আসিয়া রাত্রিবাসের কথায় হরিহোড় রীতিমত বিপন্ন বোধ করিতেছে। **ভাঙা কুঁড়ে …চারিজনে**—রাত্রির জন্য হরিহোড়ের গৃহে আশ্রয় প্রার্থনা করায় দেবীকে হরিহোড় অসহায়ভাবে জানাইল যে তাহার পত্রাচ্ছাদিত ভগ্ন কুটিরে বৃদ্ধ পিতামাতার সহিত সে বাস করে কিন্তু ইহার জীর্ণ সংকীর্ণতা আগন্তুক চতুর্থ ব্যক্তির স্থান-সংকুলানের পক্ষে বাধাস্বরূপ। **অতিথি··ঠাঁই**—কেবল স্থান-সংকুলানই হরিহোডের সমস্যা নয়, অতিথি-সংকারের সংগতিও তাহার নাই। তাহার নিদারুণ অন্নাভাব অতিথিকে পরিতুষ্ট করিবার পক্ষে বিঘ্ন বিরূপ। সুতবাং নিরুপায় দুঃখে হরিহোড অতিথিব প্রতি কর্তব্য-পালনের অক্ষমতা জ্ঞাপন করিতেছে। ভারতচন্দ্রের কাব্যে সাধারণ মানুষের এই অন্নকষ্ট সমকালীন সমাজের বাস্তবচেতনারই ফলস্বরূপ। অথচ প্রাচীন যুগের মানবিক আদর্শ অতিথি-সংকার করা তখনও মানুষের বিবেক হইতে দূরীভূত হয় নাই। বিবেক ও কর্তব্যের সহিত অবস্থাদৈন্যের সংকট হবিহোডকে অসহায অবস্থায় উপনীত করিয়াছে, তাহার দুর্ভাগ্যের করুণ চিত্র উদ্‌ঘাটিত কবিয়াছে। তাই হরিহোড় সবিনয়ে আতিথ্যপ্রার্থিনী বৃদ্ধাকে অন্যত্র আশ্রয় লইতে অনুরোধ করিতেছে। অতিথিকে উপবাসী রাখিয়া অধর্মাচরণের ইচ্ছা তাহার নাই। **এই দেখ···এ ঘরে**—অন্নদা ছদ্মবেশে হরিহোডের গৃহে উপস্থিত। বিশ্বের অন্নপালন যাঁহার কর্তব্য, ভারতচন্দ্র যেন তাঁহাকেই সম্মুখে রাখিয়া হরিহোডের কণ্ঠ হইতে সাধারণ মানুষের অন্নকষ্টের ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন। চণ্ডীর নিকট ফুল্লরা কেবল অন্নের নয়, বস্ত্র, বাসস্থান, দিন-যাপনের বহুতর ক্লেশের বিবরণ দিয়াছিল। এখানে দ্রষ্টব্য হরিহোডের তথা অষ্টাদশ শতকীয় নিম্নবিত্তের একমাত্র অভাব অন্নের। দেবীকে তাই অন্নদা অন্নপূর্ণা-রূপেই ভারতচন্দ্র অঙ্কন করিয়াছেন। ঈশ্বরী পাটনীও তাই দেবীর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল, আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে। **চারি প'র দিন**—প্রভাতে ঘুঁটে-কাঠ সংগ্রহ করিতে বাহির হওয়া, বৃদ্ধার সহিত সাক্ষাৎ ও গৃহে আগমন ইহাতেই সন্ধ্যা আসিয়া গেল, কিন্তু ইতিমধ্যে হরিহোড়ের আহার জোটে নাই। চারি প্রহর অর্থে সারা দিনকে বুঝানো হইতেছে। **যমযোগ্য অতিথি এ ঘরে**—অতিথি দেবতুল্য। কিন্তু যাহার অন্নসংস্থানের উপায় নাই তাহার নিকট যমের মতই ভয়াবহ অর্থাৎ বরণযোগ্য নয়, বিতাড়নযোগ্য। ইহা

হরিহোড়ের অবস্থা-বিপাকের মর্মভেদী মন্তব্য। **আরে বাছা না ভাবিহ দুখ**—হরিহোড়ের দুর্গতি স্বচক্ষে দেখিয়া দেবী তাঁহাকে অভয় দান করিয়া দুঃখ মোচনের ইঙ্গিত দিলেন। মুকুন্দরামের কাব্যেও ফুল্লরার বিলাপ শুনিয়া দেবী বলিয়াছিলেন—

আজি হৈতে মোর ধনে আছে তোর অংশ।

কালকেতুকে বলিয়াছিলেন—

খণ্ডাব তোমার দুঃখ আইনু তার হেতু।

ভারত…সুখ—ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্যচরিত্র হরিহোড়কে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছেন, স্বয়ং অন্নদায়িনী যাহার গৃহে আসন পাতিয়াছেন তাঁহার দৈন্য অচিরে তিরোহিত হইবে এবং হরিহোড় ইহার পর সুখসন্দর্শন করিবে।

ব্যাখ্যা

কাড়ি নিলে…দেখি পার—[রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]

এই দেখ…অতিথি এ ঘরে—[রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]

প্রশ্ন ১। মঙ্গলকাব্যের কবি হইলেও ভারতচন্দ্রের রচনায় আধুনিকতার লক্ষণ সুস্পষ্ট, হরিহোড়ের বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া আলোচনা কর।

—[ভূমিকা ও আলোচনা দ্রষ্টব্য]।

প্রশ্ন ২। 'ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে চণ্ডীর এক নূতন রূপ চোখে পড়ে—ইনি দুর্গতিনাশিনী অন্নপূর্ণা, দরিদ্রের অন্নদানই তাঁহার লক্ষ্য—হরিহোড়ের বৃত্তান্তও কাহিনীতে দেবীর এই নূতন রূপ দেখা যায়'। আলোচনা কর।

—[ভূমিকা ও রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]।

প্রসাদী : রামপ্রসাদ সেন

ভূমিকা

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙলা দেশ দুর্ভাগ্যের তমসায় আচ্ছন্ন। একদিকে মুঘল শাসনের শিথিলতা দেশের প্রান্তভাগে তাহার অবিসংবাদিত প্রভুত্ব ও প্রতাপ বিস্তারে ব্যর্থ হইয়াছে, স্থানীয় ভূস্বামী ও আঞ্চলিক শাসনকর্তাদের দোর্দণ্ড অত্যাচার বৃদ্ধি পাইয়াছে; অন্যদিকে ইংরাজ ও অন্যান্য বিদেশী বণিকদের আনাগোনা ও প্রভুত্ব স্থাপনে দেশের ভবিষ্যৎ ভাগ্যাকাশ মেঘমেদুর হইয়া উঠিয়াছে। ইহার সহিত বর্গির অত্যাচার, মন্বন্তর, স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় শাসনের যুগপৎ প্রজাপীড়ন—সব মিলিয়া সাধারণ মানুষের লাঞ্ছনার আর সীমা ছিল না। কৃষ্ণনগরের রাজসভায় তখন বিলাসের পঙ্কিলস্রোত, সহসা-অর্থস্ফীত অনুগ্রহভাজন বিত্তবানদের গৃহে বিলাসিতা ও আড়ম্বরের রাজকীয় সমারোহ, অন্যদিকে সাধারণ মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ মানুষের জীবনে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য ও অসন্তোষ, কালের দিগন্তে এই বৈপরীত্য ঘনাইয়া উঠিতেছিল। সাহিত্য ও সংস্কৃতি দূষিত জাতীয় জীবনে সুস্থসম্পদে বর্ধিত হইতে পারে না। অষ্টাদশ শতকে তাই পূর্বতন কাব্য-সাহিত্যের ধারা ক্ষীয়মাণ হইয়া আসিতেছিল। মঙ্গলকাব্যের শক্তিদেবতার প্রতি মানুষের বিশ্বাস শিথিল হইয়া উঠিয়াছে, ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল কাব্যে তাহার পরিচয় দিয়াছেন। দেবতার নিকট ঐহিক মানুষের রাজসিক ঐশ্বর্যপ্রাপ্তির আশা তিরোহিত হইয়াছে। এখন জীবনের সর্বাত্মক নৈরাশ্য-অসহায়তায় মানুষ তাহার ইষ্টদেবতার নিকট কেবল ভক্তিপ্রার্থনা করিয়াছে। এ ভক্তি কেবল পারলৌকিক মুমুক্ষাবশতঃ নয়, ইহলোকের সংকট মোচনের জন্য দুর্বল আত্মশক্তিহীন মানুষের পরমপ্রিয়ের নামে স্থিরবিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়ের ভক্তি। এই ভক্তির স্বর্ণসূত্রেই রামপ্রসাদের পদাবলী বাঁধা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙলা দেশ

একদিকে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল অন্যদিকে রামপ্রসাদের প্রসাদী সংগীত, অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যে এই দুই বিস্ময়। ভারতচন্দ্রের কাব্যে নাগরিক

জীবনের ভ্রষ্টাচার, উহার রুচিহীন বিলাসিতা, কদর্য জীবনাদর্শ, সুলভ দৈহিক-চেতনা, ক্লিষ্ট শব্দ ও ধ্বনিস্পন্দপ্রীতি দেবতার শিলমোহর লইয়া উপস্থিত। আর রামপ্রসাদ কোনো রাজসভা অথবা রাজন্যবর্গের কৌতুকসরস দৃষ্টির সহিত নিঃসম্পর্কিত আত্মমগ্ন চেতনায় এক পরম বৈরাগ্য ও মধুর জীবনাসক্তির যৌগপদ্যে এক অপার্থিব গীতি-কবিতা সৃষ্টি করিয়াছেন। রামপ্রসাদ অষ্টাদশ শতকের তৃতীয় দশকে জন্মগ্রহণ করেন এবং সমকালীন কৃষ্ণনগরাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বারা ভারতচন্দ্রের মতই অনুগৃহীত হন। যুগের অশিষ্ট রুচিপ্রভাবেই হোক অথবা প্রথাগত কাব্যের আদর্শ অনুসরণের অভ্রান্ত তাড়নাতেই হোক রামপ্রসাদও ভারতচন্দ্রের মত বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু নাগরিক জীবনের উৎকট আদি-রসপ্রীতি তাঁহার কবিধর্মকে চূড়ান্তভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবার পূর্বেই সাধক রামপ্রসাদ তাঁহার একমুখী গীতিসাধনা আত্মমগ্ন মাতৃউপাসনা ও মানবর্বৃত্তি-প্রধান আধ্যাত্মিকতার একটি নিজস্ব ক্ষেত্র আবিষ্কার করিয়া লন। তাঁহার জীবন কর্মমুখর বা বৈচিত্র্যবিস্তৃত নয়, সম্ভবত গার্হস্থ্য জীবনে তিনি মোটামুটি অবিচলিতই ছিলেন। অসংখ্য সংগীত-রচনাতেই তাঁহার খ্যাতি। এইগুলি শ্যামাসংগীত ও উমাসংগীত নামেই পরিচিত। মাতা ও সন্তানের মধুর বাৎসল্য ও স্নেহার্দ্র ভক্তি-সম্পর্ক স্থাপনে এবং গোষ্ঠিনিরপেক্ষ ব্যক্তিতান্ত্রিক মাতৃআরাধনায়, সর্বোপরি এক স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত নিজস্ব সুর-সৃষ্টিতে তিনি সমগ্র বাঙলাদেশকে চিরকালের মত বিমোহিত করিয়াছেন। তাঁহার সংগীত, মাতৃনাম-সম্বোধনের সুললিত কারুণ্য ও ব্যাকুল কাতরতা ধনীর প্রাসাদ হইতে দুঃখীজনের পর্ণকুটীরে, অবকাশ হইতে কর্মসংগ্রামে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণের আরাম ও আত্মার আনন্দ হইয়াছে, তাই তিনি বাঙলার অন্যতম জাতীয় কবি। এইগুলি স্বতঃস্ফূর্ত পুষ্পের মত যেন আপনি-অঙ্কুরিত, বিশ্বজননীর চরণে নিবেদিত। এইজন্যই এইগুলি রামপ্রসাদী নয়, কেবল প্রসাদী নামেই পরিচিত। মাতৃপূজার পুণ্য ও পবিত্র পুষ্পের মত এইগুলি আমাদের শ্রদ্ধার সামগ্রী। রামপ্রসাদ পদের ভণিতায়ও প্রসাদ শব্দটি ব্যবহার করিতেন। এই দুইয়ে মিলিয়া রামপ্রসাদের সংগীতগুলির প্রসাদী নাম সার্থক-প্রযুক্ত।

কবি-পরিচয়

প্রসাদী নামকরণের ব্যাখ্যা

অষ্টাদশ শতাব্দীর সৃষ্টি এই শাক্ত সংগীগুলি শক্তি উপাসনার গীতিরূপ

হইলেও এই সকল পদমধ্যবর্তিনী কালিকা ঠিক মঙ্গলকাব্যের শক্তিদেবী নন ; শক্তিগীতের কালী অষ্টাদশ শতকেরই যুগমাতা। ইনি একই সঙ্গে ভীতিরূপিণী ও ভীতিহরা, অন্নপূর্ণা ও করাল-বদনা, সুবর্ণমণ্ডিতা দশভুজা ও শ্মশানচারিণী রক্তকৃপাণ-ধারিণী, ভক্ত-বৎসলা ও রুদ্রাণী, হরমনোমোহিনী ও অশিববিনাশী, এক কথায় বৈপরীত্যের বিগ্রহ, উৎকেন্দ্রিক যুগজীবনের অধিষ্ঠাত্রী। হয়ত আঠারো শতকের সমকালীন সমাজের বিষম অসংগতি ও বিভ্রান্ত বিশ্বাস কবিদের চেতোদর্পণে এমন এক দেবীর কল্পনা প্রতিবিম্বিত করিয়াছে যিনি এই ত্রস্ত সময়ের বিরোধাভাসকে, বিপন্নকালের আত্মসংকটকে আপনার বিচিত্র প্রতিমায় রূপান্বিত করিতে পারেন। সমগ্র শতাব্দীর আলোকলুপ্ত আশাহীন নীরন্ধ্র অন্ধকারই এই সকল পদে শ্মশানের চিত্রকল্পে পরিবর্তিত হইয়াছে, মহাকালের ভয়াবহ নিষ্ঠুরতাই মহাকালীর চরণে বিনত হইয়া আপনার মুক্তি অন্বেষণ করিয়াছে। শাক্ত পদকর্তাগণ ঐতিহাসিক বিচারে সকলেই সরস্বতীর বাণীবিদ্ধ সাধক ছিলেন না ইহাও লক্ষণীয়। রামপ্রসাদ, রঘুনাথ রায়, হরু ঠাকুর, রাম বসু (শেষোক্ত কবিবৃন্দ অন্যান্য পদও লিখিয়াছেন) ব্যতীত অন্যান্য কবিরা ছিলেন প্রায় সকলেই বিষয়কর্মব্রতী জমিদার, রাজা-মহারাজা, দেওয়ান-নবাব, বণিক বা সংসারী। অথচ শাক্তপদাবলীর বিষয়বস্তু এই নশ্বর সংসারের অনিত্যতা, হীরামুক্তা মাণিক্যের ইন্দ্রজালচ্ছটার প্রতি বৈরাগ্য, জীবন-যৌবনের দ্রুত বিলীয়মান পরিণতি, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষয়িষ্ণুতা, সৌভাগ্যের অতর্কিত বিনাশাশঙ্কা। তাহারই বিকল্পে এই সকল পদকর্তা কালিকার স্থির নিশ্চিত অচঞ্চল পদসৌন্দর্য, অপার্থিব সম্পদ প্রার্থনা করিয়াছেন। হয়ত ব্যক্তিগত জীবনের অশান্তি, পারিবারিক জীবনের অসন্তোষ, বৈষয়িক জীবনের ভঙ্গুরতাকে রোধ করার চূড়ান্ত ব্যর্থতাই তাঁহাদের এমন কোনো দেবতার চরণোপান্তে উপনীত করিয়াছেন, যিনি জীবনের দুর্ভাগ্য ও ট্রাজেডিরই প্রতীক। কালীর মূর্তি পরিকল্পনার মধ্যে জীবনের সেই অসহায় আর্তি ও আতঙ্কই প্রতিফলিত হইয়াছে। সংসার জীবনের নৈরাশ্য-পীড়িত কবি যেন শেষপর্যন্ত জগজ্জননীর স্নেহলাভের

কালী অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগজীবনের প্রতীক

বৈপরীত্যের অধিদেবী

শাক্ত কবিদের স্বরূপ

শাক্ত পদে জীবনের আর্তি ও আতঙ্কের বিকল্প প্রার্থনা

ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, স্থাবর সম্পদ রক্ষার চরম ব্যর্থতাই যেন মাতৃচরণের অপার্থিব সম্পদকে জোর করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। জীবনের বৈপরীত্যই যে অষ্টাদশ শতকীয় শ্যামা-সংগীতের মূল প্রেরণা তাহার প্রমাণ এই পদাংশে—

ওমা কারে করেছ রাজ্যেশ্বর মা অতুল ধনের অধিকারী।
কারে করেছ পথের কাঙাল মুষ্টিমেয় অন্নের ভিখারী॥
কেউবা সুখে কাটায় নিশি পুষ্প-শয্যায় শয়ন করি
কেউবা গাছের তলায় তৃণ-শয্যায় দুঃখে কাটায় মা বিভাবরী,
সকলি তোমার খেলা বুঝেও বুঝিনে॥

শাক্তপদাবলীর শ্রেষ্ঠ কবি সাধক রামপ্রসাদ শক্তি-উপাসনাকে শাস্ত্রানুমোদিত আচারপরায়ণতা ও তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে সাধারণ মানুষের কর্মব্যস্তপীড়িত জীবনের সহজিয়া মাতৃ-ব্যাকুলতা ও সংস্কারহীন ভক্তিতে পরিণত করিয়াছিলেন। মঙ্গলকাব্যের দেবী ভক্তের নিকট মাতৃমহিমাতেই বিরাজিত ছিলেন কিন্তু মানুষের সহিত তাহার অকারণ ক্রোধ ও অবারণ প্রতিযোগিতা তাঁহাকে সন্তানের কাতর বৎসলতায় বন্দী করিতে পারে নাই। তাঁহার চকিত রোষ ও ভাগ্য-পরিবর্তনের আকস্মিক অভীপ্সার জন্যই সাধারণ মানুষের জীবন হইতে তিনি দূরাবস্থানকারিণী। রামপ্রসাদ অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া অনাগত কালের সমুদ্র-কল্লোল শুনিতে পাইয়াছিলেন, তাই দেবতাও মানুষের সহিত ব্যক্তি-তান্ত্রিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছেন, গোষ্ঠী মানুষের সম্পর্ক নয়। 'মা আমায় ঘুরাবি কত', বাঙলা গীতিকবিতার ইহাই প্রথম অস্ফুট উষারাগ, এই প্রথম কবি-কণ্ঠ আপনার সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ নিঃসঙ্গ ব্যক্তিত্বকে দেবতার সমীপে স্থাপন করিল। রামপ্রসাদ তন্ত্রসিদ্ধ সাধক ছিলেন এবং তাঁহার সংগীতাবলী তাঁহার অন্তর্জীবনের সাধনা সিদ্ধি বিশ্বাস ও ভক্তিবাদের প্রচারগীতি হইলেও ভক্তি-সম্পর্কিত এক লোকায়ত মানবতাবাদের জন্যই বাঙলাদেশে তাঁহার জনপ্রিয়তা দুই শতকের অধিককাল ধরিয়া দৃঢ়মূল হইয়াছে। অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত গোত্রহীন ভক্তির তিনি এক নূতন সুর প্রবর্তন করিয়াছিলেন, এক নূতন কবি-ভাষা রচনা করিয়া-

রামপ্রসাদের সহজিয়া সাধনা

দেবতার মানবীকরণ

প্রসাদের নূতন সুর ও কবি-ভাষা

ছিলেন। একটি অকপট আত্মউদ্ঘাটন, একটি পরিপূর্ণ বিশ্বাস, সহজ জন-জীবনেব নিত্যদৃষ্ট পদার্থ বস্তু বা ঘটনার উপমার মধ্য দিয়া জীবনের জটিলগভীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দানেও তিনি ভক্তিগীতিব এক নূতন সৃষ্টি ঘটাইয়াছেন।

ভাবার্থ

[**প্রথমপদ**] সাধক কবি রামপ্রসাদ সাংসারিক চিন্তাভবনা দূরীভূত করিয়া কালীনামে ধ্যান-সমাহিত হইবার জন্য অন্তরাত্মার নিকট আহ্বান জানাইতেছেন। বাহ্যাডম্বরে মাতৃপূজা অহংকাবেরই নামান্তর, সুতরাং মাতৃপূজা সংগোপনে পালন কবিতে হইবে। ধাতু পাষাণ বা মৃৎপ্রতিমার বদলে মনোময় প্রতিমা হৃদি-পদ্মাসনে স্থাপন কবিয়া, নৈবেদ্য ও ভোগোপকরণের বদলে ভক্তিসুধার অঞ্জলিতে, আলোকসজ্জার বদলে হৃদয়ের অনির্বাণ জ্যোতিতে মাতৃপূজা সাধন করিতে হইবে। জীবমেধের প্রয়োজন নাই, বরং দেবীব নিকট এই সুযোগে আমাদের ষড়্রিপু বলিদান করা যাইতে পারে. ঢাকঢোলেব বাদ্যসমারোহ অপেক্ষা হৃদয়ের উল্লসিত কালীনামই ভক্তকে যথার্থ মাতৃপূজাব অধিকারী কবিবে।

বিষয়-সংক্ষেপ

[**চতুর্থপদ**] প্রচলিত শাস্ত্র-সম্মত তীর্থ-গমন ও মানুষের যুক্তি-সংস্কারকে বিদ্রূপ করিয়া রামপ্রসাদ বলিষ্ঠকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন, শ্যামাজননীব চরণতল কোটিতীর্থনিকষ বলিয়া গয়াগঙ্গা বারাণসী সেই চরণেই অবস্থান করে, কাশী-গমনের প্রয়োজন সমাহিত আনন্দতন্ময় সাধক অনুভব করেন না। তীর্থ-গমনের দ্বারা মানুষ তাহার পাপ নিরাকৃত করিতে চায় কিন্তু কেবল মাতৃনামোচ্চারণেই সকল পাপ স্খলিত হইয়া অগ্নিতে তূলার মত ভস্মীভূত হইয়া যায়। গয়ায় পিণ্ডদান করিলে পিতৃঋণ হইতে মুক্তি ঘটে এই ধরণের বিশ্বাস কবির কাছে হাস্যকর, কারণ কালীর ধ্যান করিলেই মুক্তি ঘটে। ভক্তিই মুক্তির আধার। কাশীতে মরিলেই মুক্তি ঘটিবে এমন কোনো কথা নাই। কবি মুমুক্ষু নন, কারণ জলের সহিত জল মিশিয়া গেলে মাতাব প্রসাদ পাইবার আনন্দ নাই। তিনি চিনির সহিত না মিশিয়া চিনি আস্বাদ করিতে ভালবাসেন। কবিরঞ্জন কৌতুকচ্ছলে বলিতেছেন, এলোকেশী সেই জগজ্জননীকে ধ্যান করিতে পারিলেই ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ সবই করতলগত হয়, সাধনা তীর্থ মন্ত্রের প্রয়োজন হয় না।

বিষয়-সংক্ষেপ

আলোচনা

'মন তোর এত ভাবনা কেনে' এবং 'আর কাজ কি আমার কাশী' পদ দুইটি রামপ্রসাদের লোকায়ত ধর্মবিশ্বাস ও সাধনপদ্ধতির পরিচায়ক। রামপ্রসাদ তান্ত্রিক ছিলেন এবং তন্ত্রে সাধক ও সাধনার স্তরভেদ শ্রেণীভেদ নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। পূজাচার-সাধনা সাধারণ ও সাধকভেদে যেমন স্থূল ও সূক্ষ্ম, তেমনি সাধনার ক্ষেত্রেও ক্রমে ক্রমে একাধিক স্তর অতিক্রম করিতে হয়। সাধারণ জৈব প্রবৃত্তির অধীন মানুষ শান্তভাবে সাধনা করে, জৈবিক প্রবৃত্তির তাড়না যাহারা জয় করিয়াছে তাহারা বীরভাবে সাধনা করে। সর্বোচ্চ স্তরের সাধনাকে বলা হয় দিব্যভাবের সাধনা। দিব্যভাবে আচারানুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপ তুচ্ছ হইয়া যায়। এই সম্পর্কে জনৈক বিশেষজ্ঞের অভিমত—

শক্তি সাধনার স্তরভেদ

"দিব্যভাবের সাধনা বাধাবন্ধহীন নিয়ম ও ক্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। পরম জ্ঞানের অবস্থা বলিয়াই দিব্যসাধকের ক্রিয়া ও চর্যা ভাবানুগ; জ্ঞানলোকে উদ্ভাসিত। কাশী-কাঞ্চী-প্রয়াগে তাহার তীর্থস্নানের প্রয়োজন হয় না, ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্নার ত্রিবেণীসংগমে আনন্দ-স্নান করিয়া তিনি পরমা শান্তি লাভ করেন, গৃহও তাঁহার নিকট বন্ধনাগার নয়; তাঁহার হৃদয় মাতৃঅনুরাগের গৈরিকে রঞ্জিত, কাজেই বহির্বাস গৈরিক না হইলেও ক্ষতি নাই। ক্রিয়াকর্ম সব কিছুই তাঁহার সহজ। পদ্মপত্রস্থিত শুভ্র শিশিরবিন্দুর মত তাঁহার সংসারে অবস্থান। সে অবস্থান নিরাসক্ত, উদার অথচ প্রেমে পূর্ণ। শক্তিপূজার স্থূল উপকরণেও তাঁহার প্রয়োজন নাই, আধ্যাত্মিক পঞ্চ ম-কার তত্ত্বে তিনি মায়ের আরাধনা করেন। তাঁহার দীক্ষা 'মনোদীক্ষা', তাঁহার পূজা 'মানসপূজা', তাঁহার যাগ 'অন্তর্যাগ', তাঁহার যোগ 'কুণ্ডলিনী-যোগ'। দিব্য-সাধকের দিব্য-আয়োজন, দিব্যপূজা সিদ্ধিও দিব্যসিদ্ধি।

দিব্যভাবের সাধনা

মনোদীক্ষা ও মানসপূজা

[শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী—শাক্তপদাবলী ও শক্তি সাধনা]

তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতির স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপ এবং প্রণালীভেদে ইহা সহজেই অনুমেয় যে, রামপ্রসাদ দিব্যভাবের সাধনাতেই অভিনিবিষ্ট হইয়াছিলেন।' আলোচ্য গীতদ্বয়ের প্রথমটিতে অনাড়ম্বরপূর্ণ অর্চনার বিরুদ্ধে মানস-পূজা এবং দ্বিতীয়টিতে শাস্ত্রীয়

সূক্ষ্ম উপাসনা

তীর্থের বিকল্পে চরণতীর্থের প্রতি কবির অবিচল আনুগত্য ঘোষণা করা হইয়াছে। রামপ্রসাদের পদে পৌত্তলিক উপাসনা অপেক্ষা সাত্ত্বিকভাবের নিরাকার ভজনের প্রাধান্য দেখা যায়। হয়ত তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতির ঊর্ধ্বতর স্তরের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ই এই জাতীয় চেতনার উদ্বোধক, কিন্তু আমাদের মনে হয়, পৌত্তলিকতা-বিরোধী নিরাকার-ভজনা, অহৈতুকী ভক্তি, সহজিয়া আধ্যাত্মিক চেতনা, প্রতিমাপূজা-যাগযজ্ঞবিরোধিতা, শাস্ত্র ও তীর্থবিরোধিতার লোকায়ত মনোভঙ্গি সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের যুগধর্মের ফল। কেবল শক্তিসাধনায় নয়, বৈষ্ণব ধর্মের সহজিয়া শাখায়, আউল-বাউল-দরবেশি সংগীতে, কর্তাভজা-সাঁই-মুর্শিদ সম্প্রদায়ের সাধনায় সর্বত্রই এই একই মনোভাব দেখিতে পাওয়া যায়। হয়ত প্রচলিত পূজা ব্যবস্থার আড়ম্বর সমারোহের মধ্যে ভক্তিহীন প্রদর্শনবাদের প্রতি ইহারা ধীরে ধীরে বিরূপ হইয়া পড়িতেছিলেন। রামপ্রসাদ তাঁহার জীবদ্দশায় জমিদার-ভূস্বামী রাজা মহারাজা দেওয়ানদের জাঁকজমকপূর্ণ পূজার যে অর্থব্যয় ও ঐশ্বর্যসমারোহ দেখিয়াছিলেন স্বাভাবিক-ভাবেই তাহার ভক্তিরসার্দ্র মন তাহাতে বিমুখ হইয়াছিল। বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্মের বাহ্যিক ধর্মবিরোধিতা অপনোদিত হইয়া এই সময় হইতেই ধর্ম-চেতনায় একটি সমন্বয়ধর্মী সহিষ্ণুতার ভাব দেখা যাইতেছিল। রামপ্রসাদ শ্যাম ও শ্যামা, বৃন্দাবন আর কৈলাস, বাঁশী ও অসি, শোণিত সাগর ও যমুনা বারিকে অদ্বৈত দৃষ্টিতে দেখিবার প্রেরণা অনুভব করিয়াছিলেন। অন্তঃসারশূন্য সমাজের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়াইয়া বিত্তবানদের কপট ভক্তিবাদ ও হীরামুক্তা-মাণিক্যের ইন্দ্রধনুচ্ছটা তাঁহাকে বিমুখ করিয়াছিল বলিয়া তিনিই সর্বপ্রথম শ্যামজননীকে ধনীর প্রমোদগৃহ হইতে ভক্তের রিক্তধন হৃদয়ে মনোদীক্ষার মন্ত্রে ও হৃদর্চনার নৈবেদ্যে বরণ করিয়াছেন। অথচ তান্ত্রিক সাধক হিসাবে তিনি ইহাতে অশাস্ত্রীয় কিছুই করেন নাই। পাতঞ্জল যোগসূত্রে আছে 'যথাভি-মতধ্যানদ্বা', 'যথা অভিমত ও রুচি তদনুযায়ী ধ্যান কর্তব্য। প্রতিমা-উপাসনার দ্বারা মন নিবিষ্ট হইলে বাহিরের অবলম্বনের

পৌত্তলিকতা-বিরুদ্ধতা ও তীর্থদ্রোহিতা

সমকালীন লোকায়ত ধর্ম

অসাম্প্রদায়িক সমন্বয় বোধ

সমকালীন পূজার বাহ্যাড়ম্বর

রামপ্রসাদ কি অশাস্ত্রীয় ?

প্রয়োজন হয় না, তখন প্রতীকোপাসনা প্রতিমা-উপাসনার বদলে সাধকের হৃন্মন্দিরে অনুভূত হয়—

ওরে শত শত সত্য বেদ তারা আমার নিরাকারা।

বাউলদের কণ্ঠে অনুরূপ উপলব্ধি

সহজাচারী বাউলের কণ্ঠেও ইহার প্রতিধ্বনি শোনা যায়—

তন্ত্রমন্ত্র বেদ পুরাণে ঘুরায় কেবল নানা টানে
যোগে যাগে তীর্থস্নানে সহজ মানুষ ধবে হারাই।

রামপ্রসাদের একাধিক পদে এই সহজ সাধনার ইঙ্গিত আছে। 'ভাবের বিষয়' মাতৃতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

ষড়্‌দর্শনে দর্শন পেলেম না আগম নিগম তন্ত্রসারে।
সে যে ভক্তি রসের রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে পুরে॥

রামপ্রসাদের অনুরূপ পদ

প্রথাগত উপাসনার ও পৌত্তলিক পূজা-উপচারের বিরুদ্ধে তাঁহার শাস্ত্রবিদ্রোহ অপরূপ বলিষ্ঠতায় বর্ণিত হইয়াছে এই পদে—

মন তোমার এই ভ্রম গেল না।
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলে না॥
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি জেনে ও কি তাই জান না?
মাটির মূর্তি গড়িয়ে মন করতে চাও তাঁর উপাসনা॥
জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা দিয়ে কত রত্নসোনা,
ওরে কোন লাজে সাজাতে চাস তাঁয় দিয়ে ছার ডাকের গহনা?
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা সুমধুর খাদ্য নানা,
কোন লাজে খাওয়াতে চাস তাঁয় আলোচাল আর বুট-ভিজানা?
জগৎকে পালিছেন যে মা সাদরে তাই জান না।
ওরে কেমনে দিতে চাস বলি মেষ মহিষ আর ছাগল ছানা?
প্রসাদ বলে, ভক্তিমন্ত্র কেবল রে তাঁর উপাসনা।
তুমি লোক দেখানো করবে পূজা
মা তো আমার ঘুষ খাবে না॥

আলোচ্য পদে বাহ্যিক আড়ম্বরসর্বস্ব পূজার বিরুদ্ধে রামপ্রসাদের ক্রোধ অকপট তীব্রতায় প্রকাশিত হইয়াছে আর 'মন তোর এত ভাবনা কেনে' পদে ইহারই বিকল্পে একটি মানসিক পূজার ব্যবস্থা নিরূপিত হইয়াছে। তন্ত্রে

পূজার মন্ত্র যাগযজ্ঞ হোমজপ মুদ্রামণ্ডলী প্রভৃতি সাংকেতিক ব্যবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। লোকায়ত বাউলদের মত রামপ্রসাদ একেবারে পূজার বিরুদ্ধতাই করেন নাই, কিন্তু এই সকল মুদ্রামন্ত্রেরও ইঙ্গিত দিয়াছেন, কিন্তু সংকেতিক পদ্ধতিতে। তাই এই পূজার নাম মানসপূজা। বাহ্যপূজা অপেক্ষা মানসপূজার ফল বহুগুণ বেশি, ইহাও তান্ত্রিক সাধকগণ বিশ্বাস করেন। তান্ত্রিকগণ দেহকে বিশেষ মূল্য দিয়া থাকেন তাঁহাদের সকল সাধনা এই দেহের মধ্যেই, শিবের সহিত শক্তির মিলন দেহেই সাধিত হয়। তাই দৈহিক সাধনা প্রাণায়াম মন্ত্রশুদ্ধি এইগুলি তাঁহাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁহারা বলেন ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিরূপ হইল দেহ। তাই দেহের মধ্যেই পূজার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

মানসপূজার উপকরণ

শাক্তধর্মে দেহের মূল্য

অষ্টাদশ শতাব্দীর শক্তি-উপাসনায় এই লোকায়ত পূজাবিরোধী মনোভাব এবং রামপ্রসাদ প্রমুখ কবিদের শাস্ত্রবিরোধিতা সম্পর্কে জনৈক সমালোচকের আলোচনা উদ্ধৃত হইল—

"শক্তি-সাধনায় পূজা শব্দটির তাত্ত্বিক ব্যুৎপত্তি আছে। পূজার্চনা, হোমজপ, মুদ্রামণ্ডলের সূক্ষ্ম নির্দেশে তন্ত্রশাস্ত্র ভারাক্রান্ত। ঐশ্বর্য যে দেবতার ভূষণ, সম্পদ যাঁর চরণের ধূলিতে বিচ্ছুরিত," তাঁর উপাসনায় তাই উপচারের প্রচুরতা। ইতিহাসের সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙলা দেশে শক্তিপূজার সঙ্গে আনুষ্ঠানিক উৎসবের সমারোহ ও উপচার-বহুলতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিলীয়মান সাম্রাজ্যের অস্তরাগচ্ছটার স্থায়িত্বের জন্য অভিজাত জমিদারদের ব্যাকুলতার অন্ত ছিল না। শক্তি উপাসনার মধ্য দিয়ে ঐহিক-সম্পদ-লোলুপ মানুষ তাই বিত্তবৈভব কামনা করেছে হীরা মুক্তা-মাণিক্যের উপহারে মৃন্ময়ী দেবীকে সজ্জিত করেছে। কিন্তু রামপ্রসাদ কমলাকান্ত প্রমুখ সাধকগণ এই উপচারসর্বস্ব আড়ম্বরবহুল প্রদর্শনবাদী উপাসনার বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁদের আধ্যাত্মিক বিশ্বাস ও অনুভূতি মধ্যবিত্ত জীবনের সংস্কার ও সমাজ-চৈতন্য থেকে উদ্ভূত হয়েছিল বলে তাঁদের ধর্মবোধ কিছুটা পরিমাণে লোকায়ত। তাই প্রথাবদ্ধ আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াপদ্ধতি, যাগযজ্ঞাদি, পৌত্তলিক অন্ধ আচারধর্মিতাকে তাঁরা সংস্কারমুক্ত

অষ্টাদশ শতকের ঐশ্বর্যপূর্ণ শক্তিপূজা

লোকায়ত ধর্মবোধ

মনে বর্জন করার শিক্ষা অর্জন করেছিলেন।...শাক্ত পদাবলীর কায়সাধনা, দেহতত্ত্ব, শাস্ত্রগত পূজার বদলে মানসিক ভক্তিসর্বস্ব পূজার নৈষ্ঠিক বিধান, প্রচলিত পৌরাণিক তীর্থদ্রোহিতা, শাস্ত্রীয় মন্ত্রোচ্চারণের বদলে নামমাহাত্ম্য ঘোষণা এসবই ধর্মের এক সহজিয়া রূপ। এই রূপ পৌরাণিক ধর্ম থেকে আপন প্রেরণা লাভ করেনি, করেছে একটি শিথিলতন্ত্রী যুগবীণার উদ্‌ভ্রান্ত বিদ্রোহ-সংগীত থেকে, প্রেরণা পেয়েছে সহচর লোকায়ত ধর্মবোধগুলি থেকে।"

[অরুণকুমার বসু—শক্তিগীতি পদাবলী]

এই ধরণের পদ শাক্ত-পদাবলীতে একাধিক রচিত হইয়াছে। হরিনাথ মজুমদার নামক জনৈক বাউলাদর্শের কবি লিখিয়াছেন—

কয়েকজন কবির অনুরূপ পদ

শ্যামাপূজা কালীপূজা শক্তিপূজা কথার কথা নয়।...
কেবল ডাকের গযনায় ঢাকের বাজনায় শক্তিপূজা হয় না।
এক মনো-বিল্বদল ভক্তি-গঙ্গাজল শতদল দিলে হয় সাধনা॥

রামকুমার পত্রনবিশের একটি পদাংশ এইরূপ মানসোপচারের ব্যবস্থাপত্র-সংবলিত—

হৃৎ-কমল মঞ্চাসনে বসায়ে শ্যামা মায়েরে
প্রেমানন্দে পদারবিন্দে পূজ মানসোপচারে॥
কাম ক্রোধ বলিদান (দেও) জ্ঞান অসি করে ধরে।
সেইরূপ আছে তন্ত্র রসনা করহ যন্ত্র
কালীর নাম মহামন্ত্র জপ দৃঢ় করে।

প্রচলিত তীর্থবিশ্বাস ও মুক্তিমাহাত্ম্যের বিরুদ্ধেও অনুরূপ পদের ঐতিহ্য সৃষ্টি হইয়াছে। রামপ্রসাদ একটি পদে লিখিয়াছেন—

কাজ কি রে মন যেয়ে কাশী
কালীর চরণে কৈবল্যরাশি॥
সার্ধ ত্রিশকোটি তীর্থ মায়ের ও চরণবাসী।
যদি সন্ধ্যা জান শাস্ত্র মান কাজ কি হয়ে কাশীবাসী ?
হৃৎকমলে ভাব বসে চতুর্ভুজা মুক্তকেশী।
রামপ্রসাদ এই ঘরে বসি পাবে কাশী দিবানিশি॥

কুমার শম্ভুচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন—

তীর্থবাসী হওয়া মিছে তীর্থবাসী হওয়া মিছে
শ্যামার চরণ বিনে রে মন কোন তীর্থ কোথায় আছে ?

কমলাকান্ত 'তেঁই শ্যামারূপ ভালবাসি' পদে লিখিয়াছেন—

কমলাকান্তের মন নহে অন্য অভিলাষী
আমার শ্যামা মায়ের যুগল পদে গয়া গঙ্গা বারাণসী ॥

রূপতত্ত্ব বিশ্লেষণ

[**প্রথম পদ**] **মন তোর এত ভাবনা কেনে**—কবি এখানে আপনার অন্তরকে সম্বোধন করিয়া তাহার সংশয় নিরসন করিতেছেন। শাক্ত পদাবলীতে ও বাউলজাতীয় গানে মনকে সম্বোধন করার একটি প্রবণতা আছে। মন এখানে আমাদের অহংবোধের প্রতিনিধি। ঈশ্বর সম্বন্ধে, ভোগ সম্বন্ধে, সংসার-বাসনা-বিষয়ে আমরা প্রতি মুহূর্তেই আত্মদ্বন্দ্বে স্ববিরোধে ক্ষতবিক্ষত হইতেছি। ভাবতন্ময় সত্যোপলব্ধ সাধককবি তাই আপনার অন্তরের নিগূঢ় স্ববিরোধকেই লক্ষ্য করিতেছেন। বাহিরের মন কর্মচঞ্চল বিষয়স্পৃহ, বৈরাগ্যবিমুখ। কিন্তু সকল চঞ্চল দুরাশা ও মোহগ্রস্ত পথভ্রান্তিকে উপেক্ষা করিয়া, সকল সংশয়ের অবসান ঘটাইয়া, অন্তরের পরম চিত্ত যাহাতে সত্যের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়, ইহাই কবির অভীপ্সা। **একবার কালী বলে বস রে ধ্যানে**—কালী নাম উচ্চারণ করিয়া মাতৃনামে ধ্যানস্থ হইবার জন্য সাধককবির আত্ম-সম্বোধন। এই ধ্যান শাস্ত্রীয় নয়, কেবল চিত্ত স্থির করিয়া ভক্তিভাবে আত্মসমাহিত হওয়া। ইহার জন্য চিত্তকে আসক্তিহীন করিতে হইবে, কেন্দ্রাভিমুখী করিতে হইবে, বহির্জগতের বাসনা-কামনা হইতে মনকে অন্তর্জগতে নিবদ্ধ করিতে হইবে। **জাঁকজমক···মনে মনে**—দেবতা যেখানে ঐশ্বর্যময়ী সেখানে উপচারবহুল উপাসনার বিধান তন্ত্রেই আছে! কিন্তু সহজিয়া সাধককবির মতে পূজায় ঐশ্বর্যের ব্যবস্থা সাধকের ঐশ্বর্য প্রদর্শনেরই ছদ্মবেশ মাত্র। জাঁক-জমক উপচার-সর্বস্বতার দ্বারা যে অর্চনা তাহা একবার আত্মঅহমিকাকেই প্রশ্রয় দেয়। মাতৃসাধনার মূল কথা আত্মভাবের অবলুপ্তি, সম্পূজুপাসনা তাহার বিরোধী। **তুমি লুকিয়ে ······জগজ্জনে**—মাতৃপূজার যথার্থ বিধান সকলের নেপথ্যে সর্বপ্রকার

আড়ম্বর বর্জন করিয়া জগৎবাসীর নিকট কোনো প্রকার প্রচার না করিয়া মানসোপাসনা। ইহাই মনোদীক্ষা। আর্থার এভালন বলিয়াছেন,

It is so called because it produces divine state of mind and body and destroys all sins. **ধাতুপাষাণ···হৃদিপদ্মাসনে**—শাস্ত্রে চিত্ত স্থির করিবার জন্য প্রতীকোপাসনার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সাধকের নিকট নিরাকার ব্রহ্মময়ীর ধ্যানই প্রশস্ত। ইহার জন্য ধাতব-বিগ্রহ কিংবা পাষাণ-পুত্তলিকার প্রয়োজন নাই। মৃন্ময় প্রতিমার মধ্যে ঈশ্বর অবস্থান করেন না। সাধককবি হৃদয়রূপ-মঞ্চে মনোময় প্রতিমা স্থাপন করিতে বলিয়াছেন। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল গাহিয়াছেন, প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমায় এ বিশ্বনিখিল তোমারই প্রতিমা। রামকুমার নন্দী মজুমদারের একটি পদে আছে—

এই হৃদি-পদ্মাসন তোমার চির-আসন
মাগো বল তবে অন্যাসন অন্বেষণে পাব কই ?

ইহার সহিত তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের—

হৃদয়নন্দনবনে নিভৃত এ নিকেতনে
এসো হে আনন্দময় এসো চিরসুন্দর ॥

আলোচাল···আপন মনে—শাস্ত্রীয় মূর্তি-পূজায় অর্থাৎ পৌত্তলিক উপাসনায় দেবতাকে নৈবেদ্য নিবেদন করিতে হয়। দেবতা আহার করিবেন এই বিশ্বাসে তাঁহাকে আলোচাল পাকাকলা ইত্যাদি বস্তু দান করা হয়। কিন্তু বিশ্বের অন্নদান যাঁহার কর্তব্য তাঁহাকে এইরূপ আহার্য নৈবেদ্য প্রদান হাস্যকর প্রথা, বিশেষত ভক্তিবাদী সহজিয়া কবির নিকট। কিন্তু উপাসনায় দেবতাকে অর্ঘ্য দানের প্রথার তিনি বিরোধিতা করিতেছেন না। কবির মতে সাধকের অন্তরের ভক্তিই একমাত্র সুধা যাহা আলোচাল জাতীয় স্থূল বস্তুর বদলে দেবতাকে দান করা যায় এবং তাহাতেই তৃপ্তিলাভ হয়। **ঝাড়লণ্ঠন···**
···জ্বলুক নিশিদিনে—ধনীগৃহে পূজাপার্বণে ঐশ্বর্যের সমারোহ এবং বিলাস ব্যসনের প্রাচুর্য দেখা যাইত, রামপ্রসাদ এই সকল সম্পন্ন গৃহের আয়োজন বর্জন করিতে অনুরোধ করিতেছেন। ঝাড়লণ্ঠন বাতির আলো ঔজ্জ্বল্যে দৃষ্টি বিভ্রান্ত করে, কিন্তু ইহারা হৃদয়ের ভক্তির পরিচায়ক নয়। উৎসবের দিনে ঝাড়লণ্ঠন নিতান্তই বাহিরের ব্যাপার। এই প্রখরতেজা আলোকরশ্মি

দেবমন্দিরের বহিরঙ্গ সজ্জিত করে মাত্র। কিন্তু সাধকের অন্তরে ভক্তির যে জ্যোতির্ময় মাণিক্য বিরাজমান কেবলই তাহারই দীপ্তিতে হৃন্মন্দির চির-শোভাময় হইয়া থাকিবে। **রোশন (বা রোশনাই)**—আলোক শোভা-সমারোহ। **মাণিক্য**—মূল্যবান রত্নবিশেষ। **মেষ ছাগল···বলিদানে**—তান্ত্রিক উপাসনায় বলিদান অবশ্য-পালনীয়, কিন্তু সূক্ষ্ম আরাধনায় বলির ব্যবস্থা নাই। আবার অন্যদিকে সহজিয়া ধর্মের মূল কথা ঈশ্বর-প্রাপ্তি, সেখানে জীবহত্যা রক্তপাতেব বিরোধিতা আছে। ইহা কেবল ধর্মের কথাই নয়, মানবিকতার দিক হইতেও রামপ্রসাদ পশুমেধেব প্রয়োজনীয়তায় সন্দেহ জানাইতেছেন। **তুমি জয় মা কালী···রিপুগণে**—পশুহিংসাব প্রতিবন্ধকতা করিলেও বলিদানেব আচারগত ব্যবস্থা তিনি অস্বীকার করেন না। এখানে বলিও মানসিক দীক্ষার অন্যতম। তাই পশু নয়, মানুষের ষড়্‌রিপু, কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্যকেই সাধক চিরতরে নির্মূল করিতে চেষ্টা করিবেন। **প্রসাদ বলে···শ্রীচরণে**—বাদ্যভাণ্ড-সমারোহ আচারবহুল পূজায়োজনের অন্যতম অঙ্গ, কিন্তু কবি সেই স্থূল শব্দধ্বনির বদলে মাতার নামে করতালি দিয়া তাঁহার শ্রীচরণে অনুগত হইবার জন্য মনকে অনুরোধ করিতেছেন।

[চতুর্থপদ] আর কাজ······বারাণসী—কাশীধাম গয়া গঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চল ও নদীগুলি হিন্দুধর্মাবলম্বীদের নিকট আবহমান কাল হইতে পুণ্যতীর্থ-স্বরূপ। তীর্থে গমন করিয়া বিগ্রহ দর্শন করিলে পারলৌকিক মুক্তি ত্বরান্বিত হয়, ঐহিক জীবনের পাপক্ষয় ঘটে, ইহাই নিষ্ঠাবান হিন্দুদের বিশ্বাস। কিন্তু সাধককবি উপলব্ধি করিয়াছেন তীর্থের পুণ্য অঞ্চলবিশেষে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। মাতাব চরণ অনুধ্যান করিলে গৃহে বসিয়াই তীর্থফল লাভ করা যায়। [রামমোহন লিখিয়াছিলেন, "তীর্থযাত্রার দ্বারা তোমার সর্বব্যাপকত্বের যে ব্যাঘাত করিয়াছি হে জগদীশ্বর আমার অজ্ঞানতাকৃত এই অপরাধ ক্ষমা কর।"] রামপ্রসাদের পরবর্তী কবিদেব অসংখ্য পদে 'গয়া গঙ্গা বারাণসী'-র বিকল্পে মাতৃচরণকে সর্ব-তীর্থসার-রূপে ঘোষণা করা হইয়াছে। যথা, রামকৃষ্ণ রায়ের একটি পদ—

ভবে সেই যে পরমানন্দ যে জন্ পরমানন্দময়ীরে জানে
সে যে না যায় তীর্থ-পর্যটনে, কালী কথা বিনা না শুনে কানে।

প্রেমিক মহেন্দ্রনাথ বলেন, 'দেখনা হৃদে নয়ন মুদে শ্যামা-পদে বারাণসী'। মদন মাস্টার গাহিয়াছেন—

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়
কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায় ॥

হৃৎকমলে…রাশি রাশি—তন্ত্রশাস্ত্রে দেহের নানাস্থানকে তত্ত্বের দিক হইতে নানাবিধ পদ্মের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। এইজন্য চিত্ত-নিরোধের প্রথম স্তর হৃৎকমলে আত্মস্থ হওয়া। মধুপ যেরূপ বিকশিত পদ্মের মকরন্দে সুধামুগ্ধ হয় কবিও সেইরূপ চিত্তকমলে তন্ময় হইয়া কালীর পদ্মনিভ চরণ ধ্যান করিয়া অপার্থিব আনন্দ অনুভব করেন, সেই আনন্দ শতশত তীর্থযাত্রা অপেক্ষা ঘনীভূত, ইহাই সাধককবির উপলব্ধি। তুলনীয়, কমলাকান্তের পদাংশ—'মজিল মনভ্রমরা কালীপদ-নীলকমলে'। কমল ও কোকনদ সমার্থক শব্দ। কালীর চরণ কমলের সহিত অভিন্ন, সেই চরণের ধ্যান করিলে চিত্তও তাই কমলময় হইয়া যায়, ইহাই কাব্যিক ব্যঞ্জনা। **কালীনামে…মাথাব্যথা**—কালীর নাম উচ্চারণ মাত্রেই সকল প্রকার অপবাধজনিত গ্লানি নিঃশেষে মুছিয়া যায়, সুতরাং নামোচ্চারণেই যদি চিত্ত নিষ্কলঙ্ক হয় তবে তীর্থে পাপক্ষালনের প্রস্তাব অর্থহীন : পাপের অস্তিত্ব নাই অথচ পাপত্রাণের স্থান আছে ইহা যুক্তির দিক দিয়া যেন মাথা নাই কিন্তু মাথাব্যথার মত। কালীনামই সর্বপাপঘ্ন মন্ত্র, ইহার উপর আর তীর্থ হইতে পারে না। বৈষ্ণব ধর্মেও বলা হইয়াছে—

কলিতে শ্রীকৃষ্ণনাম যত পাপ হরে।
সাধ্য কি মানুষের তত পাপ করে ॥

ওরে অনলে…তুলারাশি—চরম পাপীও একমাত্র মাতৃনাম উচ্চারণের দ্বারা মুক্তি পাইতে পারে, পাপবিনাশী নামের এইরূপই মহিমা। অগ্নির দ্বারা যেমন তুলারাশি একমুহূর্তে ভস্মীভূত হইয়া যায়, নামস্পর্শেও পাপ সেইরূপ লঘু পদার্থের মত তৎক্ষণাৎ ভস্ম হয়। **গয়ায় করে…শুনে হাসি**—গয়ায় মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলে পাপপুরুষ বা প্রেতপুরুষ উদ্ধার লাভ করে ইহাই হিন্দুদের বিশ্বাস। রামপ্রসাদ পৌরাণিক হিন্দুদের এই বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, এমন কি তাহাকে মৃদু কটাক্ষ পর্যন্ত করিয়াছেন। অথচ তিনি নাস্তিকের মত ইহার বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। এক নিবিড় বিশ্বাস ও পরম প্রাপ্তির প্রত্যয় হইতেই তিনি মনে করেন, একমাত্র আন্তরিক

ভক্তিবশত কালীর চরণে মতি রাখিলে, অন্তরে কালীনাম জপ করিলে সকল পাপবোধের সমূল বিনষ্টি ঘটে, তীর্থযাত্রার পুণ্য হয়, এমন কি, পিণ্ডপ্রদানের ফলে যে মৃতের ঋণ-পরিশোধ, তাহাও সম্পন্ন হয়। **কাশীতে…উক্তি**—হিন্দুর পৌরাণিক সংস্কার কাশী বারাণসীতে মৃত্যু হইলে মুক্তি লাভ ঘটে, পুনর্জন্ম হয় না। ব্যুৎপত্তির দিক দিয়া বলা হইয়াছে, বার (বারিত হয়) অনস্ (জন্ম) যে পুরী হইতে (বহুব্রী), অর্থাৎ যেখানে মৃত্যু হইলে পুনর্জন্ম নিবারিত হয়। কাশী শিবপুরী, রুদ্রবাস ইত্যাদি নামেও অভিহিত। ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন—

পুণ্যভূমি বারাণসী বেষ্টিত করুণা অসি
যাহে গঙ্গা আসিয়া মিলিতা।
আনন্দ কানন নাম কেবল কৈবল্য ধাম
শিবের ত্রিশূলোপরি স্থিতা ॥
মহেশের রাজধানী দুর্গা যাহে মহারানী
যাহে কালভৈরব প্রহরী।
শমনের অধিকার না হয় স্মরণে যার
ভবসিন্ধু তরিবার তরি ॥
যাহে জীব ত্যজি জীব সেই ক্ষণে হয় শিব
পুন নহে জঠর যাতনা।
দেবতা গন্ধর্ব যক্ষ দনুজ মনুজ রক্ষ
সবে যার করয়ে কামনা ॥ [অন্নদামঙ্গল]

ওরে সকলের… তারই দাসী—অঞ্চলবিশেষে পদার্পণ করিলেই মুক্তি লাভ হয় না, মুক্তি ভক্তিরই অনুগামী। ত্রৈলোক্যনাথ কবিভূষণ লিখিয়াছেন—

নানা ভক্তি আছে আমার তাই দিব মা উপহার।

কাশীতে মলেই…তারই দাসী—কাশীতে দেহরক্ষা করিলে মুক্তিলাভ ঘটে এইরূপ বিশ্বাসে মুমূর্ষু ব্যক্তি কাশীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। সাধককবি রামপ্রসাদ মনে করেন অন্তরে ভক্তি থাকিলে মুক্তি ঘরে বসিয়াই লাভ করা যায়। **নির্বাণে…ভালবাসি**—রামপ্রসাদ মুক্তিপ্রার্থী নন, ইহাতে আত্মা পরমাত্মায় বিলীন হইয়া যাইবে যেমন জলবিন্দু জলে মিলিত হইয়া যায়। কিন্তু রামপ্রসাদ আস্বাদনবাদী, তিনি দূরস্থিত ভক্তের মত তটস্থ হইয়া মাতার চরণকমলের

সৌন্দর্য উপভোগ করিতে চান। তিনি চিনির সহিত মিশিয়া যাইতে চান না, চিনির মিষ্টত্ব আস্বাদ করিতে চান। জনৈক সমালোচক এই ছত্রটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"কায়সাধন ও নাম জপ করিতে করিতে মন এক স্থির অবিচল আত্মনিষ্ঠ সহজ আনন্দের স্তরে উন্নীত হয়, যেখানে পাপপুণ্যের, শুচি-অশুচির, সুখদুঃখের ভেদাভেদ ঘুচিয়া যায়, জাগতিক অভাব-অভিযোগ তাহাকে আর বিচলিত করে না। এই সাধনোপলব্ধির মধ্যে বৈরাগ্য নাই, তাহা নয়, কিন্তু এই বৈরাগ্য সুখ ও বিষয়ভোগকে অস্বীকার করিয়া নয়, অসংখ্য বন্ধনের মধ্যে যে মুক্তি, অসংখ্য আসক্তির মধ্যে নিরাসক্ত মনের যে বৈরাগ্য, সেই বৈরাগ্যই প্রসাদের বৈরাগ্য, এবং অসংখ্য গানে রামপ্রসাদ যে বৈরাগ্যের ইঙ্গিত করিতেছেন, তাহাও এই অস্তিধর্মী বৈরাগ্য, বৈদান্তিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের নেতিমূলক বৈরাগ্য নয়। তিনি চিনি হইতে চাহেন নাই, তিনি খাইতে ভালবাসিতেন, লাভ করিতে চাহেন নাই, বলিয়াছেন, নির্বাণে কি আছে ফল। মাটির মূর্তি গড়িয়া যে পূজা, ইহাও তাহার রুচিকর ছিল না, তিনি জানিতেন ত্রিভুবন জুড়িয়াই তো মায়ের মূর্তি, সেই ত্রিভুবনের রূপরসের মধ্যেই তিনি ডুবিয়াছিলেন। শুচি এবং অশুচির সংস্কার তাহার ছিল না। আনুষ্ঠানিক ধর্মের কোনো আচার-ব্যবহার রীতিনিয়মের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ছিল না।"

[ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য—ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ]

চতুর্বর্গ—ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষকে চতুর্বর্গ বলে। **এলোকেশী**—মুক্তকেশী এলোকেশী কালীর নামান্তর।

আলোচনা

আলোচ্য পদটি রামপ্রসাদের আধ্যাত্মিক আদর্শ ও ধর্মচেতনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। রামপ্রসাদ ঠিক কবি ছিলেন না, তিনি সাধককবি এবং সেই সাধনা তান্ত্রিক শক্তিধর্মের পথ হইলেও ভক্তশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ এক নিজস্ব দার্শনিক তত্ত্ব রচনা করিয়াছিলেন। 'আর কাজ কি আমার কাশী' পদে রামপ্রসাদের সেই নিজস্ব দার্শনিক মতের পরিচয় পাওয়া যায়। সাধনার ক্ষেত্রে মুক্তি বা মোক্ষের একাধিক স্তর আছে। ইহার নাম সালোক্য সামীপ্য সারূপ্য সাযুজ্য ও মোক্ষ। জনৈক পণ্ডিতের মতে—

"মনুষ্যত্ব হইতে মুক্ত হইয়া যে লোকে জীব দেবত্বে উপনীত হয়েন, সংসার-মায়া হইতে বিমুক্ত হইয়া দেবলোকে আসেন, সেই লোকে তাঁহার সালোক্য-মুক্তি হয়। দেবগণের সহিত একলোকে থাকার নাম সালোক্য। এই দেবত্ব-লাভের পর সূক্ষ্মদৃষ্টিপ্রভাবে ভক্ত যত ভগবদ্দর্শনের সমীপবর্তী হইয়া একেবারে ঈশ্বরের সম্যক ঐশ্বর্য-মূর্তি দেখিতে পান, ততই তাঁহার সামীপ্য-মুক্তি সম্ভাবিত হয়।...সামীপ্য-মুক্তি লাভ হইলে যোগীর সারূপ্য বা সার্ষ্টি মুক্তি হয়। এই আধ্যাত্মিক স্তরে আসিয়া যোগী ঈশ্বরের স্বরূপ হইয়া তাঁহার ঐশ্বর্যভোগী হন। ঈশ্বরের সহিত সমান ঐশ্বর্যশালী হওয়ার নামই সার্ষ্টি বা সারূপ্য মুক্তি।...কেহ কেহ বা তৎপরে সাযুজ্য বা ঈশ্বরের লয়-মুক্তির প্রয়াসী হন। সাযুজ্য মুক্তিলাভেও জীবের গুণভার থাকে। গুণভার যতদিন থাকে, ততদিন জীবের সাংসারগতি নিবারিত হয় না। এই গুণভারের একেবারে বিনাশ সাধন না করিতে পারিলে নিস্ত্রৈগুণ্য হয় না; নিস্ত্রৈগুণ্য না হইলে ব্রহ্ম-পদ-লাভ হয় না। এই ব্রহ্ম-পদ-লাভের নামই মোক্ষ। নির্গুণত্ব হেতু জীবাত্মা নির্গুণ-ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যান।...রামপ্রসাদ যে আধ্যাত্মিক স্তরে উপনীত হইয়াছিলেন, সে স্তরে তিনি শুধু সালোক্যেরই প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ভগবদ্দর্শন-জন্য তিনি একান্ত লোলুপ হইয়াছিলেন। অভয়-পদ-লাভের জন্য তাঁহার একান্ত লালসা হইয়াছিল।" [পূর্ণচন্দ্র বসু—রামপ্রসাদ প্রবন্ধ]

তবে শেষ পর্যন্ত লয়মুক্তি ও ব্রহ্মত্বলাভের কথাও রামপ্রসাদ বলিয়াছেন। 'এবার কালী তোমায় খাব' জাতীয় পদে ব্রহ্মের সহিত বিলীন হইবার ও লয়-মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে।

ব্যাখ্যা

জাঁকজমকে...জগজ্জনে। [প্রথম পদ]

বিশ্বজননীর চরণে নিবেদিত পূজাপুষ্পের নৈবেদ্যের মত হৃদয়ের ভক্তি ও প্রীতিবাৎসল্যে সিক্ত প্রসাদী-সংগীতের রচয়িতা কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন আলোচ্য পদাংশে আড়ম্বরবহুল উপচারসর্বস্ব পূজার বিরুদ্ধে তাঁহার ভক্ত হৃদয়ের অনীহা এবং মানস-পূজার প্রণালী বিবৃত করিতেছেন। শক্তি-সাধনায় উপাসনার নানা প্রকরণ আছে, এইগুলি তামসিক রাজসিক ও সাত্ত্বিক উপাসনা। বর্ণোজ্জ্বল মূর্তির দ্বারা যাগযজ্ঞ বাদ্যসমারোহ আলোকশোভা-

যাত্রায় যে উপাসনা তাহাই রাজসিক উপাসনা। কিন্তু সাত্ত্বিক উপাসনায় পূজার বহিরুপকরণের প্রয়োজন হয় না। বিনত চিত্তের দ্রবীভূত ভক্তি ও অসংকুচিত বিশ্বাসই এই উপাসনার উপকরণ। ইহাকেই বলা হয় মানস-পূজা। রামপ্রসাদ আলোচ্য পদে সেই সাত্ত্বিক উপাসনারই প্রশস্তি করিয়াছেন। কেবল তাহাই নয়, রাজসিক উপাসনায় যে আড়ম্বর-বাহুল্য প্রকাশ পায় তাহা এক হিসাবে সাধকের ঐশ্বর্যের আত্মপ্রচার বলিয়া বোধ হয়, ইহাই সাধক কবির অনুরূপ উপাসনা-বিরোধিতার কারণ। ইহা ভক্তির বদলে অপরের নিকট সম্পদের প্রদর্শন মাত্র। যথার্থ উপাসনায় আত্মতান্ত্রিকতা অহংসর্বস্বতার সম্পূর্ণ বিলোপ-সাধন করিতে হইবে। এইরূপ উপাসনা গোপনতা ব্যতীত সুসম্পন্ন হইতে পারে না। সুতরাং বিশ্বজনের নিকট সাড়ম্বর আত্মপ্রচারের দ্বারা পূজার বাহ্যায়োজন পরিত্যাগ করিয়া, আপন অন্তরে সংগুপ্ত ধ্যানের দ্বারা মানসোপাসনা করিবার কথাই আলোচ্য চরণদ্বয়ে সাধককবি রামপ্রসাদের বক্তব্য।

ধাতু-পাষাণ · হৃদিপদ্মাসনে। [প্রথম পদ]

'শাক্ত পদতরঙ্গিণীর গোমুখী' সাধককবি রামপ্রসাদের ভক্তিগীতি প্রসাদী হইতে চয়িত চরণদ্বয়ে শাস্ত্রানুমোদিত পৌত্তলিক উপাসনার বিরুদ্ধে কবির অসন্তোষ এবং বিকল্পে মানস-পূজার ইঙ্গিত করা হইয়াছে। জগজ্জননীর আরাধনার জন্য সাধক মূর্তি নির্মাণ করিয়া থাকেন, কিন্তু এ বিশ্বনিখিল যাঁহার রূপনির্মাণ তাঁহাকে কি ক্ষুদ্র মৃন্ময় মূর্তির মধ্যে ধরা যায়? সুতরাং ধাতব বা কাষ্ঠ পাষাণের প্রতিমা নির্মাণ করিলেই পূজাকৃত্য সম্পন্ন হয় না। বিশ্বমাতাকে আরাধনা করিতে হইলে প্রতীকোপাসনার প্রয়োজন আছে, কিন্তু বাহ্যাড়ম্বর অথবা ঐশ্বর্যপ্রদর্শনের দ্বারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। সাধককবি তাই ভক্তের হৃদিমন্দিরে ভক্তিপদ্মাসনের উপর দেবীর ধ্যানমূর্তির প্রতিষ্ঠা করিতে বলিতেছেন। মাতার যথার্থ আবাহন ও উদ্বোধন হৃদয়ে, তাই মনোময় প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সাধককে সর্বপ্রকার বাহ্যিক আয়োজন ও উপচারসর্বস্বতা পরিহার করিতে হইবে, ইহাই কবিরঞ্জনের বক্তব্য।

তুলনীয়—মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে,
মা বেটি কি মাটির মেয়ে, মিছে খাটি মাটি নিয়ে॥ [রামপ্রসাদ]

ঝাড়-লণ্ঠন……জলুক নিশিদিনে। [প্রথম পদ]

ব্যাখ্যেয় পংক্তিযুগল সাধককবি রামপ্রসাদের প্রসাদী নামাঙ্কিত মানস-পূজা-বিষয়ক ভক্তিগীতি হইতে উৎকলিত। আলোচ্য অংশে কবিরঞ্জন বাহ্যিক আয়োজনবহুল পৌত্তলিক উপাসনার বিকল্পে সাধকের মনোপদ্মাসনে বিশ্বজননীর ধ্যানমূর্তি-প্রতিষ্ঠা ও হৃন্ময় আরাধনার ইঙ্গিত দিয়াছেন। শক্তি-উপাসনায় প্রতিমা মন্ত্র আলোকমালা ও উপচারের প্রয়োজন আছে, কিন্তু সেইগুলি নিতান্ত বাহ্যিক ও স্থূল হইলে তাহা রাজসিক উপাসনায় পর্যবসিত হয়, তাহা দিব্যভাবের সাত্ত্বিক উপাসনা হয় না। সুতরাং ধাতু-পাষাণ-মৃত্তিকার প্রতিমার বদলে যেমন অন্তরে দেবীর ধ্যানমূর্তির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, সেইরূপ দেবস্থানে আলোকমালা-সমারোহের বদলে হৃদয়ের গোপনে ভক্তির মানস-দীপ্তির প্রয়োজন। ঝাড়লণ্ঠন-রোশনাই সাজাইলে সম্পদের প্রচার, আড়ম্বরের ঘোষণা হয় মাত্র। তাহা পূজারীর ঐশ্বর্য-প্রদর্শনেরই নামান্তর। চিত্তের ঐশ্বর্য বাহিরের সমারোহ-নির্ভর নয়। যথার্থ চিদ্‌গত ভক্তি-বিশ্বাস ও আন্তরিকতা থাকিলে তাহাই জ্যোতির্ময় হইয়া সর্বদাই মাতাকে ধ্যাননিমীলিত নেত্রের সম্মুখে উদ্‌ভাসিত করিয়া তুলিবে, তখন বহিরঙ্গগত দীপমালার প্রয়োজন হইবে না।

মেষ-ছাগল · সেই শ্রীচরণে। [প্রথম পদ]

বক্ষ্যমাণ পংক্তি-চতুষ্ক ভক্তিপূত প্রসাদী-গীতমালার মানসপূজা বিষয়ক পদের সমাপ্তি অংশ। এখানে সাধককবি রামপ্রসাদ শক্তি-উপাসনায় বাহ্যিক পূজাপদ্ধতির বিকল্পে মানস-উপচারের লক্ষণাদি বিবৃত করিয়াছেন। ঐশ্বর্য যে দেবতার বিভূতি, সম্পদ যাঁহার চরণের জ্যোতি সেই শক্তি-উপাসনায় উপচারের প্রয়োজন আছে, কিন্তু সাত্ত্বিক সাধক এই উপচারকে স্থূল বস্তুরূপে গ্রহণ করিবেন না, এইগুলিকে মানসক্ষেত্রে ভাবসংকেতে স্থানান্তরিত করিবেন। ধাতব-কাষ্ঠ পাষাণময় বিগ্রহের বদলে জগজ্জননীর ধ্যানমূর্তি, বাহ্যিক নৈবেদ্যের বদলে ভক্তি-পীযূষধারা, দৃষ্টিবিলসন রোশনাই-আলোকমালার বদলে দেদীপ্যমান বিশ্বাস এইগুলিই মানস-উপচার, অন্তর্যাগের উপকরণ। শক্তির উদ্বোধন করিতে হইলে তন্ত্রে বলিদানের নির্দেশ আছে। কিন্তু জীবহত্যা রক্তপাতের দ্বারা কিরূপে বিশ্বমাতা করুণারূপিণীর কৃপা লাভ

হইতে পারে! তাই কবির মানসপূজায় বলির সাংকেতিক তাৎপর্য জীবমেধ নয়, রিপুসংহার। আমাদের মানবিক দেহে কামক্রোধ লোভমোহ মদমাৎসর্য প্রভৃতি যে দোষগুলি রহিয়াছে, সেইগুলি সতত আমাদের ধর্মপথ হইতে বিচ্যুত করিয়া অহংকার ও ভ্রান্তি জন্মাইতেছে, সর্বাগ্রে সেইগুলিকে নিরাকৃত করিতে হইবে। তাহার দ্বারাই বলির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। পৌত্তলিক উপাসনায় ঢাকঢোল কাঁসী বাজাইবার বিধি আছে। কিন্তু নিতান্ত শব্দাড়ম্বর ধ্বন্যা-যোজনের দ্বারা দেবতার উদ্বোধন হইতে পারে না। আনন্দময়ীকে অন্তরে ধ্যান করিয়া সাধক যখন আনন্দে করতালি দিয়া উঠিবেন, স্থির প্রত্যয় ও নিবিড় বিশ্বাসে ধ্বনিত তাঁহাব সেই করতালিই মনোময় প্রতিমার পূজা বিধানে সত্যকার ঢাকঢোলের স্থান গ্রহণ করিবে। সুতরাং একাগ্র চিত্তে সাধনা, বিশ্বজননীর শ্রীচরণে নিবিষ্টচিত্ত হওয়াই যথার্থ মানস-পূজা, বাহ্যাড়ম্বর নয়।

আর কাজ কি · ····তীর্থ রাশি রাশি। [চতুর্থ পদ]

প্রচলিত শাস্ত্রসম্মত তীর্থের বদলে শ্যামাজননীর শ্রীচরণকে সর্বতীর্থসাব বলিয়া ঘোষণা করাব বলিষ্ঠতা ও উদারতাই প্রসাদী ভক্তিগীতিব শ্রেষ্ঠকবি রামপ্রসাদের আলোচ্য পদস্থচনার বক্তব্য। হিন্দুশাস্ত্র ও হিন্দুধর্মমতে আবহমান কাল হইতে গয়া গঙ্গা বারাণসী প্রভৃতি অঞ্চল পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত। তীর্থেব ধূলি তীর্থসলিল স্পর্শ করিলে পাপস্খলন হয়, জীবাত্মার মুক্তি ঘটে, পরমাত্মার সহিত লীনতাপ্রাপ্ত হয়, ইহাই সাধারণভাবে হিন্দুর বিশ্বাস। কিন্তু কেবল পাপাসক্ত চিত্তের অনুতাপ লইয়া কাশীধামে গমন করিলে, গঙ্গোদক পান করিলে, গয়ায় যজ্ঞ করিলেই মুক্তি ঘটিবে, ইহা বিশ্বাসের কথা, তদতিরিক্ত কিছু নয়। সাধককবি রামপ্রসাদ সাত্ত্বিকভাবের উপাসনায় দিব্যসাধনার দ্বারা যে নূতন ভক্তিবাদ লাভ করিয়াছেন তাহা ঠিক শাস্ত্রীয় সংস্কারের বশীভূত নয়। রামপ্রসাদ আনন্দময়ী বিশ্বজননীর চরণে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন। ইহাতেই যথার্থ মোক্ষ সম্ভব হইতে পারে। তাই প্রথাসিদ্ধ বিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি কাশী-গয়া-গঙ্গার তীর্থমাহাত্ম্য অবহেলা করিতেছেন। পার্বতীসুত গণেশ মাতার চতুষ্পার্শে পর্যটন করিয়া বিশ্বপর্যটনের গৌরব লাভ করিয়াছিলেন। রামপ্রসাদও মাতার শ্রীচরণে সকল তীর্থের ফললাভ করিতে চাহিয়াছেন। প্রচলিত তীর্থগুলি

তথা তাহাদের মাহাত্ম্য শ্যামাজননীর চরণের অংশ মাত্র। সেইগুলি মাতাব চরণতলেই অবস্থান করিতেছে। হৃৎকমলের উপর জননীর মনোময় প্রতিমা স্থাপন করিয়া সাধককবি যখন জননীকে ধ্যান করেন, তখন অপার্থিব আনন্দের প্লাবনে তিনি অভিভূত হইয়া যান। তখন তাঁহার মনে হয়, কালীর চরণ দিব্য কোকনদতুল্য, শতশত তীর্থের মহিমানিচয় যেন তাহাতেই ঘনীভূত হইয়া আছে। অতএব পুরাণপ্রসিদ্ধ দুর্গম অঞ্চলে স্থাপিত তীর্থের বিরুদ্ধে তিনি আনন্দময়ীর চরণেব উপরই আপনার অবিচল আনুগত্য ঘোষণা করিতেছেন।

কালীনামে পাপ···· তুলারাশি। [চতুর্থ পদ]

পৌরাণিক শাস্ত্রসম্মত তীর্থেব পাপবিনাশী মাহাত্ম্যেব বিরুদ্ধে সর্বপাপঘ্ন কালীনামের গৌরব-প্রতিষ্ঠাই আলোচ্য প্রসাদী ভক্তিগীতির বক্তব্য। বাহ্যিক আড়ম্বরসর্বস্ব উপচারবহুল উপাসনা অথবা তথাকথিত মোক্ষদাতা তীর্থের প্রতি অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া ভক্তেব মনোমন্দিরে ধ্যানময়ী দেবীর গোপন প্রতিষ্ঠা ও পূজা এবং তীর্থের বদলে জননীব চরণকেই একান্ত করিয়া ধরিয়া থাকাই সাধককবির ভক্তিধর্ম। মানুষ তীর্থের নিকট আপনার ইহলৌকিক অপরাধ পাপ ইত্যাদি বিনাশ কবিতে ও পুণ্যার্জন করিতে যায়। কিন্তু সাধককবির বিশ্বাস এতই তীব্র যে তিনি মনে করেন, একমাত্র কালীর নামগ্রহণ করিলেই পাপ নির্মূল হইয়া যায়। নামগ্রহণের দ্বাবাই যদি আত্মা অপাপবিদ্ধ হইযা উঠে, তবে অঞ্চলের দুর্গমতা সহ্য করিয়া তীর্থে যাত্রারও কোনো প্রয়োজন নাই। অথচ সাধারণ মানুষের এই বিশ্বাস পর্যন্ত নাই। যেমন কবন্ধ ব্যক্তির মাথাব্যথা বলিয়া কোনো ব্যাধি থাকিতে পাবে না, তেমনি নামোচ্চারণে সর্বপাপমুক্ত ব্যক্তিরও কোনো অপরাধ বা পাপ থাকিতে পারে না। অগ্নি যেমন প্রচণ্ড দাহ্যশক্তি-বিশিষ্ট তূলাকে মুহূর্তে ভস্ম করিয়া দেয় সেইরূপ কালীনামও অগ্নির মত পাপকে একেবারে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। পরন্তু তুলারাশি বিপুলায়তন কিন্তু সেই পরিমাণ ভারবাহী নয়, পাপও সেইরূপ আয়তনে বিপুল মনে হয়, কিন্তু গুরুভার হইতেই পারে না, ইহাই যেন কবির বক্তব্য। অগ্নির দাহিকাশক্তি মাতৃনাম উচ্চারণের সহিত নিপুণভাবে ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

গয়ায় করে···শুনে হাসি। [চতুর্থ পদ]

[রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]

কাশীতে মলেই …… **তারই দাসী** [চতুর্থ পদ]
[রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]

নির্বাণে কি ……… **এলোকেশী।** [চতুর্থ পদ]
[রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]

প্রশ্ন ১। প্রসাদী শীর্ষক পঠিত কবিতাযুগল অবলম্বনে রামপ্রসাদের ধর্ম-সাধনার পরিচয় দাও।

অষ্টাদশ শতাব্দী সাহিত্যের ইতিহাসে যুগসন্ধি আখ্যায় চিহ্নিত। এই যুগে পূর্বতন যুগের সংবদ্ধ সমাজের ভিত্তি শিথিল, মানুষের অন্ধ বিশ্বাস স্খলিত এবং সাংস্কৃতিক জীবনের শিষ্টরুচির আনুগত্য দুর্বল হইয়া আসিয়াছে। রাজনৈতিক জীবনে বিপর্যয়হেতু মানুষের গার্হস্থ্য ও সামাজিক বিপন্নতা দেখা দিয়াছে। এই সর্বাত্মক সংকটের তমিস্র রাত্রিতে রামপ্রসাদ মাতৃ উপাসনার আলোকবর্তিকা জ্বালাইয়া বিশ্বজননীর আরাধনা করিতেছেন। শাস্ত্রানুগত্য বা পৌরাণিক মাহাত্ম্যে বিশ্বাস নয়, তিনি হৃদয়ের এক স্বতঃস্ফূর্ত স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত বিশ্বাসে ও ভক্তির দ্বারা দেবতা ও মানবের মধ্যে এক স্নেহপ্রীতিমানাভিমানযুক্ত মধুর সম্পর্ক আবিষ্কার করিলেন। তাঁহার আরাধ্য দেবতা তন্ত্রোক্ত শক্তি বা কালিকা হইলেও রামপ্রসাদের ধর্মমত ও ধর্মসাধনা ঠিক তান্ত্রিক নিয়মনিষ্ঠার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিল না। হৃদয়ের আন্তরিক ভক্তি ও মানবিক প্রবৃত্তির প্রভাবে তিনি যে অভিনব মানবরসপ্লুত ভক্তিবাদের প্রবর্তন করিলেন, তাহাকে কিছুটা লোকায়ত বলা যায়। মাতা ও সন্তানের মধুর প্রীতিমধুর সম্পর্কের মধ্যে সন্তানের যে স্নেহব্যাকুলতা, উৎকণ্ঠা, মাতৃচরণ লাভের আকুলতা, অনাদরের অভিমান, পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ, তাহাই তিনি বিশ্বসৃষ্টির মূলীভূত কারণ 'আদিভূতা সনাতনী'কে দান করিলেন। পৌত্তলিক উপাসনা, তামসিক আচারাদি, রাজসিক বাহ্যাডম্বর তিনি সম্পূর্ণ পরিহার করিতে চাহিলেন। ধাতব অথবা মৃন্ময় প্রতিমায় দেবীর আবাহন, ঐশ্বর্যপূর্ণ উপাসনার ব্যবস্থা, ভোগনৈবেদ্যের স্থূল উপকরণ, রোশনাই-আলোকসজ্জা-বাদ্যভাণ্ড-সমারোহ এইগুলি এক হিসাবে পূজারীর অহংকারেরই নামান্তর, সাড়ম্বরে বন্দনার মধ্য দিয়া তাহার ভক্তিবিহীন শূন্য হৃদয়ের আত্মপ্রচারই ঘোষিত হয়। সুতরাং শাস্ত্রীয় উপাসনার এই মন্ত্রাচার যাগযজ্ঞ ইত্যাদি ব্যবস্থাকে রামপ্রসাদ

অনুমোদন করিলেন না। তিনি তন্ত্রোক্ত মানস-পূজার সূক্ষ্ম ব্যবস্থাকে কবি-চিত্তের মনোগ্রাহী করিয়া নূতন আকারে প্রচার করিলেন। ইন্দ্রিয়গোচর প্রতিমার বদলে মনোময় প্রতিমার ধ্যান, ভোগোপকরণ-নৈবেদ্যের স্থলে ভক্তি-সুধা, ঝাড়লণ্ঠন-আলোকসজ্জার বদলে হৃদয়ের জ্যোতির্ময় বিশ্বাস, পশুমেধের বদলে রিপুবলিদান, ঢাকঢোলের বদলে মাতার চরণমুগ্ধ ভক্তের আনন্দ-করতালি, ইহাই কবিপ্রচারিত মানসপূজার ব্যবস্থা। এইগুলি তথাকথিত শাস্ত্রসম্মত না হইতে পারে, কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রসম্মত।

রামপ্রসাদের ধর্ম-সাধনায় একদিকে যেমন এইরূপ আরাধ্য দেবতার উপাসনার ব্যবস্থা অন্যদিকে দেবতার মহিমাও কবি তাঁহার অননুকরণীয় ভাষা ও ছন্দে ব্যক্ত করিয়াছেন। কবি যেমন প্রথাগত পূজাব্যবস্থা আচার-আড়ম্বরে বিশ্বাস করেন না, সেইরূপ পৌরাণিক তীর্থমহিমায়ও তাঁহার বিশ্বাস নাই। কিন্তু তিনি নাস্তিক নন, তাঁহার উপাসনা সাত্ত্বিক উপাসনা। তিনি প্রচলিত বহিরঙ্গগত পূজায় অনাস্থা জানাইয়া পূজার সকল পদ্ধতিকেই গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু মানস-ক্ষেত্রে অনূদিত করিয়া। সেইরূপ তাঁহার শ্রেষ্ঠ তীর্থ শ্যামা-মায়ের শ্রীচরণ। এই চরণ অবশ্য দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়, ভক্তের হৃদিকমলেই তাহা অধিষ্ঠিত। কিন্তু সাধারণ হিন্দুর বিশ্বাস, তীর্থের সংস্পর্শে পাপের বিনাশ ঘটে। সাধককবি নিবিড় অকম্পিত প্রত্যয়ে বিশ্বাস করেন, কেবল মাতার নাম স্মরণ করিলেই, কালীনাম উচ্চারণ করিলেই সকল পাপ অগ্নিতে তুলার মত ভস্মীভূত হইয়া যায়। সুতরাং শ্রীচরণই তো কোটিতীর্থকল্প, নূতন করিয়া পথশ্রমে তীর্থ-গমনের কী প্রয়োজন? পৌরাণিক হিন্দুর বিশ্বাস শিবনির্মিত কাশীতে দেহরক্ষা করিলে নিশ্চিতই জীবের মুক্তি ঘটে, তাহার জীবাত্মার বিনাশ ও মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। কিন্তু এত নিশ্চিত বিশ্বাস সত্ত্বেও রামপ্রসাদ ঈশ্বরের সহিত লয়-যুক্তি প্রার্থনা করেন না, তিনি কেবল ঈশ্বরের সহিত এক-লোকে বাস করিতে চান, সালোক্য মুক্তি চান। জীবাত্মা পরমাত্মায় বিলীন হইলে ভক্ত আর সেই সদানন্দময়ী কালীকে কিরূপে আস্বাদন করিবে? সাধককবি ঈশ্বরের আস্বাদ কামনা করেন, তিনি শুষ্ক মোক্ষ চান না, বৈরাগ্য চান না, বন্ধনের মধ্য দিয়া বৈরাগ্য কামনা করেন। তিনি চিনি হইতে চান না, চিনি আস্বাদ করিতে চান। যদি আস্বাদই না করিলেন তবে সেই পরমানন্দরূপিণী জগন্মোহিনী বিশ্বজননীর স্নেহলাভ কেমন করিয়া করিবেন?

এইরূপে মানবিক স্নেহপ্রীতিসুলভ চিত্তবৃত্তির দ্বারা দেবতার সহিত ভক্তের সম্পর্ককে মাতা ও সন্তানের মধুর সম্পর্কে পরিণত করা, পৌত্তলিক উপাসনার বিরুদ্ধে মানসোপাসনার ঘোষণা করা এবং তীর্থমাহাত্ম্যের বদলে মাতৃচরণকেই সর্বতীর্থসার বলিয়া জ্ঞান করাই রামপ্রসাদের ধর্ম-সাধনার বৈশিষ্ট্য। ইহা অনেকটা বাউলদের লোকায়ত সহজিয়া সাধনার সহিত তুলনীয়। রামপ্রসাদ মাতার নিকট মুক্তি ও মোক্ষ কামনা করেন নাই, তিনি বৈরাগ্যের সহিত বন্ধন উভয়কে লইয়াই মুক্তি লাভ করিবেন, আনন্দময়ী মাতাকে আস্বাদন করাতেই তাঁহার ভক্তির তৃপ্তি। এইরূপ সাধনা যে হিন্দুধর্মের সনাতন সাধনার পক্ষে অভিনব তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রশ্ন ২। প্রসাদী-শীর্ষক পদ দুইটি অবলম্বন করিয়া রামপ্রসাদের কবিধর্ম ও ভক্তিসংগীত রচনায় তাঁহার কৃতিত্বের উল্লেখ কর এবং শাক্ত পদাবলীর স্বরূপ নির্ণয় কর।—[ভূমিকা ও আলোচনা দ্রষ্টব্য]

প্রশ্ন ৩। শাক্ত পদাবলীর উদ্ভব ও বিকাশ অষ্টাদশ শতকেই, রামপ্রসাদের কবিধর্মের মধ্যেই এই আধুনিক যুগের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছে—আলোচনা কর।—[ভূমিকা ও আলোচনা দ্রষ্টব্য]

সাধারণ প্রশ্নমালা ঃ প্রাগাধুনিক যুগ

ইতিহাস-বিষয়ক

প্রশ্ন ১। পঞ্চদশ শতাব্দীর কাব্যধারার সাধারণ পরিচয় দিয়া এই শতকের দুইজন উল্লেখযোগ্য কবির আলোচনা কর।

প্রশ্ন ২। বাঙলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে ষোড়শ শতাব্দীকে স্বর্ণযুগ বলা হয়, কারণ সাহিত্যের সকল শাখাই তখন উজ্জ্বল। এই শতাব্দীর মুখ্য শাখাগুলির প্রতিনিধিমূলক একজন করিয়া কবির আলোচনা কর।

প্রশ্ন ৩। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের কাব্য-বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করিয়া বাঙলা কাব্যে ঋতুবদলের লক্ষণগুলি কিভাবে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তাহা বিবৃত কর।

[পঞ্চদশ হইতে অষ্টাদশ পর্যন্ত চারশতকের বাঙলা কাব্যধারার বিস্তারিত আলোচনায় এই প্রশ্নগুলির উত্তর আছে]।

তুলনামূলক :

প্রশ্ন ১। 'প্রেমের তুলনা' ও 'ভাবোল্লাস' কবিতাদ্বয় অবলম্বনে বৈষ্ণবীয় প্রেমের কবি হিসাবে দ্বিজ চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কবিধর্মের তুলনামূলক আলোচনা কর।

প্রশ্ন ২। বৈষ্ণব গীতিকবিতার বিষয়বস্তু এক হইলেও প্রেমের প্রকাশ-ভঙ্গি ও কাব্যরীতির দিক দিয়া কবিদের মধ্যে প্রচুর স্বাতন্ত্র্য আছে। পঠিত বৈষ্ণব গীতি-কবিতাগুলি অবলম্বনে ইহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

প্রশ্ন ৩। বাসুদেব ঘোষের শচী-মার বিলাপ পদের পরোক্ষ বিষয়বস্তু গৌরাঙ্গদেব, আর গোবিন্দদাসের কবিতার বিষয়ও শ্রীগৌরচন্দ্র। কিন্তু দুইটি কবিতা দুই ভিন্ন প্রকৃতির। এই দুই কবিতার তুলনামূলক বিচার কর।

প্রশ্ন ৪। মঙ্গলকাব্যের কবিকঙ্কণ খুল্লনার বারমাসী অংশের কবি দ্বিজ মাধবাচার্যের সহিত দেবসভায় বেহুলা অংশের কবি কেতকাদাসের তুলনা কর।

[আলোচ্য তুলনামূলক প্রশ্নের উত্তরগুলি গ্রন্থ-শেষে উপসংহারে 'তুলনামূলক প্রশ্নের অধ্যায়ে' প্রাপ্তব্য।]

আধুনিক যুগ : ঊনবিংশ শতাব্দী

আপনার নিশ্বাসবাষ্পে দর্পণ অস্বচ্ছ হইলে তাহাতে মুখাবয়ব প্রতিবিম্বিত হয় না, তাহাকে স্বচ্ছ করিয়া মুখশ্রী অবলোকন করিতে হয়। বাঙলার মধ্যযুগ আপনার নিশ্বাসে অস্বচ্ছ ছিল। স্বাতন্ত্র্যহীন দেশবাসী তাহার মধ্যে নিজেকে নিরীক্ষণ করিতে পারে নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা দেশে সেই ঘটনা সম্ভব হইল। এই পর্বে বাঙালী যুগের প্রেক্ষাপটে আপনাকে চিনিতে শিখিল, বুদ্ধিবাদ ব্যক্তিজাগরণ ও যুক্তির স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হস্তক্ষেপে স্বীয় নিশ্বাসবাষ্পের অস্বচ্ছতাকে মুছিয়া ফেলিল। জাতি দর্পণে আত্মদর্শন করিল। ইতিহাসে যথার্থ এক আধুনিক যুগের সূচনা হইল।

আধুনিকতার স্বরূপ—যুগের দর্পণে আত্মদর্শন

জোয়ারের জল নদীতট উল্লঙ্ঘন করিলে তীরতরু উন্মূল হয়, প্রান্তবাসী নিরাপদ দূরত্বে স্থান পরিবর্তন করিয়া আত্মরক্ষা করে মাত্র। কিন্তু বন্যার জল যখন সমগ্র গ্রামের নিম্নভূমি প্লাবিত করিয়া দেয় তখন ছিন্নমূল মানুষ অসহায়

হইয়া উচ্চতর ভূমিতে আশ্রয় সন্ধান করে। তারপর বন্যাপসারণে পরিত্যক্ত পলিমাটির উপর নূতন শস্যসম্ভব হয়। মুসলিম শাসন ও সংস্কৃতি বাঙলার জীবনতটিনীতে জোয়ারের সূচনা করিয়াছিল, তাই সেদিনের বাঙালী নিরাপদ দূরত্বে আশ্রয় স্থাপন করিয়া নদীর সহিত প্রয়োজনিক সম্পর্ক রক্ষা করিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরাজ শাসনের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা আমাদের অভ্যস্ত আরামলালিত জীবনে বেনোজলের মত প্রবেশ করিল। পুরাতন গৃহভিত্তি সলিলসাৎ করিয়া, সংস্কারাচ্ছন্ন জীবনকে উদ্বাস্তু করিয়া, তাহা নূতন দৃঢ়তর আশ্রয়ের অন্বেষণে তাড়িত করিল। কেহ বা ভাসিয়া গেল, কেহ কঠিনতর বৃক্ষশাখা অবলম্বন করিয়া প্রলম্বিত হইল। অধিকাংশই নূতন ভূমিতে শ্রমনির্মিত কুটির লাভ করিয়া নূতন জীবন যাপন করিতে লাগিল। তাবপর পলিবিধৌত ভূমিতে ধীরে ধীরে ফসল ও তৃণাঙ্কুর জাগিল। ইতিহাসে যথার্থ এক আধুনিক যুগের সূচনা হইল।

বিদেশী সংস্কৃতির জোয়ার ও বন্যা

অষ্টাদশ শতাব্দী হইতেই বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে মনোভঙ্গির দিক হইতে আধুনিকতার সূত্রপাত বলা চলে। অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক জীবনে স্থিতিস্থাপকতার অভাব, সাধারণ মানুষের বিপর্যস্ত জীবনযাত্রা, মন্বন্তর, দারিদ্র্য, রুচিহীনতা, ক্ষণস্থায়ী জীবনের দ্রুতবিলীয়মান সম্পদের জন্য সতর্কতা ও শক্তি উপাসনার প্রাবল্য, কাব্যের প্রথাগত রীতির অন্তঃসারশূন্যতা ঘোষণা, আদিরসাত্মক কাব্যকে ভক্তিরসের প্রচ্ছদে আবৃত করা, শব্দালংকার-বাহুল্য, ভক্তিবাদে ব্যক্তিতান্ত্রিকতার প্রবর্তন—এইগুলি ক্রমবর্ধমান আধুনিকতারই পূর্বাভাস। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙলা কাব্যের ধারা স্বচ্ছন্দ স্রোতোবেগ ও তরঙ্গের আলোছায়াকম্পন হারাইয়াছে। এই যুগে গ্রামকেন্দ্রিক জীবনযাত্রা ভগ্নদশায় উপনীত হইয়াছে, কলিকাতায় নাগরিক সভ্যতার পত্তন হইয়াছে, জমিদার-বাবু-মধ্যবিত্ত-চাকুরিজীবী-ইংরেজি-নবিশ নূতন শ্রেণীসম্প্রদায়ের উদ্ভব হইতেছে। ফলে সংস্কৃতি-শিক্ষা-রুচি-মানেরও আমূল মূল্যপরিবর্তন হইতেছে। ইতিহাসের অমোঘ ইঙ্গিতে এক নূতন সভ্যতার জন্মলগ্ন আসন্ন হইয়া উঠিতেছে।

প্রাচীন ও নব্যযুগের সন্ধিকাল

সাধারণ যুগলক্ষণ

ইতিহাসের ইঙ্গিত

ভারতচন্দ্রের মৃত্যু ঘটে ১৭৬০ সালে এবং ইহার প্রায় একশত বৎসর পর ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যু হয়। এই প্রায়-শতাব্দী কালের বাঙলা সাহিত্যকে ক্রান্তিকালের সৃষ্টি বলা যাইতে পারে। পুরাতনের অনুবৃত্তি ও নূতন যুগের চিন্তা-পদ্ধতি ও রীতির অনুসরণ এই পর্বের সাধারণ লক্ষণ। এখনও পর্যন্ত প্রতীচ্য শিক্ষাদীক্ষা সংস্কৃতি ও সাহিত্য বাঙলা সাহিত্যকে প্রভাবিত করিতে পারে নাই, কিন্তু আসন্ন প্রভাতের পূর্বাভাস শেষ রজনীর তারকাপুঞ্জের ঔজ্জ্বল্যের মধ্য দিয়াই আভাসিত হইতেছিল। এই যুগের কবিরা উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না। নূতন গড়িয়া-ওঠা বিত্তবানদিগের ব্যবসা ও প্রমোদ-রাজধানীর মনোরঞ্জনই ছিল এই যুগের কবিদের উপজীবিকা। সাধারণভাবে কবিওয়ালা নামেই এই সকল সাহিত্যপ্রয়াসীদের চিহ্নিত করা হয়। পূর্বতন যুগের রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত পাঁচালির বদলে এক নূতন ধরণের সুরপ্রাণ পাঁচালি গান, রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত শুদ্ধ প্রণয় কবিতার বদলে কবিসংগীত নামক একজাতীয় দেহসচেতন অমার্জিত গীতিকবিতা, শ্যামাবিষয়ক ভক্তিগীতি ও আগমনী-বিজয়া, কিছু কিছু লৌকিক প্রেমকবিতা, নূতন প্রণালীর যাত্রা—মোটামুটি ইহাই ক্রান্তিলগ্নের সাহিত্যসংবাদ। কবিসংগীতই এই যুগের সাধনায় বৈচিত্র্যে পরিমাণে কবিসংখ্যাধিক্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য অধ্যায়। কবিসংগীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

সন্ধিকালের সাহিত্য চর্চা

বিত্তবানদের মনোরঞ্জন

কবিসংগীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ

"বাঙলার প্রাচীন কাব্যসাহিত্য এবং আধুনিক কাব্যসাহিত্যের মাঝখানে কবিওয়ালাদের গান। ইহা এক নূতন সামগ্রী এবং অধিকাংশ নূতন পদার্থের ন্যায় ইহার পরমায়ু অতিশয় অল্প। একদিন হঠাৎ গোধূলির সময় যেমন পতঙ্গে আকাশ ছাইয়া যায়, মধ্যাহ্নের আলোকেও তাহাদিগকে দেখা যায় না, এবং অন্ধকার ঘনীভূত হইবার পূর্বেই তাহারা অদৃশ্য হইয়া যায়, এই কবির গানও সেইরূপ এক সময়ে বঙ্গসাহিত্যের স্বল্পক্ষণস্থায়ী গোধূলি-আকাশে অকস্মাৎ দেখা দিয়াছিল। তৎপূর্বেও তাহাদের কোনো পরিচয় ছিল না, এখনও তাহাদের কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।"

[গ্রাম্য সাহিত্য—লোকসাহিত্য]

ক্ষণস্থায়ী সাহিত্য

ঐতিহাসিক দিক হইতে এই মন্তব্য ত্রুটিহীন, কিন্তু কবিসংগীতগুলিকে

অবজ্ঞা করিবার যথেষ্ট কারণ নাই। ইহারা দেশের এক অপরিণত বিকৃত রুচি ও বিশৃঙ্খল পরিবেশে উপজাত হইয়াছিল বলিয়া ইহাদের বিষয়বস্তুর মধ্যে তাই শ্রোতৃসমাজের চারিত্রিক অবনতিরই প্রতিফলন ঘটিয়াছে। কবিওয়ালারা উচ্চ-সংস্কৃতিসম্পন্ন ছিলেন না, কিন্তু সাহিত্যচর্চা যে দেশের লোকসমাজের সর্বস্তরে নিম্নতম জীবিকাধারীর মধ্যেও প্রসারিত হইতেছে, ইহা তাহারই লক্ষণ। কবিসংগীতগুলি ছিল উত্তরপ্রত্যুত্তরমূলক, বাদ্যসমারোহে আসরে বিবদমান প্রতিপক্ষের মধ্যে উচ্চকণ্ঠে গেয়। এই ধরণের রচনায় সাধারণ নিম্নরুচি মানুষের যে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, শব্দালংকারপ্রিয়তা, ভাষার উপর স্বোপার্জিত অধিকার ও ছন্দযুক্তিবাদ প্রকাশ পাইত তাহা বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথও শেষ পর্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন—

কবিসংগীতের ঐতিহাসিক মূল্য

"এই নষ্টপরমায়ু কবির-দলের গান আমাদের সাহিত্য এবং সমাজের ইতিহাসের একটি অঙ্গ—এবং ইংরেজ রাজ্যের অভ্যুদয়ে যে আধুনিক সাহিত্য রাজসভা ত্যাগ করিয়া পৌরজনসভায় আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে এই গানগুলি তাহারই প্রথম প্রদর্শক।" [পূর্বোক্ত গ্রন্থ]

কবিসংগীত ব্যতীত যাত্রা-পাঁচালি, শ্যামাসংগীত, বাউলগান, টপ্পা-আখড়াই-ঢপকীর্তন, খেউড়-তর্জা, হাফ-আখড়াই প্রভৃতি আরও নানা জাতীয় রচনায় এই পর্ব ভারাক্রান্ত। রামগতি ন্যায়রত্ন নামক জনৈক সাহিত্যের ইতিহাসকার বাঙলা সাহিত্যের এই পর্বকে যথার্থই 'গানের যুগ' বলিয়াছেন। বাণী-বিগ্রহের দীনতাকে সমকালীন কবিরা যে গানের বিচিত্র স্বরমূর্ছনার দ্বারা আবৃত করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার কারণ, বিশুদ্ধ কাব্যপাঠের কৌতূহল তখনও জনসাধারণের মধ্যে জাগিয়া ওঠে নাই। কাব্যপ্রচারের জন্য মুদ্রাযন্ত্রেরও ব্যাপক প্রচলন হয় নাই। উচ্চবিত্ত সমাজ আপনার সৌভাগ্যগর্বিত বিলাসিতার অপরিহার্য অঙ্গরূপে গীতবাদ্যের আয়োজন করিত এবং তাহাদের শ্রুতিবিনোদনের জন্যই এই ধরণের সংগীতের প্রসার ঘটিয়াছিল। লোকসংগীত ওস্তাদি গান মার্গ-সংগীত লঘুসংগীত কীর্তন এই সকল নানা জাতীয় সাংগীতিক ঐতিহ্য মিশ্রিত হইয়া বাঙলা সাহিত্যের প্রাণরস পুষ্ট করিতেছিল।

অন্যান্য সাহিত্য সৃষ্টি

সংগীত-প্রাধান্যের কারণ

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য শ্যামাসংগীতে রামপ্রসাদেরই উত্তরসূরী। তদ্ব্যতীত মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, গোবিন্দ চৌধুরী, মহারাজ শিবচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র, মহতাবচাঁদ, রামকৃষ্ণ, নবচন্দ্র, নন্দকুমার প্রভৃতি রাজবংশীয় কবিবৃন্দ, নন্দকিশোর ব্রজকিশোর, রঘুনাথ রায় প্রভৃতি দেওয়ান-কবি শ্যামাসংগীতে খ্যাতনামা হইয়াছিলেন। কবিসংগীতকারদের মধ্যে রামবসু, হরুঠাকুর, শ্রীধর কথক, নিতাই বৈরাগী, ভবানী দাস, নীলু ঠাকুর, ভোলা ময়রা প্রভৃতি কবির নাম উল্লেখযোগ্য। গোপাল উড়ে, কৃষ্ণকমল গোস্বামী, মদন মাস্টার, পরমানন্দ দাস, গোবিন্দ অধিকারী, নীলকণ্ঠ প্রমুখ যাত্রাকারদের নাম পরবর্তীকালে আলোচনাযোগ্য হইয়াছে। রামনিধি গুপ্ত টপ্পা গানে, মধুসূদন কান ঢপকীর্তনে, দাশরথি রায়, রসিক রায়, ঠাকুরদাস দত্ত পাঁচালি গানে, মোহনচাঁদ বসু হাফ-আখড়াই গানে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। তাছাড়া লোকসংগীতে, আউল বাউল গানে, অন্যান্য কবিতায় এই পর্বে কবির সংখ্যা বিস্ময়কররূপে সমৃদ্ধ।

কবিদের পরিচয়

'মাধুকরী' সংকলনে প্রাচীন যুগ ও মধ্যযুগের সন্ধিকালের কবিদের মধ্যে গোবিন্দ অধিকারীর একটি রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক গীতি, মদন বাউলের দুইটি মিস্টিক অনুভূতির বাউল সংগীত, কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের একটি শ্যামাবিষয়ক পদ এবং দাশরথি রায়ের পাঁচালির অংশ বিশেষ সংকলিত হইয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যধারা

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা সাহিত্য বহুশাখায়িত বৈচিত্র্যে, অসাধারণ সৃজন-প্রতিভায়, বুদ্ধিদীপ্ত ঔজ্জ্বল্যে, রূপবৈশিষ্ট্যে পূর্ববর্তী আট শতাব্দীর ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়াছে। দীর্ঘ পুরাতন যুগের অবসানে এই নূতনের সূচনাহেতু উনিশ শতক হইতেই বাঙলা সাহিত্যের বয়ঃক্রম ধরা হইয়া থাকে। মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন, সংবাদপত্র-প্রকাশ, গদ্যের ব্যবহার, ইংরাজী শিক্ষার চলন, প্রতীচ্য সংস্কৃতির চর্চা, খ্রীস্টধর্ম-প্রচার, মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ, দেশচেতনা, সাহিত্যে মানবিক মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা, অলৌকিকতার অবসান, যুক্তিবাদের আলোকে জগৎ ও জীবনকে নিরীক্ষণ, উনিশ শতকীয় আধুনিকতার এই লক্ষণগুলি সাম্প্রতিককালের ছাত্রছাত্রীদের নিকট সুপরিচিত। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠার ফলে

আধুনিক যুগের লক্ষণ

বাঙলা গদ্যের দ্বারা ব্যবহারিক জীবনের প্রকাশ-মাধ্যম আবিষ্কার ও সাহিত্য-চর্চা যেমন নাগরিক বাঙালীর মননজীবিতা ও ভাবপ্রকাশের অনন্ত সম্ভাবনার দ্বার মুক্ত করিয়া দিল, তেমনি সাময়িক পত্রপত্রিকার মাধ্যমে কূপমণ্ডুক জাতি বিশ্বের সম্মুখে আপনাকে নিরীক্ষণ করিল। জাতীয় ইতিহাসে এই পর্ব নবজাগৃতি বা রেনেসাঁস নামে সুবিদিত। জনৈক ঐতিহাসিকের সুচিন্তিত মন্তব্য উদ্ধার করিয়া বলা যায়—

নবজাগৃতি বা রেনেসাঁস

"ইংরেজি সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিয়া বাঙালী নিজের সাহিত্যের অপূর্ণতার প্রতি সচেতন হইতে থাকে। ইহার প্রথম ফল ফলিল উনবিংশ শতাব্দের প্রথম ভাগে, গদ্য-পাঠ্যপুস্তক-প্রবর্তনে এবং সাময়িক পত্রিকার প্রতিষ্ঠায়। ইংরেজি শিক্ষা ও তজ্জনিত নব-মানসিকতার সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যে আধুনিকতার পথ পরিষ্কৃত হইতে লাগিল। রঙ্গলাল-মধুসূদন-ভূদেব-বঙ্কিমের রচনাকে সম্ভাবিত করিয়াছিল ইংরেজি শিক্ষা। ইংরেজি সাহিত্যের রসগ্রহণ করিয়া শিক্ষিত বাঙালীর চিত্তে যে আত্মসম্মান দেশপ্রীতি ও বিস্ফারবোধ জাগ্রত হইয়াছিল তাহাই আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের প্রেরণার মূল। এই নব প্রচেষ্টার রূপে যে বিদেশী-অনুচিকীর্ষা দেখা যায় তাহা লজ্জার কথা নয়, কিন্তু শিক্ষিত বাঙালীর মনে বিদেশী সাহিত্যের আস্বাদজনিত যে নূতনতর রসানুভূতি জগিযাছিল তাহাই গৌরবের।" [ডঃ সুকুমার সেন—বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড]

ইংরেজি শিক্ষা ও সাহিত্যচর্চার ফল

'আত্মসম্মান, দেশপ্রীতি ও বিস্ফারবোধ'

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই উনবিংশ শতাব্দীর অধুনিক যুগের প্রথম কবি। মনোধর্মে তিনি পূর্ববর্তী কবিওয়ালাদের সঙ্গে সমগোত্রীয়তা অনুভব করিলেও তাঁহার চিন্তা ও চেতনায়, গদ্য ও পদ্য রচনায় আধুনিক যুগের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, অহংতান্ত্রিকতা, স্বদেশপ্রীতি, মাতৃভাষার মহিমা-উপলব্ধি, সমাজ চেতনা ও মানবিকবোধ প্রতিফলিত হইয়াছিল। সাংবাদিকতা তাঁহার বৃত্তি ছিল, সেই সূত্রে তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া দেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক জীবনের নানাবিধ সমস্যার সহিত পরিচিত ছিলেন এবং সংবাদ প্রভাকরে কখনও অম্লাক্ত অক্ষরে তির্যক শ্লেষে বিচক্ষণ বিশ্লেষণে এই বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতেন। কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক চিত্ত ছিল কৌতুকপরায়ণ, বিক্রমশীল, বাস্তবধর্মী ও চিত্রকর;

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

ঈশ্বরগুপ্তের কবিস্বভাব

বিদেশী সভ্যতার সহিত প্রারম্ভিক সংঘর্ষজনিত হলাহলে যখন উনিশ শতকের নাগরিক জীবন কলুষিত হইয়া উঠিতেছিল, খ্রীস্টধর্মের অবাঞ্ছিত অত্যাচারে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি যখন বিপন্ন বোধ করিতেছিল ঈশ্বরচন্দ্র তখন তাঁহার স্বাভাবিক ব্যঙ্গ-পরায়ণতার দ্বারা জীবনের সেই সাংস্কৃতিক বৈপরীত্যের প্রতি আঘাত করিয়াছেন। তাঁহার অনুপ্রাসপ্রিয়তা শব্দাড়ম্বর হেঁয়ালি-রচনা প্রাচীনত্বেরই নামান্তর, আবার এই প্রাচীনত্বের আবরণের নিম্নে যে আধুনিকতার আভরণ রহিয়াছে, তাহা স্বর্ণালংকার না হইতে পারে, কিন্তু মেকি নয়। ঈশ্বরচন্দ্রের মৌলিকতা ও নবযুগচেতনা নিহিত আছে তাঁহার ঋতু ও ধর্মবিষয়ক কবিতায়।

গুপ্তকবির আধুনিকতার লক্ষণ

ধর্মসম্বন্ধীয় কবিতায় তিনি প্রাচীন ধারার অনুবর্তন না করিয়া ঈশ্বরের সঙ্গে পিতৃসম্পর্ক স্থাপন করিয়াছেন। জগতের প্রতি প্রীতিরক্ষাকেই কবি পরমার্থ বলিয়া মনে করিয়াছেন। তাঁহার অসংখ্য ভক্তি-কবিতায় ব্রাহ্ম উপাসনার মত ঈশ্বরের নিরাকার অপৌত্তলিক মহিমার ধ্রুব প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করা যায়। নবজাগৃতির

ধর্ম বিষয়ে আধুনিকতা

অন্যতম লক্ষণ হিউম্যানিজম্, মানবিক দৃষ্টিতে ধর্মঅর্থ-কামমোক্ষের ব্যাখ্যা। মানব মহিমার শ্রেষ্ঠত্ব, মনুষ্য-জীবন সম্পর্কে শ্রদ্ধা, মানুষের আদর্শের নিরিখে সবকিছু বিচার করাই পঞ্চদশ শতাব্দীর ইতালীয় নবজাগৃতির মূল লক্ষণ ছিল। গুপ্তকবি প্রাক্তন যুগের মনোভাবে পরিবর্ধিত হইয়াও প্রতিভার সংস্কারবশে এই মনুষ্যবোধের

মানবিকবোধের সূচনা

প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার কবিতায় সুলভ রসিকতা, শ্লিষ্ট বিদ্রূপ ও ক্লিষ্ট রুচির রন্ধ্র দিয়া জীবন সম্পর্কে এই শ্রদ্ধাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার তত্ত্বকবিতাগুলিতেই এই পূর্ণ অখণ্ড মনোভাবের দ্যোতনা দেখা যায়। পারমার্থিক কবিতায় ঈশ্বরচন্দ্র মানুষের দম্ভ, সমাজের ভণ্ডামি, শ্রেণী বিশেষের পরশ্রীকাতরতা, ধর্মের নামে কাপট্যকে নির্মমভাবে আঘাত করিয়াছেন। অভিজ্ঞতালব্ধ ইন্দ্রিয়গোচর জ্ঞানই ঈশ্বর গুপ্তের নিসর্গদর্শনের প্রেরণা। জীবনে

ঋতু সম্পর্কে নূতন চেতনা

অবাস্তব ঋতুর সুদৃশ্য শোভন রূপবর্ণনা অপেক্ষা ঋতুর বাস্তব পীড়াদায়ক দুষ্টরূপের কাব্যবিবৃতির অভিনবত্বেই তিনি পুলকিত হইয়াছেন। নিদারুণ গ্রীষ্মতাপে রৌদ্রের প্রচণ্ড প্রকোপে পশুপক্ষীমানবের অস্বস্তিকর যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতির একরূপতা,

খাদ্যখাদক প্রাণীর বৈপরীত্যমূলক আচরণ, কবিপ্রসিদ্ধিগত রূপক-সম্পর্কের অর্থহীনতা, নগর ও গ্রামীণ জীবনের সমান-বিপন্নতা, ঊর্ধ্ববাহু সতৃষ্ণ বারিভিক্ষা, সৌন্দর্যনিকেতন পল্লীপ্রকৃতির ফলহীন শুষ্ক পাণ্ডুরতা—কোনো সূক্ষ্ম কবিকল্পনার বদলে দীর্ঘশ্বাসমূলক হতাশ পিপাসার ঘর্মার্ত ও স্বেদলবণাক্ত কাব্যানুভূতি জাগ্রত করিয়াছে। বাঙলাদেশের উৎসব-আনন্দ, তাহার পালপার্বণ ও সাংস্কৃতিক আনন্দোচ্ছলতার সমারোহ-বর্ণনায় গুপ্তকবির অপরিম্লান উৎসাহ ছিল। তাঁহার দেশচেতনা ছিল আবেগোষ্ণ ও আদিম-প্রকৃতির, মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল আন্তরিক এবং কাব্যচর্চাকে তিনি বিশুদ্ধ সারস্বত কৃত্য বলিয়া মনে করিতেন। নবীন লেখকদের অনুশীলিত করাও তাঁহার সকর্মক জীবনের এক অবশ্যপালনীয় ধর্ম ছিল। মোটের উপর ঈশ্বর গুপ্তের বাস্তবতা ও যুক্তিবাদ, রোমান্টিকতাবিরোধী প্রখর বস্তুচেতনা, বিদ্রূপশীলতা ও স্বদেশচৈতন্য বাঙলা কবিতার ক্ষেত্রে যে একটি নূতন যুগের পত্তন করিয়াছিল সেই ধারাতেই রঙ্গলাল হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

দেশ চেতনা

বয়সে মধুসূদন অপেক্ষা কনিষ্ঠ হইলেও, মধুসূদনের পূর্বে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পরবর্তী অধ্যায়ে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতেই আধুনিক কাব্যের বৈজয়ন্তীটি সুপবনে উড্ডীন হইয়াছিল। রঙ্গলালের ইংরাজি-শিক্ষা গুরু ঈশ্বরচন্দ্র অপেক্ষা প্রবীণ ছিল এবং মার্জিত মন ও শিষ্ট অনুশীলনের দ্বারা কবিতায় প্রাচীনত্বের শেষ মুদ্রাচিহ্নটি তিনি লুপ্ত করিয়া দিলেন। ইতিহাস-চেতনার সহিত দেশপ্রেমের বার্তা বহন করিয়া যুগচিত্তকে বিহ্বল করিয়া দিল তাঁহার পদ্মিনীর উপাখ্যান, অন্তঃপুরিকা নারীকে তিনি নতুন কালের বীরাঙ্গনারূপে দেখিলেন। বীরত্বব্যঞ্জন উপকথা, বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়, উত্তেজক ভাষা ও ছন্দ, জীবন ইতিহাসের স্বপ্নকল্পনা ইহাই রঙ্গলালের কাব্যসাধনা। রঙ্গলালের খনিতপথে সমুদ্রকল্লোলে আবির্ভূত হইলেন মধুসূদন দত্ত। য়ুরোপীয় কাব্যসাধনায় তাঁহার কবিধর্ম পরিপুষ্ট হইয়াছিল। নতুন কালের ক্ষুরধার বুদ্ধি ও যুক্তিবাদ, কাব্যকলার অভিনব সংস্কার, নবীন সমাজের ব্যক্তিত্ব-প্রধান পুরুষ ও নারীচরিত্র, দেশগৌরব ও মনুষ্যত্বচেতনা মধুসূদনের কাব্যকে দেশজ সংস্কারের সংকীর্ণতা হইতে বিশ্বসাহিত্যের বৃহত্তর ক্ষেত্রে স্থাপিত

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

আধুনিকতার স্বভাব

মধুসূদন

করিয়াছে। গ্রীক-রোমক সাহিত্যের জীবনাদর্শ, ইতালীয় নবজাগৃতির মানবতাবাদ, মিলটনের জলদগম্ভীর ছন্দ-ধ্বনি, ইহার সহিত বাল্মীকি-বেদব্যাসের কাব্যাদর্শ, কালিদাসের সৌন্দর্যবোধ —এই সাধনার ধারা মধুসূদনের ধেয়ানে মিলিত হইয়াছে।

বিশ্বসাহিত্যের পুরোহিত

পয়ার-ত্রিপদীর আড়ষ্টতার মধ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের বীর্যবান প্রবাহ বাঙলা কাব্যকে বহু শতকের জড়তা হইতে মুক্ত করিল। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে সৌন্দর্য ও বলিষ্ঠতার সহিত রোমান্টিক ভাবধারায় পরিণয় ঘটিল, মেঘনাদবধ কাব্যে নিয়তি ও দৈবনির্যাতিত শক্তিধর পুরুষের ব্যর্থ সংগ্রামে মনুষ্যত্বের অপরাজিত মহিমা সকল হীন লাঞ্ছনার মধ্য হইতেও অভ্রভেদী হইয়া উঠিল। গীতিরসোদ্বেল বাঙালী জীবনে মহাকাব্যের এই বিপুল ব্যঞ্জনাসৃষ্টিতেই মধুসূদনের প্রতিভা মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়া থাকিবে।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য

পৌরাণিক নীতিবোধকে চূর্ণ করিয়া মধুসূদন রামের দৈবমাহাত্ম্যের পাশে রাবণ-ইন্দ্রজিতের কলঙ্কিত চরিত্রকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পুরুষকার জাতীয়তা ও পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বাল্মীকির রামায়ণ হইতে বিষয়বস্তু গ্রহণ করিলেও ইহার কাহিনী মধুসূদনের আপন অদৃষ্ট-নির্যাতিত জীবনের সঙ্গে ঐকরূপ্য লাভ করিয়া রাবণকে মধুসূদনের মতই ভাগ্যহত অথচ অনমনীয় করিয়া তুলিয়াছে। বীরত্বের গগনচুম্বী শিখরেই দুরদৃষ্টের বজ্রপাত সর্বাধিক বাজিয়াছে বলিয়া ইহার প্রচণ্ড আস্ফালনের মধ্যে ট্রাজেডির গভীর ক্রন্দন ইহাকে শুষ্ক পাণ্ডিত্যপূর্ণ মহাকাব্য না করিয়া নবজীবনের আত্মচরিত করিয়া তুলিয়াছে।

মেঘনাদবধ কাব্য

কাহিনীতে কবি-ব্যক্তিত্বের প্রলেপ

সমুদ্রবারির বিশাল তরঙ্গ গর্জন স্তিমিত হইয়া নদীখাতে প্রবেশ করিলে কলস্বনা তটিনীতে পরিণত হয়, মেঘনাদবধের জলদগম্ভীর কণ্ঠ ব্রজাঙ্গনায় অনুপস্থিত। এখানে বৈষ্ণব কবির রাধিকা মধুসূদনের কাব্যনায়িকা, তাহার করুণ-কোমল কণ্ঠস্বরে রোমান্টিক প্রেমের গীতিমূর্ছনা, প্রকৃতির বর্ণবৈচিত্র্য ও ঋতুর পুষ্পপল্লব তাহাকে সাতরঙে রাঙাইয়া যায়। অন্তঃপুরচারিণী অবরুদ্ধা নারীর জন্য মধুসূদনের একটি আজন্ম সহানুভূতি ছিল। ইহার সহিত নবকালের স্বাধীন ব্যক্তিত্ব ও সংস্কারহীন প্রেম-চেতনা মিলিত হইয়া ব্রজাঙ্গনা কাব্যের জন্ম দিয়াছে। নারীর প্রতি আকর্ষণ,

ব্রজাঙ্গনা কাব্য

সংস্কারহীন প্রেমচেতনা

নারীত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, নারীর সৌন্দর্যকোমলতা ও বীর্যশালিতার যুগপৎ চিত্রণে তাঁহার আগ্রহ, তিলোত্তমা সীতা প্রমীলা ও রাধাচরিত্রেই নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। রোমক পত্রকাব্যের আঙ্গিক-সাদৃশ্যে একাদশটি পৌরাণিক নারীর আত্মবিবৃতি সংগ্রহ করিয়া মধুসূদন নবীনচিত্তের নূতন নারীবন্দনা রচনা করিলেন বীরাঙ্গনা কাব্যে। কুলাচার, শাস্ত্রীয়বাধা, সামাজিক অবরোধ কিংবা চিত্তের সংস্কার হইতেও প্রেম বড়, স্বাধীন হৃদয়ের নির্বাচন বড, দুই নয়নের কিরণসম্পাতে অপরের নয়ন-বরণের আদর্শ বড়, এই বলিষ্ঠ ঘোষণাই বীরাঙ্গনা কাব্যের মর্মবাণী। ইহার পর ফরাসীদেশে অবস্থানকালে মধুসূদন তাঁহার সারস্বত জীবনের শেষ নৈবেদ্য চতুর্দশপদী কবিতাবলী রচনা করেন। সনেট নামক কলা-কৃতির প্রবর্তন করিয়া বাঙলা গীতিকাব্যে তিনি যেমন নূতন উপনিবেশের সৃষ্টি করিলেন সেইরূপ এই খণ্ড কবিতাবলীর ভিতর দিয়া মধুসূদনের ব্যক্তিজীবনের অশ্রুবেদনা প্রেমব্যর্থতা দেশপ্রীতি ও সাহিত্যচেতনা, স্মৃতি ও সৌহার্দ্যের ফলে এক অপরূপ চলচ্চিত্র রূপায়িত হইয়াছে। কাব্যসৃষ্টি ছাড়া নাট্যরচনায় তাঁহার প্রতিভার বিস্ময়কর বিকাশ সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছে। কিন্তু নাট্য-রচনা অপেক্ষা কাব্যসৃজনেই মধুসূদনের অবিস্মরণীয় গৌরব। পুরাতন ছন্দের ভগ্ন গৃহভিত্তির উপর তিনি অমিত্রাক্ষরের সৌধ নির্মাণ করিয়াছেন, বাঙলা কাব্যের বাক্‌প্রতিমাকে নূতন সাজে অলংকারে জগন্মোহিনী করিয়া তুলিয়াছেন। গীতিকবিতা ও মহাকাব্য, বলিষ্ঠতা ও কোমলতা, বীররস ও করুণরস—এই দুই পরস্পরবিরোধী আদর্শ সৃষ্টিতে তাঁহার অনায়াস-নৈপুণ্য বাঙলা কাব্যকে ভাবালুতা ও অশ্রু-প্লাবন হইতে চিরকালের মত বাঁচাইয়া দিয়াছে।

বীরাঙ্গনা কাব্য

বীরাঙ্গনার মর্মবাণী

চতুর্দশপদী কবিতাবলী

কাব্য ও অন্যান্য সৃষ্টি

মৌলিকত্ব

মধুসূদনের কাব্যসাধনার ঐতিহ্য আত্মসাৎ করিয়াই বাঙলা কাব্যের ক্ষেত্রে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটে। মধুসূদনের প্রতিভার বলিষ্ঠতা ও অনন্যসাধারণ আত্মপ্রত্যয় তাঁহাদের ছিল না। কিন্তু অনুচিকীর্ষা মাত্র সম্বল করিয়া যুগোপযোগী ভাবাদর্শের উত্তেজনায় তাঁহারাও সমকালে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন। মধুসূদনের মত বিশ্ববিদ্যাপ্রবাহ পরিগৃহীত করার সামুদ্রিক

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন

প্রতিভা তাঁহাদের ছিল না। কেবল ইংরেজি শিক্ষাভিমান মাত্র সঞ্চয় করিয়া ইহার সহিত দেশাত্মবোধ, পৌরাণিক রুচি ও সংস্কার, নীতিবোধ, আধ্যাত্মিকতা—এইসব সংমিশ্রিত করিয়া তাঁহারা মহাকাব্য রচনার বৃহৎ আয়োজন করিয়াছেন। তাঁহাদের বলিবার বিশেষ কিছুই ছিল না, কিন্তু কথা ছিল অফুরন্ত। বক্তৃতা ও বিবরণে সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে হেম-নবীনের আর জুড়ি নাই।

মধুসূদনের সঙ্গে তুলনা

হেমচন্দ্রের কাব্য

হেমচন্দ্র বীরবাহুকাব্য, ছায়াময়ী, বৃত্রসংহার, দশমহাবিদ্যা, আশাকানন নামক কয়েকখানি আখ্যানকাব্য এবং অসংখ্য খণ্ড কবিতাবলী রচনা করিয়াছিলেন। এইগুলির ভিতর বৃত্রসংহার মেঘনাদবধের অনুকরণে রচিত কৃত্রিম মহাকাব্য, আশাকানন ও ছায়াময়ী রূপক কাব্য, দশমহাবিদ্যা হিন্দুপুরাণভিত্তিক তত্ত্বকাব্য এবং বীরবাহু দেশাত্মবোধক কল্পনাকাহিনী। বৃত্রসংহারে হেমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম চরিত্রসৃষ্টিক্ষমতা ভাষা ও ছন্দোদক্ষতা আংশিক সফল হইয়াছে, কিন্তু সনাতন নৈতিক আদর্শে রচিত বলিয়া ইহা উত্তরকালের পাঠককে মুগ্ধ করিতে পারে না। দধীচির অস্থি দ্বারা বজ্র নির্মাণ করিয়া অন্যায়ভাবে পরাক্রান্ত শচীহরণকারী বৃত্রের নিধনকাহিনী কাহিনীর দিক দিয়া কোনো কৌতূহল চরিতার্থ করে না। বৃত্রের পতন শাশ্বত পাপের পতন-কাহিনী বলিয়া কোনো অভিনব মানবিক মূল্যবোধে পুরাতন প্রথাভঙ্গের অপ্রত্যাশিত চমকে আমাদের বিস্মিত করে না। যে গভীর মানবাত্মার ক্রন্দন মধুসূদনের কাব্যজীবিত, ভাগ্যের সহিত নিষ্ঠুর পরিহাসকল্প সংগ্রামে পুরুষকারের পতনের যে অনিবার্য বেদনাময় পরিণতি তাঁহার পুরাণবৃত্তকে চিরকালের মানবমনে প্রতিষ্ঠিত করে, হেমচন্দ্র তাহাকে সযত্নে পরিহার করিয়া একটি ছাত্রপাঠ্য মহাকাব্য লিখিয়াছেন মাত্র, তদতিরিক্ত গৌরব ইতিহাস তাঁহাকে দেয় নাই। হিন্দুধর্মের সতর্ক রক্ষণাবেক্ষণ, হিন্দুধর্ম ও তাহার আধ্যাত্মিকতার প্রাণসত্তার পুনরুজ্জীবন, উচ্চকণ্ঠ জাতীয়তাবাদ ও পরাধীনতার জন্য গ্লানি, মোটামুটি কৌতুকপ্রদ পরিহাসকুশলতা—এই সকল মূলধন হইতে হেমচন্দ্র জনপ্রিয়তার সুদের হার ঊর্ধ্বমূল্যেই

বৃত্রসংহারের সমালোচনা

মধুসূদনের কাব্যবাণী ও হেমচন্দ্রের কাব্য-বক্তব্য

ছাত্রপাঠ্য মহাকাব্যের কবি

জনপ্রিয়তার কারণ

লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু যুগ পরিবর্তনে নূতন পণ্যদ্রব্যের সমারোহে আধুনিকতার বিপণি হইতে এগুলি অপসারিত হইয়াছে। ছোট ছোট কবিতায় হেমচন্দ্র ঋতু প্রকৃতি প্রেম স্বদেশ ব্যঙ্গ মানবজীবন তত্ত্ব বিষাদ এইগুলিকেই অবলম্বন করিযাছেন, কিন্তু তাহা মধুসূদনের চতুর্দশপদীর মত গাঢবদ্ধ হয় নাই। তবে ব্যক্তিতান্ত্রিকতা, আত্মমনস্কতা, স্বগত সংলাপ, ভাবাবেগ, গভীর দেশচেতনা—এইগুলি যে শ্রেণীর গীতিকবিতার লক্ষণ, হেমচন্দ্র সেই ধ্বনের কবিতায পারংগম শিল্পী। স্কট মূর বায়রণ পোপ টেনিসন প্রমুখ ইংরাজ কবিদেব কবিতা অনুবাদে তিনি সিদ্ধলেখন ছিলেন, যদিও তাঁহাদের সূক্ষ্মরসবোধ তাঁহার অনায়ত্ত ছিলেন। দান্তের ডিভাইন কমেডির অনুসরণ-অনুবাদে রচিত ছায়াময়ী তাঁহার ব্যর্থকাম বাক্‌পটুতার স্বাক্ষর। বুদ্ধিজীবিতার দিক দিয়া মধ্যবিত্ত পাঠকের পক্ষে হেমচন্দ্রের কবিতা সহজবোধ্যতা ও অনায়াস-সঞ্চারী তরলরস পরিবেশনে, তাহা প্রেমই হোক অথবা স্বদেশপ্রীতিই হোক, সুখপাঠ্য হইয়াছিল মাত্র। মধুসূদনের কবিতায় আত্মাব শিহরণ, সত্তার চেতনা; হেমচন্দ্রের কবিতায় রোমকূপের শিহবণ, ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা।

খণ্ড কবিতাবলী

ইংরেজি কবিদের প্রভাব

মধুসূদন আত্মার কবি হেমচন্দ্র ইন্দ্রিয়ের কবি

এবং নবীনচন্দ্র হেমচন্দ্রেরই মুদ্রাপৃষ্ঠ। সেই উচ্চবাক্ সুপচ্ছবিলাস, মধ্যবিত্ত পাঠকের মনঅধিনায়কতা, দেশপ্রেমের তূর্যনিনাদ ও হিন্দু-সংস্কৃতিব ন্যাস-বক্ষকতা, হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্যঘোষণা, পৌরাণিক মহিমার ঊর্ধ্ববাহু কীর্তন, স্বগত চিন্তার প্রগল্‌ভতা নবীনচন্দ্রের কাব্যবৈশিষ্ট্য। পলাশীর যুদ্ধের রণদামামা ও অস্তায়মান স্বাধীনতা-সূর্যের জন্য বিলাপের মধ্য দিয়া তিনি কাব্যজগতে প্রবেশ করেন এবং কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের অবসানে শ্রীকৃষ্ণের মহাভারত গঠনের অসমাপ্ত স্বপ্নের মধ্য দিয়া তাঁহার বিদায়গ্রহণ। ইহার পরও দুই একটি রচনা তিনি সমাপ্ত করেন কিন্তু সেইগুলি পূর্বযুগেরই অন্নোদ্‌গার মাত্র। পলাশীর যুদ্ধ ও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ—এই দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী নবীনচন্দ্রের কাব্যস্ফুরণ কখনও রোমান্টিক ভাবোচ্ছ্বাসে, কখনও সুলভ দেশগৌরবে, কখনও মহাভারত গঠনের বায়বীয় স্বপ্নে আক্রান্ত। পলাশীর যুদ্ধ কবিকে খ্যাতি দিয়াছিল। রৈবতক কুরুক্ষেত্র প্রভাস তাঁহাকে চিন্তাশীল

নবীনচন্দ্র হেমচন্দ্রেরই রূপান্তর

পলাশীর যুদ্ধ ও কুরুক্ষেত্রেব কবি

ভাবুক কবি এইরূপ উপাধি দিয়াছিল। রঙ্গমতী, ক্লিওপেট্রা, খৃস্ট, অমিতাভ, অমৃতাভ প্রমুখ কাব্যগ্রন্থ তাঁহাকে অসাধারণ কিছুই দেয় নাই। তিন খণ্ড মহাভারত রচনার মধ্য দিয়া নবীনচন্দ্র যে বিপুলায়তন ভাবগর্ভ মহাকাব্য রচনার পরিকল্পনা করেন, তাহার কেন্দ্রীয় ঘটনা সুভদ্রা হরণ, অভিমন্যু বধ, যদুবংশ ধ্বংস এবং কৃষ্ণের তনুত্যাগ।

সমকালীন জনপ্রিয়তা

ত্রয়ী মহাকাব্যের বক্তব্য

খণ্ডছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে এক অখণ্ড ধর্মরাজ্যপাশে বন্দী করিয়া, সর্বভূতহিত, নিষ্কাম প্রেম ও কর্মের আদর্শে ঐক্যবদ্ধ করার মহতী পরিকল্পনায় বিস্ময় আছে, বিশ্বাস নাই। অতিরিক্ত ভক্তিবাদ, কৃষ্ণময়তা, বাগাড়ম্বর, ভাবালুতা সব মিলিয়া রৈবতক-কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা অক্ষম মহাকাব্য। হেমচন্দ্রের মত নবীনচন্দ্রও অসংখ্য খণ্ড কবিতা লিখিয়াছিলেন, বিষয়বস্তুর দিক হইতে একমাত্র বিদ্রূপাত্মক কবিতার অভাব ব্যতীত হেমচন্দ্রের সহিত তাঁহার এবিষয়েও বিশেষ বৈপরীত্য নাই। চিন্তাতরঙ্গিণী এবং অবকাশরঞ্জিনী হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের এই দুই কাব্যগ্রন্থের নাম হইতেই তাঁহাদের গীতিধর্মিতার স্বরূপ নির্ণয় করা যায়। সাময়িক ঘটনা, অতীত গৌরব, নৈরাশ্য, হৃদয়-উচ্ছ্বাস ও অকারণ চিন্তাভার তাঁহাদের দুজনেরই কবিধর্ম।

খণ্ড কবিতাবলী

হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের তুলনা

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কাব্যের ক্ষেত্রে একদিকে যেমন এই ধ্রুপদী মহাকাব্যের আঙ্গিক অনুসরণ চলিতেছে, অন্যদিকে তেমনি রোমান্টিক কবিতারও অনুশীলন সুরু হইয়া গিয়াছে। মধুসূদনের ক্লাসিকাল কাব্যরীতির ঘনকায় গঠনের মধ্যেই ব্যক্তিপুরুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ক্লাসিক ও রোমান্টিক সর্বকালের কবিদের দুই দৃষ্টিভঙ্গির নাম মাত্র। বিশ্বকে তদ্গত হইয়া দেখা, পাণ্ডিত্যজগতে পরিভ্রমণ করা, ইন্দ্রিয়গম্য জ্ঞানকে প্রাধান্য দান করা, দৃঢ়কঠিন আঙ্গিকে সাহিত্যের কায়গঠন যেমন কবিতার একপ্রকার স্বভাব, তেমনি বিশ্বকে আত্মগতভাবে দর্শন করা, ভাবের জগতে বিচরণ করা, ইন্দ্রিয়াতীত উপলব্ধির মূল্য স্বীকার করা, শিথিল অবিন্যস্তভঙ্গিতে কবিতার তনুদেহ প্রসাধিত করাও কবিতার অন্যতম স্বভাব। এই দ্বিতীয় ধারার

ক্লাসিক ও রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি

সার্থক প্রবর্তন করিলেন বিহারীলাল চক্রবর্তী। কবির ব্যক্তিপুরুষের স্বয়ংক্রিয় উপস্থিতি, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে কল্পনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি, প্রকৃতি মানবজীবন ও নরনারী সম্পর্কে বিস্মিত চেতনা, প্রেমের নূতন মূল্য আবিষ্কার, জীবনের ব্যর্থতায় কারুণ্য, দৃষ্টিগ্রাহ্য পদার্থকে দূরত্বে স্থাপন করিয়া তাহাকে রহস্যমণ্ডিত চোখে অবলোকন করা, দেববাদী অলৌকিকতাকে অস্বীকার করা—এইগুলিকে বলা যায় রোমান্টিক কবিপ্রকৃতি। মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতায় হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যের ফাঁকে ফাঁকে এবং তাঁহাদের খণ্ড কবিতার কোথাও কোথাও এই রোমান্টিকতার গোত্রচিহ্ন স্পষ্টভাবে দেখা যায়। সামগ্রিক কবিপ্রকৃতিতে রোমান্টিকতার তিলক পরিয়া আবির্ভূত হইলেন বিহারীলাল। তিনি প্রকৃতির মধ্যে এক অনাস্বাদিতপূর্ব সৌন্দর্যসন্ধান করিলেন। বিশ্বের জড়বস্তুর মধ্যে এক অস্থির চৈতন্যের লীলাবিহার অনুভব করিলেন। গার্হস্থ্য জীবনের সুখদুঃখ তাঁহার নিকট এক মধুর রহস্যের স্বাদ বহন করিয়া আনিল। ইংরাজি সাহিত্যে কোলরিজ ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ, স্কট-বায়রণ, শেলী-কীট্‌স্‌-এর কবিতায় যে নিসর্গ-সৌন্দর্য, প্রেমপুলক, অনুভূতিপ্রাবল্য ও অস্পষ্টতা লক্ষ্য করা যায় বিহারীলাল যেন আপনার অজ্ঞাতে তাহাই বাঙালীর চিত্তভূমির উপযোগী করিয়া বাঙলা সাহিত্যে সঞ্চার করিলেন। মহাকাব্য-আখ্যানকাব্যের মধ্য দিয়া সমকালীন কবিরা যখন স্বদেশ ও স্বজাতির বীর্যশৌর্য শোক ও সংগ্রাম লইয়া ব্যস্ত তখন বিহারীলালের আত্মমগ্ন গীতোচ্ছ্বাস ধ্বনিত হইল, 'সর্বদাই হু হু করে মন, বিশ্ব যেন মরুর মতন'। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

বিহারীলাল

রোমান্টিকতার স্বরূপ

রহস্য ও অস্পষ্টতা

স্বকীয় কবিকণ্ঠ

"আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম বোধহয় কবির নিজের কথা। তৎসময়ে অথবা তৎপরে মাইকেলের চতুর্দশপদীতে কবির আত্মনিবেদন কখনও কখনও প্রকাশ পাইয়া থাকিবে, কিন্তু তাহা বিরল—এবং চতুর্দশপদীর সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে আত্মকথা এমন কঠিন ও সংহত হইয়া আসে যে, তাহাতে বেদনার গীতোচ্ছ্বাস তেমন স্ফূর্তি পায় না।

রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য

বিহারীলাল তখনকার ইংরেজি ভাষায় নব্যশিক্ষিত কবিদিগের ন্যায়

যুদ্ধবর্ণনাসংকুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখিলেন না, এবং পুরাতন কবিদিগের ন্যায় পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও গেলেন না—তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন। তাঁহার সেই স্বগত উক্তিতে বিশ্বহিত দেশহিত অথবা সভামনোরঞ্জনের কোনো উদ্দেশ্য দেখা গেল না। এইজন্য তাঁহার সুর অন্তরঙ্গরূপে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সহজেই পাঠকের বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়া আনিল।......

রোমাণ্টিকতার প্রকৃতি

·যে ভাবের উদয়ে পরিচিত গৃহকে প্রবাস বোধ হয় এবং অপরিচিত বিশ্বের জন্য মন কেমন করিতে থাকে বিহারীলালের ছন্দেই সেই ভাবের প্রথম প্রকাশ দেখিতে পাইয়াছিলাম।"

[বিহারীলাল—আধুনিক সাহিত্য]

অবশ্য প্রথম আত্মপ্রকাশেই বিহারীলাল সর্বজনপ্রিয় হইয়া উঠেন নাই, প্রাতঃসূচনার বিহঙ্গকাকলি বিলম্বজাগরের কর্ণে প্রবেশ না করাই স্বাভাবিক। মেঘনাদবধ কাব্যের এক বৎসর পরই তাঁহার প্রথম গ্রন্থ সংগীতশতক প্রকাশিত হয় এবং তাঁহার শেষ শ্রেষ্ঠকাব্য সাধের আসন নবীনচন্দ্রের প্রভাস-মহাকাব্যখণ্ডের পূর্বেই রচিত হয়। অর্থাৎ বিহারীলালের কাব্যারম্ভে মধুসূদনের মহাকাব্য এবং সমাপ্তে নবীনচন্দ্রের মহাকাব্য—এই দুই মহাকাব্যের শুক্তির কঠিন আবরণেই বিহারীলাল তাঁহার ধ্যানসৌন্দর্যের গীতিকবিতাটিকে মুক্তা করিয়া তুলিয়াছেন। আত্মনিষ্ঠ প্রকৃতিচেতনা, সৌন্দর্যসত্তার অনুধ্যান, নারীকে বিশ্বলক্ষ্মী করিয়া দেখা, নিসর্গের প্রতি জন্মান্তরের সৌহৃদ্য অনুভব বিহারীলালের কবিতার বিশেষত্ব, সর্বত্রই কবিতার ছন্দ ও ভাষায় একটি অশ্রুত সংগীতধ্বনি বিরাজমান। সমাজের যান্ত্রিক কোলাহল প্রকৃতির নির্জন নৈঃশব্দ্যের তীরে কবিকে নির্বাসিত করিয়া দিতে চায়, যেন সেইখানেই কবির মুক্তির অলকাপুরী। সংগীতশতক বঙ্গসুন্দরী নিসর্গসন্দর্শন বন্ধুবিয়োগ প্রেমপ্রবাহিনী সারদামঙ্গল ও সাধের আসন এইগুলি বিহারীলালের মুখ্য কাব্যগ্রন্থ।

যুগ ও কাল

গীতিধর্মিতা

বিহারীলাল প্রবর্তিত রোমাণ্টিক কবিগোষ্ঠীর উজ্জ্বল সদস্য সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বিহারীলালের প্রেমচিন্তা নিসর্গপ্রীতি সৌন্দর্যবোধ ও নারীমমতাকেই কবিতার বিষয় করিয়া সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁহার ষড়্ঋতুবর্ণন

কাব্যে প্রকৃতির প্রতি মানবের স্বাধীন সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে, মহিলা যেন বঙ্গসুন্দরীরই কাব্যব্যাখ্যান। পরবর্তী রোমান্টিক কবিদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, গোবিন্দচন্দ্র দাস, অক্ষয় চৌধুরী, স্বর্ণকুমারী দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রমুখ কবিদের নাম স্মরণীয়। মধ্যপর্বে বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায়, গোবিন্দচন্দ্র রায়, প্রসন্নময়ী দেবী, কামিনী রায়, প্রমুখ কবিদের নাম উল্লেখযোগ্য।

পরবর্তী কবিবৃন্দ

মিত্রাক্ষর : মধুসূদন দত্ত

ভূমিকা

পাশ্চাত্য মনীষী এমার্সন বলিয়াছেন, The greatest genius is the most indebted man, মধুসূদন সম্পর্কেও মন্তব্যটি প্রযোজ্য। উনবিংশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য আত্মসাৎ করিয়াই বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যশোহর সাগরদাঁড়ি গ্রামে তাঁহার বাল্যজীবন, কলকাতায় কৈশোর যৌবন কাটাইয়া এবং মাদ্রাজে কিছুকাল অবস্থান করিয়া মধুসূদন জীবনে ও জীবিকায় আত্মপ্রকাশের উপায় খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। খ্রীস্টধর্ম গ্রহণের ফলে বিদেশ যাত্রায় সুবিধা হইবে মনে করিয়াছিলেন, তাহাও সম্ভব হয় নাই। অথচ শিক্ষাদীক্ষায় তিনি ছিলেন ত্রুটিহীন আধুনিক যুগের প্রতিনিধি। বন্ধুবান্ধবদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়াই সাহিত্য সৃষ্টি করেন এবং ১৮৫৮ হইতে ১৮৬২-র মধ্যেই বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক, কবি ও নাট্যকারের মর্যাদা লাভ করেন। ইহার পর ১৮৬৫ সালে ফরাসী দেশে অবস্থান কালে তাঁহার কাব্যপ্রতিভার অন্তিম স্ফুরণ ঘটে। মধুসূদনের শ্রেষ্ঠত্ব তাঁহার রচনার পরিমাণে নয়, অভিনবত্বে, মৌলিকতায়, প্রান্তরের মধ্য দিয়া প্রশস্ত পন্থা নির্মাণে। তাঁহার প্রথম কাব্য তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য—বাঙলা ভাষায় লেখা সর্বপ্রথম পৌরাণিক-বিষয়-অবলম্বিত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত রোমান্টিক আখ্যানকাব্য।

কবি-পরিচয়

মেঘনাদবধ তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা, বীররসাত্মক মহাকাব্য। ব্রজাঙ্গনা বীরাঙ্গনায়ও পৌরাণিক অনুবৃত্তি, তবে আঙ্গিক গীতিকবিতাধর্মী; বীরাঙ্গনা পত্রকাব্য। সর্বশেষ কাব্য চতুর্দশপদী কবিতাবলী বাঙলা ভাষায় রচিত প্রথম সনেট, মধুসূদনের ব্যক্তিজীবনের ও তাঁহার মনোলোকের বিবিধার্থ-সংগ্রহ। ইহা ব্যতীত শর্মিষ্ঠা পদ্মাবতী কৃষ্ণকুমারী মায়াকানন ইত্যাদি নাটক, বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ এবং একেই কি বলে সভ্যতা নামক দুইটি প্রহসনও তাঁহার উদ্‌ভাবনী শক্তির উপযুক্ত পরিচয়। আটশত বৎসরের পয়ার ত্রিপদীর সংকীর্ণ শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া অমিত্রাক্ষরের স্বাধীনতা দান, সনেটের মত গীতিকবিতার আঙ্গিক সৃষ্টি তাঁহার কবিজীবনের মহত্তম কীর্তি।

মিত্রাক্ষর নামক কবিতাটি তাঁহার চতুর্দশপদী কবিতাবলী হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই নামকরণ মধুসূদনের কাব্যেই আছে। কবিতাটির বিষয়-বস্তু কবিতার অন্ত্যানুপ্রাস বা চরণশেষের মিল। ইহাই মিত্রাক্ষর নাম-করণের কারণ। কবিতার চরণান্তে যে ধ্বনিগুচ্ছ বা শব্দ ব্যবহৃত হয়, পরবর্তী চরণের শেষে তাহারই অনুরূপ ধ্বনিগুচ্ছের ব্যবহার করিলে একপ্রকার শ্রুতিমাধুর্যের সৃষ্টি হয়। ধ্বনি-সাম্যের নাম অনুপ্রাস, পরস্পর দুই চরণের শেষে অনুপ্রাস থাকিলে তাহাই অন্ত্যানুপ্রাস বা মিল। দুই চরণের এই অনুরূপ অক্ষরকে মিত্র বা বন্ধু বলা হইয়াছে, তাই কাব্যতত্ত্বে মিত্রাক্ষর শব্দটি মিলের প্রতিশব্দ। [মধুসূদন তাঁহার কবিতায় যে নূতন ছন্দের প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতে এই মিত্রাক্ষর বা অন্তঃমিল বর্জন করিয়াছেন। তাঁহার প্রবর্তিত ছন্দে আরও বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু কেবল এই অন্ত্যানুপ্রাস পরিত্যাগহেতু ইহার নাম হইয়াছে অমিত্রাক্ষর ছন্দ।]

উৎস ও নামকরণ

মিত্রাক্ষর কবিতাটি মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলীর অন্তর্গত, সুতরাং ইহা একটি সনেট। প্রসঙ্গত সনেট-নামক কাব্যপ্রকরণ সম্বন্ধে কয়েকটি জ্ঞাতব্য তথ্য পরিবেশন করা হইতেছে।

প্রতীচীয় সাহিত্যে সনেট কবির ভাবপ্রকাশের একটি সুপরিচিত এবং বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত প্রণালী। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার যেমন বিশ্বের কাছে এক নূতন সাম্রাজ্য-সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিল, সনেট-এর আবিষ্কারও সেইরূপ গীতিকবিদের

সনেট-প্রসঙ্গ

নিকট এক অদৃষ্টপূর্ব ভাবপ্রকাশের রাজ্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। জনৈক পণ্ডিতের মতে, সনেট জাতিতে ইতালীয়, গোত্রে পেত্রার্কান [অর্থাৎ পেত্রার্কা নামক ইতালীয় মহাকবির সৃষ্টিসম্ভূত]। ইংরাজি গীতিকবিরা অনেকেই সনেট রচনা করিয়াছেন—শেক্‌স্‌পিয়র মিলটন তো প্রথম শ্রেণীর সনেট-স্রষ্টা বলিয়া শ্রদ্ধান্বিত। তবে তাঁহাদের হাতে সনেটের রূপরীতির বদল হইয়াছে। অনেকের ধারণা ইতালীয় সনেটই সনেটের বিশুদ্ধির দিক দিয়া উৎকৃষ্ট।

সনেটের গঠন

সনেট গাঢ়বন্ধ একজাতীয় চতুর্দশপদী, কিন্তু কায়নির্মাণে ইহার চরণে চরণে স্তবকে-ছন্দে কঠিন বন্ধন। কিন্তু বন্ধন হইলেও তাহা স্বীকরণের পরিণাম যে মুক্তি, তাহাই কবির আনন্দ। প্রমথ চৌধুরী লিখিয়াছেন,

> ভালবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন
> শিল্পী যাহে মুক্তি লভে, অপরে ক্রন্দন।

ইহা যেন রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'অসংখ্যবন্ধন মাঝে মহানন্দময় মুক্তির স্বাদ' লাভ করা। পদ্যবন্ধ হিসাবে সনেট চতুর্দশপদী, অর্থাৎ একটি কবিতা ১৪ চরণের অধিক হইবে না। এই চতুর্দশপদ আবার দ্বিধাবিভক্ত, প্রথমভাগে আটটি চরণ দ্বিতীয় ভাগে ছয়টি। প্রথম ভাগের নাম Octave বা অষ্টক এবং দ্বিতীয় ভাগের নাম ষট্‌ক Sestet, কিন্তু ইহাই সব নয়। অক্টেভের মধ্যে আবার দুইটি চতুষ্ক এবং সেস্‌টেটে দুইটি ত্রিপদিকা থাকে। ইহাদের চরণান্ত মিলের বিন্যাসেই সনেটের সৌন্দর্য। অষ্টকে মোট দুইটি মিল থাকে বলিয়া এই আটটি চরণের মধ্যে একটি অদৃশ্য গ্রন্থিবন্ধন গড়িয়া উঠে। অষ্টকে মিলগুলি যেন বন্ধন সৃষ্টি করে, ষট্‌কে আবার মিলগুলি যেন বন্ধন মোচন করে। ইহাই সনেটের বন্ধন-মুক্তিলীলা। এইজন্যই সনেটের চরণ চতুর্দশটি এবং ইহা আট-ছয়ে বিভক্ত। "একটি অখণ্ড ভাব-ভাবনা বা অনুভূতি, অথবা কবিমানসে অধিবাসিত বহির্জগতের একটি ঘটনা বা বিষয়ই সনেটের অবলম্বন।" সেই ভাব ভাবনা অনুভূতিকে সার্থক ভাবে ফুটাইয়া তুলিতে হইলে এই অঙ্গসন্ধি অনিবার্য। তাই সনেট কেবল চতুর্দশপদী নয় তাহার সর্বাঙ্গে, চরণে মিলে, স্তবকে—

ছন্দে বন্ধন-মুক্তি লীলা

অষ্টক ও ষট্‌কের অঙ্গসন্ধি

সর্বত্রই গুরুত্ব। সনেটকে কেহ কেহ সমুদ্রের তরঙ্গ-পতনোত্থানের সহিত উপমিত করিয়াছেন। আর একজন সমালোচক বলিয়াছেন, সনেট যেন মানবচিত্তের বর্ণমালা। কবি রসেটি সনেটকে মুহূর্তের স্মৃতিসৌধ বলিয়াছেন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মতে সনেট সেই চাবিকাঠি যাহার দ্বারা শেক্‌স্‌পীয়ার হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলেন। কবি-সমালোচক প্রিয়নাথ সেন লিখিয়াছেন,

মানবচিত্তের বর্ণমালা

"যখন কোনো মুহূর্তে প্রবল ভাবের আবেশে সমাচ্ছন্ন কবিহৃদয় সৌন্দর্যের দৈব আবির্ভাবে জাগ্রত হইয়া উঠে, সনেট ভাষায় ও ছন্দে সেই দুর্লভ মুহূর্তের চিত্র। ইহা হইতে বুঝা যায়, সনেটের রচনার মূলে প্রবল ভাবের প্রণোদনা চাই। সেই ভাব যেন আবার বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত বিস্তারিত হইয়া তাহার ঘনীভূত আবেশ না হারায়। কোনো কোনো সনেট আবার গভীর চিন্তাশক্তিপ্রসূত, শেক্‌স্‌পীয়ার যাহাকে 'deep-brained' সনেট বলিয়াছেন। সুতরাং ভাব ও রসের সমগ্রতাই সনেটের জীবন। তৎপক্ষে ভাষা ও ছন্দের যুগপৎ সংযম ও স্ফূর্তি আবশ্যক। বাহুল্যহীন পরিমিত কথায় ভাবকে পরিপূর্ণ, পরিণত—অবয়ব দিবার জন্য, ভাষায় প্রকাশ-শক্তির উপর নিরবচ্ছিন্ন জোরজবরদস্তি হুকুম তামিল করিতে হইবে, অথচ ভাষাশিল্পের সূক্ষ্মতম সৌন্দর্য বিকাশেও দৃষ্টি থাকিবে। ইহাতে গীতিকবিতার উন্মাদনা থাকিবে অথচ মিত্রাক্ষর প্রাচুর্য জন্য যে ঝঙ্কার-বাহুল্য ও আড়ম্বর গীতিকবিতার গৌরব, তাহা হইতে ইহাকে রক্ষা করিতে হইবে। [প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি]

গীতিকবিতার আঙ্গিক

তথাপি গীতিকবিতা হিসাবে সনেট নিয়ন্ত্রিত-শিল্প এবং ইহা ঠিক আধুনিক গীতিকবিতার মত উদ্ভাসিত বাণী-বিগ্রহ নয়। প্রাচীন গীতিকবিতায় বিষয়-প্রাধান্য ঘটে, আধুনিক গীতিকবিতায় কবিচিত্তের প্রাধান্য। মধুসূদনের মিত্রাক্ষর সনেটে বিষয়ের সহিত কবিচিত্তের সমন্বয় ঘটিয়াছে।

সনেট কী জাতীয় গীতিকবিতা

চতুর্দশপদী মধুসূদন-প্রতিভার এক অপার বিস্ময়। তাঁহার সৃষ্টি একদিকে নবযুগের উদ্দাম পক্ষীরাজের মত জল-স্থল আকাশ অতিক্রম করিয়া নভোলোকের নীলিমরহস্যে উড্ডীন হইয়াছে তিলোত্তমাসম্ভবে। মেঘনাদবধ কাব্যে তিনি পদাতিক সৈন্যের

মধুসূদনের কবিপ্রতিভা

মত জীবনের সংগ্রামক্ষেত্রে ব্যূহ রচনা করিয়াছেন। ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনায় তিনি চারণ কবির মত পুরাণগত প্রেমের সংগীত প্রচার করিতেছেন। এখন সন্ধ্যায় গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি মৌনী ধ্যানস্থ হইয়াছেন, দিনের হিসাব-নিকাশ স্মৃতিমন্থন-রহস্যে আত্মার গভীরে অবগাঢ়, ইহাই চতুর্দশপদী কবিতাবলীর জন্মরহস্য। মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় কর্মব্যস্ত জীবন, প্রতিভার প্রচণ্ড উন্মত্ততা, প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব লইয়া কাব্য নাটক প্রহসন রচনা, জনপ্রিয়তার প্রচণ্ড গর্জন, অশান্ত কবিচিত্ত—এই সব কিছু পূর্ববর্তী কবিজীবন সম্পর্কে সত্য। কিন্তু মধুসূদনের ব্যক্তিসত্তার এক প্রান্তে ছিল আর একটি মানুষ যিনি জীবনে খ্যাতি প্রতিপত্তি যশ সম্মান অর্থ অপরিমিত রূপে চাহিয়াছিলেন।

চতুর্দশপদীর জন্মলগ্ন ও পরিবেশ

ব্যারিষ্টার হইয়া ভাগ্য পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড পাড়ি দিলেন, কিন্তু ভাগ্যচক্র বিপরীতবেগে ঘূর্ণিত হইল না। ইহার পর অদৃষ্টক্রমে কবি ফরাসী দেশে কিছুকাল নিঃসঙ্গ নির্বান্ধব বিত্তশূন্য চরম দারিদ্র্য ও দুরবস্থার মধ্যে কাটাইলেন। লক্ষ্মী অপ্রসন্ন হইলেও সরস্বতী তাঁহাকে বঞ্চনা করিলেন না। এই নিরন্ন নির্জনতায় কবি তাঁহার ধ্যানলোকের অলিন্দে দাঁড়াইয়া জীবনকে দেখিলেন, স্মৃতিভাবে অবনিত, অন্তর্লোচনে উদ্ভাসিত সেই জীবন। কবির দুঃস্থ বেদনা ও বীতগীত দীর্ঘশ্বাসকে প্রশান্ত মাধুর্যে আচ্ছন্ন করিয়া বীণা-পাণির তারে বাজিল ঝঙ্কার। শোকের লোষ্ট্রাঘাতে মানস মধুচক্র হইতে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল সনেটের বিন্দু বিন্দু মধু। ইহাই চতুর্দশপদী কবিতাবলী।

ভাবার্থ

ভাষ-সুন্দরীর চরণে কোন্ নিষ্ঠুর মিত্রাক্ষর বা মিলের ক্লিষ্টের শৃঙ্খল পরাইয়াছেন কবি তাহা ভাবিয়া পাইতেছেন না, ভাষার কোমল চরণে মিলের নিগড় পরাইতে তাহার না জানি কত ব্যথা লাগে ইহা স্মরণ করিয়া কবিচিত্ত ক্রোধার্ত হইয়া উঠে। যে ভাষার মনের ভাণ্ডারে ভাবধন ও ঐশ্বর্য, তাহার এই ভূষণ মিথ্যা সোহাগ মাত্র। শতদলের উপর রঙের প্রলেপে কী প্রয়োজন, চন্দ্র নিজ রূপেই দ্যুতিমান। জাহ্নবীর জল স্বভাব-পবিত্রতোয়া, তাহাকে কি মন্ত্রে পুণ্য করার দরকার আছে? পারিজাতগন্ধে কি পুনরায় সৌরভ ঢালিতে হয়? এইরূপ অলং-

বস্তু-বিশ্লেষণ

সুরভিতা প্রকৃতি-শোভাময়ী কবিতার চরণে অন্ত্যানুপ্রাস ব্যবহার যেন চৈনিক নারীর চরণে লৌহফাঁস পরানো মাত্র, ইহাই কবির উপলব্ধি।

আলোচনা

মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলী ব্যক্তিপুরুষের অন্তরলোক-দর্শনের বাতায়নিকা। ইহার মধ্য দিয়া কবি শ্রীমধুসূদনের অন্তরঙ্গ স্মৃতিবেদনা, সারস্বত অধমর্ণতা, উত্তরসূরীর প্রতি তাঁহার বিনম্র প্রণতি, সতীর্থের প্রতি আকর্ষণ, তাঁহার প্রেম ও প্রীতি, তাঁহার কাব্যরসবোধ ও নিসর্গ ব্যাকুলতার বহু খণ্ডচিত্র দৃষ্ট হয়। যেমন সনেটের দ্বারমুক্তিকার সাহায্যে শেক্‌স্‌পিয়ার তাঁহার অন্তর্জীবনের কপাট উদ্‌ঘাটন করিয়াছিলেন, চতুর্দশপদীর সাহায্যে মধুসূদনও তাহাই করিয়াছেন। আজীবন অসহিষ্ণু বন্ধনদ্রোহী বৈপ্লবিক মধুসূদন এই চতুর্দশপদী কবিতাবলীতেই যেন কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়াছেন। এখানে তাঁহার কণ্ঠ অনুচ্চ, হৃৎকম্পন মৃদুতর, দৃষ্টি আর্দ্র, লেখনী রৌদ্ররসপায়ী নয়। হয়ত আত্মস্মৃতি ও অন্তর অবগাহনের স্তিমিত ভঙ্গিই ইহার কারণ। এখানে মধুসূদন অশান্ত ভাস্কর নন, এখানে তিনি বর্ণমুগ্ধ চিত্রকর। অথচ মধুসূদনের কবিস্বভাবের চিরন্তন এক বৈপরীত্য এখানেও সুরক্ষিত হইয়াছে, মধুপ্রতিভার দ্বিমেরুত্ব সনেটের আঙ্গিকেই যেন যথার্থ আত্মপ্রকাশের সার্থকতা লাভ করিয়াছে। মধুসূদনের কবিমানসে দুইটি পৃথক্ ব্যক্তিত্বের বাস ছিল, 'একজন সরস্বতীর বরপুত্র, একজন লক্ষ্মীর উপাসক। একজন শ্রীমধুসূদন, একজন মাইকেল এম. এস ডাট, বার. এট.-ল। একজন অদিতির সন্তান, একজন দিতির পুত্র'। একজনের জীবন সাহিত্য-সাধনার গভীর সুখে নিবিড় দুঃখে পর্যবসিত, আর একজন 'আশার ছলনে ভুলি' জীবনের প্রাংশুলভ্য ফল লাভের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কাব্যসৃষ্টিতে স্বভাবতই এই বৈপরীত্যের সমাবেশ ঘটিয়াছে বলিয়াই রাবণের অপরাজেয় মনুষ্যত্ব শেষ পর্যন্ত অদৃষ্টের শোচনীয় আঘাতে বিপর্যস্ত হয়। বীররসের প্রতিশ্রুতি করুণরসে সমাপ্ত হয়, অভ্রংলিহ পর্বতশিখরে নিঃসঙ্গ একাকীত্ব লইয়া এ-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর বাসা বাঁধে। তাই স্বয়ং ইয়ং বেঙ্গলের প্রতিনিধি হইয়াও মধুসূদন একেই কি

চতুর্দশপদীর মধুসূদন

মধুপ্রতিভার স্বভাব-বৈপরীত্য

কাব্যে এই বৈপরীত্যের দৃষ্টান্ত

বলে সভ্যতায় ইয়ং বেঙ্গলের প্রতি নিষ্ঠুরতম বিদ্রূপ নিক্ষেপ করেন। সনেটের অষ্টকষট্‌কের বন্ধন-মুক্তিলীলা এই বিপ্রতীপ ধর্মের আনুকূল্য করিয়াছে। ইহার অষ্টক ও ষট্‌কের চতুষ্ক ও ত্রিকের মধ্য দিয়া, অন্ত্যানুপ্রাসের বিচিত্র ব্যবহারের দ্বারা, ধীরে ধীরে একটি আসক্তি ও মুক্তি, বন্ধন ও বন্ধন-মোচনের লীলা অনুভব করা যায়। মিত্রাক্ষর নামক চতুর্দশপদীর বিষয়-নির্বাচনের দ্বারা এই আসক্তি ও মুক্তি তত্ত্বটি আশ্চর্য সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

সনেটেও আসক্তি-মুক্তি-লীলা

মিত্রাক্ষর সনেটের বিষয়বস্তু কবিতায় মিল-ব্যবহারের প্রথানুগত্যের বিরোধিতা, চরণান্তের অনুপ্রাস কবির কাছে স্বাধীনভর্তৃকা নারীর চরণে পরাধীনতার ও কুসংস্কারের প্রতীকস্বরূপ নিষ্ঠুর লৌহশৃঙ্খলের মত। মুক্তিই যাহার চরণের ছন্দ হওয়া উচিত তাহার শ্রীচরণ-কমলে মিত্রাক্ষর ভূষণ তো নয়ই, পরন্তু উহা তাহার বন্ধন। সুতরাং নবযুগের প্রমিথিউস কবি নবযুগের কবিতার জন্য সর্ববন্ধন মুক্তির দাবী জানাইয়াছেন। নারী বন্দিনী থাকিবে ইহা তাহার অনভিপ্রেত। বন্দিনী নারীর বিলাপ চিরকাল তাঁহাকে বিচলিত করিয়াছে। ক্যাপটিভ লেডী হইতে বীরাঙ্গনা সর্বত্রই বন্দিনীর জন্য তাঁহার বন্দনা। তাঁহার নারী বন্দিনী হইতে বীরাঙ্গনায় রূপান্তর-প্রয়াসিনী। কেবল বনিতাতুল্যা কবিতাই বা কেন মিলের বন্ধনে বন্দিনী থাকিবে। তাই তিনি মিত্রাক্ষর বর্জন করিয়া, যতিপতনের অনিবার্য স্থান নির্দেশ অস্বীকার করিয়া কবিতাললনাকে স্বাধীন-চারিণী, আপন প্রেমের বীর্যে অশঙ্কিনী করিয়াছেন অমিত্রাক্ষর ছন্দে। সুতরাং কবিতায় মিত্রাক্ষর-ব্যবহারের বিরুদ্ধে মধুসূদনের অনীহা ও ক্রোধ স্বাভাবিক। কিন্তু যে মিল-ব্যবহারের বিরুদ্ধে কবির এই অসন্তুষ্ট বিদ্রোহ ও অসহিষ্ণু উত্তেজনা, মিত্রাক্ষর নামক সনেটের কাব্যসৌন্দর্য ও সনেট-সার্থকতা সেই মিল-বিন্যাসেই। সার্থক সনেটের মিত্রাক্ষর ব্যবহারের নৈপুণ্যের উপরই এই জাতীয় গীতিকবিতার পরিণাম-রমণীয়তা নির্ভর করে। মিলের প্রতি কবিতা-রচনার ক্ষেত্রে এই আসক্তি ও কবিতার বিষয়ে মিলের হাত হইতে এই ত্রাণপ্রার্থনা বা মুমুক্ষাই মধুসূদনের স্বভাব-বৈপরীত্য—ইহাই তাঁহার সনেটের আসক্তি-মুক্তি-

মিত্রাক্ষর সনেটের বক্তব্য

মধুসূদনের কল্পনায় নারী

মিলের সাহায্যে অমিলের বন্দনা

লীলা। এইখানেই মিত্রাক্ষর কবিতার রসবিস্ময়। এই সনেটে মিল বিন্যাস করা হইয়াছে খাঁটি পেত্রার্কীয় রীতিতে, অর্থাৎ পেত্রার্কা-বিরচিত ইতালীয় সনেটের আদর্শে। এই কবিতার প্রথম হইতে অষ্টম চরণ অর্থাৎ 'ভুলাতে তোমারে দিল এ তুচ্ছ ভূষণে' পর্যন্ত অংশ অষ্টক এবং শেষ ছয়টি চরণ ষট্‌ক। অষ্টকাংশে দুইটি চতুষ্ক আছে এবং ষট্‌কাংশে দুইটি ত্রিপদিকা আছে। অষ্টকাংশে দুইটি মিল আছে ক খ খ ক : খ ক খ ক অর্থাৎ দ্বিতীয় তৃতীয় পঞ্চম ও সপ্তম চরণে একই মিল পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। ইহার ফলে অষ্টকের চতুষ্ক দুইটি পৃথক্ হইয়াও পরস্পরসম্পৃক্ত এবং ঐক্যগ্রথিত হইয়াছে। ষট্‌কেও সেইরূপ দুইটি মিল আছে গ ঘ গ ঘ গ ঘ, ইহাতে প্রথম ও তৃতীয় চরণে মিল থাকায় মনে হয় মধ্য পদটি একক।

পেত্রার্কীয় রীতির সনেট

মিল-বিন্যাস

মধুসূদনের আলোচ্য মিত্রাক্ষর সনেটটি সম্পর্কে জনৈক বিশেষজ্ঞের আলোচনা উদ্ধার করা হইল—

"কবিতাটি সত্যই অদ্ভুত। মিলের বিচিত্র সজ্জায় কাব্যলক্ষ্মীর দীপারতি করে কবি মিলেরই নিন্দা করছেন। মিত্রাক্ষর বন্ধে অমিত্রাক্ষরের জয়গান! কী বিস্ময়কর অসংগতির আশ্চর্য নিদর্শন এই কবিতাটি। অথচ এই তো মধুসূদনের নিয়তি। অক্টোপাশ-বন্ধনের মধ্যে অষ্ট-পৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে প্রাণের আনন্দে চিরমুক্তির গান গাওয়া, এই তো মধুসূদনের কাব্যজীবনের মূল সত্য!... হিন্দু-কলেজ প্রতিষ্ঠার পর চল্লিশ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে, বাঙালী জাতি মাতৃভাষার মর্যাদা গিয়েছে ভুলে, ইংরেজিই সর্বক্ষেত্রে তার আত্মপ্রকাশের গৌরবান্বিত বাহন হয়ে উঠেছে। হিন্দু-কলেজের সেরা ছাত্র মধুসূদনের সর্বাঙ্গেও সেই দাসত্বের ছাপ। অথচ তিনিই মাতৃভাষায় মাতৃনাম উচ্চারণের প্রথম কবি-ঋত্বিক। পরাধীনতার নাগপাশ তাঁকে সর্বভাবে শৃঙ্খলিত করতে চাইছে, অথচ তাঁর সমগ্র সত্তায় মুক্তির অনন্ত পিপাসা। প্রাচীন মহাকাব্য থেকে তিনি যে বীরজগৎ আবিষ্কার করেছেন সেখানেই তাঁর প্রাণের নিত্যগতি, অথচ তাঁর আশেপাশে 'সিংহের ঔরসে শৃগালের দল' ঘুরে বেড়াচ্ছে।...এই অসংগতিই মধুসূদনের মানসে ও পরিবেশে বিরাজমান।

'মিত্রাক্ষর-বন্ধে অমিত্রাক্ষরের জয়গান'

যুগের স্বভাব

বন্ধনের মধ্য দিয়ে মুক্তি-পিপাসা

তাই বন্ধনের মধ্যে থেকে বন্ধনমুক্তির বাণীই তাঁর কবিচিত্তের বাণী। এই বন্ধনের দুর্বিবহ জ্বালা এবং সর্বভাবে এই বন্ধনকে অস্বীকার করে মুক্তির গান গাওয়াই মধুসূদনের কবিভাগ্য। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, পর পর নূতন নূতন দৃষ্টান্তে মিত্রাক্ষরের ষট্‌কবন্ধ রচিত হয়েছে :

> কি কাজ রঞ্জনে রাঙি কমলের দলে ?
> কি কাজ পবিত্রি' মন্ত্রে জাহ্নবীর জলে ?
> কি কাজ সুগন্ধ ঢালি পারিজাত-বাসে ?

এই তিন-তিনটি জিজ্ঞাসার মধ্যে বন্ধন-অসহিষ্ণু কবিচিত্তের মুক্তিকামনাই যেন মুক্ত-ত্রিবেণী রচনা করেছে। আঘাতে আঘাতে সর্ববন্ধন থেকে মুক্তি-প্রয়াসেরই তারা প্রতীক।

বলাই বাহুল্য মধুসূদনের এই বন্ধন ও বন্ধনমুক্তির প্রেরণারই যোগ্য রূপায়ণ হয়েছে সনেটের আভ্যন্তর-সংগতি অর্থাৎ বন্ধন ও বন্ধনমুক্তির লীলায়। উভয়তই আপাত-দৃশ্যমান অসংগতির মধ্যে এক পূর্ণতর ও মহত্তর সংগতির সাধনা। বন্ধনের মধ্যে থেকেই বন্ধনমুক্তির উদাত্ত সংগীত। তাই মধুসূদনের অন্তরঙ্গতম আত্মকথার সার্থক বাহন হয়েছে সনেট।"

[শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য—সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ]

আশা করা যায়, এই সুচারু বিশ্লেষণের মাধ্যমেই মিত্রাক্ষর সনেটটির রস পাঠকদের নিকট আস্বাদজনক হইয়া উঠিয়াছে।

রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ

লো ভাষা—ভাষাকে (বিশেষ করিয়া কবিতার ভাষাকেই কবি ইঙ্গিত করিতেছেন) নারী মনে করিয়া মধুসূদন তাহাকে সম্বোধন করিয়াছেন নারী-বাচক শব্দের দ্বারা। **পীড়িতে**—পীড়া দিতে, যন্ত্রণা দিতে। মিত্রাক্ষররূপ বেড়ি-চরণে যে মিল ব্যবহৃত হয়, কবি তাহাকে বেড়ি বা লৌহশৃঙ্খলের সহিত তুলনা করিয়াছেন। যাহা শ্রুতিমধুর ও সৌন্দর্যবর্ধক তাহা প্রকৃতপক্ষে লৌহ-বেষ্টনী ইহাই কবির বক্তব্য। **বড়ই নিঠুর**...**বেড়ি**—কাব্যভাষার কমল-চরণে যে সর্বপ্রথম মিত্রাক্ষর বা চরণান্ত মিল ব্যবহার করিয়াছেন সেই কবির নিষ্ঠুরতার কথা চিন্তা করিয়া কবি [illegible] ভাষাকে পদান্ত-মিলের কঠিন

লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া তাহার কোমলাঙ্গে কত ক্লেশ দান করা হয়, ইহাই কবির অনুভব! **কত ব্যথা…চরণে**—ভাষার চরণে অর্থাৎ কবিতার চরণ [কবিতা ও ভাষা এই কবিতায় একার্থক] কোমল স্পর্শকাতর, তাহাকে পাদবন্ধনীর দ্বারা শৃঙ্খলিত করিলে না-জানি কত যন্ত্রণা হয়। **স্মরিলে… রাগে**—কবিতা রমণীর কোমল চরণে মিত্রাক্ষরের শৃঙ্খল পরানোর নিষ্ঠুরতায় কবি কেবল ব্যথিত নন, ক্রুদ্ধও। এই একটি চরণে মধুসূদনের ব্যক্তিত্ব ও কবিআত্মার পরিচয় মেলে। নারীর সৌন্দর্য বন্ধনে নয়, মুক্তিতে; কবি নারীকে বন্দিনী, অধীনতার নাগপাশে শৃঙ্খলিতা দেখিয়া ব্যথিত নন। বন্দিনী নারীর বিলাপধ্বনিতে মধুসূদনের কাব্য পরিপূর্ণ। [তাঁহার প্রথম কাব্য The Captive Lady; মেঘনাদবধ কাব্যে সীতা অশোকবনে বন্দিনী, ব্রজাঙ্গনায় রাধা কুলাচারে বন্দিনী, বীরাঙ্গনায় নায়িকাগণ সকলেই অবস্থাধীনে বন্দিনী।] নারীর পুষ্পপেলব চরণে যদি কেহ লৌহনিগড় পরায় তাহার নিষ্ঠুরতায় কবি তাই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন, তাঁহার সর্বাঙ্গ পরাধীনতা ও বন্দীত্বের দুঃখে জ্বলিয়া উঠে। এখানে কবিতা তাঁহার নিকট বনিতা, কবিতাকে তিনি নারীর মতই সর্ব-সংস্কার-প্রথার বন্ধন হইতে মুক্তি দিতে চান। কিন্তু মিত্রাক্ষর তাহার চরণে পরাজিত বন্ধনের শেষ কলঙ্কচিহ্ন হইয়া থাকিবে কেন, ইহাই কবির ক্ষোভ। কবিজীবনে মধুসূদনও মিত্রাক্ষর বর্জন করিয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দ আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু মিত্রাক্ষর সনেটের বিষয়বস্তু মিত্রাক্ষর-বিরোধিতা হইলেও সনেটটি মিত্রাক্ষরেই রচিত [আলোচনা দ্রষ্টব্য]। **ছিল না কি… ভূষণে?**—কবিতা ও কবির সম্পর্ক যেন পুরুষ-নারীর সম্পর্ক, প্রেমের সম্পর্ক। আদর্শ প্রেমিক প্রেমিকাকে রাঙাইবে প্রেমের দ্বারা, অলক্ষ্য প্রাণের অমূল্য হেমোপহারে। কিন্তু যাহার হৃদয়ে প্রেম নাই, অন্তরের ঐশ্বর্য নাই, মধুসূদন যাহাকে ভাবধন বলিয়াছেন, সেই কেবল নারীর সহিত প্রভুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে। অন্তরের দৈন্য গোপন করিবার জন্য স্থূল অলংকার-ভূষণের দ্বারা নারীকে সজ্জিত করিয়া থাকে। মনের ভাণ্ডারে সম্পদ না থাকিলে মিথ্যা সোহাগ বা ছদ্ম-প্রেম প্রকাশ করে বাহিরের সমারোহের দ্বারা। মধুসূদনের বক্তব্য, কবির নিজস্ব ভাবসম্পদ থাকিলে তাহার গৌরবেই কবিতা সমৃদ্ধ হইবে। চরণান্ত মিলের দ্বারা কবিতাকে শ্রুতিমধুর করা প্রকৃতপক্ষে কবির ভাবদৈন্যেরই পরিচায়ক।

কি কাজ……জলে ?—শতদল স্বয়ং প্রকৃতি-প্রদত্ত বর্ণস্থষমায় মনোহর, সুতরাং তাহাকে পুনরায় বর্ণানুলেপনের প্রয়োজন কী ? **নিজরূপে……আকাশে**—চন্দ্র আকাশে নিজ জ্যোৎস্না-কিরণেই উদ্ভাসিত। যে স্বয়ং জ্যোতির্ময় তাহাকে উজ্জলতর কবিবার জন্য মানুষের ক্ষীণ অপচেষ্টাকেই কবি এখানে কটাক্ষ করিতেছেন। **কি কাজ……জাহ্নবীর জলে**—জাহ্নবী স্বর্গীয নদী, তাহার সলিল হিন্দুর নিকট সর্বদাই পবিত্র। কিন্তু এই পুণ্যতোয়া জাহ্নবীবারিকে মন্ত্রপাঠের দ্বারা শোধিত পবিত্র করা অর্থহীন নয় কি ? **কি কাজ…· পারিজাত-বাসে**—স্বর্গীয় নন্দনকাননের পারিজাত পুষ্প তাহার উন্মদ গন্ধের জন্য বিখ্যাত, সেই পারিজাত-গন্ধের সহিত সুগন্ধ মিশ্রিত করা অর্থহীন। **কি কাজ রঞ্জনে ·····পারিজাত বাসে**—কবিতাব স্বাভাবিক সৌন্দর্য সত্ত্বেও তাহাকে চেষ্টাকৃত ভূষণে সজ্জিত করার অপচেষ্টাকে মধুসূদন তিনটি অনুত্তরণীয় জিজ্ঞাসার মাধ্যমে কটাক্ষ করিয়াছেন। কেবল কটাক্ষই নয়, কবির আন্তরিক বেদনাও ইহার মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। কবিতা তাঁহার নিকট প্রাকৃত বস্তুর মত, ইহা যেন একটি স্বতঃস্ফূর্ত নৈসর্গিক ব্যাপার, মনুষ্যরচিত শিল্প নয়, এইরূপ বিশ্বাস মধুসূদনের ছিল। কবিতাকে তিনি কেবল অবকাশেব আনন্দ মনে করেন নাই, কবিতা তাঁহাব নিকট গভীর প্রাণের ক্রন্দন ছিল। সুতরাং সেই কবিতার চরণে মিত্রাক্ষর ব্যবহার তাঁহার সমগ্র চৈতন্যকে আলোড়িত করিয়াছে, তাঁহার কবিসত্তাকে উত্তেজিত করিয়াছে, এই বৈপরীত্যেব প্রতি তাঁহার ক্ষোভের সীমা নাই। কমলদলকে রঙের দ্বারা রাঙাইবার ইচ্ছা, জাহ্নবীর জলকে মন্ত্রে পবিত্র করার প্রয়াস, পারিজাত-গন্ধকে পুনরায় সুরভিত করাব হাস্যকরত্বই কবিতার চরণে মিত্রাক্ষর-ব্যবহারের উপমা বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছে। **পারিজাত**—সমুদ্র-মন্থনের কালে উদ্ভূত স্বর্গীয় তরু। **প্রকৃত · · ·প্রকৃতির বলে**—কবিতা প্রকৃতির সৃষ্টি। তাহা নৈসর্গিক পদার্থের মত। নদী, পুষ্প, লতা, পক্ষীর মতই তাহা প্রাকৃতিক বস্তু : কবিতাব সৌন্দর্য যেন কোন অলৌকিক দিব্যপ্রভাবে আপনি রচিত হয়, তাহা অন্যের হস্তাবলেপে সাধিত হয় না। এইজন্য প্রাচীন আলংকারিক বলিয়াছেন, কাব্য সংসারে কবি প্রজাপতি ব্রহ্মাসদৃশ। ঈশ্বর গুপ্ত লিখিয়াছেন,

চারু বিশ্ব করি দৃষ্ট-চিত্রকর কবি।
স্বভাবের পটে লেখে স্বভাবের ছবি॥

মধুসূদনও 'কবি' নামক সনেটে কবির সংজ্ঞায় বলিয়াছেন, সেই কবি,

নন্দন-কানন হতে সে সুজন আনে
পারিজাত-কুসুমের রম্য পরিমলে।

এইজন্যই প্রকৃত কবিতাকে প্রাকৃতিক বলা হইয়াছে। **চীন-নারী-সম… ফাঁসে?**—চীনদেশীয় একটি প্রাচীন সংস্কার ক্ষুদ্র চরণ নারীর সৌন্দর্যবর্ধক; এইজন্য অল্প বয়স হইতে নারীর এই পদাতিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিবার জন্য লৌহ-পাদুকায় তাহার চরণদ্বয় আটকাইয়া রাখা হইত। লৌহ-ফাঁসে আবদ্ধ চরণ বৃদ্ধি-বঞ্চিত হইয়া চৈনিক চক্ষে অপরূপ সৌন্দর্য-মাধুরী বর্ষণ করিত! কিন্তু চরণের স্বাভাবিক সৌন্দর্য রোধ করিয়া, লৌহ-নিগড়ে তাহাকে বন্দী করিয়া, বিকলাঙ্গ পঙ্গু করিয়া সৌন্দর্য বাড়িতে পারে না। ইহা মানুষের এক অমানুষিক অন্ধ কুসংস্কার মাত্র। মধুসূদন ইহাকেই কবিতার চরণের মিত্রাক্ষরের সহিত তুলনা করিয়াছেন। চরণের স্বাভাবিক প্রবণতাকে রোধ করিয়া মিত্রাক্ষরের খাতিরে তাহাকে সংকুচিত করা অনুরূপ কুসংস্কারেরই পরিচায়ক। সুতরাং ইহাকে কবিজনোচিত বলা যায় না, মধুসূদন এই কথাই বুঝাইতে চাহিতেছেন।

ব্যাখ্যা :

বড়ই নিষ্ঠুর ··উঠে রাগে—কবি মধুসূদন দত্তের চতুর্দশপদী কবিতা মিত্রাক্ষর হইতে সংকলিত আলোচ্য স্তবকরচনার পংক্তিগুলিতে কবিতার মিল-বিন্যাস-রীতিকে কবি তীব্রকণ্ঠে বিদ্রূপ করিয়াছেন। কবিতার তনুদেহ কোমল, ভাষানির্মিত কবিতা প্রকৃতপক্ষে নারীতুল্য। নারীর সৌন্দর্যরক্ষা, নারীর প্রতি নিষ্ঠুরতা না করা, নারীত্বকে সম্ভ্রম প্রদর্শন করা পুরুষের কর্তব্য ও দায়িত্ব। কিন্তু কবিতারূপিণী নারীর ক্ষেত্রে পুরুষ যে নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিয়াছে, মধুসূদন তাহা স্মরণ করিয়া ব্যথিত হইয়াছেন। কবিতাকে স্বেচ্ছাবিহারিণী স্বাধীন-সঞ্চারিণী না করিয়া তাহাকে লৌহশৃঙ্খলে বন্দিনী করা হইয়াছে, তাহার চরণে মিত্রাক্ষররূপ বেড়ি পরানো হইয়াছে। নারীর চরণে লৌহকঠিন নিগড় এবং কবিতার চরণে বা পদের শেষে অনিবার্য মিলের প্রথা, উভয়ই একজাতীয়। শৃঙ্খল স্বাধীনতা হরণ করে, মিত্রাক্ষর কবিতার স্বাভাবিক গতি ও বিকাশকে অবাঞ্ছিতভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। মধুসূদন

কবিতার চরণে মিত্রাক্ষর ব্যবহারে কবিতার দেহে যে বেদনার সৃষ্টি হয় তাহা বিশ্বাস করেন, তাই মিত্রাক্ষর ব্যবহারকারী কবির কাব্যরচনার এই প্রবণতাটি তাঁহার কাছে নিষ্ঠুরতা বলিয়া বোধ হইয়াছে। এমন কি, মিল-ব্যবহারকারী কবির নিষ্ঠুরতায় তিনি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। নারীর লাঞ্ছনা নির্যাতন দেখিলে পৌরুষ যেমন উত্তেজিত হয়, কবিও কবিতার উপর মিত্রাক্ষরের নিষ্ঠুরতা স্মরণ করিয়া অনুরূপ উত্তেজিত হইয়াছেন।

টীকা—কবিতার স্বাভাবিক উপকরণ পর্ব-পর্বাঙ্গ, যতি, মিত্রাক্ষর ও স্তবক। কিন্তু মধুসূদন মিত্রাক্ষরকে কবিতার অপরিহার্য উপাদান বলিয়া মনে করিতেন না। তাঁহার আবিষ্কৃত ছন্দে মিত্রাক্ষর নাই, তাই ইহার নাম দিয়াছিলেন অমিত্রাক্ষর। কিন্তু যে মিত্রাক্ষর-ব্যবহার তাঁহার কাছে নারীর প্রতি পুরুষের ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতা, মধুসূদন স্বয়ং এই কবিতায় সেই মিত্রাক্ষরই ব্যবহার করিয়াছেন; সনেটের মিল-বিন্যাস পদ্ধতি আলোচ্য কবিতায় রক্ষিত হইয়াছে।

ছিল না কি ....ভূষণে?—মধুসূদন দত্তের মিত্রাক্ষর নামক সনেটে কবিতা-ললনার চরণে মিত্রাক্ষরূপ নিগড় পরাইবার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া কবি মিল-ব্যবহারকারী কবির সারস্বত বৃত্তির কপটতার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। কবিতা নারী, কবি পুরুষ। নারীর প্রতি পুরুষের আন্তরিক প্রণয় হৃদয়ের ভাবসম্পদ ও অমূল্য মানসোপহারে প্রকাশিত হয়। কিন্তু কপট প্রণয়ী হৃদয়ের দৈন্য ও রিক্ততা গোপন করিবার জন্য বাহ্যিক উচ্ছ্বাসে তাহার প্রণয় নিবেদন করে, তুচ্ছ ভূষণ-অলংকারাদির দ্বারা, মিথ্যা প্রণয়বচনে প্রণয়ীকে ভুলাইয়া থাকে। যে কবি কবিতার চরণে প্রথম মিত্রাক্ষর ব্যবহার করিয়াছিলেন, কবিতার সহিত তাহার কপট প্রণয়ের ইঙ্গিত করিয়া মধুসূদন সেই মিথ্যা প্রণয়ের অলংকার-সর্বস্বতার উল্লেখ করিয়াছেন। কবিতা-দেহের মিত্রাক্ষর তাহার প্রণয়ী-হৃদয়ের ভাবসম্পদহীন রিক্ততার পরিচায়ক, তাহার কপট সোহাগের উদাহরণরূপেই তাহা মধুসূদনের নিকট প্রতিভাত হইতেছে। অর্থাৎ উপমা-রূপকের আবরণ উন্মোচন করিলে দেখা যায়, মধুসূদন বলিতেছেন, কবির কাব্য কল্পনার দ্বারা, প্রতিভার স্বাভাবিক স্ফূর্তিক্ষমতার দ্বারা উদ্ভাসিত হয়। যে কবির আন্তরিক সম্পর্ক নাই, কল্পনার ঐশ্বর্য নাই, সৃজনধর্মিতা নাই, তিনিই কেবল চতুর শ্রুতিমধুর কৌশলে

অন্ত্যানুপ্রাসের সুলভ শব্দালংকারে কবিতাকে সজ্জিত করেন। তাহার সহিত কবিতার সম্পর্ক অগভীর।

কি কাজ রঞ্জনে···পারিজাত-বাসে ?—কবিতার স্বাভাবিক প্রবণতাকে রুদ্ধ করিয়া, তাহার নিজস্ব সম্পদকে অস্বীকার করিয়া সুলভ শব্দালংকারের দ্বারা কবিতার শোভাবৃদ্ধির অপকৃষ্ট চেষ্টাকে নিন্দিত করাই মিত্রাক্ষর সনেটে মধুসূদনের বক্তব্য। আলোচ্য চরণ-চতুষ্কে মধুসূদন তিনটি জিজ্ঞাসার দ্বারা কবিতার নৈসর্গিক সৌন্দর্য ও কষ্টপ্রযুক্ত মিত্রাক্ষর-ব্যবহারের বৈপরীত্যকে প্রকাশ করিয়াছেন। কবিতা স্বভাব-সুন্দর, তাহার বিকাশ প্রাকৃতিক বস্তু বা পদার্থের মত। সুতরাং কোনো যত্নকৃতপ্রয়াসে তাহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাইতে পারে না। কিন্তু প্রাচীন কবিরা কবিতার এই নৈসর্গিক সম্পদের পরিচয় না পাইয়া মিত্রাক্ষররূপ তুচ্ছ ভূষণের দ্বারা কবিতাকে প্রসাধিত করিবার নিষ্ঠুর অপচেষ্টা করিয়াছেন। নারীর কোমল-চরণের স্বভাবসৌন্দর্যকে শৃঙ্খলিত করিয়াছেন। শতদল কমল বিধি-প্রদত্ত বর্ণে উজ্জ্বল, তাহাকে রঞ্জিত করিবার জন্য কোনো বর্ণারোপের প্রয়োজন হয় না। চন্দ্রকলা গগন-মণ্ডলে আপনিই দীপ্তি বিকিরণ করে। জাহ্নবীর জল স্বয়ংপূত, তাহাকে মন্ত্র পাঠের শোধিত বা পবিত্র করার প্রয়াস হাস্যকর। স্বর্গীয় পারিজাত কোনো কৃত্রিম সুগন্ধের দ্বারা সুবাসিত করা অর্থহীন, যেহেতু তাহার সৌগন্ধ্য তাহার সহিত অবিনাভাবে সংযুক্ত। এইরূপ কবিতার সৌন্দর্যও পদ্মের নিজস্ব বর্ণ, চন্দ্রের কিরণ, জাহ্নবীবারির পবিত্রতা ও পারিজাত-সুবাসের মত অচ্ছেদ্য সম্পর্কযুক্ত। কোনো কৃত্রিম উপায়ে তাহার উপর মিত্রাক্ষররূপ সৌন্দর্য-আরোপ তাহার প্রাকৃতিক সুষমাকেই ক্ষুণ্ণ করে, ইহাই আলোচ্য পদাংশে অমিত্রাক্ষরের ভগীরথ মধুসূদনের বক্তব্য।

টীকা—পবিত্রি'—পবিত্র করিয়া, নামধাতু।

প্রকৃত কবিতা······লৌহ ফাঁসে ?

অমিত্রাক্ষর ছন্দের ভগীরথ কবি মধুসূদন দত্ত তাঁহার মিত্রাক্ষর সনেটে কবিতাকে প্রকৃতিদুহিতা বলিয়াছেন ; সুতরাং সেই নৈসর্গিক সুষমাময়ীর স্বভাবসংগত গতিছন্দকে কৃত্রিম মিত্রাক্ষর যোজনার দ্বারা ক্ষুণ্ণ করার কাব্যিক অপচেষ্টা আলোচ্য অন্তিম চরণদ্বয়ে উপহাসিত হইয়াছে। কবিতা নিজগুণে সুরঞ্জিত, নিজবর্ণে সুরঞ্জিত, নিজ স্বভাবে দীপ্তিময়ী—কোনো কৃত্রিম

সৌগন্ধ্য রঞ্জন বা কিরণের দ্বারা তাহাকে প্রসাধিত করা উচিত নয়। কবিতার ক্ষেত্রে মিত্রাক্ষর বা অন্ত্যানুপ্রাস সেইরূপ কৃত্রিমতা, যাহা ধ্বনিসাম্য সৃষ্টির জন্য কবিতার চরণের শেষে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মধুসূদনের বিবেচনায় ইহা স্বভাবসুন্দরী বনিতার কোমল চরণে লৌহশৃঙ্খলের ন্যায়। চৈনিক দেশের একটি কুসংস্কার ছিল, নারীর চরণ স্বাভাবিক অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলে নারী সুন্দরীশ্রেষ্ঠা বলিয়া গণ্য হইবে। তাই শিশুকাল হইতে নারীর চরণে লৌহ-পাদুকা আঁটিয়া চরণের গতি রুদ্ধ করা হইত। ইহা কখনই সৌন্দর্য হইতে পারে না, ইহা নিষ্ঠুরতার নামান্তর, এমন কি নির্বুদ্ধিতাও। কবির সৃজনী-প্রতিভা ও কল্পনায় কবিতা স্বভাবগতভাবে শোভাময়ী, তাহার গতি স্বচ্ছন্দ বিচরণ, স্বভাবের আনুকূল্যেই তাহার বিকাশ। কোনো মিল-ব্যবহার, কষ্ট-কল্পিত ধ্বনিসাম্য-সৃষ্টি, এই স্বাভাবিক গতিকে বলপ্রয়োগে রুদ্ধ করিবে মাত্র। কবিতার চরণান্ত মিল দেখিয়া মধুসূদনের ব্যথিত চিত্তে তাই চৈনিক-নারীর লৌহবেষ্টনীযুক্ত চরণের কথাই মনে পড়িয়াছে। কবিতার চরণান্ত মিলের সহিত চীন-নারীর লৌহ-পাদুকার তুলনা সার্থক-প্রযুক্ত।

প্রশ্ন ১। সনেট কাহাকে বলে? সনেটের আঙ্গিক ও নির্মাণরহস্য ব্যাখ্যা করিয়া মধুসূদনের মিত্রাক্ষর কবিতাটি সনেট হিসাবে সার্থক হইয়াছে কিনা আলোচনা কর।—[ভূমিকা ও আলোচনা দ্রষ্টব্য]

প্রশ্ন ২। মিত্রাক্ষর সনেটটি অসংগতির এক বিস্ময়কর নিদর্শন। কবি মিত্রাক্ষরবন্ধে কাব্যলক্ষ্মীর বন্দনা করিয়া অমিত্রাক্ষরের জয়গান করিয়াছেন। আলোচ্য মন্তব্যটি বিচার কর।—[আলোচনা দ্রষ্টব্য]

রাবণ ও চিত্রাঙ্গদা : মধুসূদন দত্ত

ভূমিকা

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা দেশে মধুসূদনের আবির্ভাব এক অপ্রত্যাশিত বিস্ময়কর ঘটনা। যখন প্রতীচ্য সভ্যতার সহিত বাঙালীর যোগাযোগের ফলে বাঙালীর চিত্তভূমি দীর্ঘ শতাব্দীর বন্ধুরতা হইতে পরিণত ফলশ্যাম সরস উর্বরত্ব লাভ করিতেছিল। ইংরাজি শিক্ষাদীক্ষা ও আধুনিক যুগের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বুদ্ধিবাদের উদ্বোধন ঘটিতেছিল, প্রাচীন প্রথাগত সংস্কার ও সাহিত্যের অন্ধ গতানুগতিকতা ধীরে ধীরে অপসারিত

আধুনিকতার লক্ষণ

হইতেছিল। সেই মহেন্দ্রক্ষণেই মধুসূদনের আবির্ভাব। বিদেশী সংস্কৃতির মন্থনদণ্ডে বাঙালী সংস্কৃতির সমুদ্র-মন্থনের শ্রেষ্ঠ রত্ন মধুসূদন। য়ুরোপীয় বিদ্যা, প্রতীচ্য মানবিকতাবাদ, যুক্তিধর্ম, সংস্কারহীনতা তাঁহার মনোলোককে উদ্ভাসিত করিয়াছিল, মাতৃ-ভাষার প্রতি অকৃত্রিম মমতা ও শ্রদ্ধা লইয়া তিনি আমাদের সাহিত্যে অবতীর্ণ হইলেন। নবযুগের উপযোগী নাটক-প্রহসনকাব্য লিখিয়া তিনি আমাদের সাহিত্যের স্বর্ণ সম্ভাবনার দ্বার উদ্‌ঘাটিত. করিলেন। বাঙলা সাহিত্য তাহার আটশত বৎসরের নিদ্রা ভাঙিয়া নব-যৌবন-মত্ততা লইয়া জাগিযা উঠিল। শর্মিষ্ঠা, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, কৃষ্ণকুমারী নাটক, পদ্মাবতী নাটক, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, অমিত্রাক্ষর ছন্দ, সনেট রচনা, সার্থক প্রহসন রচনা—মধুসূদনের প্রতিভা যাহা কিছু স্পর্শ করিয়াছে তাহাকেই উজ্জল করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি মেঘনাদবধ কাব্য। এই কাব্যে মধুসূদনের বিশ্ববিজয়ী প্রতিভার তূর্যনিনাদ ধ্বনিত হইয়াছে। হোমার-ভার্জিল-টাস্‌সো, দান্তে-মিলটন, ব্যাস-বাল্মীকি, কালিদাস-কৃত্তিবাস, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ কবিকীর্তির গৌরব আত্মসাৎ করিয়া মধুসূদন এই জাতীয় জীবনের অমর মহাকাব্যখানি রচনা করিয়াছেন। রামায়ণের মেঘনাদবধ ইহার কাহিনী হইলেও রামায়ণের সংস্কার কবি গ্রহণ করেন নাই। ইহার বিষয় কেবল রাম-রাবণের সংঘর্ষের কাহিনী নয়, পৌরাণিক আধারে পরিবেশিত নবযুগের সঞ্জীবনী সুধা। অপ্রতিবিধেয় দৈবের সহিত অনমনীয় পুরুষকারের এক রক্তাক্ত কাহিনী মেঘনাদবধ প্রচ্ছদপটের অন্তরালে গোপন রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ইহার পরিচয়-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

বাঙলা সাহিত্যের নবযুগ

শ্রেষ্ঠ কীর্তি মেঘনাদ-বধকাব্য

জাতীয় জীবনের অমর মহাকাব্য

"মেঘনাদবধ কাব্যে কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনাপ্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই। এই পরিবর্তন আত্মবিস্মৃত নহে। ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে। কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়াছেন এবং রাম-রাবণের সম্বন্ধে অনেকদিন হইতে আমাদের মনে যে একটা

রবীন্দ্রনাথের অভিমত

বাঁধাবাঁধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে স্পর্ধাপূর্বক তাহারও শাসন ভাঙিয়াছেন।

প্রথাগত শাসনদ্রোহিতা

এই কাব্যে রাম-লক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-ইন্দ্রজিৎ বড় হইয়া উঠিয়াছে। যে ধর্মভীরুতা সর্বদাই কোনটা কতটুকু ভাল ও কতটুকু মন্দ তাহা কেবলই অতি সূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া চলে, তাহার ত্যাগ দৈন্য আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। যে শক্তি অতি সাবধানে

উদ্ধত শক্তির জয়গাথা

সমস্তই মানিয়া চলে, তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে-শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলে পরাইয়া দিল।"

এই মন্তব্যের মধ্যেই মেঘনাদবধের সত্যপরিচয় সংক্ষেপে স্মরণীয় হইয়া উঠিয়াছে।

মেঘনাদবধ কাব্য নয় সর্গে রচিত, ইহার সূচনা বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদে রাবণের বিলাপ এবং সেনাপতিপদে ইন্দ্রজিতের অভিষেকের দ্বারা। দ্বিতীয় সর্গে দেখা যায় দেবলোকে ইন্দ্রজিত বধের ষড়যন্ত্র চলিয়াছে এবং ইন্দ্রের প্ররোচনায় মহাদেবকে কামোন্মত্ত করিয়া পার্বতী তাঁহার নিকট হইতে মেঘনাদবধের উপায় জানিয়া লইলেন। যুদ্ধায়োজনের জন্য মেঘনাদ

মেঘনাদবধ কাব্যের সংক্ষিপ্ত বিষয়

যখন লঙ্কায় কর্তব্যরত, প্রমোদকানন হইতে বিরহকাতরা প্রমীলা তখন বীরাঙ্গনা সাজে রামচন্দ্রের সৈন্যাবরোধ ভেদ করিয়া স্বামীর সহিত মিলিত হইলেন, ইহাই তৃতীয় সর্গের বিষয়। সমগ্র লঙ্কায় মেঘনাদের অভিষেকে উৎসববাদ্য বাজিতেছে, এদিকে অশোককাননে অবনতমুখী বিষণ্ণহৃদয়া সীতা বিভীষণপত্নী সরমার নিকট আপন মনোবেদনা ব্যক্ত করিতেছেন, ইহা চতুর্থ সর্গের বিষয়বস্তু। পঞ্চম সর্গে লক্ষ্মণ কর্তৃক মেঘনাদবধের আয়োজনের চিন্তায় স্বর্গীয় দেবতাগণ

বিভিন্ন সর্গের মূল ঘটনা

বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেছেন; স্বপ্নের সহায়তায় মায়াদেবী লক্ষ্মণকে দিয়া মহাদেব-রক্ষিত রাবণের অভয়া-মন্দিরে পূজার্ঘ্য নিবেদন করাইলেন, অন্যদিকে মাতৃবন্দনা করিয়া মেঘনাদ যজ্ঞ-গৃহের দিকে গমন করিলেন। চণ্ডীর আশীর্বাদে অব্যর্থ দেবঅস্ত্র সংগ্রহ করিয়া নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণ কর্তৃক নিরস্ত্র মেঘনাদকে হত্যা ষষ্ঠ সর্গের বিষয়বস্তু। পরবর্তী সর্গে পুত্রশোকাতুর প্রতিহিংসাপরায়ণ রাবণের সহিত রাম লক্ষ্মণ ও

দেবসৈন্যের তুমুল রণ ও লক্ষ্মণের প্রতি রাবণের শক্তিশেল প্রয়োগ কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। অষ্টম সর্গে শক্তিশেলে অচৈতন্য লক্ষ্মণের পুনর্জীবনের সন্ধান লাভের জন্য মায়াদেবীর সহিত রামচন্দ্র প্রেতপুরীতে গমন করিয়াছেন এবং দশরথের নিকট বিশল্যকরণীর সন্ধান পাইয়াছেন। সর্বশেষ সর্গে শোকাভিভূত লঙ্কাবাসীর সহিত বজ্রাহত রাবণ সিন্ধুতীরের চিতাশয্যায় 'লঙ্কার পঙ্কজ রবি'র অস্তাচল-গমনের আয়োজন করিয়াছেন, সতী প্রমীলা ও প্রিয়পুত্র মেঘনাদকে শ্মশানের অগ্নিকুণ্ডে সমর্পণ করিয়া বিশদবস্ত্র ভাগ্যহত রাবণ শূন্য গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। অভিষেক, অস্ত্রলাভ, সমাগম, অশোকবন, উদ্যোগ, বধ, শক্তি নির্ভেদ, প্রেতপুরী ও সংক্রিয়া—এইগুলি নয়টি সর্গের কবিপ্রদত্ত নামকরণ।

সর্গের নামকরণ

মাধুকরী-র রাবণ ও চিত্রাঙ্গদা নামক কবিতাটি মেঘনাদবধ কাব্যের অস্ত্রলাভ নামক প্রথম সর্গ হইতে গৃহীত (৩৪৫ ছত্র হইতে ৪০৫ ছত্র)।

আলোচ্য কবিতার উৎস ও নামকরণ

'সম্মুখসমরে পড়ি বীরচূড়ামণি বীরবাহু', অকালে যমপুরে গমন করার পর ভগ্নদূতের মুখে সেই শোকবার্তা শুনিয়া পুত্রশোকাতুর রাবণ ঐশ্বর্যভূষিত রাজসভায় বিগলিতাশ্রু ক্রন্দন করিয়াছেন, তারপর পুত্রের আমৃত্যু বীরত্বের কাহিনী শ্রবণ করিয়া প্রাসাদশীর্ষে আরোহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন। শোকের তীব্র বেদনার উপর পুত্র-গৌরবের শ্লাঘা কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা দিয়াছে, এমন সময় রামচন্দ্র কর্তৃক সমুদ্রে সেতুবন্ধন দেখিয়া, বারীন্দ্রের বিপুল অঙ্গে এই মনুষ্যরচিত কলঙ্ক দেখিয়া তিনি সমুদ্রকে ধিক্কার দিয়া কনকাসনে আসিয়া বসিলেন। ঠিক তখন পুত্রশোকাতুরা উদভ্রান্তবেশিনী বীরবাহুজননী চিত্রাঙ্গদা আলুলায়িত-কুন্তলা হইয়া রাজসভায় ছুটিয়া আসিয়াছেন। তাহার সঙ্গে হেমাঙ্গ-সঙ্গিনী দল। একদিকে পুত্রশোকাভিভূত পিতা অন্যদিকে সন্তান বিয়োগব্যথিতা জননী—শোকের এই সর্বাত্মক চিত্র মধুসূদনের দ্বারাই সম্ভব। অথচ এই মধুসূদনই আলোচ্য সর্গের সূচনায় লিখিয়াছিলেন, 'গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত'। চিত্রাঙ্গদা যখন রাজসভায় প্রবেশ করিলেন, তখন,

পূর্বসূত্র

শোকের ঝড় বহিল সভাতে!
সুরসুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে

বামাকুল ; মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন
নিশ্বাস প্রলয়-বায়ু ; অশ্রুবারি-ধারা
আসার , জীমূত-মন্দ্র হাহাকার-রব ;
চমকিলা লঙ্কাপতি কনক-আসনে।

মৃতবৎসা রিক্তহৃদয়ার এই মর্মভেদী মূর্তি দেখিয়া রাজসভার দাসী পর্যন্ত চামর ফেলিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে, ছত্রধর ছত্র পরিত্যাগ করিয়া এই শোকে আপন শোক মিলাইয়াছে, নিষ্ফল ক্রোধে দৌবারিকের কোষবদ্ধ তলোয়ার অকস্মাৎ বিদ্যুচ্চমকে বাহিরে আসিয়া আবার মুখাবৃত করিয়াছে, পাত্রমিত্র সভাসদ সকলেই এই সর্বস্বান্ত মাতার সহিত কাঁদিয়া উঠিয়াছে। এমন কি মধুসূদন—স্বয়ং কবি পর্যন্ত কাঁদিয়াছেন এই দৃশ্য আঁকিতে, নতুবা এই অশ্রুসাগরের এতগুলি তরঙ্গ কেমন করিয়া সম্ভব হইল ?

ভাবার্থ—(ছত্র ১—১১) বীরবাহুজননী রাবণমহিষী পুত্রশোকাতুরা চিত্রাঙ্গদা উন্মাদিনী উদ্‌ভ্রান্তবেশিনী হইয়া রাজসভায় প্রবেশ করিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, বিধিকৃপায় প্রাপ্ত তাঁহার একটি

বস্তু-সংক্ষেপ

মাণিক্যতুল্য সন্তান নিশ্চিন্তমনে তিনি রাবণের নিকট নিরাপদে রক্ষা করিতে দিয়াছিলেন। দরিদ্রের ধন রক্ষাই রাজধর্ম। কিন্তু, কাঙালিনীর জননীর সেই অমূল্য রত্ন রাবণ কোথায় হারাইলেন ? (ছত্র ১২—৩০) রাবণ এই গঞ্জনার উত্তরে আপন অদৃষ্টকে দায়ী করিয়া বলিলেন, দৈবগ্রহে বীরধাত্রী লঙ্কা বীরশূন্য হইতেছে, নিদাঘে যেইরূপ বনস্থলী ফুলশূন্য এবং নদী জলহীন হয়। দাশরথি রাম সজারুর মত বারুই-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া লঙ্কা ছিন্নভিন্ন করিতেছে, স্বয়ং মহাসমুদ্র তাহার অনুরোধে আপন চরণে সেতুর শৃঙ্খল পরিধান করিয়াছেন এমনই ভাগ্য-বিড়ম্বনা। চিত্রাঙ্গদার একপুত্রশোক কিন্তু রাবণের বক্ষে শতপুত্রশোক অহর্নিশি জ্বলিতেছে, বিধি বাত্যাতাড়িত শিমূলবনের মত লঙ্কা ধ্বংসের আয়োজন করিয়াছে। (ছত্র ৩১—৬১) কিন্তু পুনরায় শোকসন্তপ্ত মহিষীর ক্রন্দনে রাবণ তাঁহাকে পুত্রের বীরত্ব ও গৌরবসংগ্রামের স্মৃতি লইয়া শোক নিবারণ করিতে বলিলেন, কারণ দেশবৈরীর সহিত সংগ্রামে মৃত বংশোজ্জ্বলকারী বীরপুত্রের জন্য বীরমাতার শোকপ্রকাশ অনুচিত। ইহা চিত্রাঙ্গদার অবিদিত নাই, কিন্তু কিসের জন্য সরযূতীরবাসী ক্ষুদ্র নর রামচন্দ্র

দেবেন্দ্রবাঞ্ছিত জলধিবেষ্টিত স্বর্ণ-লঙ্কাপুরীতে আসিল ইহাই চিত্রাঙ্গদার জিজ্ঞাসা। রামচন্দ্র বামন-হইয়া রাবণের প্রাংশুলভ্য স্বর্ণসিংহাসনের দিকে হস্তক্ষেপ করে নাই; সুতরাং রামকে দেশবৈরী বলা যায় না। নম্রশির সর্পকে আঘাত করিলে তবেই সে ফণা বিস্তার করে। রাবণকে অভিযোগ করিয়া মহিষী বলিতেছেন যে, রাবণও নিজকর্মদোষে লঙ্কাপুরে কালাগ্নি জ্বালিয়াছেন, এখন তাই সমগ্র রাক্ষসকুল ও তাঁহার সর্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে।

আলোচনা

রাবণ ও চিত্রাঙ্গদা মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গের অন্তর্ভুক্ত। প্রথম সর্গের বিষয়বস্তু, রাজসভাসমাসীন স্বর্ণলঙ্কাধিপতি রাবণের নিকট ভগ্নদূতকর্তৃক বীরবাহুর অকাল-মৃত্যুর সংবাদজ্ঞাপন এবং শোকজর্জরিত রাবণের ক্রুদ্ধ যুদ্ধাযোজন-প্রস্তুতি এবং তাহা দর্শনে পুত্রশ্রেষ্ঠ বীরবর মেঘনাদের যুদ্ধগমনের অনুমতি প্রার্থনা, রাবণের অনুমতি-প্রদান ও মেঘনাদের সৈনাপত্যপদে অভিষেকীকরণ। মৃত পুত্রের জন্য রাবণের নেত্রবারি নির্গলিত হইলেও ক্রোধোদ্দীপ্ত রাবণের যুদ্ধায়োজন এবং মেঘনাদের সৈনাপত্যে অভিষেক এই প্রারম্ভিক সর্গের মহাকাব্যিক পরিবেশটিকে বেশ ঘটনাবহুল করিযা তুলিয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যে একমাত্র পুত্রবিয়োগে শোককর্ষিতা অভাগিনী চিত্রাঙ্গদার আগমন এই সর্গের একখানি ক্রোড়পত্রের মত। অশ্রুসিক্তা জননীর নিকট রাবণ দেশপ্রীতি ও যুদ্ধের বীরত্বের সান্ত্বনা দিয়াছেন বটে কিন্তু রাবণের পক্ষে সে সান্ত্বনায় যেন বলিষ্ঠতা নাই। আসলে ইহার কিছুক্ষণ পূর্বে এই মর্মবিদারী মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া রাবণও অসহায়ের মত আর্তনাদ করিয়াছেন। পিতার পর এইবার মাতার শোক।

প্রথম সর্গের বিষয়

মেঘনাদবধ কাব্যের সূচনায় বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করিয়া কবি কাব্যবীণাপাণির নিকট আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছেন,—

উর তবে উর দয়াময়ি
বিশ্বরমে! গাইব মা বীররসে ভাসি
মহাগীত।

কাব্যের এই প্রারম্ভিক প্রতিশ্রুতি পালনে কবির ব্যর্থতা লইয়া এযাবৎ বহু আলোচনা হইয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত বীররসাত্মক কাব্যখানি যে অশ্রুর তর্পণে

সমাপ্ত হইয়াছে এই বিষয়েও সকলে একমত হইয়াছেন। অন্যান্য সর্গের কথা বলাই বাহুল্য, কেবল প্রথম সর্গে প্রাগুক্ত প্রতিশ্রুতির পরই রাবণকে আমরা দেখি পুত্রনিধন-সংবাদে অশ্রুপ্লাবিত-কলেবর ক্রন্দনব্যাকুল অচৈতন্যপ্রায়, মুখে অস্ফুট শোকোচ্ছ্বাস,—

বীররস ও করুণরস

হা পুত্র হা বীরবাহু বীরচূড়ামণি।
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে?
কি পাপে দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি
হরিলি এ ধন তুই? হায় রে কেমনে
সহি এ যাতনা আমি?

কাঠুরিয়া যেমন বৃক্ষের ডালগুলি ছেদন করিয়া বৃক্ষকাণ্ডে কঠিন কুঠার হানে, বিধাতাও সেইরূপ রাবণের প্রিয়পুত্রগণকে হরণ করিয়া ধীরে ধীরে রাবণকে ছিন্নশাখক্রমে চরম আঘাতের জন্য প্রস্তুত করিতেছেন। মধুসূদনের এই রাবণ পুত্রশোকাতুর পিতা, বাৎসল্যে কোমল তাঁহার পিতৃচিত্ত। পুত্রের গৌরবে ও সংগ্রামে তিনি কিছুক্ষণের জন্য রোমাঞ্চিত হইলেও শেষ পর্যন্ত তাঁহার ফুলসম কোমল হৃদয়ে এই বজ্রাঘাত ভুলিতে পারেন নাই, 'পিতা সদা মনোদুঃখে দুঃখী'—ইহাই প্রথম সর্গের রাবণ চরিত্র।

প্রথম সর্গের রাবণ

আলোচ্য কবিতায় হৃতপুত্রা মহিষীকে সান্ত্বনাচ্ছলেই রাবণ তাঁহার নিকট বীরপুত্রের বীর্য-গৌরব ও দেশরক্ষায় তাঁহার অবিস্মরণীয় সংগ্রামের কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শোকতাড়িত রাবণের রূপকে কবি পরিবর্তিত করেন নাই।

করুণ রস সৃষ্টিতে কবির সক্ষম প্রয়াসের আর একটি নিদর্শন এই চিত্রাঙ্গদা চরিত্র। রাবণ চরিত্রে মধুসূদনের একটি বিশিষ্ট জীবনাদর্শ আছে, মেঘনাদ প্রমীলা সীতা চরিত্রেও তাঁহার কিছু বক্তব্য আছে। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা এখানে কাব্যের প্রয়োজনেই দেখা দিয়াছেন। বীরবাহুর মৃত্যুতে অভাগিনী জননীর শোক-প্রকাশের নিমিত্তই তাঁহার উপস্থাপনা। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে চিত্রাঙ্গদা চরিত্রের ভিতর দিয়া মধুসূদনের কাব্য-পরিকল্পনার একাধিক উদ্দেশ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমত, রাবণের প্রিয়পুত্র মেঘনাদ এবং মেঘনাদের জননী মন্দোদরী রাবণের রাজমহিষী, স্বামীর উপযুক্ত স্ত্রী। মধুসূদন তাঁহাকে

চিত্রাঙ্গদা চরিত্র উপস্থাপনার উদ্দেশ্য

রাবণের অনুবর্তিনী করিয়াই অঙ্কন করিয়াছেন। অথচ চিত্রাঙ্গদার প্রতি রাবণের ঈষৎ অবহেলা ছিল বলিয়াই চিত্রাঙ্গদার নিকট বীরবাহুই ছিল একমাত্র প্রাণের ধন, কাঙালিনীর বক্ষোরত্ন। চিত্রাঙ্গদার নিকট রাবণ 'রক্ষঃ-কুলমণি' 'লঙ্কানাথ', 'রাজকুলেশ্বর', কিন্তু রানী 'দীন' 'দরিদ্র'। শাবকরূপ পুত্রকে তিনি রাবণরূপ তরুর কোটরে স্থাপন করিয়াছিলেন। তাই একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে তাঁহার শেষ সম্বল হারাইয়া গিয়াছে। তিনি হৃতসর্বস্ব অনাথিনী হইয়া পড়িয়াছেন। দেশরক্ষা, বীরধর্ম এইগুলি চিত্রাঙ্গদার নিকট তাই অর্থহীন মনে হইতেছে। এইজন্য রাবণের প্রতি তাঁহার গঞ্জনার সীমা নাই। দ্বিতীয়ত, অতুল ঐশ্বর্যপতি পুরুষকারের অধীশ্বর হইয়াও সীতাহরণেব নিমিত্ত রাবণের পতনের কারণটিকে মধুসূদন ভুলিতে পারেন নাই। রাবণের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হইয়াও কেবল নারী নিগ্রহের অপরাধেই রাবণের যে সবনাশ হইবে ইহাও মধুসূদন বারবার স্মরণ করিয়াছেন। ইহাই রাবণের নিয়তি, তাঁহার অদৃষ্ট বা বিধি। চিত্রাঙ্গদার মুখ দিয়া প্রথম সর্গে মধুসূদন তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। ক্ষুদ্র নর রামচন্দ্র যে রাবণের সহিত শত্রুতা সাধন করিয়া সমগ্র লঙ্কাপুরী ধ্বংসে উদ্যত হইয়াছে, তাহার কারণ ঐ রাবণের একমাত্র অপরাধে, কারণ,

কাকোদর সদা
নম্রশিরঃ, কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি
কেহ, ঊর্ধ্বফণা ফণী দংশে প্রহারকে।
কে কহ এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে? হায়, নাথ, নিজকর্মফলে
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি।

নারীত্বের অবমাননা ঘটাইয়া রাবণ সেই নম্রশিব সর্পকে ক্রুদ্ধ করিয়াছেন, এখন তাহার সর্বনাশ অনিবার্য, এই পরিণাম ঘোষণার জন্য চিত্রাঙ্গদা-চরিত্রের উপস্থাপনার প্রয়োজন হইয়াছে। রাবণের কর্মফলের এই রূঢ় ইঙ্গিত পুত্র-বৎসলা জননী ব্যতীত আর কাহার দ্বারা সম্ভব হইত?

চিত্রাঙ্গদা চরিত্রের উল্লেখ বাল্মীকি রামায়ণে নাই,. কৃত্তিবাসে আছে, বীরবাহু চরিত্রের কথাও কৃত্তিবাসে মাত্র পাই। মধুসূদন আপন কল্পনায় উক্ত উল্লেখ-সংকেত গ্রহণ করিয়া মেঘনাদবধ কাব্যে তাহাকে পূর্ণতা দান

করিয়াছেন এবং কাব্যসূচনায় নায়কের আসন্ন ট্রাজেডির সম্ভাবনা মুদ্রিত করিয়াছেন এই চরিত্রের দ্বারা। এইখানেই তাঁহার কবিকীর্তি।

রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ

[ছত্র ১-১০] **কতক্ষণে···পানে**—সখীদল-পরিবৃতা হইয়া আলুলায়িত-কুন্তলা ক্রন্দন-কাতরা চিত্রাঙ্গদা রাজসভায় প্রবেশ করার পর স্বামীর সহিত সাক্ষাতের প্রথমেই পুত্রশোকের কথা বলিতে পারেন নাই। আকস্মিক শোকোচ্ছ্বাস ঈষৎ প্রশমিত হইলে সাধ্বী মহিষী রাজার দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে শোককর্ষিতা হইয়া কথা বলিতে লাগিলেন। **একটি রতন · কৃপাময়**—চিত্রাঙ্গদার একমাত্র পুত্র বীরবাহু। সুতরাং তিনি যেন দয়াময় দেবতার আশীর্বাদে [বিষ্ণুর বরে] একটিমাত্র রত্নলাভ করিয়াছিলেন। এই মন্তব্যের মধ্য দিয়াই রাজার অপ্রধানা মহিষী চিত্রাঙ্গদার স্বামী-অবহেলাজনিত ক্ষোভ প্রকাশ পাইয়াছে। স্বামী নয়, পুত্রই তাঁহার দুর্ভাগ্যপীড়িত জীবনের একমাত্র সম্বল ও আশ্রয় ছিল। মহিষীর গৌবব অপেক্ষা জননীব কাতরতাই তাঁহার চবিত্রের বৈশিষ্ট্য। এইখানেই মন্দোদবীব সহিত তাঁহাব পার্থক্য। **দীন আমি······পাখী**—একমাত্র পুত্রসম্বল জননী আপনাব দীনতাবশত পুত্র-পালনের ভার দিয়াছিলেন স্বামীকে, রক্ষঃকুলপতি বাবণকে। পক্ষী তাহার অসহায় শাবককে আশ্রয়ের নিমিত্ত যেইরূপ তরুর কোটবে বাখে, চিত্রাঙ্গদাও আপনার রক্ষণা-বেক্ষণের অক্ষমতা-বশত দৃঢ় তরু মনে কবিয়া লঙ্কাধিপতি বাবণের নিরাপদ আশ্রয়ে অসহায় পুত্রকে রাখিয়াছিলেন। অসহায় শাবকপালনে আশঙ্কিত, শত্রুভীত পাখীর সহিত জননী চিত্রাঙ্গদা এবং লঙ্কাপতি রাবণের সহিত নিরাপত্তাযুক্ত তরুর তুলনা সার্থক। **থুয়েছিনু**—রাখিয়াছিলাম। তৎসম সংস্কৃত শব্দের পাশে এইরূপ দেশী শব্দ ব্যবহারেই মধুসূদনের কৃতিত্ব। তদ্ব্যতীত, মহিষী নয়, দীনা জননীর মুখে এই শব্দটি তাহার নারীসুলভ সাধারণত্বেই পরিচয় দেয়। **কহ কোথা···রতন?**—যুদ্ধক্ষেত্রে পুত্রের মৃত্যু যেন মাতার নিকট অবিশ্বাস্য, তাই তিনি নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে যাঁহার নিকট পুত্রকে রক্ষা করিবার দায়িত্বভার দিয়াছিলেন, তাঁহাকে প্রশ্ন করিতেছেন সেই পুত্রকে তিনি কোথায় রাখিয়াছেন? অমূল্য রত্নতুল্য পুত্রকে না দেখিয়া তাঁহার এই ব্যাকুল জিজ্ঞাসা অসহায়া জননীর শোকসন্তপ্ত উন্মাদিনী অবস্থাকেই

নিপুণভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। সামান্ত উক্তির মাধ্যমে চরিত্র-চিত্রণের নিপুণ ক্ষমতা ছিল মধুসূদনের। চিত্রাঙ্গদা তাহার প্রমাণ। **দরিদ্র-ধন-রক্ষণ রাজধর্ম**—রাজার অন্যতম ধর্ম দরিদ্রের ধন যত্নসহকারে রক্ষা করা। রাজার নিকটই দীনব্যক্তি তাঁহার একমাত্র অমূল্য রত্ন নিশ্চিন্তচিত্তে সমর্পণ করে, উহার নিরাপত্তায় তাহার কোনো আশঙ্কা থাকে না। **তুমি রাজকুলেশ্বর**—রাবণ তো কেবল দরিদ্রের ধনরক্ষক রাজাই নন, তিনি ঐশ্বর্যপুরী লঙ্কার অধিপতি, সুতরাং রাজকুলেশ্বর, অর্থাৎ দীনা জননীর একমাত্র অমূল্য মণি তাঁহার নিকট নিরাপদেই থাকিবে এইরূপই স্বাভাবিক।

[ছত্র ১২-২০] **দশানন বলী**—বলশালী রাবণ। **এ বৃথা সুন্দরি**—প্রিয় মহিষীকে সম্বোধন করিয়া রাবণ তাহাকে বলিলেন যে চিত্রাঙ্গদা অকারণে তাঁহাকে গঞ্জনা দিতেছেন। ভাগ্য-দোষে অদৃষ্টপাকে আজ রাবণের এই দুর্গতি, তাই তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ হইতে বীরবাহু হারাইয়া গিয়াছে। বীরবাহুকে হারাইবার জন্য রাবণ অপরাধী নন, দোষী তাঁহার নিয়তি, সুতরাং তাহাকে অনুযোগ করা অর্থহীন। **বীরপুত্র-ধাত্রী···জলশূন্য নদী**—রাবণ তাঁহার অদৃষ্টবিড়ম্বনাকেই তাঁহার সকল ভাগ্যবিপর্যয়ের কারণ বলিয়া মনে করিতেছেন। এই নিষ্ঠুর অদৃষ্টের নিমিত্ত লঙ্কার প্রবল পরাক্রান্ত বীরসকল রামের সহিত যুদ্ধে একে একে নিহত হইতেছেন, ইহা অকল্পনীয় ছিল। স্বর্ণলঙ্কা অসংখ্য বীরপুত্রের পালয়িত্রী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, কিন্তু সামান্য মানব রামের সহিত যুদ্ধে তাহাদের মৃত্যু ঘটিতেছে, ইহা কি বিশ্বাস্য ব্যাপার? কিন্তু দৈবক্রমে তাহাও সম্ভব হইতেছে। গ্রীষ্মকালে কানন যেইরূপ ফলহীন হয়, নদী জলশূন্য হয়, সেইরূপ রাবণের দৈবগ্রহে লঙ্কা বীরশূন্য হইতেছে। এখানে নিদাঘের প্রচণ্ড দাবদাহ রাবণের ভাগ্যবিপর্যয়ের এবং ফলশূন্য বনস্থলী ও জলশূন্য নদী বীরশূন্য লঙ্কার সহিত উপমিত হইয়াছে। **বরজে সজারু···লঙ্কা মোর**—পানের ক্ষেত্রের শত্রু হইল সজারু, তাহারা পান-উৎপাদনস্থানে প্রবেশ করিয়া পানের ক্ষেত ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ রামচন্দ্র ও তাঁহার সৈন্যদল রাবণের সুদুর্গম লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়া স্বর্ণলঙ্কার সযত্ন-বর্ধিত সৌন্দর্য নষ্ট করিয়া দিতেছে। উপমাটি মধুসূদনের গ্রাম্য জীবনের অভিজ্ঞতার পরিচায়ক।

[ছত্র ২১-৩০] **আপনি জলধি···অনুরোধে**—রামচন্দ্র সেতুবন্ধের দ্বারা মহাসমুদ্রকেও বন্দী করিয়াছেন, ইহা নিয়তি ব্যতীত আর কী হইতে পারে!

নতুবা যে মহাম্বুধি মানুষের পক্ষে দুস্তর ও দুর্লঙ্ঘ্য সেও আজ মানুষের অনুরোধে স্বেচ্ছায় আপন চরণে সেতুরূপ শৃঙ্খল গ্রহণ করে! কিছুক্ষণ পূর্বে বীরবাহুর মৃত্যুদৃশ্য ও যুদ্ধের অবস্থা দেখিবার জন্য রাবণ প্রাসাদশীর্ষে আরোহণ করিয়া সমুদ্রে রামচন্দ্রের সেতু নির্মাণ দেখিয়া মর্মাহত হইয়াছেন। সমুদ্রের এই স্বেচ্ছাবৃত্তহীন সেতুশৃঙ্খল তাঁহাকে ব্যথিত করিয়াছিল, তিনি সমুদ্রকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন,

> কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে
> প্রচেতঃ! হা ধিক, ওহে জলদলপতি!
> এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য অজেয়
> তুমি? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ
> রত্নাকর?· ·
> অধম ভালুকে
> শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে;
> কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
> বীতংসে?

এখানে তাহারই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

এক পুত্রশোকে···দিবানিশি—মধুসূদনের রাবণ কেবল পুত্রবৎসল স্নেহান্ধ পিতা মাত্র নন, তিনি দেশবৎসল আদর্শ রাজা। পুত্রের মৃত্যু তাঁহাকে শোক-মূর্ছিত করিলেও লঙ্কার প্রতিটি বীরপুত্রের মৃত্যুই তাঁহার নিকট গভীর শোকের কারণ। তাই চিত্রাঙ্গদার এক বীরবাহু নামক পুত্রের মৃত্যুজনিত শোকে তিনি বলিতেছেন, তাঁহার হৃদয়বেদনা রানীর বেদনা অপেক্ষা শতগুণ তীব্র। কারণ তাঁহার প্রিয় স্বভূমির শত শত বীরযোদ্ধা এই যুদ্ধে নিহত হইতেছে। প্রতিটি মৃত্যুই তাঁহার নিকট পুত্রশোকের মত বেদনাদায়ক। **হায় দেবি,··· এ কাল সমরে**—অরণ্যে বায়ুপ্রাবল্যে শিমূলের বীজসকল উড়িয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। রামচন্দ্রের সৈন্যদলের পরাক্রমে ও আক্রমণে তেমনি অসহায় শিমূল বীজের মত রাবণের সৈন্যদল চতুর্দিকে ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িতেছে। এইজন্য এই যুদ্ধকে কালযুদ্ধ বলা যায়, ইহাতে অপরাজেয় যোদ্ধাগণ—রাক্ষস-কুলের শ্রেষ্ঠ বীরগণ পরাস্ত হইয়া সহজেই নিহত হইতেছে। **বিধি প্রসারিছে ···তোমারে**—পুত্রহারা চিত্রাঙ্গদার শোকাকুল গঞ্জনা শুনিয়া রাবণ তাঁহার

এই ভাগ্যবিড়ম্বনাকে দৈব বলিয়া মনে করিতেছেন। তাঁহার মনে হইতেছে আজ ভাগ্যদোষে তাই সবই বিপরীত। দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র মানুষের সেতুর শৃঙ্খল পরিগ্রহ করিতেছে। বীরধাত্রী লঙ্কা বীরশূন্য হইতেছে, যেন পানের ক্ষেত্রে সজারু প্রবেশ করিতেছে। ইহা কেবল রামচন্দ্রের আক্রমণেই নয়; লঙ্কাধিপতির বিশ্বাস—স্বয়ং বিধাতা আজ লঙ্কাব উপর বিরূপ, তিনিই লঙ্কা গ্রাস করিবার জন্য তাঁহার লোলুপ বাহু প্রসারিত করিয়াছেন।

[ছত্র ৩১-৪০] **বিধুমুখী**—চন্দ্রসদৃশ মুখ যাহাব। **গন্ধর্ব-নন্দিনী**—চিত্রাঙ্গদার পিতা চিত্রসেন গন্ধর্ব। **বিহ্বলা আহা স্মরি পুত্রবরে**—রাবণের সান্ত্বনা বাক্য শুনিয়া চিত্রাঙ্গদার শোক প্রশমিত হইল না, অধোমুখে তিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন। পুত্রের মুখখানি মনে পড়িল, আবার তিনি বিহ্বলা বিবশা হইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। **দাশরথি-অরি**—রামচন্দ্রেব শত্রু অর্থাৎ রাবণ। **দেশবৈরী···ক্রন্দন**—রাবণ পুনবায় চিত্রাঙ্গদাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন যে, চিত্রাঙ্গদা বীরাঙ্গনা, বীরবাহু তাহার বীরপুত্র। জন্মভূমি রক্ষার জন্য বীরসন্তান দেশের শত্রুর সহিত পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়া বীরবাঞ্ছিত স্বর্গপুরে গিয়াছে, সুতরাং বীরকর্মে মৃত্যু হইলে তাহা শোকেব বিষয় নয়। **এ বংশ··পরাক্রমে**—রণক্ষেত্রে বীরবাহু যে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছে তাহার জন্য রাবণের বংশই গৌরবান্বিত হইয়াছে।

ইন্দুনিভাননে—চন্দ্রাননা, সম্বোধন। **তিত অশ্রুনীরে**—চোখের জলে সিক্ত হইতেছ?

[ছত্র ৪১-৫০] **চারুনেত্রা দেবী**—অর্থাৎ সুদৃশ্যা সুন্দরী। চিত্রাঙ্গদা রূপসী, তাই তাহার রূপের উল্লেখ করা হইতেছে। **দেশবৈরী···ভাগ্যবতী**—চিত্রাঙ্গদা রাবণকে বলিলেন, দেশের শত্রুর সহিত সংগ্রাম বীরত্বব্যঞ্জক, ক্ষণজন্মা ব্যক্তিই দেশবৈরীকে নিহত করে। এইরূপ পুত্রের জননী অবশ্যই ভাগ্যবতী। **বীরপ্রসূন**—বীরশ্রেষ্ঠ। প্রসূন শব্দের অর্থ পুষ্প; সৌন্দর্যে লাবণ্যে কুসুমবৎ বীর; অথবা আপনার বীরজীবনকে যিনি দেশের জন্য অর্ঘ্য করিয়াছেন, এইরূপ অর্থ করা যায়। **প্রসূ**—জননী। **কিন্তু ভেবে··· রাবণ?**—রাবণ চিত্রাঙ্গদাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিলেন যে, দেশের শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিয়া বীরবাহু বীরবাঞ্ছিত স্বর্গ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা রাবণকে প্রশ্ন করিতেছেন, রামচন্দ্র কী অপরাধে দেশবৈরী হইলেন,

এবং সে অপরাধ কাহার? কোথায় লঙ্কা এবং কোথায় সুদূর অযোধ্যাপুরী! অথচ সেই দূর রাজ্য হইতে রামচন্দ্র লঙ্কায় আসিয়াছেন, নিশ্চয় কোনও গূঢ়তর কারণে। সেই কারণ স্বয়ং রাবণের কৃতকর্ম, ইহাই চিত্রাঙ্গদার বক্তব্য। **দেবেন্দ্র-বাঞ্ছিত**—দেবরাজ ইন্দ্র পর্যন্ত স্বর্ণলঙ্কার ঐশ্বর্যে মুগ্ধ ও সম্পদলুব্ধ। **রজত-প্রাচীর···জলধি**—লঙ্কার চতুষ্পার্শে সমুদ্র সফেন তরঙ্গের দ্বারা যেন রৌপ্যনির্মিত প্রাচীর দিয়া স্বর্ণলঙ্কাকে বেষ্টন করিয়া আছে। লঙ্কার সৌন্দর্য মধুসূদনের কবি-কল্পনাকে বারবার উদ্বেলিত করিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে রাবণ যেমন তাঁহার মানসপুত্র, লঙ্কাও সেইরূপ মধুসূদনের মানসসৃষ্টি। তাই লঙ্কাকে ঐশ্বর্যে সম্পদে ভূষণে সাজাইয়াও তাঁহার তৃপ্তি নাই, সমুদ্রের রৌপ্যশীর্ষ তরঙ্গের দ্বারা লঙ্কার প্রাচীর নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। **শুনেছি··ক্ষুদ্র নর**—রামচন্দ্র সামান্য মনুষ্য, আর লঙ্কা সৌন্দর্যপুরী; সুতরাং সাধারণ নরের পক্ষে স্বর্ণ-সাম্রাজ্য-অভিযান অস্বাভাবিক ব্যাপার, ইহাই চিত্রাঙ্গদার বক্তব্য। **তব হৈমসিংহাসন আশে···চাঁদে**—ক্ষুদ্র নব স্বর্ণমোহে ঐশ্বর্যলোভে রাবণের সুবর্ণসিংহাসনের জন্য লঙ্কায় আগমন করেন নাই, বামন হইয়া তিনি চন্দ্রে হস্ত প্রসারণ করেন নাই। নিশ্চয় তাঁহার লঙ্কা-অভিযানের পশ্চাতে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য আছে! **তব দেশরিপু কেন তারে বল, বলি?**—চিত্রাঙ্গদা বীর রাবণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, রামচন্দ্র রাবণের সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া তাঁহার লঙ্কার সম্পদহরণের জন্য আগমন করেন নাই, সুতরাং তাঁহাকে দেশবৈরী বলার কোনো সংগত কারণ আছে কি? তিনি অকারণে রাবণের শত্রু হন নাই, যে কারণে শত্রু হইয়াছেন, তাহা চিত্রাঙ্গদা পরবর্তী চরণেই ব্যাখ্যা করিবেন। **কাকোদর······প্রহারকে**—সর্প বক্রোদর বলিয়া কাকোদর, সর্বদাই ভূমিতলশায়ী, নম্রশিরঃ; কিন্তু তাহাকে যদি কেহ আঘাত করে তবে সে ফণা তুলিয়া আঘাতকারীকে দংশন করে। রামচন্দ্র ক্ষুদ্র নর। তিনি ঐশ্বর্যলোভে স্বর্ণলঙ্কা আক্রমণ করেন নাই, করিলে তাঁহাকে চিত্রাঙ্গদা দেশবৈরী বলিতেন, উহাকে বামনের চন্দ্রপ্রাপ্তির চেষ্টা বলিতেন। কিন্তু রাবণ সীতাহরণ করিয়া ক্ষুদ্র নরের সম্মানে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, এখন নতশির সর্প ফণা বিস্তার করিয়া প্রহারকারীকে দংশন করিতে উদ্যত হইয়াছে, ইহাই রামচন্দ্রের লঙ্কা আক্রমণ সম্পর্কে চিত্রাঙ্গদার ব্যাখ্যা এবং ইহাই রাবণের প্রতি পুত্রহীনা মাতার উষ্মার কারণ। **কে কহ···আপনি**—তীব্র ধিক্কারে চিত্রাঙ্গদা

রাবণকে বিদ্ধ করিয়া আক্ষেপের সুরে বলিতেছেন আত্মতুষ্ট রাবণ জানেন না তাঁহার স্বকৃত অপরাধেই আজ লঙ্কায় সর্বনাশ উপস্থিত। সীতা-হরণের পাপে আজ সমগ্র দেশে কালাগ্নি জ্বলিতেছে, ইহাতে দেশ-রাষ্ট্র-বংশ সবই ভস্মীভূত হইবে। আপনার পাপের ফলে কেবল রাবণ নিজেকেই নয়, সমগ্র রাক্ষসকুলকে বিনষ্ট করিতেছেন, যাহার অন্যতম ফল বীরবাহুর অকাল-মৃত্যু। [মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণের পতন ও পরাজয়ের বিলাপ আছে, কিন্তু তাঁহার আত্মানুশোচনা নাই, তাঁহার স্বকৃত অপরাধ বা পাপ সম্পর্কে তাঁহার কোনো দায়িত্ববোধ নাই। তাই তাঁহার বিমূঢ় আর্তনাদ, পুরুষকারের পরাজয়, ভাগ্যচক্রের বিপরীত আবর্তন, তাঁহাকে ট্রাজিক হিরোয় পরিণত করিয়াছে মাত্র। কিন্তু রাবণ চরিত্রের প্রতি মধুসূদনের যত শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিই থাক, সীতাহরণের জন্য রাবণের অপরাধের কথাও মধুসূদন উপেক্ষা করেন নাই। চিত্রাঙ্গদাব মুখ দিযাই তাহা বলাইয়াছেন। মনে হয়, রাবণ-চরিত্র সম্পর্কে মধুসূদন মনঃস্থির করিতে পারেন নাই। রাবণ আত্মসম্মানের জন্য সীতাকে হরণ করিয়াছেন, বংশ-মর্যাদা ও ভগ্নীব সম্মান রক্ষার্থে সীতাহরণ প্রয়োজন হইয়াছিল, রাবণের এইরূপ বিশ্বাস ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইহা যে নারীত্বের প্রতি অশ্রদ্ধা—নবযুগের কবির পক্ষে, বন্দিনী নারীর ব্যথার মুখপাত্রের কাছে ইহাও অস্বীকারের বিষয় হয় নাই।]

ব্যাখ্যা

দীন আমি……অমূল্য রতন ?—আলোচ্য অংশটি মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যান্তর্গত প্রথম সর্গের 'রাবণ ও চিত্রাঙ্গদা' অংশে রাবণের প্রতি চিত্রাঙ্গদার উক্তি। এখানে একমাত্র পুত্র বীরবাহুর যুদ্ধক্ষেত্রে রামচন্দ্রের হাতে অকাল তিরোধানে শোকাকুলা জননী চিত্রাঙ্গদার উদ্‌ভ্রান্ত মর্মবেদনা ও রাবণের প্রতি অনুযোগ প্রকাশ পাইয়াছে।

অপ্রধানা মহিষী চিত্রাঙ্গদার একমাত্র জীবনধন ছিল বীরবাহু। তাঁহার এই একমাত্র আশ্রয়টিকে তিনি অশেষ যত্নে পরম উৎকণ্ঠায় আঁকড়াইয়া ছিলেন। এই একটি মাত্র পুত্রকে নিরাপদে রাখিবার জন্য তিনি লঙ্কাপতি রাবণের নিকট তাহার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়াছিলেন। অর্থাৎ বীরবাহু যেন জননী চিত্রাঙ্গদারই একমাত্র সন্তান, পিতারূপে কোনো দাবী বা অধিকারই

রাবণের ছিল না। রাবণ রাক্ষসবংশের শিরোমণি বলিয়া চিত্রাঙ্গদা পুত্রের নিরাপত্তার জন্য রাবণকে তাঁহার পুত্রের রক্ষকমাত্র করিয়াছিলেন। দীন দরিদ্র ব্যক্তির নিকট অমূল্য রত্ন থাকিলে তাহার নিরাপত্তার জন্য সে শক্তিমান বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট গচ্ছিত রাখে। রাবণের প্রেমবঞ্চিত মহিষী চিত্রাঙ্গদাও দীনতারই প্রতিনিধি, সুতরাং একমাত্র পুত্র বীরবাহু তাঁহার নিকট দুর্মূল্য রত্ন ব্যতীত কিছুই নয়। ভীত পক্ষী যেমন শিকারী পশু-পাখীর হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য অসহায় শাবকগুলিকে বৃক্ষের নিরাপদ কোটরে গোপন রাখে তেমনি চিত্রাঙ্গদাও তাহার আপন নিরাপত্তার অভাব আশঙ্কা করিয়া বলশালী রাবণের নিকট তাহাকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব দান করেন। রণক্ষেত্রে বীরবাহুর মৃত্যু হইয়াছে, ইহা চিত্রাঙ্গদার বিশ্বাসযোগ্য নয়, কারণ রাবণের নিকট তিনি পুত্রকে রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়াছিলেন। দায়িত্বশীল রাজারূপে রাবণ তাহাকে সযত্নে রক্ষা কবিবেন। তাহাকে দেখিতে না পাইয়া তাই চিত্রাঙ্গদা ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় তাহার পুত্রের উদ্দেশ জানিতে চাহিয়াছেন। তাহার এখনও বিশ্বাস রাবণ চিত্রাঙ্গদার পুত্রকে অন্যত্র কোথাও রক্ষা করিয়াছেন। [বীরবাহুর মৃত্যু হইয়াছে ইহা জানা থাকায় চিত্রাঙ্গদার এই মিথ্যা বিশ্বাস আমাদের মনে বেদনার সঞ্চার করে।]

গ্রহদোষে…এ যাতনা আমি—আলোচ্য অংশটি মধুসূদনেব মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গ হইতে উদ্ধৃত রাবণ ও চিত্রাঙ্গদা নামক কাব্যখণ্ডে চিত্রাঙ্গদার নিকট রাবণের উক্তি।

চিত্রাঙ্গদা একমাত্র পুত্র বীরবাহুর অকাল-বিয়োগে রিক্তধন হইয়া রাবণকে কাঙালিনীর একমাত্র অমূল্য রত্ন হারাইবার জন্য ভর্ৎসনা করায় রাবণ আপন অদৃষ্টের দোহাই দিলেন। যুদ্ধে বীরবাহুর মৃত্যু ঘটিবে ইহা রাবণের পক্ষে অভাবিত ছিল। অথচ তাহাও সম্ভব হইয়াছে। রাবণ আজ ভাগ্যদোষে দোষী, নিয়তি-লাঞ্ছিত, দুর্ভাগ্যপীড়িত। অদৃষ্টাহত ব্যক্তিকে নিন্দা করিয়া কোনো লাভ নাই, কারণ তাহার কৃতকর্মের জন্য ব্যক্তিগতভাবে সে দায়ী থাকে না। অতএব চিত্রাঙ্গদা বৃথাই তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতেছেন। রাবণ স্বয়ং গ্রহদোষে অপরাধী হইয়া নিদারুণ যন্ত্রণা পাইতেছেন।

বীরপুত্র-ধাত্রী…জলশূন্য নদী—প্রসঙ্গসূত্র পূর্ববৎ।

বীরবাহুর অকালমৃত্যুতে শোককর্ষিতা জননী চিত্রাঙ্গদা রাবণকে তাঁহার একমাত্র পুত্রধন রক্ষণাবেক্ষণে বিশ্বাসভঙ্গ করার জন্য অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ভর্ৎসনা করিলে রাবণ নিরুপায়ের মত আপন অদৃষ্টের দোহাই দিলেন। কোন সৌরলোকের গ্রহাবর্তনের দুর্জ্ঞেয় নিয়মের সহিত রাবণের কর্মফল বাঁধা, রাবণ তাহা জানেন না। কিন্তু সেই অদৃষ্ট ভাগ্যের জন্য তাঁহার জীবনে কেবলই প্রত্যাশার বিপরীত ফললাভ ঘটিতেছে। কেবল বীরবাহুর মৃত্যু নয়, স্বর্ণলঙ্কা একদা অজেয় বীরপুত্রদেব জন্য খ্যাতনামা ছিল। এখন একে একে সকল বীরই রহস্যজনকভাবে নিহত হইতেছে। এই দুর্জ্ঞেয় দৈব বা অদৃষ্ট যেন একটি অনিবার্য নিদাঘের মত রাবণের উপর নামিয়া আসিয়াছে। গ্রীষ্মে যেমন বনস্থলী-কানন-উদ্যান ফুলশূন্য হইয়া ওঠে, নদী যেমন জলহীন পাণ্ডুর ও শুষ্ক হইয়া ওঠে, তেমনি ভাগ্যরূপ নিদাঘে লঙ্কা বীরশূন্য হইতেছে।

বরজে সজারু……অনুরোধে—প্রসঙ্গসূত্র পূর্ববৎ।

চিত্রাঙ্গদা কাঙালিনীর অমূল্যনিধির মত তাঁহার একমাত্র পুত্র বীরবাহুকে নিরাপত্তার জন্য রাবণেব নিকট সমর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাবণের দায়িত্ব-হীনতার ফলে সেই বীরবাহু মাতার বক্ষ বজ্রাহত করিয়া যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। এইরূপ অভিযোগের উত্তরে যন্ত্রণাক্লিষ্ট রাবণ আপনার দুর্ভাগ্যপীড়িত অদৃষ্ট-লাঞ্ছিত ললাটে করাঘাত করিলেন। বস্তুত, এই শোচনীয় বিপর্যয়ের জন্য রাবণ প্রত্যক্ষভাবে দায়ী নন। অপরাধ তাঁহাব নয়, অপরাধী তাঁহার ভাগ্য। দৈব বিমুখ বলিয়াই গ্রীষ্মের ফুলশূন্য কাননের মত, জলশূন্য নদীর মত লঙ্কা বীরশূন্য হইতেছে। সজারু সামান্য জীব হইলেও পানের ক্ষেতে প্রবেশ করিয়া যেমন সযত্নে সজ্জিত পানগুলিকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়, তেমনি সামান্য মানব রামচন্দ্র রাবণের সযত্নরক্ষিত পুরীতে প্রবেশ করিয়া লঙ্কার সৌন্দর্য তছনছ করিয়া দিতেছে। স্বয়ং জলধিপতি সমুদ্র ক্ষুদ্র রামের অনুরোধে আপনার অজেয়-উপাধি ঘুচাইয়াছেন, আজ তিনি তাঁহার মহাতরঙ্গের চরণে রামচন্দ্র নির্মিত বালুর সেতুরূপ শৃঙ্খল পরিয়াছেন। রাবণ প্রাসাদ-শীর্ষ হইতে ইহা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। ইহাই ভাগ্যবিড়ম্বনা।

হায় দেবি……কহিনু তোমারে—[রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]।

বামন হইয়া……চাঁদে—[রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]।

কাকোদর……গ্রহারকে—[রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]।

প্রশ্ন ১। রাবণ ও চিত্রাঙ্গদা কবিতা অবলম্বনে মধুসূদনের রাবণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

[ভূমিকা ও আলোচনা দ্রষ্টব্য]

প্রশ্ন ২। রাবণ ও চিত্রাঙ্গদা কবিতা অবলম্বনে রাবণ ও চিত্রাঙ্গদা চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা কর।

[ভূমিকা ও আলোচনা দ্রষ্টব্য এবং গ্রন্থ শেষে তুলনামূলক আলোচনা দ্রষ্টব্য]

প্রশ্ন ৩। চিত্রাঙ্গদা চরিত্র মূল রামায়ণে নাই। মধুসূদন চরিত্রটি কোথায় পাইলেন? এই চরিত্র উপস্থাপনার কারণ কী?

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গান্তর্গত রাবণ ও চিত্রাঙ্গদা অংশে মধুসূদনের চরিত্র-কল্পনায় বৈশিষ্ট্য আমাদের মুগ্ধ করে। রামায়ণের কাহিনীকে মধুসূদন কোথাও বিকৃত করেন নাই, কিন্তু রামায়ণের উপকরণমাত্র গ্রহণ করিয়া তিনি একটি নিজস্ব কাব্য পরিকল্পনার সৌধ নির্মাণ করিয়াছেন। প্রয়োজন মত নূতন চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, সামান্য সংকেতমাত্র অবলম্বন করিয়া কোথাও চরিত্র নির্মাণ করিয়াছেন কিন্তু কোথাও প্রাক্তন চরিত্রের মূল প্রতিপাদ্যের বিরোধিতা করেন নাই। রাম লক্ষ্মণ তাঁহার নিকট উপহাস্যাস্পদ এবং রাবণ শ্রদ্ধার্হ হইয়াছে, ইহাই যথার্থ নয়। রাবণের সমস্ত পরাজয়কে তিনি সহানুভূতি দিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু রাম লক্ষ্মণের প্রতি তাঁহার বিজাতীয় ঘৃণা প্রকাশ পাইয়াছে, যাঁহারা এইরূপ সমালোচনা করেন, তাঁহারা পণ্ডিত হইলেও দুইটি গ্রন্থ উত্তমরূপে পড়েন নাই: এক, রামায়ণ এবং দুই, মেঘনাদবধ কাব্য।

রামায়ণে এবং বিশেষ করিয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণে ভ্রাতা এবং পুত্রের মৃত্যু সংবাদে একাধিকবার শোকমূর্ছিত রাবণের চিত্র দেখিতে পাই। বীরবাহুর মৃত্যু-সংবাদ ভগ্নদূতের মুখে শুনিয়া রাবণের বিলাপের বর্ণনা আছে কৃত্তিবাসে, কিন্তু সেখানে চিত্রাঙ্গদার উল্লেখ নাই। বীরবাহুর উপাখ্যান তথা বীরবাহুর যুদ্ধ-যাত্রার পূর্বে কৃত্তিবাস চিত্রাঙ্গদার উল্লেখ করিয়াছেন। চিত্রাঙ্গদা চিত্রসেন গন্ধর্বের কন্যা, রাবণ তাহার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে হরণ করিয়া লঙ্কায় আনেন। তাঁহার পুত্র বীরবাহু বিষ্ণুর বরে ভূমিষ্ট হয় এবং তাঁহাদের জীবনের এই বিষ্ণুপ্রীতি ও ভক্তিপ্রাণতার উল্লেখ কৃত্তিবাসে একাধিকবার আছে। সুতরাং স্বভাবে ও

জন্মসূত্রে রাক্ষস না হইবার জন্য এবং বিষ্ণুর আশীর্বাদে, চিত্রাঙ্গদা-চরিত্রে রাবণের বিপরীত একটি মনোভাব আছে, এই সম্ভাবনাটিকে মধুসূদন আশ্চর্য সাফল্যে গ্রহণ করিয়াছেন। অথচ রাবণ ও চিত্রাঙ্গদা অংশে তিনি 'গন্ধর্ব-নন্দিনী' শব্দটি ব্যতীত চিত্রাঙ্গদার বিষ্ণুপরায়ণতারও উল্লেখ করেন নাই, পূর্বসূত্রও কিছু বলেন নাই। সুতরাং রামায়ণকে তিনি অবহেলা করিয়াছেন, এইরূপ অভিযোগ এখানে অবাস্তব ও ভিত্তিহীন। পরন্তু রামায়ণ মতে চিত্রাঙ্গদার সৌন্দর্যে রাবণ তাহাকে হরণ করিয়া আনেন, সুতরাং চিত্রাঙ্গদা অনবদ্য রূপসী ছিলেন। আলোচ্য অংশেও পুনঃপুন চিত্রাঙ্গদার সৌন্দর্যের উল্লেখ আছে। রাবণ তাহাকে 'সুন্দরি' 'ইন্দুনিভাননে' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। কবির ভাষায় চিত্রাঙ্গদা 'বিধুমুখী' 'চারুনেত্রা দেবী'। চিত্রাঙ্গদা যে রাবণকে অভিযোগ করিয়াছেন তাহার প্রধান কারণ, তাঁহার একমাত্র পুত্রের বিয়োগজনিত শোক, সেখানে কোনো সান্ত্বনা নাই। অথচ মধুসূদনের কাব্যে রাবণের সম্পর্কে কবির যে ধারণাই থাকুক না কেন সীতাহরণের জন্য রাবণেব কর্মফলকেও তিনি অবহেলা করিতে পারেন নাই। রাবণ এই বিষয়ে সচেতন নয়, তাই রাবণচরিত্র শেষ পযন্ত পরাজয়ের করুণ আর্তনাদেও নিষ্পাপ রহিয়া গিয়াছে, কিন্তু অপরের মুখে রাবণের নিয়তির কারণ ও কর্মফলেব কথা মধুসূদন উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাই চিত্রাঙ্গদা চরিত্রের উপস্থাপনার হেতু। রাবণ ও চিত্রাঙ্গদার কথোপকথনের মধ্য দিয়া ইহাই দেখিতে পাই। একদিকে রাবণের দুর্বোধ নিয়তির সক্ষোভ উল্লেখ, অন্যদিকে চিত্রাঙ্গদা কর্তৃক রাবণের পাপজনক কর্মফলের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত —ইহাই এই সর্গের বিশেষত্ব। রাবণের নিকট বীরবাহুর মৃত্যু দেশের জন্য সংগ্রামে মৃত্যু, রামকে তিনি দেশবৈরী মাত্র মনে করেন। আপনার অপরাধ সম্পর্কে তিনি আদৌ সচেতন নন, তিনি ন্যায়কর্ম বলিয়াই সীতাহরণ করিয়াছেন, ইহা রাজারূপে তাঁহার কর্তব্য ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া নারীকে বন্দিনী করা, নারীত্বের অসম্মান? বিধাতার বক্ষে এই তাপ জন্মিয়াছে, তাই শত বীর্যসত্বেও এই একটিমাত্র অপরাধে সোনার লঙ্কা ছারখার হইয়া যাইবে, চিত্রাঙ্গদার উক্তি যেন সেই আসন্ন দুর্ঘটনার অদৃশ্য সংকেত,

> হায় নাথ, নিজকর্মফলে
> মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি।

ইহাই চিত্রাঙ্গদা চরিত্রের উপস্থাপনার কারণ ও সার্থকতা।

চিত্রাঙ্গদা-চরিত্র সম্পর্কে মত উদ্ধৃতি

"রণক্ষেত্র দর্শন করিয়া, রাক্ষসরাজ পুনর্বার সভামণ্ডপে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। এমন সময় অতি গম্ভীর রোদনধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল এবং বীরবাহুর জননী রাজমহিষী চিত্রাঙ্গদা দেবী, সঙ্গিনীদিগকে সঙ্গে লইয়া আলু-থালু বেশে, সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। বীররসের ন্যায় করুণরসের উদ্দীপনেও মধুসূদন কিরূপ নিপুণ ছিলেন, এই অংশ তাহার পরিচায়ক। যে কারুণ্যপূর্ণ ভাষায় চিত্রাঙ্গদা দেবী রাক্ষসনাথের নিকট আপনার হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। হায়, বিধাতা চিত্রাঙ্গদাকে একটি মাত্র রত্নে অধিকারিণী করিয়াছিলেন। বিহগী যেমন সস্নেহে আপনার শাবটিকে তরুকোটরে রাখিয়া দেয়, কাঙালিনী চিত্রাঙ্গদাও তেমনি রাজার নিকট সে রত্ন গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। দরিদ্রধন রক্ষণ রাজধর্ম। রাজকুলেশ্বর লঙ্কানাথ কাঙালিনী চিত্রাঙ্গদার সে রত্ন কোথায় রাখিয়াছেন? পুত্রশোকাতুরা জননীর এরূপ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কি সম্ভব? রাক্ষসরাজের পক্ষে ইহার উত্তর দিবার সম্ভাবনা ছিল না। যে দুর্বিষহ যন্ত্রণায় তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল, তিনি কেবল তাহারই উল্লেখ করিয়া বলিলেন,

> এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা ললনে
> শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে
> দিবানিশি।……

চিত্রাঙ্গদা দেবী পুত্রশোকে উন্মাদিনী হইলেও, বীরমাতা বীরপত্নী, রাক্ষস-রাজ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলেন,

> দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব
> গেছে চলি স্বর্গপুরে।…

বীরমাতার পক্ষে এরূপ সান্ত্বনা অবশ্যই শান্তিজনক। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা দেবীর পক্ষে এ সান্ত্বনা তৃপ্তিপ্রদ হইল না। সুগন্ধি কুসুম যখন দেবোদ্দেশে হোমানলে অর্পিত হয়, তখন তাহার পুষ্পজন্ম সফল হইল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সেই কুসুম যখন আবার প্রচণ্ড দাবানলে ভস্মীভূত হয়, তখন তাহা কেবল ক্ষোভেরই কারণ হইয়া উঠে। সন্তানকে, স্বদেশের কল্যাণের জন্য, ধর্মযুদ্ধে নিহত হইতে দেখিলে বীরজননীর প্রাণে সান্ত্বনা আসিতে পারে সত্য। কিন্তু অপরের পাপ

তৃষ্ণারূপ অগ্নিতে হৃদয়ের ধনকে আহুতিরূপে অর্পিত দেখিলে বীরজননীর প্রাণে যে যন্ত্রণা হয়, তাহা কে বুঝিবে? যে অগ্নিকুণ্ডে চিত্রাঙ্গদার হৃদয়ের ধন সমর্পিত হইয়াছিল, তাহা হোমানল নয়, লঙ্কেশ্বরের অসংযত বাসনারূপ দাবানলেই তাহা ভস্মীভূত হইয়াছিল। জননীর প্রাণ শান্তি মানিবে কেন?

সুশীতল বারিধারা হৃদয়ে ধারণ করিয়াও কাদম্বিনী যেমন বজ্রাগ্নি নিক্ষেপ করে, পতিপরায়ণার হৃদয় স্বভাবত স্নেহপ্রবণ হইলেও অবস্থা বিশেষে সে তেমনি তাহা হইতে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা নির্গত হয়; চিত্রাঙ্গদা-চরিত্রে কবি ইহা সুন্দররূপে প্রমাণিত করিয়াছেন। এ চিত্র বাল্মীকি-রামায়ণে নাই, ইহা মধুসূদনের সৃষ্টি। কৃত্তিবাসকৃত রামায়ণে চিত্রাঙ্গদার কেবল নামমাত্রই আছে। মধুসূদন পরে বীরাঙ্গনা-কাব্যে দলিতা-ফণিনী-রূপিণী জনার যে তেজোময় চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, মেঘনাদবধের চিত্রাঙ্গদায় তাহারই রেখাপাত হইয়াছে। চিত্রাঙ্গদা-চরিত্রের প্রবর্তন না করিলে রাক্ষসরাজের অবস্থা পরিস্ফুট হইত না।

আত্মসংযমে অসমর্থ হইয়াই রাক্ষসরাজ পতিপ্রাণা সীতাদেবীকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। বিধাতা যদিও তাঁহাকে তাঁহার পাপের উপযুক্ত দণ্ড দিতেছিলেন, তথাপি তাঁহার চৈতন্য হয় নাই। পাপ গোপন করিবার প্রবৃত্তির ন্যায়, যে কোনো উপায়ে হউক, পাপাচারের সমর্থন করিবারও প্রবৃত্তি মনুষ্য হৃদয়ে স্বভাবত প্রবল। পাপের সমর্থন করিতে যাইয়া, মনুষ্য কত সময়ে যে জগতের সকলকে, এমন কি নিজের হৃদয়কেও, বঞ্চনা করে তাহার সংখ্যা নাই। রাক্ষসরাজ ঘোরতর পাপাচারী হইয়াও, বিধাতার নিকট বলিতেন,

> কি পাপ দেখিয়া মোর রে দারুণ বিধি
> হরিলি এ ধন তুই?

…কিন্তু তাঁহাকে তাঁহার এই ভ্রম বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন ছিল। রাক্ষসরাজ, পুত্রশোকবিধুরা চিত্রাঙ্গদা দেবীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলেন, দেবি, তোমার বীরপুত্র, দেশবৈরীদিগকে বিনাশ করিয়া স্বর্গ-গমন করিয়াছে; বীরমাতা হইয়া তোমার পক্ষে এরূপ ক্রন্দন কি কর্তব্য? কিন্তু বিধাতার বিধানে তাঁহাকে উপযুক্ত দণ্ড ভোগ করিতে হইল। যে ফণিনীর মণি তিনি অপহরণ করিয়াছিলেন, সে তাঁহাকে বিষদংশনে দংশন করিয়া বলিল, দেশবৈরী? রাক্ষসরাজ কাহাকে দেশবৈরী বলিতে চান? ক্ষুদ্র নর রামচন্দ্র কি লঙ্কার স্বর্ণ-সিংহাসনের

জন্ত যুদ্ধ করিতেছেন ? তবে দেশবৈরীর কথা কেন ? চিত্রাঙ্গদা দেবী রাক্ষসরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

কে কহ এ কাল অগ্নি জ্বলিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে ? হায় নাথ, নিজ কর্মফলে
মজালে রাক্ষসকুল, মজিলা আপনি।

পুত্রশোককাতর মনুষ্য অনেক সময় সমদুঃখভাগিনী পত্নীর সহিত একত্রে রোদন করিয়া সান্ত্বনা লাভ করে ; কিন্তু হতভাগ্য রাক্ষসরাজের পক্ষে সে আশা ছিল না। শতপুত্রশোকে জর্জরিত হইলেও পত্নীগণের নিকট তাঁহার সহানুভূতির আশা ছিল না। সহানুভূতির প্রার্থনা করিতে যাইলে তাঁহার ভাগ্যে কেবল তিরস্কারই মিলিত। আমরা সেইজন্য বলিয়াছি, চিত্রাঙ্গদা-চরিত্রের প্রবর্তন করিয়া, মধুসূদন যন্ত্রণাপীড়িত রাক্ষসরাজের অবস্থা সম্যক্ পরিস্ফুট করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

[যোগীন্দ্রনাথ বসু—মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত]

মেঘনাদ ও বিভীষণ : মধুসূদন

ভূমিকা

উৎস ও নামকরণ

মেঘনাদ ও বিভীষণ মেঘনাদবধ কাব্যের ষষ্ঠ সর্গের অন্তর্ভুক্ত এবং এই সর্গেই কাব্যের মূল ঘটনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। আলোচ্য সর্গে লক্ষ্মণের চণ্ডীপূজা ও মেঘনাদ হত্যার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। বিভীষণের সাহায্যে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে গোপনে প্রবেশ করিয়া লক্ষ্মণ যজ্ঞরত নিরস্ত্র মেঘনাদকে আক্রমণ করিলেন। প্রথমে লক্ষ্মণকে ইন্দ্রজিৎ তাঁহার ইষ্টদেবতা মনে করিয়াছিলেন। কারণ তাঁহার দুর্ভেদ্য পুরীমধ্যে যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণ প্রবেশ করিতে পারিবেন, ইহা কল্পনারও অতীত ছিল। অচিরে ভ্রান্তি নিরসন হইল, ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া আক্রমণোদ্যত শিষ্টাচারবিহীন শত্রুর শিরোদেশে নিরস্ত্র ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞের কোষা নিক্ষেপ করিলেন, লক্ষ্মণ অচৈতন্য হইয়া ভূতলে পড়িলেন। তখন লক্ষ্মণের অস্ত্রগুলি ব্যবহারের জন্য ইন্দ্রজিৎ চেষ্টা করিলেন, মায়া প্রভাবে সেই অস্ত্রগুলি নড়াইতে

পর্যন্ত পারিলেন না। সহসা দুয়ারে বিভীষণকে দেখিতে পাইয়া সমস্ত রহস্য তাঁহার নিকট পরিষ্কার হইল। ইহার পর ইন্দ্রজিৎ ও মেঘনাদের কথোপ-কথন আলোচ্য কবিতার বিষয়বস্তু। ইহাই সংকলিত অংশের নামকরণের হেতু।

ষষ্ঠ সর্গের শ্রেষ্ঠত্ব

ষষ্ঠ সর্গ মেঘনাদবধ কাব্যের শ্রেষ্ঠ সর্গ, এই সর্গেই মধুসূদন তাঁহার মানস-পুত্র অমর সিংহশিশুকে নিহত করিয়াছেন এবং নিজেই কবি স্বীকার করিয়াছেন it cost me many a tear to kill him. রামায়ণের কাহিনী অনুযায়ী মেঘনাদেব নিধনই তাঁহার বর্ণনীয় বিষয়, কিন্তু দৈবছলনায় মায়ার ষড়যন্ত্রে ভাগ্য-প্রাতিকূল্যে এই মৃত্যু কত করুণ কত অনুকম্পায়ী কত নিষ্ঠুর হইয়া উঠিয়াছে মধুসূদন তাহাই দেখাইয়াছেন। কাহারও চরিত্র সম্পর্কে বিদ্বিষ্ট মনোভাব মাত্র নয়, কিন্তু সমস্ত ঘটনার পশ্চাতে দৈবের এমন একটি নির্মম পরিহাস ও অদৃষ্টের এক গভীর বৈপরীত্য আছে যাহা কবিকে ক্ষুব্ধ কবিয়াছে। একটি অপরাজেয় মানুষকে হত্যা করিবার জন্য দেবতাদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত, কর্মিৎকর্মা মায়া-দেবীর উদ্যোগ, আকাশে ময়ূব সর্পের যুদ্ধ দেখাইয়া রামচন্দ্রকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কাহীন করা, অদৃশ্যভাবে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগাবে প্রবেশ করা এবং নিরস্ত্র অসহায় ইন্দ্রজিৎকে হত্যা করা—আয়োজনের ত্রুটি ঘটে নাই।

করুণরস

বীরত্বের এই অপঘাত-মৃত্যুর বেদনাই মেঘনাদবধ কাব্যের করুণ রস এবং এই রস বীররসকে বিদ্রূপ করে না। যে শক্তি আপনাকে পদে পদে প্রতিহত দেখিয়াও পরাজয় স্বীকার করে না, নিয়তির হাস্যকর পরাক্রম যাহাকে পরাজিত করিয়া নিজেকেই লজ্জিত করে, সেই শক্তিরই নাম মেঘনাদ এবং তাঁহার মৃত্যু যতই আকস্মিক ও অযুদ্ধ-সম্ভব হোক, মানবিকতার দিক দিয়া ইহাই রামায়ণের সর্বাপেক্ষা করুণ ও নিষ্ঠুর ঘটনা।

বিষয়বস্তুর পূর্বসূত্র

ষষ্ঠ সর্গান্তর্গত মেঘনাদ ও বিভীষণের ঘটনাগত পূর্বসূত্রটি এইরূপ—গহনবনে একাকী চণ্ডীপূজা সমাপন করিয়া দৈবাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া লক্ষ্মণ রঘুপতির নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে ইন্দ্রজিৎ হত্যার জন্য যাত্রা করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু সেই কৃতান্তদূতের সহিত

যুদ্ধে পাঠাইবার জন্য রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে অনুমতি করিতে ইতস্তত করিতে-ছিলেন। বীরদর্পে লক্ষ্মণ বলিলেন,—

দৈববলে বলী যে জন, কাহারে
ডরে সে ত্রিভুবনে ?

দেবকুল তাঁহাদের অভয় সহায়, বিভীষণ সমর্থন করিয়া বলিলেন, রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি রাবণের পাপপুরী ত্যাগোন্মুখা, পরদিবস লক্ষ্মণের হাতে মেঘনাদ নিহত হইবে। তথাপি শঙ্কিত রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সম্ভাব্য অমঙ্গলের দুশ্চিন্তায় সীতাউদ্ধার পরিত্যাগ করিয়া সুমিত্রার নয়নের মণি তাঁহাকে অক্ষত অবস্থায় ফিরাইয়া দিবেন কিনা, এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রের এই দ্বিধাগ্রস্ততা দেখিয়া দেবতাগণ প্রমাদ গণিলেন, আকাশ-সম্ভবা সরস্বতী আকাশবাণীতে রামচন্দ্রকে প্রবোধ দিলেন। শূন্যমার্গে রামচন্দ্র ময়ূর ও সর্পের সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করিলেন। এই ঘোররণে পরিণামে অজগরের আক্রমণে ময়ূর নিহত হইয়া ভূতলে পড়িল। বিভীষণ ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, ইহা আশু ঘটনারই সংকেত আসন্ন ; যুদ্ধে বলবত্তর হওয়া সত্ত্বেও লক্ষ্মণের হস্তে মেঘনাদই নিহত হইবেন। তখন দেবগণের পুষ্পাশীর্বাদ শিরে লইয়া লক্ষ্মণ ও বিভীষণ নির্গত হইলেন, রামচন্দ্র প্রাণাধিক ভ্রাতা কিশোর লক্ষ্মণের নিরাপত্তার জন্য সতী পার্বতীর নিকট প্রার্থনা করিলেন। রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মীর নিকট মায়া আসিয়া কমলার তেজ সম্বরণ করিতে অনুরোধ করিলেন। রক্ষঃশ্রেষ্ঠ রাবণ ও রানী মন্দোদরীর পূজার্ঘ্য লাভ করিলেও বিষণ্ণচিত্তে ইন্দিরা বলিলেন, রাবণের স্বেচ্ছাকৃত অপরাধেই আজ তাহার সর্বনাশ আসন্ন, সুতরাং 'প্রাক্তনের গতি কার সাধ্য রোধে' ? তিনি মায়াদেবীর অনুরোধে তেজ সম্বরণ করিলেন, লক্ষ্মণকে ইন্দ্রজিত হত্যার বরদান করিলেন ; অদৃশ্যভাবে লক্ষ্মণ ও বিভীষণ দ্রুতবেগে নগরে প্রবেশ করিলেন। মায়ার প্রভাবে তাঁহারা পুরীদ্বার উন্মুক্ত করিলেন, কাহারও কর্ণে শব্দ প্রবেশ করিল না, যেন পুষ্পরাশিতে কৌশলে সর্প প্রবেশ করিল ! লঙ্কার ঐশ্বর্য সৈন্যসম্পদ হেমহর্ম্য অনির্বর্ণ স্যন্দন দেখিয়া লক্ষ্মণ বিস্মিত হইয়া গেলেন। নিদ্রোত্থিত পুরীর পুরুষ ও নারী আপন কর্মে অংশগ্রহণ করিতেছে, ইহারা সকলেই লক্ষ্মণের চক্ষে মাধুরী বর্ষণ করিল। মেঘনাদ তখন নিভৃত মন্দিরে কৌষিকবস্ত্রে কৌষিক-উত্তরী ধারণ করিয়া ইষ্টদেবতার উপাসনা করিতে-

ছিলেন। ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্র যেরূপ গোষ্ঠগৃহে প্রবেশ করে সেইরূপ দুইজনে অদৃশ্যে যজ্ঞগৃহে প্রবেশ করিলেন। সহসা সম্মুখে সশস্ত্র বীর-সুদর্শন লক্ষ্মণকে দেখিয়া ইন্দ্রজিৎ সবিস্ময়ে ভাবিলেন, তাঁহার দেবতা বিভাবসু সম্মুখে আবির্ভূত—কিন্তু দেবতার একী লীলা যে লক্ষ্মণের বেশে অবতীর্ণ হইয়াছেন? রৌদ্রকণ্ঠে লক্ষ্মণ আত্মপরিচয় দিয়া তাঁহার ভ্রান্তি নিরসন করিলেন এবং আপনার উদ্দেশ্য জানাইলেন। বিস্ময়ের বেশ তখনও তরুণ বীরের দৃষ্টি হইতে ঘোচে নাই, কারণ এইরূপ দুর্ভেদ্যমন্দিরে লক্ষ্মণের প্রবেশ অবিশ্বাস্য! তাই তিনি পুনর্বার ইহা আবির্ভূত ইষ্টদেবতার কৌতুক মনে করিয়া তাঁহার নিকট বিশ্বাসে বরপ্রার্থনা করিলেন। তারপর যখন চৈতন্য হইল, তখন কৃতান্তরূপী লক্ষ্মণ কালানল-তেজে কোষমুক্ত কৃপাণ লইয়া আক্রমণোদ্যত। কিন্তু বীরচূড়ামণি মেঘনাদ তখনও তাঁহাকে সংগ্রামের শৌরপ্রণালী অবলম্বনে সবিনয়ে আতিথ্য গ্রহণ করিতে বলিলেন, আপনাকে অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত করিতে সুযোগ দিতে বলিলেন। জলদ-প্রতিম স্বরে লক্ষ্মণ তাঁহাকে এইটুকু শুধু জানাইলেন, পাপীর নিকট ক্ষাত্রধর্ম পালনের দায়িত্ব তাঁহার নাই, তাই 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'। ক্ষাত্রবীরের এই নির্লজ্জ অবীর্যসুলভ রণপ্রথায় হতবাক্ মেঘনাদ চক্ষের নিমিষে যজ্ঞের কোষা নিক্ষেপ করিয়া লক্ষ্মণের ললাটে আঘাত করিলেন এবং লক্ষ্মণ মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। রাবণি লক্ষ্মণের অস্ত্র আকর্ষণ করিলেন' মায়াপ্রভাবে তাহা তাঁহার হস্তগত হইল না। নিষ্ফল আক্রোশে অস্ত্রসংগ্রহের জন্য দ্বারে ছুটিতে গেলেন, দেখিলেন দ্বারে ভীমসম বিভীষণ প্রহরী—হতাশ বিষণ্ণ-কণ্ঠে তিনি বলিলেন, এতক্ষণে পুরীমধ্যে তস্করের মত লক্ষ্মণের প্রবেশের সূত্র তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন।

ভাবার্থ

সহসা দ্বারদেশে খুল্লতাত বিভীষণকে দেখিয়া ইন্দ্রজিৎ দুষ্প্রবেশ্য রক্ষঃপুরে লক্ষ্মণের আগমনের রহস্যভেদ করিলেন। বিভীষণের স্বজাতিদ্রোহিতায় বিষণ্ণকণ্ঠে ইন্দ্রজিৎ তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, নিকষা সতী যাঁহার জননী, শূলাস্ত্রধারী মহাদেবসদৃশ রক্ষঃশ্রেষ্ঠ রাবণ যাঁহার ভ্রাতা, ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ যাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র, তাঁহার এ কী কলঙ্ককৃত্য! আপনার অন্তঃপুরে ভ্রাতুষ্পুত্র-হত্যার জন্য শত্রু লক্ষ্মণকে ডাকিয়া আনা কেন

বস্তুবিশ্লেষণ

তস্করকে আপনার গৃহসন্ধান দেওয়া, চণ্ডালকে রাজাসনে অভিষেক করানো। গুরুজন খুল্লতাতের প্রতি তথাপি সম্মান রক্ষা করিয়া মেঘনাদ তাঁহাকে দ্বারমুক্ত করিতে বলিলেন—কারণ অস্ত্রাগার হইতে অস্ত্র আনিয়া তিনি রামানুজকে এখনি যোগ্য শাস্তি দিবেন [ছত্র ১-১০], লঙ্কার কলঙ্ক প্রত্যক্ষ সংগ্রামেই দূর করিবেন। উত্তরে রাঘবদাসরূপে আত্মপরিচয় দান করিয়া, বিভীষণ যখন রামচন্দ্রের স্বার্থবিরোধী কাজ করিতে অসম্মতি জানাইলেন, তখন হতাশ লজ্জায় মরমে মরিয়া ইন্দ্রজিৎ বলিলেন, ইহা শুনিয়া তাঁহার মৃত্যু হওয়া উচিত ছিল, বিভীষণের মুখে রামদাসত্বের উল্লেখ? মহাদেবের ললাটস্থিত চন্দ্র কি ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়? আপনার মহান বংশ এবং অধম রামের পরিচয় বিস্মৃত হওয়া যেন স্বচ্ছ সরোবর পরিত্যাগপূর্বক রাজহংসের পঙ্কিল সলিলে বিহার করার মত অসম্ভব ব্যাপার! অরণ্যসম্রাট সিংহ শৃগালের সহিত মিত্রতা স্থাপন করে না, কিন্তু বিভীষণের নিকট নিশ্চয়ই তাহা অজানা নাই [ছত্র ১১-৩০]। নিরস্ত্র ব্যক্তিকে সংগ্রামে আহ্বান করার হীনতাই লক্ষ্মণের ক্ষুদ্রমতিত্বের নিশ্চিত প্রমাণ। বীরপুত্রধাত্রী লঙ্কার শিশুপুত্রের নিকটও তাহা হাস্যকর। বীর বিভীষণের নিকট যুদ্ধের মহারথি-প্রথা অবশ্যই অজ্ঞাত নয়, ইন্দ্রজিৎ এই বলিয়া খুল্লতাতকে গৃহদ্বার ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। দেব-দৈত্য-নরের সহিত মেঘনাদের অজেয় পরাক্রম বিভীষণের অবিদিত নাই, অচিরেই তিনি পুনরায় তাহার প্রমাণ পাইবেন, দেখিবেন দৈববলে বলীয়ান্ লক্ষ্মণ কোন্ শক্তির সাহায্যে ইন্দ্রজিৎ রাবণিকে পরাস্ত করিতে পারেন! দুর্বল মানবকে ইন্দ্রজিৎ ভয় করেন না। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করার হঠকারিতার শাস্তি দিতে বিভীষণ অনুমতি করুন, ইহাই তাঁহার প্রার্থনা। আক্ষেপের সুরে মেঘনাদ বলিলেন, বিভীষণের জন্মপুরে বনবাসী পদার্পণ করিয়াছে, নন্দনকাননে দুরাচার দৈত্য প্রবেশ করিয়াছে—প্রফুল্লকমলে যেন কীট অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, ইহা অসহ্য অপমান। এই অপমান রক্ষোবংশের উজ্জ্বল-মণি হইয়া বিভীষণই বা কেমন করিয়া সহ্য করিতেছেন? এই ভর্ৎসনায় মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত নম্রশিরে লজ্জিত বিভীষণ ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, [ছত্র ৩১-৫০] নিজ কর্মদোষে রক্ষোরাজ রাবণ স্বয়ং নিমজ্জিত, কনকলঙ্কাও তৎসহ অধোগামী পাপপূর্ণ; সুতরাং সেই প্রলয় সর্বনাশ হইতে উদ্ধারের জন্য বিভীষণ রামচন্দ্রের চরণাশ্রয় করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার অপরাধ নাই। রোষে

মেঘমন্দ্র স্বরে তখন বীরশ্রেষ্ঠ রাবণাত্মজ প্রশ্ন করিলেন, ধর্মানুগ বিভীষণ পৃথিবীর কোন্ ধর্মশাস্ত্র অনুসারে জ্ঞাতিত্ব জাতিত্ব ভ্রাতৃত্ব বিসর্জন দিতেছেন? গুণধাম পরজন অপেক্ষা নির্গুণ স্বজনই বরণীয়, ইহাই তো শাস্ত্রের শিক্ষা। কিন্তু হতাশ ধিক্কারে মেঘনাদ বলিলেন, বিভীষণ গঞ্জনার অতীত, কারণ নীচের সহবাসে তাঁহার নীচতা সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহা ধর্ম নয়, ক্ষুদ্র নরের সাহচর্যে তিনি বর্বরতাই শিক্ষা করিয়াছেন [ছত্র ৫১-৭২]।

আলোচনা

মেঘনাদ ও বিভীষণ মধুসূদনের কাব্যের একটি বিশিষ্ট অংশ তাহাতে সন্দেহ নাই। মেঘনাদের আসন্ন মৃত্যুর করুণ পটভূমিকায় স্বজনদ্রোহী বিভীষণের সহিত দেশপ্রেমিক স্বজাতিনিষ্ঠ মানবধর্মী মেঘনাদের এই আলোচনা তাঁহার মহান চরিত্রকে প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। যজ্ঞাগারের নিভৃত কক্ষে বিভীষণের সহায়তায় লক্ষ্মণের গোপন অনুপ্রবেশ এবং অসহায় নিরস্ত্র মেঘনাদের উপর তাঁহার অপ্রস্তুত আক্রমণ, ইহাই মেঘনাদবধ কাব্যের মূল ঘটনা। অন্যান্য সর্গগুলি এই ঘটনারই পল্লবিত বিস্তার মাত্র। আলোচ্য কাব্যাংশে লক্ষ্মণকে যজ্ঞপাত্রের আঘাতে অচৈতন্য করিয়া মেঘনাদ অস্ত্রাগারের অভিমুখে যাইবার কালে খুল্লতাত বিভীষণের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। আপন বীর-বংশের সম্মাননীয় ব্যক্তির দ্বারা এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতা তাঁহার তরুণ বীর্য ব্যথিত করিয়াছে, নৈরাশ্যে আত্মগ্লানিতে তিনি হতবাক্ হইয়াছেন। তাঁহার কণ্ঠে ভৎর্সনা-গঞ্জনা তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। অথচ মূল রামায়ণে এই অংশে বিভীষণের কাপুরুষ মন্তব্য এত হীনভাবে চিত্রিত হয় নাই। বাল্মীকির রামায়ণে আছে,

সমগ্র কাব্যের মূল ঘটনা

"ইন্দ্রজিৎ নিকটস্থ হয়ে বিভীষণকে দেখে কঠোর বাক্যে বললেন, তুমি এইখানেই জন্মগ্রহণ করে বৃদ্ধ হয়েছ, তুমি আমার পিতার ভ্রাতা, পিতৃব্য হয়ে কি ক'রে আমার শত্রুতা করছ? দুর্বুদ্ধি, তুমি স্বজন ত্যাগ ক'রে পরের দাস হয়ে সাধুজনদের নিন্দাভাজন হয়েছ। যে স্বপক্ষ ত্যাগ ক'রে পরপক্ষে যায়, স্বপক্ষ ক্ষীণ হলে পরপক্ষই তাকে বিনষ্ট করে।

বাল্মীকির রামায়ণে প্রাসঙ্গিক অংশ

বিভীষণ উত্তর করলেন, রাক্ষসরাজপুত্র, তুমি কি আপন স্বভাব জান না? যদিও আমি ক্রূরকর্মা রাক্ষসদের কুলে জন্মেছি, তথাপি মানুষের যা শ্রেষ্ঠ গুণ এবং রাক্ষসে যা দুর্লভ সেই সত্ত্বগুণই আমার স্বভাবগত। যে ব্যক্তি ধর্মপথ থেকে ভ্রষ্ট এবং পাপবুদ্ধি, তাকে হস্তস্থিত আশীবিষের ন্যায় ত্যাগ করাই শ্রেয়। পরস্বাপহারী ও পরস্ত্রীধর্ষক ব্যক্তি প্রজ্বলিত গৃহের ন্যায় ত্যাজ্য। মহর্ষিগণের হত্যা, দেবগণের সহিত বিরোধ, গর্ব, রোষ, শত্রুতা এবং হিতৈষীর প্রতিকূলতা—এইসকল দোষ আমার ভ্রাতার জীবন ও ঐশ্বর্য নষ্ট করছে। এই কারণেই তোমার পিতাকে আমি ত্যাগ করেছি, তুমি অতি গর্বিত, অল্পবয়স্ক ও দুর্বিনীত, কালপাশ তোমাকে বদ্ধ করেছে, তুমি যা ইচ্ছা হয় বল। আজ তুমি লক্ষ্মণের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না।"

[রাজশেখর বসু—বাল্মীকি রামায়ণ, সারানুবাদ]

বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের বিভীষণের সঙ্গে তুলনা

স্পষ্টত দেখা যাইতেছে, মূল রামায়ণে বিভীষণকে কবি ধর্মপথগামী ও সত্যনিষ্ঠরূপেই অঙ্কিত করিয়াছেন এবং তাঁহার মুখ দিয়া রাবণ ও মেঘনাদকে গাঢ় কালিমায় অবলিপ্ত করিয়াছেন। মধুসূদনের কাব্যে মূলগতভাবে ইহারই প্রতিবাদ করা হইয়াছে। রাবণ সীতাহরণ করিয়াছেন বটে এবং তাঁহার যাহা কিছু অপরাধ ঐ সীতাহরণের জন্যই, কিন্তু তদতিরিক্ত কিছু নয়। কৃত্তিবাসের রামায়ণেও বিভীষণ চরিত্র বাল্মীকিরই মত, সেখানেও বিভীষণ ইন্দ্রজিৎকে এবং রাবণকে অসংখ্য অনুচ্চার্য পাপের নায়ক বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। মধুসূদনের কাব্যে বিভীষণ বলিয়াছেন যে,

নিজ কর্মদোষে, হায়, মজাইলা
এ কনকলঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি!
বিরত সতত পাপে দেবকুল, এবে
পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী, প্রলয়ে যেমতি
বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কাল সলিলে!

মধুসূদনের বিভীষণ সমর্থনলাভের অযোগ্য

কিন্তু সমগ্র কাব্যে ইহার স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ বা তথ্য নাই বলিয়া ইহা বিশ্বাসযোগ্য হইয়া উঠে নাই, বরং 'মহামন্ত্রবলে নম্রশির ফণীর' মত বিভীষণের মলিনবদন লজ্জিত মুখখানিই সত্য হইয়া উঠে। সে লজ্জা শেষ পর্যন্ত আমাদের সহানুভূতিকে উজাড় করিয়া লইতে পারে না। মেঘনাদের মহৎ স্বদেশপ্রীতি, বংশ-

গৌরব, কুলগর্বের পাশে ইহা দ্যুতিহীন পাণ্ডুর মনে হয়। যাহার জন্মপুরীতে বনবাসী পদার্পণ করিয়াছে তাহার মূঢ়তা ক্ষমাহীন, মেঘনাদের এই দৃপ্ত বিশ্বাসই পাঠকচিত্তে সংক্রামিত হইয়া যায়। মধুসূদনের কাব্যরসসন্ধানী দৃষ্টিই বিভীষণ চরিত্রটিকে মর্মমূল পর্যন্ত দেখিয়া লইয়াছে, ধর্মের দিক দিয়া তিনি বিভীষণকে দেখেন নাই।

ধর্ম নয়, সাহিত্যের দৃষ্টিতে চরিত্রবিচার

মেঘনাদবধ কাব্যে মধুসূদন রামায়ণের চরিত্রাদর্শ পরিবর্তিত করিয়া সমকালীন সমালোচকদের নিকট নিন্দিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কেবল চরিত্রের আদর্শ-পরিবর্তন ব্যতীত এই কাব্যের অভিনবত্ব সে যুগের পাঠক সম্যক অনুধাবন করিতে পারেন নাই। রাম বা লক্ষ্মণ আমাদের নিকট দেবতুল্য, কবি তাঁহাদের হীনভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, হিন্দুধর্মত্যাগী মধুসূদন সম্পর্কে এই সমালোচনা কটূক্তির স্তরে উপনীত হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমান যুগ এই ধর্মীয় দৃষ্টিতে কাব্যবিচার করে নাই। মেঘনাদবধ কাব্যে মধুসূদন পৌরাণিক ধর্মসংস্কারের কোনো পরিচয় রাখেন নাই, সাহিত্যিক ও মানবিক ভঙ্গিতেই তিনি এই কাব্য রচনা করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে রাক্ষসগণের সহিত রঘুপতির যুদ্ধ একটি নূতন তাৎপর্য লাভ করিয়াছে। তাহা দেবশক্তির দ্বারা পদে পদে অনুগৃহীত মানুষের সহিত শক্তিমান কিন্তু দুর্ভাগ্যপীড়িত মানুষের সংগ্রাম। রাক্ষসবংশের ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্য ছিল, বীর্য ও পৌরুষ ছিল, ছিল না কেবল অদৃষ্টের প্রসন্নতা। ইহাই তাহাদের সকল পরাজয়ের মূলে। কবি ধ্বংসের গিরিখাতের সর্বপ্রান্তে উপস্থাপিত করিয়াও তাই রাক্ষসবংশের—বিশেষত তাঁহার অমর সৃষ্টি রাবণ-মেঘনাদের গুণগরিমার উল্লেখ না করিয়া পারেন নাই। বিভীষণের সহিত সংলাপে মেঘনাদের দেশাত্মবোধ, স্বজাতিপ্রীতি, আক্রমণকারী বিদেশীদের প্রতি তীব্র আপোষহীন ঘৃণা যেরূপ দ্বিধাহীন ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহার তুলনা হয় না। মধুসূদনের কাব্যে দেশাত্মবোধ অন্যত্র খুব উচ্চকণ্ঠে প্রচারিত নয়। কিন্তু রাবণ-মেঘনাদের স্বাজাত্যবোধ ও মাতৃভূমি-রক্ষাকল্পে তাঁহাদের অনমনীয় দৃঢ়তা ও সংকল্প যে কবির স্বদেশপ্রীতিরই প্রতিফলন, ইহা সম্ভবত তৎকালীন পাঠকের নিকট অজ্ঞাত ছিল না। মধুসূদনের পূর্ববর্তী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছিলেন,

কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।

এই একই কথা ভাষান্তরে ও অন্য প্রসঙ্গে মধুসূদন পুনরাবৃত্তি করিলেন মাত্র,

শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা।

উত্তরকালে এই উক্তিটি বাঙালী পাঠকের নিত্য-উচ্চার্য হইয়াছে। মেঘনাদবধ কাব্য অনুসরণে রচিত হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহারেও দেশরক্ষার জন্য দেবতাগণের সংগ্রামের ভাবটি প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। ইহা এই ষষ্ঠ সর্গেরই প্রভাব।

রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ

[ছত্র ১-১০] **এতক্ষণে ··রক্ষঃপুরে**—ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে একমনে ইষ্টদেবতার বৈধ উপাসনায় নিযুক্ত ছিলেন, সহসা সম্মুখে অস্ত্রশস্ত্রধারী বীরদর্পী লক্ষ্মণকে দেখিয়া হতবাক্ হইয়া যান এবং লক্ষ্মণকে তিনি তাঁহার আরাধ্য দেবতা বিভাবসু বলিয়াই স্থিরপ্রত্যয় হইয়াছিলেন। শত্রু লক্ষ্মণরূপে দেবতার আবির্ভাব তাঁহার নিকট দেবতার কৌতুকলীলা বলিয়া নিশ্চিত বিশ্বাস হইয়াছিল; কিন্তু লক্ষ্মণ আত্মপরিচয় দেওয়াতে তাঁহার ভ্রান্তি অপনোদিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ যুযুধান লক্ষ্মণকে যজ্ঞকোষা নিক্ষেপে অচৈতন্য করিয়া তিনি স্বীয় পথে ছুটিলেন অস্ত্রসংগ্রহের জন্য। দেখিলেন দ্বারভাগে বাধা দিতেছেন স্বয়ং খুল্লতাত বিভীষণ। লক্ষ্মণের আত্মপরিচয় পাইবার পর দুষ্প্রবেশ্য দুর্ভেদ্য নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণ কী কৌশলে প্রবেশ করিলেন, ইহা মেঘনাদের নিকট চিন্তা ও রহস্য ছিল, যদিও তখন গবেষণার সময় ছিল না, অস্ত্রসংগ্রহই আশু কর্তব্য। সহসা বিভীষণকে দেখিয়া হীনভাবে লক্ষ্মণের পুরীপ্রবেশ-রহস্য পরিষ্কার হইল। তিনি বুঝিলেন, লক্ষ্মণ আপন বীর্যোদ্যমে এই কার্য সাধিত করেন নাই, গৃহশত্রু বিভীষণের সহায়তায় তস্করের মত তিনি প্রবেশ করিয়াছেন। ইহাই তাঁহাকে বিষণ্ণ করিয়া তুলিল। **হায় তাত······তস্করে ?**—গৃহশত্রু বিভীষণের এই স্বজনদ্রোহিতায় বিষাদগ্রস্ত কণ্ঠে মেঘনাদ বলিলেন, ইহা কি খুল্লতাতের উপযুক্ত হইয়াছে? নিকষা সতী যাঁহার জননী, রাক্ষসকুলতিলক রাবণ এবং শূলাস্ত্রধারী মহাদেবসদৃশ কুম্ভকর্ণ যাঁহার ভ্রাতা, স্বয়ং ইন্দ্রকে পরাস্ত করিয়াছেন এইরূপ মেঘনাদ যাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র, সেই বিভীষণ আজ আপনার মহান বংশগৌরব ও শত্রুজয়ের ঐতিহ্য বিস্মৃত

হইয়া শত্রুর সহিত মৈত্রী করিয়াছেন? আজ তিনিই তস্করকে আপনার গৃহের দুর্লভ রত্ন অপহরণ করিবার পথসন্ধান বলিয়া দিতেছেন? দৈত্য-কুলগর্ব ইন্দ্রজিৎকে গোপনে হত্যা করিবার জন্যই লক্ষ্মণ যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিয়াছেন, সুতরাং ইহা তস্করকে আপন গৃহের সম্পদ-হরণের পথ বলিয়া দেওয়ারই নামান্তর মাত্র। মেঘনাদবধ কাব্যে মধুসূদন সর্বদাই রাবণ-মেঘনাদের এক মহান্ কীর্তি-মুদ্রিত বংশগৌরব প্রকাশ করিয়াছেন—বীরত্বে মনুষ্যত্বে অপরাজেয়ত্বে অতুলনীয় এক বংশগৌরব। সেই অপরিম্লান বংশ ও ঐতিহ্যচেতনার দ্বারাই ইন্দ্রজিৎ খুল্লতাতকে লজ্জিত ও ধিক্কৃত করিতে চাহিয়াছেন। **শূলিশম্ভুনিভ**—শূলাস্ত্রধারী মহাদেবের সহিত তুলনীয় যিনি। **বাসববিজয়ী**—ইন্দ্রকে যিনি পরাস্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ। **চণ্ডালে ·· আলয়ে**—ক্ষুদ্র নর রামচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতা লক্ষ্মণ সম্পর্কে 'তস্কর' 'চণ্ডাল' প্রভৃতি শব্দ মেঘনাদের আত্মমর্যাদা ও বংশগৌরবেরই পরিচায়ক। গুহক চণ্ডালের সহিত মিত্রতার ইঙ্গিত এখানে দুর্লক্ষ্য নয়। লক্ষ্মণ চোরের মত পুরীতে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা চণ্ডালের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছেন, এইরূপ ব্যক্তিদের সহিত পরমশ্লাঘনীয় ঐতিহ্যসমৃদ্ধ রাক্ষস বংশের কোনো সম্পর্ক হইতেই পারে না। বলার ভঙ্গির মধ্যে শ্লেষবিদ্রূপের পরিচয় সুস্পষ্ট। **কিন্তু নাহি··· ·পিতৃতুল্য**—বিভীষণের চরম স্বজনদ্রোহিতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা মেঘনাদের নিকট বেদনাদায়ক এবং অমার্জনীয়, ইহা তাঁহার বক্তব্যের তিক্ত বিদ্রূপেই জানা যায়। তথাপি মধুসূদনের তরুণ-নায়ক স্বভাবে আদর্শ চরিত্র, তিনি পিতৃতুল্য খুল্লতাতের সহিত বাক্য-ব্যবহারে ধৈর্যহারা হন না, যথোচিত সম্মান রক্ষা করেন। এই ব্যবহারিক সৌজন্য রক্ষার জন্যই মেঘনাদ তাঁহাকে গঞ্জনা করেন নাই। **গঞ্জি**—গঞ্জনা করি। [ছত্র ১১-৩০] **রামানুজে**—অর্থাৎ লক্ষ্মণকে। **শমন-ভবনে**—মৃত্যুপুরীতে। **লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে**—অর্থাৎ লঙ্কার কলঙ্ক আজ সংগ্রামে ঘুচাইব; কিন্তু বাক্যটির অর্থ সুস্পষ্ট নয়। লঙ্কার কলঙ্ক কাহাকে বুঝানো হইতেছে? তস্কররূপী লক্ষ্মণকে? অথবা রাম লক্ষ্মণের লঙ্কা-আক্রমণই কি লঙ্কার কলঙ্ক? যথার্থ লঙ্কার কলঙ্ক হওয়া উচিত বিভীষণ অথচ তাঁহার সহিত সংগ্রামের কথা তো বলা হয় নাই। শত্রুসৈন্য কর্তৃক লঙ্কা-অবরোধই লঙ্কার কলঙ্ক, এইরূপ ইঙ্গিত গ্রহণ করা যাইতে পারে।

কামনা—প্রার্থনা, ইচ্ছা। **রাঘবদাস আমি**—বিভীষণ স্বীকার করিলেন যে, তিনি রামচন্দ্রের অনুগত। সাহচর্যমাত্র নয়, দাস শব্দের দ্বারা বিভীষণ রামচন্দ্রের পদাশ্রিত ও কৃপাপ্রার্থী এইরূপ ইঙ্গিত করিলেন। **রাবণি**—রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ। **তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে**—রাঘবদাস বলিয়া আপনার পরিচয় দেওয়াতে বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের ভর্ৎসনার ভাষা পর্যন্ত নাই, লজ্জায় তিনি আপনার মৃত্যুকামনা করিতেছেন। একটি মাত্র বাক্যে মেঘনাদের মুমূর্ষু লজ্জার এই নিপুণ প্রকাশ মধুসূদনের পক্ষেই সম্ভব। বংশ-মর্যাদা আত্মঅহংকার ব্যক্তিত্ব একদিকে, অন্যদিকে দাসত্ব স্বজনবিদ্বেষ ও শত্রুতা—এই দুয়ের অসীম বৈপরীত্য একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে ফুটিয়াছে। 'ইচ্ছি' শব্দটিকে নামধাতুরূপে প্রয়োগ করিয়া মধুসূদন সমকালে ও পরে অনেকের দ্বারা নিন্দিত হইয়াছেন, কিন্তু এই শব্দটি যে এখানে অপরিহার্য, তাহা যে কোনো পাঠকই বুঝিতে পারেন। (পরবর্তীকালে এই বাক্যটি প্রায় প্রবাদে পরিণত হইয়াছে)। **স্থাপিলা বিধুরে····· ধুলায়** ?—মহাদেবের ললাটস্থিত চন্দ্রের সহিত তুলনীয় রাক্ষসবংশের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হইয়াছে বিভীষণ কর্তৃক রামচন্দ্রের দাসত্ব-গ্রহণে, ইহাই মেঘনাদের বক্তব্য। চন্দ্রের বিধিনির্দিষ্ট স্থান মহাদেবের ললাটে, সুতরাং মহাদেব যাঁহাকে ললাটে স্থাপন করিয়া পূজা করেন, সেই চন্দ্র কি কখনও ধুলায় মলিন হয় ? কিন্তু রাক্ষসবংশের মর্যাদা মাটিতে লুটাইয়াছে বিভীষণ রাম-চন্দ্রের দাস হইয়াছেন বলিয়া। 'যান গড়াগড়ি' শব্দটি এখানে সুপ্রযুক্ত ও শ্রুতি-সুভগ হয় নাই বলিয়াই অনেকের বিশ্বাস। **স্বচ্ছ সরোবরে······শৈবাল দলের ধাম** ?—বিভীষণের রাঘবানুগামিতার কর্মফলস্বরূপ ঐ একই তিরস্কার। রাজ-হংসের বিচরণক্ষেত্র পঙ্কজ-শোভিত স্বচ্ছ সরোবরে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া রাজহংস কদমাক্ত শৈবালসমাচ্ছন্ন পঙ্কিল পল্বলে যায় না। কিন্তু রাক্ষসবংশ পরিত্যাগ করিয়া বিভীষণ নরবংশের সহিত মিশিয়াছেন। রাজহংস-শোভিত কমল-প্রস্ফুটিত স্বচ্ছ সরোবর রাক্ষসবংশের পবিত্রতার সহিত উপমিত হইয়াছে। **মৃগেন্দ্রকেশরী···মিত্রভাবে** ?—পশুরাজ সিংহ সিংহের সহিতই মিত্রতা স্থাপন করে, ক্ষুদ্র শৃগালের সহিত নয়। **হে বীর কেশরি**—বিভীষণ নিতান্ত ক্ষুদ্র ব্যক্তি নন, তিনিও রাক্ষসবংশের বীরশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাঁহাকে 'বীর কেশরি' সম্বোধন করিয়া মেঘনাদ তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। তিনি বীর্যে-বীরত্বে সিংহের সহিতই তুলনীয়, কিন্তু অধুনা শৃগালরূপী রামচন্দ্রের সহিত

সথ্যস্থাপন করিয়াছেন। মেঘনাদের ভাষায় মধুসূদন যে বলিষ্ঠ ধিক্কার সংযোজনা করিয়াছেন, নিদর্শনা, প্রতিবস্তূপমা, দৃষ্টান্ত প্রভৃতি অলংকার-প্রয়োগেই তাহা সার্থক হইয়াছে। **সম্ভাষে**—সম্ভাষণ করে। **অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি**—আবার মেঘনাদের সেই বিনয় ও পিতৃব্যের প্রতি স্বভাব-সম্ভ্রম। বংশমর্যাদাহানির অভিমানেই তিনি এত কথা বলিলেন। কিন্তু তথাপি তিনি স্বীকার করিতেছেন তাহার অজ্ঞতার তুলনায় তাঁহার পিতৃব্য অনেক বিচক্ষণ। **অবিদিত চরণে**—আপনার নিকট কিছুই অজানা নাই। বিভীষণের পাণ্ডিত্য ধর্মানুরক্তি সত্যনিষ্ঠা রামায়ণে প্রসিদ্ধ। সুতরাং এইরূপ মন্তব্য এখানে মেঘনাদের পক্ষে উপযুক্ত হইয়াছে। [ছত্র ৩১-৫০] **ক্ষুদ্রমতি নর··· সম্বোধে সংগ্রামে?**—বীরকেশরী বিভীষণের পক্ষে ইহা নিশ্চয় অজানা নাই যে, রণস্থলে বীরব্যক্তি কখনও নিরস্ত্র ব্যক্তিকে যুদ্ধে আহ্বান করে না। যোদ্ধা লক্ষ্মণ যে কত হীনবৃত্তি সাধারণ মানুষ তাহার একমাত্র প্রমাণ তিনি অস্ত্রহীন মেঘনাদকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছেন। **কহ মহারথি·· একথা**—মহারথী বিভীষণ স্বয়ং যুদ্ধনিপুণ, যুদ্ধের কতকগুলি নিজস্ব সবজনীন নিয়ম আছে, অস্ত্রহীন ব্যক্তিকে আক্রমণ না করা তাহার অন্যতম। কিন্তু সে নিয়ম লঙ্ঘন করা বীরত্বের নয়, কাপুরুষতার লক্ষণ। লঙ্কার শিশুপুত্রগণও এই নিয়মের সহিত পরিচিত, তাহারাও ইহা শুনিয়া হাসিবে যে, বীর লক্ষ্মণ নিরস্ত্র মেঘনাদকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছেন। বীরপুত্রধাত্রী লঙ্কার শিশুপুত্রগণও যে মানবিক যুদ্ধনিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিতে জানে, প্রথিতযশা বীর লক্ষ্মণ তাহাকে লঙ্ঘন করিয়াছে, ইহা যেমন ব্যঙ্গাত্মক, তেমনি বেদনাদায়ক। অথচ ইহাই মেঘনাদের ট্র্যাজেডি। **দেখিব··· কুমতি**—দেবানুগ্রহ রাম লক্ষ্মণ দৈব সাহায্যে অনেক আনুকূল্য লাভ করিয়াছে, এমন কি যজ্ঞাগার পর্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু অস্ত্রসহ সম্মুখ সংগ্রামে মেঘনাদের আত্মবিশ্বাস, কোনো শক্তিই তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিবে না। সম্মুখ যুদ্ধে দেববল অপেক্ষা বাহুবলেরই প্রয়োজন, ইহাই ইন্দ্রজিৎ মনে করেন। ভবিষ্যৎ ধারণাহীন মেঘনাদের পক্ষে এইরূপ উক্তি এক প্রকার tragic irony মাত্র। **দেব-দৈত্য······নরাধমে**—যুদ্ধে অপরাজেয় মেঘনাদের পরাক্রম কি দেবতা-দৈত্য, কি মানব সকলের সহিত সংগ্রামেই প্রকাশ পাইয়াছে, ইহা বিভীষণের অজ্ঞাত নাই। সেই পূর্ব বিবরণ স্মরণ করাইয়া মেঘনাদ

বলিতেছেন যে, অস্ত্রহীন ব্যক্তির সহিত যুদ্ধোদ্যত দুর্বল লক্ষ্মণকে ভয় করিবার পাত্র মেঘনাদ নন। যাহার এমন স্পর্ধা হঠকারিতাপূর্বক দুর্গম নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে প্রবেশ করে, বিনয়ী ভ্রাতুষ্পুত্র পিতৃব্যের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন, সেই নরাধমকে এই দণ্ডেই মৃত্যু নামক চরম শাস্তি প্রদান করিবেন। **তব জন্মপুরে···সহিছ কেমনে?**—কেবল নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে প্রবেশের ব্যাপার নয়, লঙ্কার আত্মসম্মান ও মর্যাদাপন্ন ব্যক্তির পক্ষে ইহা অসহনীয় যে, পবিত্র জন্মভূমিতে বনবাসী ব্যক্তি পদার্পণ করিয়াছে। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ অরণ্যবাস করিতেছিলেন, এই অর্থে তাঁহারা বনবাসী। কিন্তু বনবাসী শব্দের দ্বারা লঙ্কাধিবাসীর তুলনায় আরণ্যক আদিম নীতিহীন মানুষের প্রতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করা হইতেছে। নন্দন-কাননতুল্য লঙ্কাপুরীতে যেন দুরাচার দৈত্যগণ প্রবেশ করিয়াছে। প্রস্ফুটিত পদ্মে যেন কীট প্রবেশ করিয়াছে। এইরূপ দৃষ্টান্তের দ্বারা মেঘনাদ তাঁহার তীব্র ঘৃণা ও অপমানবোধ প্রকাশ করিলেন। ইহা যে-কোনও লঙ্কাবাসীর পক্ষেই গ্লানিকর, বিশেষত বীরশ্রেষ্ঠ বলিয়া খ্যাত বিভীষণের ভ্রাতুষ্পুত্রের পক্ষে তো এই অপমান স্বাভাবিক। আর আশ্চর্য, রক্ষোভূষণ বিভীষণ এখনও তাহা সহ্য করিতেছেন? অর্থাৎ যথার্থ লঙ্কাবাসীর চিত্তে যে বুদ্ধিগ্রাহ্য নাগরিকচেতনা, জাতীয়তাবোধ, কর্তব্যধর্ম ও দেশপ্রেম থাকা অনিবার্য, বিভীষণের সেই বোধগুলি এখনও অসাড় হয় নাই। এইরূপ ধারণা করিয়াই বিভীষণকে মেঘনাদ এই সকল কথা বলিলেন। জন্মভূমিকে নন্দনকানন, প্রফুল্লকমল ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করার পশ্চাতে মধুসূদনের স্বদেশপ্রীতিরই পরিচয় পাওয়া যায়। **মহামন্ত্র···রথী**—বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের প্রতিটি মন্তব্যই যুক্তিপূর্ণ, শ্লেষাত্মক, স্বজন-পরিত্যাগকারী বিভীষণ একটি কথারও প্রতিবাদ করিতে পারেন না। তাই লজ্জায় তিনি অধোবদন হইয়া রহিলেন। মন্ত্রের দ্বারা ভুজঙ্গ যেইরূপ অবনতশির হইয়া যায়, মেঘনাদের বিদ্রূপ-বিস্ময়-উত্তেজনায় তিনিও সেইরূপ মস্তক অবনত করিলেন। মেঘনাদের উক্তি তাঁহাকে বশীভূত করিল, ইহা কবির বক্তব্য নয়, বিভীষণ যে লজ্জিত হইয়া মাথা নত করিলেন মাত্র, তাহাই তিনি বলিতে চাহিতেছেন। রামচন্দ্রের অনুগামিতায় বিভীষণের একটি মহৎ আদর্শ ছিল, কিন্তু তাহা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে নাই, ইহা বিভীষণও জানেন। তাই তাঁহার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ, আত্মপক্ষ-সমর্থন দুর্বল, তাঁহার লজ্জা ও ম্লানমুখই মধুসূদনের কাছে সত্য হইয়া দেখা

দিয়াছে। সেইজন্য মেঘনাদের ভৎর্সনা ও ধিক্কারের পাশে বিভীষণের যুক্তি পাঠকদের নিকট বিভীষণকে সমর্থনযোগ্য করিয়া তুলিতে পারে নাই। [ছত্র ৫১-৭২] **রাবণ-অনুজ লক্ষি রাবণ-আত্মজে**—অর্থাৎ রাবণের ভ্রাতা বিভীষণ রাবণপুত্র মেঘনাদকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন। নামের বদলে বিশেষণাত্মক শব্দ ব্যবহার করা মধুসূদনের স্বভাব। এখানে একটি সূক্ষ্ম গূঢ়ার্থও লক্ষণীয়। রাবণ-অনুজ ও রাবণ-আত্মজ দুই শব্দই প্রমাণ করিতেছে উভয়ে একই বংশ-সম্ভূত একই ব্যক্তির ভ্রাতা ও পুত্র, কিন্তু স্বভাবে আচরণে কী আশ্চর্য বৈপরীত্য—ইহাই কবির ইঙ্গিত। **নিজ কর্মদোষে···আপনি**—বিভীষণ মেঘনাদের ভৎর্সনার উত্তরে নম্রশির্ষে লজ্জিতকণ্ঠে বলিলেন তিনি এই গঞ্জনার যোগ্য নন। তাঁহার কোনো অপরাধ নাই, অর্থাৎ তিনি বিশ্বাসঘাতক বা স্বজনদ্রোহী নন। তাঁহার বিশ্বাস, লঙ্কাধিপতি আপন পাপের দ্বারা সমগ্রপুরী এবং নিজেকে সর্বনাশের পথে লইয়া যাইতেছেন। একটি ব্যক্তির কর্মদোষে স্বর্ণলঙ্কা নিমজ্জিত। অপরাধ যদি কাহারও হয়, তবে সে ব্যক্তি রাবণ। **বিরত সতত পাপে দেবকুল**—বিভীষণ ধর্মভীরু, তিনি পাপবিমুখ। দেবতাদের মধ্যে কোনো পাপ নাই, ইহাই তাঁহার পক্ষে বরণীয়। **এবে পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী**—বিভীষণের মতে, তাঁহার লঙ্কার প্রতি আনুগত্যত্যাগ ও রামের দাসত্ব স্বীকার করার একমাত্র কারণ লঙ্কা অধুনা পাপের পঙ্কে নিমজ্জিত হইতেছে। [মেঘনাদবধ কাব্যে লঙ্কার পাপের কোনো ইঙ্গিত বা সম্ভাবনা মধুসূদন দেন নাই, সুতরাং বিভীষণের এই মন্তব্য তাঁহার চরিত্র ও আচরণকে পাঠকদের নিকট সমর্থনযোগ্য ও বিশ্বাস্য করিয়া তোলে নাই। রাবণ নিজকর্মদোষে কনক-লঙ্কা মজাইয়াছেন, এইরূপ অভিযোগ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। সীতা-হরণই যে তাঁহার চরমতম পাপ এবং সেই একটি মাত্র পাপেই সমগ্র লঙ্কার সর্বনাশ হইবে, চিত্রাঙ্গদার অভিযোগে প্রথম সর্গে ইহা বলা হইয়াছে। সীতাহরণের অপরাধকে মধুসূদন স্বয়ং অবহেলা করেন নাই। কিন্তু বিভীষণের 'এবে পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী' এইরূপ উক্তির সমর্থন মেলে না।] **প্রলয়ে যেমতি···কালসলিলে**—এক আসন্ন প্রলয়ে লঙ্কা ধীরে ধীরে মহাকালের গর্ভে বিলীন হইবে, তাহার পাপের সীমা নাই। **রাবণের······মজিতে?**—পাপাতিরেক হেতু লঙ্কার আসন্ন সর্বনাশের কথা স্মরণ করিয়া বিভীষণ রামচন্দ্রের চরণ আশ্রয় করিয়া এই মহাপ্রলয় হইতে

উদ্ধারলাভের আশা রাখেন। বিভীষণ অপরের অপরাধে স্বয়ং কেন নিমজ্জিত ও গ্রস্ত হইবেন? বিভীষণের উক্তিতে রামচন্দ্র দেবতার অবতার। তাঁহার চরণ আশ্রয় করিলে প্রলয় ও সর্বনাশ হইতে উদ্ধারলাভ সম্ভব। সমগ্র লঙ্কার ভাগ্যের সহিত আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিবার এই আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতা ধর্মের নামে সত্যের নামে হইলেও, শেষ পর্যন্ত বিভীষণ পাঠকদের নিকট শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠেন নাই। **বাসবত্রাস**—ইন্দ্রের পক্ষে ভীতিস্বরূপ অর্থাৎ মেঘনাদ। **গম্ভীরে……বলী**—লঙ্কার পাপের জন্য রাঘবাশ্রয়ে উদ্ধারার্থী বিভীষণের আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তি শুনিয়া বীরশ্রেষ্ঠ মেঘনাদ ক্রুদ্ধ হইলেন। এতক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার সংলাপে পিতৃব্যের প্রতি যে সশ্রদ্ধ বিনয় রক্ষিত হইয়াছিল, তাহাও বিনষ্ট হইল। খুল্লতাতের প্রতি তিনি প্রায় গর্জন করিয়া উঠিলেন। অন্ধকার রাত্রিতে মেঘগর্জনের মত সে কণ্ঠ গম্ভীর শুনাইল। তু আঁধার অম্বরে প্রচণ্ড ডম্বরু বাজিল গম্ভীর গরজনে—রবীন্দ্রনাথ। **ধর্মপথগামী …জলাঞ্জলি?**—গম্ভীর গর্জনে মেঘনাদ প্রশ্ন করিতেছেন, ধর্মানুগামিতার জন্য বিভীষণ জগদ্বিখ্যাত, কিন্তু কোন্ ধর্মশাস্ত্র মতে জ্ঞাতিত্ব ভ্রাতৃত্ব জাতিত্ব পরিত্যাগের নির্দেশ আছে? যে ধিক্কার ও অবিশ্বাসে মেঘনাদ বিভীষণের এই ধর্মভ্রষ্টতার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন তাহা মধুসূদনের ধর্মচেতনার মানবিকতারই উদাহরণ। নবযুগের ও নবজাগৃতির কুলপুরোহিত কবির কাছে মানবধর্মই সত্য ধর্ম, মনুষ্যত্বই একমাত্র আচার, মানবিকবোধই একমাত্র ন্যায়, মনুষ্যত্বের মূল্যেই শাস্ত্রের বিচার। সুতরাং জ্ঞাতিত্ব জাতিত্ব ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধই সত্য সম্বন্ধ, এইগুলি পরিত্যাগ করাই অধর্ম। **শাস্ত্রে বলে…পরঃ পরঃ সদা**—মেঘনাদ যে শাস্ত্র জানেন সে শাস্ত্রমতে, 'গুণবান্ বা পরজনঃ স্বজনো নির্গুণঃ স্বজনঃ শ্রেয়ান্ যঃ পরঃ পর এব সঃ'। ইহা বাল্মীকি রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে কথিত হইয়াছে। সুতরাং আর্য রামায়ণকেই মধুসূদন ইন্দ্রজিতের মুখে শাস্ত্রবাক্য বলিয়া চালাইয়াছেন। বস্তুত মেঘনাদবধ কাব্য তো রামায়ণের অনুবাদ নয়, ইহা আধুনিক যুগের বুদ্ধিজীবী কবির দ্বারা নূতন ভাবে নির্মিত। সুতরাং সাম্প্রতিক কালের বুদ্ধিবাদ ও যুক্তির আলোকে আধুনিক নায়ক মনুষ্যত্বের ও মানবধর্মের স্বপক্ষে যুক্তি ও সমর্থন খুঁজিয়া পাইয়াছে রামায়ণ কাব্যে; সুতরাং রামায়ণ তাঁহার নিকট শাস্ত্র ব্যতীত আর কী? **এ শিক্ষা… শিখিলে**—শাস্ত্রে বলে স্বজন গুণহীন হইলেও গুণবান পরজন অপেক্ষা তাহাই

শ্রেয়। সুতরাং ইহা বিস্মৃত হইয়া রাক্ষস বংশের পাপের দোহাই দিয়া তাহাদের পরিত্যাগ করিয়া রামচন্দ্রের অনুগামী হইবার এই শিক্ষা বিভীষণ কোথা হইতে শিক্ষা করিলেন, ইহাই মেঘনাদের তীক্ষ্ণ প্রশ্ন। **কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা**—ইন্দ্রজিতের কণ্ঠ এখন বদলাইয়া গিয়াছে। দ্বারদেশে বিভীষণকে দেখিয়া তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা। এতক্ষণ পিতৃব্যের প্রতি কথোপকথনে তিনি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম রক্ষা করিয়াছিলেন, এখন তাঁহার সকল সম্মানবোধ বিলুপ্ত হইয়াছে। তিনি পিতৃব্যকে গঞ্জনা করিবারও অযোগ্য মনে করেন। **হেন সহবাসে ··শিখিবে?**—মেঘনাদ পিতৃব্যকে গঞ্জনা করিতে চান নাই, তাহার নৈরাশ্যব্যঞ্জক শেষ মন্তব্য, অসৎসঙ্গই চরিত্রভ্রষ্টতার হেতু। বিভীষণের যে ব্যবহার তাহার কাছে সভ্যজগতের নিয়ম-বহির্ভূত বর্বরতাতুল্য, ইহার একমাত্র কারণ বর্বর রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের সহিত খুল্লতাতের সংযোগ ও অবস্থান। **গতি···দুর্মতি**—খুল্লতাতের বর্বর ব্যবহারের এই বিশেষ প্রবণতাটি সমর্থিত হইতেছে একটি সামান্য বাক্যের দ্বারা, যে ব্যক্তি নীচ ও অধোগামী তাহার সহিত একত্র-বাসকারী ব্যক্তিও দুর্মতি ও দুষ্ট প্রকৃতির।

ব্যাখ্যা

স্থাপিলা বিধুরে · ধূলায়?—মধুসূদন রচিত মেঘনাদবধ কাব্যের ষষ্ঠ সর্গান্তর্গত মেঘনাদ ও বিভীষণের কথোপকথন অংশ হইতে আলোচ্য পংক্তি উদ্ধৃত। লক্ষ্মণ-হত্যার জন্য অস্ত্র-সংগ্রহোদ্যত মেঘনাদকে 'রাঘবের অনুগামী দাস' এইরূপ বলিয়া দ্বার ছাড়িয়া দিতে অস্বীকার করায়, খুল্লতাতের আদর্শ-ভ্রষ্টতায় ইহা ব্যথিত বিস্মিত মেঘনাদের উক্তি।

বিভীষণ রামচন্দ্রের পক্ষে যোগ দিয়াছেন, সুতরাং লক্ষ্মণ হত্যায় মেঘনাদকে বাধা দেওয়াই তাঁহার কর্তব্য। রামচন্দ্রের দাস এই বাক্য বিভীষণের মুখে শোনা মেঘনাদের পক্ষে অবিশ্বাস্য ছিল। বিভীষণের মত রাক্ষসকুলতিলক বীর এইরূপ মন্তব্য কিরূপে করিলেন তাহা ভাবিয়া তিনি হতবাক্ হইয়া গেলেন। বিধাতা চন্দ্রের স্থান নির্ধারণ করিয়াছেন হরশিরে। চন্দ্র তাই শিবললাটেই শোভা পায়। কিন্তু চন্দ্র কি কখনও দেবাদিদেবের ললাটভ্রষ্ট হইয়া ভূলুণ্ঠিত মলিন হয়? দেবমস্তকে যাহার স্থান, ধূলিতে লুণ্ঠিত হওয়া তাহার যেরূপ

অমর্যাদার বিষয়, রাক্ষসবংশের শিরোভূষণরূপে যাহার মর্যাদা, রামচন্দ্রের দাসত্ব করাও তাঁহার পক্ষে সেইরূপ চরম গ্লানিকর ও অবমাননাজনক, ইহাই মেঘনাদের বক্তব্য। যে বিভীষণ বিধিনির্দিষ্ট হইয়া পবিত্র বংশের শ্রেষ্ঠাসনে আসীন ছিলেন, বিধাতার ইচ্ছাশক্তিকে অমান্য যেন করিয়াই তিনি স্বেচ্ছায় নিজেকে চরম হীনতায় কলঙ্কিত করিতেছেন।

স্বচ্ছ সরোবরে……মিত্রভাবে ?—প্রসঙ্গসূত্র পূর্ববৎ।

ঐশ্বর্যশোভমানা অতুলবৈভবসম্পন্না স্বর্ণালঙ্কার শ্লাঘনীয় রাক্ষসবংশ পরিত্যাগ করিয়া খুল্লতাত বিভীষণ রাঘবদাস হইয়াছেন, লক্ষ্মণকে রক্ষার জন্য দ্বাররক্ষী হইয়া অস্ত্রসংগ্রহোদ্যত মেঘনাদকে বাধা দিতেছেন, ইহা মেঘনাদের পক্ষে চরম হতাশা ও বিপন্ন বিস্ময়ের কারণ হইয়াছে। বিধাতা-নির্ধারিত শিবললাট পরিত্যাগ করিয়া যেন চন্দ্র অপমানের ধূলায় স্বেচ্ছায় মলিন হইতেছে। তীব্র ব্যথাত ভর্ৎসনায় মেঘনাদ বিভীষণকে আপনার উজ্জ্বল আত্মপরিচয়ে উদ্বোধিত করিতে চাহিলেন। রাজহংসের বিচরণস্থল স্বচ্ছতোয়া সরসী, যেখানে প্রস্ফুটিত শতদল তাহাদের মিত্র। ইহা ত্যাগ করিয়া রাজহংস কথনই শৈবালাদিসমাচ্ছন্ন পঙ্কিল জলাশয়ে গমন করে না। সামান্য জীবেরও এই আত্মমর্যাদাবোধ ও সৌন্দর্যজ্ঞান আছে। বনের সম্রাট সিংহ বীরবিক্রমে আপনার উপযুক্ত শক্তিসম্পন্ন জীবের সহিতই মিত্রতা স্থাপন করে, কপট হীন প্রাণী শৃগালের সহিত তাহার মিত্রতা দেখা যায় না। কিন্তু জীবসমাজে যে আত্মমর্যাদা জ্ঞান আছে, বিভীষণ বীরষভ ও রক্ষঃশ্রেষ্ঠ হইয়া তাহাও ভুলিয়া গেছেন। হীনবৃত্তি মানুষের সহিত তাঁহার মিত্রতার কথা চিন্তা করিয়াই ইন্দ্রজিৎ অবিশ্বাসে বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছেন।

কুক্রমতি নর……একথা—[রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]।

তব জন্মপুরে……কীট বাস ?—[রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]।

রাঘবের পদাশ্রয়ে……মজিতে ?—[রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]।

শাস্ত্রে বলে…… পরঃ সদা—[রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]।

হেন সহবাসে……সে দুর্মতি—[রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]।

প্রশ্ন ১। মেঘনাদ ও বিভীষণ কবিতা অবলম্বনে বিভীষণ চরিত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। [ভূমিকা ও আলোচনা দ্রষ্টব্য]

প্রশ্ন ২। মেঘনাদ ও বিভীষণ কবিতা অবলম্বনে এই দুই চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা কর।

বাসববিজয়ী মেঘনাদ মধুসূদনের অমর কাব্য মেঘনাদবধ কাব্যের শ্রেষ্ঠ

চরিত্র। রাবণের মধ্যে যে আগ্নেগিরির ভূকম্পন, মেঘনাদ তাহারই সূচীমুখ-শিখর। মধুসূদন তাঁহার এই মানসপুত্তলীকে সম্পূর্ণ মনোমত করিয়া গড়িয়াছিলেন, বীর্যে নির্ভীকতায় মনুষ্যত্বের সকল শুভ্রগুণে তাঁহার চরিত্র বিভূষিত করিয়াছিলেন। পারিবারিক সম্পর্ক রক্ষায় তাঁহার যে পরিমাণ সতর্কতা, স্বদেশের সম্ভ্রমরক্ষায়ও তাঁহার সেইরূপ দায়িত্ববোধ। আত্মমর্যাদা তাঁহাকে সচেতন করিয়াছে, অহংকারী করে নাই। হতাশকণ্ঠে নিয়তির দুর্নিবোধ বজ্রমুষ্টির প্রতি তিনি কাতরোক্তি করেন নাই। ছিন্নশাখ দ্রুমের মত ক্রন্দনোদ্বেল রাবণের হাত হইতে তিনি সৈনাপত্যভার গ্রহণ করিয়াছেন, কুসুমদাম ছিন্ন করিয়া সংগ্রামের রুক্ষ ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াছেন অবিচলিত চিত্তে। কিন্তু আবার দারুণ যুদ্ধের পূর্বমুহূর্তেও প্রিয়তমা প্রমীলার প্রেমস্নিগ্ধ করপল্লব স্পর্শ করিতে ভোলেন নাই। বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সহিত বীরত্ব ও জিগীষা তাঁহার চরিত্রের প্রধান ধর্ম। ইন্দ্রজিৎ পিতামাতার আদর্শ পুত্র, পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তিতে শ্লাঘনীয়। তাঁহার হৃদয়ে স্বদেশে যে রক্তরাগ প্রতিমা মুদ্রিত তাহা কোনো উত্তেজনার সৃষ্টি নয়। আবার এই সকল পারিবারিক গুণগ্রামের সহিত ইষ্টদেব বিভাবসুর উপাসনায় তাহার আত্মমগ্ন একাগ্রতা আমাদের বিস্মিত করে।

ষষ্ঠ সর্গেই মেঘনাদ চরিত্রকে সম্পূর্ণ করিয়া পাওয়া যায় এবং ষষ্ঠ সর্গে মেঘনাদের মৃত্যুতেই মেঘনাদবধ কাব্যের মূল ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। যজ্ঞাগারে ইষ্টদেবতার নিভৃত পূতচিত্ত সাধনায় যে জীবন আপনার অনির্বাণ দেদীপ্যমানতার ইন্ধন সংগ্রহে উদ্যত ছিল, তাহা দৈবক্রমে নির্বাপিত হইয়া গিয়াছে বলিয়াই এই মৃত্যু এত অসহায় রকমের করুণ ও বিষণ্ণ। দুর্ভেদ্য পুরীমধ্যে সাধন মন্দিরে লক্ষ্মণের আগমনে তিনি সর্বপ্রথম চমকিত হইয়াছেন, কিন্তু কিংকর্তব্যবিমূঢ় না হইয়া তৎক্ষণাৎ কোষানিক্ষেপে শত্রুকে মূর্ছিত করিয়া অস্ত্র-সংগ্রহে ছুটিয়াছেন। কারণ নিরস্ত্র শত্রুকে হত্যা করার অমানবিক প্রবৃত্তি তাঁহার মনুষ্য শরীরে ছিল না। তখনও মনের মধ্যে ছিল বিস্ময়—লক্ষ্মণের পুরী-প্রবেশ কেমন করিয়া সম্ভব হইল। সহসা দ্বারপ্রান্তে খুল্লতাত বিভীষণকে দেখিয়া তাঁহার সংশয় ভঞ্জন হইয়াছে। পরমাত্মীয়ের বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি লজ্জিত হইয়াছেন, তীব্রতম অসহনীয় ভৎর্সনায় খুল্লতাতকে বিদ্ধ করিয়াছেন, যেন মনুষ্য-সভ্যতার ইতিহাসে এতবড় হীনতা আর কখনও তিনি প্রত্যক্ষ করেন নাই। অথচ বয়োজ্যেষ্ঠ পিতৃব্যের প্রতি

তাঁহার মৌখিক সৌজন্য সামান্যও কপট হয় নাই। মেঘনাদ ও বিভীষণ অংশের পাঠকমাত্রই তাহা স্বীকার করিবেন।

বংশ-গৌরব আত্মশ্লাঘা স্বদেশ-বাৎসল্য মেঘনাদের চরিত্রের মহৎ স্বভাব। বিভীষণের ধর্মভ্রষ্ট কলঙ্কে তিনি বিস্মিত ও ব্যথিত হইয়াছেন কারণ ইহা তাঁহার পক্ষে অকল্পনীয় ছিল। আপনার বংশমর্যাদা তাঁহার নিকট শ্রেষ্ঠত্বের আনুপাতিক উপকরণের ঊর্ধ্বে ছিল বলিয়াই বিভিন্ন উদাহরণের দ্বারা তিনি বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতাকে সমালোচনা করিয়াছেন।

মধুসূদনের মেঘনাদ শাস্ত্রের প্রথাগত বিশ্বাসের বদলে এক অভিনব মানব-ধর্মশাস্ত্রের বিশ্বাসকে গ্রহণ করিয়াছেন। শত পাপ কলঙ্কের মধ্যেও আত্মরক্ষা অপেক্ষা স্বদেশের মৃত্তিকারক্ষা, আপনার পারত্রিক মোক্ষ অপেক্ষা বংশমর্যাদা রক্ষাই তাঁহার নিকট গুরুতর কার্য। গুণবান পরজন অপেক্ষা নির্গুণ স্বজনই যে বরণীয়, এই মানব শাস্ত্রীয় শিক্ষাই মধুসূদনের তরুণকাব্য-নায়ককে এক অপরূপ দীপ্তিতে ভূষিত করিয়াছে।

পক্ষান্তরে বিভীষণ চরিত্র সম্পর্কে মধুসূদন রামায়ণের মূলসূত্রটিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। রামায়ণ অনুযায়ী বিভীষণ ধর্মভীরু, মধুসূদনের কাব্যেও তাই। কিন্তু এই ধর্ম পৌরাণিক ধর্ম, ইহার প্রতি কবির কোনও শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয় নাই। লঙ্কার পাপের কথা কিংবা অধর্মাচারী রাবণের পাপের উল্লেখ মধুসূদনও একাধিকবার করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু কাব্যে তাহা ব্যাখ্যাত হয় নাই বলিয়া বিশ্বাসযোগ্যও হয় নাই। দেবকুল পাপাচার হইতে বিরত কিন্তু লঙ্কাপুরী সতত পাপে পরিপূর্ণ বলিয়া সেই আসন্নবিনাশ লঙ্কার ভাগ্য হইতে আপনার ভাগ্যকে পৃথক্ করিয়া বিভীষণ আত্মরক্ষার্থে রামচন্দ্রের অনুগামী হইয়াছেন, এইরূপ আত্মতুষ্টি আমাদের নিকট বিভীষণ চরিত্রকে মহৎ করিয়া তোলে নাই। বরং জন্মভূমির শত্রুকে মিত্র সম্ভাষণ করার হীনতাই বিভীষণকে নিশ্চিন্তভাবে কলঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। ইন্দ্রজিতের তীব্রতম শ্লেষবাক্যে বিভীষণ স্বয়ং লজ্জিত হইয়াছেন, মধুসূদন এইরূপ ইঙ্গিতও দিয়াছেন,

'মহামন্ত্র বলে যথা নম্রশিরঃ ফণী,
মলিন বদন লাজে,

—স্বদেশের সম্মান-রক্ষার পবিত্র কর্তব্য বিসর্জন দিয়া যে ধর্মভীরু বনবাসী হীন মানুষের নিকট দাসত্ব বরণ করে তাহার ধর্মপরায়ণতাকে ইন্দ্রজিৎ শেষ পর্যন্ত 'বর্বরতা' বলিয়াছেন, ইহাই বিভীষণ চরিত্র সম্পর্কে মধুসূদনের সুস্পষ্ট মনোভাব।

আদি-কবি : বিহারীলাল চক্রবর্তী

ভূমিকা

ঈশ্বর গুপ্তের ক্লিষ্ট তথ্যভারাক্রান্ত সাংবাদিক ও কটাক্ষকণ্টকিত পদ্যবন্ধের পর, মধুসূদন দত্তের বীররসাত্মক পৌরাণিক মহাকাব্যধারা হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের মধ্যে ক্লাসিকাল আখ্যানমূলক কাব্যের একটি গতানুগতিক ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছিল। যুদ্ধবর্ণনা ও বীররস, ইতিহাস-পুরাণের বৃহৎ ঘটনার নূতন ভাষ্যরচনা, হত্যা-মৃত্যুর ঘনায়িত আয়োজন, দেশাত্মবোধক ভাব মহোৎসব—ইহার দ্বারাই এই জাতীয় ক্লাসিকাল কাব্যের আসর জমিয়া উঠিয়াছিল। এমন সময় বিহারীলাল চক্রবর্তী ইতিহাস-পুরাণের জগতের বাহিরে, এই বাস্তব দৈনন্দিন জগতের সুখদুঃখের নদী-স্রোতের পাশে বসিয়া আপন মনের মৃদু রাগিণী বাজাইতেছিলেন। ইহাই আধুনিক সাহিত্যের প্রথম বিশুদ্ধ রোমান্টিক লিরিক, আত্মভাবনামূলক কবিতা। বিহারীলাল বাঙলা কাব্যকে আখ্যান বিবরণের বক্তৃতাস্রোত হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে সংগীত করিয়া তুলিলেন, আপনার মানস-প্রবৃত্তির ভাবপ্রকাশের বাহন করিলেন। অহংতান্ত্রিক কবির নিজস্ব দৃষ্টিতে বিশ্বকে রঞ্জিত করিয়া সেই দেখার নেশায় পাঠককে তিনি আহ্বান করিলেন। প্রাচীন কবিতায় আত্মভাবসাধনার এই রীতি প্রচলিত ছিল না।

কবি পরিচয়

আধুনিক সাহিত্যের প্রথম রোমান্টিক লিরিক

"কবির অন্তরে একটা যে অকারণ, অনির্দেশ্য বেদনাবোধ, একটা অপ্রশমিত অভাবের অস্বস্তি অনির্বাণ দহন জ্বালায় ধূমায়িত হয়, এবং ইহাই যে তাঁহার কবিতার প্রেরণা ও প্রাণশক্তি কবির এই জীবনসত্য প্রাগাধুনিক যুগে অজ্ঞাত ছিল।" বিহারীলাল আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মানুষের এই অজ্ঞেয় জটিল মনোবৃত্তিকেই কাব্যে প্রকাশ করিলেন। এতকাল কবিরা ইন্দ্রিয়দৃষ্টির দ্বারাই বিশ্বকে দেখিয়াছেন, বিহারীলাল তাহাকে দেখিলেন মানসনেত্রে ধ্যানস্থ দৃষ্টিতে। এ দেখা অভিনব দেখা, নিভৃত দেখা। বিশ্বের প্রকৃতি-নিসর্গের প্রতি কবি আপন অন্তরাত্মার এক গোপনগভীর আকর্ষণ অনুভব করিয়াছেন,

আধুনিক মানুষের জটিল মনোবৃত্তি

সমস্ত জগতের উপর তিনি এক অপূর্ব সৌন্দর্যের করুণমধুর প্রচ্ছায়া বিস্তীর্ণ দেখিয়াছেন, সকল জড় সজীব সত্তার অন্তরালে এক রহস্যময়ীর লীলাচঞ্চল চরণক্ষেপ অনুভব করিয়াছেন। বিচিত্র রূপতৃষ্ণা ও সৌন্দর্যপিপাসা, অচরিতার্থ প্রেমের জন্য বিষণ্ণ হাহাকার, প্রকৃতির মর্মরহস্যে অনুপ্রবেশের কাতর ক্রন্দন, কোলাহল ও নাগরিকতার অনিঃশেষ অসন্তোষ-অনুভব, তরুলতা-মনুষ্যের জীবনের সহিত এক প্রকার 'জননাথের সৌহৃদানি'র চেতনা—ইহাই বিহারীলাল-প্রবর্তিত আধুনিক রোমান্টিক গীতিকবিতার মূল স্বভাব।

বিহারীলাল প্রবর্তিত রোমান্টিকতার স্বভাব লক্ষণ

বিহারীলালের শ্রেষ্ঠ কাব্য সারদামঙ্গলের প্রথম সর্গ হইতে আদি-কবি কবিতাটি উদ্ধৃত হইয়াছে। মূল কাব্য সর্গবদ্ধ, খণ্ডাংশের নাম নাই। সংকলয়িতা ইহার বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে নামকরণ করিয়াছেন 'আদি-কবি'। বাল্মীকির কবিত্বলাভ এই অংশের বিষয়বস্তু বলিয়া এই নামকরণ অযথার্থ হয় নাই।

উৎস ও নামকরণ

প্রসঙ্গত সারদামঙ্গল কাব্যের বিষয়ালোচনা করা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিহারীলাল নামক 'আধুনিক সাহিত্যের' বিখ্যাত প্রবন্ধে বলিয়াছেন,

সারদামঙ্গলের বিষয় পরিচয়

"সারদামঙ্গল এক অপরূপ কাব্য। প্রথম যখন তাহার পরিচয় পাইলাম তখন তাহার ভাষায় ভাবে এবং সংগীতে নিরতিশয় মুগ্ধ হইতাম, অথচ তাহার আদ্যোপান্ত একটা সুসংলগ্ন অর্থ করিতে পারিতাম না। যেই একটু মনে হয় এইবার বুঝি কাব্যের মর্ম পাইলাম, অমনি তাহা আকার পরিবর্তন করে। সূর্যাস্তকালের সুবর্ণমণ্ডিত মেঘমালার মত সারদামঙ্গলের সোনার শ্লোকগুলি বিবিধ রূপের আভাস দেয়, কিন্তু কোনো রূপকে স্থায়ী ভাবে ধারণ করিয়া রাখে না। অথচ সুদূর সৌন্দর্য স্বর্গ হইতে একটি অপূর্ব পূরবী রাগিণী প্রবাহিত হইয়া অন্তরাত্মাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে থাকে।

রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা ও আলোচনা

এইজন্য সারদামঙ্গলের শ্রেষ্ঠতা অরসিক লোকের নিকট ভালরূপে প্রমাণ করা বড়ই কঠিন হইত। যে বলিত, আমি বুঝিলাম না আমাকে বুঝাইয়া দাও, তাহার নিকট হার মানিতে হইত।

…সারদামঙ্গলে কবি যাহা গাহিতেছেন তাহা কান পাতিয়া শুনিলে একটি স্বর্গীয় সংগীতসুধায় হৃদয় অভিষিক্ত হইয়া উঠে, কিন্তু সমালোচন-শাস্ত্রের আইনের মধ্য হইতে তাহাকে ছাঁকিয়া লইবার চেষ্টা করিলে তাহার অনেক রস বৃথা নষ্ট হইয়া যায়।

সারদামঙ্গল বুদ্ধিগ্রাহ্য রচনা নয়

প্রকৃতপক্ষে সারদামঙ্গল একটি সমগ্র কাব্য নহে, তাহাকে কতকগুলি খণ্ড কবিতার সমষ্টিরূপে দেখিলে তাহার অর্থবোধ হইতে কষ্ট হয় না। দ্বিতীয়ত, সরস্বতী সম্বন্ধে সাধারণত পাঠকের মনে যেরূপ ধারণা আছে কবির সরস্বতী তাহা হইতে স্বতন্ত্র।

খণ্ড কবিতার সমষ্টি

কবি যে সরস্বতীর বন্দনা করিয়াছেন, তিনি নানা আকারে নানাভাবে নানা লোকের নিকট উদিত হন। তিনি কখনো জননী, কখনো প্রেয়সী, কখনো কন্যা। তিনি সৌন্দর্যরূপে জগতের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন, এবং দয়া-স্নেহ-প্রেমে মানবের চিত্তকে অহরহ বিচলিত করিতেছেন। ইংরেজ কবি শেলি যে বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,

সরস্বতীর নানা রূপ, নানা আকার

Spirit of Beauty, thou dost consecrate
With thine own house all thou dost shine upon
Of human thought or form,

সারদা, বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্যলক্ষ্মী

যাহাকে বলিয়াছেন,

Thou messenger of sympathies
That wax and wane in lovers' eyes.

সেই দেবীই বিহারীলালের সারদা।

সারদামঙ্গলের আরম্ভের চারি শ্লোকে কবি সেই সারদাদেবীকে মূর্তিমতী করিয়া বন্দনা করিয়াছেন। তৎপরে বাল্মীকির তপোবনে সেই করুণারূপিণী দেবীর কিরূপে আবির্ভাব হইল, কবি তাহা বর্ণনা করিতেছেন। পাঠকের নেত্রসম্মুখে দৃশ্যপট যখন উঠিল তখন তপোবনে অন্ধকার রাত্রি—

বাল্মীকির তপোবন

নাহি চন্দ্রসূর্য তারা
অনল-হিল্লোল-ধারা

সারদার প্রথম আবির্ভাব-ক্ষণ

বিচিত্র-বিদ্যুত-দাম-দ্যুতি ঝলমল ;
তিমিরে নিমগ্নভব,
নীরব নিস্তব্ধ সব,
কেবল মরুতরাশি করে কোলাহল।

এমন সময় ঊষার উদয় হইল—

হিমাদ্রি শিখর পরে
আচম্বিতে আলো করে
অপরূপ জ্যোতিঃ এই পুণ্য-তপোবনে।
বিকচ নয়নে চেয়ে
হাসিছে দুধের মেয়ে,—
তামসী-তরুণী-ঊষা কুমারী রতন।
কিরণে ভুবন ভরা,
হাসিয়ে জাগিল ধরা,
হাসিয়ে জাগিল শূন্যে দিগঙ্গনাগণে।
হাসিল অম্বরতলে
পারিজাত দলে দলে,
হাসিল মানস-সরে কমল-কানন।

ঊষা যেন এক কুমারী কন্যা

তপোবনে একদিকে তিমির-রাত্রি ভেদ করিয়া তরুণ ঊষার অভ্যুদয় হইল তেমনি অপরদিকে নিষ্ঠুর হিংসাকে বিদীর্ণ করিয়া কিরূপে করুণাময় কাব্যজ্যোতি প্রকাশ পাইল কবি তাহার বর্ণনা করিতেছেন।"

করুণাময়ী সারদার আবির্ভাব

ইহার পর রবীন্দ্রনাথ সারদামঙ্গলের প্রথম সর্গের 'অম্বরে অরুণোদয়' হইতে 'অন্তরে করুণাসিন্ধু উথলিয়া ধায়' পর্যন্ত কাব্যাংশ উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন,

"সারদাদেবীর এই এক করুণামূর্তি। তাহার পর ২১ শ্লোক হইতে আবার একটি কবিতার আরম্ভ হইয়াছে। সে-কবিতায় সারদাদেবী ব্রহ্মার মানস-সরোবরে সুবর্ণপদ্মের উপর দাঁড়াইয়াছেন এবং তাঁহার অসংখ্য ছায়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। ইহা সারদাদেবীর বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্যমূর্তি—

সৌন্দর্যময়ী সারদার বিকাশ

ব্রহ্মার মানস-সরে
ফুটে ঢল ঢল করে
নীলজলে মনোহর স্বর্ণ-নলিনী,
পাদপদ্ম রাখি তায়
হাসি হাসি ভাসি যায়
ষোড়শী রূপিণী বামা পূর্ণিমা যামিনী।
কোটি শশী উপহাসি
উথলে লাবণ্যরাশি,
তরল দর্পণে যেন দিগন্ত আবরে,
আচম্বিতে অপরূপ
রূপসীর প্রতিরূপ
হাসি হাসি ভাসি ভাসি উদয় অম্বরে।

এই সারদাদেবীর, Spirit of Beauty-র নব-অভ্যুদিত করুণা-বালিকা-মূর্তির এবং সর্বত্র-ব্যাপ্ত সুন্দরী ষোড়শী মূর্তির বর্ণনা সমাপ্ত করিয়া কবি গাহিয়া উঠিয়াছেন,

তোমারে হৃদয়ে রাখি
সদানন্দ মনে থাকি,
শ্মশান অমরাবতী দুই ভাল লাগে।
গিরিমালা কুঞ্জবন
গৃহ নাট-নিকেতন
যখন যেখানে যাই যাও আগে আগে।...
যত মনে অভিলাষ,
তত তুমি ভালবাস,
তত মন প্রাণ ভরে আমি ভালবাসি,
ভক্তিভাবে একতানে
মজেছি তোমার ধ্যানে,
কমলার ধনমানে নহি অভিলাষী।

কবির অন্তরে ভাস্বরী সারদার নিত্য অবস্থান

এই মানসীরূপিণী সাধনার ধনকে পরিপূর্ণভাবে লাভ করিবার জন্ত কাতরতা প্রকাশ করিয়া কবি প্রথম সর্গ সমাপ্ত করিয়াছেন।"

রবীন্দ্রনাথের এই অসামান্য আলোচনা অনুসরণ করিয়া দেখা গেল যে, সারদামঙ্গল কাব্যে কবি এক অভিনব সারদাদেবীর বন্দনা করিয়াছেন। ইনি, প্রথমত, কোনো ধর্মশাস্ত্রের সহিত যুক্ত নন, কাব্যশাস্ত্রের বন্দিতা দেবী। দ্বিতীয়ত, সারদা রূপান্তরের মধ্য দিয়া কবির নিকট নানাকালে নানা বেশে নানা আকারে আবির্ভূত হন। তৃতীয়ত, তিনি জননী-প্রেয়সী-কন্যা সব রূপেই উদ্বোধিত। চতুর্থত, তিনিই জগতের বস্তুপুঞ্জের অন্তরালচারিণী সৌন্দর্যসত্তা। পঞ্চমত, তিনি কবির অন্তরে করুণারূপেও আবির্ভূত হইয়া থাকেন। করুণারূপে সম্ভূতা এই দেবী বাল্মীকির নিকট আবির্ভূতা হইয়াছিলেন বলিয়াই ঋষি বাল্মীকি কবি বাল্মীকিতে পরিণত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার কণ্ঠে মানুষের সংসারের প্রথম কবিতা তথা শ্লোক নির্গত হইয়াছিল. ইহাই আলোচ্য কবিতায় বিহারীলালের বক্তব্য।

ভাবার্থ

কাব্য বস্তু-সংক্ষেপ

পর্বতশিখরের প্রান্ত হইতে অকস্মাৎ জ্যোতির্ময়ী শুভ্রধবলা বিকচনয়না কন্যার মত সহাস্যবদনা উষাকুমারীর আবির্ভাবে বাল্মীকির পুণ্য তপোবন আলোকিত হইল। ক্রমে আকাশ সূর্যালোকিত হইল। মন্দপ্রবাহিনী তমসাতীরে ভাববিহ্বল মুনি প্রাকৃতিক শোভা অবলোকন করিতেছিলেন। সহসা বৃক্ষশাখে কূজনরত ক্রৌঞ্চদম্পতির প্রতি ব্যাধের শর নিক্ষিপ্ত হওয়ায় শোণিতাক্ত একটি ক্রৌঞ্চ ভূতলে পতিত হইল, মৃত বিহঙ্গের জন্য ক্রৌঞ্চীর কাতর ক্রন্দনে অরণ্য উন্মথিত হইল, এবং এই ঘটনার প্রত্যক্ষ দর্শক করুণার্ত বাল্মীকির ললাটে বিদ্যুৎরেখার মত জ্যোতির্ময়ী সরস্বতীর আবির্ভাব ঘটিল। এই দিব্য আবির্ভাবে ভুবন কিরণপ্লাবিত হইল অথচ তাহা চন্দ্রসূর্যের কিরণের তুলনায় খরদীপ্তি নয়, শান্ত। যোগীর ধ্যানে উদ্ভাসিত দেবীর মত এই বাণীরূপা কিরণময়ী ললাটদেশ হইতে বিনির্গতা হইয়া মুগ্ধনেত্রে বাল্মীকির মুখ নিরীক্ষণ করিলেন। তাঁহার বাহুতে ইন্দ্রধনুর বলয়, কণ্ঠে তারকার হার, সীমন্তে নক্ষত্রের টিপ, কর্ণে কিরণের দুল, আলুলায়িত কুন্তলচূর্ণ মুখে উড়িয়া পড়িতেছে দেখিয়া বনভূমি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দেবীর মুখমণ্ডলে হাস্য-আনন্দ-বিগলিত মাধুর্য-ক্রোধ প্রভৃতি নানা ভাবের বিকাশ ঘটিতেছে। সহসা সহচরবিহীনা ক্রৌঞ্চীর উত্তাল ক্রন্দন শুনিয়া,

তীরবিদ্ধ রক্তাক্ত পক্ষী ও ক্রন্দমানা সহচরীর দিকে দৃষ্টি দিয়া বীণানন্দিনী দেবী উন্মাদিনী হইলেন। তাঁহার অন্তর করুণায় আপ্লুত হইল, তাঁহার বীণায় উঠিল বিষাদের ঝঙ্কার। সেই কাতর করুণ-সংগীত শুনিয়া আরণ্যক তরুলতা ও তমসা নদী যেন বেদনায় বিলাপ করিয়া উঠিল এবং দেবীর এই করুণারূপিণী মূর্তি দেখিয়া করুণা-উদ্‌বেলিতচিত্ত আদিকবি বাল্মীকি বিহ্বল হইয়া গেলেন।

আলোচনা

রামায়ণের সূচনায় বাল্মীকির কবিত্বলাভের ঘটনাটিকে রামায়ণ কাব্যের ভূমিকাস্বরূপ গণ্য করা হইয়া থাকে। নারদের নিকট রামচন্দ্র সম্বন্ধে কাব্য-রচনার অনুজ্ঞা লাভ করিয়া বাল্মীকি তমসাতীরে স্নানের জন্য আগমন করিলেন এবং তীরশোভা নিরীক্ষণপূর্বক নদীতীরে বিচরণ করিতেছিলেন। সহসা নিকটবর্তী বৃক্ষচূড়ে নিবাসিত এক কলকণ্ঠ ক্রৌঞ্চমিথুনের প্রতি জনৈক নিষাদের কুশলনিক্ষিপ্ত তীর একটি বিহঙ্গকে বিদ্ধ করিল,

তং শোণিতপরীতাঙ্গং চেষ্টমানং মহীতলে।
ভার্যা তু নিহতং দৃষ্ট্বা রুরাব করুণাং গিরম্‌॥

নিহত ক্রৌঞ্চ এবং বিলাপিতা স্ত্রী-বিহঙ্গের রোদন শ্রবণে বাল্মীকিচিত্তে গভীর করুণার সঞ্চার হইল, তিনি ধিক্কার দিয়া ব্যাধকে বলিলেন,

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্‌॥

অর্থাৎ 'রে নিষাদ, প্রেমমুগ্ধ ক্রৌঞ্চদম্পতির অন্যতমকে হত্যা করার জন্য জগতে তোমার প্রতিষ্ঠা ঘটিবে না'। কিন্তু ইহা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বাল্মীকি ভাবিতে লাগিলেন, কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া, এ আমি কী বলিলাম! তখন শিষ্য ভরদ্বাজকে ডাকিয়া বলিলেন, ইহাই কি শ্লোক, শোক হইতে উৎপন্ন হইয়াছে? এই যে পাদবদ্ধ-অক্ষরযুক্ত তন্ত্রীলয়ে গেয় বাক্যদ্বয়, ইহাই কি কবিতা? শোকের জন্য করুণা হইতে ইহার জন্ম, শোকার্ত হইয়া এই শ্লোকের জন্ম দিলেন বলিয়াই বাল্মীকি হইলেন আদি-কবি,

পাদবদ্ধোঽক্ষরসমস্তন্ত্রীলয়সমন্বিতঃ
শোকার্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা॥

বাল্মীকির রামায়ণে ইহার পর দেখি আশ্রম প্রত্যাগমনের পর ঋষি কর্তৃক

তাঁহার এই নবাবিষ্কৃত নবোচ্ছাস ছন্দের কথা ভাবিবার কালে প্রজাপতি ব্রহ্মার স্বয়ং আবির্ভাব ঘটিয়াছে এবং ব্রহ্মা বাল্মীকিকে বলিয়াছেন যে, বাল্মীকির শোকোৎপন্ন এই বাক্যধ্বনিরই নাম হইবে শ্লোক। এই শ্লোকেই অর্থাৎ এই নবপ্রাপ্ত ছন্দেই আদি-কবি তাঁহার রামচরিত রচনা করিবেন। বাল্মীকির সেই রচনা হইবে মৃত্যুঞ্জয়ী।

বাল্মীকির কবিত্বলাভের এই ঘটনাটিকেই বিহারীলাল রামায়ণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু রামায়ণে শোক হইতে বাল্মীকির শ্লোক উচ্চারণের পশ্চাতে কোনো দিব্য প্রেরণা ছিল না [যদিও ব্রহ্মা বলিয়াছেন, আমার ইচ্ছা-বশেই তোমার মুখ হইতে এই বাণী নির্গত হইয়াছে], অন্তত কাব্যাধিষ্ঠাত্রী সরস্বতীর কোন ভূমিকার উল্লেখমাত্র নাই। বিহারীলাল আলোচ্য কাব্যে বাল্মীকির তৎকালীন চিত্তে যে বাগ্‌দেবীর প্রেরণা ঘটিয়াছিল, ইহাই প্রচার করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, রামায়ণে বাল্মীকি পাদবদ্ধ-অক্ষরযুক্ত শ্লোকরূপ আবিষ্কার করিয়াছেন রামায়ণ রচনার জন্য, বিহারীলালের নিকট রামায়ণ রচনা গৌণ। প্রকৃতপক্ষে **এই বিষণ্ণতা দুঃখ করুণার মধ্য হইতে একটি সারস্বত-প্রেরণাবিদ্ধ কবির জন্ম হইল, ইহাই বিহারীলালের বক্তব্য।** তাই বাল্মীকি কবির নিকট আদি-কবি, তাঁহার 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং' এই শ্লোক আদি-কবির প্রথম কবিতা। আর এ কবিতা যেন বাল্মীকির নিজস্ব সৃষ্টি নয়, তাঁহার বিস্ময়বিস্ফারিত কণ্ঠে সরস্বতীর বাণী। তৃতীয়ত, রামায়ণে বাল্মীকির কবিতা উচ্চারণের পর তাঁহার নিকট ব্রহ্মার আবির্ভূতি ঘটিয়াছিল। কাব্যশাস্ত্রে ব্রহ্মা প্রজাপতি, স্বয়ং জগৎশিল্পের স্রষ্টা। বাল্মীকি সরস্বতীকে ব্রহ্মার মানস-সরে প্রস্ফুটিত পদ্ম, ব্রহ্ম-কন্যা ইত্যাদি বলিয়াছেন।

রামায়ণের সংকেত বিহারীলালের পার্থক্য

বিহারীলাল সারদা-সরস্বতীকে আদি-কবির নিকট করুণারূপিণী করিলেন কেন, ইহার উত্তরেই কবিতাটির গীতিধর্মিতা নিহিত আছে। ইহা রামায়ণের বাল্মীকি-কাহিনী মাত্র নয়, ইহা নিত্যকালের কবিজন্মের কাহিনী। **শোকের ভিতর দিয়া ভাববিভোর চিত্তে কেমন করিয়া বাণীমূর্তি সরস্বতীর দিব্য-উদ্‌ভাসন ঘটে, ইহাই আলোচ্য কবিতার বিহারীলালের উপলব্ধি।** রোমান্টিক কবিরা তাঁহাদের কাব্যপ্রেরণাস্বরূপ এক বাণী বাগ্‌দেবীর আরাধনা করিয়া থাকেন। মেঘনাদবধের প্রথম সর্গ স্মরণীয়,

বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে
ভারতি! যেমতি মাতঃ বসিলা আসিয়া,
বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)
যবে খরতর শরে, গহন কাননে,
ক্রৌঞ্চবধূসহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা,
তেমতি দাসেরে, আসি দয়া কর, সতি।
কে জানে মহিমা তব এ ভবমণ্ডলে?
নরাধম আছিল যে নর নরকুলে
চৌর্য্যে রত, হইল সে তোমার প্রসাদে
মৃত্যুঞ্জয়, যথা মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি!
হে বরদে, তব বরে চোর রত্নাকর
কাব্যরত্নাকর কবি! তোমার পরশে
সুচন্দন-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে!
হায় মা, এ হেন পুণ্য আছে কি এ দাসে?
কিন্তু যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে
মূঢ়মতি, জননীর স্নেহ তার প্রতি
সমধিক। ঊর, তবে ঊর দয়াময়ি
বিশ্বরমে!

বিহারীলালের কবিতার আদি কবির নিকট করুণারূপে উদ্ভাসিতা সারদা বা সরস্বতী এবং মধুসূদনের 'শ্বেতভুজা ভারতী' ও পাশ্চাত্ত্য কবিদের কাব্য-সূচনায় Heavenly Muse-এর বন্দনা একই।

বাগ্‌দেবীর আবির্ভাব না ঘটিলে কবি হওয়া যায় না, বিহারীলালের নিকট হইতে এই বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের চিত্তেও সংক্রামিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ, প্রথমত, বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্য ইহাই ছিল কিশোর রবীন্দ্রনাথের প্রচার্য এবং দ্বিতীয়ত, পরিণত বয়সে 'কাহিনী' নাট্যকাব্যের 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতা।

বিহারীলালের এই কবিতাটি আধুনিক রোমান্টিক গীতিকবির একটি আশ্চর্য সার্থক সৃষ্টি। প্রাচীন পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া

বিহারীলাল একটি কবিতার জন্মলগ্নের আধুনিক ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন। কবিতা একটি দৈবী প্রেরণার মত, বেদনার মধ্য দিয়া তাহার জন্ম ঘটে কবির অন্তরে, তাহার ধ্যানে, তাহার চকিত উদ্ভাসনে। নিত্যকাল ধরিয়া তাহাই ঘটিয়াছে। ত্রিকালের ত্রিবিধ সরস্বতীপ্রতিমার আবির্ভাবদৃশ্য অঙ্কন করাই সারদামঙ্গলের কবির উদ্দেশ্য ছিল। এই প্রেরণারূপিণী বীণাপাণি বাল্মীকির শোকার্ত ললাটদেশে প্রভাতের ঊষা কিরণের মত আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তিনিই কালিদাসকে বাণীর বিদ্যুদ্দীপ্ত চমকে জাগাইয়াছেন, তিনিই আবার বিহারীলালের নিকট স্নেহ-প্রেম-করুণার আধার সারদাবেশে জাগরিতা। ক্রৌঞ্চীর শোক একটি কারণ মাত্র, প্রকৃতপক্ষে কবির অন্তরে যদি বেদনা না জাগে, তবে কবিতার জন্ম হইবে কিরূপে? রবীন্দ্রনাথও 'ভাষা ও ছন্দে' বলিয়াছেন,

অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেয়, তার বক্ষে বেদনা অপার
তার নিত্য জাগরণ, অগ্নিসম দেবতার দান
ঊর্ধ্বশিখা জ্বালি চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ।

এবং ইহারই সহিত তুলনীয় শেলির উক্তি,

Our sweetest songs are those
That tell of saddest thought

রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ

হিমাদ্রি-শিখর পরে—হিমালয় পর্বতশীর্ষে। **আচম্বিতে আলা করে**—অকস্মাৎ আলোকিত করিয়া। **অপরূপ জ্যোতিঃ**—ঊষার আলোকাভাস এক স্বর্গীয় জ্যোতির ন্যায় বোধ হইতেছে। **পুণ্য তপোবন**—মহর্ষি বাল্মীকির তপোবন বুঝানো হইতেছে। **বিকচ**—বিকশিত। **দুধের মেয়ে**—শুভ্রকান্তি, দুগ্ধধবলা অর্থে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উপর নারীরূপক আরোপ করা বিহারীলালের বৈশিষ্ট্য। তাই ঊষা তাঁহার নিকট দুধের মেয়ে। ঊষার অন্ধকার-বিদীর্ণ আলোকের কুন্দবিকাশকে দুগ্ধের শুভ্রতার সহিত উপমিত করা হইয়াছে। **তামসী-তরুণ-ঊষা**—অন্ধকার রাত্রির বক্ষ হইতে ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত, এই অর্থে হয়ত কবি তামসী শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। সুতরাং

শব্দটির সম্ভাবিত অর্থ, তমসা হইতে সদ্য আগত তরুণী উষা। **কুমারী-রতন**—দুগ্ধশুভ্রা হাস্যময়ী সুনয়নী উষা যেন একটি কুমারী কন্যা। **অম্বরে অরুণোদয়**—ধীরে ধীরে আকাশে সূর্যোদয় ঘটিল। **তলে দুলে⋯স্বনে**—নিম্নে মর্তলোকে কুলুকুলু শব্দে তমসা নদী ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। নদী এখানে নারীরূপে কবির নিকট প্রমূর্ত, তাই তমসা তটিনী-রানী। [রামায়ণেই তমসা নদীর উল্লেখ আছে। বাল্মীকি ভরদ্বাজকে বলিয়াছেন, এই অকর্দম রমণীয় প্রসন্নাম্বু মনুষ্যমনের মত স্বচ্ছ তমসা তীর্থে আমি অবগাহন করিব,

ইদমেবাবগাহিষ্যে তমসা তীর্থমুত্তমম।

রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেও তমসার উল্লেখ আছে,

হেমন্ত বনানীর ছায়ে
স্বচ্ছ শীর্ণ ক্ষিপ্রগতি স্রোতস্বতী তমসার তীরে
অপূর্ব উদ্বেগ ভরে সঙ্গিহীন ভ্রমিছেন ফিরে
মহর্ষি বাল্মীকি কবি,—]

নিরখি লোচন⋯ভাব-ভোলা মনে—আত্মবিভোর মুনি প্রভাতকিরণে উদ্ভাসিত নদী, নদীতট ও প্রাকৃতিক মধুর দৃশ্যগুলি মুগ্ধনেত্রে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। **শাখি-শাখে**—বৃক্ষ শাখায়। **শাখি-শাখে⋯ধরণী লুটায়**—অরণ্যশোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে বাল্মীকি দেখিতে পাইলেন বৃক্ষশাখায় এক ক্রৌঞ্চদম্পতি আবেগে কূজন করিতেছে। সহসা ভূমিতলের জনৈক ব্যাধ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণে একটি বিহঙ্গ রক্তাক্ত দেহে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। [কৃত্তিবাসের রামায়ণে এই অংশ,

একদিন সে বাল্মীকি সরোবর কূলে।
রামনাম জপেন বসিয়া বৃক্ষমূলে॥
ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চী বসিয়া আছিল বৃক্ষডালে।
এক ব্যাধ ঐ পক্ষী বিন্ধিলেক নলে॥
পক্ষীরে বিন্ধিল ব্যাধ শৃঙ্গারের কালে।
ব্যাকুল হইয়া পড়ে বাল্মীকির কোলে॥]

ক্রৌঞ্চী⋯⋯ক্রন্দনে—মৃত পক্ষীর জন্য আর্তস্বরে নিঃসঙ্গ ক্রৌঞ্চী ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। [রামায়ণে আছে,

তং শোণিতপরীতাঙ্গং চেষ্টমানং মহীতলে।
ভার্যা তু নিহতং দৃষ্ট্বা রুরাব করুণাং গিরম্॥
বিযুক্তা পতিনা তেন দ্বিজেন সহচারিণা।
তাম্রশীর্ষেণ মত্তেন পত্রিণা সহিতেন বৈ॥]

চক্ষে কবি · বিহ্বলের প্রায়—মৃত রুধিরাক্ত ক্রৌঞ্চ এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে বিচরণকারিণী ক্রৌঞ্চীর করুণার্ত বিলাপ শ্রবণ করিয়া বাল্মীকির মন বিবশ হইল, চিত্তে করুণার উদ্রেক হইল। **সহসা ললাটভাগে····· নীল নবঘনে**—ঘননীল মেঘপুঞ্জ হইতে যেইরূপ চকিতবিদ্যুৎ স্ফুরিত হয়, সহসা ঋষির ললাটদেশ হইতে সেইরূপ জ্যোতিঃপুঞ্জ নির্গত হইল এবং সেই আলোক-বন্যার মধ্যে আবির্ভূতা হইলেন দীপ্তিময়ী সারদা বা সরস্বতী। ইহা অলৌকিক নয়, সরস্বতীর আবির্ভাব, কবিত্বশক্তির আবির্ভাবের যেন চকিত দিব্য-প্রেরণা, ইহাই কবির অভিপ্রেত। কবিত্বশক্তি ধ্যানের বিষয় তাই ললাটের জ্যোতিই তাহার রূপক। [বাল্মীকির কবিত্বলাভের এই ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করিয়াছিল। বাল্মীকিপ্রতিভা হইতে এই অংশের বর্ণনা দেওয়া হইতেছে,

প্রথম ব্যাধ। দেখ দেখ দুটো পাখি বসেছে গাছে।
দ্বিতীয় ব্যাধ। আয় দেখি চুপি চুপি আয় রে কাছে।··
বাল্মীকি। থাম থাম কী করিবি বধি পাখিটির প্রাণ।
দুটিতে রয়েছে সুখে মনের উল্লাসে গাহিতেছে গান।
ব্যাধ। থামো থামো ঠাকুর—এই ছাড়ি বাণ।
(মা নিষাদ ইত্যাদি আবৃত্তির পর)
কী বলিনু আমি একী সুললিত বাণী রে।
কিছু না জানি কেমনে যে আমি প্রকাশিনু দেবভাষা,
একী হৃদয়ে একী এ দেখি—
ঘোর অন্ধকার মাঝে একী জ্যোতি ভায়—
অবাক। করুণা এ কার।
(সরস্বতীর আবির্ভাব)
বাল্মীকি। একী এ, একী এ, স্থির চপলা।
কিরণে কিরণে হল সব দিক উজলা!

কী প্রতিমা দেখি এ, জোছনা মাখিয়ে
কে রেখেছে আঁকিয়ে আ মরি কমল-পুতলা।]

কিরণে⋯ ⋯ভুবন উজলে—বাল্মীকির ললাটদেশে যে জ্যোতির্বন্যার আবির্ভাব ঘটিল, তাহার প্রদীপ্ততেজে বনভূমি আলোকিত হইয়া গেল। এই অলৌকিক জ্যোতির নিকট সদ্যউদিত অরুণালোক পর্যন্ত ম্লান হইয়া গেল। সমগ্র পৃথিবী যেন এই জ্যোতির দ্বারা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। **চন্দ্র নয়⋯ কি জ্বলে**—ভাববিদ্ধ বিস্মিত বাল্মীকির হৃদয়ে এক অপার্থিব পুলক, তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না, তাঁহার ললাটজ্যোতির স্বরূপ কী? ইহা এক অদৃষ্টপূর্ব দিব্যতেজ। ইহার প্রখর দীপ্তিতে ভুবন আলোকিত, সূর্য ম্লানচ্ছবি, কিন্তু ইহার জ্যোতিঃ স্নিগ্ধশীতল, প্রখরদাহদাহক নয়। তাই চন্দ্র নয়, সূর্য নয়, অথচ তদপেক্ষা উজ্জ্বল কিন্তু স্নিগ্ধ এই জ্যোতির্লেখার স্বরূপ বাল্মীকির নিকট তখনও দুর্জ্ঞেয়। এই জ্যোতিঃ ললাটের দ্বারপ্রান্ত উদ্‌ঘাটিত করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে অর্থাৎ ইহা যোগীর অন্তরলোকের দিব্যচেতনা মাত্র। করুণার তরঙ্গ হইতে ধীরে ধীরে একটি সারস্বত প্রেরণার আলোকপদ্ম মাথা তুলিয়াছে, ইহাই যেন কবির বক্তব্য। ['সরস্বতীর অধিষ্ঠান আমার শরীরে, নানা ছন্দে নানা ভাষা আপনা হইতে স্ফুরে'—কৃত্তিবাসও এইরূপ লিখিয়াছিলেন। কাব্য রচনাকালে আপনার অন্তরলোকের জ্যোতিঃপুঞ্জের নবোদ্‌ভাসিত আলোকে কবি বিশ্বজগৎ নিরীক্ষণ করেন, চিত্তের আলোকে জগৎ আলোকিত হয়—এইরূপ ব্যাখ্যাই আলোচ্য অংশে গ্রহণ করা যাইতে পারে। কবির চিত্তে উদ্‌ভাসিত এই জ্যোতির্ময়ী কন্যাই রবীন্দ্রনাথের চিত্রা কাব্যের চিত্রা কবিতায় বিচিত্ররূপিণী, যিনি,

অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে,
আকুল পুলকে উলসিছ ফুলকাননে,
দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ চল চরণে
তুমি চঞ্চলগামিনী।
মুখর নূপুর বাজিছে সুদূর আকাশে,
অলক গন্ধ উড়িছে মন্দ বাতাসে,
মধুর নৃত্যে নিখিল চিত্ত বিকাশে
কত মঞ্জুল রাগিণী।

কত না বর্ণে কত না স্বর্ণে গঠিত,
কত যে ছন্দে কত সংগীতে রচিত,
কত না গ্রন্থে কত না কণ্ঠে পঠিত
তব অসংখ্য কাহিনী।]

কিরণমণ্ডলে··· স্বরূপসী—ঋষি বাল্মীকির ললাটদেশ হইতে নির্গলিত জ্যোতিঃপুঞ্জের মধ্যে পরম জ্যোতির্ময়ী অপূর্ব সৌন্দর্যপ্রতিমা অধিষ্ঠান করিতেছেন। **যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে**—বাল্মীকির ললাট হইতে আবির্ভূতা সরস্বতী বাল্মীকিকে যোগীতে পরিণত করিয়াছেন। কবিকে প্রাচীনকালে বলা হইত ঋষি, নৃচক্ষুঃ, যোগী। সারস্বত বিদ্যা তাঁহার ধ্যানের সামগ্রী, তাই বাণীমূর্তি বাল্মীকির ললাটিকা মেয়ে। প্রকৃতপক্ষে, বিহারীলাল যাঁহাকে সরস্বতী বলেন তিনিই বিশ্বজগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তিনি বাহিরে সৌন্দর্যময়ী, অন্তরে যোগেশ্বরী। সারদা, কবির মতে, বিশ্বের অন্তর্নিহিত এক আদিশক্তি মাত্র, ইনি জ্ঞানরূপিণী চৈতন্যময়ী শক্তিরূপিণী এবং বিদ্যাদায়িনী। সুতরাং সাধক ইঁহাকে ধ্যানের দ্বারা চিত্তে জাগরিতা করিতে চাহেন। বাল্মীকির ক্ষেত্রে এই ধ্যানের ধন অবশ্য সহসা করুণার প্রেরণায় ললাট হইতে বিনির্গতা হইয়াছেন। অন্যত্র বিহারীলাল এই সারদাকে সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছেন,

তুমিই বিশ্বের আলো তুমি বিশ্বরূপিণী।
প্রত্যক্ষে বিরাজমান,
সর্বভূতে অধিষ্ঠান;
তুমি বিশ্বময়ী কান্তি দীপ্তি অনুপমা,
কবির যোগীর ধ্যান
ভোলা প্রেমিকের প্রাণ
মানবমনের তুমি উদার সুষমা।

নামিলেন ধীর মুখপানে চেয়ে—বাল্মীকির ললাটদেশ হইতে দেবী জ্যোতিঃপুঞ্জ-সমাচ্ছন্ন হইয়া অর্থাৎ জ্যোতিঃ হইতে দেহধারণ করিয়া প্রাদুর্ভূতা হইলেন, সম্মুখে অবতরণ করিলেন। সেই ধীরমূর্তি বাল্মীকিকে কাব্যদীক্ষা দিতে আসিয়াছেন, তাই তাঁহার মুগ্ধনেত্র বাল্মীকির দিকে নিবদ্ধ হইয়া রহিল। **করে ইন্দ্রধনু···আনন**—এই কয়টি ছত্রে বীণাপাণি

বাগ্‌দেবীর সৌন্দর্যভূষিত অনিন্দ্যরূপের বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহার কনক বাহুতে ইন্দ্রধনুর কঙ্কণ, গলায় তারকাখচিত হার, সীমন্তে নক্ষত্রের টিপ, কর্ণে কিরণের কর্ণাভরণ, কুঞ্চিত অলকগুচ্ছ মুখে আসিয়া পড়িতেছে। দেবীর এই হিরণ্ময়রূপে সমগ্র বনভূমি আলোকিত হইল। সারদার এই রূপবর্ণনা আশ্চর্যভাবে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পাওয়া যায়,

উন্মত্ত সে অভিসারে
তব বক্ষোহারে
ঘন ঘন লাগে দোলা - ছড়ায় অমনি
নক্ষত্রের মণি,
আঁধারিয়া ওড়ে শূন্যে ঝোড়ো এলোচুল,
দুলে ওঠে বিদ্যুতের দুল,

[চঞ্চলা-বলাকা]

চাঁচর—কুঞ্চিত কেশদাম। **হাসি-হাসি নয়নে**—সেই চন্দ্রবদনা সারদা স্মিত প্রসন্ন মুখে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার মনের মধুর জ্যোতিই যেন নয়নে উচ্ছলিত হইয়া পড়িতেছে। **কভু হেসে প্রতিক্ষণে**—বিহারীলালের সারদা বস্তুত কোনো দেবীমূর্তি নন, তিনি 'মানবমনের উদার সুষমা', তিনি বাহিরে প্রকৃতির সৌন্দর্যের, অন্তরে মানুষের স্নেহ-প্রেম-করুণা-মমতার প্রতি। তাই বাল্মীকির সম্মুখে অবতীর্ণা সারদা-কন্যার মুখে কখনও স্নিগ্ধমধুর হাসির মূর্তি। আবেশ, কখনও রোষরৌদ্র, কখনও বা তাঁহার নয়নদ্বয় করুণায় ছলছল করিতেছে। মানুষের এই বহুবিচিত্র চিত্তবৃত্তির দ্বারাই 'যোগীন্দ্রের ধ্যানধন' বিশ্বময়ী কান্তিরূপিণী গঠিত। **বিলোচন**—নয়ন। **করুণ ঘিরে**—বাল্মীকির ললাটদেশ হইতে অবতরণ করিয়া জ্যোতির্ময়ী কন্যা হাস্য-রোষ-করুণার প্রতিমূর্তি হইয়া যখন বাল্মীকির নেত্রে বিহ্বলতা সৃষ্টি করিতেছিলেন, তখনই সহসা নিকটবর্তী ক্রৌঞ্চীর বিয়োগবিধুর আর্ত ক্রন্দন তাঁহার কর্ণগোচর হইল, চমকিত হইয়া তিনি রক্তমাখা ভগ্নপক্ষ মৃত বিহঙ্গ ও তাহার চতুষ্পার্শ্বে সঞ্চরমানা ক্রৌঞ্চীকে দেখিতে পাইলেন। **উত উত উতরোল**—অর্থাৎ বন-পরিব্যাপ্ত ক্রন্দন কোলাহল। উতরোল শব্দের অর্থ কোলাহল বা উচ্চ রব, কিন্তু উত উত শব্দটির কোনও সুনির্দিষ্ট অর্থ নাই। উত উচ্চতাকে বোঝায়, গ্রাম্য ভাষায় উত শব্দের অর্থ ইতস্তত, এখানে-সেখানে। প্রকৃতপক্ষে 'উত

উক্ত উতরোল' শব্দের দ্বারা কবি একটি ধ্বনিসাম্য সৃষ্টি করিয়াছেন মাত্র। [শব্দ ব্যবহারে বিহারীলালের দক্ষতা সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু রোমান্টিক গীতিকবিতায় শব্দের ধ্বনিগত ব্যঞ্জনাসৃষ্টিই প্রধান উদ্দেশ্য।] **নেহারেন**—দেখিতে লাগিলেন। **যেন উন্মাদিনী**—মৃত ক্রৌঞ্চের জন্য বিরহিণী বিহঙ্গীর করুণ বিলাপধ্বনি শুনিয়া দেবীর চিত্ত বিষণ্ণ বেদনায় দ্রবীভূত হইল, তিনি উন্মাদিনীর মত একবার বাল্মীকির প্রতি, একবার সেই ক্রৌঞ্চীর প্রতি তাকাইতে লাগিলেন। **কাতরা···বিষাদিনী**—সারদার অন্তরে করুণার উৎস উৎসারিত হইল, তিনি অনুকম্পায় কাতর হইলেন, তখন তাঁহার বীণায় অঙ্গুলির ঝংকার উঠিল, অতি সকরুণ কণ্ঠে তিনি বিষাদ-সংগীত গান করিতে লাগিলেন। তাৎপর্য হইল এই যে, বেদনায় যখন পরিপূর্ণ হয় তখনই সেই বেদনা বাণীর সংগীত হইয়া উঠে, শোক পরিণত হয় শ্লোকে। ইহাকেই পরোক্ষে বলিলে বলা যায়, যাহা সংগীত তাহার জন্ম শোকের তরঙ্গে। এই বীণা বিষাদসংগীত গাহিতেছে, তাই বীণাই বিষাদিনী। এইরূপ প্রয়োগ রোমান্টিক গীতিকবিতার বিশেষত্ব। রবীন্দ্রনাথও অল্প বয়সের একটি গীতে সরস্বতীকে দিয়া বিষাদিনী বীণা বাজাইয়াছেন,

> অয়ি বিষাদিনী বীণা আয় সখী
>
> গা লো, সেই সব পুরানো গান।
>
> বহুদিনকার লুকানো স্বপন
>
> ভরিয়া দে না লো আঁধার প্রাণ॥

প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, বাল্মীকির সাবদা বিষাদবীণা বাজাইয়া যে সকরুণ সংগীত গাহিতেছেন, তাহা করুণরসার্দ্র রামায়ণ গানেরই পূর্বাভাস মাত্র। **সে শোক···উভরায়**—বীণানন্দিনীর করুণ শোকসংগীত সমগ্র জগতের বায়ুতরঙ্গে বিলসিত হইল, তরুলতা নদী প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থ পর্যন্ত এই জ্যোতির্ময় সারস্বত বিলাপগীতি শ্রবণ করিয়া যেন বিষণ্ণ কণ্ঠ মিলাইল দেবীর কণ্ঠের সহিত। অর্থাৎ দেবীসংগীত ও নৈসর্গিক সংগীত শোকের আবেগে একীভূত হইল। **উভরায়**—উচ্চকণ্ঠে। **নিরখি···উথলিয়া যায়**—ললাটদেশ হইতে বিনির্গতা সারদার শোকসংগীত বাল্মীকিকে ব্যাকুল করিল, দেবীর দিকে তাকাইয়া তিনি বিহ্বল আবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহার অন্তরেও করুণার ঢেউ উথলাইয়া উঠিল। দেবীর করুণারূপে বাল্মীকিও করুণাস্পৃষ্ট হইলেন,

তাঁহার অন্তরে জাগিল অনুরূপ সৃষ্টির প্রেরণা অর্থাৎ বাল্মীকি কবি হইলেন। তাই তিনি আবেশ-বিহ্বল 'আদি-কবি'। বিহারীলাল যাহাকে 'গদ্‌গদ আদি-কবি' বলিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাহাই,

অপূর্ব উদ্বেগভরে সঙ্গিহীন ভ্রমিছেন ফিরে
মহর্ষি বাল্মীকি কবি—রক্তবেগ-তরঙ্গিত বুকে
গম্ভীর জলদমন্দ্রে বারম্বার আবর্তিয়া মুখে
নব ছন্দ, [ভাষা ও ছন্দ—কাহিনী]

ইহাই রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'বাণীর বিদ্যুৎদীপ্ত ছন্দোবাণ-বিদ্ধ বাল্মীকি'। এখন তাঁহার অন্তরে যে করুণাসিন্ধু উত্তাল হইয়া উঠিল, সেই করুণাসিন্ধুর তরঙ্গেই তিনি রামায়ণের সংগীত রচনা করিলেন। স্বর্গলোকের দৈবপ্রভাবে বাল্মীকির ললাটদেশে বাগ্‌দেবীর আবির্ভূতি ঘটিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাল্মীকির অন্তরে ক্রৌঞ্চবধজনিত করুণার প্রেরণাতেই তাঁহার জন্ম, তাই সারদা সৌন্দর্য-লক্ষ্মী কবির ললাটিকা মেয়ে, নন্দিনী বা মানস-কন্যা। কবি মাত্রই জানেন,

আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা—
তুমি আমারই তুমি আমারই।
মম অসীম-গগন-বিহারী॥ [রবীন্দ্রনাথ]

তাই এই বীণাবাদিনী বাগ্‌দেবী ও বাল্মীকির সারদা, তাঁহারই নন্দিনীচ্ছবি।

তমসাতটিনী তীরে প্রভাতের জ্যোতির্ময় উষাকিরণে সহসা শোকের প্রাদুর্ভাব এবং বাল্মীকির ললাটে বীণানিনাদিনীর দিব্যাবতরণ ও বাল্মীকির কবিত্বলাভ, তথা জগতের আদি কাব্যসৃষ্টির এই রূপক রবীন্দ্রনাথের উত্তর-কালের একটি কবিতায় অপরূপ করিয়া বর্ণিত হইয়াছে,

প্রথম যুগের উদয় দিগঙ্গনে
প্রথম দিনের উষা নেমে এল যবে
প্রকাশ পিয়াসি ধরিত্রী বনে বনে
শুধায়ে ফিরিল, সুর খুঁজে পাবে কবে।
এসো এসো সেই নবসৃষ্টির কবি,
নব জাগরণ-যুগ-প্রভাতের রবি—
গান এনেছিলে নব ছন্দের তালে
তরুণী উষার শিশিরস্নানের কালে,
আলো আঁধারের আনন্দবিপ্লবে॥

ব্যাখ্যা

সহসা ললাট ভাগে…নীল নবঘনে—উনিশ শতকীয় বাঙলা কাব্যে রোমান্টিক গীতিকবিতার প্রবর্তয়িতা, সারদামঙ্গল কাব্যের কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর উক্ত কাব্যান্তর্গত আদি-কবি শীর্ষক কবিতা হইতে আলোচ্য পংক্তিটি উদ্ধৃত। তমসা নদীতীরবর্তী তপোবনে মহর্ষি বাল্মীকির কবিত্বলাভের দিব্য মুহূর্তের একটি চিত্রময় বর্ণনা এই অংশের বিষয়ীভূত।

উষালোকপ্লাবিত নদীতটে বাল্মীকি যখন নিসর্গ শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, তখন জনৈক ব্যাধকর্তৃক সম্মুখস্থ বৃক্ষশাখে কুজনরত বিহঙ্গ দম্পতির একটি পক্ষী শরাঘাতে নিহত হইলে মৃত ক্রৌঞ্চের জন্য ক্রৌঞ্চীর আর্ত বিলাপ অরণ্যে ছড়াইয়া পড়িল। এই করুণ আর্তস্বরে ঋষির অন্তরে অকস্মাৎ করুণার উদ্ভব হইল, তিনি বিহ্বল বিবশ হইলেন (এবং সেই মুহূর্তে 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং' শ্লোক উচ্চারণ করিলেন)। সহসা বাল্মীকির ললাটদেশে একটি দিব্য জ্যোতিঃপুঞ্জ নির্গত হইল এবং সেই আলোকমণ্ডলের মধ্য হইতে আবির্ভূতা হইলেন এক জ্যোতির্ময়ী কন্যা। ইনিই বাল্মীকির সারস্বত প্রেরণাদাত্রী সারদা। জলভারাবনত ঘননীল মেঘপুঞ্জ হইতে যেরূপ চকিত বিদ্যুৎশিখা বিকীর্ণ হয়, সেইভাবেই বাল্মীকির ললাট হইতে জ্যোতির্ময়ী কন্যার আবির্ভাব ঘটিল।

কাব্যশাস্ত্র কবিপ্রতিভার দুর্জ্ঞেয় রহস্য ব্যাখ্যা করিতে পারে না, তাই প্রতিভাকে বলা হইয়া থাকে অলৌকিক, স্বর্গীয়, দিব্য। ইহাকেই কবিরা সরস্বতীর আবির্ভাব বলিয়া থাকেন। কবির মানস-তপস্যাই কাব্যরূপ ধারণ করে এবং প্রতিভার মনন-ব্যাপারের জন্য কবির মস্তিষ্কে, সম্ভবত এই কারণেই ললাটদেশকে সারদার উদ্ভাসন-স্থলরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

কিরণ-মণ্ডলে… ললাটিকা মেয়ে—ভূমিকাসূত্র পূর্ববৎ।

ব্যাধ কর্তৃক শরাঘাতে কুজনরত ক্রৌঞ্চের আকস্মিক নিধন দেখিয়া যে মুহূর্তে বাল্মীকির হৃদয়ে করুণার প্লাবন জাগিল সেই মুহূর্তে তাঁহার ললাট হইতে এক অপার্থিব তীব্র আলোকতরঙ্গ বিচ্ছুরিত হইল এবং তাহার মধ্য হইতে এক জ্যোতির্ময়ী কন্যার আবির্ভাব ঘটিল। ইনিই কবির কাব্য-অধিষ্ঠাত্রী দেবী সারদা। কবির অন্তরলোকের রসচৈতন্য হইতে প্রকৃতপক্ষে তাঁহার বহির্গমন

ঘটিল। ললাটদেশই কবির মনন-সাম্রাজ্য, তাই সারদার নির্গমন ললাট হইতে; এইজন্য সারদা ললাটিকা কন্যা। ইনি একদিকে দিব্য জ্যোতির দ্বারা পরিদৃশ্যমান বিশ্বকে উজ্জ্বল করিয়া তোলেন, অন্যদিকে ইনিই কবির অন্তরবাসিনী। সারস্বত-জ্যোতির মধ্যে তাঁহার অবস্থান বলিয়া তিনি কিরণ-মণ্ডলে জ্যোতির্ময়ী, আবার সৌন্দর্যরূপে বিশ্বে মিশাইয়া থাকেন বলিয়া ইনি সৌন্দর্যলক্ষ্মী, তথা স্বরূপসী। প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রে কবিকে সাধক-ঋষি বলা হয়, তাঁহারা ভূতভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা, মনীষী, সুতরাং এই হিসাবে যোগীও। কবি যাঁহাকে কাব্যসৃষ্টির জন্য ধ্যান করেন, তিনিই আবার পরাশক্তি, বিশ্বসৃষ্টির মূল কারণ প্রথম আদিশক্তি, তাই তিনি যোগীর ধ্যানের ধন। এই জ্ঞানচৈতন্য ও সৌন্দর্যরূপিণী, কান্তিময়ী সারদাকেই আলোচ্য ছত্রে বিহারীলাল বাল্মীকির ললাটে আবির্ভূতা দেখাইয়াছেন।

কবির আরাধ্যা দেবীকে যোগীর ধ্যানরূপের সহিত একীভূত করিয়া বিহারীলাল কাব্যতত্ত্বের সহিত আধ্যাত্মিকতা তত্ত্ব যোগ করিয়াছেন। যিনি কবির নিকট বাগ্‌দেবী তিনিই সাধকের নিকট সৃষ্টির আদ্যাশক্তি। বিহারীলাল অন্যত্র বলিয়াছেন,

> কবিরা দেখেছে তারে নেশার নয়নে,
> যোগীরা দেখেছে তারে যোগের আসনে।

একবার সে·····বীণা বিষাদিনী—ভূমিকাসূত্র পূর্ববৎ।

করুণাপ্লুতচিত্ত বাল্মীকির ললাটদেশ হইতে দিব্য জ্যোতিঃপুঞ্জের দীপ্তি-রাশির সহিত নানাভাবময়ী সারদামূর্তির আবির্ভাব ঘটিল তারপর ব্যাধবাণহত ক্রৌঞ্চের জন্য ক্রৌঞ্চীর বিলাপ শ্রবণ করিয়া দেবী একবার বাল্মীকি ও একবার মৃতপক্ষী পরিক্রমণকারিণী পক্ষীর দিকে চাহিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তরও করুণায় বিগলিত হইল, হাস্য-রোষ প্রভৃতি ভাবের বদলে তাঁহার সমগ্র আবির্ভাবই বিষণ্ণতায় বিবশ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। সেই ব্যাকুলতায় তাঁহার বীণা বাজিয়া উঠিল, অতি সকরুণ স্বরে তিনি বিষাদ-গীতি গাহিতে লাগিলেন। একদিকে বহির্জগতের শোক, অন্যদিকে অন্তর্জগতে তাহার আলোড়ন, ইহারই ফলে চিন্তানুভূত শোক সংগীত হইয়া ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল।

বাল্মীকির মানস-কন্যা, তাঁহার ললাটদেশ হইতে আবির্ভূতা সারদাই আবার বিশ্বপ্রকাশিনী, সৌন্দর্যময়ী, অখিল ব্রহ্মাণ্ডে তিনিই চৈতন্য ও কান্তিরূপে সংস্থিতা। বাল্মীকির চিত্তে যখন তিনি ছিলেন তখন বাল্মীকির প্রতিভার উন্মেষ ঘটে নাই। এখন অন্তরের জ্যোতির্ময়ী সারদা বাহিরে আসিয়া কবিচিত্তের সহিত বিশ্বের সৌন্দর্যের যোগ সাধন করিলেন।

নিরখি নন্দিনীচ্ছবি……উথলিয়া যায়—ভূমিকাস্থত্রে পূর্ববৎ।

তীরবিদ্ধ বিহঙ্গের মৃত্যু ও সহচরীর বিলাপ গাথায় বাল্মীকির চিত্তে করুণার প্রবাহ বহিল এবং তাঁহার ললাটদেশ হইতে জ্যোতিঃপুঞ্জ নির্গত হইল। সেই প্রদীপ্ত আলোকশিখার মধ্য দিয়া অবতীর্ণ হইলেন বিশ্বের আনন্দময়ী, কবির সারস্বতসাধনার অধিষ্ঠাত্রী চৈতন্যময়ী কান্তিময়ী ও সৌন্দর্যময়ী সারদা বা সরস্বতী। বিরহিণী ক্রৌঞ্চীর আর্তবিলাপে দেবীও করুণাবিগলিত হৃদয়ে বীণায় বিষাদ-সংগীতের ঝঙ্কার তুলিলেন, সেই শোক-বিলাপে আরণ্যক তরুলতা ও নদী পর্যন্ত আপ্লুত হইয়া গেল। বাল্মীকি ক্রৌঞ্চের মৃত্যুর বেদনায় একটি মাত্র শ্লোক দৈবাৎ উচ্চারণ করিয়াছিলেন। এখন স্বয়ং কাব্যলক্ষ্মীর আবির্ভাব ও বীণাঝঙ্কারে এক বিপুলায়তন শোক-কাব্যের সম্ভাবনা জাগিল। এই জ্যোতির্ময়ী স্বরূপসী কন্যা বাল্মীকিরই ধ্যানরূপ, কবির অন্তরলোকের সামগ্রী, তাই সারদাকে কবির মানস-কন্যা বলা যায়। মানস-কন্যা মূর্তিময়ী হইয়াছেন, অর্থাৎ বাল্মীকি এখন কবিত্ব-শক্তির অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহার অন্তরে করুণার তরঙ্গ উদ্বেল হইয়াছে তাই সৃষ্টি প্রেরণায় তিনি পুলকবিহ্বল হইয়াছেন।

কাব্যের উপলক্ষ শোক হইলেও শেষ পর্যন্ত কাব্য আনন্দদান করে, কারণ কাব্যে সমর্পিত শোক অলৌকিক বলিয়া তাহা পার্থিব দুঃখপ্রদায়ী নয়। তাই কবির সাধনা যখন সিদ্ধ হয়, যখন অন্তরস্থিত কাব্যলক্ষ্মীর বা প্রেরণার উদ্বোধন ঘটে, তখন কবি পুলকবিহ্বল গদগদ হন। তখন তিনি বাণীর বিদ্যুদ্দীপ্ত ছন্দোবাণ-বিদ্ধ, তখন 'অলৌকিক আনন্দের ভার' বহন করিয়া 'রক্তবেগতরঙ্গিত' বক্ষে বিচরণ করেন।

প্রশ্ন ১। বিহারীলাল চক্রবর্তী তাঁহার আদিকবি কবিতায় আদি-কবি কাহাকে বলিয়াছেন এবং কেন, বুঝাইয়া দাও।—[ভূমিকা ও আলোচনা দ্রষ্টব্য]

প্রশ্ন ২। বিহারীলাল বাল্মীকির নিকট আবির্ভূতা সারদাকে করুণা-রূপিণী করিয়াছেন কেন? 'যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে' এইরূপ মন্তব্যের তাৎপর্য কী, নিজের ভাষায় লিখ।—[ভূমিকা ও আলোচনা দ্রষ্টব্য]

প্রশ্ন ৩। বাল্মীকির কবিত্বলাভের রামায়ণোক্ত কাহিনী গ্রহণ করিলেও বিহারীলাল তাঁহাকে আধুনিক মনোভাবের উপযোগী করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রামায়ণ-কাহিনীর সহিত তুলনাসূত্রে এই উক্তিটি বিচার কর।—[ভূমিকা ও আলোচনা দ্রষ্টব্য]

জীবন-মরীচিকা : হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকা

মধুসূদনের পর বাঙলা কাব্যের ক্ষেত্রে যশ সম্মান ও সৌভাগ্য আদায় করিয়াছিলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার কথা ছিল প্রচুর, কণ্ঠ ছিল গম্ভীর, সুতরাং বঙ্গীয় পাঠক তাঁহাকে অবহেলা করিতে পারে নাই। তাঁহার কবিতা শুনিয়াছে পড়িয়াছে ও মুখস্থ করিয়াছে, কিন্তু তাহাতে গভীর কিছু নাই বলিয়া সহজেই ভুলিয়া গিয়াছে। হেমচন্দ্রের অনুকরণস্থল মধুসূদন, অথচ মধুসূদনের প্রতিভার কণামাত্র তাঁহার ছিল না। মধুসূদনের মতই তিনি খণ্ড ও দীর্ঘ কবিতা লিখিয়াছেন, আখ্যান রচনা করিয়াছেন, অমিত্রাক্ষর ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যের মধ্যে চিন্তা-তরঙ্গিণী, বীরবাহু কাব্য, আশাকানন, ছায়াময়ী, দশমহাবিদ্যা—এইগুলিতে সামান্য আখ্যানের আভাস আছে। মেঘনাদবধ কাব্যের অনুকরণে রচিত, হেমচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা, বৃত্রসংহার মহাকাব্য হিসাবে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। এই কাব্যে দেবতাদের স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করার এবং শচীহরণের জন্য বৃত্র দধীচির অস্থিনির্মিত বজ্রের দ্বারা নিহত হইয়াছে। এই পাপের পরাজয় ও পুণ্যের জয়ের নৈতিক বিধানের দ্বারা হেমচন্দ্র মেঘনাদবধে রাবণের শক্তিবৃদ্ধির প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন।

কবি-পরিচয়

কাব্য পরিচয়

বৃত্রসংহারের কবি

হেমচন্দ্র প্রচুর খণ্ড কবিতা লিখিয়াছিলেন এবং এইগুলির ভিতর দিয়াই তাঁহার কবিত্বের যোগ্যতা ও লোকপ্রিয়তার পরীক্ষা ঘটিয়াছে। স্বদেশপ্রেম, তত্ত্বকথা, ঈশ্বরচিন্তা, প্রকৃতি, প্রেম, ব্যঙ্গবিদ্রূপ, সমকালীন ঘটনা—নানা বিষয় অবলম্বনে হেমচন্দ্র গীতিকবিতা রচনা করিয়াছেন। ইহাদের ভিতর উচ্চাঙ্গের কবিত্ব অথবা গভীর মননশীলতা না থাকিলেও সাধারণ পাঠককে উত্তেজিত ও বিমুগ্ধ করার উপযোগী ছিল। বিশেষ করিয়া শোণিতসঞ্চারী দেশগৌরব

খণ্ড কবিতায় তাঁহার সাফল্য

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের উত্তরাধিকার

প্রচারে ও পরিদৃশ্যমান জীবনের অসংগতির প্রতি সূচীমুখ বিদ্রূপনিক্ষেপে হেমচন্দ্র কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিলেন। মানসিক দিক হইতে মধুসূদন অপেক্ষা তাঁহার প্রবণতা ছিল ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের দিকে। তাঁহার সাময়িক ঘটনাসচেতনতা, বিদ্রূপ-পরায়ণতা, তথ্যনিষ্ঠা, বক্তৃতাপ্রবণতা এইগুলি গুপ্ত-ধনপ্রাপ্তিমাত্র। গ্রে, বাইরন, পোপ, ড্রাইডেনের প্রতিও তাঁহার পক্ষপাত ছিল। ইংরাজি ওড-জাতীয় কবিতায় তিনি দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন।

নাম সার্থকতা

জীবন-মরীচিকা হেমচন্দ্রের একটি পরিচিত এবং একদা-জনপ্রিয় খণ্ড কবিতা। ব্যক্তিগত জীবনের বিষাদচেতনায়, কবিআত্মার অন্তর্মুখী অবসাদচিন্তায়, স্বগতভাষণে ও চিন্ময় অনুভূতির আবেগোচ্ছ্বসিত প্রকাশে ইহা একটি গীতিকবিতার সুষমা লাভ করিয়াছে। ব্যক্তি-জীবনের বিষণ্ণতার বেদনাই আলোচ্য কবিতার বিষয়বস্তু। আশাকল্পনাবিজড়িত মানবজীবনের ব্যর্থতার পরিণামে কবিচিত্তে যে সুগভীর নৈরাশ্য ও অনুতাপ সঞ্চিত হইয়াছে, তাহাই দীর্ঘশ্বাস-করুণ ছন্দে প্রকাশিত হইয়াছে। মরীচিকা যেমন তৃষ্ণার্ত মরুপথিকের নিকট প্রথমে কুহক ও পরে ভ্রান্তিসঞ্চার করে, জীবনও সেইরূপ কবির নিকট যৌবনে রোমাঞ্চ ও স্বপ্নসম্ভব কল্পনার সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু যে-কোনও কারণেই হোক, তাহা অপনোদিত হইয়াছে বলিয়া জীবনের মরীচিকাত্ব বিষয়ে কবি নিঃসংশয় হইয়াছেন। নামকরণ এইদিক দিয়া সার্থক বলা যায়।

বাঙলা কবিতায় বিষাদচেতনা ও আত্মনিষ্ঠ তত্ত্ববাদের প্রবর্তক সম্ভবত ঊনিশ শতকীয় বাঙলা কাব্যের প্রথম কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। বিষাদ

ও নৈরাশ্য আধুনিক মানবের একটি মৌলিক এবং প্রায় অপরিহার্য অনুভূতি। সভ্যতা একালের মানুষকে যেমন আলোকদীক্ষিত করিয়াছে, শিক্ষানুশীলিত করিয়াছে, তেমনি মানুষের আত্মস্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিতান্ত্রিকতা, স্বাধীনতাপ্রিয়তা বর্ধিত করিয়াছে। গুহাহিত মানুষ উন্মুক্ত আকাশের তলে আসিয়া দাঁড়াইতে শিখিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, সে জগৎ জয় করিবার দুঃসাহসও পোষণ করিয়াছে।

বাংলা কবিতায় বিষাদচেতনা

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ মানুষের হৃদয়ে অপরিতৃপ্ত ক্ষুধা, অপ্রতিবিধেয় আকাঙ্ক্ষা, অপরিশোধনীয় জিগীষা জাগাইয়াছে বটে, কিন্তু বাস্তব জগতে তাহার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটাইবার ব্যবস্থা করে নাই। ফলে একালের বুদ্ধিজীবী মানুষের জীবনে কেবলই ইচ্ছার সঙ্গে বাস্তবের অসংগতি, উপায় ও অবস্থার বৈপরীত্য, দুরন্ত আশা ও দুর্বল শক্তির সংঘর্ষ। আর এই কারণেই শিল্পে-সাহিত্যে শেষ পর্যন্ত একটি পরাজয়ের করুণ বিলাপ, আশাভঙ্গের ব্যর্থ আর্তনাদ। মহাকাব্যে ইহারই নাম দুর্জ্ঞেয় নিয়তি—যাহার বিরুদ্ধে রাবণের দুর্নিবার আক্ষেপ। গীতিকবিতায় ইহারই নাম আত্মবিলাপ, নাটকে ইহারই নাম ট্রাজেডি।

আধুনিক মনের নৈরাশ্যবাদের কারণ

এই আত্মবিলাপ সাধারণত দুই জাতের দেখা যায়। একজাতীয় কবিতায় কবি তাঁহার প্রাক্তন জীবনের ধনজনসম্ভোগহেতু ঈশ্বরবিমুখতার জন্য প্রৌঢ় সীমায় আসিয়া সহসা পারলৌকিক চিন্তায় গভীর বিষাদে নিমগ্ন হন। এই জাতীয় পারত্রিকচৈতন্য ও প্রাক্তন সুখ ভোগের জন্য আত্মানুতাপ ধর্মের দিক হইতে সহনীয় হইলেও কাব্যের দিক দিয়া গতানুগতিক। বিদ্যাপতি হইতে রামমোহন এই জাতীয় পদ লিখিয়াছেন। যথার্থ আত্মবিলাপ ঈশ্বরবিস্মৃতির জন্য নয়, জীবন সম্পর্কে মোহভঙ্গের জন্য অথবা জীবনের মর্মরস-প্রাপ্তির পূর্বেই দিনগুলি রাতগুলি যে দ্রুত নিঃশেষ হইয়া গেল, এই সত্যোপলব্ধির জন্য। হেমচন্দ্রের জীবন-মরীচিকা দ্বিতীয় জাতের আত্মবিলাপ। ঈশ্বরগুপ্ত তাঁহার আত্মবিলাপে বলিয়াছেন,

ঈশ্বর বিমুখতার জন্য আত্মবিলাপ

মোহভঙ্গের ও আশা-ভ্রষ্টতার আত্মবিলাপ

আমার আত্মীয় কই আত্মার আত্মীয় কই,
আত্মার আত্মীয় নই, আত্মা কই কার রে।

ইন্দ্রিয় যাহার বশ, ছোটে যশ দিক দশ,
পরম পীযূষ-রস সুখে সেই খায় রে ॥

ইহা এক ধরনের পারমার্থিক চিন্তাপ্রসূত। মধুসূদনের আত্মবিলাপ দ্রুত বিলীয়মান জাগতিক সুখের স্বপ্নবৎ অসম্পূর্ণতা ও আশাভঙ্গের দুঃখোৎসারিত,

রে প্রমত্ত মন মম! কবে পোহাইবে রাতি?
জাগিবি রে কবে?
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুম ভাতি
কত দিন রবে?
নীরবিন্দু দূর্বাদলে, নিত্য কি রে ঝলমলে?
কে না জানে অম্বু-বিম্ব অম্বু-মুখে সদ্যঃপাতী?

ভাবার্থ

জীবন সম্পর্কে বীতস্পৃহ কবি জীবনের আশাবসানে ও মোহভঙ্গে অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিতেছেন, জীবন যে ভ্রান্তিমাত্র ইহা পূবে জানা থাকিলে তিনি জীবন-আসক্তি প্রকাশ করিতেন না।

মর্মসংক্ষেপ

প্রভাতে সূর্যোদয়কালে যেরূপ অস্পষ্ট কুয়াশার মধ্য দিয়া বসুন্ধরা মনোমোহন হইয়া উঠে, প্রফুল্ল কুসুমসুবাসে চতুর্দিক আমোদিত হয় এবং বিহঙ্গ কাকলিতে পূর্ণ হয়, সেইরূপ জীবনের শৈশবে মন মায়াগ্রস্ত হয়, লুব্ধ আশা আত্মাকে আচ্ছন্ন করিয়া তোলে। তখন মনে হয়, বসুন্ধরা বীরভোগ্যা, ইহাই বস্তুময় জগতের সংগীত, সুরভিত মুঞ্জরিত সংসার মধুময় বোধ হয়। কিন্তু মধ্যাহ্নে প্রচণ্ড সূর্যকিরণে পৃথিবীর কুহেলির অবসান ঘটে। গন্ধ, সুধা, বিহঙ্গ-কাকলি ও সমীরের অন্তর্ধানের মত জীবনের দ্বিপ্রহরেও যৌবনের সুখস্বপ্ন অপসৃত হয়, হৃদয়বাসনা অপগত হয়। কল্পনার স্বর্ণ-মেঘ ও চকিতবিদ্যুৎ-রেখা বিলীন হয়। জীবনের কঠিন আঘাত-সংঘাতের মধ্যে শৈশবের রঙিন আকাঙ্ক্ষাগুলি জীর্ণ হইয়া ভগ্নদুর্গ-প্রাকারে ছিন্ন পতাকার মত পড়িয়া থাকে।

আলোচনা

হেমচন্দ্রের জীবন-মরীচিকা কবিতায় মধুসূদনের আত্মবিলাপের প্রভাব সুস্পষ্ট। তবে মধুসূদনের আত্মবিলাপ কবিজীবনের, হেমচন্দ্রের আত্মবিলাপ ব্যক্তিজীবনের। খ্যাতি অর্থ যশ প্রেম, কবিজীবনের বাঁকে বাঁকে কত কুহকিনী আশা মধুসূদনকে বিভ্রান্ত করিয়াছে, কিন্তু এক নিঃসঙ্গ মুহূর্তে কবি অনুভব

করিতেছেন, আশানুরূপ কিছুই তিনি পান নাই। সম্ভবত কেহ পাইতেও পারে না—তথাপি আশার কুহক-ছলে মানুষ জীবনের অমূল্য মুক্তাগর্ভ সময় হারাইতেছে, ইহাই উক্ত কবিতার অভীষ্ট। কিন্তু হেমচন্দ্র কৈশোর-যৌবনের সীমা অতিক্রম করিয়া সহসা জীবনকে কেন মরীচিকা বলিয়া মনে করিতেছেন, তাহার কোনো সংগত কারণ এখানে ব্যাখ্যা করা হয় নাই। কবি শেষ বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছিলেন, কিন্তু এখানে দৃষ্টিহীনতার আক্ষেপও স্পষ্ট নয়। এই অকারণ দুর্জ্ঞেয় নৈরাশ্যই কবিতাকে বিলাপসর্বস্ব করিয়াছে কিন্তু রসগ্রাহী করিতে পারে নাই। নবীনচন্দ্রের 'ধন্য আশা কুহকিনী' কবিতাটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

জীবন-মরীচিকা কবিতায় হেমচন্দ্র জীবনকে মরীচিকার সহিত অভিন্ন করিয়া দেখিয়াছেন, ইহাও মধুসূদনের কবিতারই স্মারক। আত্মবিলাপের তৃতীয় স্তবকে আছে,

নিশার স্বপন-সুখে সুখী যে কী সুখ তার ?
জাগে সে কাঁদিতে।
ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার
পথিকে ধাঁধিতে।
মরীচিকা মরুদেশে, নাশে প্রাণ তৃষাক্লেশে
এ তিনের ছল সম ছল রে এ কু-আশার।

আবার কবিতার ছন্দ, চরণান্ত অনুপ্রাস-ব্যবহার এবং শব্দপ্রবণতা বিশেষভাবে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আত্মবিলাপের অনুরূপ। ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়াছেন,

না বুঝিলে সারমর্ম হায় হায় হায় রে।
কে আমার আমি কার আমার কে আছে আর,
যত দেখ আপনার ভ্রমমাত্র তায় রে॥

ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহার কবিতার প্রতি চরণের শেষে 'রে' যোগে মিল দিয়াছেন। [যেমন, হায় রে, তায় রে, ধায় রে, খায় রে, নাচায় রে ইত্যাদি] আর হেমচন্দ্রের প্রতি চরণের শেষে মিলও হুবহু তাহারই অনুরূপ [যথা, আঁধারে, আকারে, প্রকারে, আস্বারে, প্রহারে, সঞ্চারে ইত্যাদি]।

ইংরাজিতে যাহাকে এলেজি-জাতীয় কবিতা বলে, জীবন-মরীচিকা তাহারই বাঙলা-সংস্করণ। জীবনের মধ্যে এক প্রকার দুর্জ্ঞেয় নৈরাশ্যবোধ আবিষ্কারই

এই কবিতায় লক্ষ্য, কিন্তু রোমান্টিক কবিদের বিষাদচেতনার সহিত ইহা অভিন্ন নয়। হেমচন্দ্র জীবনের রূপ পরিবর্তনে হতাশ হইয়াছেন মাত্র। কিন্তু রোমান্টিক কবিদের নিকট সমগ্র জীবন মরীচিকাবৎ নয়। জীবনে যে সুদূর-সন্ধানী সৌন্দর্যের রহস্যলোক উন্মোচিত হয় না, প্রেম যে এখানে জন্ম-জন্মান্তরের অনন্ত বেদনায় উদ্‌ঘাটিত হয় না, সীমার সহিত যে এখানে অসীমের পরিণয় সম্পন্ন হইতে পারিতেছে না, ইহাই যেন তাহাদের আক্ষেপ। তাই তাহাদের কামনা একটি সুন্দরতর সম্পূর্ণতর পৃথিবীর জন্য, যেখানে তাহাদের দুর্লভ কামনার পরিপূর্তি, অসীম সৌন্দর্যের পরিতৃপ্তি। কিন্তু তাহার অসম্ভাব্যতাই তাহাদের নৈরাশ্য। বলা বাহুল্য, বিহারীলালের পূর্বে হেমচন্দ্র এই জাতীয় নৈরাশ্য ফুটাইতে পারেন নাই। জীবনের মরীচিকা ও ইহার অসারতা হেমচন্দ্রের নিকট বিদ্যুৎবেগে, অনুভূতির চকিতকিরণে উদ্‌ভাসিত হয় নাই। ইহা দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা-নিকষ সংবাদ মাত্র। তাই ইহাতে বৈচিত্র্য নাই, বিস্ময় নাই। এইজন্য জীবন-মরীচিকা একখানি প্রথম শ্রেণীর গীতিকবিতা হইতে পারে নাই।

রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ—

[প্রথম স্তবক] **জীবন ··জানিত রে**—পরিণত অভিজ্ঞতায় সংসারের ব্যর্থতায় পর্যুদস্ত হইয়া কবির নিকট সমগ্র জীবনের অর্থহীনতা ও অসারতা প্রতিপন্ন হইয়াছে বলিয়া আক্ষেপের সুরে তিনি বলিতেছেন যে, জীবন এমন মিথ্যা, ভ্রান্তিপূর্ণ ও ব্যর্থতাগ্রস্ত, তাহা আগে কবির জানা ছিল না। জীবন সম্পর্কে তরুণ বয়সে সকলেই আশাবাদী থাকে, প্রৌঢ় অভিজ্ঞতায় যখন আশা নিরাশায় পরিণত হয়, তখন জীবনকে ভ্রমাত্মক মনে হয়। আত্মবিলাপ কবিতায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তও জীবনকে ভ্রম বলিয়াছেন। তুলনীয়,

কেমন তোমার ভ্রম মিছামিছি কেন ভ্রম
করিছ যে পরিক্রম ফল নাহি তায় রে।

ছুঁয়ে এত···যাচিত রে—কৈশোর বয়সে জীবনের অনন্ত সম্ভাবনা সম্মুখে প্রসারিত বলিয়া আমরা উদীয়মান দৃষ্টিতে জীবন সম্পর্কে কল্পনা পোষণ করি; জীবন আমাদের নিকট নিমন্ত্রণের চিঠি মেলিয়া ধরে। কিন্তু জীবন যে শেষ পর্যন্ত মিথ্যা ও অসার এই কঠিন বাস্তব বেদনাহত অভিজ্ঞতা যদি পূর্বে ঘটিত তবে কি কবি জীবন সম্পর্কে মোহগ্রস্ত ও ব্যগ্র হইয়া জীবনকে যাজ্ঞা

করিতেন ! এই একটি ছত্রে কবির স্থচিরস্থায়ী আশা যে সহসা ভাঙিয়া গিয়াছে তাহার আর্তনাদ অনুভব করা যায়। **প্রভাতে…আঁধারে**—রাত্রি অবসানে দিবালোকের অভ্যুদয় একটি অস্বচ্ছ কুয়াশার আবরণের ন্যায় বিরাজ করে ; তাহারই মধ্য দিয়া সূর্যোদয়ের সহিত পৃথিবী সদ্য প্রস্ফুটিত পুষ্পের মত বিকশিত হইয়া উঠে। **বারিদ**—জল দান করে যে, মেঘ। **ভূধর**—পর্বত। **বিতরে**—বিতরণ করে। **বারিদ…আকারে**—প্রভাতে সূর্যালোকের মৃদু সূচনায় বিশ্বপ্রকৃতি—আকাশের মেঘমালা, দূরস্থিত পর্বত, নৈসর্গিক দৃশ্যাদি ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠে, যেন সেইগুলি কোনো পদার্থ গাত্রে প্রতিফলিত ছায়া-ছবির মত বিচিত্র সৌন্দর্য বিতরণ করিতেছে। অর্থাৎ অন্ধকারের মধ্য হইতে ফুটিয়া-ওঠা বিশ্বসংসারের ছবিগুলি যেন সত্য নয়, কোনো যাদুকরের প্রদর্শিত স্বপ্নবৎ আলেখ্য চিত্র। **ছায়াবাজি**—শব্দটি এখানে অবাস্তব চিত্র অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। শব্দটি সুপ্রযুক্ত হয় নাই। **কুসুমিত তরুচয়**—পুষ্পিত বৃক্ষসকল, প্রভাতে সূর্যোদয়ের সহিত ফুল ফুটিয়া উঠে, ইহাই কবির বক্তব্য। **ঘ্রাণে…সঞ্চারে**—প্রভাতে পুষ্পিত ফুলের গন্ধে বাতাস যেন মুগ্ধ হইয়া মন্দ মন্দ প্রবাহিত হয়। **কুলায়ে**—পক্ষীর নীড়ে। **প্রেমানন্দে অনর্গল**—অবিশ্রাম প্রণয় সম্ভাষণে ; প্রভাতে বিহঙ্গ সকল ডাকিতে থাকে।

সেইরূপ…আস্বারে—প্রভাতে যেইরূপ অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্য দিয়া আলোকাভাসে বিশ্বপ্রকৃতি স্বপ্নবৎ বোধ হয়, সেইরূপ, জীবনের প্রভাত-সূচনায় তথা বাল্যকালে ভবিষ্যৎ জীবনের নানা স্বপ্নকল্পনা, অস্পষ্ট-দৃশ্যমান সংসার, নানাবিধ ছলনার দ্বারা, বহু মুগ্ধ আকাঙ্ক্ষা দিয়া চিত্তকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। [লুব্ধ আশা শব্দ প্রয়োগ সুষ্ঠু হয় নাই]। **পৃথিবী-ললামভূত**—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। ললাম শব্দের অর্থ অলংকার, ললাটের ভূষণ, ধ্বজা ; ললাম বিশেষণে শ্রেষ্ঠ বুঝায়। **পৃথিবী…পরিপ্লুত**—অর্থাৎ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ নিত্য সুখে বিরাজমান, এক কথায় বসুন্ধরা বীরভোগ্যা [ইহাও অসার্থক প্রয়োগ ; পৃথিবী-ললামভূত—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, এই অর্থে বাণভট্টের কাদম্বরীতে প্রয়োগ আছে]। **পঞ্চভূত-মাঝারে**—অর্থাৎ রূপ-রসশব্দস্পর্শগন্ধময় পৃথিবীতে। **ব্রহ্মাণ্ড-সংসারে**—এই বিশ্বজগৎকে প্রত্যূষকালে গন্ধময় কুসুমিত উপবনসদৃশ বোধ হয়, মনে হয় অনন্ত জগতের সকল কিছুই আনন্দময়, মধুর।

[দ্বিতীয় স্তবক] **মধ্যাহ্নে···ঝঙ্কারে**—দ্বিপ্রহরে সূর্যের প্রখর কিরণে যেরূপ প্রভাতীয় মাধুর্য অপহৃত হয়, অস্পষ্ট কুয়াশা কাটিয়া যায়, পুষ্পসৌরভ মিলাইয়া যায়, বাতাস স্তব্ধ হয় ও পক্ষীর কাকলি বন্ধ হয়। **শৈশব যৌবন গন্ধ**—প্রভাতের পর মধ্যাহ্ন যেমন সকালের মাধুর্য অপহরণ করে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ শৈশব-যৌবনের মধুর কল্পনা ও আশা তিরোহিত হয়। **মনোগত···চিত্তবিকারে**—জীবনের দ্বিপ্রহর-সমাগমে শৈশব-যৌবনের রঙিন স্বপ্নকল্পনা অপগত হয়, অল্পবয়সের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও হৃদয়ের অস্ফুট ইচ্ছা সকল ভাঙিয়া পড়ে, তখন চিত্তের বিকার দেখা দেয়। **সুবর্ণ মেঘের···বিহারে**—জীবনের মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইলে শৈশব-যৌবনের মানসিক আশা ও কল্পনা অপসৃত হয়; দ্বিপ্রহরের সূর্যের প্রচণ্ড কিরণে যেমন প্রভাতবেলার স্বর্ণমণ্ডিত মেঘমালা ও বিদ্যুচ্চমক বিলীন হইয়া যায়। [সুবর্ণ মেঘমালার সহিত সৌদামিনী তথা বিদ্যুতের অবস্থান নিত্য নয়, সুতরাং এইরূপ উপমা কষ্টকল্পিত]। **ছিন্ন তুষারের···প্রহারে**—তুষারাবৃত পর্বত শৃঙ্গে যখন প্রচণ্ড রৌদ্রতপ্ত হিমবাত ও ঝড়ের প্রকোপ দেখা দেয়, তখন তুষাররাশি চতুর্দিকে ছিন্নভিন্ন হইয়া উড়িয়া পড়ে; জীবনের অভিজ্ঞতা ও বয়োবৃদ্ধির উত্তপ্ত ঝড়ে শৈশবের আশা-আকাঙ্ক্ষার তুষারও ছিন্নভিন্ন হইয়া উড়িয়া যায় [ইহাও সৌন্দর্যবর্ধক কল্পনা নয়]। **পড়ে থাকে···প্রাকারে**—শত্রুসৈন্য যখন দুর্গ আক্রমণ করিয়া দুর্গস্থ সৈন্যদের পরাস্ত করে তখন পরপক্ষের পতাকা ভগ্নদুর্গের প্রাচীরের নিম্নে অবহেলিত ও ছিন্ন হইয়া লুটাইয়া থাকে; সেইরূপ প্রৌঢ় অভিজ্ঞতার আবির্ভাবে জীবনের শৈশবকল্পনা ও বাসনাসকলও অবহেলিত হইয়া লুটাইয়া পড়ে।

ব্যাখ্যা—

প্রভাতে অরুণোদয়······আস্তারে—[রূপতত্ত্ব বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]।

ছিন্ন তুষারের···ভগ্নদুর্গ-প্রাকারে—ছত্রচতুষ্টয় হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন-মরীচিকা নামক গীতিকবিতার সমাপ্তি অংশ। বক্ষ্যমাণ অংশে কবি জীবনমধ্যাহ্নের রবিকিরণদীপ্ত রসহীন তপ্ত অভিজ্ঞতার আবির্ভাবে শৈশব-যৌবনের মধুর স্বপ্নকল্পনা ও রঙিন আশাআকাঙ্ক্ষার ত্বরিত অবসানের বেদনা প্রকাশ করিয়াছেন। শৈশবে মানুষ জীবনকে রমণীয় কাম্য ও আকাঙ্ক্ষিত

মনে করে, ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন রচনা করে। শৈশব যৌবনের এই সকল মদির বাসনা ও মুগ্ধ আশাগুলি যেন তুষারের উজ্জ্বল শুভ্র পর্বতশৃঙ্গ, কঠিন দুর্গ-প্রাকারের উপর উড্ডীন পতাকা। কিন্তু মানুষের এই সাধ অচিরেই বিলীন হয়। মধ্যাহ্নের আগমনে জীবনের রূপপ্রকৃতির পরিবর্তন হয়। উত্তপ্ত রৌদ্রতাপে হিমবাহের সৃষ্টি হয় এবং ঝড়ের প্রচণ্ড আঘাতে পর্বতের তুষার ছিন্নভিন্ন হইয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। সেইরূপ জীবনের নানা তিক্ত অভিজ্ঞতা ও অভাবিতপূর্ব দুঃখের তাপে শৈশবের উজ্জ্বল স্বপ্নগুলি ছিন্ন হইয়া ছড়াইয়া পড়ে। শত্রুসৈন্য দুর্গ চূর্ণ করিয়া পাচীল ভাঙ্গিয়া পতাকা ছিন্ন করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দেয়। জীবনেও সেইরূপ বিপরীত অভিজ্ঞতার কঠিন পরাক্রমে ছোটবেলার উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলি ভূমিতে অবলুণ্ঠিত হইয়া পড়ে।

প্রশ্ন ১। জীবন-মরীচিকা কবিতায় জীবনকে কবি মরীচিকা বলিয়াছেন কেন? কবির এই নৈরাশ্যবাদের কারণ কী বুঝাইয়া দাও—[ভূমিকা ও আলোচনা দ্রষ্টব্য]।

দিবাবসানে : রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকা

বয়সে মধুসূদন অপেক্ষা কয়েক বৎসরের কনিষ্ঠ হইলেও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যের ইতিহাসে মধুসূদনের পুরোগামী, মধুসূদন-বাদিত বঙ্গসংগীতের বাদ্যযন্ত্র তাঁহারই হস্তে প্রথম নির্মিত হইয়াছিল।

কবিপরিচয়

তিনিই সর্বপ্রথম ইংরাজি সাহিত্যের সহিত সৃজ্যমান বাঙলা কাব্যের পরিণয় সম্পর্ক স্থাপন করেন। তাঁহারই হাতে একালের প্রথম বাঙলা কাব্য 'পদ্মিনী উপাখ্যান' রচিত হয়। রঙ্গলালের ইতিহাস-প্রীতি, স্বাজাত্যবোধ, মাতৃভাষার প্রতি গভীরতম মমতা, সংস্কৃতের প্রতি শ্রদ্ধা, ইংরাজী ভাষাও সাহিত্যের সহিত আত্মিক পরিচয়ের ফলে ইংরাজি ঐতিহ্য গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা, ভৌগোলিক চেতনা, সাংবাদিকতা—এসবই একবাক্যে নবজাগৃতির

নিঃসংশয়িত লক্ষণ। পদ্মিনী উপাখ্যান কাব্যে রঙ্গলাল টডের রাজস্থান হইতে বীরত্বব্যঞ্জক স্বদেশপ্রীত্যাত্মক কাহিনী অবলম্বনে আখ্যানসৃষ্টির যে বিচিত্র নজির স্থাপন করিয়াছিলেন, পরবর্তী অর্ধশতাব্দীর স্বনামধন্য সারস্বততীর্থযাত্রী তাঁহারই অনুকরণ করিয়াছেন, মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল পর্যন্ত। পদ্মিনী উপাখ্যানের 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়' বাঙলার প্রথম বন্দে মাতরম। সংবাদ প্রভাকর, রহস্যসন্দর্ভ, এডুকেশন গেজেট, সাপ্তাহিক বার্তাবহ প্রভৃতি সাময়িক পত্রের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ তাঁহার চিত্ত ও কবিমানসকে সমাজসচেতন, রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন, তথ্যনিষ্ঠ ও সত্যপ্রিয় করিয়াছিল। ঐতিহাসিক গবেষণা ও যুক্তিমূলক পরিচ্ছন্ন নৈয়ায়িক প্রবন্ধ রচনায় তাঁহার পারদর্শিতা ছিল। হোমার হইতে কালিদাস, এই উভয় প্রত্ন-ভাষার কবির কাব্যানুবাদে তাঁহার কুশলতা বিস্ময়কর। স্কট মুর বায়রণের প্রভাব তাঁহার কাব্যগ্রন্থাবলীতে বহুশ্রুত। পদ্মিনী উপাখ্যান, কর্মদেবী, শূরসুন্দরী, কাঞ্চীকাবেরী তাঁহার মৌলিক কাব্যগ্রন্থ। হোমারের নামে প্রচলিত একখানি অপ্রধান কাব্য ভেকমূষিকের যুদ্ধ ও কুমারসম্ভব তাঁহার অনুবাদকৃতি, এতদ্ভিন্ন অনেকগুলি উদ্ভট নীতিকবিতারও অনুবাদ করিয়াছিলেন, সমকালীন পত্রপত্রিকায় ইংরাজি কবিতার অনুবাদ আরও একাধিক আছে, উড়িয়া ও ফারসী হইতেও তিনি বহু কবিতার অনুবাদ করেন।

১৮৬১ সালে প্যারীমোহন সেনগুপ্ত এবং ১৮৭২ সালে রঙ্গলাল কুমারসম্ভবের অনুবাদ করেন। দিবাবসানে কবিতাটি [নামকরণ সংকলনকারের] রঙ্গলালের কুমারসম্ভব অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত [অষ্টম সর্গ]। সন্ধ্যার বর্ণনা অংশটির বিষয় এবং মূল কাব্যের অষ্টম সর্গের সহিত ইহার প্রসঙ্গসূত্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয় বলিয়া নিসর্গ কবিতারূপেই ইহা পঠনীয়, এইজন্য নামকরণ অসংগত হয় নাই।

উৎস ও নামকরণ

হিমালয়কন্যা উমার সহিত ত্রিলোকেশ্বর মহাদেবের বিবাহ ওষধিনগরীতে সম্পন্ন হইয়াছে। বিবাহের পর এক মাস পার্বতীসহ হিমালয়ের আবাসে মহাসুখে কাটাইয়া, নগপতিকে দুহিতৃবিরহে রাখিয়া পরমেশ্বর সৌন্দর্যময় শৈলবিহারে বহির্গত হইলেন। অবশেষে তাঁহারা মেরুপর্বতে আগমন করিলেন। এখানকার মন্দার পর্বতকে মন্থনদণ্ড

প্রসঙ্গসূত্র

করিয়া সমুদ্রমন্থন করা হইয়াছিল। এখানে পার্বতী নিত্য মন্দাকিনীতে স্নান করেন, মহেশ্বর পারিজাত কুসুমে তাঁহার অলকদাম সুশোভিত করিয়া দেন। ইহার পর একদিন সূর্যের অস্তগমন-কালে পার্বতীকে লইয়া বৃষধ্বজ চিরমনোহর গন্ধমাদন-পর্বতের অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। অস্তাচলবিলগ্ন অনুজ্জ্বল নেত্রগম্য ভাস্করের প্রতি অবলোকন করিয়া কাঞ্চনশিলায় উপবিষ্ট মহাদেব তখন দক্ষিণভুজাশ্রয়া পার্বতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দেখ প্রিয়ে ঐ অস্তাচলগামী সূর্য দিবস সংহার করিয়া, তাঁহার কমলকান্তি তোমার আরক্তকান্তি নেত্রত্রিভাগে সংরক্ষিত করিয়া বিদায় লইতেছেন, যেন প্রলয়কালে প্রজাপতি ব্রহ্মা জগৎকে সংহার করিতেছেন। সূর্য অনেক দূরে কিরণ সংকোচন করিয়া লইয়াছেন বলিয়া তোমার পিতার জলপ্রপাতগুলির চারিদিকে নির্ঝর-শীকরে আর ইন্দ্রধনুর সে শোভা দেখা যাইতেছে না। চক্রবাক-চক্রবাকী রজনী-সমাগমে বিচ্ছেদের আশঙ্কায় ক্রন্দমান হইয়া, মুখে অর্ধভুক্ত মৃণাল লইয়া পরস্পর বিপরীত গ্রীবায় বসিয়া আছে কারণ তাহাদের মধ্যবর্তী সামান্য বিচ্ছেদ এখন দীর্ঘবিচ্ছেদ হইবে। শল্লকীতরুর ভগ্নশাখা-স্রুত নির্যাসে সুরভিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া হস্তীরা ভ্রমরীমুদিতকোষ পদ্মে সমাকীর্ণ বারি প্রভাত পর্যন্ত তৃষ্ণা নিবারণের নিমিত্ত সংগ্রহ করিয়া লইতেছে। মিতভাষিণী পার্বতীকে দেখাইয়া মহেশ্বর বলিলেন, দেখ, পশ্চিমবিলম্বিত সূর্যের দীর্ঘ প্রতিবিম্বে যেন সরোবরে স্বর্ণসেতুবন্ধ নির্মিত হইয়াছে। শুভ্র মৃণালসদৃশ দন্ত লইয়া বন্যবরাহযূথপতিসকল গাঢ় পঙ্কপল্বলে আতপদাহ নিবারণ করিয়া পল্বল আলোড়িত করিয়া এক্ষণে তীরে ছুটিতেছে। বৃক্ষশাখায় স্থানগ্রহণকারী স্বর্ণাভপুচ্ছ ময়ূর যেন সন্ধ্যার মৃদু সৌন্দর্য পান করিতেছে। আকাশের পূর্বভাগে তিমির বৃদ্ধির ফলে তাহা পঙ্কবৃদ্ধির ন্যায় দেখাইতেছে এবং সমগ্র অবশিষ্ট আকাশ অল্পজলবিশিষ্ট সরোবরের ন্যায় বোধ হইতেছে। উটজাঙ্গনে মৃগীরা প্রবেশ করিতেছে, বৃক্ষের মূলে জলসেক করা হইয়াছে, ধেনুগণ অগ্রে প্রত্যাবর্তন করিতেছে, হোমাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে —এইসব মিলিয়া আশ্রমগুলি কী অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে। প্রায় বদ্ধ-কোষ পদ্মগুলি ভ্রমরের পুনরাগমনের ও প্রবেশের নিমিত্ত প্রীতিপূর্ণ চিত্তে মুখবিবরের দ্বার ঈষদুন্মুক্ত করিয়া রাখিতেছে।...সূর্যের কিরণপায়ী মহর্ষিগণ ও তাঁহাদের সহচরবৃন্দ অগ্নিতে তেজঃরক্ষাকারী সূর্যকে রথাশ্ব-চমকিত সামবেদের গানে বন্দনা করিতেছেন। [কুমারসম্ভব ৮ম সর্গ, ২৯-৪১]

ভাবার্থ

গন্ধমাদন-পর্বতে স্নিগ্ধরূপা সন্ধ্যার আগমনে শিলাসনোপবিষ্ট মুগ্ধনেত্র মহেশ্বর পার্বতীকে সেই স্বর্ণপ্রভ দৃশ্য দেখাইয়া বলিলেন, প্রিয়ে, অবলোকন কর, ব্রহ্মার জগৎ-সংহারের ন্যায়, দিবসপতি সূর্য তোমার নয়নপ্রান্তে আরক্ত প্রভা সংস্থাপিত করিয়া, দিবস সংহার করিয়া বিদায় লইতেছেন। হিমালয়-নিঃসৃত নির্ঝরশীকরগুলি অস্তরাগ রশ্মিতে উজ্জ্বল হইয়া ইন্দ্রধনুর শোভাকে পর্যন্ত পরাজিত করিয়াছে। রাত্রি উপস্থিত দেখিয়া মৃণালখণ্ড মুখে চক্রবাক-চক্রবাকী আসন্ন বিচ্ছেদ-দুঃখে বিলাপ করিতেছে। ভগ্ন শল্লকী-তরুর নির্যাসে সুবাসিত যে জলের পদ্মকোষে ভ্রমর আটকাইয়া গিয়াছে সেই জল সারাদিবসের সঞ্চয়ের জন্য হস্তিসমূহ পান করিতে চলিয়াছে। সরসীর উপর বিলম্বিত সৌরকর যেন এক মনোহর স্বর্ণসেতু নির্মাণ করিয়াছে। মৃণাল কিশলয় ভাঙিয়া বৃহৎ দংষ্ট্রাযুক্ত বন্য বরাহগুলি দিবসের আতপতাপ নিবারণ করিয়া আলোড়িতপঙ্ক হ্রদ ত্যাগ করিয়া উঠিতেছে। বৃক্ষশাখোপরি স্বর্ণকলাপ ময়ূরগুলি যেন দিবসের ভাস্করকিরণ পান করিতেছে। আকাশের একপ্রান্তে আলোক এবং অন্য প্রান্তে অন্ধকার বর্ধিত হওয়ার পরে আকাশটিকে কিছু পঙ্ক ও বারিযুক্ত সরোবরের ন্যায় দেখাইতেছে। তপোবনের মৃৎকুটীরের প্রাঙ্গণ দিয়া হরিণ-হরিণীরা চলিয়া যাইতেছে, আশ্রমধেনুবৃন্দ প্রত্যাবর্তন করিতেছে, আলবালে জলসেক করা হইয়াছে এবং হোমবহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। রাত্রি আগমনে পদ্মের পাপড়ি মুদ্রিত হইলেও যেন ভ্রমরের আগমনের জন্য সামান্য উন্মুক্ত রাখিয়াছে। কিরণোষ্মপায়ী মুনিগণ উপযুক্ত হৃদয়গ্রাহী সামবেদ-বন্দনার দ্বারা অগ্নিতে তেজঃরক্ষাকারী সূর্যের স্তব করিতেছেন।

বস্তুবিশ্লেষণ

আলোচনা

বাঙলা কবিতায় বিহারীলালের রোমান্টিক সুর প্রবর্তনের পূর্বে প্রকৃতির সৌন্দর্য-সম্ভোগ রীতি জনপ্রিয়তা লাভ করে নাই। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতায় প্রকৃতির শোভাসুষমা ও ঋতুর বৈচিত্র্য দেখা গেলেও তাহা বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনায় তথ্যভারে উচ্চাঙ্গের কবিতা হইয়া উঠে নাই। মধুসূদনের কবিচিত্ত যথার্থ সৌন্দর্যচেতন ছিল কিন্তু তাঁহার

প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা

নিসর্গপ্রীতি মহাকাব্যের প্রাচীরের ফাঁক দিয়া বিশ্বপ্রকৃতির অনির্বচনীয় মাধুর্যের অসীম ব্যাপ্তি অন্বেষণ করিতে পারে নাই। চতুর্দশপদী কবিতাবলীর মধ্যে নিসর্গের যে খণ্ড খণ্ড রূপচিত্র দেখা যায় সেইগুলি আধুনিক বাঙলার প্রথম প্রকৃতিসৌন্দর্য বর্ণনা। মধুসূদনের তুলনায় রঙ্গলাল প্রাচীনপন্থী, তাঁহার কাব্যসাধনায় ইতিহাস ও আখ্যানসর্বস্বতার ডম্বরুধ্বনির মধ্যে সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের ললিত তরঙ্গধ্বনি শ্রুতিগোচর হয় না। দিবাবসানে রঙ্গলালের মৌলিক কবিতা নয়, কুমারসম্ভবের অষ্টম সর্গের কয়েকটি শ্লোকের মর্মানুবাদ। কিন্তু ইহারই মধ্য দিয়া চারুপ্রকৃতি বর্ণনায় আখ্যানকাব্যের কবির যে কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে তাহারই সহিত সংকলয়িতা এযুগের পাঠকদের পরিচয়-সাধন করাইয়াছেন। অস্তমিত তপনের বর্ণোজ্জ্বলকান্তি বিশ্বভুবনের উপর যে শেষ সৌন্দর্যের অঙ্গুলিস্পর্শ বুলাইয়া যায়, অনুবাদের মধ্যে কবি তাহারই প্রতি মুগ্ধ হইয়াছেন। তাই প্রয়োজনমত মূলের অর্থ হইতে সরিয়া আসিয়া তিনি স্বতন্ত্রদৃষ্টিতে যেন সন্ধ্যার বর্ণনা করিয়াছেন। মিতবাক্‌ বর্ণনায়, সুপ্রযুক্ত শব্দের ধ্বনিতে তাহার দিবাবসানে অনুবাদের আড়ষ্টতা কাটাইয়া একটি মৌলিক প্রকৃতিবিষয়ক কবিতার পর্যায়ে আরোহণ করিয়াছে।

অনুবাদ হইলেও মৌলিক কবিতার মর্যাদা

কুমারসম্ভবের অষ্টম সর্গের ২৯ হইতে ৪১ শ্লোক দিবাবসানে কবিতার উৎস, কেবল ৪০ শ্লোকটির অনুবাদ আলোচ্য কবিতায় বর্জিত হইয়াছে। অনেকের মতে, কুমারসম্ভবের অষ্টম সর্গ হইতে শেষ পর্যন্ত অংশ উক্ত কাব্যে প্রক্ষিপ্ত, কালিদাস কেবল সপ্তম সর্গ পর্যন্তই লিখিয়াছিলেন। অন্তত অষ্টম সর্গের নিষ্প্রভ বর্ণনা হইতে এই মন্তব্য সংগত মনে হয়। আলোচ্য ছত্রগুলির মূল শ্লোক পাঠ করিলেই দেখা যায় এখানে প্রকৃতি বর্ণনায় কোনও চমৎকৃতি নাই, প্রথাগত নিসর্গদৃশ্যের পৌনঃপুনিক সমাবেশমাত্র। অবশ্য শ্রেষ্ঠ প্রতিভার ভিতরও অনেক সময় গতানুগতিক চিন্তার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু মেঘদূতের কবির পক্ষে এইরূপ প্রায় অনলংকৃত সন্ধ্যাদৃশ্য যেন অপ্রত্যাশিত মনে হয়। রঙ্গলালের অনুবাদে অবশ্য সাবলীলতা আছে, গতানুগতিক বর্ণনাকে তিনি মোটামুটি হৃদয়গ্রাহী করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ মূলের যথাযথ অনুবাদ হয় নাই, এমন কি অর্থের বৈপরীত্যই ঘটিয়াছে [রূপতত্ত্ব-

অনুবাদের উৎস

বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]। কিন্তু তাহা কবির স্বেচ্ছাকৃত হইতে পারে। হয়ত কবি মূলের সহিত তুলনায় দু-এক স্থানে স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়াছেন। অনুবাদক হিসাবে রঙ্গলালের দক্ষতা ছিল, ইংরাজি ও সংস্কৃত দুই ভাষাতেই তিনি মোটামুটি ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং তাঁহার অনুবাদ কবিতার পরিমাণও কম নয়। পরন্তু তিনি স্বয়ং কবি, মৌলিক স্রষ্টা। হয়ত এইজন্যই অনুবাদের ভাষায় একটি কবিজনসুলভ লাবণ্য আছে, স্বচ্ছন্দ গতি ও প্রসাদগুণ আছে, মূলের কষ্টকল্পনাকে তিনি যথাসম্ভব পরিহার করিয়াও অর্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন এবং প্রয়োজনমত পরিবর্ধন বা পরিবর্তন করিয়াছেন। হয়ত ঠিক একই কারণে দুই একস্থানে স্বাধীনতাও গ্রহণ করিয়া মূলের বিপরীত অর্থ প্রয়োগ করিয়াছেন। অনুবাদক রঙ্গলালের এক নূতন পরিচয় পাওয়া গেল এই কবিতার মধ্য দিয়া। ইহাই দিবাবসানে কবিতা পাঠের অভিজ্ঞতা এইমাত্র বলা যায়। তবে মাধুকরী-র পাঠকপাঠিকা বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীরূপে 'পদ্মিনী উপাখ্যান' 'কাঞ্চী কাবেরী'র কবি, 'স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায়' এই চারণ গানের গীতিকার, মধুসূদনের পূর্বসূরী রঙ্গলালের কবিত্বের সহিত পরিচিত হইবেন না, অনুবাদক কবিরূপেই রঙ্গলালকে জানিবেন, ইহাও বিস্ময়কর।

অনুবাদক রঙ্গলাল

দিবাবসানে কবিতায় কুমারসম্ভবের যে শ্লোকগুলি অনুবাদ করা হইয়াছে, সেইগুলি প্রকৃতপক্ষে কবিপ্রসিদ্ধিতে পূর্ণ এবং সেইগুলির পূর্ণ অর্থ গ্রহণেই শ্লোকগুলির সৌন্দর্য নির্ভরশীল [চণ্ডীদাসের প্রেমের তুলনা কবিতাপ্রসঙ্গে কবিপ্রসিদ্ধির আলোচনা দ্রষ্টব্য]। কবিপ্রসিদ্ধি শব্দের আভিধানিক অর্থ,

কবিপ্রসিদ্ধি

"প্রাচীন কবিগণের মধ্যে কতকগুলি বস্তু ও বিষয় তাহাদের বর্ণনা ও সম্বন্ধাদির কল্পনা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং পরবর্তী কবিগণ যে কল্পনার অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। তুলনীয়, সূর্য-প্রিয়া কমলিনী, চন্দ্র-প্রিয়া কুমুদিনী, তাই দিবসে পদ্ম রাত্রিতে কুমুদ বিকশিত হয়। চকোরের জ্যোৎস্না পান, চাতকের ঊর্ধ্বমুখে বৃষ্টিজল পান, চক্রবাক ও চক্রবাকীর বিরহ রজনী, মেঘশব্দে বা দর্শনে ময়ূরের হর্ষ ও নৃত্য, যশ ও পুণ্য শুক্লবর্ণ, নিন্দা ও পাপ কৃষ্ণবর্ণ, প্রমদা বা যুবতী সধবা সুন্দরীর পদাঘাতে অশোকতরুর পুষ্পোদ্গম ইত্যাদি। এইরূপ ক্রোধ ও অনুরাগ রক্তবর্ণ, হাস্য ও কীর্তি শুভ্রবর্ণ, বর্ষাগমে

হংসগণ মানস-সরোবরে গমন করে, যোষিতদিগের মুখমধু দ্বারা বকুলপুষ্প বিকশিত হয়। মদনের ধনুর্গুণ ভ্রমরের মালা, মদনের ধনু ও বাণ পুষ্পময়, মদনের পুষ্পবাণে নারীচিত্ত ও যুবতীর কটাক্ষে যুবকগণের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। অশোকতরুতে ফল হয় না, বসন্তে জাতী পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় না, চন্দন বৃক্ষে ফলপুষ্প হয় না ইত্যাদি"। [বাঙলা ভাষার অভিধান—জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস]

এই সকল কবিপ্রসিদ্ধির ব্যবহারেই কুমারসম্ভবের শ্লোকগুলিতে সন্ধ্যার আগমন ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। রঙ্গলালও সেইগুলির বর্ণনা করিয়াছেন। [কবিপ্রসিদ্ধি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকাব্যে প্রকাশ কবিতা দ্রষ্টব্য]।

রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ

আরক্ত অপাঙ্গধর—অর্থাৎ পার্বতীর নেত্র, নেত্রের প্রান্তভাগকে অপাঙ্গ বলা হয়, সেই অপাঙ্গ যদি আরক্ত হয় তবে তাহা নারীর পক্ষে সৌন্দর্যের চিহ্ন। **আরক্ত · করিয়ে স্থাপন**—কবিপ্রসিদ্ধি আছে পদ্ম সূর্যপ্রিয়া, সূর্য অস্ত গেলে পদ্মও মুদিত হয়, কিন্তু মহাদেব বলিতেছেন, সূর্য অস্ত যাইতেছেন কিন্তু তাঁহার প্রিয়া পদ্মের কান্তিকে তিনি পার্বতীর নয়নকোণে, আরক্ত অপাঙ্গে স্থাপন করিয়া যাইতেছেন। অর্থাৎ পার্বতীর মনোহর মুখশ্রী ও নয়নের প্রশংসা করিয়া মহাদেব বলিতেছেন যে, দিনপতি যেন পার্বতীর নেত্রকোণে কান্তি স্থাপন করিয়া বিদায় লইতেছেন। **দিবসে···করেন হরণ**—ধাতা অর্থাৎ ব্রহ্মা যেরূপ কল্পান্তে বিশ্ব সংহার করেন সেইরূপ সূর্যদেবও দিবসকে সংহার করিতেছেন।

[কুমারসম্ভবের মূল শ্লোকটি এইরূপ,

পদ্মকান্তিমরুণত্রিভাগয়োঃ সংক্রময্য তব নেত্রয়োরিব।
সংক্ষয়ে জগদিব প্রজেশ্বরঃ সংহরত্যহরসাবহর্পতিঃ ॥

(৮ম সর্গ, ৩০ শ্লোক)

অর্থাৎ 'প্রলয়কালে ব্রহ্মার জগৎসংসারের ন্যায়, দিবসপতি তোমার নেত্রের অরুণকান্তি-ত্রিভাগে (অর্থাৎ অপাঙ্গে) পদ্মকান্তি সংস্থাপন করিয়া, দিবস সংহার করিতেছেন'। রঙ্গলালের অনুবাদ মোটামুটি আক্ষরিক। এই শ্লোকের ব্যঞ্জনা, রাত্রিকালে কমল বিকশিত হয় না, তাই কমলের সৌন্দর্য পার্বতীর অরুণপ্রান্ত নয়নে গচ্ছিত রাখিয়া সূর্য তিরোহিত হইলেন। অর্থাৎ পার্বতীর পদ্মতুল্য নয়নের দ্বারা রাত্রিতে কমলের অভাব বিদূরিত হইল।]

অস্তমিত······নির্ঝর—হিমালয় (পার্বতীর পিতা)-পর্বত-নিঃসৃত ঝর্ণাগুলির উপর অস্তাচলগামী সূর্যের আলোক শিখা পড়িয়া অতি মনোহর দেখাইতেছে। মহাদেব পার্বতীকে তাহাই দেখাইতেছেন। **ইন্দ্রধনু···শীকর নিকর**—পার্বত্য ঝর্ণাগুলির উপর অস্তায়মান সূর্য দ্বারা জলকণার উপর বিচিত্র বর্ণে সৃষ্ট হইয়াছে, সেই বর্ণসুষমা আকাশের ইন্দ্রধনুর শোভাকেও পরাজিত করে। [এই অনুবাদ মূলানুযায়ী হয় নাই বরং বিপরীতার্থক হইয়াছে। মূলে আছে,

শীকরব্যতিকরং মরীচিভির্দূরয়ত্যবনতে বিবস্বতি ।
ইন্দ্রচাপপরিবেশশূন্যতাং নির্ঝরাস্তব পিতুর্ব্রজন্ত্যমী ॥

(৩১ শ্লোক)

অর্থাৎ 'ঐ দেখ, নির্ঝরের জলকণায় আর পূর্ববৎ সৌরকর স্পর্শ হইতেছে না, ভাস্করের প্রভাজালে নির্ঝর-শীকর আর আগের মত শোভা পাইতেছে না, সূর্য অনেক দূরে কিরণসঙ্কোচ করিয়া লইয়াছেন বলিয়া, তোমার পিতার জলপ্রপাতগুলির চারিদিকে আর নয়নরঞ্জন ইন্দ্রধনু যে শোভা দেখা যাইতেছে না' (রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের অনুবাদ)। সম্ভবতঃ দিবাবসানে সূর্যের তির্যক্ আলোকমালা নির্ঝর-শীকরের উপর পতিত হইয়া শেষবারের মত এক অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছে, ইহাই রঙ্গলালের অভিপ্রেত চিত্র।]

চক্রবাক ··· করে দুখে—অন্ধকারে বা রাত্রিসমাগমে চক্রবাক ও চক্রবাকী পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, ইহাই কবিপ্রসিদ্ধি। ইহাই আলোচ্য শ্লোকের ভিত্তি। চক্রবাক ও চক্রবাকীর মুখে মৃণালখণ্ড এবং পরস্পরের দিকে মুখ করিয়া উপবিষ্ট ছিল কিন্তু রাত্রির ক্রমাগমনে তাহারা ধীরে ধীরে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন-বিরহিত হইয়া যাইতেছে ও তাহাদের বিরহের আকুল ক্রন্দন ছড়াইয়া পড়িতেছে। [মূল শ্লোক,

দষ্টতামরসকেশরস্রজোঃ ক্রন্দতোর্বিপরিবৃত্তকণ্ঠয়োঃ ।
নিঘ্নয়োঃ সরসি চক্রবাকয়োরল্পমন্তরমনল্পতাং গতম্ ॥ (৩২ শ্লোক)

অর্থাৎ 'মুখে পদ্মের কেশর অর্ধদষ্ট, বিপরীত দিকে কণ্ঠ স্থাপিত, পরস্পরের গভীর অনুরাগী, সরোবরের চক্রবাক-চক্রবাকীর মধ্যে যে সামান্য ব্যবধান ছিল, (মৃণালটুকুই মাত্র তাহাদের ব্যবধান ছিল) নিশাগমে তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত

হইতেছে'।] **শল্লকী-তরুর···মাতঙ্গসমূহ**---শল্লকীতরুর নির্যাসে (শল্লকী একপ্রকার বৃক্ষ, যাহা হইতে সুগন্ধি নির্যাস নির্গত হয়) সরোবরের জল সুবাসিত, সেখানে যে সকল পদ্ম ফুটিয়াছিল সন্ধ্যাগমে তাহাদের পাপড়ি বন্ধ হওয়ায় ভ্রমরসকল তাহাতে আটকাইয়া গিয়াছে, হস্তিসমূহ সারা-দিবসের জল সঞ্চয়ের জন্য সেই জল পান করিতে চলিয়াছে। [মূল শ্লোক,

স্থানমাহ্নিকমপাস্য দন্তিনঃ শল্লকীবিটপভঙ্গবাসিতম্।

আবিভাত-চরণায় গৃহ্নতে বারি বারিরুহবদ্ধষটপদম্॥ (৩৩ শ্লোক)

অর্থাৎ 'শল্লকীবিটপ-স্রুত নির্যাসে সুরভিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া, যেখানে পদ্মের মুদিত পাপড়িতে ভ্রমর আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, সারা রাত্রির জন্য, সেই স্থানের জল পান করিবার নিমিত্ত হস্তিসমূহ চলিয়াছে'। মূল শ্লোকমতে হস্তিগণ শল্লকী-বিটপ ভঙ্গে সুবাসিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া (=স্থানম্ অপাস্য চলিতেছে, আর রঙ্গলাল লিখিয়াছেন, হস্তিসমূহ শল্লকী-তরুর ক্ষীর গন্ধে সুবাসিত জল পানের জন্য চলিয়াছে।]

অই দেখ সেতু স্বর্ণময়—মহেশ্বর প্রিয়তমা পার্বতীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিতেছেন যে, পশ্চিম দিগন্তশায়ী সূর্যরশ্মি সরসীর উপর প্রলম্বিত হওয়ায় মনে হইতেছে যেন সরোবরের জলের উপর সোনার সেতু নির্মিত হইয়াছে। [মূল শ্লোক,

পশ্য পশ্চিমদিগন্তলম্বিনা নির্মিতং মিতকথে বিবস্বতা।

দীর্ঘয়া প্রতিময়া সরোহম্ভসাং তাপনীয়মিব সেতুবন্ধনম্॥

(৩৪ শ্লোক)

অর্থাৎ 'মিতভাষিণি, অবলোকন কর, সূর্যের পশ্চিমদিগন্তলম্বিত প্রতিবিম্ব-সদৃশ সূর্যরশ্মির দ্বারা জলের উপর যেন সোনার সেতুনির্মিত হইয়াছে'।]

দীঘল-দশনধর···· হ্রদচয়—দীর্ঘ দশনযুক্ত বন্য বরাহগুলি দাঁতের দ্বারা পদ্মের ডাঁটি ভাঙিয়া হ্রদের ঘনপঙ্কে সারা দিবসের রৌদ্রতাপ নিবারণ করিয়া রাত্রি আগমনে হ্রদসমূহ ত্যাগ করিয়া উঠিয়া যাইতেছে। [মূল শ্লোক,

উত্তরন্তি বিনিকীর্য পল্বলং গাঢপঙ্কমতিবাহিতাতপাঃ।

দংষ্ট্রিণো বনবরাহযূথপা দষ্টভঙ্গুরবিসাঙ্কুরা ইব॥ (৩৫ শ্লোক)

অর্থাৎ 'বৃহৎ দংষ্ট্রাযুক্ত বন্য বরাহরাজগুলি, যাহাদের দন্ত দেখিয়া মনে হয় মুখে যেন মৃণালের শ্বেত ডাঁটা, গাঢ় পঙ্কে দিবসের আতপ অতিবাহিত করিয়া

পল্লব আন্দোলিত করিয়া তীরে উঠিতেছে'। এখানেও রঙ্গলাল অনুবাদে স্বাধীনতা লইয়াছেন। দন্তভঙ্গবিসাঙ্কুরা ইব, অর্থাৎ বরাহের বৃহৎ দন্তগুলি ভগ্ন মৃণালের মত, কিন্তু রঙ্গলাল লিখিয়াছেন 'দন্তে ভাতি বিস-কিশলয়' (বিস=মৃণাল)। **আরও উল্লেখযোগ্য,** রঙ্গলালের মূল অনুবাদে ছিল 'উঠিতেছে ত্যজি হ্রদ-পয়', পয় অর্থ এখানে জল, সংকলনকর্তা তাহাকে পরিবর্তিত করিয়া লিখিয়াছেন 'ত্যজি হ্রদচয়'—এই পরিবর্তনের কোনো কারণ ছিল না।]

হের অই ... সব গ্রাসি ? -স্বর্ণকান্তি কলাপধারী ময়ূর বৃক্ষশাখায় অপরূপ হইয়া শোভা পাইতেছে, তাহাদের পুচ্ছে রৌদ্ররাগ পড়িয়াছে, মনে হইতেছে যেন তাহারা সন্ধ্যাসূর্যের কিরণ পান করিতেছে। [মূল শ্লোক,

এষ বৃক্ষশিখরে কৃতাস্পদো জাতরূপরসগৌরমণ্ডলঃ।
হীয়মানমহরত্যয়াতপং পীবরোরু পিবতীব বর্হিণঃ॥ (৩৬ শ্লোক)

অর্থাৎ 'পীনবক্ষা, দেখ, ঐ বৃক্ষশিখরে অবস্থানকারী স্বর্ণকলাপধারী ময়ূর হীয়মান সন্ধ্যাসূর্যের মাধুরী পান করিতেছে। এই শ্লোকের ব্যঞ্জনা এই যে, রবিরশ্মির দ্বারা ময়ূরের পেখম অনুপম বর্ণোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, মনে হইতেছে যেন সূর্যাভা পান করিয়াই তাহাদের কলাপের এত স্বর্ণকান্তি শোভা'।]

ভানুর কিরণ ... দেখা যায়—আকাশ হইতে সূর্যকিরণ অপসারণের ফলে পূর্বপ্রান্তে অন্ধকার বৃদ্ধি পাইতেছে। সূর্য-কিরণকে জলের, আকাশকে সরোবরের সহিত তুলনা করিয়া কবি বলিতেছেন যে, সূর্যালোক কমিয়া যাওয়ায় আকাশটি শুষ্ক সরোবরের ন্যায় বোধ হইতেছে, রবিকিরণের তিরোধানে পূর্বদিকপ্রান্তে অন্ধকার বৃদ্ধি পাইতেছে, মনে হইতেছে যেন জলের ক্রমাপসারণে সরোবরে পঙ্ক বাড়িয়া যাইতেছে। পরিগতে—পরিগত হইলে অর্থে। [মূল শ্লোক,

পূর্বভাগতিমির-প্রবৃত্তিভির্ব্যক্তপঙ্কমিব জাতমেকতঃ।
খং হৃতাতপজলং বিবস্বতা ভাতি কিঞ্চিদিব শোষবৎ সরঃ॥

(৩৭ শ্লোক)

অর্থাৎ 'সূর্যকর্তৃক জলরূপ কিরণ অপহরণের ফলে এবং পূর্বভাগে তিমির-বৃদ্ধির ফলে আকাশটি একপ্রান্তে ব্যক্তপঙ্ক এবং অল্পাবশিষ্টজল সরোবরের ন্যায় দেখা যাইতেছে'।]

উটজ অঙ্গনে ··আশ্রম-সকলে—মৃৎকুটীরের প্রাঙ্গণ দিয়া হরিণহরিণীরা প্রত্যাবর্তন করিতেছে, আলবালে জলসেচন করা হইয়াছে, যজ্ঞ ধেনুগণ গোষ্ঠ হইতে ফিরিয়া আসিতেছে, আশ্রমে হোমাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে, এইসব মিলিয়া নিকটবর্তী আশ্রম মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে। **উটজ**—মৃৎকুটীর। **কুরঙ্গাবলী**—হরিণহরিণীর দল। **তরুপুঞ্জ-মূল**—আলবাল।

[মূল শ্লোক,

আবিশদ্ভিরুটজাঙ্গনং মৃগৈর্মূলসেকসরসৈশ্চ বৃক্ষকৈঃ
আশ্রমাঃ প্রবিশদগ্ন্যগ্নেনবো বিভ্রতি শ্রিয়মুদীরিতাগ্নয়ঃ ॥

(৩৮ শ্লোক)

অর্থাৎ 'কুটীরাঙ্গনে প্রবেশকারী মৃগদিগের দ্বারা, আশ্রমের জলসিক্ত মূল বৃক্ষসকলের দ্বারা, আশ্রমে প্রবেশকারী হোমধেনু ও হোমার্থে প্রজ্বলিত অগ্নির দ্বারা আশ্রমসকল কী অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে'।]

শিহরিছে · সরসিজ · প্রীতিফুল্ল মনে—কোষবদ্ধ কমলগুলি সরোবরে শিহরিত অর্থাৎ বাতাসে কম্পিত হইতেছে, রাত্রি আগমনে তাহাদের পাপড়ি বদ্ধ হইলেও কিঞ্চিৎ বিবর উন্মুক্ত আছে, যেন ভ্রমরের প্রতি প্রীতিবশত তাহাদের আগমনের জন্য কোষদ্বার ঈষৎ খুলিয়া রাখিয়াছে। [মূল শ্লোক,

বদ্ধকোষমপি তিষ্ঠতি ক্ষণং সবিশেষবিবরং কুশেশয়ম্।
ষট্পদায় বসতিং গ্রহীষ্যতে প্রীতিপূর্বমিব দাতুমন্তরম্ ॥

(৩৯ শ্লোক)

অর্থাৎ 'প্রায় বদ্ধকোষ কমল প্রীতিপূর্বক ভ্রমরকে স্থান দিবার জন্য যেন দলগুলি ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া বিরাজ করিতেছে'। বঙ্গানুবাদে রঙ্গলাল 'ক্ষণদার আগমন-ক্ষণে' বাক্যাংশটি যোজনা করিয়াছেন। **লক্ষণীয়** যে, রঙ্গলালের অনুবাদে ছিল 'বিহরিছে সরসিজ', ইহা তিষ্ঠতি •কুশেশয়ম্-এর আক্ষরিক তর্জমা। সংকলয়িতা ইহাকে পরিবর্তিত করিয়াছেন 'শিহরিছে সরসিজ', এই পরিবর্তন অবাস্তব।]

হৃদয়-সঙ্গত ·ভানুর কিরণে—সূর্য অস্তমিত হইলে তিনি অগ্নির মধ্যে তাঁহার তেজঃ সংরক্ষিত করেন, ইহাই কবিপ্রসিদ্ধি। সন্ধ্যায় আশ্রম-তপোবনে হোমাগ্নি জ্বলিতেছে, যে সকল বালখিল্য প্রভৃতি মুনিগণ কিরণপান করিয়া থাকেন, তাঁহারা শতসহস্র হৃদয়সংগত সামগান বন্দনার সাহায্যে সেই অগ্নির

স্তব করিতেছেন। বালখিল্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ সূর্যের কিরণমাত্র পানপূর্বক সৌরলোকে ভ্রমণ করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। [মূল শ্লোক,

সামভিঃ সহচরাঃ সহস্রশঃ স্যন্দনাশ্বহৃদয়ঙ্গমস্বনৈঃ
ভানুমগ্নিপরিকীর্ণতেজসং স স্তুবন্তি কিরণোষ্মপায়িনঃ ॥ (৪১ শ্লোক)

অর্থাৎ 'কিরণোষ্মপায়ী ও তাঁহাদের সহচর মুনিঋষিগণ অগ্নিতে পরিকীর্ণ-তেজঃ ভানুর স্তব করিতেছেন সহস্র সহস্র সামবেদ গানের দ্বারা, যে গানের ধ্বনি রথাশ্বদেরও বিমুগ্ধ করে'। যে গান রথাশ্বদের হৃদয়ংগম হয়, এইরূপ অর্থ বঙ্গলাল পরিহার করিয়াছেন।]

ব্যাখ্যা—

আরক্ত অপাঙ্গধর ···করেন হরণ—[রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]।
চক্রবাক-চক্রবাকী ··· করে দুঃখে—[রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]।
ভানুর কিরণজাল ··· দেখা যায়—[রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]।
শিহারছে সরসিজ ···প্রীতিফুল্ল মনে—[রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]।

প্রশ্ন ১। দিবাবসানে কবিতা অবলম্বনে সন্ধ্যাপ্রকৃতির একটি রূপচিত্র অঙ্কন কর। [ভাবার্থ দ্রষ্টব্য]

প্রশ্ন ২। দিবাবসানে কবিতার উৎস নিরূপণ করিয়া অনুবাদক কবি হিসাবে বঙ্গলালের কবিপ্রকৃতির পরিচয় দাও।

[ভূমিকা ও আলোচনা দ্রষ্টব্য।]

অলকাপুরী : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূমিকা

"দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতিভা অসাধারণ এবং বহুবিচিত্র। কাব্যে সংগীতে গণিতে শর্টহ্যাণ্ড লেখায় ভাষাতত্ত্বে দর্শনে ইঁহার সজাগ কৌতূহল ছিল। কিন্তু নির্লিপ্ত ও উদাসীন-প্রকৃতি বলিয়া কোন কিছুরই অনুশীলনে প্রসক্তি ছিল না। দর্শন অনুশীলন ছাড়া কোন কিছুতেই তিনি বেশিদিন লাগিয়া থাকেন নাই।··

দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়

দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রথম দার্শনিক গ্রন্থ হইতেছে চারিখণ্ড তত্ত্ববিদ্যা। তাহার পর গীতাপাঠের ভূমিকা বা গীতাপাঠ ছাড়া অধিকাংশ নিবন্ধই পুস্তিকা। তবুও

এগুলি বেশ মূল্যবান্ রচনা। তাহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে সোনার কাঠি রূপার কাঠি, সোনায় সোহাগা, আর্যামি ও সাহেবিয়ানা, সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা, অদ্বৈতমতের প্রথম ও দ্বিতীয় সমালোচনা, আর্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাত ও সংঘাত, সারসত্যের আলোচনা, হারামণির অন্বেষণ ইত্যাদি। ইঁহার অনেকগুলি প্রবন্ধ নানা চিন্তায়, প্রবন্ধমালায় ও চিন্তামণিতে সঙ্কলিত আছে। দ্বিজেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গদ্য রচনা গীতাপাঠের ভূমিকা। চিঠি লেখায় দ্বিজেন্দ্রনাথের একটি নিজস্ব সহজ ও সরল ভঙ্গি ছিল।" [সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস]

কিন্তু বাঙলা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ অবদান তাঁহার স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্য। রূপকে-রূপকথায় উল্লাসে-উৎপ্রেক্ষায় এই কাব্যটি অতুলনীয়। মেঘদূত অনুবাদ, যৌতুক না কৌতুক গাথা কাব্য, স্বপ্নপ্রয়াণ এবং 'মলিন মুখ চন্দ্রমা ভারত তোমারই' এই স্বদেশী সংগীত, কবি হিসাবে দ্বিজেন্দ্রনাথের খ্যাতি চিরস্থায়ী করিয়া রাখিবে। স্বপ্নপ্রয়াণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,

"স্বপ্নপ্রয়াণ যেন একটা রূপকের অপরূপ রাজপ্রাসাদ। তাহার কত রকমের কক্ষ, গবাক্ষ, চিত্র, মূর্তি ও কারুনৈপুণ্য। তাহার মহলগুলি বিচিত্র। তাহার চারিদিকের বাগানবাড়িতে কত ক্রীড়া-শৈল, কত ফোয়ারা, কত নিকুঞ্জ, কত লতাবিতান। ইহার মধ্যে কেবল ভাবের প্রাচুর্য নহে, রচনার বিপুল বিচিত্রতা আছে। সেই যে একটি বড় জিনিসকে তাহার কলেবরে সম্পূর্ণ করিয়া গড়িয়া তুলিবার শক্তি, সেটি ত সহজ নহে।"

স্বপ্নপ্রয়াণ

সংস্কৃত ছন্দে বাঙলা কবিতা রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত তাঁহার একটি পরিহাসমূলক কবিতা,

ইচ্ছা সম্যক তব দরশনে কিন্তু পাথেয় নাস্তি
পায়ে শিক্লী মন উড়ু উড়ু একি দৈবের শাস্তি।

[দ্রঃ সৈয়দ মুজতবাআলি—বড়বাবু—দেশ শারদীয়া ১৩৭১]

দ্বিজেন্দ্রনাথের পূর্বে বাঙলায় মেঘদূত অনুবাদ করিয়াছিলেন লালমোহন গুহ ও ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ। দ্বিজেন্দ্রনাথের মেঘদূত অনুবাদ মেঘনাদবধ কাব্যের পূর্বেই প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে মেঘদূত অনুবাদ করিয়াছিলেন ভুবনচন্দ্র বসাক, নীলমণি নন্দী, প্রাণনাথ পণ্ডিত, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইহাদের তুলনায় দ্বিজেন্দ্রনাথের অনুবাদ জনপ্রিয় হইয়াছিল।

উৎস ও নামকরণ

"অলকাপুরী" মেঘদূতের উত্তরমেঘ অংশের প্রথম কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ। অনুবাদের বিষয়বস্তু অনুযায়ী নামকরণ সংকলয়িতাপ্রদত্ত।

মেঘদূত কাব্য-পরিচয়

মেঘদূত সৌন্দর্যবর্ণনা-প্রধান খণ্ডকাব্য। প্রভুশাপে রামগিরি পর্বতে নির্বাসিত প্রিয়জনবিরহিত যক্ষের স্বগতপ্রলাপে কালিদাস একদিকে যেমন নিঃসঙ্গ বিরহীর আর্ত দীর্ঘশ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন, তেমনি নববর্ষাগমে গিরিপাদমূলে নগনদীজনপদ অরণ্য নগরীর উপর যে প্রাবৃট্ দিবসের মনোহর শোভা সঞ্চারিত হয়, আকাশভাসমান মেঘের চলমান দৃষ্টি দিয়া তাহা মুগ্ধনেত্রে নিরীক্ষণ করিয়াছেন। পূর্বমেঘ ও উত্তর-মেঘে বিভক্ত এই মন্দাক্রান্তা ছন্দের কাব্যে পূর্বমেঘে রামগিরি হইতে মেঘের অলকা পর্যন্ত যাত্রার বর্ণনা, উত্তরমেঘে অলকা-উজ্জয়িনীর নাগরিক সৌন্দর্যের বর্ণনা। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অপরূপ ব্যাখ্যাটি স্মরণীয়,

মেঘদূত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ

"মেঘদূত ছাড়া নববর্ষার কাব্য কোনো সাহিত্যে কোথাও নাই। ইহাতে বর্ষার সমস্ত অন্তর্বেদনা নিত্যকালের ভাষায় লিখিত হইয়া গেছে। প্রকৃতির সাংবৎসরিক মেঘোৎসবের অনির্বচনীয় কবিত্বগাথা মানবের ভাষায় বাঁধা পড়িয়াছে।

পূর্বমেঘ-এর ভাবার্থ

পূর্বমেঘে বৃহৎ পৃথিবী আমাদের কল্পনার কাছে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। আমরা সম্পন্ন গৃহস্থটি হইয়া আরামে সন্তোষে অর্ধনিমীলিতলোচনে যে গৃহটুকুর মধ্যে বাস করিতেছিলাম, কালিদাসের মেঘ আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে হঠাৎ আসিয়া আমাদিগকে সেখান হইতে ঘরছাড়া করিয়া দিল। আমাদের গোয়ালঘর-গোলাবাড়ির বহু দূরে যে আবর্তচঞ্চলা নর্মদা ভ্রূকুটি রচনা করিয়া চলিয়াছে, যে চিত্রকূটের পাদকুঞ্জ প্রফুল্ল নবনীপে বিকশিত, উদয়ন-কথাকোবিদ গ্রামবৃদ্ধদের দ্বারের নিকটে যে চৈত্যবট শুককাকলিতে মুখর, তাহাই আমাদের পরিচিত ক্ষুদ্র সংসারকে নিরস্ত করিয়া বিচিত্র সৌন্দর্যের চিরসত্যে উদ্ভাসিত হইয়া দেখা দিয়াছে।......

অজ্ঞাত নিখিলের সহিত নবীন পরিচয়, এই হইল পূর্বমেঘ। নবমেঘের

আর একটি কাজ আছে। সে আমাদের চারিদিকে একটি পবমনিভৃত পরিবেষ্টন রচনা করিয়া 'জননান্তর সৌহৃদানি' মনে করাইয়া দেয়, অপরূপ সৌন্দর্যলোকের মধ্যে কোনো একটি চিরপ্রিয়ের জন্য মনকে উতলা করিয়া তোলে।

উত্তরমেঘের গূঢ়ার্থ

পূর্বমেঘে বহুবিচিত্রের সহিত সৌন্দর্যের পরিচয় এবং উত্তরমেঘে সেই একের সহিত আনন্দের সম্মিলন। পৃথিবীতে বহুর মধ্য দিয়া সেই সুখের যাত্রা, এবং স্বর্গলোকে একের মধ্যে সেই অভিসারের পরিণাম।"

[নববর্ষা—বিচিত্র প্রবন্ধ]

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনূদিত মেঘদূতের উত্তরমেঘের প্রথম কয়েকটি শ্লোকের অংশ দ্বারা অলকাপুরী কবিতা রচিত হইয়াছে। স্বভাবতই একটি অখণ্ড সম্পূর্ণ গীতিকবিতার আভাস ইহাতে নাই। অলকাপুরী অর্থাৎ যক্ষের নিজের বাসভূমি ও স্বদেশের বর্ণনায় তাহার আগ্রহাতিশয্য ও সৌন্দর্যমুগ্ধতার পরিচয় এই অংশে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সংকলয়িতা মধ্যবর্তী কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ বর্জন করিয়াছেন, ফলে উক্ত বর্ণনায় সম্পূর্ণ রস ব্যাহত হইয়াছে। মোটামুটি অনুবাদ স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল।

গীতিকবিতার রস খণ্ডিত

ভাবার্থ

যাত্রাপথের অবসানে নববর্ষার মেঘসমূহ যখন অলকাপুরীতে প্রবেশ করিবে তখন অলকাপুরীর যে শোভা চক্ষে পড়িবে যক্ষ মেঘকে তাহারই আভাস দিতেছে। অলকার প্রাসাদপুরী মেঘের মতই স্তরে স্তরে সজ্জিত ; বিদ্যুতের ন্যায় তাহাদের অভ্যন্তরে সুরূপসীগণ, মেঘের গর্জনের ন্যায় তথাকার মৃদঙ্গধ্বনি, মেঘস্থ বারির ন্যায় প্রাসাদের মণিময় ভূতল, ইন্দ্রধনুর ন্যায় গৃহমধ্যস্থ চিত্রলেখা এবং উভয়ই আকাশস্পর্শী। প্রতি গৃহে কুসুমাভরণ-সজ্জিতা উজ্জ্বল ললনাদের কথা স্মরণ করিলে বিরহী যক্ষের নির্বাসন দুঃখ উত্তাল হইয়া উঠে। সেখানকার পুরসুন্দরীগণের হস্তে কমল, কর্ণে শিরীষ, খোঁপায় কুরুবক, অলকে কপোল-স্পর্শকামী কুন্দ এবং কেশপাশে কদম্ব। সেখানে ঋতুশাসন লঙ্ঘন করিয়া সকল সময়ে সর্ব ঋতুর ফুল ফোটে, কমলিনী কখনই মুদিত হয় না, সর্বদাই ময়ূর কেকারবে মত্ত এবং নিত্য জ্যোৎস্নালোকে বিরাজিত। সেখানে নিত্য সুখ,

বস্তু-বিশ্লেষণ

নিত্যযৌবন ও নিত্যমিলনের আনন্দ।···কুবেরের গৃহত্যাগ করিয়া উত্তরে মেঘ যক্ষের ইন্দ্রধনুশোভিত বহির্দ্বারযুক্ত নিলয় দেখিতে পাইবে। তাহার পার্শ্বে ভ্রমরগুঞ্জিত কমলবিকশিত সরোবর, মণিময় ঘাট, যেখানকার স্বচ্ছ জলে সর্বদা বিহার ছাড়িয়া হংসহংসী মানস-সরোবরে পর্যন্ত যাইতে চায় না। একধারে নীলকান্তি শিখরযুক্ত কনক কদলীতরুবেষ্টিত উচ্চভূমি যেন নীল মেঘের প্রান্তে স্বর্ণাভ বিদ্যুৎ। সেখানে কুরুবকবেষ্টিত মাধবীমণ্ডপের নিকট গন্ধমুগ্ধ ভ্রমরের মেলা—আর কিশলয়মণ্ডিত অশোক ও বকুলতরু তোমার চরণ-স্পর্শ ও মুখ-মদিরা কামনা করে। সেই তরুদ্বয়ের মধ্যে সোনার দাঁড়ে কেকাভাষী উদ্‌গ্রীব শিখীকে যক্ষপ্রিয়া সন্ধ্যাকালে বলয়শিঞ্জন ও করতালির সাহায্যে নাচাইয়া থাকে—যে সকল স্মৃতি স্মরণ করিয়া যক্ষের হৃদয়বেদনা বৃদ্ধি পায়। এই সকল চিহ্ন দেখিয়া মেঘ যক্ষের আবাস মুহূর্তে চিনিতে পারিবে, তবে এক্ষণে যক্ষ-নিবাস যক্ষের অভাবে শূন্য, সেখানে দিবসাবসানে আর পদ্ম শোভা পায় না।

আলোচনা

দ্বিজেন্দ্রনাথ এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্যে মননশীলতায় বিচিত্র বিষয়ের উপর অসাধারণ অধিকারে এবং তৎসহ কবিত্বে ও রসবোধে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতিভা একমাত্র রবীন্দ্রনাথের সহিতই তুলনীয়। বাঙলা দেশে জাতীয়তাবাদ প্রসারে যে হিন্দুমেলার দান অগ্রগণ্য, তিনি তাঁহার অন্যতম হোতা; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তাঁহারই সুপরিচালনায় ও দার্শনিক চিন্তায় বাঙলা সাময়িক পত্রিকার শীর্ষমণি হইয়াছিল। স্বদেশী সংগীত রচনায়ও তিনি বাঙলা দেশে পথিকৃৎ এবং বাঙলা দেশে নাট্য-আন্দোলনেও তিনি অগ্রপথিক। জোড়াসাঁকো-নাট্যমঞ্চে তাঁহারই প্রয়াসে নাট্যাভিনয় সুরু হইয়াছিল এবং নাট্যকার রামনারায়ণের তিনি ছাত্র ছিলেন। মধুসূদন বলিতেন, একমাত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট তিনি টুপি খুলিতে রাজি ছিলেন। বিহারীলালকে দ্বিজেন্দ্রনাথই আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলা যায়। কবি হিসাবে দ্বিজেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব স্বপ্নপ্রয়াণেই সীমাবদ্ধ নয়, মেঘদূত অনুবাদে তাঁহার রসবোধ ও সরসতার অমূল্য নিদর্শন নিহিত। বাঙলা শর্টহ্যাণ্ড প্রণালী তিনিই উদ্ভাবন করিয়াছিলেন এবং এই নীরস-বিষয়কেও তিনি কবিতায় রূপান্তরিত করিয়াছেন।

অলকাপুরী নামক কবিতাংশে মেঘদূতের উত্তরমেঘের যে কয়েকটি শ্লোক অনূদিত হইয়াছে, সমগ্র কাব্যে সেইগুলি কাব্যসৌন্দর্যে উচ্চশ্রেণীর নয়।

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথের অনুবাদে ইহাদের মধ্যে একটি অনায়াস প্রসাদগুণ সঞ্চারিত হইয়াছে। বাঙলায় সংস্কৃত ছন্দের প্রয়োগকৌশলে তিনি দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন এবং মন্দাক্রান্তা ছন্দেও তিনি বাঙলা কবিতা লিখিতে পারিতেন (ভূমিকায় উদাহরণ দ্রষ্টব্য) কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় মেঘদূত-অনুবাদে তিনি মূলের ন্যায় মন্দাক্রান্তা ছন্দ নির্মাণ করেন নাই। সম্ভবত মন্দাক্রান্তা ছন্দের বাঙলা রূপায়ণ তাঁহার মতে গভীর-রসাত্মক কবিতার অনুকূল বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, তাই দীর্ঘ-ত্রিপদী তানপ্রধান ছন্দেই তিনি অনুবাদ করিয়াছেন। যথাসম্ভব নিষ্ঠাপূর্ণ মূলানুসরণই তাঁহার অনুবাদের বৈশিষ্ট্য তবে প্রয়োজনমত দু এক স্থানে স্বাধীন বাক্য যোজনাও করিয়াছেন, ইহাতে মূলের সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই পরন্তু আরও অর্থসংগতি লাভ করিয়াছে। এই দিক দিয়া রঙ্গলালের কুমারসম্ভব অনুবাদ হইতে (দিবাবসানে কবিতা দ্রষ্টব্য) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেঘদূত অনুবাদ অনেক উৎকৃষ্ট। উভয়েই অনুবাদে দীর্ঘত্রিপদী ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন এবং উভয়েই মৌলিক কবিতা রচনায় পারদর্শী। কিন্তু রঙ্গলাল মূলের অর্থ যেরূপ কোন কোন স্থলে পরিবর্তিত করিয়াছেন (যেমন দিবাবসানে কবিতার দ্বিতীয় শ্লোক) দ্বিজেন্দ্রনাথের অনুবাদে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। অবশ্য উভয়ের অনুবাদেই একটি প্রসন্ন সাবলীলতা আছে, তবে রঙ্গলালের তুলনায় এই গুণ দ্বিজেন্দ্রনাথে অধিকতর। কোনো কোনো শ্লোকে মূলের সহিত তুলনায় রঙ্গলাল সম্পূর্ণ অর্থ পরিস্ফুট করিতে পারেন নাই, কিছু কিছু ভাববর্জন করিয়াছেন, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথের অনুবাদে তাহার উদাহরণ যথাসম্ভব কম। একটি ব্যাপারে দ্বিজেন্দ্রনাথ অপেক্ষা রঙ্গলাল কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের অনুবাদ ঈষৎ ব্যাখ্যানিত, স্বল্পবাক্যে সংহত নয়, স্তবকবদ্ধ রচনায় দ্বিজেন্দ্রনাথের দৃষ্টি ছিল না। রঙ্গলাল চার চরণেই এক একটি স্তবক সমাপ্ত করিয়াছেন।

রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ

অট্টালিকা···তোমা মত—নির্বাসিত যক্ষ আকাশবিহারী মেঘকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে যে, অলকা প্রাসাদপুরী, সেখানকার অট্টালিকাগুলি তোমারই মত স্তরে স্তরে সুসজ্জিত। **তোমার···তুলনায়**—সেই অলকার প্রাসাদগুলির সহিত সর্বাংশে মেঘেরই তুলনা করা চলে, মেঘের মধ্যে যেমন তড়িৎমালা, প্রাসাদপুরীর মধ্যে তেমনি সুন্দরী রমণী, উভয়েরই তুল্য-শোভা।

তড়িৎমালার সহিত সুন্দরীর তুলনা সংস্কৃতে ও বৈষ্ণব কবিতায় সুপরিচিত। যেমন, রামায়ণে, রাবণের 'মহীতলে স্বর্গমিব প্রাসাদে,' 'মেঘ যেমন তড়িৎমালায় ভূষিত হয়, সেই গৃহ সেইরূপ বহু ববনারীর সমাবেশে সমুজ্জ্বল।' বিদ্যাপতির পদে আছে, রাধার রূপ কৃষ্ণের কাছে, 'মেঘলতা সনে তড়িৎলতা জনু হৃদয়ে শেল দেই গেল।' **তোমার গর্জনস্বর··বাজে তায়**—প্রাসাদপুরীর মধ্যে সর্বদা সংগীত-অনুশীলন হইতেছে এবং মৃদঙ্গধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে। সেই গম্ভীর মৃদঙ্গধ্বনি মনোহর মেঘগর্জনের সহিত তুলনীয়। রবীন্দ্রনাথও লিখিয়াছেন, 'বাদলমেঘে মাদল বাজে'। **তোমার অন্তরে··সেথায়**—'তোমার মধ্যে যেমন জল আছে, সেই প্রাসাদগুলির কুট্টিম নানা অপরূপ স্বচ্ছ মণিজালে বিরচিত বলিয়া, তেমনি মনে হয় জল থৈ থৈ করিতেছে' (রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের অনুবাদ)। **ইন্দ্রধনু···প্রকাশ**—মেঘে যেমন ইন্দ্রধনু-সমারোহ, তেমনি অলকার গৃহে গৃহে বিচিত্র বর্ণের চিত্রাবলী শোভা পাইতেছে। **হর্ম্যগণ···আকাশ**—অলকার প্রাসাদপুরীগুলি গগনস্পর্শী, এই দিক দিয়াও আকাশচুম্বী মেঘের সহিত তাহারা তুলনীয়। [মূল শ্লোক,

বিদ্যুৎবন্তং ললিতবনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ
সংগীতায় প্রহতমুরজাঃ স্নিগ্ধগম্ভীর ঘোষম্।
অন্তস্তোয়ং মণিময়ভুবস্তুঙ্গমভ্রংলিহাগ্রাঃ
প্রাসাদাস্ত্বাং তুলয়িতুমলং যত্র তৈস্তৈর্বিশেষৈঃ॥ (৬৭ শ্লোক)

অর্থাৎ 'সেই অলকার প্রাসাদসমূহের যে যে বৈশিষ্ট্য আছে তদ্দ্বারা সর্বাংশে তোমার সহিত তুলনা চলে। তোমার যেমন বিদ্যুৎ, প্রাসাদের তেমনি সুন্দরী বনিতা; তোমার ইন্দ্রচাপের তুলনা প্রাসাদের চিত্রাবলী; স্নিগ্ধগম্ভীর গর্জনের তুলনা সংগীতের মুরজবাদ্য; তোমার অন্তঃস্থিত জল, প্রাসাদের মণিময় ভূমি; তুমি যেমন উচ্চ, প্রসাদচূড়াও সেরূপ অভ্রংলিহ', (রাজশেখর বসুর অনুবাদ)। মেঘদূতের সংস্কৃত টীকায় মল্লিনাথের মতে, এই শ্লোক পূর্ণোপমা এবং বিম্ব-প্রতিবিম্বভাবের উদাহরণ; মেঘ উপমান প্রাসাদ উপমেয়। মেঘের বিদ্যুতাদির সহিত প্রাসাদের বনিতাদির সাদৃশ্য বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রনাথের অনুবাদ যথাসম্ভব মূলানুগ ও স্বচ্ছন্দ।]

আলো করি···এসেছি কোথায়—অলকার মণিহর্ম্য প্রাসাদে বিদ্যুৎ-সদৃশা বনিতাগণ রূপে গৃহ উজ্জ্বল করিয়া বিরাজ করিতেছে, তাহাদের সর্বাঙ্গ

কুসুমালংকারভূষিত। এই সকল দৃশ্য স্মরণ করিলে অলকাপুরী হইতে নির্বাসিত যক্ষের স্বভূমির জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। এই অংশ মেঘদূতের কোনো শ্লোকের অনুবাদ নয়, ইহা কবি দ্বিজেন্দ্রনাথের নিজস্ব সংযোজন; পরবর্তী শ্লোকে অলকাপুররমণীদের যে পুষ্পাভরণের বর্ণনা আছে তাহারই প্রসঙ্গসূত্রে ইহা রচিত হইয়াছে মাত্র। **পঙ্কজ তাদের কেশপাশে**— অলকাকামিনীদের ফুলসজ্জার বিবরণ, তাহাদের হস্তে পঙ্কজ (ইহাকে বলে লীলাকমল), কর্ণে শিরীষের ভূষণ, খোঁপায় কুরুবক, কপোল চুম্বন করিবার লোভবশত কেশসন্নিহিত কুন্দকলি মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, চুলে কদম্ব গোঁজা। [মূল শ্লোকটি সৌন্দর্যে সুবিখ্যাত,

হস্তে লীলা কমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারুকর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্॥ (৬৮ শ্লোক)

অর্থাৎ 'হস্তে ধৃত লীলাকমল, কুন্তলে কুন্দকলি বিন্যস্ত,
মুখের মধুরিমা লোধ্রপ্রসবের পরাগে হয়ে যায় পাণ্ডুর,
কর্ণে শোভা পায় শিরীষ মনোহর, তরুণ কুরুবকে কবরী,
এবং তুমি যাকে ফোটাও, সেই নীপে সিঁথির প্রসাধন বধূদের।'

[বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ]

লীলাকমলের একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে, প্রাচীন নারীদের হস্তে কমলধারণ একটি স্টাইল। কিন্তু 'পঙ্কজ তাদের করে'—ইহার দ্বারা অনুরূপ অর্থটি ফোটে নাই। শিরীষ ফুল বিশেষভাবেই কর্ণাভরণ ছিল। কুরুবক সম্ভবত মোরগ ফুল, সুতরাং খোঁপার উপযোগী। অলকের কুন্দ 'কপোল-চুম্বন লোভে' শোভা পায়, এই অংশ অনুবাদকের যোজনা। কদম্ব সিঁথিতে ছিল, দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন 'কেশপাশে'। মুখশ্রী লোধ্ররেণুতে পাণ্ডুর, মূলের এই অংশ বর্জিত হইয়াছে। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয়—পঙ্কজ শরতের, কুন্দকলি হেমন্তের, কুরুবক বসন্তের, শিরীষ গ্রীষ্মের, কদম্ব বর্ষার ও অনুবাদে বর্জিত লোধ্র শীতের ফুল। অর্থাৎ কালিদাস অলকায় একই সঙ্গে ষড়্ঋতুর পুষ্পই কল্পনা করিয়াছেন। পরের চরণগুলি দ্রষ্টব্য।]

সদাই…রহে ফুটি—সেখানে সর্বদাই সকল প্রকার পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়

এবং সেই কারণেই সংবৎসরই ভ্রমর গুঞ্জন করে কারণ ঋতুর প্রচলিত বিভাগীয় শাসন অলকায় নাই। পদ্ম শরতে ফুটিয়া থাকে, কিন্তু অলকায় সারা বৎসরই তাহাদের আনন্দিত বিকাশ। **ময়ূর যতেক·· আঁধার ভুলিয়া**—ময়ূর বর্ষার মেঘোদয়ে উন্মত্ত হইয়া কলাপ বিস্তার করে ও কেকারব করে; কিন্তু অলকায় সর্বঋতুতেই 'উতলা কলাপী কেকাকলরবে বিহরে'। সেখানে প্রতি রাত্রেই চন্দ্র উদিত হয় বলিয়া জ্যোৎস্নাস্নানে রাত্রি প্রত্যহই অন্ধকার ভুলিয়া যায়। [এই কয় ছত্রের মূল দ্রষ্টব্য,

যত্রোন্মত্তভ্রমরমুখরাঃ পাদপা নিত্যপুষ্পাঃ
হংসশ্রেণীরচিতরশনা নিত্যপদ্মা নলিন্যঃ।
কেকোৎকণ্ঠা ভবনশিখিনো নিত্যভাস্বৎকলাপাঃ
নিত্যজ্যোৎস্নাঃ প্রতিহততমোবৃত্তিরম্যাঃ প্রদোষাঃ॥

(৬৯ শ্লোক)

অর্থাৎ 'যেখানে পাদপসকল নিত্যপুষ্পিত এবং মত্তভ্রমরে মুখর, নলিনী সকল নিত্যপদ্মযুক্ত এবং মেখলার ন্যায় হংসশ্রেণী দ্বারা বেষ্টিত, ভবন শিখিগণের কলাপ নিত্য উজ্জ্বল এবং তাদের কণ্ঠ কেকারবের জন্য উন্নত, সায়ংকাল নিত্যজ্যোৎস্নাময় এবং অন্ধকারনিবৃত্তির জন্য রম্য' (রাজশেখর বসুর অনুবাদ)। দ্বিজেন্দ্রনাথ কোন্ অংশ বর্জন করিয়াছেন তাহা সহজেই লক্ষণীয়। যেখানে সব ঋতুর ফুল একসঙ্গে ফোটে সেখানে নিত্য চন্দ্রালোক অসম্ভব নয়। তবে অন্যত্র যক্ষ বলিয়াছে, অলকাপুরী কৈলাসস্থ শিবের ললাট-চন্দ্রের আলোকে নিত্য জ্যোৎস্নাভূষিত।] **হর্ষ বিনা···বিচ্ছেদ-হুতাশ**—যক্ষের মতে, সেই অলকাপুরীতে আনন্দের নিমিত্তই অশ্রুজল পড়ে, বেদনায় নয়; সেখানে যৌবন ভিন্ন বয়স নাই, কোনো বিরহ-বেদনা বা দুঃখ নাই। [মূল শ্লোকটি এইরূপ,

আনন্দোত্থং নয়নসলিলং যত্র নান্যৈর্নিমিত্তৈ-
র্নান্যস্তাপঃ কুসুমশরজাদিষ্টসংযোগসাধ্যাৎ।
নাপ্যন্যস্মাৎ প্রণয়কলহাদ্বিপ্রয়োগোপপত্তি-
র্বিত্তেশানাং ন চ খলু বয়ো যৌবনাদন্যদস্তি॥ (৭০ শ্লোক)

অর্থাৎ 'অন্য হেতু নেই—যেথায় যক্ষেরা অশ্রু ফেলে শুধু পুলকে ;
অন্য তাপ নেই—কেবল কামজ্বর, দয়িত কাছে এলে কেটে যায়,
প্রণয়-অভিমান ব্যতীত অন্যত কখনো বিচ্ছেদ ঘটে না,
যেথায় যৌবন ব্যাপ্ত আজীবন, অন্য বয়সের দেখা নেই'
(বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ)

দ্বিজেন্দ্রনাথের অনুবাদ এই শ্লোকটির সম্পূর্ণ অনুসরণ করে নাই।]

কুবের-আলয়···শোভা পায়—কুবের যক্ষের প্রভু, তাহার প্রাসাদ অতিক্রম করিয়া উত্তরদিকে যক্ষের নিবাস, যাহার বহির্দ্বার ইন্দ্রধনুশোভা-তুল্য। যক্ষ মেঘকে আপনার গৃহের উদ্দেশ জানাইতেছে। [মূল শ্লোকে আছে,

তত্রাগারং ধনপতি গৃহানুত্তরেণাস্মদীয়ং
দূরাল্লক্ষ্যং সুরপতিধনুশ্চারুণা তোরণেন।
যস্যোপান্তে কৃতকতনয়ঃ কান্তয়া বর্ধিতো মে •
হস্তপ্রাপ্যস্তবকনমিতো বালমন্দারবৃক্ষঃ॥ (৮১ শ্লোক)

অর্থাৎ 'যেখানে কুবের গৃহের উত্তরে ইন্দ্রধনুতুল্য চারু তোরণবিশিষ্ট আমাদের আগার দূর থেকে দেখা যায়। তার প্রান্তে আমার কান্তাকর্তৃক পুত্রবৎ বর্ধিত ক্ষুদ্র মন্দার বৃক্ষ আছে, তা হস্তপ্রাপ্য স্তবকভারে নমিত' (রাজশেখর বসুর অনুবাদ)। দ্বিজেন্দ্রনাথ অর্ধাংশ বাদ দিয়াছেন।] **পার্শ্বে এক···করে ঠাট**—যক্ষের আলয়ের পার্শ্বে ভ্রমরগুঞ্জিত পদ্মে পরিপূর্ণ সরোবর। **পদ্মাসনে অলি করে ঠাট**—অর্থাৎ পদ্মের সহিত ভ্রমরদের ছলাকলা চলে সেখানে। **তাহার···মণি-বাঁধা ঘাট**—সেই সরোবরের এক পার্শ্বে মণি-নির্মিত অর্থাৎ মরকতশিলায় বাঁধানো সুন্দর ঘাট। **পরকাশে**—প্রকাশে অর্থাৎ শোভা পায়। **সরসীর······এমনি আরামে**—সেই স্বচ্ছ সরসীর জলে হংস হংসী অবিরাম বিচরণ করিতেছে ; বর্ষাগমে হংসবলাকা-শ্রেণী মানস-সরোবরে প্রস্থান করে, কিন্তু যক্ষের গৃহপার্শ্বের বাপী পরিত্যাগ করিয়া তাহারা কখনই মানস-সরোবরে যাইতে চাহে না। প্রকারান্তরে মানস-সরোবর অপেক্ষা যক্ষের গৃহপার্শ্বস্থ সরোবরের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হইল। 'যাইতে মানস-সরে কারও না মানস সরে'—এই অংশের যমক অলংকার লক্ষণীয়।

[মূল শ্লোক,

বাপী চাস্মিন্ মরকতশিলাবদ্ধসোপানমার্গা
হৈমৈশ্ছন্না বিকচকমলৈঃ স্নিগ্ধবৈদূর্যনালৈঃ।
যস্যাস্তোয়ে কৃতবসতয়ো মানসং সন্নিকৃষ্টং
নাধ্যাস্যন্তি ব্যপগতশুচস্ত্বামপি প্রেক্ষ্য হংসাঃ॥ (৮২ শ্লোক)

অর্থাৎ 'সেখানে একটি বাপীও আছে, তার সোপানপথ মরকতশিলায় বাঁধানো এবং তা স্নিগ্ধ বৈদূর্যমণির নালযুক্ত বিকশিত হৈমকমলে আচ্ছন্ন। তার জলে যে সকল হংস বাস করে তারা তোমাকে দেখেও নিশ্চিন্ত থাকবে এবং নিকটস্থ মানস-সরোবরে যেতে উৎসুক হবে না'।]

উঁচা ভূমি ·····যেন সাজে—নীলকান্তি শিখরযুক্ত পর্বততুল্য একটি উচ্চ ক্রীড়াভূমি যক্ষের গৃহের পার্শ্বেই বিরাজমান। উহা সোনার কদলীবৃক্ষের দ্বারা পরিবেষ্টিত; মনে হয় যেন মেঘের চারপাশে বিদ্যুৎবিকাশ। [দ্রষ্টব্য মূল শ্লোক,

তস্যাস্তীরে রচিতশিখরঃ পেশলৈরিন্দ্রনীলৈঃ
ক্রীড়াশৈলঃ কনককদলীবেষ্টনপ্রেক্ষণীয়ঃ।
মদ্গেহিন্যাঃ প্রিয় ইতি সখে চেতসা কাতরেণ
প্রেক্ষ্যোপান্তস্ফুরিত তড়িতং ত্বাং তমেব স্মরামি॥ (৮৩ শ্লোক)

অর্থাৎ 'তার তীরে সুন্দর ইন্দ্রনীলমণিময় শিখরযুক্ত ক্রীড়াশৈল আছে, তা কনককদলীতরুর বেষ্টনহেতু দর্শনযোগ্য। সখে, তোমার প্রান্তদেশে বিদ্যুৎস্ফুরণ দেখে আমি কাতরচিত্তে আমার গেহিনীর প্রিয় সেই ক্রীড়াশৈলই স্মরণ করছি' (রাজশেখর বসুর অনুবাদ)।]

মাধবী মণ্ডপ···অশোক বকুল—যক্ষের গৃহপ্রাঙ্গণে মাধবীমণ্ডপের উপর অলিবাঞ্ছিত ফুলগন্ধযুক্ত কুরুবক বেষ্টিত এবং দুটি পত্রপুষ্পসমাচ্ছন্ন অশোক ও বকুলতরু উহাদের সন্নিকটে বিরাজ করিতেছে। **অশোক ভাবিছে···ভাবয়ে দিনরাত**—যক্ষগৃহসংলগ্ন অশোক তরু যেন আপন মনে চিন্তা করিতেছে, রূপসী বধূর চরণস্পর্শ করে তাহাকে পুষ্পিত করিবে; বকুলের অনুরূপ বাসনা, সুন্দরী বণিতার মুখস্পৃষ্ট মদিরা (অর্থাৎ কুলকুচা করা মদ) বকুলতরুর উপর পড়িলে বকুলও পুষ্পসম্ভব হইয়া উঠিবে। সুন্দরী যুবতীর বাম-পদস্পর্শে

অশোকতরু মঞ্জরিত হয় এবং ললনামুখনিঃসৃত মদিরা পান করিলে বকুল ফোটে, ইহা প্রাচীন কবিপ্রসিদ্ধি (দিবাবসানে কবিতার আলোচনা-অংশ দ্রষ্টব্য)। মল্লিনাথ বলিয়াছেন, নারীর স্পর্শে প্রিয়ঙ্গু নামক একপ্রকার গন্ধলতা ফুটিয়া উঠে, মুখোচ্ছিষ্ট মদিরায় বকুল বিকশিত হয়, পদাঘাতে অশোক, দৃষ্টিবিক্ষেপে তিল এবং আলিঙ্গনে কুরুবক, নারীর নর্মবাক্যে মন্দার, হাস্যে চম্পক, নিশ্বাসে আম্রমুকুল, সংগীতে রুদ্রাক্ষ ও নৃত্যে কর্ণিকার বিকশিত হয়। এইজন্য প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে দেখা যায়, 'সুলক্ষণা ললনাগণ আকাশে ফুল ফুটাইবার জন্য অশোকে বামপদের আঘাত এবং বকুলে শীধু-গণ্ডূষের সিঞ্চন করিয়া থাকেন।' এখানে যক্ষ কেবল কবিপ্রসিদ্ধিরই উল্লেখ করে নাই ; যক্ষ বিরহে তাহার প্রিয়া যেন অবিরত বিরলগৃহে একাকিনী বসিয়া থাকে, বকুল-অশোক পুষ্পিত করিবার বাসনা তাহার নাই।'

[মূল শ্লোক,

রক্তাশোকশ্চলকিশলয়ঃ কেশরশ্চাত্র কান্তঃ
প্রত্যাসন্নৌ কুরুবকবৃতের্মাধবীমণ্ডপস্য।
একঃ সখ্যাস্তবসহময়া বামপাদাভিলাষী
কাঙ্ক্ষত্যন্যো বদনমদিরাং দোহদচ্ছদ্মনাস্যাঃ॥ (৮৪ শ্লোক)

অর্থাৎ রেখেছে বেড়া দিয়ে ফুল্ল কুরুবক সেথায় মাধবীর বিতানে,
অদূরে কমনীয় বকুলতরু, আর কম্প্রকিশলয় রক্তাশোক ;
হে মেঘ, সে তোমার সখির বামপদ আমারই মত করে অভিলাষ,
অন্যজন তার দোহদ ছল ক'রে চায় যে বদনের মদিরা।

(বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ)

দ্বিজেন্দ্রনাথের অনুবাদ মূলের তুলনায় স্বচ্ছন্দ।]

তাহার মাঝেতে……কল্পি দাড়—অশোক বকুলের মধ্যভাগে ময়ূরের নিমিত্ত নির্মিত স্বর্ণ দাঁড়, সেখানে উদ্‌গ্রীব কোকোৎকণ্ঠ ময়ূর সন্ধ্যায় আসিয়া বসে। **তাহারে……তার বালা**—যক্ষপ্রিয়া সন্ধ্যাবেলায় বলয়কঙ্কণের সহিত করতালি দিয়া সেই ময়ূরকে নৃত্য করায়। তুলনীয়,

'তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া
ভবন-শিখীরে নাচায় গণিয়া গণিয়া' (বর্ষামঙ্গল—রবীন্দ্রনাথ)

[মূল শ্লোক,

তন্মধ্যে চ স্ফটিকফলকা কাঞ্চনী বাসযষ্টি-
মূলে বদ্ধা মণিভিরনতিপ্রৌঢবংশ-প্রকাশৈঃ।
তালৈঃ শিঞ্জাবলয়ঃ সুভগৈর্নর্তিতঃ কান্তয়া মে
যামধ্যাস্তে দিবসবিগমে নীলকণ্ঠঃ সুহৃদ্ বঃ॥ (৮৫ শ্লোক)

অর্থাৎ 'আবার সেই তরুদ্বয়ের মধ্যে স্ফটিক ফলকযুক্ত কাঞ্চনময় বাসযষ্টি আছে, তার নিম্নদেশ অনতিপক্ক বংশের তুল্য আভাময় মণির দ্বারা বদ্ধ। তোমার সুহৃৎ ময়ূর দিবাবসানে তাতে বসলে আমার কান্তা বলয় শিঞ্জিত ক'রে মধুর করতালি দিয়ে তাকে নাচায়' (রাজশেখর বসুর অনুবাদ)। মূলের বর্ণনা অনুবাদে দ্বিজেন্দ্রনাথ সংক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন।] **স্মরিতে …হৃদয়ের জ্বালা**—সুদূর রামগিরি পর্বতে নির্বাসিত যক্ষ মেঘের নিকট তাহার বাসগৃহ ও উহার চতুপার্শ্বস্থ দৃশ্যাবলী এবং জীবনযাপনের বর্ণনা দিতে দিতে ক্রমশ গৃহবিরহ স্ত্রীবিরহে উদ্‌ভ্রান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। মূলে এইরূপ কোনো পংক্তি না থাকিলেও প্রসঙ্গসূত্রে এইরূপ আক্ষেপ স্বাভাবিক বলিয়াই দ্বিজেন্দ্রনাথ তাহা সংযুক্ত করিয়াছেন। **এসকল দিবস-অবসানে**—মেঘকে যক্ষ বলিতেছে, অলকাপুরীতে তাহার গৃহ এই সকল নির্দেশের দ্বারা সহজেই চিনিতে পারা যাইবে। কিন্তু যক্ষ মনস্তাপের সহিত বলিতেছে যে, এক্ষণে যক্ষের অভাবে সে গৃহ শূন্যপ্রায়, সর্বক্ষণ যেখানকার সরোবরে কমল শোভা পাইত সম্প্রতি সেখানে সন্ধ্যায় আর পদ্ম শোভা পায় না। আপাত-দৃষ্টিতে পংক্তিটি অর্থহীন মনে হয়। ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে 'হৃদয়েতে পেয়ে সুখ সদা হাসি হাসি মুখ কমলিনী সদা রহে ফুটি'—অর্থাৎ যক্ষের গৃহস্থ সরোবরে পদ্ম কখনও মুদিত হইত না, সূর্যাবসানেও নয়। কিন্তু শেষ পংক্তির অর্থ তদনুযায়ী, যক্ষের অভাবে বর্তমানে সন্ধ্যাকালে সেখানে পদ্ম বিকশিত থাকে না। [প্রকৃতপক্ষে মূল শ্লোকের অর্থ অন্যরূপ ছিল,

এভিঃ সাধো হৃদয়নিহিতৈর্লক্ষণৈর্লক্ষয়েথাঃ
দ্বারোপান্তে লিখিতবপুষৌ শঙ্খপদ্মৌ চ দৃষ্ট্বা।
ক্ষামচ্ছায়ং ভবনমধুনা মদ্বিয়োগেন নূনং
সূর্যাপায়ে ন খলু কমলং পুষ্যতি স্বামভিখ্যাম্॥

অর্থাৎ 'হে সাধো, তোমার হৃদয়নিহিত এই সকল লক্ষণ দ্বারা এবং দ্বার-পার্শ্বে অঙ্কিত শঙ্খপদ্মের চিত্র দেখে আমার ভবন চিনতে পারবে ; তা এখন আমার বিরহে নিশ্চয়ই ক্ষীণপ্রভ। সূর্যের অভাবে কমল কখনই নিজ শোভা ধারণ করে না' (রাজশেখর বসুর অনুবাদ)।]

ব্যাখ্যা

তোমার তড়িতমালা……কিবা তুলনায় [রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]।

তোমার অন্তরে……তেমনি প্রকাশ [রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]।

সূর্য বিনা……বিচ্ছেদ-হুতাশ [রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]।

এবে উহা……দিবস-অবসানে [রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]।

প্রশ্ন ১। অলকাপুরী কবিতা অবলম্বন করিয়া অলকাপুরীর একটি সৌন্দর্যচিত্র অঙ্কন কর। [ভাবার্থ দ্রষ্টব্য]

প্রশ্ন ২। বঙ্গলালের দিবাবসানে এবং দ্বিজেন্দ্রনাথের অলকাপুরী কবিতা-দ্বয় অবলম্বনে কালিদাসের কুমারসম্ভব এবং মেঘদূত এই দুই রচনার অনুবাদে উভয় কবির কৃতিত্বের তুলনামূলক আলোচনা কর। [অলকাপুরী কবিতার আলোচনা দ্রষ্টব্য]

কৃষ্ণার্জুন : নবীনচন্দ্র সেন

ভূমিকা

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মধুসূদনের মহাকাব্য-রচনার রূপরীতি ও আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া যাঁহারা বাঙলা কাব্যসাহিত্যে স্থানলাভ করিয়াছিলেন, নবীনচন্দ্র সেন তাঁহাদের শেষ প্রতিনিধি। স্তিমিত প্রতিভা ও বাক্‌পটুতায় তিনি হেমচন্দ্রেরই দোসর। কিন্তু ওজস্বিতার সহিত ভক্তিরসের যোগে তাঁহার জনপ্রিয়তা

কবি-পরিচয়

হেমচন্দ্রের তুলনায় আরও স্থায়ী হইয়াছিল। নবীনচন্দ্র উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ছিলেন এবং ইংরাজি কাব্যকবিতার সহিত তাঁহারও আবাল্য চিৎসংসর্গ ঘটিয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অনুকরণ করিয়া ছাত্রবয়সে তাঁহার পদ্যবন্ধ রচনার সূত্রপাত, তারপর দীর্ঘ বয়স পর্যন্ত ইতিহাস, পুরাণ, ভক্তিশাস্ত্র বাস্তব জগৎ, বহু প্রসঙ্গেই তিনি অক্লান্ত লিখিয়া গিয়াছেন। অবকাশ-রঞ্জিনী তাঁহার খণ্ড গীতিকাব্যের সংকলন। পলাশীর যুদ্ধে স্বাধীনতার শেষ গৌরবের বিষণ্ণ কাহিনী ছন্দোবদ্ধ করিয়া তিনি সহসা জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। বঙ্গমতী ক্লিওপেট্রা কুরুক্ষেত্র অমিতাভ অমৃতাভ প্রভৃতি কাব্যগুলি অর্ধ-ঐতিহাসিক অথবা পৌরাণিক কাহিনী-ভিত্তিক এবং রচনাসৌকর্যে উল্লেখযোগ্য নয়। নবীনচন্দ্র গদ্যে জীবনী ও একটি উপন্যাসও রচনা করিয়াছিলেন। তবে তাঁহার সর্বাধিক আলোচিত কাব্য তিনটি, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস, এই তিনটি কাব্য একই বৃহত্তর কাব্য-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। সমগ্র মহাভারতের কাহিনী অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নায়ক করিয়া নবীনচন্দ্র এক অভিনব মহাভারত রচনার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। খণ্ডচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত জাতিভেদজর্জরিত পরস্পরবিবদমান ভারতবর্ষকে নিষ্কাম প্রেম ও মৈত্রীর ডোরে সংগ্রথিত করিয়া পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ যে মহাভারতভূমি গঠনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাই নবীনচন্দ্র এই কাব্যত্রয়ীতে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। যে নিরাসক্ত কাব্যসাধনা ও সংযত সংগঠনপ্রতিভা থাকিলে ইহা সম্ভবপর হইত, তাহা নবীনচন্দ্রের ছিল না। মহাকাব্য রচনার ছলে তিনি এক আধুনিক শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল পাঁচালি লিখিয়াছেন মাত্র।

কাব্যকৃতি

ত্রয়ী-মহাকাব্য-পরিচয়

কৃষ্ণার্জুন কবিতাটি নবীনচন্দ্রের রৈবতক কাব্যের সপ্তদশ সর্গ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। 'মহাভারত' নামক এই দীর্ঘ সর্গের বিষয়বস্তু—রৈবতক পর্বতের শোভা দর্শন করিয়া অর্জুন পথ ভুল করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সাধনগৃহে উপনীত হইবার পর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁহার ধ্যানকল্পনার আভাস দিলেন, অর্জুনের বাহুবল ও সাহচর্যের দ্বারা এক অখণ্ড ধর্মরাজ্য মহাভারত স্থাপন করাই তাঁহার অভিপ্রায়। অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথনচ্ছলে এই মহাভারত গঠনের পরিকল্পনা বিবৃত হইয়াছে বলিয়া এই অংশের নাম সংকলনকার দিয়াছেন কৃষ্ণার্জুন।

উৎস ও নামকরণ

ভাবার্থ

শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কাম ধর্মের সাহায্যে এক অখণ্ড মহাভারত গঠনের স্বপ্ন অর্জুনের নিকট বিবৃত করিলে অর্জুন বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন যে, নিষ্কামধর্ম জগতে প্রচার করাই যদি শ্রীকৃষ্ণের মহাব্রত হয় তবে সমগ্র জগতই তো তাহার আশ্রয়। ক্ষুদ্র নবরাজ্য ভারতবর্ষকে তিনি গ্রহণ করিতেছেন কেন? তখন কৃষ্ণ তাঁহার আদর্শ ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন যে, যতদিন সমগ্র ভারতে খণ্ডরাজ্যসমূহ থাকিবে ততদিন খণ্ড ধর্মও থাকিবে, কারণ তরু ভিন্ন হইলে তাহার ফলফলও ভিন্ন হইবে। এক ধর্ম এক জাতি ও একই রাজনীতির সাহায্যে কৃষ্ণ আর্যাবর্ত-জননীর খণ্ডদেহ ঐক্যবদ্ধ করিতে চান, নতুবা ভারতময় হিংসাবিদ্বেষ নিবারিত হইবে না, আর্যবসতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। ধর্মভিত্তি ব্যতীত সাম্রাজ্য ও সমাজ সুগঠিত হইতে পারে না, পাপ-সমুদ্রে ভাসিয়া যায়। সংসার কেবল সত্ত্বগুণমাত্রে সৃজিত নয়। অর্জুন এই নিষ্কাম ধর্মের আদর্শ অনুধাবন ও অনুসরণের অঙ্গীকার করিলে কৃষ্ণ গৃহভিত্তিতে অঙ্কিত ভারতজননীর চিত্র দেখাইয়া অর্জুনের কর্তব্যপথ নির্দেশ করিলেন। নারায়ণপদে সকল কর্মফল সমর্পণ করিয়া কৃষ্ণার্জুন এক কর্তব্য-ব্রতে আত্মসমর্পণ করিবেন এইরূপ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলেন। ঐকধর্ম, এক জাতি, একনীতি, সর্বভূতহিতই হইবে তাহাদের কর্তব্য, সাধনা হইবে নিষ্কাম কর্ম, লক্ষ্য হইবে পরম ব্রহ্ম, তবেই মহাভারত-ধর্মরাজ্য স্থাপিত হইবে।

সপ্রসংক্ষেপ

আলোচনা

রৈবতক কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস এই ত্রয়ী মহাকাব্যের মধ্য দিয়া নবীনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে নায়ক করিয়া এক মহাভারত গঠনের যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহা কাব্যনির্মাণের তারল্য ও বহুভাষিতার জন্য সুগঠিত হইতে না পারিলেও আদর্শের উচ্চতার জন্য তৎকালে উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছিল। নবীনচন্দ্রের ভাষায় "রৈবতক কাব্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদিলীলা, কুরুক্ষেত্রকাব্য মধ্যলীলা, এবং প্রভাসকাব্য অন্তিমলীলা লইয়া রচিত।" তিন কাব্যে কথিত কাহিনীতে নবীনচন্দ্রের বক্তব্য, বহুপূর্বে ভারতবর্ষ ছিল নাগ-নামক জাতিবিশেষের, বাসভূমি, পরে

নবীনচন্দ্রের মহাকাব্য-ত্রয়ীর বক্তব্য

আর্যদের দ্বারা তাহারা সম্পূর্ণ পরাজিত হয়। কতকগুলি অনার্য নাগ আর্যের দাসত্ব গ্রহণ করিয়া শূদ্র নামে পরিচিত হইল। আর্যগণ জাতিভেদ প্রথার প্রবর্তন করিলেন এবং ব্রাহ্মণগণ যাগযজ্ঞের অত্যাচারে বর্ণভেদে সমাজদেহকে খণ্ডিত ও মুমূর্ষু করিয়া তুলিলেন। তখন নারায়ণাবতার কৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটিল সমগ্র ভারতবাসীকে একজাতীয় একধর্মবিশিষ্ট ও একরাষ্ট্রনীতির অধীন করিবার জন্য। অর্জুনের বাহুবল হইল কৃষ্ণের সহায়, তুর্বাসা হইলেন কৃষ্ণদ্রোহী ব্রাহ্মণদের প্রতিনিধি। তুর্বাসার প্রচণ্ড শত্রুতা ও ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডবদেরই জয় হইল, কৃষ্ণের ঈপ্সিত ধর্মরাজ্য স্থাপিত হইল। কৃষ্ণ সুভদ্রা ও শৈলজানাম্নী নিষ্কাম ধর্মপরায়ণা নাগকন্যার সহায়তায় সমগ্র ভারতে গীতা ও কৃষ্ণনাম প্রচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রতিহিংসাপরায়ণ তুর্বাসা শেষ পর্যন্ত কীভাবে ষড়যন্ত্র ও কৌশলে যদুকুল ধ্বংস করিল, ইহাই এই কাব্যত্রয়ীর শেষ অংশ। কাব্য হিসাবে ইহাদের মহিমা অধুনা ম্লান, কেবল হিন্দুধর্মের এক পুনরভ্যুত্থানের উত্তেজিত মুহূর্তে ইহারা লোকচিত্তে ভক্তির বন্যা বহাইয়া দিয়াছিল। এই কাব্যত্রয়ীর ঐতিহাসিক মূল্য, জনৈক সমালোচকের ভাষায়,

ঐতিহাসিক মূল্য

"শ্রীকৃষ্ণ শতধাবিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষকে রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক ঐক্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এক বৃহদ্ভারতের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। একদিকে সামন্তচক্র ও রাজন্যবর্গের পারস্পরিক স্বার্থবিরোধ, অপরদিকে বৈদিক যাগযজ্ঞে অতিশয় আসক্ত ব্রাহ্মণদের কৃষ্ণ ও ক্ষত্রবিরোধিতা এবং ক্ষত্রিয় বিনাশের জন্য শূদ্রের সঙ্গে সহযোগিতা—ইহার মধ্যে কৃষ্ণের রাজনৈতিক ঐক্যসংহতি প্রতিষ্ঠা এবং ব্রাহ্মণ্য প্রভাব ও বৈদিক যাগযজ্ঞের বিরোধিতা করিয়া প্রেমধর্ম প্রচার—নবীনচন্দ্র প্রধানত এই আদর্শই কাব্যত্রয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন।"

[ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—রৈবতক কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস, সম্পাদকের ভূমিকা]

কৃষ্ণার্জুন বিপুল ঘটনাবহুল রৈবতক কাব্যের সপ্তদশ সর্গের অংশ। সমগ্র কাব্যের তুলনায় নিতান্ত সামান্য অংশ হইলেও ইহার মধ্য দিয়া নবীনচন্দ্রের মূল কাব্যাদর্শ শ্রীকৃষ্ণের মুখে বিবৃত হইয়াছে। অর্জুনের ভূমিকা এখানে গৌণ, তিনি কেবল পরিপ্রশ্নের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আদর্শকে সুব্যাখ্যাত করিতে সাহায্য করিয়াছেন এবং এই মহাব্রতে তাঁহার অনুগামিতার ইঙ্গিত দিয়াছেন।

রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ

এ মহানিষ্কামধর্ম—কৃষ্ণ তাহার যে নিষ্কামধর্মের কথা বলিয়াছেন তাহা ঠিক গীতার নিষ্কামধর্ম নয়। পূর্ববর্তী কয়েকটি পংক্তিতে অর্জুন এই নিষ্কামধর্মের স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলে কৃষ্ণ বলিয়াছেন,

বিষ্ণুশক্তি জগন্মাতা
—পঞ্চভূতে অধিষ্ঠিতা,
পঞ্চভূতময়ী সৃষ্টি, সর্বত্র সমান
দেখ মহাশক্তিরূপে বিষ্ণু অধিষ্ঠান।
পার্থ! সর্বভূত-হিত
যাহাতে হয় সাধিত,
নিষ্কাম সে কর্ম,—ধর্ম, পুণ্যফল তার।
হয় সর্বভূত-আত্মা বিষ্ণুতে সঞ্চার।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান্ বলিয়াছেন,

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি॥ ২।৪৭

অর্থাৎ 'কেবলমাত্র কর্মে তোমার অধিকার আছে, ফলে নহে। অতএব কর্ম কর। কিন্তু কর্মফলে যেন কখনও তোমার আসক্তি না হয়, কারণ কর্মফলের তৃষ্ণাই কর্মফল প্রাপ্তির হেতু। সুতরাং কর্মফল প্রাপ্তির হেতু হইও না অর্থাৎ কর্ম সকামভাবে করিও না। আবার কর্মত্যাগেও তোমার প্রবৃত্তি না হউক' (উদ্বোধন-সংস্করণ)। উনিশ শতকে নিষ্কামধর্ম বঙ্কিমচন্দ্রকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। বিবেকানন্দও বলিয়াছেন, 'বুদ্ধদেব ধ্যানের দ্বারা ও যীশুখ্রীষ্ট প্রার্থনার দ্বারা যে আধ্যাত্মিক অবস্থা ও দিব্যভাব লাভ করিয়াছিলেন, অনাসক্ত কর্মী নিষ্কাম কর্মের দ্বারাও সেই উচ্চাবস্থা লাভ করিবেন'।

এ মহা…মহাব্রত তব—অর্জুন কৃষ্ণের যে মহাব্রতের কথা বলিয়াছেন, তাহা মূল গ্রন্থে পূর্ববর্তী কাব্যাংশে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যথা

বাঁধি ধর্ম-নীতি-পাশে
মিলাইব অনায়াসে
জননীর খণ্ড দেহ, করিয়া চালিত
জ্ঞানাঙ্কুশে, ভেদ-জ্ঞান করিব রহিত।

শিখাব একত্ব-মর্ম,
এক জাতি, এক ধর্ম ,
এরূপে করিব এক সাম্রাজ্য স্থাপন,—
সমগ্র মানব প্রজা, রাজা নারায়ণ।

কি কাজ কোন ছার—কৃষ্ণ যে মহাব্রতের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সমগ্র মানব সমাজকে লইয়া, সুতরাং কেবল ভারত-সাম্রাজ্য কেন তাঁহার আশ্রয় হইবে, ইহাই অর্জুনের প্রশ্ন। বিশ্বরাজ যে মহানুভবের আশ্রয়, সমগ্র মানব যাঁহার প্রজা, ক্ষুদ্র নররাজ্য ভারতবর্ষ লইয়া তিনি কী করিবেন? **যতদিন··· ভেদময়**—অর্জুনের পরবর্তী প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে, ভারতবর্ষে একধর্ম একরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, যতদিন ভারতবর্ষে খণ্ড খণ্ড অসংখ্য রাজ্য থাকিবে ততদিন জাতিভেদ থাকিবে এবং ধর্মভেদ থাকিবে, কারণ রাজ্যভেদেই ধর্মভেদ ঘটে। **ফল ফুল এই নীতি**—উদাহরণ দিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, ফল ও ফুলের বিভিন্নতার জন্যই যেরূপ বৈচিত্র্য ঘটে, বীজের নানারূপত্বই বৃক্ষের গঠনভেদের কারণ, ইহাই প্রকৃতির নীতি। **ক্ষুদ্র··· যথায় তথায়**—বীজ বা পুষ্প আকারে ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহা হইতে যে বৃক্ষের জন্ম হয় তাহা বিপুলকায়, বীজের ভিন্নতা বোঝা যায় না। কিন্তু বৃক্ষ হইতে তাহা প্রমাণিত হয়। সেইরূপ খণ্ড খণ্ড রাজ্য ও জাতিভেদ হইতেই ধর্মের ক্ষেত্রে এক বিপুল ভেদের সৃষ্টি হয়।

একধর্ম···হবে না মিলিত—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ এক মহারাজনীতিজ্ঞের প্রতিভা দেখাইয়াছিলেন বলিয়া কবির বিশ্বাস। এই যুদ্ধ কেবল ধর্মযুদ্ধ নয়, জাতিভেদ রাষ্ট্রভেদ ঘুচাইয়া তিনি এক অখণ্ড সার্বভৌম ভারতরাষ্ট্রের গঠন পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। তবেই জননী ভারতভূমির খণ্ডদেহ মিলিত হইবে। এই ভারত সাম্রাজ্য গঠনই তাঁহার রাজনীতি। **ততদিন ··ভারত**—ভারতবর্ষ তাহার আঞ্চলিক বিভিন্নতা ও জাতিভেদত্ব দূর করিতে না পারিলে ভারতবাসীর পারস্পরিক কলহ ঘৃণা-বিদ্বেষ ও হিংসার আগুনে ভারতবর্ষ ধ্বংস হইয়া যাইবে। এই আত্মঘাতী-কলহরূপ হলাহল নিভানোই শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য। **আর্যজাতি···স্বপ্নবৎ**—বৈদিক যুগ হইতে যে আর্যসভ্যতা আর্যজাতির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, যাহার স্থান

সভ্যতার ইতিহাসে সর্বোচ্চ ছিল, ব্রাহ্মণ্য যুগে জাতিভেদ বর্ণাশ্রমধর্মের ফলে তাহা ক্ষুণ্ণ হইয়া গিয়াছে। সেই আদি বৈদিক সভ্যতার সুনাম পুনঃপ্রবর্তনই শ্রীকৃষ্ণের বাসনা। **ধর্মভিত্তি···কালপারাবারে**—যে রাষ্ট্রের কোনো ধর্মগত ঐক্য নাই তাহা সুদৃঢ় হইতে পারে না। উহা যেন বালিতে নির্মিত সমাজ বা সাম্রাজ্য---কিন্তু তাহা চিরস্থায়ী নয়, এক সময় অবশ্যই সেই বালুকানির্মিত রাষ্ট্র কালসমুদ্রে ভাঙিয়া পড়িবে। **তেমতি হে সংসার**—শ্রীকৃষ্ণ বীর অর্জুনকে বুঝাইতেছে যে, ধর্মপ্রচারের জন্য একটি সমাজ এবং সাম্রাজ্যের শক্তির প্রয়োজন, নতুবা সেই ধর্মপ্রচার করা সম্ভব নয়। সংসার কেবল সত্ত্বগুণেই সৃষ্ট নয়। সত্য ন্যায় দয়া ধর্ম শ্রদ্ধা ভক্তি ঔদার্য প্রভৃতি গুণগুলিকে সত্ত্বগুণ বলে। [এই চরণের অর্থ পূর্ববর্তী বা পরবর্তী চরণের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ মনে হয় না।] **তোমার কর্তব্যপথ স্থন্দর**—শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিষ্কামধর্মের আদর্শ ও কর্তব্য শিক্ষা প্রসঙ্গে দেওয়ালে ভারত জননীর চিত্র দেখাইলেন। মূল কাব্যে পূর্ববর্তী স্তবকে এই চিত্রের বর্ণনা আছে—

চিত্র ভারতের পার্থ ' আর্যলক্ষ্মী দেবী
খণ্ড দেহ, খণ্ড দেশ,
দেখ গৃধ্র নিবিশেষ
ভারত-নৃপতিগ্রাম দেখ ভুবিষহ
বর্তমান ভারতের চিত্র শোকাবহ। ইত্যাদি

ততোধিক···মহত্তর—ইহা অপেক্ষা (অর্থাৎ জননী ভারতবর্ষের সেবা) মহত্তর মনুষ্যধর্ম আর নাই। **এস মিলি···সমর্পিয়া**—শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন দুইজনে মিলিয়া অখণ্ড ভারত-সাম্রাজ্য গঠনের চেষ্টা করিবেন, কিন্তু নিষ্কামভাবে অর্থাৎ ফলাফল নারায়ণপদে বা ভগবানপদে সমর্পণ করিয়া। [নবীনচন্দ্রের কাব্যে শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যাবতার, তিনি স্বয়ং ভগবান্ নন।] **এক ধর্ম ··মহাভারত স্থাপিত**—আলোচ্য অংশে শ্রীকৃষ্ণ তাহার মহাভারত গঠনের অভিনব পরিকল্পনা ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের সাধনা এক অখণ্ড সার্বভৌম ভারত-সাম্রাজ্য গঠন করা। যেখানে একটিমাত্র ধর্ম থাকিবে, একটিমাত্র জাতি, একটি রাষ্ট্র এবং একই নীতি বিরাজ করিবে। সর্বজীবের মঙ্গলকামনাই হইবে এই রাষ্ট্রের একমাত্র ভিত্তি। এই সাম্রাজ্য-গঠনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের যে সাধনা, তাহা কোনো ফললাভের জন্য নয়, তাহা নিষ্কাম, ফলাকাঙ্ক্ষাবিহীন।

তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরমব্রহ্ম বা ভগবানের চরণ লাভ। এই মহাভারতই কৃষ্ণের ধর্মরাজ্য, ইহা তিনি অবশ্যই স্থাপন করিবেন।

ব্যাখ্যা

ফল ফুল যথায় তথায় [রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]।

ধর্মভিত্তি···কাল পারাবারে [রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]।

একধর্ম···মহাভারত স্থাপিত [রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]।

প্রশ্ন ১। কৃষ্ণার্জুন কবিতায় যে 'ধর্মরাজ্য মহাভারত' গঠনের পরিকল্পনা বিবৃত হইয়াছে, তাহার স্বরূপ আলোচনা কর।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলা দেশে যে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন ও হিন্দু সংস্কৃতির পুনরুদ্দীপন ঘটিয়াছিল, সেই ধর্মীয় জাগরণের অন্যতম উদ্‌গাতা ছিলেন নবীনচন্দ্র। তিনি তাঁহার রৈবতক কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস এই মহাকাব্যত্রয়ীর মধ্য দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নায়ক করিয়া এক অখণ্ড ধর্ম ও জাতিভেদহীন মহাভারত সাম্রাজ্য গঠনের কল্পনা করিয়াছিলেন। মহাভারত গীতা হরিবংশ ভাগবত বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি পুরাণশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া নবীনচন্দ্র ইহার কাহিনী নির্মাণ করেন এবং মহাভারতীয় যুগের পটভূমিকা সংস্থাপন করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, ব্রাহ্মণ্যযুগে ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্রবর্তিত জাতি ও বর্ণভেদ প্রথায় সমাজে যে বর্ণবৈষম্য ও আত্মঘাতী বিভেদ সৃষ্টি হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহা দূর করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। অনার্যশক্তির সহায়তায় অর্জুনের সাহায্যে কৃষ্ণার্জুন দুর্বাসা প্রমুখ ব্রাহ্মণশক্তিকে পরাস্ত করিয়া একধর্মরাজ্য পাশে ভারতবর্ষকে গ্রথিত করিয়া তাহার আকাঙ্ক্ষিত ধর্মরাষ্ট্র স্থাপন করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যত্রয়ীর প্রথম খণ্ড রৈবতকের মহাভারত নামক সপ্তদশ সর্গ হইতে উদ্ধৃত আলোচ্য কৃষ্ণার্জুন শিরোনামা চিহ্নিত কবিতায় অর্জুনের সহিত কথোপকথন ও ব্যাখ্যানচ্ছলে কৃষ্ণের মুখে তাঁহার মহাভারত-গঠন পরিকল্পনা বিবৃত হইয়াছে।

কৃষ্ণের উদ্দেশ্য দ্বিবিধ, এক, ধর্মসংস্থাপন, দুই, সার্বভৌম রাষ্ট্রগঠন। উভয়েই পরস্পরের পরিপূরক। ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল ব্রাহ্মণদের ভেদনীতির দ্বারা শাসিত ও পরিচালিত হইয়া জর্জরিত হইয়াছে। আর্য-অনার্যভেদ, ব্রাহ্মণ

ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের বর্ণ বৈষম্য ধর্মবৈষম্য ভারতবর্ষের সংহতি ও অখণ্ডতা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। এই ভেদনীতি অখণ্ড ভারতজননীর দেহকেই যেন খণ্ড খণ্ড করিয়া দিয়াছে। ভারতবাসী আত্মঘাতী বৈনাশিক কলহে লিপ্ত হইয়াছে। সুতরাং কৃষ্ণ একধর্ম একজাতির রাষ্ট্ররূপে ভারতবর্ষকে গঠন করিতে চান—প্রাচীন বৈদিক যুগের আর্যনাম আর্যজাতিত্বের খ্যাতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে চান। আবার ভারতজননী জগন্মাতা বিষ্ণুশক্তিরই অংশ বলিয়া ইহা এক হিসাবে বিষ্ণুসেবাই—নরনারায়ণ ভগবানেরই সেবা। তাই সর্বভূতের হিতকামনাই শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতির উপায়, সাধনা নিষ্কামধর্ম। তিনি রাষ্ট্রগঠন করিবেন ফলাকাঙ্ক্ষাহীনভাবে, পরমব্রহ্মে লক্ষ্য রাখিয়া, অর্জুনের সহায়তায়। ইহাই অর্জুনের প্রতি তাঁহার ধর্মরাজ্য মহাভারত গঠনের পরিকল্পনার বিবরণ।

প্রশ্ন ২। নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণার্জুন কবিতা এক বিশাল মহাকাব্যের অন্তর্গত। সংক্ষেপে উক্ত মহাকাব্য-পরিকল্পনার আভাস দিয়া আলোচ্য কবিতায় নবীনচন্দ্রের বক্তব্যের সারমর্ম লিখ। [ভূমিকা ও আলোচনা দ্রষ্টব্য]।

বৈশাখ : দেবেন্দ্রনাথ সেন

ভূমিকা

মধুসূদন, বিহারীলাল এবং রবীন্দ্রনাথের কবিধর্ম, কলানৈপুণ্য, রসবোধ এবং সৌন্দর্যদৃষ্টি সমন্বিত হইয়াছিল দেবেন্দ্রনাথ সেনের কবিতায়। বিহারীলালের রোমান্টিক দূরাভিসারের পরিবর্তে দেবেন্দ্রনাথ একপ্রকার গার্হস্থ্য প্রেম মাধুর্য ও সৌন্দর্যের নূতন রোমান্টিক উন্মাদনা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্য-নায়িকা জগৎলক্ষ্মী চৈতন্য-স্বরূপিণী নন, তিনি পত্নীর সেবা-প্রেম-মনোরমা মাধুরীরই ধ্যান করিয়াছেন। ইহার সহিত মিশিয়াছিল বৈষ্ণবীয় ভক্তি ও বাৎসল্যরস। দেবেন্দ্রনাথ রূপের পূজারী এবং দেহকেন্দ্রিক সৌন্দর্যের দিশারী ছিলেন। ইন্দ্রিয়-চৈতন্যকে অবহেলা করিয়া অতীন্দ্রিয় রহস্যে কখনও বিহ্বল হন নাই। প্রকৃতির বর্ণসুষমা ও

গার্হস্থ্য রোমান্টিকতার কবি

রূপ ও সৌন্দর্য-প্রীতি

শোভাসমারোহ, নারীর পারিবারিক মাধুর্য, শিশুর কলকাকলি, মাতার অনুপম স্নেহগভীরতা, নানাবর্ণের পুষ্পের রূপরসগন্ধ দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় এমন একটি ইন্দ্রিয়ের আনন্দ সৃষ্টি করিয়াছে যাহা বিহারীলালের অন্যান্য সমকালীন কাব্যশিষ্যদের মধ্যে দুর্লভ। প্রতীচ্য রোমান্টিক কবিদের সহিত তাঁহার মানসিক সংযোগ ছিল, তাঁহার কাব্যগ্রন্থে কীট্‌সের কবিতায় অনুবাদ আছে। আবার সংস্কৃত কাব্যেও তাঁহার অধিকার ছিল। তাঁহার বিভিন্ন কবিতায় সংস্কৃত কাব্যকবিতার উল্লেখ দেখা যায়। তবে রূপানুরাগে ইন্দ্রিয়বাসনায় প্রেমচেতনায় কীটসের সহিত তাঁহার সহধর্মিতা আছে। কীট্‌সের মতই দেবেন্দ্রনাথ নশ্বর জীবনের রূপমাধুরীর পানপাত্ররূপে বহুতর নানা জাতের পুষ্পবন্দনা করিয়াছেন। অশোকগুচ্ছ, গোলাপগুচ্ছ, পারিজাতগুচ্ছ, শেফালিগুচ্ছ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের নামকরণেই এই পুষ্পপ্রীতি সুমুদ্রিত। তাঁহার অন্যান্য কাব্যের মধ্যে অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা, অপূর্ব-বীরাঙ্গনা, উর্মিলা-কাব্য, নির্ঝরিণী, হরিমঙ্গল, অপূর্ব-শিশুমঙ্গল, অপূর্ব-নৈবেদ্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। দেবেন্দ্রনাথের কাব্যে বিহারীলালের শিথিল অযত্ন-বিন্যস্ত বাক্‌রীতি ও উদাসীন অন্যমনস্কতার বদলে মধুসূদন-সুলভ এক ঋজু সংহতি, ক্লাসিকাল গঠন-পারিপাট্য ও পরিমিতিবোধ আছে। বিশেষত আবেগঘন অথচ মিতবাক্ সংযত সনেট রচনায় তাঁহার গৌরব মধুসূদনের কৃতিত্বেরই অনুজকল্প।

কাব্যবিষয়

কীট্‌স-এর সহিত তুলনা

কাব্যগ্রন্থ

সনেট

বৈশাখ দেবেন্দ্রনাথের শেফালিগুচ্ছ কাব্য হইতে গৃহীত, নামকরণ কবি প্রদত্ত। রুদ্রতনু মহাদেবসদৃশ দহনজ্বালাসমাচ্ছন্ন গ্রীষ্মের প্রথম মাস বৈশাখের একটি রূপচিত্রাঙ্কনই ইহার বিষয়বস্তু, এইজন্য নামকরণ সংগত হইয়াছে।

নামকরণ

ভাবার্থ

শিবরূপী রুদ্র বৈশাখ যখন সন্ন্যাসীর মত তপস্যারত, তখন অনঙ্গরূপী চৈত্রমাস পত্নী বাসন্তী যামিনীর উদ্‌ভ্রান্ত ক্রন্দন অবহেলা করিয়া পুষ্পশরের দ্বারা বৈশাখের ধ্যানভঙ্গ করিতে উদ্যত হইয়াছে। বৈশাখের ললাটে দীপ্ত অগ্নি,

সর্বাঙ্গে ভস্মধূসরতা। সহসা সেই নয়ন হইতে অনল স্ফুরিত হইল, অদৃষ্টচক্রে চৈত্রমাস ভস্মীভূত হইয়া গেল। দিগঙ্গনার ব্যাকুল নিবারণ, নব উষার ক্রোধ সংবরণের অনুনয়, কোকিলের কুহুরবের মিনতি সকলই তাহার নিকট উপেক্ষিত হইল। অশোক-পুষ্প সম্ভ্রমে সেই অগ্নি নিঃসারকের নিকট মাথা নত করিল। অনাথিনী বাসন্তী সীমন্তের এয়োতি চিহ্ন মুছিয়া ফেলিল। তাহার দুঃখে শাল্মলী তাহার রক্তরাগ ফুল ঝরাইয়া দিল, পাপিয়া বসন্তের কোনও নিরাপদ রাজ্যে পলায়ন করিল, করবী ফুলে প্রজাপতি আত্মগোপন করিল। শিরীষ ফুল চোখের জলে সিক্ত হইয়া উঠিল। সমস্ত বনস্থলী চৈত্রের মৃত্যুতে উদ্ভিন্ন যৌবনেই যেন বৈধব্য লাভ করিল। দিনগুলি সারা দিনের ক্লান্তি ও রাত্রি তাহার আয়ুহীনতার কথা চিন্তা করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

বস্তু-সংক্ষেপ

আলোচনা

দেবেন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টি রূপাসক্ত, আপনাকে তিনি 'রূপের পূজারী' বলিয়াছেন। প্রকৃতির চিত্রশালায় বসিয়া তিনি নানা রূপরসের পাত্রে তুলিকা লইয়া ভাবের পৃষ্ঠায় নিসর্গচিত্র আঁকিতে ভালবাসেন, ইহাই তাঁহার প্রকৃতি সৌন্দর্যমুগ্ধ কবিতার স্বভাব। বৈশাখকে অনেকেই রুদ্র মহাদেবের সহিত তুলনা করিয়াছেন, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ তাহাকে মহাদেবের সহিত তুলনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি মহাদেব কর্তৃক মদনভস্মের পৌরাণিক কাহিনী যুক্ত করিয়া এখানে একটি নূতন সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছেন। কুমারসম্ভব কাব্যের প্রসঙ্গসূত্রে কবিতাটি সমৃদ্ধ হইয়াছে। কুমারসম্ভব কাব্যের তৃতীয় সর্গে মহাকবি কালিদাস ঋতুরাজ বসন্তের সহযোগিতায় মদন কর্তৃক মহাদেবের ধ্যানভঙ্গের চিত্র আঁকিয়াছেন। তবে, দেবেন্দ্রনাথ মদন ও বসন্তকে পৃথক দুই চরিত্র নয়, একই চরিত্রে পরিণত করিয়াছেন। বসন্তের অকাল অভ্যুদয়ে সহসা তপোবন রোমাঞ্চিত হইল, দক্ষিণ-পবন বহিতে লাগিল, অশোক, আম্রপল্লব ও কর্ণিকায় চারিদিক প্রফুল্ল হইল। বসন্ত-পত্নী মধুশ্রী ভ্রমরপংক্তির দ্বারা, কজ্জল বালরবিকিরণের দ্বারা অধরের রক্তাভা রচনা করিলেন। ভ্রমর একই কুসুমপাত্রে প্রিয়া পরিভুক্ত পীতমধু পান করিতে

বৈশাখের সহিত মহাদেবের তুলনা

কুমারসম্ভবের কল্পনা

লাগিল, কৃষ্ণসার শৃঙ্গভাগ দ্বারা পত্নীর দেহ স্পর্শ করিতে লাগিল। তরুসংলগ্ন লতাগুলি পর্যাপ্ত পুষ্পস্তবকে আনমিত হইয়া উঠিল। বনস্থলীর এই আকস্মিক পরিবর্তনে কেবল লতাগৃহদ্বারপথে বাম-প্রকোষ্ঠার্পিত-হেমবেত্র নন্দী মুখে অঙ্গুলি দিয়া বনভূমিকে স্তব্ধ হইতে বলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বনভূমি নিস্তব্ধ হইল আর মদন তখন নিঃশব্দে মহাদেবের ধ্যানমূর্তির পশ্চাতে গোপন হইলেন। তখন সহসা বনভূমি উজ্জ্বল করিয়া অরুণরাগবসনে দেহ আবৃত করিয়া পর্যাপ্ত পুষ্পস্তবকাবনম্রা পার্বতী সেই অবৃষ্টিসংরম্ভমেঘের ন্যায় মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। অপর্ণা যেই মুহূর্তে মহাদেবকে প্রণাম করিলেন তৎক্ষণাৎ মদন আশীর্বাদপ্রদায়ী মহাদেবের দিকে পুষ্পধনু নিক্ষেপ করিলেন। মহাদেব প্রথমে জোয়ারতরঙ্গের ন্যায় উদ্বেল হইলেন, পরমুহূর্তেই তাঁহার ত্রিনয়ন মুক্ত হইল,

কালিদাসের মদনভস্ম কাহিনীর প্রেরণা

স্ফুরন্নুদর্চিঃ সহসা তৃতীয়াদক্ষ্ণঃ কৃশানুঃ কিল নিষ্পপাত।

দেবতাগণ 'প্রভু ক্রোধ সংবরণ করুন, সংবরণ করুন' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, তৎপূর্বেই 'বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা ভস্মাবশেষং মদনং চকার', নেত্রজ অগ্নি মদনকে ভস্মীভূত করিয়া দিল। কামবধূ রতি অসহ্য ক্রন্দনে ভূতলে লুণ্ঠিতা হইয়া পড়িলেন, তাঁহার বিকীর্ণমর্ধজা বিলাপে অরণ্য উন্মথিত হইল।

ইহাই দেবেন্দ্রনাথের বৈশাখ কবিতার কাব্যপ্রেরণা। কেবল চিত্রকল্প নয়, শব্দ ব্যবহারেও তাঁহার কবিতায় কুমারসম্ভব পাঠের প্রমাণ আছে। তবে রবীন্দ্রনাথের কল্পনা কাব্যের বৈশাখ কবিতাই তাঁহার প্রত্যক্ষ প্রেরণা ছিল মনে হয়। কল্পনার বৈশাখ ১৩০৬ সালে এবং দেবেন্দ্রনাথের শেফালিগুচ্ছ, যাহার মধ্যে বৈশাখ কবিতাটি আছে, ১৩১৫-র কাছাকাছি প্রকাশিত হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা

রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ

(প্রথম স্তবক)—**কপালে কঙ্কণ হানি**—ললাটে করাঘাত করিয়া। কঙ্কণ মাঙ্গল্য ও সাধব্যের প্রতীক। নারীর দুরদৃষ্টবশত পতিবিয়োগ ঘটিয়াছে বলিয়া সেই কঙ্কণের দ্বারা কপালে আঘাত করার মধ্যে বৈধব্যগ্লানির দুর্বিষহতাই ব্যঞ্জিত হইতেছে। **মুক্ত করি চুল**—কেশপ্রসাধন এয়োতির

ধর্ম, সুতরাং বাসন্তী যামিনী সদ্য বিধবা হইয়াছে বলিয়া কেশদাম আলুলায়িত করিয়াছে। **বাসন্তী ·আকুল**—স্বামী চৈত্রমাসের অকাল-বিয়োগে বাসন্তী যামিনী বৈধব্যের বেদনায় ক্রন্দনকাতরা হইয়াছে। **স্বামী তার চৈত্রমাস**—চৈত্রমাসের পর বৈশাখের আগমন হয়, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ঋতুর এই পর্যায়ক্রম স্বীকার করেন নাই। তাঁহার কল্পনা বাসন্তী যামিনী ও চৈত্রমাস অর্থাৎ বসন্ত, অনঙ্গমদন ও রতির ন্যায় দম্পতি, তাহাদের পল্লবসমারোহ ও পুষ্পিত যৌবনের বিপুল গর্বে তাহারা ধ্যানস্তব্ধ মহাদেবসদৃশ বৈশাখের ধ্যানভঙ্গ করিতে গিয়াছিল। কিন্তু রুদ্রতপঃ সেই বৈশাখের ত্রিনেত্রবহ্নিতে অনঙ্গ চৈত্র ভস্মীভূত হইয়া গেল, বসন্তের যৌবন-চাঞ্চল্যের পরিসমাপ্তি ঘটিল, বাসন্তী রাত্রির সৌন্দর্যের অবসান ঘটিল। প্রাকৃতিক দিক হইতে ইহারই নাম চৈত্রের পর বৈশাখের আগমন। **অনঙ্গের মত**—চৈত্রমাস তাহার বসন্ত-সমারোহের দ্বারা শিবরূপী বৈশাখের ধ্যানভঙ্গ করিতে উদ্যত, তাই কুমারসম্ভবের ঘটনাবলীর স্মরণে কবি তাহাকে অনঙ্গের সহিত তুলনা করিয়াছেন (আলোচনা দ্রষ্টব্য)। **দক্ষিণে ঈষৎ···করিছে প্রয়াস**—অনঙ্গমদন ধ্যাননিরত মহাদেবের পশ্চাতে গোপন থাকিয়া দক্ষিণপ্রান্তে আনত হইয়া নতজানু বসিয়া মহাদেবের দিকে তাহার অমোঘ পুষ্পশর নিক্ষেপ করিয়াছিল। সেই দৃশ্যটি কবি কুমারসম্ভব হইতে চৈত্রমাসের উপর আরোপ করিয়াছেন। কালিদাসের ভাষায়, 'বিরূপাক্ষ অদূরে চক্রীকৃত-চারুচাপ দক্ষিণাপাঙ্গ-নিবিষ্টমুষ্ঠি নতাংস আকুঞ্চিত-সব্য-পাদ বাণক্ষেপোদ্যত মদনকে দেখিতে পাইলেন' (কুমারসম্ভব ২।৭০)।

[দ্বিতীয় স্তবক] **ললাটে · জ্বলে**—মদনভস্মকারী মহাদেবের ত্রিনয়ন রুদ্রতেজে অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিয়াছিল 'স্ফুরন্নুদর্চি সহসা তৃতীয়াদক্ষ্ণঃ কৃশানুঃ কিল নিষ্পপাত'। বৈশাখ মাস তাহার প্রখর দৃষ্টিবিভ্রমকারী রৌদ্রতাপে ও প্রচণ্ড দাবদাহে যেন অগ্নিস্ফুরণকারী মহাদেব। অগ্নিতাপদীপ্ত বৈশাখকে রবীন্দ্রনাথও 'দীপ্তচক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী' বলিয়াছেন। তুলনীয়,—

জ্বলিতেছে সম্মুখে তোমার
লোলুপ চিতাগ্নিশিখা লেহি লেহি বিরাট অম্বর—
নিখিলের পরিত্যক্ত মৃতস্তূপ বিগত বৎসর
করি ভস্মসার। [বৈশাখ, কল্পনা]

সর্বাঙ্গে···তপে মগ্ন—বৈশাখে রৌদ্রতাপে চতুর্দিক শুষ্ক ও ধূসর হইয়া যায়।

যেন মহাদেব যোগসাধনার রহস্যে সর্বদেহে ভস্ম মাখিয়া স্তব্ধতনু হইয়া ধ্যান করিতেছেন। তু

হে ভৈরব হে রুদ্র বৈশাখ,
ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল,
তপঃক্লিষ্ট তপ্ততনু, মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল
কারে দাও ডাক— [বৈশাখ, কল্পনা]

চিনিলে না বৈশাখ দেবেরে?—অর্থাৎ এই দিগন্তবিস্তৃত অগ্নিতেজ ও স্তব্ধতনু ধ্যানসমাহিত ভস্মাচ্ছাদান বৈশাখকে নিঃসংশয়িতভাবে মহাদেবের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। বস্তুত বৈশাখ মহাদেবই, ঋতুমাত্র নয়। **হে চৈত্র··· আহা**—বসন্তসৌন্দর্য-সমাকীর্ণ চৈত্রমাস নিতান্ত দৈববশতই যেন বৈশাখের ধ্যান ভাঙাইতে গিয়া আপনাকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। মহাদেবের প্রতি বাণক্ষেপণোদ্যত মদনকে কালিদাসও বলিয়াছেন 'পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখং'। **নাশিতে ·নয়ন**—বৈশাখের ধ্যানভঙ্গ করিবার চপল প্রয়াস রুদ্র বৈশাখকে ক্রুদ্ধ করিয়াছে, তাই চৈত্রের জীবন নাশ করিবার জন্য তাহার ত্রিনয়নে অগ্নিতেজ উৎসারিত হইল। একজনের নয়ন-উন্মোচন আর একজনের জীবনহানির কারণ, ইহার দ্বারা কবি যেন চৈত্র ও বৈশাখ এই দুই ঋতুর প্রচণ্ড বৈপরীত্যই ঘোষণা করিলেন।

[তৃতীয় স্তবক] **দিগঙ্গনা**—দিগ্‌বধূ অর্থাৎ চতুর্দিক। **দিগঙ্গনা·· সম্বর**—মহাদেবরূপী বৈশাখের অগ্নিতেজে বসন্তের চিহ্ন যখন সহসা নির্মমভাবে নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে, তখন যেন চতুর্দিক কাতরস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল; নূতন প্রভাত (অর্থাৎ বৈশাখের প্রভাত) অনুনয় করিয়া বৈশাখকে ক্রোধ সংবরণ করিতে বলিল।

[কালিদাসের কাব্যে মহাদেবের তীব্র ক্রোধ দেখিয়া দেবতাগণও অনুরূপ কাতরকণ্ঠে ক্রোধ সংবরণের অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই অনুরোধ আকাশেই থাকিয়া গেল। তাহার পূর্বেই মদন ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল,

ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি যাবদ্‌গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি
তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা ভস্মাবশেষং মদনং চকার ॥]

কোকিল···মিনতি—বসন্তের বিহঙ্গ কোকিলের কুহুস্বরকে কবি রুদ্র-ভৈরব

একজনের অগ্নিবর্ষী নয়নের উন্মোচন, আর-একজনের চিরতরে নয়ন-নিমীলনের কারণ, ইহাই বিস্ময়। ইহার দ্বারা ঋতু হিসাবে চৈত্র ও বৈশাখ, তথা বসন্ত ও গ্রীষ্মের তীব্র বৈপরীত্যই কবি প্রকাশ করিতেছেন।

নিশি-শেষে—চৈত্রের শেষ রজনী ছিল বসন্তের কুসুমগন্ধে চন্দ্রকিরণে মদির। গ্রীষ্মের প্রকোপ দিবসেই প্রকাশ পায়। বৈশাখের প্রথম দিবস হইতেই তাহার প্রখরতা দেখা যাইতেছে। তাই কবি কল্পনা করিতেছেন যে, চৈত্রমাস যেন গ্রীষ্মপ্রভাতেই তাহার সকল বসন্তচিহ্ন লইয়া অবলুপ্ত হইল।

দিন বলে ···আয়ুহারা—আলোচ্য পংক্তি-মিথুন প্রকৃতির রূপের পূজারী দেবেন্দ্রনাথের বৈশাখ কবিতার অন্তিম অংশ। এখানে কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের মদনভস্মের রূপক গ্রহণ করিয়া, রুদ্র মহাদেবরূপী বৈশাখের অগ্নিতেজে মদনরূপী চৈত্রের ভস্মীভবনের ফলে গ্রীষ্মের দিবসরাত্রির রিক্ত হাহাকারকে কবি নিপুণভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

দিবস ও রাত্রি বসন্তে উভয়ই মনোরম. উহারা যেন চৈত্রের প্রাণস্বরূপ। কিন্তু বৈশাখের রুদ্রতেজে ক্রুদ্ধ নয়নের অগ্নিপ্লাবনে চৈত্রের অপমৃত্যু ঘটায় দিবস ও রাত্রির নিঃসঙ্গতা সীমাহীন হইয়াছে। এখন দিবস আশঙ্কা করিতেছে, তাহার পরিশ্রমের আর অন্ত থাকিবে না। রাত্রির আশঙ্কা, তাহার আয়ু স্বল্প হইয়া যাইবে। গ্রীষ্মকালে দিবসগুলি প্রখর তাপে দুবহ হইয়া উঠে, সকল প্রাণী ক্লান্তি ও অবসাদ অনুভব করে। গ্রীষ্মের রাত্রিগুলি শীত ও বসন্তের রাত্রির মত দীর্ঘ হয় না। রাত্রি ছোট হইয়া যায়, দিন হয় দীর্ঘ। এই প্রাকৃতিক সত্যকেই কবি কল্পনার দ্বারা বৈশাখ কর্তৃক চৈত্রের মৃত্যুতে তাহাদের অনাথ অসহায়তার ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া অপূর্ব কাব্যসৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

প্রশ্ন ১। দেবেন্দ্রনাথের বৈশাখ কবিতার কাব্যপ্রেরণা উল্লেখ করিয়া কবিতাটির একটি রসগ্রাহী সমালোচনা কর।

রবীন্দ্রযুগের কবি হইয়াও মনোধর্মে দেবেন্দ্রনাথের আত্মীয়তা ছিল পূর্বযুগের কবি মধুসূদন ও বিহারীলালের সহিত। ইহার সহিত রবীন্দ্রকাব্যের সৌন্দর্য-চেতনা রূপকল্পনা ভাষা ও শব্দব্যবহারের সৌকর্য তিনি আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। ইংরাজি রোমান্টিক কবি শেলী-কীট্‌সের সহিতও তাঁহার যোগসূত্র ছিল, আবার সংস্কৃত কাব্যও তিনি কবিতার প্রেরণায় গ্রহণ

[পঞ্চম স্তবক] **লতিকা…চরণে**—লতা তরুর আশ্রিত, এবং লতা বসন্তেই পল্লবিত হয়, কিন্তু চৈত্রের মৃত্যুতে ক্লান্ত লতা যেন তরুর চরণে লুটাইয়া পড়িল। **বনস্থলী…নবীন যৌবনে**—চৈত্র কেবল বাসন্তী যামিনীরই স্বামী নয়, সমগ্র বনের তরুলতারই স্বামী ছিল। তাই চৈত্রের অকালমৃত্যুতে যেন সমগ্র বনস্থলী তাহাদের নবীন যৌবনেই পতিহীনা হইল। **দিন বলে… আয়ুহারা**—চৈত্রমাস ছিল বসন্তের দিনরাত্রির প্রাণস্বরূপ, এখন চৈত্রের মৃত্যুতে তাহারা অনাথ নির্জীব হইয়া পড়িয়াছে। চৈত্রের পর বৈশাখ মাসে প্রখর উত্তাপে দিনগুলি হয় ক্লান্তমন্থর, রাত্রি হয় হ্রস্বতর। কিন্তু কবি চৈত্রের অকালমৃত্যুকেই ইহার কারণস্বরূপ নির্দেশ করিতেছেন। [মূল কবিতায় শেষের আরও দুইটি ছত্র,

দম্পতি যুক্তি করি বিরহে ডাকিল।
কল্পনা কবির বধূ বিদায় মাগিল।]

ব্যাখ্যা

হে চৈত্র……মেলিল নয়ন—প্রকৃতির রূপসৌন্দর্যমুগ্ধ রোমান্টিক কবি দেবেন্দ্রনাথের বৈশাখ কবিতা হইতে উদ্ধৃত আলোচ্য চরণগুলিতে কবি মহাদেবরূপী বৈশাখের নয়নস্ফুরিত অগ্নিতেজে চৈত্রের আকস্মিক ভস্মীভবনের জন্য গভীর বেদনা প্রকাশ করিয়াছেন। চরণে অর্ঘ্যদানকারিণী পার্বতীর প্রতি ধ্যানস্তব্ধ মহাদেবের হৃদয়ে দুর্বলতা সৃষ্টির জন্য কৃত্রিমভাবে তপোবনে অকালবসন্তের সমাগম ঘটাইয়া অন্তরাল হইতে মহাদেবের প্রতি পুষ্পধনু নিক্ষেপ করিয়া অবিমৃষ্যকারী মদন দেবাদিদেবের ধ্যানভঙ্গ করিতে গিয়াছিল। আকস্মিক দুর্বলতায় চকিত বিরূপাক্ষ পরমুহূর্তেই অন্তরালবর্তী কামদেবকে ত্রিনয়নের অগ্নিস্রাবে ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছিলেন। পুষ্পলতা তরু ও বসন্ত-রাত্রিভূষিত চৈত্রও যেন মধুর বাসন্তী রাত্রিশেষে ধ্যানমূর্তি বৈশাখের তপস্যা-ভঙ্গ করিবার স্পর্ধা দেখাইয়াছিল, কিন্তু ক্রুদ্ধ বৈশাখের রুদ্রদাহে সে ভস্মে পরিণত হইয়া গিয়াছে। মদন যেমন বহ্নিমুখ পতঙ্গের মত আপনার ক্ষুদ্র পরাক্রম সত্ত্বেও মহাদেবের হাতে ভস্মীভূত হইবার জন্যই তাহাকে বাণ-ক্ষেপের হঠকারিতা করিয়াছিল, চৈত্রমাসও যেন নিতান্ত দুর্ভাগ্যবশতই আপন মৃত্যুমুখ অদৃষ্টের তাড়নায় ক্রুদ্ধ বৈশাখের দ্বারা ভস্মীভূত হইয়া গেল।

একজনের অগ্নিবর্ষী নয়নের উন্মোচন, আর-একজনের চিরতরে নয়ন-নিমীলনের কারণ, ইহাই বিস্ময়। ইহার দ্বারা ঋতু হিসাবে চৈত্র ও বৈশাখ, তথা বসন্ত ও গ্রীষ্মের তীব্র বৈপরীত্যই কবি প্রকাশ করিতেছেন।

নিশি-শেষে—চৈত্রের শেষ রজনী ছিল বসন্তের কুসুমগন্ধে চন্দ্রকিরণে মদির। গ্রীষ্মের প্রকোপ দিবসেই প্রকাশ পায়। বৈশাখের প্রথম দিবস হইতেই তাহার প্রখরতা দেখা যাইতেছে। তাই কবি কল্পনা করিতেছেন যে, চৈত্রমাস যেন গ্রীষ্মপ্রভাতেই তাহার সকল বসন্তচিহ্ন লইয়া অবলুপ্ত হইল।

দিন বলে ...আয়ুহারা—আলোচ্য পংক্তি-মিথুন প্রকৃতির রূপের পূজারী দেবেন্দ্রনাথের বৈশাখ কবিতার অন্তিম অংশ। এখানে কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের মদনভস্মের রূপক গ্রহণ করিয়া, রুদ্র মহাদেবরূপী বৈশাখের অগ্নিতেজে মদনরূপী চৈত্রের ভস্মীভবনের ফলে গ্রীষ্মের দিবসরাত্রির রিক্ত হাহাকারকে কবি নিপুণভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

দিবস ও রাত্রি বসন্তে উভয়ই মনোরম. উহারা যেন চৈত্রের প্রাণস্বরূপ। কিন্তু বৈশাখের রুদ্রতেজে ক্রুদ্ধ নয়নের অগ্নিপ্লাবনে চৈত্রের অপমৃত্যু ঘটায় দিবস ও রাত্রির নিঃসঙ্গতা সীমাহীন হইয়াছে। এখন দিবস আশঙ্কা করিতেছে, তাহার পরিশ্রমের আর অন্ত থাকিবে না। রাত্রির আশঙ্কা, তাহার আয়ু স্বল্প হইয়া যাইবে। গ্রীষ্মকালে দিবসগুলি প্রখর তাপে দুঃসহ হইয়া উঠে, সকল প্রাণী ক্লান্তি ও অবসাদ অনুভব করে। গ্রীষ্মের রাত্রিগুলি শীত ও বসন্তের রাত্রির মত দীর্ঘ হয় না। রাত্রি ছোট হইয়া যায়, দিন হয় দীর্ঘ। এই প্রাকৃতিক সত্যকেই কবি কল্পনার দ্বারা বৈশাখ কর্তৃক চৈত্রের মৃত্যুতে তাহাদের অনাথ অসহায়তার ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া অপূর্ব কাব্যসৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

প্রশ্ন ১। দেবেন্দ্রনাথের বৈশাখ কবিতার কাব্যপ্রেরণা উল্লেখ করিয়া কবিতাটির একটি রসগ্রাহী সমালোচনা কর।

রবীন্দ্রযুগের কবি হইয়াও মনোধর্মে দেবেন্দ্রনাথের আত্মীয়তা ছিল পূর্বযুগের কবি মধুসূদন ও বিহারীলালের সহিত। ইহার সহিত রবীন্দ্রকাব্যের সৌন্দর্য-চেতনা রূপকল্পনা ভাষা ও শব্দব্যবহারের সৌকর্য তিনি আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। ইংরাজি রোমান্টিক কবি শেলী-কীট্‌সের সহিতও তাঁহার যোগসূত্র ছিল, আবার সংস্কৃত কাব্যও তিনি কবিতার প্রেরণায় গ্রহণ

করিয়াছেন। একদিকে কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের মদনভস্মের কাহিনী তাঁহাকে প্রভাবিত করিয়াছে, অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের কল্পনা কাব্যের বৈশাখ কবিতায় বৈশাখের সহিত মহাদেবের সাদৃশ্য তাঁহার কবিকল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। এই দুই প্রেরণার যুগ্মফল তাঁহার শেফালিগুচ্ছ কাব্যের অন্তর্গত বৈশাখ কবিতা।

দেবেন্দ্রনাথের কবিতার বিষয়বস্তু বৈশাখের তাপদীপ্ত তেজস্ক্রিয় রূপের বর্ণনা। রবীন্দ্রনাথের বৈশাখ কবিতার মতই অনলবর্ষী স্তব্ধবাক্ ধূসর পিঙ্গল তপঃক্লিষ্টতনু বৈশাখকে তিনি রুদ্রতপস্বী মহাদেবরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু মহাদেবের নয়ন হইতে সবদাই অগ্নি নির্গত হয় না। মদনভস্মের সময় একবার ক্রুদ্ধ রুদ্রের ত্রিনেত্রদ্বার উন্মোচিত হইয়াছিল। এই অনল-নিঃস্রাবের রূপ অঙ্কন করিবার জন্য কবি বৈশাখের পূর্ববর্তী মাস চৈত্রকে মদনের সাজ পরাইয়াছেন। স্মরণীয়, কল্পনা কাব্যে মদনভস্মের পূর্বে ও মদনভস্মের পরে নামে দুইটি কবিতা আছে।। কুমারসম্ভব কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে আছে, পার্বতীর সহিত মহাদেবের বিবাহ সম্পাদনের জন্য দেবতাগণ মদনের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বসন্তকে সঙ্গে লইয়া কামদেব মহাদেবের স্তব্ধ তপোবনে অকাল বাসন্তী সমারোহ ঘটাইয়া ধ্যাননিমগ্ন গিরিশের অন্তরালে পুষ্পধনু হাতে অনুকূল সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। হিমালয়াত্মজা উমা যখন মহাদেবের চরণে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিতেছেন এবং মহাদেব তাহাকে আশীর্বাদোদ্যত তখনই কম্পিতবক্ষ মদন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ফুলশর নিক্ষেপ করিলেন। দেবশ্রেষ্ঠ মুহূর্তকাল বিচলিত হইলেন, পরক্ষণেই ক্রোধে তাঁহার ত্রিনেত্র স্ফুরিত হইল ও অগ্নিস্রাবে মদন ভস্মীভূত হইয়া গেল।

দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় চৈত্ররূপী মদন কেবল আপনার ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলিত মলয় ও পুষ্পবর্ণের গৌরবে স্পর্ধান্বিত হইয়া দুঃসাহসে ধ্যানসমাহিত বৈশাখের তপস্যা-ভঙ্গে উদ্যত হইয়াছিল। পরক্ষণেই বৈশাখের অগ্নিতেজে সে নিঃশেষে অপসারিত হইয়াছে। রতির বৈধব্যের মত চৈত্রের পত্নী বাসন্তী যামিনীও কপালের সিন্দূরবিন্দু মুছিয়া ফেলিয়া আকুল ক্রন্দনে লুটাইয়া পড়িয়াছে। কোকিলের কুহুরবের মিনতি, দিগঙ্গনার অনুনয়, নবীনা উষার অনুরোধ বৈশাখের অগ্নিতেজকে নিবারিত করিতে পারে নাই। শাল্মলীর রক্তরাগ-পুষ্প ভূমিতে ঝরিয়া পড়িয়াছে। পাপিয়া চিরতরে অন্য কোনো

চিরবসন্তের রাজ্যে এবং প্রজাপতি করবীর শিরে পলায়ন করিয়াছে, শিরীষ অশ্রুবারিতে সিক্ত হইয়াছে। দগ্ধতরুর চরণে পদাশ্রিত লতা লুটাইয়া পড়িয়াছে ; সমগ্র বনস্থলী যেন বাসন্তী যামিনীর মত নবীন যৌবনে পতিহীনা হইয়াছে। বৈশাখের দিবসগুলি চৈত্রের শোকে হইয়াছে অবসন্ন ক্লান্ত, রাত্রি হইয়াছে ক্ষণায়ু।

কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণা সত্ত্বেও দেবেন্দ্রনাথের কবিকল্পনায় মৌলিকতা আছে। বসন্তের পরই গ্রীষ্মের আগমন ঘটে কিন্তু হৃদয়মনোহর পুষ্পকরোজ্জ্বল বসন্তের পর রুদ্রতেজ বৈশাখ যেন দুই বিপরীত ঋতু। ইহা বুঝাইবার জন্যই কবি চৈত্রকে মদন এবং বৈশাখকে মহাদেবরূপে বর্ণনা করিয়া বৈশাখ কর্তৃক চৈত্র-ভস্মীভবনের কল্পনা প্রয়োগ করিয়াছেন। কুমারসম্ভবের ইঙ্গিতমাত্র গ্রহণ করিয়া কবি বৈশাখের যে রূপচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা যেমন বুদ্ধিগ্রাহ্য, তেমনি সৌন্দর্যবাচক। সংযত বর্ণনায়, ঘনীভূত কল্পনায়, শব্দ ও ছন্দের সুষম বিন্যাসে দেবেন্দ্রনাথের বৈশাখ একটি শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতায় পরিণত হইয়াছে।

জিজ্ঞাসা ঃ অক্ষয়কুমার বড়াল

ভূমিকা

রবীন্দ্রপূর্ব গীতিকবিতায় অক্ষয়কুমার বড়াল একজন প্রতিভাশালী কবির নাম। ইনি রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা এক বৎসরের অগ্রবর্তী ছিলেন এবং কবিস্বভাবে তাঁহার যোগ ছিল অক্ষয় চৌধুরী, দেবেন্দ্রনাথ সেন, স্বর্ণকুমারী দেবী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, গোবিন্দচন্দ্র দাস প্রভৃতির সহিত। আবার ইঁহারা সকলেই বিহারীলাল-প্রবর্তিত রোমান্টিক গীতিধারার উত্তরসাধক ছিলেন।

অক্ষয়কুমার ও তাঁহার সমধর্মী কবিবৃন্দ

সংসারের গার্হস্থ্য গণ্ডীর মধ্যে পত্নীপ্রেমের স্বর্গরচনা অক্ষয়কুমারের কাব্যরীতির মুখ্য লক্ষণ। নারীকে ধ্যান-ধারণার মধ্যে এক অভিনবরূপে বন্দনা করা, পত্নী জায়া জননী বিবিধ বেশে

কাব্যলক্ষণ

সাজাইয়াও এক চিরন্তনী নারীর মাধুর্য আস্বাদন করা, প্রেমকে কেন্দ্র করিয়া জীবনমৃত্যুর রহস্য উন্মোচন করা, মানবজীবনের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা অক্ষয়কুমারের অধিকাংশ কাব্যগ্রন্থের বক্তব্য। সতীর্থ কবিদের তুলনায় চিন্তা-কাতরতা, জীবনজিজ্ঞাসা, আত্মবিরোধ হইতে মুক্তি-অন্বেষণ, রোমান্টিক অতৃপ্তি অক্ষয়কুমারে সর্বাধিক। তাঁহার কাব্যগ্রন্থের নাম প্রদীপ, কনকাঞ্জলি, ভুল, শঙ্খ ও এষা। পত্নীবিয়োগে রচিত এষা তাঁহার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কাব্য। ইহার সহিত টেনিসনের ইন মেমোরিয়াম এবং রবীন্দ্রনাথের স্মরণকাব্যের সাদৃশ্য আছে।

কাব্যগ্রন্থ

অক্ষয়কুমারের ঈশ্বরচেতনা ও নৈরাশ্যবাদ তাঁহার কবিতাকে উত্তরকালের কবিদের তুলনায় কিছুটা পশ্চাদ্‌গামী করিয়া রাখিয়াছে। আধুনিক বুদ্ধিজীবী চিত্তের নৈর্ব্যক্তিক বিষণ্ণতা তাঁহার কবিতায় আশ্চর্য সাফল্য লাভ করিলেও শেষ পর্যন্ত ইহাকে তিনি চিত্ত-বিহারী নারায়ণের কৃপায় অবলুপ্ত করিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতিরূপমুগ্ধতা তাঁহার ছিল না, তবে বিহারীলালের সাধের আসন কাব্যে যে আত্মমুখী তত্ত্বপ্রবণতা লক্ষ্য করা যায় তাহাই যেন অক্ষয়কুমারে সংক্রামিত হইয়াছিল। মোটের উপর অক্ষয়কুমার অপাংক্তেয় কবি নন, তাঁহার ভাষা সংযত, ছন্দ সুললিত এবং সুরচিত, বাক্‌শিল্পে কবির উচ্ছ্বাস কূলপ্লাবী নয়। মাধুকরীর অন্তর্গত 'জিজ্ঞাসা' কবিতাটি তাঁহার এষা কাব্যের মধ্যবর্তী নামবিহীন চিন্তাংশ, নামকরণ সংকলয়িতার। সাংসারিক শোকক্ষতি ব্যথাদর্প দৈন্য-পরাজয়ের ভিতর দিয়া মনুষ্যজীবন ক্রমশ ঈশ্বরের সত্তার সহিত পরিচিত ও ঈশ্বরসমীপস্থ হইতেছে কিনা ইহাই আলোচ্য কবিতায় কবির আত্মমগ্ন অনুভাবনা বলিয়া ইহার নামকরণ সংগত।

ঈশ্বরচেতনা

কাব্যরীতি

জিজ্ঞাসা-নামকরণ

সাংসারিক মৃত্যুশোক, পার্থিব ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক নৈরাশ্যে অভিভূত কবি ধীরে ধীরে জীবনমৃত্যুর রহস্যে অবগাঢ় হইয়া এক অসীম জিজ্ঞাসার অনুবর্তী হইয়াছেন এবং ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে তাঁহার ব্যাকুল প্রশ্ন জাগিতেছে। তাঁহার প্রথম জিজ্ঞাস্য, সাংসারিক দুঃখকষ্ট শোকপরম্পরা এইগুলি কি ঈশ্বর-মন্দিরে

আরোহণের সোপানশ্রেণী? মানুষের পরাজয় ও দৈবনিগ্রহ, দীর্ঘশ্বাস ও ক্রন্দন কি তাহাকে কোনো নূতনতর অধ্যবসায় ও আশায় উদ্দীপিত করিবার নিমিত্ত? ঈশ্বর কি মনুষ্য-জীবন লইয়া হোমযজ্ঞ করিতেছেন? মানবপ্রকৃতির উগ্র তাড়না ও স্বভাবগত কালিমা দহন করিয়া কি তাঁহার হোমশিখা জ্বলিতেছে? কবি কাতরকণ্ঠে জানিতে চাহিতেছেন যে, মানুষের অহমিকা ষড়রিপু কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি স্বভাবগুলি কি ঈশ্বরবোধ বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করিতেছে? ঈশ্বর কোথায় কবি তাহা জানেন না, কিন্তু তাঁহার প্রশ্নাকুলতা, জগতের উত্থান-পতনের মধ্য দিয়াই কি মানবজীবন দেবমহিমা লাভ করিতেছে? মানুষের গ্লানিকলঙ্ক পাপতাপ তাহার মৃত্যুর পর সঙ্গে সঙ্গে যাইবে, না জগতের নশ্বরদেহের সঙ্গেই বিলীন হইবে? প্রবীণ জনক শিশুসুলভ চাপল্য দেখিয়া যেরূপ হাস্য করেন, কবিও কি একদিন জীবনের শেষযাত্রা অতিক্রম করিয়া জাতজন্মের সুখদুঃখ ভ্রান্তি স্মরণ করিয়া ইহাকে শৈশব-লঘুতার মত তুচ্ছ জ্ঞান করিবেন না? হয়ত তখন পর্বতচূড়ায় আরোহণ করিয়া পথশ্রমকে মিথ্যা মনে করিবেন।

বস্তুবিশ্লেষণ

আলোচনা

অক্ষয়কুমারের এষা কাব্য হইতে জিজ্ঞাসা কবিতাটি উদ্ধৃত হইলেও ইহার সহিত মূল কাব্যের পত্নী-বিয়োগ-কাতরতা ঘনিষ্ঠভাবে অন্বিত নয় বলিয়া জিজ্ঞাসা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গীতিকবিতা হইয়া উঠিয়াছে। ১৩১৩ সালে অক্ষয়কুমারের স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে তিনি এষা (অর্থাৎ 'অন্বেষণীয়া, প্রার্থনীয়া, বাঞ্ছনীয়া') কাব্যখানি রচনা করেন। উপহার ও নিবেদন ব্যতীত ইহার চারিটি অধ্যায়, নাম 'মৃত্যু', 'অশৌচ', 'শোক' এবং 'সান্ত্বনা'। মানবীর অদর্শনেই কবির শোকবেদনা উচ্ছলিত হইলেও শেষ পর্যন্ত প্রশান্ত ঈশ্বর-প্রত্যয়ে অক্ষয়-কুমারের কবিচৈতন্যের সমাধান বলিয়া এই শোক স্মৃতিবহ হইয়া গভীর কাব্যসম্পদের সৃষ্টি করিতে পারে নাই। তিনি এই সান্ত্বনায় পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছেন যে 'মানবাত্মার পরিণতির পক্ষে শোকদহন অপরিহার্য'। দুঃখতাপ ক্ষতিবেদনার মধ্য দিয়া এই জগতের প্রাণী প্রতিদিন প্রতিনিয়ত ঈশ্বরসান্নিধ্যে উপনীত হইতেছে, প্রতি মানুষের হৃতসর্বস্বতা দেবতারই অস্তিত্বের উপলক্ষ,

এষা কাব্যের আলোচনা

প্রকৃতপক্ষে জিজ্ঞাসু মন, বিশ্বাসী কবি

এইরূপ বিশ্বাসে তাঁহার কবিতা শেষ হইয়াছে। জিজ্ঞাসা কবিতায় এই সমাপ্তিপর্বের বিশ্বাস জিজ্ঞাসার আকারে পুনরাবৃত্ত।

জিজ্ঞাসা কবিতায় অক্ষয়কুমারের কবিপ্রকৃতির মূল বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে। চিন্তামূলক তত্ত্বপ্রাধান্য, ঈশ্বরবিশ্বাস, মানবজীবনের প্রতি কবির গভীর প্রত্যয়, এই পরিমিত কবিতার প্রতি ছত্রে স্তবকে পরিস্ফুট। পত্নীর প্রীতিস্নিগ্ধ স্মৃতি হইতে সূচনা করিয়া, শোকের অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া কবি শেষ পর্যন্ত সমগ্র মানবের শোকবেদনা দুঃখতাপকে ঈশ্বরলাভের সোপান বলিয়া গণ্য করিয়াছেন।

•

রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ

[প্রথম স্তবক] **গৃহচূড়ে ……মন্দিরে ?**—যেমন ধীরে ধীরে এক একটি সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া মানুষ শীর্ষগৃহে আরোহণ করে, তেমনি কবি প্রশ্ন করিতেছেন, মানবাত্মাও কি সেইরূপ এই জগতের নিয়ত দুঃখতাপ শোক-বেদনার ক্রমান্বয় আঘাত সহ্য করিতে করিতে ঈশ্বরের নিকট উপনীত হইতেছে ? এখানে কবি দুঃখশোককে প্রতিকূল ভাগ্যের বিড়ম্বনা বলেন নাই। প্রতিটি শোক দুঃখাঘাত আমাদের আত্মচৈতন্য জাগ্রত করিতেছে এবং আত্মা এইভাবে অনিবার্য দুঃখের সোপান অতিক্রম করিয়া দেবতার সমীপবর্তী হইতেছে, এইরূপ বিশ্বাস প্রতিফলিত হইয়াছে আলোচ্য কবিতায়। **শোক-দুঃখস্তর**—মানব-জীবনের ক্রমান্বয় দুঃখবেদনা যেন সোপান-পরম্পরা, এক একটি দুঃখের অভিজ্ঞতা মানবাত্মাকে দুঃখান্তরালবর্তী ঈশ্বরের নিকট উপনীত করিতেছে।

[দ্বিতীয় স্তবক] **পদে পদে পরাজয়**—মানুষের জীবনে প্রতি মুহূর্তেই সংগ্রাম এবং সেই সংগ্রামে প্রতিক্ষেত্রেই মানুষ পরাস্ত হইতেছে অদৃষ্টের নিকট। **অতি অসহায়**—বস্তুত বৈজ্ঞানিক শক্তিতে যতই উন্নত হোক না কেন, মানুষ তাহার ভাগ্যের হাতে এখনও ক্রীড়নক মাত্র। এইজন্য মানুষকে কবি সর্বাপেক্ষা অসহায় বলিয়াছেন। নিষ্ঠুর অপ্রতিরোধ্য মৃত্যু যখন পরম প্রিয়জনকে চিরকালের মত হরণ করিয়া লইয়া যায়, তখন মানুষ নিজেকে শিশুর মত সহায়হীন বোধ করে। **অদৃষ্ট নির্মম**—মানুষের সকল কার্য নিয়ন্ত্রিত হইতেছে যে দুর্নিরীক্ষ্য প্রাক্তন বা ভাগ্যের দ্বারা, সে যেমন অদৃষ্ট, তেমনি

নিষ্ঠুর। তাহাকে দেখা যায় না, পূর্ব হইতে জানা যায় না, এবং তাহার কোনো করুণা দয়া বা মমতা নাই। কোনো ব্যাকুল ক্রন্দন, সকাতর আর্তনাদ তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না। **এই অশ্রু··· ·জড়ত্ব নাশ ?** —জীবনের ক্ষয়ক্ষতি মৃত্যুশোক বিয়োগবেদনা প্রথমে মানুষকে নির্জীব জড় করিয়া তোলে। কিন্তু কবি প্রশ্ন করিতেছেন, মানুষের বিয়োগ-ব্যথা-জনিত ক্রন্দন-দীর্ঘশ্বাস কি শেষ পর্যন্ত তাহার জড়ত্বনাশ করিতে সাহায্য করে? **দেয় কি··· উদ্যম ?**—আপাতদৃষ্টিতে মানুষের পার্থিব তাপদহন শোকযন্ত্রণা তাহাকে নির্জীব পঙ্গু অসহায় করিয়া তোলে। কিন্তু কবি ঈশ্বরের মঙ্গলময়তায় বিশ্বাস হারান নাই বলিয়া তিনি প্রশ্ন করিতেছেন, জীবনের দুঃখকাতরতা ও বিলাপ, আক্ষেপ ও নৈরাশ্য কি মানুষকে নূতন আশা-ভরসা ও কর্মে উদ্দীপনা দান করিবার প্রস্তুতিমাত্র? এখানে প্রশ্নবোধক বাক্যে বক্তব্য প্রকাশিত হইলেও ইহা কবির আন্তরিক বিশ্বাসেরই ছদ্মবেশ মাত্র।

[তৃতীয় স্তবক] **এই যে তাড়নে**—প্রকৃতি অর্থাৎ অভ্যাসদোষ মানুষকে ক্রমাগত তাড়না করিতেছে কাম ক্রোধ লোভ মোহ এইগুলি পাশবিক প্রকৃতি, পশুগণ ইহা দমন করিতে পারে না। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, অল্পলোকই যথার্থ সংযমী হইয়া প্রকৃতিদোষ দমন করিতে পারে। **এ মোহ-কলঙ্ক-লিখা**—মানুষের প্রাকৃতিক লুব্ধতা কামনা-বাসনার ভাগ্যলিপি। **তোমারই কি হোমশিখা**- পুণ্যার্জনের জন্য ঋষিরা অগ্নি জ্বালাইয়া হোম করিতেন। কবি কল্পনা করিতেছেন যে, দেবতাও যেন অগ্নি জ্বালাইয়া হোম করিতেছেন, আর মানুষের স্বভাবদোষ ক্রোধ লোভ বাসনা ইত্যাদি সেই হোমাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে। **দাহিয়া গগনে ?**—শুষ্ক কাষ্ঠ জীর্ণপত্র অগ্নিতে দগ্ধ হয়, মানুষের সংকীর্ণতা লোভ মোহ মাৎসর্যকে ঈশ্বরও সেইরূপ প্রতিনিয়ত অগ্নিদগ্ধ করিতেছেন, ঊর্ধ্বমুখে তাহারই শিখা উঠিতেছে। অর্থাৎ প্রতিদিনই মানুষ তাহার ক্রোধ মোহ লোভ হইতে ঈশ্বরেচ্ছায় মুক্তি পাইতেছে।

[চতুর্থ স্তবক] **এই দর্প · আরাধনা ?** মানুষের গর্বিত অহংকার, ষড়যন্ত্র, কুচিন্তা ও স্বাধিকারপ্রমত্ততা কখনই সত্য হইতে পারে না, কবির বিশ্বাস এইগুলি এক প্রকার ঈশ্বর-প্রাপ্তিরই উপায় মাত্র। ইহা আত্মসমর্পণের রীতি নয়, কিন্তু আত্মবিদ্রোহের মধ্য দিয়া যেন এক বিপরীত পদ্ধতিতে ঈশ্বরসেবা! **এই কাম· আত্মবোধ**—তত্ত্বজিজ্ঞাসু কবি মনে করেন, মানুষের কুপ্রবৃত্তিগুলি,

যেমন কামনা বাসনা ক্রোধ মোহ প্রভৃতি, তাহার আত্মচৈতন্যই জাগ্রত করিয়া তোলে। **লোভে · ধারণা?**—জীবনের স্বভাব ও দুদমনীয় প্রবৃত্তিগুলি, যেমন লোভ-ক্ষুব্ধতা, ক্রোধ-মোহ-কাতরতা এইগুলি যে মানুষকে আত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে, আর ইহাদেরই ভিতর দিয়া মানুষ দেবতার স্বরূপ অবগত হইতে পারে।

[পঞ্চম স্তবক] **জগৎ ভিতর · তোমায়?**—ঈশ্বর অজ্ঞেয় নন, তিনি জাগতিক দুঃখবেদনা মানুষের ক্রোধ মোহ প্রভৃতি রিপুর সংঘর্ষের ভিতর দিয়াই মানুষের আত্মাকে সচেতন করিয়া তুলিতেছেন। কবির বিশ্বাস এখানে প্রশ্নের আকারে দেখা দিয়াছে। **এই পড়ে · দেব মহিমায়?**—প্রত্যেক রিপুর সহিত একটি যন্ত্রণা আছে। কামের পর আছে অতৃপ্তি, ক্রোধের পর অনুতাপ, পাপের পর প্রায়শ্চিত্ত, শোকের পর সান্ত্বনা। এইভাবেই উত্থান পতনের মধ্য দিয়া মানুষ দেবতার অমর মহিমা অনুভব করিতে পারে।

[ষষ্ঠ স্তবক] **প্রবীণ জনক আকুল**—বয়োবৃদ্ধ পিতা অথবা গুরুজনবর্গ শিশুদের অর্থহীন খেলাধুলা দেখিয়া হাসিয়া আকুল হন, কারণ তাঁহাদের প্রৌঢ় অভিজ্ঞতায় ঐ সকল চাপল্যের কোনো সংগতি বা কার্যকারণ নাই বলিয়া। **অমনি কি···দুখ-ভুল?**—মানুষ তাহার জীবনের সকল কর্মসমাপনান্তে, কে জানে এমন এক অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতালোকে প্রস্থান করিবে যেখানে কোনো ক্ষয়ক্ষতি সুখদুঃখ লোভমোহ শোকসান্ত্বনা কিছুই নাই। হয়ত তখন মানবাত্মা তাহার বিগত মনুষ্যজীবনের সুখদুঃখ ভুলভ্রান্তিগুলি, যাহা ঘটনা-কালে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, স্মরণ করিয়া, সেইগুলির অর্থহীনতায় উচ্চহাস্য করিবে। প্রবীণ পিতার নিকট শিশুর খেলাধুলা যেমন হাস্যকর অর্থহীন, কবির ধারণা দেহান্তে মানবাত্মার বৃহৎ অভিজ্ঞতায় বিগত জীবনের ভুলভ্রান্তি-গুলিও সেইরূপ হাস্যকর ও অর্থহীন বলিয়া বোধ হইবে।

[সপ্তম স্তবক] **জগতের পাপ·· মনে হয়**—পর্বতশিখরে আরোহণ করিবার পর অভিযাত্রী যেমন সুউচ্চ শিখরাগ্র হইতে দূর বিস্তৃত ভূমিতল দেখিয়া সাফল্যে তাহার সকল পথশ্রম ভুলিয়া যায়, তেমনি জীবনাবসানে মানবাত্মাও নিশ্চয় তাহার পূর্ব জীবনের সকল গ্লানি দৈন্য হতাশা বিভ্রান্তি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া যাইবে। তাই কবি শেষ স্তবকে ব্যাকুল হইয়া প্রশ্ন করিতেছেন, জগতের যাহা কিছু দুঃখদৈন্য পাপতাপ শোকবিলাপ এইগুলি কি

জগতেই শেষ হইয়া যায়? অর্থাৎ করুণাধার দয়াময় ঈশ্বরের প্রতি কবির নিবিড় বিশ্বাসবশতই কবি মনে করেন, মানবাত্মাকে নিশ্চয়ই দেহান্তে পার্থিব শোকতাপ স্পর্শ করিতে পারে না।

ব্যাখ্যা

এ জগতে নিরন্তর…… তোমার মন্দিরে?—(প্রথম স্তবক)

আলোচ্য অংশ, ঈশ্বর ও মানবের সম্পর্ক নিরূপণাকাঙ্ক্ষী জীবনজিজ্ঞাসু, অক্ষয়কুমার বড়ালের জিজ্ঞাসা কবিতার প্রথম স্তবকের শেষ পংক্তি। পত্নী-বিয়োগে শোকাভিভূত কবি শেষ পর্যন্ত সকল শোকবেদনা ক্ষয়ক্ষতি যে ঈশ্বর-প্রাপ্তির উপায় এই সান্ত্বনা লাভ করিয়াছেন।

তত্ত্বজিজ্ঞাসু কবির প্রশ্ন, জীবনের আঘাতসংঘাত দুঃখাভিঘাত বিয়োগ-বিধুরতা, এইগুলি মানবাত্মার সহিত দেবতার পরিচয় সাধনের সোপান কিনা। এক একটি উচ্চ সোপানে চরণ ফেলিয়া উচ্চ গৃহের উপরিতলে উঠিতে হয়। সোপানগুলি দীর্ঘ উচ্চতার পথে যাত্রা করিবার এক একটি স্তর। এই যুক্তি অনুসরণ করিয়া কবি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সাংসারিক দুঃখতাপ শোক বেদনা এইগুলিও কি দেবমন্দিরে আরোহণ করিবার এক একটি সোপান নয়? এই জগতে প্রতিনিয়ত মানবাত্মা যত শোক সন্তাপ লাভ করে তাহারি ভিতর দিয়াই তাহার আত্মবোধ জাগ্রত হয় আর সেই আত্মবোধের দ্বারাই জীবাত্মা ক্রমে পরমাত্মার সমীপবর্তী হয়, ইহাই প্রশ্নচ্ছলে কবির অভিপ্রেত।

এ মোহ-কলঙ্ক……উঠিছে গগনে? (তৃতীয় স্তবক)

জিজ্ঞাসা কবিতা হইতে উৎকলিত এই পংক্তিগুচ্ছে আত্মীয়-বিয়োগবিধুর কবি অক্ষয়কুমার বড়াল মানবসম্প্রদায়ের রিপুবৃত্তির মধ্য দিয়া ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের উপায় অন্বেষণ করিয়াছেন।

মানুষ বিধাতার শ্রেষ্ঠ জীব হইলেও সে অনেক রিপু জয় করিতে পারে নাই। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য প্রভৃতি একাধিক পশুসুলভ প্রবৃত্তি তাহাকে অহরহ তাড়না করিতেছে। এইগুলি মানবের কলঙ্কের ভাগ্যলিপির মত। কিন্তু তত্ত্বজিজ্ঞাসু কবি মনে করেন, এই সকল লোভ মোহ প্রভৃতি স্বভাবগুলিকে ঈশ্বর যেন প্রতিনিয়ত জ্বালাইয়া দগ্ধ করিতেছেন। পুণ্য সঞ্চয়ের এবং পাপ-নিবারণের জন্য ঋষিরা যেরূপ কাষ্ঠ জ্বালাইয়া হোম করিতেন

সেইরূপ নীচতা দীনতা সংকীর্ণতা প্রভৃতি মানব প্রবৃত্তিগুলিকে দহন করিয়া দেবতা মানুষকে পাপমুক্ত করিতেছেন। মানুষের কুপ্রবৃত্তিগুলি সেই হোম বহ্নির ঊর্ধ্বশিখা, ইহাই প্রশ্নচ্ছলে কবির প্রত্যয়।

এই কাম তোমার ধারণা? (চতুর্থ স্তবক)

প্রসঙ্গসূত্র পূর্ববৎ।

মানুষ এখনো সংযম শিক্ষা করে নাই, সকল রিপুপ্রবৃত্তিকে সে নিঃশেষে দমন করিতে পারে নাই, ইহা সত্য। কিন্তু মানব-স্বভাবের যাহা কিছু কদর্যতা, তাহার অহমিকা ও কুপ্রবৃত্তি, তাহার পরশ্রীকাতরতা ও স্বার্থপরতা, তাহার অধিকারপ্রমত্ততা ও বর্বর-স্বভাব, তাহার কামনা ও লোভ এইগুলি এক হিসাবে তাহার আত্মচৈতন্যকেই জাগাইয়া তোলে। ঈশ্বরের স্বরূপ মানুষের জানা না থাকিলেও মানুষ দুঃখশোকের দাম দিয়া জানিতে শেখে। তাহার লুব্ধতা ও ক্ষুব্ধতা, তাহার হীন বাসনা ও অনুতাপ, তাহার আপন স্বরূপকেই উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়। সত্যজিজ্ঞাসু কবি এই আত্মবোধের দ্বারাই ঈশ্বরবোধ ঘটে কিনা তাহাই এখানে ব্যাকুলভাবে জানিতে চাহিয়াছেন।

এই পড়ে দেব মহিমায়? (পঞ্চম স্তবক)

বৃহৎ শোক মহৎ সান্ত্বনা আনে। আত্মীয়-বিয়োগব্যথিত কবি অক্ষয়কুমার জাগতিক দুঃখদৈন্যের মধ্য দিয়া ঈশ্বরচেতনা ঘটে কিনা তাহাই আলোচ্য ছত্রে প্রশ্ন করিয়াছেন।

বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র মতে ঈশ্বরের স্বরূপ দুর্জ্ঞেয়। কিন্তু সান্ত্বনাপ্রত্যাশী ঈশ্বর-বিশ্বাসী কবির ধারণা, ঈশ্বর পার্থিব ক্ষয়ক্ষতি, পাপ-অনুতাপ, শোক-শান্তির মধ্য দিয়া মানুষকে ঈশ্বরের স্বরূপ জানাইতেছেন। রিপুপ্রবৃত্তি মানুষের আত্মবোধকে জাগ্রত করিতেছে। পাপের পর প্রায়শ্চিত্ত ঘটিতেছে, ক্রোধের পর অনুতাপ। এইভাবে কখনও শোক, কখনও হাহাকার, কখনও উত্থান, কখনও পতন ইহাদের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে মানুষের নিকট নিশ্চয় এক মঙ্গলময়ের মহিমাই উদ্‌ভাসিত হইতেছে। এই নিবিড় বিশ্বাসই আলোচ্য ছত্রে প্রশ্নের আকারে প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রবীণ জনক····· সুখ দুখ ভুল? (ষষ্ঠ স্তবক)

[রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]।

জগতের পাপ···· ভ্রম মনে হয়! (সপ্তম স্তবক)

[রূপতত্ত্ব বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]

প্রশ্ন ১। জিজ্ঞাসা কবিতায় অক্ষয়কুমার বড়ালের যে তত্ত্বজিজ্ঞাসা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার উপলক্ষ কী? ঈশ্বরের স্বরূপ লাভ সম্বন্ধে কবির জিজ্ঞাসা ব্যাখ্যা কর।

— রবীন্দ্রযুগে জন্মগ্রহণ করিলেও মনোধর্মে অক্ষয়কুমার বড়াল প্রাক্‌রবীন্দ্র বা রবীন্দ্রসমকালীন কবি, এইজন্য তাঁহার কবিতা চিন্তাতরঙ্গিনী ও ভাবনা-প্রধান ১৩১৩ সালে তাহার পত্নীবিয়োগ ঘটে এবং এই দুঃখকর অভিজ্ঞতা তাঁহার কবি জীবনে গভীর নৈরাশ্য ও বৈরাগ্যের সঞ্চার ঘটায়। পত্নীর মৃত্যুতে জীবনের স্বরূপ সম্বন্ধে কবি তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া উঠেন এবং শোকস্মৃতির ভিতর দিয়া ক্রমশ ঈশ্বরের প্রতি নিবিষ্ট-ধ্যান হইতে থাকেন। তাঁহার এষা কাব্যে এই শোক ও শোকোত্তীর্ণ সান্ত্বনার কথা আছে। এই শোকোত্তর ঈশ্বর-চৈতন্যের সান্ত্বনাই তাঁহার এষা-কাব্যান্তর্গত জিজ্ঞাসা কবিতার উপলক্ষ।

জিজ্ঞাসা কবিতায় অক্ষয়কুমার মানুষের দুঃখদৈন্য শোক অনুতাপকে প্রতিকূল অদৃষ্টের অকারণ লাঞ্ছনা মনে করেন না। তাঁহার মতে, মানবাত্মার পরিণতির জন্য, মানবাত্মা ও পরমাত্মার সাহত মিলনের জন্যই, শোকদহন অনিবার্য। জগতের নিরন্তর শোকদুঃখ যেন মানব জীবনের ক্রমাভিযাত্রার স্তর-পরম্পরা বা সোপান-শ্রেণী—ঈশ্বরের দেবালয়ে উঠিতে গেলে এইগুলি অনিবার্যভাবে একে একে অতিক্রম করিতেই হইবে। মানবের সাংসারিক দুর্ভাগ্য ও অসহায় সংগ্রাম, তাহার ভাগ্যবঞ্চনা ও পরাজয় ইহারা মানুষের ক্লৈব্য দূর করিয়া নূতন আশা ও বিশ্বাসের সূচনা করিবে বলিয়া কবির ধারণা। এমন কি মানুষের পাশবিক কুপ্রবৃত্তি ও চরিত্রকালিমা, এইগুলিকেও হোমশিখার মত তিনি দগ্ধ করিয়া দিবেন। মানবস্বভাবের রিপুগুলি প্রকৃতপক্ষে দেবতারই অর্চনার উপকরণ। এই কামনা বাসনা রোষহলাহলের ভিতর দিয়া, দর্প অহমিকা ক্রোধ ও স্বার্থপরতার ভিতর দিয়া, মানুষের যে আপন স্বরূপজ্ঞান হইতেছে বা আত্মবোধ জাগিতেছে, তাহাই পরোক্ষভাবে দেবতার দেবত্ব ও মহিমা ইত্যাদি বিষয়ে মানুষের নিকট ধারণা জন্মাইতেছে। তাহার পাপের পর প্রায়শ্চিত্ত, অপরাধের পর অনুতাপ, শোকের পর সান্ত্বনা এসবই দৈবানুগ্রহপুষ্ট মাত্র। জীবনের সকল দায়িত্ব সমাপন করিয়া কবিআত্মা

যখন দেহব্যূহ হইতে সুদূরে চলিয়া যাইবে, তখন তাহার সকল বিগত জীবনের অকৃতার্থ স্নেহপ্রেম ভুলভ্রান্তি অপরাধ, সবই অপদার্থ রকমের হাস্যকর ও তুচ্ছ মনে হইবে। কারণ সুউন্নত পর্বতশৃঙ্গে উঠিয়া ভূপৃষ্ঠ দেখিলে পথের কষ্টশ্রম দূর হইয়া সহসা মন অপূর্ব অপ্রাপনীয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠে।

এই সকল তত্ত্ববিশ্বাসই জিজ্ঞাসার আকারে অক্ষয়কুমার বড়ালের জিজ্ঞাসা কবিতার বক্তব্য।

হাসি ও অশ্রু ঃ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

ভূমিকা

১৩০৫ সালে দ্বিজেন্দ্রলালের আষাঢ়ে কাব্য প্রকাশিত হইলে রবীন্দ্রনাথ ইহার সমালোচনায় লিখিয়াছিলেন—

"লেখক তাঁহার নাম প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু ইহা নিশ্চয় বাঙলা পাঠকসমাজে তাঁহার নাম গোপন থাকিবে না।" এবং থাকেও নাই।

বহুপ্রতিভ দ্বিজেন্দ্রলাল

অপরাজেয় নাট্যকার, হাসির গানের রাজা, সংগীতকার, সুগায়ক, ব্যক্তিত্বপ্রধান কবিসাহিত্যিক দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রযুগের দীপ্ত মধ্যাহ্নে আবির্ভূত হইয়াও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে অম্লান জনপ্রিয়তার যশোমুকুট লাভ করিয়াছিলেন। কবি হিসাবে তাঁহার

কবিধর্ম

স্বকীয়তা ছিল। রোমান্টিক কাব্যসাধনায় তিনি রবীন্দ্রনাথের অনুবর্তী হইলেও প্রেম প্রকৃতি সৌন্দর্য বর্ণনায় তাঁহার ভাবালুতা ছিল সংযত, ভাষা বলিষ্ঠ ও সুবোধ্য, ছন্দ দ্রুততাল এবং গদ্যধর্মী এবং কবিধর্মে প্রতীচ্য কবিতার দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত। হাসির

সংগীত গুণ

গানে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বলা যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় যে সংগীতধর্ম প্রচ্ছন্নভাবে বহমান তাহাই তাঁহার কাব্যের সর্বাধিক গুণ ছিল। 'তাঁহার কাব্যে হাস্য করুণা মাধুর্য বিস্ময় কখন

কে কাহার গায়ে আসিয়া পড়িতেছে তাহার ঠিকানা নাই' রবীন্দ্রনাথের এই প্রশস্তি অনতিশয়োক্তি। বঙ্গমঞ্চে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলির জনপ্রিয়তা এখনও অক্ষীয়মাণ। প্রহসন ও নাট্যরচনা ব্যতীত দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যরচনা দুইখণ্ড আর্যগাথা, আষাঢ়ে, মন্দ্র, আলেখ্য, ত্রিবেণী ও হাসির গান।

রচনা-পরিচয়

ভাবার্থ

কবিজীবন অবিমিশ্রভাবে হাস্যকেন্দ্রিক নয় ইহা করুণরসের উপাদানকেও গ্রহণ করিতে চায়। হাস্যরসের চর্চায় অর্ধজীবন অতিবাহিত করিয়া কবি এখন জীবনের গভীরতর দিকটিকে অনুভব করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। এখন সুখের জন্য নয়, দুঃখের জন্য, অপরের বেদনায় অনুকম্পায়ী হইবার জন্য তিনি হাস্যচর্চা বিষয়ক পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে অভিলাষী। ইতিহাস পুরাণে যাহা কিছু বেদনাঘন, যেগুলি এতকাল কবির দৃষ্টির অবহেলায় ছিল, আজ তাহাদেরই কথা তাহার স্মরণ জুড়িয়া বিরাজ করিতেছে। সীতা ও দময়ন্তীর দুর্ভাগ্য, শকুন্তলা দ্রৌপদীর দুরদৃষ্ট, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যচ্যুতি, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রশোক, হরিশ্চন্দ্রের সর্বস্বচ্যুতি—এই সকল করুণ ঘটনাগুলি কবি স্মরণ করিতেছেন। ইহা ভিন্ন সিজার হানিবলের পতন, সেকেন্দার শাহের রাজ্যভ্রষ্টতা, নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ইউরোপের সংগ্রাম, দারা-ঔরংজেবের বিপন্ন অবস্থা, পানিপথে দুর্ধর্ষ মহারাষ্ট্রের পরাজয়-বরণ, এই সকল ইতিহাসের ট্রাজিক ঘটনাগুলি কবির চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে। অতীত-বর্তমানের যাহা কিছু ক্লান্ত পীড়িত যন্ত্রণাক্লিষ্ট ক্রন্দন-ভারাক্রান্ত ঘটনা, সেখানেই কবি আকর্ষণ অনুভব করিতেছেন। কবির এই দুঃখবাদের একটি আদর্শ আছে। কেবল অপরের দুঃখ অনুভব করিয়াই তিনি বিলাপ করিতে চান না, মহতের জন্য কাতর হইলেই ক্রন্দন ধন্য হয়। যাঁহারা কর্মের ও ধর্মের জন্য জীবন দান করিয়াছেন, যাঁহাদের জীবন সত্যব্রত ও পরার্থে আত্মত্যাগী, বুভুক্ষুকে যে অন্ন দেয় এবং ব্যাধিগ্রস্তের জন্য নিদ্রাহীন সেবা করেন, নিরাশ্রয়কে যিনি আশ্রয় দেন ও আর্তকে রক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞা করেন তাঁহাদের জন্যই কবির আগ্রহ। পিতার সেবায় কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত পুরু, পরার্থে প্রাণবিসর্জনকারী ভীষ্ম, তপস্বী ভগীরথ, অস্থিদাতা দধীচি, কর্তব্যে

বক্তব্যবিশ্লেষণ

স্নেহত্যাগিনী গান্ধারী, ক্ষমাশীলা সীতা, বিশ্বহিতার্থে গৃহত্যাগী বুদ্ধদেব ও প্রেমিক শ্রীচৈতন্য, দারিদ্র্যব্রতী প্রতাপসিংহ ও দুর্গাদাস—ইহাদের ত্যাগ ও মহত্ত্বে কবি আত্মপ্রবুদ্ধ হইতে চান। এই অশ্রুব্যাকুলতার বন্যা তাঁহাকে আনন্দের স্বর্গদ্বারে লইয়া যাইবে, প্রাণের টানে তাহা মাতৃপদতল স্পর্শ করিবে।

আলোচনা

'হাস্য করে অর্ধ জীবন করেছি তো অপচয়'—হাসির গানের রাজা দ্বিজেন্দ্রলালের এক অভিনব আত্মসমীক্ষা। একথা সত্য, সাহিত্যে তিনি পরিহাস-রসিকতার, শ্লেষবিদ্রূপ-কটাক্ষের এক উজ্জ্বল সৌরকর বিতরণ করিয়াছিলেন। জীবনের নানা স্তরে নিহিত নিন্দনীয় অসংগতি এবং কলুষতা তাঁহার তীক্ষ্ণ তির্যক দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই, তাহাকে তিনি ব্যঙ্গের কশাঘাতে জর্জরিত করিয়াছেন, অভ্যস্ত গতানুগতিক বিশ্বাস ও বহুকাল-স্তিমিত শিথিল অপদার্থতাকে নির্মমভাবে অপদস্থ করিয়াছেন। উত্তরকালের সমাজ ও সাহিত্য তাহা অস্বীকার করিবে না। কিন্তু বিদ্রূপ-কটাক্ষ, কটু শ্লেষ ও বক্র রসিকতাই জীবনের সব নয়, ইহার পশ্চাতেও একটি গভীর অশ্রুভারাক্রান্ত বেদনাগত ইতিহাস আছে, ইহাই যেন সহসা কবি আবিষ্কার করিয়াছেন। অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলাল যে হাসির গান লিখিয়াছেন তাহা একান্তই পরিহাস-তরল একথা তাঁহার সীরিয়াস পাঠকবর্গ স্বীকার করিবেন না। যথার্থ হাস্যরস, গভীর সহানুভূতি ও জীবন সম্পর্কে অকৃত্রিম বেদনাবোধ হইতে উৎসারিত হয়। হাস্যরসিক কান্নার মৎস্যচক্ষু ভেদ করেন হাসির জলপাত্রের দিকে নিবিষ্ট-চিত্ত হইয়া। দ্বিজেন্দ্রলাল ভাঁড়ামি করেন নাই, তিনি কান্নার ছদ্মবেশে হাসির কটাক্ষে আমাদের জাগ্রত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। আমাদের সমাজের ইতর আত্মবঞ্চনা, পঙ্গু মিথ্যার গলদঘর্ম বিলাসিতা, মনুষ্যত্বের হীন অপনোদন, স্বদেশপ্রেমের আড়ম্বরি প্রচার এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার স্ফীতকায় অন্তঃসারশূন্যতা—ইহাদের প্রতি তিনি হাসির করুণা বর্ষণ করিয়াছেন মাত্র। তাই হাসির গানের সম্রাট দ্বিজেন্দ্রলাল যেন অনেকটা অহেতুকভাবেই তাঁহার

দ্বিজেন্দ্রলালের আত্মসমীক্ষা

হাস্যশিল্পী দ্বিজেন্দ্রলাল

জীবন হাস্য-প্রধান নয়

হাসি ও অশ্রুর সম্পর্ক

দ্বিজেন্দ্রলাল করুণরসেরও কবি

হাস্যরসউদ্দীপক সৃষ্টিকে অবহেলা করিয়াছেন। যেখানে তিনি হাসির গানের কবি সেখানেও তিনি করুণরসের সাধক, ইহা সমভাবেই সত্য। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক বলিয়াছেন,

"যে আদর্শনিষ্ঠা এই গানগুলিতে ফুটিয়াছে, তাহার সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যান্য রচনার আদর্শবাদের ঐক্য আছে। একান্ত সত্যনিষ্ঠা, চরিত্রের ঋজুতা ও দৃঢ়তা, মানুষের সাধারণ সুখদুঃখের জন্য একান্ত দরদ এইগুলি দ্বিজেন্দ্রলালের মতে শ্রেষ্ঠ আদর্শ। তিনি কল্পনাপ্রবণতা ভাববিলাস-মাত্রকে পছন্দ করিতেন না, পাঁচজনের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া আমোদ করিয়া পুরুষের মত সংসারের কর্তব্য সাধন করা, ইহাই ছিল তাহার বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ ধর্ম। ন্যায়বিচার সত্য সহানুভূতি ও কাণ্ডজ্ঞান—এই চারিটি স্তম্ভের উপর দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার আদর্শ জগৎ গড়িয়া তুলিতে চাহিতেন, এই আদর্শ এত দুর্লভ বলিয়াই যেন অনেক সময় দরদী দ্বিজেন্দ্র-লালের বিদ্রূপের সহিত একটা সহানুভূতি সহিষ্ণুতা এমনকি প্রশ্রয়শীলতা জড়িত হইয়া রহিয়াছে"।

সমালোচকের মন্তব্য

বস্তুত হাসি ও অশ্রু কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলাল হাস্যরস ও করুণরসকে দুই বিপরীত মেরুতে স্থাপন করিয়াছেন বটে, কিন্তু সাহিত্যে অন্তত ইহা সত্য নয়। যথার্থ হাস্যরস করুণরসের বিরোধিতা করে না, তাহাকে পরিপুষ্টই করে। মানব জীবনে যাহা করুণ ক্রন্দনময় তাহাই হাসির আশ্চর্য উপকরণ, ইহা ভলটেয়ার হইতে দ্বিজেন্দ্রলাল সব হাস্যরসিকের পরীক্ষিত সত্য। রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্র-লালের হাস্যরসাত্মক কাব্য আষাঢে সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন,

হাস্যরস করুণরসের পরিপোষক

"শুদ্ধমাত্র অমিশ্র হাস্য ফেনারাশির মত লঘু এবং অগভীর। তাহা বিষয় পুঞ্জের উপরিতলের অস্থায়ী উজ্জ্বল বর্ণপাত মাত্র। কেবল সেই হাস্যরসের দ্বারা কেহ যথার্থ অমরতা লাভ করে না।...হাস্যরসের সঙ্গে চিন্তা এবং ভাবের ভার থাকিলে তবে তাহার স্থায়ী আদর হয়। সমালোচ্য গ্রন্থে...যে হাস্য প্রকাশ পাইতেছে, তাহা লঘু হাস্যমাত্র নহে, তাহার মধ্যে কবির হৃদয় রহিয়াছে, তাহার মধ্য হইতে জ্বালা ও দীপ্তি ফুটিয়া উঠিতেছে। কাপুরুষতার প্রতি যথোচিত ঘৃণা এবং ধিক্কারের দ্বারা তাহা গৌরববিশিষ্ট।

দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য

তাহা ছাড়া, সাময়িকপত্রে মধ্যে মধ্যে আষাঢ়ে-রচয়িতার এমন সকল কবিতা বাহির হইয়াছে, **যাহাতে হাস্য এবং অশ্রুরেখা, কৌতুক এবং কল্পনা, উপরিতলের ফেনপুঞ্জ এবং নিম্নতলের গভীরতা একত্র প্রকাশ পাইয়াছে।** তাহাই তাঁহার কবিত্বের যথার্থ পরিচয়। তিনি যে কেবল বাঙালীকে হাসাইবার জন্য আসেন নাই, সেই সঙ্গে তাহাদিগকে যে ভাবাইবেন এবং মাতাইবেন, এমন আশ্বাস দিয়াছেন।"

[আধুনিক সাহিত্য -রবীন্দ্রনাথ]

নাট্যসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের এই 'দুখের রাজা' সৃষ্টির অকপট পরিচয় আছে। সীতা নাটকে নির্বাসিতা সীতার দুঃখভারাক্রান্ত মূর্তি, প্রতাপসিংহ, দুর্গাদাস, সাজাহানে অসংখ্য ট্র্যাজিক চরিত্র রচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের করুণ রস সৃষ্টির দক্ষতা অনস্বীকার্য। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সুপরিচিত উক্তি, 'যে-বঙ্কিম বঙ্গ সাহিত্যের গভীরতা হইতে অশ্রুর উৎস উন্মুক্ত করিয়াছেন, সেই বঙ্কিম আনন্দের উদয়শিখর হইতে নবজাগ্রত বঙ্গ সাহিত্যের উপর হাস্যের আলোক বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন', ইহা দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কেও পুনর্ব্যবহার্য।

নাট্যসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল

হাসি ও অশ্রু দ্বিজেন্দ্রলালের দীর্ঘ কবিতা, কয়েকটি স্তবকমাত্র মাধুকরীতে ঈষৎ অবস্থান পরিবর্তনে গৃহীত হইয়াছে (অর্থাৎ আলোচ্য কবিতার প্রথম স্তবক মূল কবিতার ত্রয়োদশ স্তবক, দ্বিতীয় স্তবক মূলের দ্বাদশ, তৃতীয় স্তবক মূলের চতুর্দশ স্তবক)। এখানে দ্বিজেন্দ্রলাল আত্মসমীক্ষা করিলেও আপনার সাহিত্যিক পরিচয়কেই বড় করিয়াছেন একথা বলা সংগত হইবে না, কারণ কোনোকালেই দ্বিজেন্দ্রলাল অবিমিশ্রিতভাবে পরিহাসসর্বস্ব লেখক ছিলেন না। এখানে হাস্য প্রচলিত অর্থে সুলভ অগভীর রসিকতা, জীবনের মূল্যবোধহীন উত্তেজনা, সস্তা আমোদপ্রমোদ, হৃদয়স্পর্শবিহীন মানবিক সম্পর্ক। আর অশ্রু গভীর সমবেদনা, মনুষ্যত্ববোধ, মহত্ত্ব সম্পর্কে শ্রদ্ধা, পরোপচিকীর্ষা, তিতিক্ষা, শুশ্রূষা প্রভৃতি গুণের প্রতীক। সুতরাং সাহিত্যিক হিসাবে কিংবা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ মানুষ হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলাল

হাসি ও অশ্রুর সঙ্গে মূল কবিতার তুলনা

যথার্থ আত্মসমীক্ষা নয়

জীবনের অগভীর আমোদপ্রমোদ, স্থূল ভোগোপকৃত সুখ পরিত্যাগ করিয়া গভীর সহানুভূতিপূর্ণ আত্মত্যাগপরায়ণ সেবানিষ্ঠ জীবন যাপন করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। ইতিহাস-পুরাণের যাহা কিছু গভীর রসাত্মক করুণরসোদ্দীপক মানবাত্মা-আলোড়নকারী ঘটনা, তিনি তাহারই রসাস্বাদন করিতে চাহিয়াছেন। কারণ মহৎ সাহিত্যের উপকরণ ইহাদের মধ্য হইতেই গড়িয়া উঠে। শেলীর ভাষায়,

এখানে কবি জীবনতার সাধকমাত্র

সাহিত্য করুণরসের স্থান

We look before and after and pine for what is not.
Our sincerest laughter with some pain is fraught.
Our sweetest songs are those that tell of saddest
thought.

যাহা আমাদের অশ্রু আকর্ষণ করে শিল্পবস্তু হিসাবে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব পৃথিবীর সর্বকালেই স্বীকৃত হইয়াছে। একটি মহৎ পতন, মহতী বিনষ্টি, নিবিড় ত্যাগ, গভীর শোক, নিঃসীম হাহাকারকে কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল করিবার প্রতিভাকেই কাব্যলক্ষ্মী তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ পুষ্পমালা নিবেদন করিয়া থাকেন।

রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ

(প্রথম স্তবক) **হাস্য শুধু ··অপচয়**— জীবনের অধাংশ অর্থাৎ যৌবন-কাল পর্যন্ত নিতান্ত স্থূলভ পরিহাস-রসিকতায় অগভীর ও নিষ্ফল জীবন-যাপন করিয়া কবি আক্ষেপ সহকারে বলিতেছেন যে, কেবল হাস্যচাপল্যকেই এতকাল তিনি সখ্যসূত্রে বাঁধিয়াছেন, কিন্তু অশ্রু অর্থাৎ গভীর দুঃখবৈরাগ্যপূর্ণ চিন্তা কি তাহার নিকট অপাংক্তেয়? **চলে যা সহবেদনায়**—এতাবৎ-কাল কবির লঘু চাপল্য ও ব্যঙ্গরসিকতাই প্রিয় ছিল বলিয়া কোনো অশ্রু-কাতরতার ঘটনা অথবা বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতাকে তিনি মনে স্থান দেন নাই, এখন তাই সুখ-তামাশার বদলে যাহা কিছু বিষাদজনক কবি তাহাই স্মরণ করিতে চাহিতেছেন। এখন পরিহাস নয়, যেখানে ব্যথা কবির সহানুভূতি যেন সেখানেই ধাবিত হয়, ইহাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা। তুলনীয়, 'দুখের বেশে এসেছ বলে তোমারে নাহি ডরিব হে, যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা

নিবিড় করে ধরিব হে'—রবীন্দ্রনাথ। **সুখের সঙ্গ……সহবাস**—কবি এখন সম্পূর্ণরূপে সুখবিলাসপূর্ণ দিনযাপনরীতি ত্যাগ করিয়া দুঃখবিষাদপূর্ণ জীবনযাপন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। **ইহাই আমার……অভিলাষ**—এই বেদনাবিষাদ অশ্রুভারাক্রান্ত জীবনের সহিত সহমর্মিতাকে কবি তাঁহার ইচ্ছামাত্র নয়, ব্রতরূপে পালন করিতে চান।

(দ্বিতীয় স্তবক) **নিয়ে আয়……অশ্রুধার**—সুখ পরিহাস, তরল রসিকতা, সুলভ স্বপ্নমায়ার সহিত সকল সম্পর্ক ঘুচাইয়া দিয়া কবি সমাজের যাহা কিছু গভীর অশ্রুব্যাকুলতা, দুর্ভাগ্য, নৈরাশ্য, বেদনা ও ক্রন্দন তাহাই গ্রহণ করিবার, বহন করিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন। তাই ইতিহাস-প্রবাহের অন্তর্গত যত কিছু হৃদয়মথিত কাহিনী, জগতের অশ্রুধারে যাহাদের হৃদয় মলিমা ধৌত সেইসব চরিত্র, তাঁহার স্মৃতিপটে মুহূর্তে ভিড় করিয়া দাঁড়াইতেছে। রামায়ণে রাজনন্দিনী সীতার অশেষ দুঃখভোগের ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার করুণ কাহিনী, মহাভারতে কলি কর্তৃক উৎপীড়িত নল-রাজার রাজদুহিতা স্ত্রী দময়ন্তীর বনবাস-জীবনের দুর্বিষহ বেদনামাখা ঘটনা তিনি স্মরণ করিতে চাহিলেন। **শকুন্তলার·হাহাকার**—মহাভারতের নিগৃহীত শোকক্লিষ্টা নারী চরিত্রগুলির মধ্যে কবির মনে পড়িল শকুন্তলা ও দ্রৌপদীকে। তাপসকন্যা নিষ্পাপচরিত্র শকুন্তলা দুষ্মন্তের সভাগৃহ হইতে যেদিন অপমানিতা ও প্রত্যাখ্যাতা হইয়াছিলেন, সেইদিন তাঁহার নারীজন্মের চরম দুর্দিন। সভাকক্ষে দুর্যোধন প্রমুখ ধার্তরাষ্ট্রগণের দ্বারা লাঞ্ছিতা বিলাপিতা দ্রৌপদীর চিত্র ও জগতের করুণ ঘটনাগুলির মধ্যে অন্যতম। এইগুলি স্বভাবতই বেদনাস্পৃষ্ট নীতস্থ কবির স্মরণে আসিল সীতা-দময়ন্তীর প্রসঙ্গসূত্রে। **যুধিষ্ঠিরের পুত্রশোক** কেবল ক্রন্দমানা নারী নয়, পুরুষের দুঃখবেদনার কথাও কবির মনে পড়িতেছে। অতুল বৈভবসম্পন্ন গুণবান পাণ্ডবগণ যেদিন কৌরবদের ষড়যন্ত্রে সর্বস্বান্ত হইয়া একবস্ত্রে বনবাস বরণ করিলেন সেদিন সমগ্র ভারত তাঁহাদের দুঃখে অশ্রুপাত করিয়াছিল. কারণ তাহার সহিত তাঁহার বিষাদ লিপ্ত করিয়া দিতে চান। ধৃতরাষ্ট্র সারাজীবন তাঁহার পুত্রদের বাৎসল্যে প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সেই সমস্ত অধর্মাচারী পুত্রদের মৃত্যুর সংবাদে তিনি কিরূপ বিচলিত ও বিদীর্ণচিত্ত হইয়াছিলেন, মহাভারত পাঠকের তাহা অজানা

নাই। শোকার্ত পিতার ক্রোধ লৌহভীমকে চূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। **হরিশ্চন্দ্রের ···অশ্রুলোক**—বিশ্বামিত্রের ক্রোধে হরিশ্চন্দ্র তাঁহার সকল পার্থিব সম্পদ, রাজ্য, পুত্র, স্ত্রী, নিজের জীবন দান করিয়া চণ্ডালের দাসরূপে শ্মশানে শবদহন কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহাও পুরাণের আর একটি ট্র্যাজিক কাহিনী। এই সকল কাহিনী স্মরণ করিয়া কবি একটি অনির্বাপ্য দুঃখের রাজ্য তাহার স্মৃতিপটে সদাজাগরূক রাখিতে চাহিয়াছেন। **সিজার পতন**—অসম্ভব ক্ষমতা ও শক্তিস্ফীতি হইতে সহসা সিজার ও হানিবলের পতন ইতিহাসের দুই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। **সিজার** বা জুলিয়াস সিজার, রোম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, পৃথিবীর সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, রাজনীতিজ্ঞ এবং সমরনায়ক সাধারণ অবস্থা হইতে রোম সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসকে পরিণত হইয়াছিলেন (১০২-৪৪ খ্রীঃ পূর্বাব্দ), কিন্তু তাঁহার সহকর্মী রোমান সেনেটরদের বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের ফলে নিহত হন। **হানিবল** খ্যাতনামা কার্থেজীয় জেনারেল যিনি দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধে (২১৮-২০১ খ্রীঃ পূর্বাব্দ) ইতালি আক্রমণ করিয়া রোমানদের পরাস্ত করেন। অল্প বয়স হইতেই তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল I Swear that so soon as I am old enough, I will persue the Romans both at sea and on land. I will use both fire and steel to arrest the destiny of Rome রোম জয় করিলেও নিদারুণ শীত ও পথকষ্টে আল্‌প্‌স্‌ পর্বত অতিক্রম করার পর হানিবলের বিপুল সেনাবাহিনী ভাঙিয়া পড়ে। খ্রীঃ পূঃ ২০৪ অব্দে আফ্রিকানাসের অধীনে এক সুগঠিত রোমক-বাহিনী হানিবলকে পরাজিত করে। ১৮২ খ্রীঃ পূর্বাব্দে বিষপান করিয়া হানিবল আত্মহত্যা করেন। **সেকেন্দরের রাজ্যলোপ**—৩৩৬ খ্রীঃ পূর্বাব্দে ম্যাসিডনের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আলেকজাণ্ডার বা সেকেন্দর অল্পকালের মধ্যেই গ্রীসদেশে আধিপত্য বিস্তার করেন এবং দিগ্বিজয়ে বাহির হন। তারপর অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই পারস্য সম্রাটকে পরাজিত করিয়া হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া ভারতে আসেন। ভারতের বিপুল অংশ হস্তগত করিয়া আলেকজাণ্ডারের সৈন্যবাহিনী বিপাশা অতিক্রম করিয়া আর যাইতে না চাহিলে ফিরিয়া যাইবার কালে বিভিন্ন রাজার দ্বারা প্রচণ্ডভাবে বাধা পাইতে থাকে। ব্যাবিলনে পৌঁছাইয়া মাত্র ৩৩ বৎসর বয়সে আলেকজাণ্ডারের

মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর পরই তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য তাঁহার প্রধান সেনাপতিদের মধ্যে বণ্টিত হইয়া যায়। আলেকজাণ্ডার ইংরাজি উচ্চারণ, ফারসীতে সেকন্দর, গ্রীক আলেকজান্দ্রস্। **নেপোলিয়ন ইউরোপ**—ফরাসী দেশের একদা ভাগ্য বিধাতা, সমগ্র ইউরোপের অধিচিকীর্ষু নেপোলিয়ন ফরাসী বাহিনীর সৈনিক হইতে ধীরে ধীরে বাহু ও বুদ্ধিবলে সৈন্যবাহিনীর সর্বময় কর্তায় পরিণত হইয়াছিলেন। অস্ট্রিয়া, রাশিয়া এবং গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্ঘবদ্ধ সেনাবাহিনী নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করিলে একাধিকবার পরাজিত হয়। নেপোলিয়ান ধীরে ধীরে অধিকৃত সাম্রাজ্যে এক নূতন শাসনব্যবস্থা শিক্ষাবিধি ও আইনকানুন গড়িয়া তুলিলেন। ইউরোপীয় শক্তিবর্গ পুনর্বার নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে আক্রমণ করিলে পরাস্ত হয় এবং ১৮১২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত নেপোলিয়ানের জয়যাত্রা ও একাধিপত্য অব্যাহত থাকে। ১৮১২ খ্রীস্টাব্দে রুশিয়ার যুদ্ধে নেপোলিয়ান সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। ক্রমে রাশিয়া, সুইডেন, প্রুশিয়া, অস্ট্রিয়া ও গ্রেট ব্রিটেন ঐক্যবদ্ধভাবে মুক্তিযুদ্ধে নেপোলিয়ান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত ওয়াটারলুর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নেপোলিয়ান সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে অন্তরীণ হন। এখানেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে (১৮২১)। **দারার খড়্গ**—শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা পিতার সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিলেন কিন্তু শাহজাহানের অসুস্থতার সংবাদে তাঁহার পুত্রদের মধ্যে ক্ষমতালিপ্সা তীব্র হইয়া উঠিলে, ক্ষমতাদ্বন্দ্বে দারা, সুজা ও মুরাদ ঔরংজেবের নিকট পরাস্ত হন। উদারনৈতিক সাহিত্যরসিক, যুদ্ধ-কুটিলতায় অনভ্যস্ত দারা বিপুল সৈন্যবাহিনী লইয়া চম্বলের নিকট ঔরংজেবের হাতে পরাজয় বরণ করেন এবং পাঞ্জাবে পলায়ন করেন এবং ঔরংজেব তাঁহাকে অনুসরণ করিতে থাকেন। লাহোর, মুলতান, সিন্ধু হইতে ক্রমশ পলায়ন করিয়া কান্দাহারের নিকট জনৈক বালুচি সেনাধ্যক্ষের কৃতঘ্নতায় তিনি ধৃত ও নিহত হন (এখানে উল্লেখ-যোগ্য যে, দ্বিজেন্দ্রলালের শাজাহান নাটকে দারার শোচনীয় মৃত্যুদৃশ্য চিত্রিত হইয়াছে।) **ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুভয়**—ঔরঙ্গজীব বা ঔরংজেব, শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র, বুদ্ধিবলে বাহুবলে মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তা হইয়াছিলেন। দীর্ঘ গৌরবময় সাম্রাজ্য-চালনার শেষ কয়েক বৎসর ঔরংজেবের জীবন হইতে ভাগ্যলক্ষ্মী অপসৃত হইতে থাকেন এবং দাক্ষিণাত্য ও মারাঠাদের

সহিত অর্থক্ষয়ী ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে তিনি সর্বস্বান্ত বিক্ত ও হতাশ হইয়া পড়েন। ভারত সাম্রাজ্যের চতুর্দিকে তখন বিদ্রোহ ও অরাজকতা, অসন্তোষ ও ঔদ্ধত্য—সম্রাট বৃদ্ধ ও অসুস্থ, কাহাকেও বিশ্বাস করেন না, সকলের সম্পর্কে তাঁহার সন্দেহ, সুতরাং কাহাকেও বিশ্বাস করিয়া দায়িত্ব দিতে পারিতেছেন না। আপন পিতা ও ভ্রাতাদের রক্তে হাত রঞ্জিত করিয়া তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, অদৃষ্ট তাহারই পুনরাবৃত্তি ঘটাইতে চলিল, তাঁহার পুত্রগণ পিতৃদ্রোহী হইল। তখন,

In the midst of universal disorder, desolution, misery and destitution, with a sense of utter frustration he withdrew to Ahmadnagar in 1705 The Maratha counter-offensive gathering momentum became completely dominant At his journey's end the great Emperor was fully conscious of the failure of his Deccan campaign He died on Feb. 20, 1707 at Ahmadnagar (Hist. of India by Sinha & Banerjee)

শেষ জীবনে আপন জীবনের পূর্বকৃত অপরাধের ও ক্ষমতালিপ্সার পুনরাবৃত্তি ঘটায় ঔরংজেবের নৈরাশ্য ও অবক্ষয় তাঁহাকে মুমূর্ষু করিয়া দিয়াছিল, ইহাকেই কবি মৃত্যুভয় বলিয়াছেন। **পানিপথে পরাজয়**—কুরুক্ষেত্রের অনতিদূরে পানিপথের প্রান্তরে একাধিকবার ভারত-ইতিহাসের ভাগ্য নির্ধারিত হইয়াছে। পানিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬ খ্রীঃ) ইব্রাহিম লোদিকে পরাস্ত করিয়া বাবর ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত করেন। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১৫৫৬) বিপুল সৈন্য সামন্ত লইয়া হিমু আকবরের হস্তে পরাস্ত হন এবং ভারতবর্ষে আকবরের শক্তি অপরাজিত হয়। এখানে কবি পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের কথাই বলিতেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতের ভাগ্যাকাশ যখন মেঘাক্রান্ত, দিল্লীর সিংহাসন কম্পিত, মারাঠাশক্তির অভ্যুদয়ে উত্তর ভারত বিচলিত, তখন আহমদ শাহ আবদালীর নেতৃত্বে আফগান সৈন্যবাহিনীর সহিত মারাঠাদের যুদ্ধ বাধিল পানিপথে, ইহাই পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (১৭৬১ খ্রীঃ)। "প্রথমে মনে হয়েছিল মারাঠারাই সম্ভবত জিতবে, কিন্তু সময় বুঝে, মারাঠারা যখন ক্লান্ত, তখন ১৩০০০ সৈন্যকে হঠাৎ নামিয়ে আবদালী যুদ্ধের চেহারা পাল্টে দিলেন।

সদাশিব রাও নিজে অসমসাহসে লড়েছিলেন, পাঁচজন আফগান ঘোড়সওয়ার নাকি তাঁর মূল্যবান পোশাকের লোভে তাঁর শিরশ্ছেদ করেছিল। মারাঠা পক্ষে হতাহতের সংখ্যা হল বিপুল। সেদিন অপরাহ্নে 'যেন মাঠ থেকে কর্পূরের মত মারাঠা ফৌজ উবে গিয়েছিল'। দুঃসংবাদ পেয়ে পেশোয়ারও বুক ভেঙে গেল, কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। মহারাষ্ট্রে প্রায় প্রত্যেকটি পরিবারকে স্বজনবিয়োগে শোকাতুর হতে হয়েছিল"। (হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় – ভারতবর্ষের ইতিহাস)। **যেথায় ক্লান্তি নিয়ে চল**—পুরাণ ইতিহাসের বহুবিধ দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা স্মরণ করিয়া সুখ-পরিহাস সম্পর্কে বীতরাগ কবি কেবল মানুষের সকল কালের বেদনা বিলাপের মধ্যেই আত্মনিমজ্জিত হইবার বাসনা প্রকাশ করিতেছেন। যেখানে মানুষের উদ্যম লুপ্ত হইয়া ক্লান্তি দেখা দিয়াছে, যেখানে রোগভোগে জীবন দুর্বিসহ হইয়াছে, কাহারও শারীরিক অথবা মানসিক ক্লেশ প্রকাশ পাইয়াছে, যেখানে নিখিল মানুষের ক্রন্দন ও হাহাকার, সেই সকল ঘটনা কবির অগোচর থাকিলেও, সেখানেই তাঁহার আকর্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। তাই তিনি অপরকে তাঁহার অজ্ঞাত মনুষ্যজীবনের করুণ অসহায় অবস্থার সঙ্গী হইবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছেন।

(তৃতীয় স্তবক) **পরের দুঃখে ধন্য হয়**—আলোচ্য ছত্রদ্বয়ে কবির স্বীয় দুঃখবাদের অন্তরালশায়ী একটি তত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে। কবি কেবল পরের দুঃখমাত্রেই অশ্রুজল ফেলিতে চান না। মহৎ ব্যক্তির শোচনীয় পরিণাম, কোনো প্রশংসনীয় ত্যাগের বেদনাদায়ক ঘটনা, কোনো উচ্চ আদর্শের পরিণতিস্বরূপ যে দুঃখবরণ তাহাই তাঁহার বিষাদের কারণ এবং ইহারই ফলে সেই বিষাদ তাৎপর্যমণ্ডিত হইয়া উঠিবে বলিয়া কবি বিশ্বাস করেন। **কর্মের জন্য ... দৃঢ়পণ**—যে মহত্ত্ব পরিণামে মানুষের, বিশেষত কবির শোকাশ্রু আকর্ষণ করিবে, আলোচ্য ছত্রগুলিতে তাহারই কয়েকটি উদাহরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে। মৃত্যু মাত্রই করুণ নয়। কিন্তু যদি তাহা কোনো কর্তব্যকর্ম পালনের পরিণাম হয়, কোনো ধর্মরক্ষার জন্য যদি কেহ জীবন বিসর্জন দেয়, সত্যপালনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় যদি কেহ দুঃখভোগ করে, পরের মঙ্গলের জন্য যদি কাহাকেও মৃত্যুবরণ করিতে হয় তবে তাহাই মহত্ত্ব, আর সেই মহত্ত্বের জন্য 'ধন্য এ ক্রন্দন'। অনাথ আতুর ক্ষুধার্তকে যে সর্বস্ব

দান করে, অসুস্থ ব্যক্তির শয্যাপার্শ্বে যে আত্মসুখ ভুলিয়া বিনিদ্র রাত্রি জাগরণ করে, আশ্রয়হীন ব্যক্তিকে যে আপনার আশ্রয় দান করে অথবা আর্ত বিপন্ন ব্যক্তিকে রক্ষা করিবার জন্য যে একাগ্র প্রতিজ্ঞা করে, সেই মহৎ। তাহার ত্যাগ ও সহিষ্ণুতা যে শোক উৎপাদন করে, সেই শোকই ধন্য। **পিতার জন্য পুরুর কুষ্ঠ**—কৌরব ও পাণ্ডব বংশের আদি পুরুষ পুরু যযাতি ও শর্মিষ্ঠার কনিষ্ঠ পুত্র। শুক্রাচার্যের অগোচরে শর্মিষ্ঠাকে গ্রহণ করার অপরাধে শুক্রের অভিশাপে যযাতি জরাগ্রস্ত হইলে কনিষ্ঠপুত্র পুরু সেই জরা আপন দেহে ধারণ করিয়া জরামুক্ত পিতাকে বহুকাল যৌবনতৃষ্ণা ভোগের ক্ষমতাদান করিয়া পুরাণে মহৎ হইয়া আছেন। কুষ্ঠ এখানে জরা অর্থে গৃহীতব্য। **পরের জন্য ভীষ্মের প্রাণ**—ভীষ্মের বিচিত্র জীবনকাহিনী সর্বজনপরিচিত। সত্যবতীর সহিত পিতা শান্তনুর বিবাহ হইলে ভবিষ্যজাত পুত্রকে রাজ্যদানের অঙ্গীকারে শান্তনুপুত্র ভীষ্ম বিবাহ না করিবার এবং আমরণ ব্রহ্মচারী থাকিবার দারুণ প্রতিজ্ঞা করিয়া জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। 'শৌর্যে বীর্যে জ্ঞানে রাজনীতিতে দৃঢ়তায় ধর্মে ও সংযমে ভীষ্মের মত মহাপুরুষ জগতে দুর্লভ' (পৌরাণিক অভিধান)। **ভগীরথের তপস্যা**—ইক্ষ্বাকু বংশীয় সগর রাজার অধস্তন চতুর্থ পুরুষ দিলীপের পুত্র ভগীরথ কপিলের শাপে ভস্মীভূত পিতৃ-পুরুষদের উদ্ধারের জন্য বহু বর্ষ কঠিন তপস্যা করিয়া সগররাজের ষাট হাজার পুত্রকে মুক্ত করিবার জন্য গঙ্গাকে স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ করাইয়াছিলেন। তিনি মোট তিনবার তপস্যা করিয়াছিলেন। **দধীচির সেই অস্থিদান**—ঋষি অথর্বের পুত্র তপস্যাব্রতী দধীচি বৃত্রাসুরনিধনের জন্য বজ্র নির্মাণার্থে আপনার প্রাণ বিসর্জনপূর্বক ইন্দ্রকে তাহার অস্থি দান করেন। এই মহৎ ত্যাগ পুরাণে অবিস্মরণীয় হইয়া আছে। **গান্ধারীর কর্তব্যজ্ঞান**—সত্যদর্শিনী কর্তব্য-পরায়ণা ধর্মনিষ্ঠ কৌরব-জননী গান্ধারী আপন পুত্রদের অধর্মাচরণে, পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে কপটবিজয়ে এবং পুত্রবধূতুল্যা দ্রৌপদীর লাঞ্ছনায় ব্যথিতা হইয়া স্বামী ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আপন পুত্রের নির্বাসন প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু স্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক এই আবেদন প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল। পণমুক্ত পাণ্ডবদের প্রাপ্য অর্ধরাজ্য প্রত্যর্পণের ও সন্ধির জন্য তাঁহার প্রস্তাবও অগ্রাহ্য করা হয়। বনবাসের পর পাণ্ডবগণ হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য কৌরব সভায় দূত প্রেরণ করিলে গান্ধারী রাজসভায় আসিয়া দুর্যোধনকে সন্ধির উপদেশ

দান করেন এবং তিরস্কার করিয়া বলেন, ধর্মহীন ঐশ্বর্যপ্রাপ্তির চেষ্টার পরিণাম মৃত্যু। কিন্তু তাঁহার সকল আবেদন বৃথা হয়। অথচ কর্তব্যজ্ঞান ও ধর্মচারিতা সত্ত্বেও গান্ধারীর মাতৃহৃদয় বাৎসল্য ও স্নেহ কম ছিল না, পুত্র-মৃত্যুতে তাঁহার শোক মহাভারতে বিবৃত আছে। কিন্তু জীবনে স্নেহকে তিনি কখনও ধর্ম সত্য অথবা কর্তব্যের উপর স্থাপন করেন নাই। **সীতার সে উপাখ্যান**—রাজদুহিতা সীতা রামচন্দ্রের সহিত বিবাহিত হইবার অব্যবহিত পরেই অরণ্যজীবন যাপন করেন এবং রাবণ কর্তৃক লঙ্কায় অপহৃতা হন। রামচন্দ্র কর্তৃক উদ্ধারের পরও তিনি শান্তিলাভ করেন নাই, প্রজাদের সমালোচনায় রামচন্দ্র তাঁহাকে ত্যাগ করিতে উদ্যত হন এবং অগ্নিপরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। ইহার পর দ্বিতীয়বার রামচন্দ্র তাঁহাকে মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনে নির্বাসিত করেন। এত দুঃখ লাঞ্ছনা নির্যাতনেও সীতা ক্ষমাশীলা ছিলেন, আপনার বিপন্ন বিষাদের জন্য কাহাকেও দায়ী করেন নাই। সীতার এই অলোকসামান্য ক্ষমাপরায়ণতা তাঁহার চরিত্রে মহত্ত্ব দান করিয়াছে বলিয়া কবি ইহাকে স্বর্গীয় ও আলোকিত বলিয়াছেন। (দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' নাটকে সীতা পতিসত্য পালনের জন্য স্বেচ্ছায় বনবাস বরণ করিয়া লইয়াছেন, এইরূপ আখ্যান বিবৃত হইয়াছে)। **বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ**—পৃথিবীর সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহর্ষি বুদ্ধদেব আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে হিমালয়ের পাদদেশে জন্মগ্রহণ করেন। রাজকীয় ঐশ্বর্যে লালিত হইলেও মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে মানুষের ব্যাধি জরা মৃত্যুভয় শোক ইত্যাদি নিবারণ করিবার উপায় অন্বেষণের জন্য তিনি গৃহত্যাগ করেন, পরে সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি বুদ্ধ নামে পরিচিত হন এবং বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। স্ত্রী এবং সদ্যোজাত একমাত্র পুত্র রাহুলকে পরিত্যাগ করিয়াই বুদ্ধদেব সংসার হইতে পথে সত্যসন্ধানে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন। **শ্রীচৈতন্যের প্রেমোচ্ছ্বাস**—মধ্যযুগীয় বাঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ শ্রীচৈতন্যদেব ২৪ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করেন এবং দীক্ষা-গ্রহণান্তে শ্রীচৈতন্য নামে পরিচিত হন। তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মের নাম গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম, প্রেমভক্তি ইহার মূল কথা। মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই চৈতন্যদেবের ভক্তসংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায় এবং হরিভক্তির জোয়ারে কীর্তনে নামবাদপ্রচারে তিনি ভারতবর্ষের অর্ধাংশ মাতাইয়া তোলেন। **প্রতাপসিংহের দারিদ্র্য**—ভারত-বিজয়ী আকবরের অপ্রতিরোধনীয়

অভিযানের তুরপনেয় কণ্টক, রাজপুতগৌরব প্রতাপসিংহ আকবরের নিকট মাথা নত করেন নাই। হলদিঘাটের যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিয়াও মুষ্টিমেয় স্বদেশভক্ত লইয়া অরণ্যে প্রান্তরে অসহায় দারিদ্র্যে দিনপাত করিয়াছেন এবং ধীরে ধীরে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া কয়েকটি দুর্গ পুনরুদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন। (দ্বিজেন্দ্রলালের 'প্রতাপসিংহ' নাটকে স্বদেশপ্রেমিক প্রতাপসিংহের দারিদ্র্য ও আরণ্যক জীবনের নিরতিশয় দুঃখের চিত্র আছে)। **দুর্গাদাসের ইতিহাস**—In the history of Rajputana, Durgadas is justly regarded as one of the immortals for his selfless devotion to the cause of his country in the face of terrible odds. (An Adv. Hist. of India--Majumdar Roychoudhury and Dutta). দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার 'দুর্গাদাস' নাটকে দুর্গাদাসের যে কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা এই- ঔরংজেবের চক্রান্তে যোধপুররাজ যশোবন্ত সিংহের মৃত্যু হইলে মাড়বার সেনাপতি দুর্গাদাস যশোবন্তের বিধবা পত্নী মহামায়া ও শিশুপুত্র অজিত সিংহকে ঔরংজেবের হাত হইতে রক্ষা করেন এবং রাজপুত সৈন্যদের অধিনায়কতা করিয়া মেবার আক্রমণকারী ঔরংজেবকে দুইবার পরাস্ত করেন। কিন্তু রাজপুতগণ দুর্গাদাসকে ত্যাগ করায় শম্ভুজির আশ্রয়প্রার্থী দুর্গাদাস বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ঔরংজেবের বন্দী হন ও পরে মুক্ত হন। অজিত সিংহ কর্তৃক আকবরের কন্যা রাজিয়াকে ঔরংজেবের হস্তে সমর্পণ করার অপরাধে দুর্গাদাস পুনরায় নির্বাসিত হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, "সত্যকার দেশপ্রেম কোনো বাহ্যিক পুরস্কারের অপেক্ষা রাখে না। একবার অকৃতজ্ঞ রাজপুত দলপতিগণ ও দ্বিতীয়বার অকৃতজ্ঞ প্রভুপুত্র কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া দুর্গাদাস ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। দেশের সেবায় দুঃখ আছে, কোনো পুরস্কার নাই, দেশসেবার জন্যই দেশসেবা করিতে হয়, কোনো প্রতিদানের প্রলোভনে নহে। দুর্গাদাসের জীবনের সকরুণ পরিণতির ইহাই সান্ত্বনা" (বাঙলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস)। নাটকে কথিত এই ইতিহাসই 'দুর্গাদাসের ইতিহাস'রূপে আলোচ্যাংশে কবির অভিপ্রেত। **সেই রাজ্যে···মাতিয়ে দে**—পুরাণ ইতিহাস হইতে যে সকল মহৎ লোকের কাহিনী কবির স্মরণে আসিল সেইগুলির বিবরণ দিয়া কবি

একটি শোকের রাজ্য নির্মাণ করিতে চাহিয়াছেন, যেখানে ক্রন্দন নিতান্তই অশ্রুপাত নয়—যেখানে মহত্ত্বের জন্য ক্রন্দনের একটি মূল্য আছে। ইহা কবিকে আত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করিবে, কর্মে অনুপ্রাণিত করিবে, উত্তেজিত করিবে, আনন্দিত করিবে। এইজন্যই সেই ক্রন্দন ধন্য। **উঠুক বন্যা... গড়িয়ে যায়**—মহত্ত্বের ত্যাগে ও তিতিক্ষায়, সেবা ও আত্মবিসর্জনে কবি যে শোকাশ্রু বর্ষণ করিবেন তাহাই যথার্থ ক্রন্দন, সেই ক্রন্দনের প্রবল বন্যা স্বর্গরাজ্য অতিক্রম করিবে অর্থাৎ সেই কান্না ঠিক লৌকিক নয়, তাহা স্বর্গীয় হইবে। কবি আশা করেন, শেষ পর্যন্ত সেই কান্না দেশমাতৃকার জন্য কান্নায় পরিণত হইবে।

ব্যাখ্যা

চলে যা রে ... সহবেদনায়—আলোচ্য ছত্রগুলি হাসি ও অশ্রু কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলালের মূল কাব্যবক্তব্যের সারমর্ম। কবি অর্ধজীবন লঘু হাস্য-পরিহাস ও অগভীর বিলাসিতায় অপচয়িত করিয়া এখন মানুষের দুঃখশোক বিলাপবেদনার জন্য অনুকম্পায়ী হইতে চাহিয়াছেন। যথার্থ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ঘটে অপরের দুঃখে আপনার দুঃখ অভিসিঞ্চিত করায়। জীবনের ব্যথাবেদনা অশ্রুতাপ বিড়ম্বনা ও নিন্দিত অভিশাপের সহিত এতকাল যেন কবির পরিচয় ছিল না। তিনি এক অর্ধসত্য সুখের রাজ্যে নির্বাসিত ছিলেন। এখন সেই সুখরাজ্য হইতে বহির্গত হইয়া মানুষের ক্রন্দন-বিষাদের সঙ্গী হইতে চাহিয়াছেন। তাই এখন হাস্য-পরিহাস নয়, অপরের ব্যথার ব্যথী হইয়া তাহার সহিত একত্র হইয়া, অপরের অশ্রুর সহিত অশ্রু মিলাইবার জন্যই কবির অকৃত্রিম আকূতি প্রকাশ পাইয়াছে আলোচ্য দুই ছত্রে।

যেথায় ক্লান্তি ... নিয়ে চল—[রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]।

পরের দুঃখে ... ধন্য হয়—[রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]।

উঠুক বন্যা ... গড়িয়ে যায়—আলোচ্য অংশটি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাসি ও অশ্রু কবিতার সমাপ্তি চরণ। কবি হাস্য-পরিহাসের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া আপনার চারিদিকে একটি করুণা ও দুঃখের রাজ্য সৃষ্টি করিয়াছেন। যেখানে মানুষের অশ্রুবেদনা, ব্যাধি ও যন্ত্রণা, জীবনবিসর্জন ও শোক-ক্লান্তি ঘনীভূত সেখানেই তিনি সহানুভূতি প্রকাশ করিবারজন্য

আকুল হইয়াছেন। যথার্থ বেদনার কাহিনী কবির যে অশ্রুজল আকর্ষণ করিবে, যে সহানুভূতির সৃষ্টি করিবে, যে বেদনা উদ্বুদ্ধ করিবে তাহা কবির নৈরাশ্যের কারণ হইবে না, বরং এই সমবেদনা ও অনুকম্পার আলোকে তিনি আত্মচৈতন্যই লাভ করিবেন। পরের দুঃখে উৎসারিত গভীর ক্রন্দন মানুষের মন উদার করে, তাহাকে লৌকিক দুঃখের সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত করিয়া স্বর্গাভিমুখী করে অর্থাৎ এক অপার্থিব আনন্দ দান করে, যাহা জাগতিক ক্ষয়ক্ষতি হইতে মুক্ত। প্রাণের জন্য প্রাণের এই ব্যাকুলতা, মানবাত্মার কষ্টে অপর মানবাত্মার বেদনা শেষ পর্যন্ত এক বৃহত্তর জননীর জন্য কেন্দ্রীভূত হইবে। সব যন্ত্রণাবোধ ও সহমর্মিতা, সব করুণা ও দুঃখ-চেতনা যেন স্বদেশমাতৃকার চরণে নিবেদিত হয় ইহাই কবির অন্তিম বাসনা।

[সমাপ্তি চরণের অর্থ সুস্পষ্ট নয়। পূর্ববর্তী চরণের সঙ্গে 'মায়ের পায়ে গড়িয়ে যায়' এই চরণের তাৎপর্য গভীর সংগতিসূত্রে জড়িত নয়]।

প্রশ্ন ১। হাসি ও অশ্রু কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলাল হাসি ও অশ্রুর মধ্যে অশ্রুকে বরণীয় করিয়াছেন কেন? ইহার মধ্য দিয়া কবিজীবনের যে আদর্শ প্রচারিত হইয়াছে তাহার সাহিত্যিক সার্থকতা কতখানি?

হাসি ও অশ্রু ভাবপ্রকাশের দুই পৃথক ভঙ্গি, মানুষ সুখে আনন্দে কৌতুকে হাসে, দুঃখে অশ্রুপাত করে। ইহা জৈব নিয়মের অন্তর্গত। কিন্তু সাহিত্যে হাসি ও অশ্রুর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। কোনো কোনো সাহিত্যিক রসিকতা-উৎপাদনকেই তাঁহার লক্ষ্য করিয়া থাকেন, কেহ বা করুণ ঘটনার দ্বারা পাঠকের বেদনাবোধ জাগাইতে চেষ্টা করেন। হাসি ও অশ্রু কবিতায় কবি দ্বিজেন্দ্রলাল হাসির তুলনায় অশ্রুর দিকেই তাঁহার শিল্পী-জীবনের প্রবণতার অঙ্গীকার ঘোষণা করিয়াছেন।

হাস্যরস সাময়িক আনন্দের সৃষ্টি করিলেও জীবনের গভীরতা ইহাতে নাই। রসিকতা কৌতুক লঘু আমোদ-প্রমোদের দ্বারা আমরা বাহ্যিক বিলাসের স্থূল উপকরণ রচনা করি মাত্র। কিন্তু জীবনের যথার্থ পরিচয় নিহিত আছে মানুষের বেদনাবোধ দুঃখ-শোক, তাপ-যন্ত্রণার মধ্যে। অপরের ব্যথার সহিত সমবেদনা, অন্যের অশ্রুজলের সহিত সহমর্মিতাই এখন কবির নিকট বরণীয় বলিয়া তিনি হাসির সহিত সম্পর্ক ঘুচাইয়া দুঃখের সহিত সখ্য স্থাপন করিতে বসিয়াছেন। তাই পুরাণ-ইতিহাসের যাহা কিছু

করুণ হৃদয়বিদারক স্মৃতি, মানুষের ত্যাগ বঞ্চনা লাঞ্ছনার যাহা কিছু শোকঘন কাহিনী, তাহার প্রতি কবির চিত্ত উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। অতীতের সেই সকল অবিস্মরণীয় স্মৃতিলোকের মধ্যে বাস করিয়া কবি অপরের জন্য কাঁদিবেন, দুঃখীর দুঃখে অনুকম্পায়ী হইবেন, মহত্ত্বের জন্য কাঁদিয়া কান্নাকে সার্থক করিবেন। সীতা-দময়ন্তী শকুন্তলা দ্রৌপদীর কাহিনীতে দেখা যায়, তাহারা সকলেই জীবনের নানাপথে নানাভাবে অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে চরম দুঃখ বরণ করিয়াছেন। যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্র হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি পৌরাণিক পুরুষ চরিত্রগুলিও অতুল সম্পদ, ঐশ্বর্য, চরিত্রমাহাত্ম্য সত্ত্বেও ভাগ্যচক্রে জীবনের একাধিক অবস্থায় চরম দুঃখ শোক ও আঘাত পাইয়াছেন। রোমক সম্রাট সিজার, কার্থেজের বীর যোদ্ধা হানিবল, বিশ্বাভিযানকারী সম্রাট আলেকজাণ্ডার, ইউরোপের অধিপতি ফরাসীদেশের নেপোলিয়ান—ইহারা একদা ইতিহাসে ক্ষমতা ও শৌর্যের সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াও দুর্দৈববশত পরাস্ত হইয়াছেন, তাহাদের সকল মহিমা গোধূলির বর্ণচ্ছটার মত বিলীন হইয়াছে। ঔরংজেবের উত্থানে যুবরাজ দারার আসন্ন বিপদ, শেষ জীবনে পুত্রদের আত্মকলহ ও বিদ্রোহে ঔরংজেবের অবক্ষয়, পানিপথের তৃতীয় সংগ্রামে অপরাজেয় মারাঠার সর্বনাশের কথা কবির মনে পড়িতেছে। পুরাণ-ইতিহাসের এই সকল অশ্রুকরুণ দুঃখকর ঘটনার স্মৃতির ভিতর দিয়াই কবি তাঁহার অশ্রুপ্রবণতাকে জাগাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

কিন্তু কেবল নির্বিচার পরের দুঃখে কান্না নয়, যথার্থ মহত্ত্বের জন্য কান্নাতেই কান্নার সার্থকতা, ইহাও কবি জানেন। যাহারা কর্মসাধন অথবা কোনো ধর্মরক্ষার জন্য, অপরের মঙ্গলের জন্য, বিপন্নকে রক্ষার জন্য আত্মদান করিয়াছে, বিবিধ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, দুঃখবরণ করিয়াছে তাহাদের দুঃখেই কবির শোক। যেমন পিতার জরা পুত্র পুরু আপন শরীরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, পরার্থে ভীষ্ম আমরণ জিতেন্দ্রিয় ছিলেন, সারা জীবন কঠিন তপস্যা করিয়া ভগীরথ সগর-বংশধরদিগকে উদ্ধার করেন এইগুলিকেই মহৎ দুঃখ বলা যায়। দুঃখভোগকারিণী জননী গান্ধারী ও সীতা, আত্মদাতা দধীচি, মহাপুরুষ বুদ্ধদেব ও চৈতন্য, সর্বস্বান্ত রাণা প্রতাপসিংহ ও দুর্গাদাস—ইহাদের জীবনের ইতিহাস কবির অশ্রুকে উদ্বুদ্ধ করিবে, কিন্তু পরিণামে মহৎ দুঃখের অভিজ্ঞতায় মনুষ্যত্বকেই জাগ্রত করিবে।

বস্তুত দুঃখমাত্রই জীবনের গভীরতার পরিচায়ক নয়, যদি সেই দুঃখ কোনো গভীর ত্যাগ, সহিষ্ণুতা বা আকস্মিক সর্বনাশ হইতে সৃষ্ট না হয়। হাসি ও অশ্রু কবিতায় ইহাই কবির অভীষ্ট। হাস্যরসের চর্চায় যে মহৎ সাহিত্য রচিত হয় না, ইহা বিশ্বের সকল সমালোচকই স্বীকার করিয়াছেন। কবিও অনুভব করিয়াছেন, রসিকতার মধ্যে জীবনের গভীরতা নাই। কিন্তু দুঃখের সহিত সহমর্মিতায়, মহত্ত্বের দুঃখভোগে যে সমবেদনা তাহাই তাঁহার বরণীয়। এই দুঃখ অন্তরে একটি মনুষ্যত্ববোধ জাগাইয়া তোলে। ইহাই হাসি ও অশ্রু কবিতায় কবির অশ্রু-কাতরতার সাহিত্যিক সার্থকতা।

চেরি-পুষ্প : প্রমথ চৌধুরী

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী

"প্রমথ চৌধুরীর কবিতায় ব্যঙ্গাত্মক মনোভাবেরই প্রাধান্য—তিনি আবেগ ও ভাবালুতার চির-বিরোধী ও তীক্ষ্ণ মননশীল শ্লেষের কশাঘাতে বাঙলা কাব্যে প্রচলিত রসার্দ্রতার উপহাস্য দিকটারই উদ্‌ঘাটন-প্রয়াসী। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পর্ক, এমন কি সাহিত্যিক সহযোগিতা যতই ঘনিষ্ঠ হউক, রুচি ও কল্পনার দিক দিয়া উভয়ের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান থাকাই স্বাভাবিক তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রমথ চৌধুরী বিশেষ গীতিকবিতা লেখেন নাই, তিনি সনেট-রচয়িতা হিসাবেই বাঙলা কাব্যে স্থান পাইয়াছেন।

সনেটকার

সনেট এক ব্যঙ্গকবিতা ছাড়া অন্যান্য জাতীয় কবিতার মধ্যে সর্বাপেক্ষা মননধর্মী; ইহার আঁটসাঁট গড়ন, উচ্ছ্বাসাধিক্যের বলিষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ ও স্বল্পপরিসরে ভাব-পরিণতির সম্পাদন সমস্তই সদা-সক্রিয় মননশীলতার মুদ্রাঙ্কিত। প্রমথ চৌধুরী আমাদের

কবিতার বৈশিষ্ট্য

মুগ্ধ বা ভাববিহ্বল করিতে চাহেন না, করিতে চাহেন তীক্ষ্ণ ভাষণে ও অপ্রত্যাশিত ভাবসন্নিবেশে চমকিত। তাঁহার মনোঘুড়ি কবি-কল্পনার লাটাইয়ে' দৃঢ়বদ্ধ থাকিয়া কবির হস্তধৃত সূত্রের

আকর্ষণে উচ্চতর ভাবাকাশে স্বচ্ছন্দ বিচরণের স্বাধীনতা হইতে প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে ও কল্পনার অতিরিক্ত আবেশে বুঁদ হইবার কোন সুযোগ পায় নাই। সুতরাং তাঁহার 'সনেট-পঞ্চাশৎ' রবীন্দ্র-কল্পলোক হইতে স্বতন্ত্র ও উহারই পরিপূরক এক নূতন মনোরাজ্যের সন্ধান দেয়। বরং ভাবের দিক দিয়া রবীন্দ্র-বিরোধী ও কাব্যে অস্পষ্টতার প্রতিবাদকারী দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে তাঁহার খানিকটা মিল আছে, যদিও দ্বিজেন্দ্রলালের লঘু হাস্যচপলতার সহিত তুলনায় তাঁহার পরিহাসের মধ্যে গভীরতর মননিষ্ঠতা ও দৃষ্টিভঙ্গির একটা বৈপরীত্যমূলক মৌলিকতার ছাপ পরিস্ফুট।" (ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

মননিষ্ঠ পরিহাস

ভাবার্থ

গোলাপী উষার মৃদু বর্ণ অপহরণ করিয়া লজ্জা-রক্তমুখী অসংখ্য চেরিপুষ্প বসন্ত আগমনের বহুপূর্বেই তুষারমণ্ডিত পর্বতের সানুদেশে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। নিষ্পত্র শাখাগুলি কুঙ্কুমবর্ষণে পূর্ণ হইয়াছে। ফুলের ভাষার অর্থ কবি জানেন, এই চেরিফুলগুলি বসন্তের আগমনী ঘোষণা করিতেছে। কঠিন শুভ্র তুষারের গাত্রে যেন চেরিপুষ্পের অনুরাগদীপ্তি পড়িয়াছে। তাহার পূর্বরাগানুরঞ্জিত করপল্লবের ছোঁওয়ায় বসন্তের স্মৃতি উদ্দীপিত হইয়াছে। পর্বতের পটে চেরিপুষ্প দেখিয়া মনে হইতেছে উহা যেন শিবদর্শনের পর উমার প্রসন্ন রক্তাভ বদন।

বস্তু-বিশ্লেষণ

আলোচনা

তির্যক শ্লেষ-কটাক্ষ, অম্লাক্ত মন্তব্য, যুক্তিমূলক মনোভাব প্রমথ চৌধুরীর কবিতায় একটি নূতন স্বাদ দান করিয়াছে। প্রচলিত অর্থে যাহাকে কবি বলে, প্রমথ চৌধুরী সে জাতের কবি ছিলেন না। ভাবালুতা, উচ্ছ্বাস, অতীন্দ্রিয় কল্পনা, পেলবতা এইগুলিকে তিনি যথাসম্ভব পরিহার করিয়া চলিয়াছেন। একটি মননশীল জীবনদৃষ্টি, ইন্দ্রিয়গম্য বস্তুবিচার, চতুর বাক্‌পটুতা, নিপুণ শব্দচয়ন, সংযত ও পরিমিত স্তবক রচনায় তাঁহার কবিতা তাঁহার চিন্তাশীল বিতর্কমূলক গদ্যরচনারই নামান্তর। সনেট রচনায় প্রমথ চৌধুরীর দক্ষতা সর্বাধিক প্রকাশ পাইয়াছে। ফরাসী সনেটের কলাকৃতি তিনি অনুসরণ

করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও অষ্টক ও ষট্‌কবন্ধ রচনায়, ফরাসী রীতি অপেক্ষা অধিকাংশ সনেটে তাঁহার নিজস্ব একটি রীতি প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার অধিকাংশ সনেটে অষ্টকের পর দুই চরণের একটি মিত্রাক্ষর-যুগলে সনেটের মূল ভাবটি ঘনীভূত আকারে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার পর একটি চতুষ্ক anti-climax-এর সৃষ্টি করিয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, মাধুকরী সংকলনে ধৃত তাজমহল সনেটটি উল্লেখযোগ্য। তবে আলোচ্য চেরি-পুষ্প কবিতাটি সে-জাতীয় উদাহরণ নয়। ইহা ফরাসী সনেটের আঙ্গিকেই রচিত (সনেট-সম্পর্কে আলোচনা মধুসূদনের মিত্রাক্ষর কবিতা-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য)।

প্রমথ চৌধুরী রোমান্টিক কবি ছিলেন না। তাই সৌন্দর্য-প্রেম-প্রকৃতি তাঁহার কবিতার উপকরণ হয় নাই। এক অর্থে তাঁহার কবিতা জীবন-সমালোচনাই। কিন্তু আলোচ্য চেরি-পুষ্প কবিতায় প্রকৃতির সৌন্দর্য-প্রতীক পুষ্প কবির মুগ্ধ দৃষ্টি হরণ করিয়াছে। অবশ্য ফুলকে কবি ফুলের স্বভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাকে কোন সূক্ষ্মতর তত্ত্বের বা লাবণ্যের অথবা কোনো মানবীয় গুণের প্রতীকরূপে দেখেন নাই। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয়, চেরি-পুষ্প বাঙলার পরিচিত নিত্যদৃষ্ট ফুল নয়, ইহা পার্বত্যপুষ্প। সুতরাং সুদূর পার্বত্য প্রকৃতির সৌন্দর্যবিলাসের কাব্যরূপায়ণে প্রমথ চৌধুরীর গোষ্ঠী-বিচ্যুত গর্বিত স্বাতন্ত্র্যেরই প্রকাশ ঘটিয়াছে। তবে কবিতাটির সৌন্দর্য পার্বত্যফুলের বর্ণনামাত্রে নয়। তুষারাচ্ছন্ন পর্বতগাত্রের প্রস্ফুটিত চেরি-ফুলকে তিনি পার্বতীর লজ্জারক্ত মুখের সহিত উপমিত করিয়াছেন, ইহাতেই কবিতাটির মনোহারিতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ

বসন্তের আগমনে আজো আছে দেরি—অর্থাৎ এখনো শীতের অবসান হয় নাই। এখনও বৃক্ষগুলি পত্রহীন রিক্তশাখা, এখনও পর্বত শুভ্র তুষারে সমাচ্ছাদিত। **পর্বতের তুষার**—শীতের অস্তিত্ব পর্বতের তুষারাবরণে। শুভ্র হিমপ্রবাহ পাহাড়ের গাত্রে জমিয়া আছে। কবিতার ভৌগোলিক পরিবেশ স্পষ্টতই অবঙ্গীয়। **চুরি ক'রে…চেরি**—চেরি ফুলের বর্ণ গোলাপী ; কবি কল্পনা করিতেছেন, ইহা যেন লজ্জার রক্তিমাভা। চেরি ফুলগুলি যেন প্রভাতী উষার হালকা গোলাপী বর্ণ চুরি করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাই

তাহাদের অজস্র প্রস্ফুটিত বিকাশেও এই বর্ণচৌর্যের লজ্জা ঢাকা পড়ে নাই। **চেরি** ফল ও ফুলের জন্য বিখ্যাত এক প্রকার পার্বত্য বৃক্ষ, ইহাদের বিভিন্ন জাতি। ["Of all the fruit-producing members of the rose-family (Rosaceae), the cherry-tree is most beautiful. There are three wild kinds in Great Britain. In April its young pinkish-brown leaves are almost hidden by clusters of rather frail white flowers, but when the petals have fallen the leaves enlarge and become green. Other kinds of cherry grow wild in Europe, Asia, and North America, and most of the decorative garden varieties come from Japan or China, where they have cultivated for hundreds of years."] **পত্রহীন · আসার**—অসংখ্য চেরিপুষ্প বৃক্ষের শাখা পূর্ণ করিয়া ফুটিয়াছে ; যে শাখাগুলিতে পত্র জন্মায় নাই, সেই শাখাগুলি ফুলের পরাগ-রেণু বর্ষণে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। **আসার**—বর্ষণ, বৃষ্টি। **সে জানে·· ভাষার**—ফুলের একটি নিজস্ব ভাষা আছে। তাহার বর্ণে-সুগন্ধে পরাগে-লাবণ্যে একটা কিছু বাণী প্রকাশ করে, কিন্তু সকলে তাহা অনুধাবন করিতে পারে না। ফুলের নিজস্ব ভাষার মর্মভেদ করা তাহার পক্ষেই সম্ভব, যে ফুলের বর্ণগন্ধ-পরাগ-লাবণ্যের সহিত হৃদয়সম্পর্কে যুক্ত, যাহার হৃদয়ে সৌন্দর্যের আবেদন পৌঁছায়। কবি বলিতে চান, এই চেরি-ফুলগুলির নিজস্ব সাংকেতিক ভাষার অর্থ গ্রহণের ক্ষমতা তাঁহার আছে। **বসন্তের···রুদ্রভেরি**—চেরি কেবল ফুল নয়, সে যেন মণিমাণিক্যের ভেরি বাজাইয়া বসন্তের আসন্ন আবির্ভাব নীরব বাক্যে ঘোষণা করিতেছে। এখনও:শীতের অবসান ঘটে নাই, কিন্তু বিকাশমান চেরিগুলিই যেন বলিতেছে, Can spring be far behind ?

মর্মর-কঠিন·· আলোক—কঠিন পর্বতের অঙ্গে শুভ্র তুষারের আবরণ, তাহার পটভূমিকায় সানুদেশের বনান্তরালে শত শত চেরি ফুটিয়াছে, ইহা অপরূপ দৃশ্য। যেন এই সকল নারীরূপিণী ফুলগুলির অনিন্দ্য যৌবনের রূপ-মাধুরীর আলোকচ্ছটা পাহাড়ের তুষার-শুভ্রতাকে রাঙাইয়া দিয়াছে। **পূর্বরাগে·· জাগায়ে**—যাহার সহিত এখনও চক্ষের সাক্ষাৎ হয় নাই, তাহার নামশ্রবণে বা চিত্রদর্শনে সঞ্জাত অনুরাগকেই বলে পূর্বরাগ। ফুলের বুকের

শিশিরে বসন্তের স্মৃতি উদ্দীপ্ত হইয়াছে বলিয়া পর্বতের সহিত চেরিফুলের সম্পর্ক পূর্বরাগের। চেরিফুলগুলি তাহাদের অনুরাগের ছোঁওয়ায় পর্বতকে বিচলিত করিয়াছে। **রক্তিম ··শিব-দরশনে**—শুভ্র পর্বতগাত্রে লজ্জাভ চেরি-ফুলগুলির মধ্যে প্রেমের ইঙ্গিত আবিষ্কার করার পর কবি বলিতেছেন, পর্বতরূপী হিমালয়কে চেরিপুষ্পস্বরূপ উমা দর্শন করিল, মহাদেব-দর্শনে পার্বতীর মুখে লজ্জার রক্তরাগ ছড়াইয়া পড়িল। সেই আভায় বিশ্ব রাঙাইয়া চেরিফুল শিব-সন্দর্শন-ভৃপ্ত লজ্জারুণা পার্বতীর মত পর্বতগাত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ব্যাখ্যা

চুরি করে ·ঝাঁকে ঝাঁকে চেরি।

আলোচ্য পংক্তিচয় প্রমথ চৌধুরীর সনেট চেরি-পুষ্প হইতে উদ্ধৃত। এখানে কবি বসন্তের পূর্বেই তুষারমণ্ডিত পর্বতপ্রান্তে পুষ্পিত চেরিফুলের বর্ণসমারোহের প্রশস্তি করিয়াছেন। মৃদু রক্তাভ বর্ণের এই সুগন্ধযুক্ত ফুলগুলির দিকে তাকাইয়া কবির মনে হইতেছে যে ইহারা যেন ভোরের গোলাপী রঙ চুরি করিয়া লইয়াছে। অন্ধকার-বিদীর্ণ প্রভাতের প্রথম আলোকাভাসের ন্যায় চেরিফুলগুলির রঙ দেখিয়া অন্তত তাহাই মনে হয়। ইহাদের এই চৌর্যপ্রবৃত্তির জন্যই যেন ফুলগুলি লজ্জায় রাঙা হইয়া আছে। পর্বতের সানুদেশে অবস্থিত অসংখ্য অগণ্য চেরিফুল কবির সৌন্দর্যমুগ্ধ দৃষ্টিতে চপল বর্ণচোরার ন্যায় প্রতিভাত হইয়াছে।

রক্তিম আভায় ····শিব-দরশনে।

প্রসঙ্গসূত্র পূর্ববৎ।

প্রভাতী উষার মৃদু গোলাপী বর্ণের সহিত তুলনীয় চেরিফুলগুলি তুষার-মণ্ডিত পর্বতের প্রান্তদেশে অসংখ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহাদের রক্তাভ দ্যুতি পশ্চাতের শুভ্র পর্বতগাত্রে প্রতিফলিত হইতেছে। পশ্চাতে হিমবান্ পর্বত আর সম্মুখের লজ্জারক্তরাগসম দোদুল্যমান চেরিফুলগুলি দেখিয়া স্বভাবতই কবির মনে পার্বতী-পরমেশ্বরের প্রেমের রূপকল্পনার স্মৃতি উদ্দীপ্ত হইয়াছে। ঐ তুষারাবৃত পর্বত যেন ধ্যানস্তব্ধ মহাদেব। আর চেরিফুলগুলি তাহাদের রূপের কমনীয়তায় সৌন্দর্যে যথার্থই গিরিসুতা পার্বতীর সহিত তুলনীয়।

যখনই ফুলগুলি নয়ন উন্মীলন করিল, তখনই দেখিল ঐ শুভ্র পর্বতকে। মহাদেবের সহিত দৃষ্টিমিলনে যেন পার্বতীর মুখ লজ্জায় পুলকে আভাময় হইয়া উঠিল ; সেই লজ্জা ও যৌবনাভাই চেরিফুলের গোলাপী রঙ হইয়া সমগ্র সৌন্দর্যমুগ্ধ বিশ্বকে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে।

প্রশ্ন ১। প্রমথ চৌধুরীর কবি-প্রকৃতির পরিচয় দিয়া চেরি-পুষ্প কবিতাটির একটি রসগ্রাহী সমালোচনা লিখ। [ভূমিকা ও আলোচনা দ্রষ্টব্য]

জ্ঞান ও ভক্তি : ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী

ভূমিকা

রবীন্দ্রোত্তর বাঙলা গীতিকবিতার ইতিহাসে ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরীর নাম অনুল্লেখযোগ্য, মুষ্টিমেয় কবিতা লিখিয়া তিনি প্রায় বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। বিশ শতকের গোড়ার দিকে ভুজঙ্গধর ছিলেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি পরিচালিত সাহিত্য মাসিক পত্রগোষ্ঠীর তরুণ উদ্যমী লেখক।

কবিপরিচয়

কবিশেখর কালিদাস রায় মাধুকরীর ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "ভুজঙ্গধর তত্ত্বমূলক ও আধ্যাত্মিক কবিতার লেখক, ইঁহার রচনায় ছন্দোবৈচিত্র্য লক্ষণীয়। দেশবন্ধু ইঁহার ভক্তিরসাত্মক কবিতার পরম ভক্ত ছিলেন। দার্শনিকতাকে ইনি রসে পরিণত করিয়াছেন"।

ভুজঙ্গধর রবীন্দ্রকাব্যের অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার কবিতাপুস্তকের নাম শিশির, ছায়াপথ ও রাকা।

ভাবার্থ

ঈশ্বরের স্বরূপ, সংসার ও জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানবাদী ও ভক্তিবাদী যেন দুই বিপরীত মার্গের পথিক। জ্ঞানবাদীর নিকট দেহ নশ্বর, কিন্তু ভক্তিবাদী মনে করেন মনুষ্যদেহ ঈশ্বরের অধিষ্ঠান স্থল। জ্ঞানীর নিকট ব্রহ্ম সত্য বলিয়া সংসার মায়ামাত্র, কিন্তু ভক্ত এই স্নেহ-প্রেমময় সংসারকে তাঁহার লীলা বলিয়া জানেন। জ্ঞানী কর্মনাশের

বস্তুবিশ্লেষণ

পক্ষে, ভক্ত সকল কর্ম কৃষ্ণে অর্পণ করেন। জ্ঞানবাদ তপশ্চর্যার প্রচারী, ভক্তিবাদ প্রেমের পক্ষে। ব্রহ্মের সহিত জীবের অদ্বৈতই জ্ঞানীর ঘোষণা, কিন্তু ভক্ত আপনাকে ঈশ্বরের দাসানুদাস মনে করেন, তিনি অদ্বৈতবাদী নন। জ্ঞানবাদ আত্মার আনন্দকেই চরম মনে করে, কিন্তু ভক্তিবাদ পতিরূপী কৃষ্ণের তৃপ্তিবিধানকেই জীবের সার্থকতা বলিয়া বিশ্বাস করে। জ্ঞান ও ভক্তির এই বিরোধে কবি আপনাকে জ্ঞান অথবা ভক্তি উভয় ধর্ম-বঞ্চিত এবং বিচার-বুদ্ধিহীন বলিয়া ঈশ্বরের নিকট দীনভাবে পথ-সংকেতের মিনতি জানাইয়াছেন।

আলোচনা

কবিতা হিসাবে জ্ঞান ও ভক্তি উচ্চাঙ্গের কবিতা নয়, ইহা তত্ত্ব কথা মাত্র। মাধুকরী-সংকলনে ধৃত পূর্ববর্তী শুক-সারী সংবাদ কবিতার সহিত ইহা তুলনীয়। কিন্তু শুক-সারী সংবাদে গোবিন্দ অধিকারী শুক-সারীর তাত্ত্বিক বিতর্কের অন্তরালে সারীর মুখে শ্রীরাধিকার শ্রেষ্ঠত্ব যে-ভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহাতেই উহা একটি অভূতপূর্ব কাব্যসৌন্দর্য লাভ করিয়াছে। ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরীর কবিতায় সেই বৈচিত্র্য নাই। ইহা নিতান্ত নিরাসক্ত কণ্ঠে সাধনার ভিন্নপন্থা-ঘোষণা মাত্র, শেষ পর্যন্ত কবি কোনো অভিনব মন্তব্যে কোনও একটির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেন নাই। আপনাকে অন্ধ এবং জ্ঞানহীন ভক্তিহীন বলায় জ্ঞান অথবা ভক্তি কোনো একটির প্রতি কবির প্রচ্ছন্ন আকর্ষণও অস্ফুটভাবে আভাসিত হয় নাই। সকল পন্থা-পদ্ধতির ঊর্ধ্বে কবির নিবিড় ঈশ্বর চেতনা প্রকাশ করাই কবির উদ্দেশ্য। মোটের উপর সে উদ্দেশ্য সার্থক হয় নাই।

কবিতা হিসাবে বিচার

জ্ঞান ও ভক্তি সাধনার দুইপথ। বহির্জগৎসম্বন্ধীয় বিচার শক্তিকেই জ্ঞান বলা যায়। ইহাও ঈশ্বর-স্বরূপ-লাভের অন্যতম পন্থা বলিয়া ধর্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কেনোপনিষদে আছে,

জ্ঞান ও ভক্তি-সাধনার পন্থা আলোচনা

প্রতিবোধ বিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে
আত্মনা বিন্দতে বীর্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্‌ ॥

অর্থাৎ 'বুদ্ধিবৃত্তিসমূহের আত্মারূপে ব্রহ্ম বিদিত হইলে প্রকৃত জ্ঞান ও অমৃতত্ব

লাভ হয়। আত্মজ্ঞানের দ্বারাও অমৃত লাভের যোগ্যতা ঘটে, বিদ্যার দ্বারাও ও অমৃতত্ব লাভ হয়'। কিন্তু ভক্তিতে কোনো পরিপ্রশ্ন বিচারবোধ বা তত্ত্বজ্ঞান নাই, ইহা পরিপূর্ণ বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন একটি বোধ। নামশ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পদসেবা, পূজা, স্তব, পরিচর্যা, সখ্যসম্ভাষিণ ও আত্মসমর্পণ এইগুলিকেই ভক্তি বলা যায়।

উপনিষদ কাহিনীতে ঋষিপুত্র সনৎকুমার ছিলেন এই জ্ঞানমার্গের প্রতীক। তিনি বুঝিযাছিলেন সংসারসমুদ্র অতিক্রমের জন্য চাই ব্রহ্মজ্ঞানের তরণী ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ—ভূমাই জিজ্ঞাস্য। আবার এই জিজ্ঞাসার চরিতার্থতার জন্য যে সাধন তাহাই কর্ম জ্ঞান ও ভক্তি নামে প্রথিত হইয়াছে। জ্ঞান ও ভক্তিহীন কর্মের দ্বারা এই ভূমাকে পাওয়া যায় না। জ্ঞান ও ভক্তি মিলিতভাবে বা স্বতন্ত্রভাবে ভূমাকে পাইবার সাধন। বৈষ্ণবধারা এই দুই পন্থার মিলন-সেতু ইহাও অনেকে বলিয়া থাকেন। জ্ঞানবাদীরা বলেন, জীবের সহিত ব্রহ্মের আত্যন্তিক অভেদই হইল ব্রহ্মের স্বরূপ। ভক্তিবাদীদের মতে, জীবের সহিত ব্রহ্মের আত্যন্তিক ভেদই ইহার অর্থ। "জ্ঞান না হইলে কোনো বিষয়ের উপর রাগ হয় না, দ্বেষ হয় না, উপেক্ষা হয় না। রাগ দ্বেষ বা উপেক্ষা এই ত্রিবিধ মনোবৃত্তি জ্ঞানেরই পরিণতি। প্রমাণের সাহায্যে প্রমেয় বস্তুর স্ফুরণই জ্ঞান। এই জ্ঞান হইবার পর তাহার ফলস্বরূপ আমাদের যত প্রকার জ্ঞানভিন্ন মনোবৃত্তি হইয়া থাকে, সেইগুলিই ভাব। জ্ঞানপ্রবণ প্রবৃত্তির প্রাবল্য ঘটিলে সংসারকে তুচ্ছ বোধ হয় এবং একমাত্র পরমার্থ-সদ্‌বস্তু যে জ্ঞান বা প্রকাশ, তাহাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া থাকে।" কিন্তু এই জ্ঞানবাদের পর আসিল ভক্তিবাদের যুগ, যাহার সার কথা, "সকল সুন্দরের সুন্দর, সকল মাধুর্যের সার, সকল মনোহরের মনোহর, সর্বলাবণ্যের পার, আত্মার আত্মা, প্রাণের প্রাণ ও জীবনের জীবন সেই উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ভূমাকে বুঝিয়া শুনিয়া মনন করিয়া দেখিয়া এবং তাহাতেই মজিয়া তাহাতেই সর্বস্ব বিলাইয়া দিয়া তাহারই জন্য বাঁচিয়া থাকার নামই ভক্তি, তাহারই নাম প্রেম"।

ভূমাকে পাইবার সাধন

অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদ

ভক্তিবাদের জন্ম জ্ঞানবাদের পর

(বাঙলার বৈষ্ণবধর্ম, প্রমথনাথ তর্কভূষণ)

গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে নিষ্কাম কর্মযোগ, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভক্তিযোগ এবং শেষ ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ প্রদর্শিত। ভক্তিযোগ অতিশয় গূঢ় এবং কর্ম ও জ্ঞানের মূল কারণস্বরূপ। ভক্তিরহিত কর্ম ও জ্ঞান উভয়ই বৃথা। এইজন্য সাধকগণ কর্ম ও জ্ঞান উভয়কেই ভক্তি মিশ্রিত করিয়া সাধন করিতে বিধি প্রদান করিয়াছেন (দ্র স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, গীতার ভূমিকা)। গীতার জ্ঞানযোগ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,

গীতায় জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়

বীতরাগভয়ক্রোধাঃ মন্ময়াঃ মামুপাশ্রিতাঃ
বহবো জ্ঞানতপসা পূতাঃ মদ্ভাবমাগতাঃ ॥

অর্থাৎ 'আসক্তিরহিত ভয়শূন্য ও ক্রোধবর্জিত মদ্‌গতচিত্ত ও আমরাই শরণাগত অর্থাৎ কেবল জ্ঞাননিষ্ঠ বহু ব্যক্তি জ্ঞানরূপ তপস্যাদ্বারা পরাশুদ্ধি লাভ করিয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন'। অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, সংসার-ফলারম্ভক দ্রব্যসাধ্য যজ্ঞ অপেক্ষা মোক্ষদায়ক জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। ৭ম অধ্যায়ে তিনি পুনরায় বলিয়াছেন, আর্তিযুক্ত, তত্ত্বজিজ্ঞাসু অর্থকামী এবং জ্ঞানী এই চতুর্বিধ ভক্তের মধ্যে নিত্যযুক্ত একনিষ্ঠ জ্ঞানীই ঈশ্বরের প্রিয়।

প্রেমরসাস্পদ ভক্তির প্রচারক ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। শিক্ষাষ্টক শ্লোকে তাঁহার বিখ্যাত উক্তি,

ভক্তিবাদী শ্রীচৈতন্য

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

—'হে জগদীশ, আমি ধন জন যুবতী বা কাব্যামৃত অভিলাষ করি না, কেবল জন্মে জন্মে যেন তোমার প্রতি অহৈতুকী ভক্তি থাকে এই আমার প্রার্থনা'। এই শ্লোকের উল্লেখ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন,

"যখন এই অবস্থা লাভ হয়, যখন মানুষ সর্বভূতে ঈশ্বর এবং ঈশ্বরে সর্বভূতকে দর্শন করে, তখনই সে পূর্ণ ভক্তি লাভ করে, তখনই সে আব্রহ্মস্তম্ভ পর্যন্ত সবভূতেই বিষ্ণুকে অবতীর্ণ দেখিতে পায়, তখনই সে প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারে ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই নাই, তখন—কেবল তখনই সে নিজেকে দীনের দীন জানিয়া প্রকৃত ভক্তের দৃষ্টিতে ভগবানকে উপাসনা করে। তখন

ভক্তিবাদের সমর্থনে বিবেকানন্দ

তাহার আর বাহ্য অনুষ্ঠান এবং তীর্থভ্রমণাদির প্রবৃত্তি থাকে না। সে প্রত্যেক মানুষকেই যথার্থ দেবমন্দির বলিয়া মনে করে"।

ইহাই ভক্তির চরম অবস্থা। জ্ঞান ও ভক্তি কবিতায় প্রকারান্তরে এই ভক্তির প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ

জ্ঞান—যাহার দ্বারা জানা যায় তাহাই জ্ঞান। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বহির্জগৎ সম্বন্ধে যে বিচারশক্তির অধিকার লাভ হয়, তাহাই জ্ঞান। **জ্ঞান বলে**··· **নশ্বর**—পঞ্চভূতাত্মক এই দেহ মৃত্যুর পর পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া যায়, দেহের অবসানে ইহার আর কোনো অস্তিত্ব থাকে না। সুতরাং জ্ঞানবাদীর মতে, দেহ নশ্বর ক্ষয়পরায়ণ মৃত্যুশীল। **ভক্তি**—"ভগবানকে পাইবার ইচ্ছা, ভগবানের আনুকূল্য লাভ করিবার অভিলাষ ও তাঁহার প্রতি সখ্যভাবের দ্বারা মনে যে স্নিগ্ধতা আসে তাহার নাম ভক্তি। ইহা শুদ্ধসত্ত্বরূপ, প্রেমরূপ এবং সূর্য-রশ্মি-তুল্য" (সীতাপতি বাচস্পতি সম্পাদিত চৈতন্য-চরিতামৃত, পৃঃ ৫৮)। ধ্বন্যালোকে আনন্দবর্ধনের একটি শ্লোকে এই ভক্তির কথা চমৎকার করিয়া বলা হইয়াছে,

> যা ব্যাপারবতী রসান্ রসয়িতুং দৃষ্টিঃ কবীনাং নবা
> দৃষ্টির্যা পরমার্থবস্তুবিষয়োন্মেষা চ বৈপশ্চিতী।
> তে দ্বে অপ্যবলম্ব্য বিশ্বমখিলং নির্বর্ণয়ন্তো বয়ম্
> শ্রান্তা নৈব তু লব্ধমব্ধিশয়নত্বদ্‌ভক্তিতুল্যং সুখম্॥

—"নয় প্রকার রসের আস্বাদন করিবার ও করাইবার জন্য ব্যাপৃত যে নূতন কবিদৃষ্টি এবং পরমার্থবস্তু প্রকাশন যে বৈপশ্চিতী বা দার্শনিক দৃষ্টি, এই দুইটি দৃষ্টিরই সাহায্যে আমরা অখিল বিশ্বকে বুঝিয়াছি এবং বুঝিয়া তাহার স্বরূপ কী তাহার বর্ণনাও করিয়াছি; অবশেষে এইরূপে আজীবন বিশ্বদর্শন ও বিশ্ববর্ণন করিতে করিতে আমরা শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি, কিন্তু হে জলধিশয়িন্ ভগবান্, তোমাকে ভালবাসারূপ যে ভক্তি তাহার ন্যায় সুখ এখনো আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই"। **ভক্তি বলে**···**ভিতর**—জ্ঞানবাদী দেহের নশ্বরত্বের কথা বলেন, কিন্তু ভক্তিবাদীর মতে দেহ অবিনশ্বর; তাহার বিনাশ নাই। দেহ দেবতারই অবস্থান-ভূমি, ঈশ্বর দেহের মধ্যেই বর্তমান আছেন।

বাউল প্রমুখ ভক্তিতত্ত্বে দেহকেই সর্বস্ব বলা হইয়াছে। বস্তুত কিছুই অনিত্য নয়, ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—'ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু অনিত্য বস্তু আছে, এই সমস্তই পরমেশ্বরের দ্বারা আবরণীয়' ইহা উপনিষদেরই বাণী। **জ্ঞান বলে···পরিবার**—শংকরবাদী দার্শনিকগণ মনে করেন, ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈবনাপর:—জীব অজ্ঞানতা ও মায়াবশত সাংসারিক ভ্রান্তিতে মজিয়া আছে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ—কেই বা তোমার স্ত্রী কেই বা পুত্র, সকলই অধ্যাস বা ভ্রান্তি, নলিনীদলগতজল-মতিতরলম্—পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় সবই অনিত্য। **ভক্তি বলে···লীলা তার**—কিন্তু জ্ঞানবাদীগণের অদ্বৈতবাদ পরবর্তী দার্শনিকগণ স্বীকার করেন নাই। তাহারা মনে করিয়াছেন, ব্রহ্মও সত্য জগৎও সত্য। এই সংসার ঈশ্বরেরই লীলা। শংকর-পরবর্তী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ বলিয়াছেন, ব্রহ্মসত্য কিন্তু তিনি নির্গুণ নন। ববং অশেষ কল্যাণগুণের আধার। জীব ও জগৎ তাঁহা হইতে পৃথক্ সত্তা নয়, তাঁহারই গুণ। রামানুজ তাই জ্ঞানের দ্বারা মুক্তিতে বিশ্বাস করেন নাই, তাঁহার মতে জ্ঞানের পরিসমাপ্তি ভক্তিতে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মনে করেন, জীবজগৎ কৃষ্ণের লীলা-মাধুরীর প্রকাশ, লীলা-বশতই ব্রহ্ম নবরূপ ধারণ করেন। জগৎসৃষ্টি দ্বারা ব্রহ্ম কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে চান নাই, উহা তাহার লীলা মাত্র। বৃন্দাবনলীলা রাসলীলা প্রভৃতি শব্দ বৈষ্ণবধর্মে সুপরিচিত। রবীন্দ্রনাথও জগৎ ব্যাপারকে ঈশ্বরের লীলা মনে করিতেন,

কত বর্ণে কত গন্ধে কত গানে কত ছন্দে
অরূপ তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর।

অথবা, ওগো আমার ওগো সবার,
বিশ্ব হতে চিত্তে বিহার—
অন্তবিহীন লীলা তোমার নূতন নূতন হে ॥

এই সংসার মিথ্যা তো নয়ই, পরন্তু স্নেহ-প্রেম হাসিকান্না এইগুলি যে ঈশ্বরেরই নিত্য-অপরিবর্তনীয় লীলা, এই বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বহুবার প্রকাশ পাইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ চৈতালি কাব্যের নিম্নোক্ত কবিতাটি—

কহিল গভীর রাত্রে সংসারে বিরাগী—
"গৃহ তেয়াগিব আজি ইষ্টদেব লাগি।

কে আমারে ভুলাইয়া রেখেছে এখানে" ?
দেবতা কহিল, "আমি"। শুনিল না কানে।
সুপ্তিমগ্ন শিশুটিরে আঁকড়িয়া বুকে
প্রেয়সী শয্যার প্রান্তে ঘুমাইছে সুখে।
কহিল, "কে তোরা ওরে মায়ার ছলনা" ?
দেবতা কহিল, "আমি"—কেহ শুনিল না।
ডাকিল শয়ন ছাড়ি, "তুমি কোথা প্রভু"।
দেবতা কহিল, "হেথা"—শুনিল না তবু।
স্বপনে কাঁদিল শিশু জননীরে টানি,
দেবতা কহিল—"ফির"। শুনিল না বাণী।
দেবতা নিশ্বাস ছাড়ি কহিলেন, "হায়
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়" ?

জ্ঞান বলে···কর নাশ—জ্ঞানবাদীগণ মনে করেন মানুষের সকল কার্য আচার অবস্থা ও অবস্থান তাহার প্রাক্তন কর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মানুষের দুঃখ লাঞ্ছনা নির্যাতন প্রভৃতির মূল আছে তাহার কর্মে, সুতরাং ইহা নাশ করিতে পারিলেই দুঃখ হইতে নিবৃত্তি পাওয়া যায়। কর্মবাদ ভারতীয় দর্শনের একটি পুরাতন তত্ত্ব। নাস্তিক অথবা আস্তিক উভয় দর্শনেই কর্মবাদ আছে। বৌদ্ধদর্শনে কর্মবাদের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। "দুঃখের কারণ খুঁজিতে গিয়া বৌদ্ধদর্শন বৌদ্ধধর্মের প্রধান স্বীকৃতি কর্মবাদকেই সমর্থন করিয়াছে। মানুষের কৃতকর্ম একটা জাগতিক ব্যাপার, অন্যান্য জাগতিক ব্যাপারের ন্যায় ইহারও উৎপত্তি হয়, ইহারও ফল বা কার্য আছে, আর সেই কার্য উৎপন্ন হইবার পর ইহারও বিলয় হয়। কর্ম হইতে সৃষ্ট হয় বন্ধ—বন্ধ হইতে হয় দুঃখ। এই বন্ধ হয় কার ? আমরা সাধারণভাবে বলি আত্মার।··· কিন্তু বৌদ্ধদের মতে স্থির দেহাতিরিক্ত কোনো আত্মা নাই। যাহাকে আমরা আত্মা বলি তাহাও একটা প্রবাহ মাত্র; অনুভূতির পর অনুভূতি, সুখের পর দুঃখ, বাসনার পর বাসনা—এইভাবে চলিতেছে একটা প্রবাহ। যাহারা নিষ্কৃতি চায় তাহাদের কর্তব্য এই স্রোত রোধ করা। বাসনাকে নির্মূল করিতে পারিলেই এই প্রবাহ থামিয়া যায়। ইহার জন্য প্রয়োজন সম্যক্ জ্ঞান" (ভারত দর্শনসার—উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য)। **ভক্তি বলে···নহে**

পাশ—শ্রীমদ্‌ভাগবত গীতায় বলা হইয়াছে, নিরাসক্ত চিত্তে নিষ্কামভাবে কর্মপালন কর, সকল কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ কর। এইভাবে কৃষ্ণে সমর্পিত কর্ম আর বন্ধন হইবে না, তাহা মুক্তির দিশারী হইবে। গীতায় কৃষ্ণ বলিয়াছেন, বেদের কর্মকাণ্ড কামনামূলক, তাহার দ্বারা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি স্থির হয় না। সুতরাং হে অর্জুন,

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥
যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥

—'কেবল কর্মে তোমার অধিকার আছে, কখনই কর্মফলে নয়। কর্মফলের কারণ হইও না, সমভাবে থাকিয়া সকল কর্ম কর, কর্মত্যাগে তোমার যেন প্রবৃত্তি না হয়। হে ধনঞ্জয়, যোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসক্তি ত্যাগ করিয়া সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাবে থাকিয়া সকল কর্ম কর। ফলাফলে চিত্তের সমত্বই যোগ'। **জ্ঞান বলে · মন**—জ্ঞানবাদীগণ ব্রহ্মতত্ত্ব লাভের জন্য ধ্যান সমাধি ও উপাসনার বিধান দিয়াছেন। "শব্দাদি বিষয় হইতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়কে পৃথক্ করিয়া মনোমধ্যে উপসংহার পূর্বক এবং উক্ত মনকেও প্রত্যক্-চেতয়িতাতে উপসংহার করিয়া একাগ্ররূপে যে চিন্তা করা, তাহাই ধ্যান। তৈলধারার ন্যায় প্রবাহিত অবিচ্ছিন্ন প্রত্যয়ধারাই ধ্যান" (গীতাভাষ্য)। ধ্যানের দ্বারা মন বিকারশূন্য হয়। ভগবান বুদ্ধ যোগাসনে বসিবার পূর্বে সংকল্প করিয়াছিলেন,

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে ॥

অর্থাৎ 'এই আসনে আমার শরীর শুষ্ক হউক, ত্বক অস্থি ও মাংস ধ্বংস হউক। বহুকল্প-দুর্লভ বোধি (জ্ঞান) লাভ না করিয়া এই আসন ত্যাগ করিব না'। **ভক্তি বলে···কর নিমজ্জন**—ভক্তিবাদে ধ্যানের প্রয়োজন স্বীকৃত হয় না, ঈশ্বরের প্রতি প্রেমে মন পূর্ণ ও অবগাঢ় করিতে পারিলেই সাধনার সাফল্য নিশ্চিত। রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতায় লিখিয়াছেন,

যার খুশি রুদ্ধ চক্ষে কর বসি ধ্যান,
বিশ্ব সত্য কিংবা ফাঁকি লভ সেই জ্ঞান।

আমি ততক্ষণ বসি তৃপ্তিহীন চোখে
বিশ্বেরে দেখিয়া লই দিনের আলোকে।

ইহারই রূপান্তর আর এক ভাষায়,

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়,
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।

অথবা, অন্যত্র -

জানি নাই গো সাধন তোমার বলে কারে।
আমি ধূলায় বসে খেলেছি এই তোমার দ্বারে॥…
তোমার জ্ঞানী আমায় বলে কঠিন তিরস্কারে,
পথ দিয়ে তুই আসিস নি যে, ফিরে যারে।
ফেরার পন্থা বন্ধ করে আপনি বাঁধ বাহুর ডোরে,
ওরা আমায় মিথ্যা ডাকে বারে বারে॥

জ্ঞান বলে·· অবিনাশ--বেদান্ত মতে মুমুক্ষু জীব তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা যোগের দ্বারা আত্মোৎকর্ষ লাভ করিতে পারে, মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া ব্রহ্ম-সাযুজ্য লাভ করিতে পারে। অদ্বৈতবাদীদের মতে আত্মাই ব্রহ্ম, সুতরাং আত্মজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান। আত্মার বিনাশ নাই, তাহা অক্ষয় অবিনাশী। ধ্যান ও চিত্তশুদ্ধির পরই ব্রহ্মজ্ঞান ঘটে অর্থাৎ নির্মলচিত্তে ব্রহ্মের পূর্ণ উপলব্ধি প্রাপ্ত হয়। মুণ্ডকোপনিষদের বাণী স্মর্তব্য,

এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো
যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ।
প্রাণৈশ্চিত্তং সর্বমোতং প্রজানাং
যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা॥

—'আত্মার দ্বারা জীবগণের ইন্দ্রিয়সহ সমস্ত চিত্ত ওতপ্রোত রহিয়াছে। চিত্ত প্রসন্ন হইলেই এই আত্মা আপনাকে বিশেষরূপে প্রকটিত করেন। সুতরাং এই যে দেহে প্রাণ পঞ্চপ্রকারে সম্প্রবিষ্ট হইয়া আছে, সেই দেহের মধ্যেই বিশুদ্ধ চিত্তের দ্বারা এই সূক্ষ্ম আত্মাকে জানিতে হইবে'।

বলে ·দাসের সে দাস—বৈষ্ণবগণ মনে করেন ঈশ্বরের সঙ্গে সাযুজ্য প্রভৃতি লক্ষ্য নয়। জীব সেবার দ্বারা ভজনের দ্বারা ভাগবৎ সেবার অধিকার

লাভ করিবে। ইহা কেবল বৈষ্ণব ধর্মের নয়, অনেক ভক্তিমূলক ধর্মেরই কথা। তবে বৈষ্ণবদের দ্বারাই ইহার পরাকাষ্ঠা ঘটিয়াছিল। বৈষ্ণব কবি লিখিয়াছেন,

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পহুঁ-দাসের অনুদাস।
সেবা-অভিলাষ করে নরোত্তম দাস॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন,

কৃষ্ণের নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি গেল।
এই দোষে মায়া তাব গলায় বান্ধিল॥

ইহারই নাম রাগানুগা ভক্তি। এই দাস্য হইতেই জীবের সদ্গতি। রামপ্রসাদও সাযুজ্যমুক্তি চান নাই,

চিনি হতে চাইনে মাগো
চিনি খেতে ভালবাসি।

এই সেবার কথা রবীন্দ্রনাথের ভক্তিবাদেও আছে,

ঐ আসন তলের মাটির 'পরে লুটিয়ে রব
তোমার চরণ-ধুলায়-ধুলায় ধুসর হব॥

জ্ঞান বলে…আত্মাসনে—পুনরায় বৈদান্তিক মতের কথা আসিতেছে। যেহেতু আত্মাই ব্রহ্ম সুতরাং আত্মজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান। তাই আত্মার আনন্দই সাধকের মুক্তির পথ। মুণ্ডকোপনিষদের শ্লোক স্মরণীয়,

প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্বভূতৈর্বিভাতি
বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।
আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান
এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ॥

—'যিনি প্রাণের প্রাণ পরমেশ্বর, তিনিই সর্বভূতরূপে বহুভাবে প্রকাশিত হন। ইহাকে যে বিদ্বান জানেন তিনি অতিবাদী হন না। তিনি আত্মক্রীড়, আত্মরতি ও ক্রিয়াবান—ইনিই ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম'। **ভক্তি বলে …জীবনে মরণে**—বৈষ্ণবধর্ম ভক্তিবাদী; বৈষ্ণবগণ আপনাকে কৃষ্ণের লীলাবিভাবিকা সখী এবং অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণকে পরম প্রেমিক

রূপে দেখে। ইহা আত্মরতি আত্মসুখের সম্পূর্ণ বিপরীত, কৃষ্ণের সুখই ভক্তের কাম্য। চৈতন্যদেবের একটি শ্লোকে আছে,

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু
মামদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎ প্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ।

--'সেই লম্পট হরি আমাকে আলিঙ্গন করুন বা পদদলিত করুন, তাঁহার অদর্শনজন্য মর্মপীড়া প্রদানই করুন, কিংবা যেরূপ ইচ্ছা ব্যবহার করুন, তথাপি তিনিই আমার প্রাণনাথ, অন্য কেহ নহেন'।

ঈশ্বরকে প্রেমিকরূপে ভজনা পৃথিবীর অন্য ধর্মেও আছে। সুফী ধর্মের ইহাই সার কথা। খ্রীস্টান ধর্মে সেণ্ট জনের উক্তি,

Make myself thy bride, I will rejoice in nothing till I am in thy arms.

নিউম্যান বলিয়াছেন,

If thy soul is to go on into higher spiritual blessedness it must become a woman, yes, however manly thou may be among men.

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,

তোমায় আমায় মিলন হবে বলে আলোয় আকাশ ভরা
পরাণ আমার বধূর বেশে চলে চিরস্বয়ম্বরা॥

জ্ঞানহীন ভুটি হাত—ধর্মের তত্ত্ব জটিল, অধ্যাত্মপথ নানামতে কণ্টকিত, সাধনার বহুবিধ পন্থা ও পদ্ধতি দার্শনিকগণ নির্দেশ করিয়াছেন। মোটামুটি ইহাদের দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়, জ্ঞানবাদী ও ভক্তিবাদী। জ্ঞানবাদী বিচারের দ্বারা, তর্কের দ্বারা, প্রমাণ-প্রমেয়ের দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ সন্ধান করেন, জীবের মুক্তি অন্বেষণ করেন। ভক্তিবাদীগণ বিশ্বাসের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ সন্ধান করেন। কবি জ্ঞানের পথের পথিক নন আবার সংশয়ের অবসানে তাঁহার চিত্তে এখনো নির্মল বিশুদ্ধ ভক্তি ও প্রগাঢ় আত্মসমর্পণের ভাব জাগে নাই। কিন্তু তিনি নাস্তিক নন, ঈশ্বরে তাঁহার আস্থা ও বিশ্বাস আছে। তাই পরমকরুণাময় সর্ববিদ্ ঈশ্বরের নিকট তাঁহার প্রার্থনা, কোন্

মত ও পথ অবলম্বন করিলে তিনি ঈশ্বরের সান্নিধ্য পাইবেন, তাহা যেন বিচার-শক্তিহীন মূঢ় অন্ধতুল্য কবিকে হাত ধরিয়া দেখাইয়া ঈশ্বরই নির্দেশ দিয়া দেন।

ব্যাখ্যা

জ্ঞান বলে, এই দেহ… নিত্যলীলা তাঁর।

আলোচ্য ছত্র-চতুষ্টয় ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী বিরচিত জ্ঞান ও ভক্তি নামক তত্ত্বকবিতার অন্তর্ভুক্ত। কবি এখানে ধর্মপথ ও মতের পরস্পর-বিভিন্নতার উল্লেখ করিয়াছেন। জ্ঞানবাদ ও ভক্তিবাদ ভাববাদী দর্শনের দুইটি বিশিষ্ট মতাদর্শ। দীর্ঘকাল ধরিয়া এই দুই পদ্ধতি ভারতীয় অধ্যাত্মসাধকদের জিজ্ঞাসা ও বিশ্বাসকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। জ্ঞানবাদে আছে বুদ্ধি ও বিতর্কের দ্বারা লব্ধ জ্ঞান এবং ভক্তিবাদ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত।

জ্ঞানবাদীগণের মতে, দেহ বিনাশশীল। পঞ্চভূতাত্মক শরীর মৃত্যুর পর পঞ্চভূতে মিশাইয়া যায়, তাহার আর কোনো অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু ভক্তিবাদ দেহের বিনাশে বিশ্বাসী নয়। ভক্তিবাদে দেহকে ঈশ্বরের আবাস বলা হইয়া থাকে। তান্ত্রিকগণ মনে করেন যে, পরমসত্তা ঈশ্বর দেহেই অবস্থান করেন। ত্রিলোকে যত কিছু বর্তমান সবই দেহভাণ্ডে নিবদ্ধ, সাধনার দ্বারা দেহের মধ্যেই পরাশক্তিকে অনুভব করা যায়। জীবদেহের মস্তকে যে সহস্রার পদ্ম তাহাই ব্রহ্মময়ের অধিষ্ঠানভূমি। তাই দেহের প্রদীপ জ্বালাইয়াই দেবতার আরাধনা করিতে হয়। জ্ঞানবাদীগণ বিশ্বাস করেন, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। দারাপুত্র পরিবার, এই স্নেহদুঃখপূর্ণ সংসার, সবই মায়া বা ভ্রান্তি মাত্র—আত্মচৈতন্য জাগ্রত হইলেই এই ভ্রান্তি নিরসন হয়। কিন্তু ভক্তিবাদ ব্রহ্মের এই অদ্বৈত সর্বাংশে স্বীকার করিতে পারেন নাই, তাই যুগে যুগে অসংখ্য সাধক সংসার ও জগৎকেও সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বৈষ্ণব ভক্তিবাদীরা এই দৃশ্যমান স্নেহপ্রেমবাৎসল্যপূর্ণ মানবসংসারকে ঈশ্বরের নিত্য লীলা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ঈশ্বরের কোনোই প্রয়োজন ছিল না, তিনি অদ্বৈতই ছিলেন—কিন্তু কেবল অহেতুক আনন্দে, কেবল এক অনির্বচনীয় লীলারস আস্বাদনের জন্য আপনাকে বহু করিয়াছেন, জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, আপনাকে মনুষ্যজন্মে অবতীর্ণ করিয়াছেন। ভক্তের জন্য ভগবান স্বয়ং মাটির

পৃথিবীতে নামিয়া আসেন, ইহাই তাঁহার লীলা, তাঁহার সেই চিরন্তন অপূর্ব লীলাই স্ত্রীপুত্রপরিবারের মধ্যে, সংসার বন্ধনের মধ্যে, স্নেহপ্রেমের মধ্যে বিচলিত হইতেছে। সুতরাং ইহাতে মিথ্যামায়া বলিবার উপায় নাই।

জ্ঞান বলে বন্ধ-মূল ···কর নিমজ্জন।

প্রসঙ্গসূত্র পূর্ববৎ।

কর্মসম্বন্ধেও ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তায় দুই বিপরীত মত প্রকাশ পাইয়াছে। বৌদ্ধ জৈন ও হিন্দুদর্শনের কোনো কোনো শাখায় মনে করা হইয়া থাকে কর্ম হইতে মানুষের দুঃখ উপজাত হয়। জীব মায়া বা কর্মের দ্বারা বেষ্টিত, ইহাকেই বলা হয় বন্ধ, বন্ধ হইতে দুঃখের উৎপত্তি। সুতরাং মানুষের দুঃখ নিবৃত্তির জন্য প্রয়োজন আত্মজ্ঞানলাভ। যে কর্ম দুঃখের মূলে, তাহা নাশ করিতে পারিলেই মানুষ মোক্ষলাভ করিবে, আর পুনর্জন্ম ঘটিবে না, বৌদ্ধধর্মে ইহা বলা হইয়াছে। কিন্তু ভক্তিধর্মে কর্মকে দুঃখের হেতু বলিয়া স্বীকার করা হয় না। কর্ম যদি নিষ্কামভাবে সাধিত হয়, তবে সেই কর্ম কৃষ্ণসমর্পিত এবং তাহাই মুক্তির উপায়। গীতায় ভগবান্ কৃষ্ণ বলিয়াছেন, কেবল কর্মেই তোমার অধিকার আছে, ফলে নয়। ঈশ্বরে কর্মফল অর্পণ করিয়া কর্মসাধনার নামই নিষ্কাম ধর্ম। সুতরাং এখানে কর্ম বন্ধন নয়, কৃষ্ণে সমর্পিত কর্মই মুক্তির উপায়। আবার জ্ঞানবাদীর মতে, তপস্যা-উপাসনা-ধ্যান চিত্তবৃত্তিনিরোধ ও যোগ—এই সকল সাধন-পথের বিধি নির্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কালক্রমে ভক্তিবাদে এই যজ্ঞ তপস্যা বা ধ্যানের প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে। সহজিয়া বৌদ্ধ সাধক বলিয়াছেন, সকল প্রকার সমাধির দ্বারা কী হয়, সুখদুঃখের দ্বারা মৃত্যু তো হইবেই। সুতরাং ভক্তিবাদ এইটুকু জানে, যদি অন্তরে প্রেম থাকে, ঈশ্বরে অনুরাগ থাকে, তবে কোনো কৃচ্ছ্রসাধন সমাধি বা ধ্যানেরই প্রয়োজন নাই। প্রেম এক অনির্বচনীয় রস, ভালোবাসার দ্বারা পরাশক্তি পরম প্রিয় হইয়া ধরা দেন, তপস্যার দ্বারা যাহা সম্ভব হয় না। ঈশ্বর ভালবাসার অধীন, শক্তির বা বলের নয়, ইহাই ভক্তিবাদের কথা।

জ্ঞান বলে, আমি সেই··· ···জীবনে মরণে।

প্রসঙ্গসূত্র পূর্ববৎ।

বৈদান্তিকগণ জ্ঞানবাদী, কর্ম অপেক্ষা তাঁহারা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বই প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, ঈশ্বর অদ্বৈত, জীব স্বরূপত ঈশ্বরই, মায়াবশত

আপনাকে স্বতন্ত্র মনে করে। সুতরাং জ্ঞানবাদী নিশ্চিতভাবে জানেন, আত্মাই সেই পরম অক্ষয় অব্রণ অসীম ব্রহ্মশক্তি। অতএব আত্মার বিনাশ নাই, জীবই পরমাত্মার বিকাশ মাত্র। সে এবং আমি এক, সোঽহং, সে এবং তুমিও এক, তত্ত্বমসি। কিছুরই ক্ষয় নাই, বিনষ্টি নাই। কিন্তু ভক্তিবাদ এই অদ্বৈত তত্ত্ব সর্বাংশে স্বীকার করিয়া লয় নাই। বৈষ্ণব ভক্তিবাদ জীবকে ঈশ্বরের তটস্থ শক্তি মনে করে। জীবের সহিত ঈশ্বরের সম্পর্ক সখ্যদাস্যের। জীব সেবার দ্বারা, ভজনের দ্বারা ভগবানের সেবার অধিকার লাভ করে। ভক্ত তাই নিজেকে দেবতার দাসানুদাস মনে করে। দেবতাকে বন্দনা-ভজনা-পূজা করাতেই তাহার সার্থকতা। জ্ঞানবাদী পুনরায় মনে করেন, জীব যেহেতু ব্রহ্মই, সুতরাং আত্মচৈতন্য লাভ বা আত্মানন্দ লাভই জীবের লক্ষ্য। কিন্তু ভক্তিধর্ম মনে করে, কৃষ্ণের সুখ-সাধনেই ভক্তের পরম সার্থকতা। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর আমার প্রেমিক, আমি তাঁহার প্রেমিকা। সুতরাং আপনার জীবন দিয়া সেই প্রাণনাথকে তৃপ্ত করাই ভক্তের লক্ষ্য। ভক্তের এই মনোভাব চণ্ডীদাসের পদে রাধার কণ্ঠে ব্যক্ত হইয়াছে—

> বঁধু কি আর বলিব আমি।
> জনমে জনমে জীবনে মরণে
> প্রাণনাথ হৈও তুমি॥

প্রশ্ন ১। জ্ঞান ও ভক্তি কবিতায় জ্ঞান ও ভক্তির পারস্পরিক দৃষ্টি-ভিন্নতার যে পরিচয় কবি দিয়াছেন, দর্শনের দিক হইতে তাহার ব্যাখ্যা কর এবং কবিতা হিসাবে জ্ঞান ও ভক্তির সার্থকতা নিরূপণ কর।

তত্ত্বকবিতা রচনায় ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী একদা রবীন্দ্র-সমকালীন তরুণ কবিদের মধ্যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্ঞান ও ভক্তি নামক চতুর্দশ চরণের এই কবিতায় তিনি সংক্ষেপে জ্ঞান ও ভক্তি নামক দার্শনিক দৃষ্টি-ভঙ্গির দুই বিপরীত স্বভাবের পরিচয় দিয়াছেন। হিন্দুদর্শন নানা মত ও পথে, বহু তত্ত্বজটিলতায় ভারাক্রান্ত। কিন্তু মোটামুটিভাবে ইহার তিনটি শাখা কল্পনা করা যাইতে পারে—কর্মবাদ, জ্ঞানবাদ ও ভক্তিবাদ। যাগ যজ্ঞ মন্ত্র উপাসনা ইত্যাদি বৈদিক যুগের সাধনাকে কর্মবাদ, তৎপরবর্তী যুগের ঈশ্বরজিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের তাত্ত্বিক আগ্রহকে জ্ঞানবাদ এবং সর্বশেষে বিশুদ্ধ সেবা-প্রেম-অনুরাগ-বিশ্বাসের দ্বারা ঈশ্বর-সাধনাকে বলা যায় ভক্তিবাদ। এইগুলি

সাধনার পদ্ধতি মাত্র, কোনো বিশিষ্ট দার্শনিক তত্ত্বের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত নয়। কবি ভুজঙ্গধর আলোচ্য কবিতায় কেবল জ্ঞান ও ভক্তি, অর্থাৎ একদিকে সংশয়বাদীর তত্ত্বজিজ্ঞাসা অন্যদিকে বিশুদ্ধ বিশ্বাসীর একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণ, এই দুই সাধনসংকেতে ধর্মের পথরেখাটি পাঠকদের সম্মুখে অনুভববেদ্য করিয়া তুলিয়াছেন। পঞ্চভূতাত্মক জীবদেহের জংগমতা, সংসারের ভ্রান্তি, দুঃখের মূলকারণ কর্ম, উপাসনা-সমাধি, ব্রহ্ম ও আত্মার অদ্বৈতহেতু আত্মার অবিনাশিত্ব এবং সাধকের আত্মানন্দ-সিদ্ধির প্রয়াস—এইগুলি জ্ঞানবাদীর বক্তব্য বলিয়া কবি উপস্থাপিত করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, ঈশ্বর দেহের মধ্যেই অবস্থান করেন, পরিবারকেন্দ্রিক সংসার তাঁহার লীলামাত্র, কৃষ্ণে সমর্পিত হইলে কর্মেই মুক্তি ঘটে, প্রেমরসে সাধকের চিত্ত নিমজ্জিত করিতে হইবে, ভক্ত দেবতার ভজন-দাস্যের অধিকারী, জীবনে মরণে কৃষ্ণকেই প্রাণপতিরূপে অনুভব করিতে হইবে—এইগুলি ভক্তিবাদীগণের বিশ্বাস। এই বৈপরীত্যে কবি বিভ্রান্ত হইয়া করুণানীশ দেবতার নিকট আচরণীয় পথের ইঙ্গিত ভিক্ষা করিয়াছেন, ইহাই আলোচ্য জ্ঞান ও ভক্তি কবিতার বক্তব্য।

ভুজঙ্গধরের এই তত্ত্বকথায় দার্শনিক মতের বিভিন্ন মত ও পন্থার পরিচয় মিলিতেছে। সাধারণভাবে জ্ঞানবাদ বলিতে শংকরের অদ্বৈত বেদান্তমত এবং ভক্তিবাদ বলিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মমত বুঝাইলেও কবি বিভিন্ন তত্ত্বকথার মধ্য দিয়া বৌদ্ধ-জৈন মত, গীতার কর্মবাদ, উপনিষদের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা নিম্বার্ক মধ্বাচার্য রামানুজের দার্শনিক মত, রসবাদ ইত্যাদি প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়াছেন। দার্শনিক শংকর ব্রহ্মকে একমাত্র সত্য এবং জগৎকে মিথ্যা বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। 'এই দেহ নিতান্ত নশ্বর' তাহারই প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে হয়। 'ভগবান দেহের ভিতর' কথাটি সাংখ্য ও শক্তিধর্মের বিশিষ্ট মত। ভক্তিবাদীর মতে সংসার ঈশ্বরের নিত্যলীলা—ইহা সুস্পষ্টভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বিশ্বাসকেই মনে করাইয়া দেয়। বন্ধ-মূল কর্মনাশের কথা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে আছে আর গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণার্পিত ধর্মের উপদেশ দিয়াছেন। ধ্যানযোগের কথা অনেক ধর্মেই আছে, কিন্তু 'প্রেমরসে কর নিমজ্জন' পুনরায় বৈষ্ণব ধর্মের কথা মনে করায়। পরবর্তী চরণগুলিতে মোটামুটি জ্ঞান ও ভক্তির মাধ্যমে শংকর-বেদান্ত ও বৈষ্ণব মতেরই প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

কবিতা হিসাবে জ্ঞান ও ভক্তি উচ্চশ্রেণীর নয় কারণ নিছক তত্ত্বকথা কাব্যরসের সৃষ্টি করে না, যদি কবির মন্ময় আত্মভাবনায় তাহা উদ্‌ভাসিত না হয়। কবি জ্ঞান ও ভক্তির পারস্পরিক মত-বৈষম্যে বিভ্রান্ত হইয়া ঈশ্বরের নিকট আপনার বিচার-শক্তিহীন মূঢ়তা নিবেদন করিয়াছেন। ইহাও আন্তরিক হইয়া উঠে নাই। এইখানেই কবিতাটির ত্রুটি।

মাধবিকা : যতীন্দ্রমোহন বাগচী

ভূমিকা

রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিদের মধ্যে যে কবিগোষ্ঠী রবীন্দ্র-সাধনাকে নিষ্ঠার সহিত গ্রহণ করিয়া কাব্যসৌন্দর্য রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী তাঁহাদের অন্যতম। যতীন্দ্রমোহন সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেন লিখিয়াছেন,

"যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কবিতা-অনুশীলন দীর্ঘ দিনের। ১৩০৬ সাল হইতে ইঁহার কবিতা সাহিত্যে ও অন্য মাসিকপত্রে বাহির হইতে থাকে। তবে মানসীতেই ইঁহার বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ। ইঁহার প্রথম কবিতার বই, লেখা। তাহার পর রেখা, অপরাজিতা, নাগকেশর, বন্ধুর দান, জাগরণী, নীহারিকা, মহাভারতী (এবং পাঞ্চজন্য)। যতীন্দ্রমোহন ছন্দে ও ভাষায় রবীন্দ্রপন্থী। যতীন্দ্রমোহনের কবিতার প্রধান গুণ চিত্রলিপি-কুশলতা। ছন্দে ও শব্দে তাঁহার অধিকার নির্বাধ। বিষয়েও বিচিত্রতা আছে। সমসাময়িক কবিদের মত তাঁহারও রচনায় পল্লীপ্রীতির প্রকাশ এবং ভাগ্যহত নিপীড়িত নারীর প্রতি সমবেদনা প্রকাশিত। যতীন্দ্রমোহনের কবিতায় আবেগ খুব স্পষ্ট নয়, যেটুকু আছে তাহাতে রচনায় বেগের সঞ্চার করিয়াছে। জীবন বা জগৎ সম্বন্ধে কোনো বক্র দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ নাই। ইঁহার কবিতার সৌন্দর্য প্রসন্ন সরলতায়" (বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস)।

ভাবার্থ

নববসন্তের প্রথম সমীর হিল্লোলিত হইয়া কবিচিত্তকে ব্যাকুল বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছে। এই বর্ণোজ্জ্বল, জীবনরসপূর্ণ এবং যৌবন-উদ্দীপক সমীরকে সম্বোধন করিয়া কবি প্রশ্ন করিতেছেন, কোন্ দক্ষিণসমুদ্রে সদ্যোস্নাত হইয়া নীরবিলাসী বিহঙ্গদের পক্ষবিধুনন ও মৌমাছিদের গুঞ্জরণ বহন করিয়া সে বিমুগ্ধচিত্তে উত্তরাভিযানে চলিয়াছে। বহুদিনের অদর্শনে কবি তাঁহার বর্ষ-অতীতের বন্ধুর পুরাতন ভঙ্গিকে স্মরণ করিতেছেন। সেই পুরাতন শীতল স্পর্শ ও কণ্ঠস্বর কবি চিনিতে পারিয়াছেন। কোন্ নারিকেল-কুঞ্জশোভিত সমুদ্রতীরে মলয়বীথিকা হইতে সমাগত এই বসন্তানিলের নিকট কবি সেই দূরবর্তী বেতস-বন এলাচ-লতা কেয়াপাতার শুভসমাচার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। যে-বসন্তে নরনারীর হৃদয় উদ্‌ভ্রান্ত হইত, প্রেমের স্পর্শে দীঘির পথে নারীগণ ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করিত, প্রোষিত-ভর্তৃকা যে বসন্তে প্রিয়হীনতায় অশ্রুনয়না হইত, সেই বসন্তসমীর এখনও সকলের দ্বারা সদ্যো-পুলকে সমাদৃত হয় কিনা, সকলে তাহাকে চিনিতে পারে কিনা—ইহাও কবির জিজ্ঞাস্য। বসন্তকালে প্রস্ফুটিত রক্তন-অশোকের সেই বর্ণ আজও অক্ষুণ্ণ আছে কিনা, ফুল্লকুসুম দেখিয়া তরুণীবৃন্দ এখনও উল্লসিত হয় কিনা, বিহঙ্গ এখনও দক্ষিণপবনে কলকণ্ঠ হয় কিনা, তৃণশীর্ষে পতঙ্গ ছুটিয়া আসে কিনা, এসবই কবি মাধবিকার নিকট জানিতে চাহিয়াছেন। বসন্তে কিছুই পরিবর্তিত হয় নাই, কোনো পুলকই স্তব্ধ হয় নাই শুনিয়া কবি অসীম তৃপ্তি ও আনন্দ অনুভব করিয়াছেন। নূতন অনুপ্রেরণার শোণিতচাঞ্চল্যে কবি বসন্তসমীরের চরণে তাঁহার মুগ্ধহৃদয়ের অঞ্জলি প্রদান করিলেন। আবার কোন্ বর্ষান্তে সাক্ষাৎ হইবে বলিয়া এই ক্ষণবসন্তের দান যেন সে গ্রহণ করিয়া কবিকে কৃতার্থ করে, ইহাই কবির নিবেদন।

বস্তুবিশ্লেষণ

আলোচনা

স্নিগ্ধ মনোরম ভঙ্গিতে প্রকৃতির দৃশ্য সৌন্দর্যের বর্ণনা করিবার ক্ষমতা যতীন্দ্রমোহনের আয়ত্ত ছিল, মাধবিকা কবিতায় তাহার নমুনা আছে। প্রকৃতি-মুগ্ধতায় তিনি রবীন্দ্রনাথেরই দোসর—এবিষয়ে তাঁহার মৌলিকতা নাই, কিন্তু এই বসন্ত-বরণের ভঙ্গিটি তাঁহার

প্রকৃতির কবি

নিজস্ব। তিনি গুরুগম্ভীর বসন্তমঙ্গলের স্তোত্র-রচনা করেন নাই, বসন্তকে তিনি ঋতুমাত্র বলিয়া দেখেন নাই। বসন্ত-সমীর কবির সখা; বর্ষাকালের অদর্শনে বিদেশ-প্রত্যাগত বন্ধুর সহিত সাক্ষাতের আনন্দ ও বিস্ময় সঞ্চার করিয়া কবি তাহাকে এক মুহূর্তে অসংখ্য প্রশ্ন করিযাছেন। প্রত্যাসন্ন প্রিয়জনের নিকট প্রীতিসম্ভাষণ ও কুশল-সংবাদের এই ভঙ্গিটির দ্বারা বসন্ত সহসা আমাদের অত্যন্ত নিকটতম আত্মীয় হইয়া উঠিয়াছে, কবির সাক্ষাৎকারটি আমাদের সহিত সাক্ষাৎকার বলিয়াই মনে হয়। ইহা হয়ত গভীর ভাবকল্পনার দৃষ্টান্ত হইয়া উঠে নাই, কিন্তু লঘু-কল্পনার সহিত আন্তরিকতা ও সারল্য যুক্ত হইয়া কবিতাটিকে সর্বজনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছে।

সখ্যরসের কবিতা

বসন্ত কবিপ্রিয় ঋতু এবং বাস্তব-জগতে বসন্তের যে ম্লান শোভাই দেখা দিক, কাব্যে তাহার অনিন্দিত সুষমা-বরণের আগ্রহ কালিদাসের কাল হইতে যতীন্দ্রমোহনের কাল পর্যন্ত ক্ষীয়মাণ হয নাই। ঋতুসংহার কাব্যে কালিদাস বসন্তকে বলিয়াছিলেন যোদ্ধা—প্রেমাতুর বিরহীহৃদয় তাহার আক্রমণের স্থল এবং প্রফুল্ল সহকারমুকুল তাহার সুতীক্ষ্ণ শায়ক, মধুকরশ্রেণী তাহার বিলাস-ভঙ্গি-দুঃসহ ধনুকের গুণ। একালের কবি রবীন্দ্রনাথ বসন্তকে ঋতুরাজ বলিয়াছেন—কবিতায় সংগীতে বসন্তের অপূর্ব যৌবনমদিরা তাঁহার হাতে সফেন হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুত, রবীন্দ্র-ভক্ত যতীন্দ্রমোহন বসন্তের যে অভ্যর্থনা গীতি গাহিয়াছেন, তাহার সূচীপত্র রবীন্দ্রনাথেই। যে পথিকসমীর দক্ষিণসমুদ্রের বার্তাবহন করিয়া যতীন্দ্রমোহনের কাব্যাঙ্গনে অশোক-বঙ্গনের নবপত্রে মঙ্গল-সমাচার মুদ্রিত করিয়া দিয়াছে, রবীন্দ্রনাথই তাহার প্রথম প্রত্যুদ্গমন রচনা করিয়াছেন। বিচিত্র প্রবন্ধের বসন্তযাপন প্রবন্ধে কবি লিখিয়াছেন,

প্রাচীন কাব্যে বসন্ত

রবীন্দ্র-সাহিত্যে বসন্ত

"এই মাঠের পারে শালবনের নূতন কচি পাতার মধ্য দিয়া বসন্তের হাওয়া দিয়াছে। বড়লাট ছোটলাট সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের উৎকট ব্যস্ততাকে কিছুমাত্র গণ্য না করিয়া দক্ষিণসমুদ্রের তরঙ্গোৎসবসভা হইতে প্রতি বৎসর সেই চিরন্তন বার্তাবহ নবজীবনের আনন্দ-সমাচার লইয়া ধরাতলে অক্ষয় প্রাণের আশ্বাস নূতন করিয়া প্রচার করিতে বাহির হয়···আমরা কি বসন্তের নিগূঢ় রসসঞ্চার-বিকশিত তরুলতাপুষ্পপল্লবের কেহই নই? তাহারা যে

আমাদের ঘরের আঙিনাকে ছায়ায় ঢাকিয়া, গন্ধে ভরিয়া, বাহু দিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহারা কি আমাদের এতই পর যে তাহারা যখন ফুলে ফুটিয়া উঠিবে আমরা তখন চাপকান পরিয়া অফিসে যাইব, কোনো অনির্বচনীয় বেদনায় আমাদের হৃৎপিণ্ড তরুপল্লবের মতো কাঁপিয়া উঠিবে না?"

ফাল্গুনী নাটকে বসন্তের রূপ

ফাল্গুনী নাটকে বেণুবনের গানে ইহারই প্রতিধ্বনি শুনি—

ওগো দখিন হাওয়া পথিক হাওয়া
পথের ধারে আমার বাসা
জানি তোমার আসা-যাওয়া
শুনি তোমার পায়ের ভাষা।

রবীন্দ্রসাহিত্য হইতে এইরূপ দৃষ্টান্ত অসংখ্য চয়ন করা যায়। বসন্তঋতু রবীন্দ্রনাথের হাতে এই মর্যাদা লাভ করিয়াই রবীন্দ্রানুরাগী কবিদের অনুপ্রাণিত করিয়াছে, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

তবে মাধবিকা কবিতার বিষয়বস্তু বসন্ত-অভ্যর্থনা রবীন্দ্র-কবি-ধর্মের প্রকৃতি-প্রীতির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইলেও কবিতাটির ছন্দ ও রূপকার্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রভাবই অধিকতর অনুভূত হয়। মাধবিকা শব্দের অর্থ বসন্তকাল, কবি ইহাকে বসন্তের প্রতীক সমীর অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। বসন্ত-সমীর যেন কবির পরিচিত, বহুকাল অদর্শনের পর আবির্ভূত প্রিয়বান্ধব—এই রূপকল্পনার মধ্যে যে লঘুত্ব আছে তাহা সত্যেন্দ্রনাথের fancyমূলক কবিতাগুলিকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। কবিতাটির স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দও সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় পরিচিত (দৃষ্টান্তস্বরূপ মাধুকরী সংকলনের অন্তর্ভুক্ত সত্যেন্দ্রনাথের কবর-ই-নূরজাহান কবিতার ছন্দ দ্রষ্টব্য)। ইহা ব্যতীত, তদ্ভব শব্দের ও প্রচলিত গ্রাম্য হসন্তধ্বনি-প্রধান শব্দের ব্যবহারেও তাঁহার কবিতার শিল্পকর্ম সত্যেন্দ্রীয় কাব্যালোকের অনুষঙ্গবাহী।

সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব

রূপতত্ত্ব বিশ্লেষণ

মাধবিকা—মাধবী শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ, বসন্তকাল অর্থে কবি ব্যবহার করিয়াছেন। কবিতাটি বসন্ত-সমীরের প্রতি সম্বোধিত হইলেও উদ্দিষ্ট বসন্ত।

তবে বসন্ত যখন কবির বন্ধু, তখন স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দের দ্বারা তাহাকে বিশেষিত করিবার তাৎপর্য বোধগম্য হয় না।

দখিন হাওয়া ভাণ্ডারী—দক্ষিণ-সমীরের স্পর্শে বনে-প্রান্তরে নানা বর্ণের ফুল ফুটিতে থাকে ; বসন্ত যেন তাহার কোনো গোপন বর্ণের সংগ্রহশালা হইতে রঙ লইয়া ফুলে মুকুলে ছড়াইয়া দেয়, ইহা কল্পনা করিয়া কবি তাহাকে নূতন রঙের ভাণ্ডারী অর্থাৎ সঞ্চয়কারী বলিয়াছেন। **জীবন-রসের রসিক বঁধু**—বসন্তই পৃথিবীর হিমস্পর্শ হইতে নবীন প্রাণকে উজ্জীবিত করিয়া তোলে ; এই প্রাণরসে তরুপল্লবকে এমন কি মনুষ্যজীবনকে সরস করে বলিয়াই কবির প্রিয় বসন্ত জীবনরসের রসিক বন্ধু। **যৌবনেরই কাণ্ডারী**—বসন্ত কবির কাছে যৌবনের পরিচালক বা দিঙ্‌নির্ণায়ক। **সিন্ধু থেকে···স্নান করি**—বসন্তপবন দক্ষিণ-সমুদ্রবাহী বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, কবি তাহারই সূত্রে অনুমান করিয়াছেন দখিন হাওয়া বুঝি সদ্যোস্নাত হইয়া আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,

দখিন-সাগর পার হয়ে যে এলে পথিক তুমি
আমার সকল দেব অতিথিরে আমি বনভূমি।

গাংচিলেদের গান ধরি—যেহেতু বসন্তের হাওয়া দক্ষিণসমুদ্র হইতে আগত, সুতরাং তাহার সংগীত যেন সদ্য-পরিত্যক্ত সমুদ্রের গাংচিলেদের ডানার শনশন আওয়াজেরই স্মৃতি। **মৌমাছিদের···সুর ধরি**—পুষ্পিত পল্লবে মৌমাছিদের মনোমুগ্ধকর গুঞ্জরণ অনুসরণ করিয়া দক্ষিণসাগর ত্যাগ করিয়া বসন্তবাতাস লোকালয়ে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। **চললে··উত্তরে**—দক্ষিণ দিক হইতে আগত পথিক বাতাস যেন কিসের নেশায় মুগ্ধ হইয়া উত্তরে ছুটিয়া আসিতেছে—ইহাই কবির বক্তব্য।

অনেক দিনের··ভঙ্গী তো—গত বৎসর বসন্ত শেষের পর আর এক বৎসরে বসন্ত-আগমন, এই দীর্ঘ বৎসরের ব্যবধানে কবি তাহার প্রিয় সুহৃদ বসন্তের সহিত সাক্ষাতে তাহাকে প্রশ্ন করিতেছেন, এতকালের অদর্শনেও বসন্তের সেই পুরাতন প্রিয় পরিচিত ভঙ্গিটি অবশ্যই পরিবর্তিত হইয়া যায় নাই ? **তেমনি সরস··ঝাঁকটি নেই**—বসন্তসমীর তাহার স্নিগ্ধ স্পর্শে মৃদু সংগীত ধ্বনিতে মানুষের মন হরণ করে এবং এক মুহূর্তেই তাহার পরিচয় নিঃসংশয়িতভাবে ঘোষণা করে। ইহাকেই কবি বন্ধুর পুরাতন সরস স্পর্শ এবং

গলার হাঁক বলিয়া মনে করিতেছেন। **মলয়ের বন ঘিরে**—বসন্তঋতু মাত্র দুই মাসের, বৎসরের অন্য সময় সে নিশ্চয় অন্য কোনো অজানিত দেশের মলয়-বনে নিরুদ্দেশ হয়। **নারিকেলের·· কোন্ তীরে**—সারা বৎসর বসন্ত হয়ত কোনো নারিকেলবীথি-শোভিত সমুদ্র-পারবর্তী নিলয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। **লকলকে···কোন্ গলি**—বৎসরের অন্য সময়ে অদর্শিত বসন্ত যে অজ্ঞাত-দেশে আতিথ্য গ্রহণ করে, সেই দেশে নিশ্চয় সতেজ পল্লবিত বেতসবন আছে, কবি তাহার গোপন ঠিকানা বসন্ত সমীরের নিকট জানিতে চাহিয়াছেন। **এলা-লতার·· মঙ্গলই**—বসন্তের সাংবাৎসরিক নিকুঞ্জের সেই সকল প্রতিবেশী সহচর এলাচ-লতা এবং কেয়াবনের শুভ সমাচার কবি সেই দেশ হইতে আগত হাওয়ার নিকট জানিতে চাহিয়াছেন।

নরনারী ··ফুল ধরে---দক্ষিণ-প্রত্যাগত বসন্ত সমীরকে দেখিয়া কবি উৎকণ্ঠার সহিত জানিতে চাহিয়াছেন, বসন্ত-আগমনে এখনও পরিচিত সংসারের নরনারী বিহ্বল হয় কিনা। ব্যাকুল বসন্তের হাওয়া প্রবাহিত হইলে পুরুষ-নারী নির্বিশেষে অকারণ পুলকে মুগ্ধ হইয়া পড়ে, যৌবনের উন্মাদনায় অভ্যস্ত কর্মে ভ্রান্তি উৎপন্ন হয় এবং সকলের চিত্তেই নবযৌবনের পল্লবগুলি মুকুলিত হইয়া উঠে। এই সাধারণ প্রত্যয় হইতেই কবি তাহাকে এই সকল ঘটনায় কোনো ছেদ পড়িয়াছে কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তুলনীয়,

দৃষ্ট্বা প্রিয়ে! সহৃদয়স্য ভবেন্ন কস্য কন্দর্প-বাণ-পতন-ব্যথিতং হি চেতঃ

[ঋতুসংহার—কালিদাস]

—(প্রিয়ামুখতুল্য কুরুবক-মঞ্জরী দেখিয়া) কোন্ হৃদয়বান চিত্ত কন্দর্প-শরাঘাতে ব্যথিত হয় না?

আসতে যেতে ·ছল করা- বসন্ত-আগমনে নারীর চিত্ত উতলা হয়, কিন্তু বাহিরে তাহা প্রকাশিত করিবার স্বাভাবিক লজ্জাবশত নারী ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করে—অকারণে দীঘির ঘাটে জল আনিতে যায়। নববসন্তের হাওয়ায় এখনও সেইরূপ হয় কিনা ইহাই বসন্তের নিকট কবির প্রশ্ন। **পথিক বধূর···জলভরা**—যে নারীর স্বামী পথিক অর্থাৎ বিদেশে অবস্থানকারী তাহার হৃদয় বসন্তে বিরহে ব্যাকুল হয় বলিয়া তাহার নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত হয়। ইহা এখনও দেখা যায় কিনা কবি তাহা বসন্ত বাতাসকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তুলনীয়,

আ মূলতো বিদ্রুমরাগতাম্রং সপল্লবাঃ পুষ্পচয়ং দধানাঃ
কুর্বন্ত্যশোকা হৃদয়ং সশোকং নিরীক্ষ্যমাণা নবযৌবনানাম্॥
[ঋতুসংহার—কালিদাস]

—ঐ নবপল্লবশোভিত বিদ্রুমবৎ রক্তাভ কুসুমনিচয়ে শোভিত বিমণ্ডিত রক্তাশোকতরু দেখিয়া নবযুবতীদের হৃদয় প্রিয়বিরহশোকে অধীর হইয়া পড়িতেছে। এবং

নেত্রে নিমীলয়তি রোদিতি যাতি শোকং ঘ্রাণং করেণ বিরুণদ্ধি বিরৌতি চোচ্চৈঃ
কান্তা-বিয়োগ-পরিখেদিত-চিত্ত-বৃত্তিদৃষ্টাধ্বগঃ কুসুমিতান্ সহকারবৃক্ষান্।
[ঐ]

—কান্তা-বিয়োগ-বিধুর বিয়োগখিন্ন হৃদয় আজ এই বসন্তে কুসুমিত সহকারবৃক্ষের দিকে চাহিয়া নয়ন মুদিত করিতেছে, শোকে অবসন্ন হইতেছে, সৌরভে ব্যাকুল ঘ্রাণ রোধ করিতেছে উচ্চৈঃস্বরে নির্জন বনপথে বিলাপ করিতেছে।

রঙ্গনে…জুটেছে তো—বসন্তে রঙ্গন অশোক ইত্যাদি ফুল ফুটিয়া উঠে; সেই ফুল্ল কুসুমবৃক্ষের শাখায় দোল খাইতে আসে তরুণীদল। ইহার পুনরাবৃত্তি আজও হয় কিনা, কবি প্রশ্ন করিতেছেন। **তোমায় চেয়ে পতঙ্গ**—আজও বসন্তে কাননে পাখিরা কলরব করে কিনা, নবীন তৃণশীর্ষে প্রজাপতি উড়িয়া আসে কিনা বসন্তকে কবি জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

তেমনি…উস্‌খুসি—কবির আশঙ্কা অমূলক, আজও বসন্তে তেমনি করিয়াই ফুল ফোটে, নরনারীর চিত্ত উতলা হয়, প্রোষিতভর্তৃকার বিরহী চিত্ত অশ্রুভারাক্রান্ত হয়, নবপল্লবে পতঙ্গ সমাগম ঘটে, ইহা শুনিয়া প্রকৃতিপ্রেমিক কবি আনন্দিত ও পুলকিত হইলেন, তাহার প্রাণ পুনরায় সঞ্জীবিত হইল, মন এই সব কিছুর আস্বাদ গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইল। চনচনিয়ে উস্‌খুসি প্রভৃতি শব্দ-ব্যবহার সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার কথা স্মরণ করায়। **নূতন রসে… অঞ্জলি**—বসন্ত-সমাগমে পুরাতন আনন্দের সমাবর্তনে কবির হৃদয় জারিত হইল, ধমনীতে রক্তস্রোত তরঙ্গিত হইল। তিনি প্রাণের মুগ্ধ আনন্দের উপচার দান করিতে চাহিলেন তাঁহার প্রিয় সুহৃদ বসন্তকে। **গ্রহণ করো…সঙ্কের**—বসন্ত তাহার ক্ষণিক আগমনে, পুনরায় দীর্ঘকালের জন্য অদৃশ্য হইবার

পূবে, কবির এই বিমুগ্ধ হৃদয়ের অঞ্জলি গ্রহণ করুক, ইহাই কবির আন্তরিক মিনতি।

ব্যাখ্যা

দখিন হাওয়া⋯ ⋯যৌবনেরি কাণ্ডারী। (প্রথম স্তবক)

বক্ষ্যমাণ পংক্তিদ্বয় প্রকৃতিসৌন্দর্যমুগ্ধ যতীন্দ্রমোহন বাগচীর মাধবিকা কবিতার সূচনাংশ। কবি এখানে বসন্তের বার্তাবহ দক্ষিণসমুদ্র হইতে আগত নবসমীরকে তাহার হৃদয়ার্ঘ্য দান করিয়াছেন।

দক্ষিণপবন বসন্তের প্রাণস্পন্দন স্বরূপ—সে অফুরন্ত বর্ণের উৎস, অনির্বাণ প্রাণের কেন্দ্র। তাহার স্নিগ্ধ করপল্লবের স্পর্শে বনে বনে অসংখ্য মুকুল বর্ণাঢ্য হইয়া উঠে। যে সকল শাখা শীতার্দ্র প্রহরে দীর্ঘকাল মুদিত ছিল সেইগুলি বসন্ত-সমাগমে নানা রঙে রাঙাইয়া উঠে। এত রঙ সে বসন্তের গোপন সঞ্চয়-শালা হইতেই সংগ্রহ করে বলিয়া বসন্ত-সমীরকে কবি যথার্থই নূতন রঙের ভাণ্ডারী বলিয়াছেন। বসন্ত কেবল রঙেই তরুজগৎকে সাজায় না, সে জীবজগৎ প্রাণীজগৎ তরুজগতের বুকে সঞ্চার করে প্রাণরস। শুষ্ক তরু মুকুলিত হয়, নিমীলিত প্রাণ সহসা পুলকে উল্লসিত হইয়া উঠে। দিশাহারা যৌবনকে সেই যেন পরিচালিত করে। তাই সে জীবনরসের রসিক-বন্ধু এবং যৌবনের কাণ্ডারী।

কোথায় ছিলে⋯ সব মঙ্গলই? (দ্বিতীয় স্তবক)

আলোচ্য পংক্তিগুলি প্রকৃতিপ্রেমিক বসন্তমুগ্ধ কবি যতীন্দ্রমোহনের মাধবিকা কবিতার অংশ। এখানে কবি বৎসরান্তে আবির্ভূত সেই চিরপুরাতন বসন্তের নিকট তাহার নিবাস-নিকুঞ্জের ঠিকানা সন্ধান করিয়াছেন।

মাত্র দুই মাসের জন্য ধরার চিত্তকে উতলা করিবার জন্য বসন্তের আবির্ভাব হয়, তারপর দীর্ঘকাল তাহার অদর্শন ঘটে। কিন্তু এবার যখন দক্ষিণ সমুদ্র-পার হইতে কবির প্রিয়বান্ধব বসন্তের আগমন ঘটিয়াছে, তাহাকে চিনিতে কবির বিলম্ব হয় নাই বলিয়া কবি তাঁহার প্রিয় সুহৃদের নিকট তাহার বাসভূমির মঙ্গল-সংবাদ প্রশ্ন করিয়াছেন। বৎসরের অন্য সময় বসন্ত কোথায় বিরাজ করে কবি তাহা জানেন না। কিন্তু তাঁহার অনুমান বসন্ত যেন কোনো সমুদ্রতীরের নারিকেলকুঞ্জে, দক্ষিণদেশস্থ মলয় পর্বতের

প্রান্তবর্তী অরণ্যে বাস করে। সেখানে সর্বদা সতেজ বেতসতরু পল্লবিত হইয়া আছে, সেখানে অরণ্যে এলাচ কেতকী ইত্যাদি বৃক্ষের অভাব নাই কিন্তু সেই বসন্ত-বাসিত নারিকেল-শোভিত এলাচ-কেতকী-বেতস-বীথি-বেষ্টিত পর্বতারণ্যের ঠিকানা কবির নিকট অজ্ঞাত বলিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে কবি তাহার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতেছেন এবং তৎস্থানের তরুলতাপল্লবের মঙ্গল সমাচার বসন্তসমীরের নিকট জানিতে চাহিয়াছেন।

নরনারী তোমার সেই জলভরা? (তৃতীয় স্তবক)

আলোচ্য কবিতাংশ নিসর্গ-সৌন্দর্যপ্রিয় রবীন্দ্রযুগের কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর মাধবিকা নামক কবিতার অন্তর্গত। এখানে বসন্ত-সমাগমে নরনারীর চিত্তে যে চিরকাল ধরিয়া যৌবনের পুলক রোমাঞ্চ ও শিহরণ সঞ্চারিত হয়, প্রশ্নচ্ছলে তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন।

বসন্ত যৌবনের ঋতু, ইহার সমীর-সঞ্চালনে পল্লব-প্রস্ফুটনে নরনারীর জীবনেও আবেশ-মদিরতা ও বিহ্বল বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। আজ বসন্ত-অভ্যুদয়ে সেই যৌবনাবেশ-বিহ্বলতা অব্যাহত আছে কিনা ইহাই ব্যাকুল কণ্ঠে বসন্তের নিকট কবি জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বসন্তের স্পর্শে পুরুষ ও নারীর জীবনে আসে অপূর্ব উন্মাদনা—তখন আমাদের অভ্যস্ত গৃহকর্ম বিশৃঙ্খল হইয়া যায়, সকল কর্মে ভুল হইয়া যায়। যৌবনের আবেশে পুরুষ ও নারীর জীবনে আসে মিলনের আগ্রহ। তাই পরস্পরের এতকালের শূন্য হৃদয়ে অনুরাগের মাধুরী ঝরিতে থাকে, রিক্তচিত্তের শাখায় শাখায় যেন পুষ্প বিকাশ হইতে থাকে। তখন নারীর গৃহকর্মে মন লাগে না। বাহিরের আকর্ষণ তীব্রতর হইয়া উঠে বলিয়া জল ফেলিয়া পুনরায় জল ভরার ছল করিয়া তাহারা অকারণে দীঘির ঘাটে ছুটিয়া যায়। এই বসন্তে যাহাদের প্রিয়জন বিদেশে আছে, সেই প্রোষিতভর্তৃকা রমণী তো বিরহদহনে বিষণ্ণহৃদয়ে বসিয়া থাকে, তাহাদের আঁখিপল্লব অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠে। বসন্তের এই পরিচিত চিত্রগুলি এবং বসন্তকালে মানুষের আবহমান স্বভাবগুলি স্মরণ করিয়া কবি প্রত্যাসন্ন দক্ষিণ-সমীরকে প্রশ্ন করিতেছেন, আজও বসন্ত-সমাগমে নরনারীর সেই স্বভাবগুলি অক্ষুণ্ণ আছে কিনা।

প্রশ্ন ১। যতীন্দ্রমোহনের কবিধর্মের পরিচয় দিয়া মাধবিকা কবিতায় বসন্ত-প্রকৃতির যে রূপচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহার একটি ভাষাচিত্র রচনা কর।

অথবা মাধবিকা কবিতায় কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী বসন্তের প্রতি যে সম্বর্ধনা-লিপি নিবেদন করিয়াছেন তোমার নিজের ভাষায় তাহার পরিচয় দাও।

রবীন্দ্র-কাব্যের সৌর-পরিমণ্ডলে যতীন্দ্রমোহন চন্দ্রের দ্যুতিতে কমনীয়। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-প্রেম ও সৌন্দর্যনিষ্ঠার দান তিনি অঞ্জলি ভরিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আপন অকৃত্রিম কবিস্বভাবে তাহাকেই তিনি নূতন বেশে সাজাইয়াছেন। পল্লীজীবনের রূপচিত্রাঙ্কনে, নারীজীবনের গ্রাম্যসারল্যের অবোধপূর বেদনা আবিষ্কারে বাঙলা কবিতায় তাহার আসনখানি স্বকীয়তায় চিহ্নিত হইয়া আছে। মাধবিকা কবিতায় বাঙলার প্রিয় ঋতু বসন্তের আনন্দ-সঞ্চারী রূপমূর্তি অঙ্কনে তিনি সাফল্য লাভ করিয়াছেন।

বৎসরান্তে দক্ষিণ-সমুদ্র হইতে নারিকেল-বেতস-এলাচ-কেতকীর কুঞ্জবন পরিত্যাগ করিয়া বসন্তের স্নিগ্ধ সমীর আসিয়াছে। কবি তাহাকে চিনিতে ভুল করেন নাই। এই বসন্ত বাতাস বর্ণগন্ধময়, সে শুষ্ক পল্লবে জীবন সঞ্চার করে, অর্ধস্ফুট মুকুলে বর্ণাভা দান করে, মৌমাছিদের সচকিত করে, তৃণশীর্ষে প্রজাপতিকে নিমন্ত্রণ জানায়। সর্বোপরি কর্মব্যস্ত মানব-মানবীর রিক্ত হৃদয়ে সহসা নবযৌবনের আবেশ-মধুর চঞ্চলতা সৃষ্টি করিয়া সে মিলনের আগ্রহ জাগাইয়া দেয়, পথিকবধূর বিরহী আঁখিপল্লব সিক্ত করিয়া তোলে। তাহার স্নিগ্ধ স্পর্শ, কমকণ্ঠের ধ্বনিগীত, পুরাতন ভঙ্গিমাটি কবি ভুল করেন নাই। আজও জীবজগতে প্রাণীসমাজে নিসর্গলোকে বসন্তের আগমনে সেইরূপ চঞ্চলতার আবির্ভাব ঘটে কিনা, বসন্ত-সমীরের নিকট কবি ব্যগ্রকণ্ঠে সেই প্রশ্ন জানাইয়াছেন।

বসন্ত তাই কবির নর্মসহচর, তাহার প্রিয় সুহৃদ, দীর্ঘকালের পরিচিত ঋতু। বৎসরের অদর্শনের পর সেই বসন্তের আগমনে কবি আকুল হৃদয়ে তাঁহার পরিচিত বন্ধুর প্রত্যুদ্গমন করিয়াছেন। বিহ্বল উন্মাদনায়, জীবন-স্পন্দনে ও রক্তের চাঞ্চল্যে কবি স্বয়ং আবিষ্ট হইয়াছেন—আকুল আগ্রহে তাই বসন্তের সম্বর্ধনা করিয়াছেন। এতকাল বুঝি তাঁহার প্রিয় বন্ধু কোন্ দূর সমুদ্রতীরবর্তী মলয়পর্বতের নির্জননিকুঞ্জে অবস্থান করিতেছিল—সেইখানের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—সেখানকার পরিচিত লতাপল্লব, তরুগুলির কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

বসন্ত কেবল কবিরই বন্ধু নয়, প্রকৃতি ও মানবের অন্তরঙ্গ সখা। তাই বসন্ত-আবির্ভাবে তাহার অভ্যর্থনায় কোথাও কোনো ত্রুটি ঘটিয়াছে কিনা ইহাও কবির ব্যগ্র জিজ্ঞাসা। মানব-মানবীর জীবনে এখনো বসন্ত-স্পর্শে যে ব্যাকুলতার সৃষ্টি হয়, আশোক বঙ্গনের ফুল্ল শাখায় তরুণীরা দোল খাইতে আসে, বিহঙ্গ অরণ্যে কলগীত করে, তৃণশীর্ষে পতঙ্গ ধাইয়া আসে, ইহা জানিতে পারিয়া, তাঁহার বন্ধুর অভ্যর্থনায় ত্রুটি ঘটে নাই বলিয়া তিনি পরম তৃপ্তি আনন্দ ও পুলক অনুভব করিয়াছেন। বসন্তের প্রাণরসে তিনি সঞ্জীবিত হইয়া তাই তাঁহার প্রিয়বান্ধবের করপুটে কবির বিমুগ্ধ হৃদয়ের অঞ্জলি নিবেদন করিয়াছেন—পুনর্বার অদর্শনের পূর্বে ইহাই হোক কবির অনুরাগ সখ্যের অর্ঘ্য।

কবর-ই-নূরজাহান : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ভূমিকা

জ্ঞানতাপস, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের শব্দবর্ণস্পর্শ-সচেতন কবি সত্যেন্দ্রনাথ আপন সীমানার মধ্যে ছিলেন একচ্ছত্রাধিপতি কবি। মুখ্যত ছন্দের উপর তাঁহার কৃতিত্ব তাঁহার কাব্যের বিষয়বস্তুর প্রতি পাঠকের মনোযোগ ক্ষীয়মাণ করিয়া তুলিলেও সত্যেন্দ্রকাব্যের বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও অবহেলার নয়। একদিকে যেমন বাঙলা দেশের দৃশ্যনিসর্গ ইতিহাস-ভূগোল-জীবনযাত্রার তিনি রূপকার ছিলেন, অন্যদিকে সমগ্র ভারতের অতীত-ইতিহাস-পুরাণ-শাস্ত্রের উপকরণকেও কাব্যচ্ছন্দে গ্রথিত করিয়াছিলেন। বিসদৃশ বস্তুর মধ্যে উদ্ভট খেয়ালি-কল্পনার সূত্রে তিনি এক শিশুসুলভ সৌষম্য আবিষ্কার করিয়া পুলকানুভব করিতেন, আবার অন্যদিকে যাহা কিছু আমাদের জ্ঞানের অধিকারসামগ্রী, যাহা বুদ্ধিগ্রাহ্য, যাহা হৃদয়মস্তিষ্কের অর্জনীয়, তাহার প্রতিও তাঁহার আগ্রহ কম ছিল না। ইহার ফলে সত্যেন্দ্রনাথের কবিধর্মে একটি বৈপরীত্য দেখা যায়—একদিকে 'আমরা' কবিতায় বাঙালীত্বের সুলভ সাম্প্রদায়িক

সত্যেন্দ্রনাথের কবিধর্ম

বৈপরীত্যস্বভাব

গর্বে তিনি উত্তেজিত, অন্যদিকে জাতিভেদবিরহিত মনুষ্যগৌরবে তিনি উদারনৈতিক। একদিকে স্থির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বুদ্ধিগম্য ক্লাসিকাল কল্পনা, অন্যদিকে শিশুসুলভ কল্পনার রোমান্টিক মায়াকুহেলি সৃজন। একদিকে মহাসরস্বতী, অন্যদিকে নীলপরী-লালপরীর চলচঞ্চল-চরণের নূপুরনিক্বণ। সাময়িকতার প্রতি তাঁহার লোভ ছিল, বস্তুভেদী কল্পনা অপেক্ষা তথ্যচয়নের প্রতি তাঁহার নিরতিশয় আগ্রহ ছিল। এইজন্য সতর্ক অনুসন্ধিৎসায় তিনি কোনো বিষয়ের নাড়িনক্ষত্রের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া কবিতায় উপচিত করিয়াছেন। হয়ত ইহার দ্বারা রচিত কবিতায় গভীরতার হানি ঘটিয়াছে, হয়ত তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তথ্যপুঞ্জ হইয়া ছাত্রপাঠ্য কবিতায় পরিণত হইয়াছে—তথাপি বস্তুনিষ্ঠা, সত্যচয়নের আগ্রহ, ইতিহাস-চেতনা প্রভৃতি গুণগুলির দ্বারা সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রকবিখ্যাতির পার্শ্বে একটি নিজস্ব বিশিষ্টতা ও মৌলিকতার স্বাক্ষর রাখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ ভক্তদের তিনি শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যের ভাবাদর্শ ও কাব্যরূপ তিনি নির্বিচারে অনুকরণ করেন নাই। তাঁহার জীবন দীর্ঘায়ু ছিল না, সুতরাং তাঁহার কাব্যের পরিণাম-সম্ভাব্যতা আমাদের আলোচনার বহির্ভূত, কিন্তু আপন ক্ষমতায় তিনি 'বঙ্গ-ভারতীর তন্ত্রীপরে একটি অপূর্ব তন্ত্র' পরাইয়াছেন। তাঁহার ছন্দোকুশলতা বস্তুত অননুকরণীয়—বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষায় স্তবকবন্ধে পর্বচরণের বৈচিত্র্যে মিলে-চঙে ছন্দকে তিনি রীতিমত একটি সজ্ঞামান বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছেন। দেশবিদেশের নানা ভাষার কবিতায় বাহ্যিক ধ্বনিরূপকে বুদ্ধি ও শ্রুতির অনুগামী করিয়া বাঙলা কবিতায় প্রয়োগ করিবার দুঃসাহস দেখাইয়াছেন, বিবিধ সংস্কৃত ছন্দের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার আর একটি কৃতিত্ব পৃথিবীর নানা ভাষার নানা মেজাজের কবিতার অনুবাদ করিয়া বাঙলা অনুবাদ-কবিতার গৌরব অপরিমেয় বর্ধিত করিয়াছেন। পরিহাসমূলক রঙ্গব্যঙ্গ কবিতা ও প্যারডি রচনাতেও তাঁহার দক্ষতা প্রমাণিত হইয়াছে। গদ্য প্রবন্ধ এবং উপন্যাস রচনাতেও তিনি অগ্রণী হইয়াছিলেন, তবে এই দুই ক্ষেত্রে তাঁহার সাফল্য প্রমাণিত হয় নাই।

তথ্যনিষ্ঠা

মৌলিকতা

ছন্দের ক্ষেত্রে

অনুবাদ-কুশলতা

প্যারডি

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যের আর একটি প্রধান গুণ, বাঙলা ভাষার নিজস্ব ধ্বনি ও অর্থকে কবিতার অন্যতম শক্তিরূপে প্রয়োগ করা, যে কারণে মোহিতলাল তাঁহাকে 'বাঙলা বুলির বুলবুলি' বলিয়াছেন। ছড়ার ছন্দ অতি স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা, চলিত গ্রাম্য দেশি শব্দ সার্থকভাবে প্রয়োগ করা তাঁহার স্বভাব ছিল এবং অন্যান্য ভাষার শব্দ ব্যবহারেও তিনি নূতন ধ্বনি-সৃষ্টির দিকে নজর দিতেন। প্রথম শ্রেণীর কবি না হইয়াও, একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত সত্যেন্দ্রনাথই সমসাময়িক ও পরবর্তী কবিদের উপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। তাঁহার উল্লেখযোগ্য কাব্যগুলির মধ্যে বেণু ও বীণা, ফুলের ফসল, কুহু ও কেকা, অভ্রআবীর, বেলাশেষের গান, বিদায়-আরতি, হসন্তিকা, হোমশিখা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য, তীর্থসলিল এবং তীর্থরেণু অনুবাদ কবিতার সংকলন। কবর-ই-নূরজাহান কবিতা অভ্রআবীর কাব্য হইতে কিছু পরিমাণে বর্জিত হইয়া মাধুকরীতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

ভাষা ও শব্দ

পরবর্তীদের উপর প্রভাব

কাব্যগ্রন্থ

ভাবার্থ

জাহাঙ্গীরের সমাধিপার্শ্বে নীরবে নিদ্রিতা, একদা ভারত-ইতিহাসের ভাগ্য-বিধাত্রী নূরজাহানের সমাধির উপর সম্রাজ্ঞীর স্বরচিত দুই ছত্র কবিতা দেখিতে দেখিতে কবির চোখের সম্মুখে নূরজাহানের জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলী চলচ্চিত্রের মত ভাসিয়া উঠিয়াছে। একদা জগৎ-আলো নূরজাহানের সমাধির উপর আজ রাত্রির অন্ধকারে কেবল জোনাকির ক্ষীণ আলোর কণিকা। ইরান দেশের গোলাপসদৃশ যে ভুবনবিজয়ী রূপের কথা শুনিয়া কবি তাঁহাকে বঙ্গদেশ হইতে দেখিতে আসিয়াছেন, সে রূপ আজ কবরের বোরকায় আবৃত। বিশ্বজয়ী জাহাঙ্গীরের জগৎ আজ অন্ধকার বলিয়া কবি তাঁহাকে আবার সেই অতুলনীয় রূপ ধারণ করিয়া পুনরুজ্জীবিত হইবার অনুরোধ করিয়াছেন। (১ম স্তবক)

নূরজাহানের ভাগ্যপরিবর্তনের হেতু ছিল রূপ। এই রূপ নূরজাহানের জীবন ঘিরিয়া একবারই বিকশিত হইয়াছিল। নিত্য গোলাপবাগে বুলবুলি যে রূপসন্ধান করে ইহা তদপেক্ষা বেশি। এই রূপের জন্যই সংসারে নিত্য বহু

অন্যায় সংঘটিত হইতেছে, অথচ খনিজ স্বর্ণের ন্যায় যথার্থ রূপ প্রাত্যহিক ভোগ্যপণ্য নয় (২য় স্তবক)। নূরজাহানের জীবনকাহিনী রোমাঞ্চকর। শুষ্ক মরুভূমির সর্পাচ্ছন্ন আস্তানায় ভূমিষ্ঠ নূরজাহানকে গরীব পিতামাতা প্রচণ্ড দারিদ্র্য সত্ত্বেও স্নেহবশত তথায় পরিত্যাগ করিয়া আসিতে পারেন নাই। মরুভূমির আশীর্বাদস্বরূপ এই মরুকন্যার জীবনে পরবর্তীকালে তপ্ত বালুকার ন্যায় মানুষের কামনার অগ্নিশিখা দেখা দিয়াছে। ধীরে ধীরে মেহেরউন্নিসার জীবনে ঋতুর পর্যায়ক্রমের সহিত যৌবনলাবণ্য উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিয়াছে, কৈশোরে-দেখা সেই যৌবন লাবণ্যের স্মৃতি বাদশাহ হইবার পর সেলিম ভুলিতে পারেন নাই। জীবনে যিনি ন্যায়পরায়ণ ছিলেন, তিনি রূপমোহে সকল ধর্মনীতি ভুলিয়া ষড়যন্ত্রের দ্বারা মেহেরউন্নিসার স্বামী সরলচিত্ত সিংহতেজা বীর শের আফগানকে হত্যা করিবার জন্য সুবাদার কুতুবউদ্দীনকে প্রেরণ করেন। শের আফগানের দ্বারা উচ্চাভিলাষী সেই সুবাদার নিহত হইলেও পরিণামে শের-আফগানও মৃত্যুবরণ করিলেন—এখনও তাঁহাদের দুইজনের সমাধি পাশাপাশি বর্তমান। বর্ধমানের গৈরিক মাটি জাহাঙ্গীরের কৃতকর্মের লজ্জায় ও রক্তে রক্তিমতর হইয়াছে (৩য় ৪র্থ স্তবক)। সেদিন সপ্ত-সমুদ্র-উন্মথিত সহস্র মোতির হারে যুবরাজ সেলিম মেহেরউন্নিসাকে বরণ করিলেন অন্দরমহলে এবং অচিরেই নবপরিণীতা মেহের বুদ্ধিবলে সেলিমকে বশ করিয়া স্বয়ং সাম্রাজ্যচালনা করিতে লাগিলেন। চিত্তের অনির্বাপ্য উদ্দীপনায় মেহের দরবার ও অন্দরের মধ্যে অবরোধ মোচন করিয়া প্রকাশ্যে শাসনভার গ্রহণ করিলেন, রূপমুগ্ধ জাহাঙ্গীর নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িলেন। নূরজাহানের পিতা মন্ত্রীপদ লাভ করিলেন, ভ্রাতা যোদ্ধা-কবি আসফ খাঁ সম্রাজ্ঞীর ইচ্ছায় হইলেন সেনানায়ক। নূরজাহানের এই শাসনপর্ব রাজ্যে শৃঙ্খলাস্থাপনে শিল্পকলা-প্রচারে পণ্যোৎপাদনে ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছে। নূরজাহান স্বয়ং নানা প্রসাধন-শিল্প এবং আতর আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কর্মোৎসাহিনী নূরজাহান জাহাঙ্গীরের পাঞ্জা লইয়াই নারী-বাদশাহী চালনা করেন (৫ম স্তবক)। পুরাতন ইতিহাসের এই দিনগুলির কথা স্মরণ করিয়া লাহোরের শহরতলীর জীর্ণ কাঁটাঝোপ-জঙ্গলের আড়ালে অবহেলিত সমাধিপার্শ্বে সন্নিহিতা রূপসী-শ্রেষ্ঠা নূরজাহানের বীতরূপ গতসৌন্দর্য পরিণতির কথা কবি চিন্তা করিতেছেন। অদূরে সম্রাট

জাহাঙ্গীরের সমাধি, যাহা জীবিতকালে নূরজাহানেরই চেষ্টায় রত্নভূষিত, সমুজ্জ্বল। কিন্তু দরিদ্র পিতামাতার দরিদ্র কন্যারূপে জাত নূরজাহান জীবনে অতুল ঐশ্বর্যশালিনী হইয়াও আজ মৃত্যুর পর অনুরূপ নিঃসঙ্গ দারিদ্র্যে মৃৎপালঙ্কে চিরশায়িতা। চিরসঙ্গিনী নূরজাহানকে আজ সেলিম ডাকেন না। জীবৎকালের সূক্ষ্ম কারুকার্যখচিত গদির বদলে আজ নূরজাহানের বক্ষে মস্তকে সর্বত্রই প্রস্তর, বিস্মরণী লতা ও মাটির বন্ধনে তিনি নিদ্রাভিভূতা—তাঁহার সমাধিমৃত্তিকাই যেন রূপের পবিত্র চন্দন, দেহের মাটি স্বামী-প্রেমের সিন্দূর-সদৃশ, তাহার জীর্ণ শ্রীহীন কবর যেন বিশ্বনারীর সৌন্দর্যদুর্গ। (৬ষ্ঠ স্তবক)।

নূরজাহানের সমাধিভিত্তির উপর সম্রাজ্ঞীরচিত যে শ্লোক উৎকীর্ণ আছে তাহার অকপট কারুণ্যে কবি বিস্মিত ও বেদনার্ত হইয়াছেন। নূরজাহান লিখিয়াছেন যেন তাহার দরিদ্র কবরে কেহ দীপ জ্বালাইয়া অথবা ফুল দিয়া নিরুপদ্রব শ্যামা পোকাকে পুড়াইয়া না মারে, অথবা বুলবুলিদের বিরক্ত না করে। বস্তুতঃ আজ নূরজাহানের কবর দীপহীন, অযত্নবর্ধিত জঙ্গলে আচ্ছন্ন। নিরলংকৃত নিঃস্ব অবহেলিত হইয়া নূরজাহানের নরদেহ কালের ধূসর ধূলায় মিশিয়া গেলেও নূরজাহানের স্মৃতি সহজে মুছিবে না। একটি কল্পিত রূপস্বর্গে রূপশ্রেষ্ঠা নূরজাহান চির-নূতন হইয়া থাকিবেন, তাহার নামটি ঘিরিয়া সেখানে ফুল ফুটিবে, অনুরাগের প্রদীপ জ্বলিবে অনির্বাণ দীপ্তিতে, চিত্তলোকে সকল-কালে চলিবে তাঁহার পূজা। কারণ নূরজাহান কেবল মোগলযুগের তিলোত্তমাই ছিলেন না, তিনি সর্বকালের রূপবতী (৭ম স্তবক)।

আলোচনা

কবর-ই-নূরজাহান সত্যেন্দ্রনাথের অন্যতম জনপ্রিয় কবিতা এবং ইহা সত্যেন্দ্র-প্রতিভার প্রতিনিধিমূলক কবিতাও বটে। কবিতাটি দীর্ঘ, এখানে অংশত সংকলিত হইয়া অবশ্য অর্থহানি করে নাই, প্রত্যুত সংহত হইয়াছে। এই জাতীয় কবিতাকে 'ওড' বলা যায়, কোনো মৌলিক কল্পনা বা উদ্ভাবনী শক্তি এই কবিতার পশ্চাতে নাই। নূরজাহানের কবর দেখিয়া, সমাধিপৃষ্ঠে উৎকীর্ণ লিপি পাঠ করিয়া কবির মনে যে প্রতিক্রিয়া হইয়াছে তাহারই ছন্দোবদ্ধ রূপ এই কবিতা। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নয়—সেই উপলক্ষে সত্যেন্দ্রনাথ ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে নূরজাহানের

ওড জাতীয় কবিতা

জীবৎকাহিনী সম্পূর্ণ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং সেই সংগৃহীত তথ্য ধীরে ধীরে অভিজ্ঞ ঐতিহাসিকের ন্যায় পেশ করিয়াছেন। এই তথ্যচয়নের লুব্ধ আতিশয্যই সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার যুগপৎ দোষগুণ। এই তথ্যচয়নেই তাঁহার মৌলিকতা আর এই মৌলিকতার গুণে শেষ পর্যন্ত তাঁহার কবিতা ছাত্রপাঠ্য কবিতা হইয়া উঠিয়াছে।

তথ্যচয়নের আতিশয্য

কবর-ই-নূরজাহান কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ নূরজাহানের কবরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সন্ধ্যানিশার ঘনায়িত অন্ধকারে জোনাক-পোকায় স্পন্দমান মুহূর্তে অতীত যুগের পৃষ্ঠাগুলি এক এক করিয়া মেলিয়া ধরিয়াছেন। মোগল যুগের বিলাস-ব্যসন ঐশ্বর্যসমারোহ সম্পদশালিতা ও শাসনাধিকারের অধিনেত্রী আজ লুপ্ত-গৌরব সমাধির দীন মৃত্তিকায় অবহেলিত হইয়া পড়িয়া আছে। কবি অতীত ইতিহাসের মধ্যে সতর্ক পদচারণা করিয়া সেই পুরাতন ধূসর স্মৃতির হারানো রত্ন-কণিকা উদ্ধার করিয়াছেন। বর্তমান হইতে অতীতে অবগাহন করিবার জন্য কবিতা-রচনার পরিবেশটিকে সন্ধ্যার অন্ধকারে 'মণ্ডিত' করিতে হইয়াছে—ইহাতে কবিতাটি সূচনা হইতেই রসঘন হইয়া উঠিয়াছে। একদা যিনি জগৎ-আলো এই সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার সমাধির উপর আজ দীপালোকটুকু পর্যন্ত পড়ে না;—সন্ধ্যারাতের অন্ধকার কেবল ম্লান জোনাকির আলোয় স্পন্দমান হইয়া উঠিয়াছে। ইতিহাসের দ্বারোদ্ঘাটন করিবার এই ভঙ্গিটি বস্তুসর্বস্ব কবির পক্ষে কল্পনাশক্তিরই পরিচয় দেয়।

কবিতার সার্থক পরিবেশ

নূরজাহানের রোমাঞ্চকর জীবনের প্রতি কবির দৃষ্টি কেবল ঘটনাবৈচিত্র্যের সন্ধান করে নাই, নূরজাহানের জীবনের মূল ঘটনাগুলি হইতে কবি চরিত্রের মূল প্রাধান্যটি উদ্ধার করিয়াছেন। রূপই ছিল নূরজাহানের ভাগ্যপরিবর্তন ও ভাগ্যবিপর্যয়ের পরশমণি, এই অতুলনীয় রূপের প্রভাবেই সামান্য দরিদ্র অবস্থা হইতে মেহেরউন্নিসা ভারত-ভাগ্যবিধাত্রী হইয়াছিলেন। এই রূপের অসামান্য আলোকচ্ছটার প্রতি কবির ইঙ্গিত কবিতাটিকে নিছক তথ্যচয়নের অতিরেক হইতে বাঁচাইয়া দিয়াছে। অথচ সেই রূপশ্রেষ্ঠা সুন্দরীর জীর্ণ কবরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কবি রূপের পরিণামের যে ভগ্নচিত্র দর্শন করিয়াছেন, তাহা নিয়তির এক অমোঘ উদাহরণরূপে পাঠকের মন বেদনায় বিষণ্ণ করিয়া তোলে—এইখানেই কবিতাটির সার্থকতা।

কবিতার রূপের স্বরূপ

রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ

[১ম স্তবক] **জগৎ আলো নূরজাহান**—অনবদ্যা সুন্দরী নূরজাহান ছিলেন বিশ্বের আলোক-স্বরূপ, ইহাই কবির বাচ্যার্থ। কিন্তু ইহার গভীর তাৎপর্য আছে। নূরজাহানের পূর্বনাম ছিল মেহেরউন্নিসা, বিবাহের পর জাহাঙ্গীর প্রথমে তাঁহার নাম রাখেন নূরমহল—প্রাসাদের আলো, পরে নূরজাহান—জগতের আলো। [জাহাঙ্গীরের পূর্বনাম ছিল সেলিম, অভিষেকের পর নাম হয় নূরউদ্দিন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ গাজী। "নূর অর্থাৎ আলো, আলো ছিল জাহাঙ্গীরের প্রিয়। স্বয়ং জাহাঙ্গীরের নাম নূরউদ্দিন (ধর্মের আলো), তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর নাম হইল নূরজাহান। তাঁহার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান মুদ্রার নাম নূর-ই-জালালী"—ডঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী : ভারতবর্ষের ইতিহাস]। **সন্ধ্যারাতের··স্পন্দমান**—কবি যখন সুদূর লাহোরে নূরজাহানের সমাধিপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন দিবসের আলো নিষ্প্রভ হইয়া গেছে, ধীরে ধীরে আসন্ন রাত্রির ঘনায়মান অন্ধকারে সহস্র জোনাকির ম্লান আলোক দীপ্তি পাইতেছে। সেই জোনাক-পোকার মৃদু আলোক-পুঞ্জে রাত্রির অন্ধকার যেন কাঁপিয়া উঠিতেছে। **মরুভূমির গোলাপ ফুল**—মেহেরউন্নিসা প্রকৃতপক্ষে মরুকন্যা, তাঁহার রূপের সহিত মরুভূমির দেশের গোলাপফুলেরই তুলনা চলে। **ইরান দেশের শকুন্তলা**—মেহেরউন্নিসার পিতা ছিলেন ইরানীয় (পারসিক), কবি তাহাকে কালিদাসের কাব্যের উর্বশীর গর্ভজাত আশ্রমকন্যা রূপসী শকুন্তলার সহিত তুলনা করিয়াছেন। শকুন্তলাও আশ্রমবাসিনী তাপসিনী ছিলেন—তাঁহার অনুপম রূপসৌন্দর্যেও জগৎপতি দুষ্মন্ত আকৃষ্ট হন ও শকুন্তলাকে বিবাহ করেন। **কই সে তোমার রূপ অতুল**—যে রূপের জন্য নূরজাহান ইতিহাসে বিস্ময় হইয়া আছেন, তাঁহার সমাধিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া কবি কল্পনানেত্রে সেই ভুবনে তুলনাহীন রূপ প্রত্যক্ষ করিবার ইচ্ছা জানাইয়াছেন। **পাষাণ কবর-বোরকা খোলো**—আজ নূরজাহানের দেহ সমাহিত, পাষাণরূপ অবগুণ্ঠন তাঁহাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। কবি সেই গুণ্ঠন মোচন করিয়া নূরজাহানের রূপসৌন্দর্য দেখিতে চান। মুসলমান নারীগণ অসূর্যম্পশ্যা বলিয়া সর্বাঙ্গ ও বিশেষত মুখমণ্ডল যে বস্ত্রের দ্বারা সর্বসম্মুখে আবৃত রাখেন তাহার

নাম বোরকা বা বোরখা। মোগল-সম্রাজ্ঞীর সাম্প্রতিক বোরকা যেন সমাধির প্রস্তর। **দাঁড়াও রূপ ধরি** সৌন্দর্য সম্বল করিয়া নূরজাহান প্রথমে সেলিমকে, পরে ভারত-সাম্রাজ্য জয় করিয়াছিলেন বলিয়া এই রূপ-সৌন্দর্যকে কবি নূরজাহানের বিজয়-পতাকা বলিয়াছেন। সেই বিশ্বজয়ী রূপের বিজয়-পতাকা উড়াইয়া নূরজাহান আবার সমাধি হইতে জাগিয়া উঠুন। **জগৎ-জেতা ··অন্ধকার**—আকবরের তুলনায় জাহাঙ্গীরের আমলে মোগল শাসন বহু বিস্তৃত হয়, তাছাড়া তিনি মেবার আহম্মদনগর জয় করেন, দুর্জয় কাঙড়া দুর্গ তাঁহার অধিকারে আসে এবং কান্দাহারও জয় করেন। এই রাজ্যাধিকারের জন্যই জাহাঙ্গীরকে কবি জগৎ-জেতা বলিয়াছেন। তাহা ছাড়া বিশ্বসুন্দরীশ্রেষ্ঠা মেহেরউন্নিসাকে লাভ করাও এক অর্থে বিশ্বজয়। কিন্তু আজ নূরজাহানের মৃত্যুতে সেই সকল বিজয়গৌরব ম্লান নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে, ইহাই কবির অভিপ্রেত। জগতের আলো নিভিয়া গেলে বিজিত জগৎও অন্ধকার হইয়া পড়ে। **জাগো তুমি, দিক আবার**—জগতের পরীতুল্য রূপ যাহার সেই নূরজাহান ইতিহাসের প্রদোষ হইতে জাগ্রত হইয়া জগৎকে আর একবার রূপমুগ্ধ করুন, কবির ইহাই প্রার্থনা।

[২য় স্তবক] **রূপের গোলাপ ·· হাসে গো**—বুলবুলি গোলাপ-বাগিচায় বিহার করিতে ভালোবাসে। কিন্তু প্রকৃত মনোমোহন রূপময় গোলাপ প্রত্যহ প্রস্ফুটিত হয় না বলিয়া বুলবুলি গোলাপ ফুটিলেই সমবেত হইয়া তাহাতে মুখ সংলগ্ন করে। এখানে গোলাপ অর্থে নূরজাহান এবং বুলবুলি অর্থে নূরজাহানের কবরক্ষেত্রে বিহঙ্গকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। নূরজাহান স্বয়ং তাঁহার কবরে দীপ জ্বালাইতে ও ফুল দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, কারণ এখানে বুলবুলি পাখি কেবল নূরজাহানরূপ গোলাপের সৌন্দর্যেই আবিষ্ট থাকিবে। **তুচ্ছ রূপার বদরীতি ?**—রূপা অর্থাৎ রৌপ্যমুদ্রা তথা অর্থের জন্য সংসারে মানুষ নিকৃষ্ট নানাপ্রকার অন্যায় অসততা ও কুকর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। নূরজাহানের রূপমোহে যুবরাজ সেলিম উন্মত্ত হইয়া নানা ষড়যন্ত্রের ফলে তাঁহাকে লাভ করেন—ইহাও এমন কিছু অন্যায় বলিয়া কবি মনে করেন না। কারণ রূপা অপেক্ষা রূপ উৎকৃষ্ট। **খনির সোনা··· পোদ্দারে**—নারীর অনবদ্য রূপলাবণ্য স্বর্গীয় সম্পদ, তাহা পার্থিব ধনরত্ন খনিজ সোনা ইত্যাদির সহিত তুলনীয় নয়। খনিজ স্বর্ণ পণ্যদ্রব্য, তাহা

ব্যবসায় স্থানে নিত্য বিক্রীত হয়। ব্যবসায়ী তাহা ক্রয়-বিক্রয় করে। কিন্তু নৈসর্গিক রূপ নারীর যৌবনসৌন্দর্য পণ্য দ্রব্য নয়, তাহা নিত্যসুলভ নয়। নূর-জাহানের রূপকে কবি মুদ্রা বা পার্থিব ধনরত্ন স্বর্ণের চেয়ে উৎকৃষ্ট বলিয়াছেন।

[তৃতীয় স্তবক] **মরুভূমির আস্তানা**—পারস্য হইতে ভারতবর্ষে আগমন কালে কান্দাহারের মরুভূমির সর্পসংকুল দরিদ্র বিশ্রামস্থলে দরিদ্র পিতার গর্বের সম্পদ হইয়া নূরজাহানের জন্ম হয়। [মুতামীদ খানের ইকবাল-নামা-ই-জাহাঙ্গীরী-র মতে, মেহেরউন্নিসা পারস্যত্যাগী পারসিক মির্জা ঘিয়াস বেগের কন্যা, তাহার জন্ম কান্দাহারের পথে মরুভূমিতে, আকবরের রাজত্বকালে। দরিদ্র পিতামাতা প্রথমে মেহেরকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতে মনস্থ করেন পরে ঘিয়াস বেগ কন্যাকে সঙ্গে লইয়াই ভারতে আসেন। মেহের-উন্নিসার শৈশব কাটে আগ্রা নগরীতে]। **তোমায় ফেলে দণ্ড বই**—পিতামাতা কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়াই পলায়নের উদ্যোগ করিয়াছিলেন, পরে নবজাত কন্যাকে সঙ্গে লইয়াই ভারতে যাত্রা করেন। দারিদ্র্যই এই সিদ্ধান্ত-গ্রহণের কারণ ছিল। কবি বলিতে চাহিতেছেন, সদ্যোজাত কন্যার রূপ-মাধুরী তখন হইতেই দৈন্য দারিদ্র্য অপেক্ষা বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। **জয়ী হল বুকের ধন**—রূপবতী শিশুকন্যার প্রতি স্নেহবশত দারিদ্র্য চিন্তা উপেক্ষা করিয়া পিতামাতা শিশুকন্যাকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন। মাতার অশ্রু পিতার স্নেহ আবার পরিত্যক্ত কন্যাকে কুড়াইয়া লইল। **মরুভূমির মেহেরবাণী**—মেহেরউন্নিসার নামের সহিত ধ্বনিসাম্য লক্ষ্য করিয়া কবি তাহাকে মরুভূমির আশীর্বাণী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। **তোমায় ঘিরে দিন নিশা**—মরুভূমির তপ্ত বালুকার বুকে মেহেরউন্নিসার জন্ম, ভবিষ্যৎ জীবনেও যেন ইহা কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। যুবরাজ সেলিম তাহাকে কৈশোরে দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তারপর সেই রূপমুগ্ধতাই তাহাকে পরবর্তীকালে অর্থাৎ সম্রাট হইবার পর মেহেরের স্বামী শের আফগানকে হত্যা করাইয়া মেহেরউন্নিসাকে অধিকার করিতে প্ররোচিত করিয়াছিল। পুরুষের তপ্ত রূপ-তৃষ্ণা মেহেরের জন্মকালের উত্তপ্ত তৃষ্ণার্ত মরুবালির মতই যেন মেহেরের উত্তর-যৌবনে কার্যকরী হইয়াছিল। [ওলন্দাজ ভ্রমণকারী দ্য লায়েৎ বলেন, মেহের কৈশোরে শাহজাদা সেলিমের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। "যৌবনে সেলিম অত্যন্ত সুরাসক্ত হইয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক বহু দোষ তাহার

চরিত্রে পরিস্ফুট হইল। ইতোমধ্যে মির্জা ঘিয়াসের সুন্দরী কন্যা মেহের-উন্নিসার প্রতি আসক্তির ইঙ্গিতও আকবরকে বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল"—ডঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী]।

[চতুর্থ স্তবক] **দিনের পরে ··ভুলল না**—মেহেরউন্নিসার কৈশোরে যুবরাজ সেলিম তাঁহার রূপে উন্মত্ত হইয়াছিলেন, যৌবনে বাদশাহ হইয়াও তাঁহাকে তিনি বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, মেহেরকে লাভ করিবার জন্যই তিনি তাঁহার স্বামী শের আফগানকে হত্যা করাইয়াছিলেন। মেহেরকে প্রথম দেখিবার অনেক বর্ষ পর এই ঘটনা সংঘটিত হয়—ইতিমধ্যে বহু দিবস অতিক্রান্ত হইয়াছে, বহু ঋতু ফুল ফুটাইয়াছে। । It is sometimes said that Jahangir had been in love with Mihr-un-nisa "when she was still a maiden, during the life-time of Akbar", and that his infatuation for her cost Sher Afghan his life যুবরাজ সেলিমের রাজ্যাভিষেক হয় ১৬০৪ খ্রীস্টাব্দে এবং মেহেরউন্নিসাকে তিনি বিবাহ করেন ১৬১১ খ্রীস্টাব্দে। রাজ্যাভিষেকের পূর্বে মেহেরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকিলে ইহা স্বাভাবিকভাবেই প্রমাণিত হয়, জাহাঙ্গীর এতকাল মেহেরকে ভুলিতে পারেন নাই। সম্ভবত মেহেরকে স্মরণ রাখিয়াই জাহাঙ্গীর তাঁহার পিতা এবং স্বামীকে উচ্চপদে বসাইয়াছিলেন। পূর্বোক্ত ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, She was married, at the age of 17, to Ali Qali Beg Istajhi, another Persian adventurer, who in the begining of Jahangir's reign received the Jagir of Burdwan in Bengal and the title of Sher-Afghan- Dr. R. C Mazumder: An Advanced History of India]। **অন্যায়ের ·কি বন্যায়**—জাহাঙ্গীর বাদশাহ হইবার পর ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া সুবিখ্যাত হইয়াছিলেন। কিন্তু মেহেরউন্নিসাকে লাভ করিবার জন্য হীন ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন। যিনি অন্যায়ের চিরকাল শত্রু ছিলেন, তিনি রূপমোহের প্রভাবে ধর্ম ও নীতি বিসর্জন দিলেন! **কুচক্রে তার ·শের আফগান**---যৌবনে একটি সিংহকে স্বহস্তে বধ করিয়া নূরজাহানের স্বামী আলি কুলি বেগ শের-আফঘান উপাধি লাভ করিয়া-

ছিলেন। ঐতিহাসিকদের মতে তিনি শুধু বীরই ছিলেন না, পরন্তু সরলহৃদয় উদার পাঠান ছিলেন। জাহাঙ্গীরের ষড়যন্ত্রেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। **সেলিমের …অসি-সংঘাতে**—সেলিমের অন্তরঙ্গ পার্শ্বচর, তাঁহার ধাত্রীপুত্র, বঙ্গদেশের সুবাদার কুতুবউদ্দিনকে সেলিম শের আফগানের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। কুতুবউদ্দিন সম্ভবত কোনো উচ্চতর সুবাদারির লোভে এই কার্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহার তৃষ্ণা অচরিতার্থই থাকিয়া যায়, কারণ শের আফঘানের হাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। পরে তাঁহার অনুচরদের দ্বারা শের আফঘান নিহত হন। [শের-আফঘানের মৃত্যু জাহাঙ্গীরের ষড়যন্ত্র অথবা দুর্ঘটনা কিনা এই বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। অনেকে বলেন, When Jahangir heard that Sher Afghan had grown "insubordinate and disposed to rebellions," he sent in A. D. 1607 his foster-brother, Qutb ud-din, the new governor of Bengal, who was to the Emperor "in the place of a dear son, a kind brother, and congenial friend", to chastise him. An affray took place between Sher-Afghan and Qutb-ud-din at Burdwan, in course of which the latter was killed. Sher-Aghan was in his turn, hacked to pieces by the followers of Qutb-ud-din, and Mihr-un-nisa was taken to the court with her young daughter.—An Advanced History of India. ডঃ বেণীপ্রসাদ এই মৃত্যুর জন্য জাহাঙ্গীরকে অপরাধী মনে করেন না।] **তেজস্বী …আজ**—সিংহতেজা বীর শের-আফঘানও আজ নাই, তাহাকে হত্যা করিতে আসিয়াছিল যে হীন ষড়যন্ত্রকারী কুতুব সেও আজ নাই। উভয়েই মৃৎপ্রোথিত হইয়া পাশাপাশি অবস্থান করিতেছে। **রাঢ়ের …লাজ**—শের আফঘান ও কুতুবের যুদ্ধ হয় বর্ধমানে, কারণ শের-আফঘান তখন বর্ধমানের মসনবদার ছিলেন। বর্ধমান রাঢ়ের অন্তর্ভুক্ত—রাঢ়ের মাটি স্বভাবতই লাল। এই রক্তিম মাটি বীর নির্দোষ শের আফঘানের রক্তে ঘনলাল হইয়াছিল। কিন্তু যেহেতু এই মৃত্যু ছিল ষড়যন্ত্রপ্রসূত, এইজন্য কবির বক্তব্য, যেন জাহাঙ্গীরের কৃতকর্মের লজ্জায় মাটি সেদিন রক্তিমতর হইয়া উঠিয়াছিল।

[৫ম স্তবক] **পাঁচ হাজারের শোভার সার**—অর্থাৎ রাজবধূরূপে বরণ করিবার উপহারস্বরূপ সম্রাট জাহাঙ্গীর রূপসীশ্রেষ্ঠা নূরজাহানের বহুমূল্য রত্নালংকারে ভূষিত করিলেন। **বাদশার বল**--জাহাঙ্গীরের বেগম হইবার কিছুদিনের মধ্যেই বুদ্ধিবলে নূরজাহানই সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্ত্রী হইয়া উঠিলেন, জাহাঙ্গীর তাঁহার বশীভূত হইয়া রহিলেন। ["১৬১২ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৬২২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দশ বৎসর নূরজাহান মুগল সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। বুদ্ধিমতী স্বামী-সোহাগিনী উচ্চাকাঙ্ক্ষিণী নূরজাহান স্বীয় ক্ষমতাগুণে রাজ্যের সমস্ত শক্তি করায়ত্ত করিলেন। রাজকীয় মুদ্রার একপৃষ্ঠে তাঁহার নাম মুদ্রিত হইল। তিনি সিংহাসনে উপবেশন করেন নাই সত্য, কিন্তু রাজ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন নিঃসন্দেহ। তাঁহার শাসন-ক্ষমতা সুনিপুণ না হইলে গর্বিত মুগল-আমীরগণ এই নারীর আধিপত্য কিছুতেই স্বীকার করিতেন না। রাজদরবারে অপরাধীর বিচারের সময় নূরজাহান ঝরোখার অন্তরালে অবস্থান করিয়া ইঙ্গিত দ্বারা জাহাঙ্গীরের বিচারের ত্রুটি সংশোধন করিয়া দিতেন"—ডঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী]। **অফুরান মনের রস**--নারী হইয়াও নূরজাহানের উৎসাহ বিচক্ষণতা সঞ্জীবনী শক্তি ছিল বিস্ময়কর। ["তিনি অসামান্য স্নেহগুণের অধিকারিণী ছিলেন এবং বুদ্ধিবলে জাহাঙ্গীরকে বহুবার চরম সংকট হইতে উদ্ধার করিয়াছেন"]। **দরবারে বার পর্দাতে**- মুগল-বেগমদের মত তিনি পর্দানশীন রহিলেন না, স্বয়ং দরবারে রাজকার্য পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতেন [পূর্বোক্ত টীকা দ্রষ্টব্য]। **পিতা তোমার আসফ জা**—সম্ভবত নূরজাহানের চেষ্টাতেই তাঁহার আত্মীয়বর্গ পদোন্নতি লাভ করিয়াছিল। [But the most dominating trait of her character was her inordinate ambition, which led her to establish an unlimited ascendancy over her husband. Her father, Itimad-ud-daulah, and brother Asaf Khan became prominent nobles of the court, and she further strengthened her position by marrying her daughter by her first husband to Jahangir's youngest son, Prince Shahryar—Dr. R. C. Majumder.] ইতিহাসের তথ্যে জানা যায়, নূরজাহান একটি রাজনৈতিক চক্র গঠন করেন। "নূরজাহানের মাতা আসমত বেগম ছিলেন তাঁহার

পরামর্শদাত্রী। তাঁহার পিতা মির্জা গিয়াস বেগ (ইতমদউদ্দৌল্লা) ছিলেন সুদক্ষ শাসক, ভ্রাতা আসফ খান (আবুল হাসান—ইনি কবিতাও লিখিতেন) ছিলেন বিচক্ষণ কূটনীতিক। শাহজাদা খুররাম ছিলেন আসফ খানের কন্যা আরজুমন্দ বানু বেগমের স্বামী। এই সময়ে খুররাম ছিলেন নূরজাহানের অনুগৃহীত"—ডঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী]। **দেশে আবার···শিল্পী সব**—ইহা ঐতিহাসিক সত্য, নূরজাহানের সাম্রাজ্য পরিচালনায় জাহাঙ্গীরের শাসন সুশৃঙ্খলভাবে চলিত এবং দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, মুগল সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটিয়াছিল, বহু বিদ্রোহ প্রশমিত হইয়াছিল। অবশ্য ইহার জন্য স্বয়ং জাহাঙ্গীরের কৃতিত্বও ছিল। উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং শিল্প সাহিত্যের চর্চা বাড়িয়াছিল। নূরজাহান এবং জাহাঙ্গীর উভয়েই ছিলেন শিল্পের অনুরাগী। Nur Jahan was indeed possessed of exquisite beauty, fine taste for Persian literature, poetry and arts, "a piercing intellect, a versatile temper and sound common sense" -An Advanced History of India. "নূরজাহানের চেষ্টায় জাহাঙ্গীরের মদ্যপানের মাত্রা হ্রাস পাইল। রাজকার্য হইতে আংশিকভাবে অবসর লাভ করিয়া জাহাঙ্গীর কলাশিল্প চিত্র ও সংগীতের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইলেন"—ডঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী]। **নূতন কত ইঙ্গিতে** নূরজাহান "সংগীত চিত্র কাব্য এবং শিল্পে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে তিনি বিভিন্ন প্রকার পরিচ্ছদ অলংকার এবং প্রসাধন সামগ্রী আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি ওড়না, কাঁচুলি এবং আতর। ফুল নিংড়াইয়া আতর হয়—কবি তাহার ইঙ্গিত দিয়াছেন) উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। কাফিখান বলেন, নূরজাহান প্রবর্তিত পরিচ্ছদ-প্রসাধনধারা ঔরংজেবের রাজত্বকাল পর্যন্ত দিল্লির রাজপরিবারের ও সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অভিজাত পরিবারের আদর্শ ছিল।"—(পূর্বোক্ত গ্রন্থ)। জাহাঙ্গীরের কালে অন্যান্য শিল্প ব্যবস্থারও উন্নতি ঘটিয়াছিল। **তুমিই গো নারী বাদশাহী**—অনলস কর্মোদ্যোগিনী নূরজাহান জাহাঙ্গীরের পাঞ্জা অর্থাৎ রাজহস্তচিহ্নযুক্ত একপ্রকার শাসননামা লইয়া স্বয়ং সাম্রাজ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন—এবং কবি তাহাকেই সাম্রাজ্যলক্ষ্মী বলিতে চান। নূরজাহানের অবদানকে সত্যেন্দ্রনাথ

আলোচ্য অংশে অতিরঞ্জিত করিয়াছেন। নূরজাহান তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বে-বুদ্ধিবলে জাহাঙ্গীরের উপর প্রভুত্ব করিয়া সাম্রাজ্য চালনায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নূরজাহান ছিলেন ক্ষমতালুব্ধা উচ্চাকাঙ্ক্ষিনী, স্বার্থপরায়ণা এবং তাঁহারই ষড়যন্ত্রে শেষ দিকে জাহাঙ্গীরের সাম্রাজ্যে নানা অন্তর্বিরোধ ঘনাইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং তাঁহাকে কি সাম্রাজ্যলক্ষ্মী বলা যায়?

[৬ষ্ঠ স্তবক] **আজ লাহোরের জঞ্জালে**—লাহোরের শহরতলীর এক-প্রান্তে নূরজাহানের সমাধির চারপাশে এখন অযত্নবর্ধিত কাঁটাঝোঁপ স্তূপীকৃত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারই মধ্যে একদা অনিন্দ্যসৌন্দর্যের অধিকারিণী নূরজাহান চিরশায়িতা। **লহর**—ঢেউ। **জীর্ণ তোমার সুন্দরী**—মৃত্যু সকল রূপসৌন্দর্যের চরম পরিণাম, নূরজাহানের সমাধি দেখিয়াই কবি তাহা বুঝিতে পারিলেন। যিনি ছিলেন অনন্তসুন্দরী, আজ তাহার সমাধি জরাজীর্ণ, সেখানে কোন বস্তুভূষণের লেশমাত্র নাই, আর সেই সমাধির মধ্যে অলংকারহীনা ভূষণহীনা হইয়া নূরজাহান সুপ্তিমগ্না। **হোথা তোমার আলপনায়**—নূরজাহানের জীবৎকালেই জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হইয়াছিল, সুতরা নূরজাহানের যত্নে নির্মিত মণিকাঞ্চিত সমাধি অদূরেই শোভা পাইতেছে। জীবিতকালে যিনি বেগম হইয়াও সম্রাটের উপর আপন কর্তৃত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, আজ মৃত্যুর পরে সম্রাটের সমাধির তুলনায় সেই সর্বময়ী কর্ত্রীর জীর্ণ সমাধির বৈপরীত্যই কবি লক্ষ্য করিতেছেন। **মীনার বাহার**—মসজিদের শীর্ষচূড়ার সৌন্দর্য। **শাহ-ডেরা**—বাদশাহের প্রাসাদ। **গরীব বাপের আজ মাটি**—ভাগ্যপরিবর্তনের পূর্বে নূরজাহান ছিলেন দরিদ্র পিতার কন্যা, মৃত্যুর পর তাঁহার সেই প্রাক্তন রিক্ততাই যেন আজ প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। সর্বস্বান্ত হইয়া নূরজাহান আজ নিঃসঙ্গ অবস্থায় ভূপ্রোথিত এবং একদা যিনি স্বর্ণসিংহাসনে শোভা পাইতেন আজ মৃত্তিকাই তাঁহার পালঙ্ক। **শাহ-ডেরার রাখ্‌ছে না**—বাদশাহের নিদ্রাশয্যা হইতে জাগ্রত হইয়া জীবিতকালের প্রিয়তমা নূরজাহানকে আহ্বান করিবার কোনো ক্ষমতাই আজ ভারতসম্রাটের নাই, এমন কি, জীবৎকালের পার্শ্বসহচরী যে আজ চিরকালের মত অনুপস্থিত, এই সংবাদও তাহার অজ্ঞাত। **সূক্ষ্ম সোনায় পাথর ছায়**—ভারত-সম্রাজ্ঞীর শয্যা ছিল কারুকার্যখচিত সূক্ষ্ম

স্বর্ণসূত্রের বয়ন-সমন্বিত গদি। আজ সমাধিতে শায়িত বলিয়া প্রস্তরই তাঁহার শয্যা, পালঙ্ক, উপাধান ও আচ্ছাদন। **বিস্মরণী···গোপীচন্দন এ**—নূরজাহানের সমাধির উপর যে সকল আরণ্যক লতা উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা বিস্মৃতির প্রতীক, তাহাদের শাখা-প্রশাখার বন্ধনেই সম্রাজ্ঞী আজ সুপ্তিমগ্না। সেই সুন্দরীকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিতেছেন যে, তাঁহার সমাধির মৃত্তিকা আজ পবিত্র। নশ্বর দেহ বিলীন হইলেও সেই দেহের পরিণাম যে মৃত্তিকা তাহা সেই রূপের স্মৃতি বিজড়িত বলিয়া বৈষ্ণবদের ব্যবহার্য তিলকমাটির ন্যায় পবিত্র। **গৌরী**—গৌরবর্ণা। **গোপীচন্দন**—বৈষ্ণবগণ যে মৃত্তিকার দ্বারা তিলক রচনা করেন তাহাই গোপীচন্দন। সম্ভবত বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ ইহাকে দ্বারাই চন্দনের কাজ করিতেন এই বিশ্বাসে ইহাকে গোপীচন্দন বলে। **সোহাগী তোর সিঁদুর গো**—ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নূরজাহান জাহাঙ্গীরের প্রিয়তমা পত্নী ছিলেন বলিয়া কবি বলিতেছেন সেই স্বামী-সোহাগিনীর দেহের মৃত্তিকা আজ স্বামী-প্রেমের প্রতীকরূপ সিন্দূরে পরিণত হইয়াছে। **জীর্ণ তোমার···শ্রীদুর্গ**—নূরজাহানের মৃত্যু হইয়াছে কিন্তু কবির বিশ্বাস রূপের মৃত্যু ঘটে না। তাই নূরজাহানের যে সমাধিস্থল আপাতদৃষ্টিতে ধ্বংসস্তূপ ও অযত্নীকৃত, তাহা বিশ্বের নারী সমাজের নিকট সৌন্দর্যের দৃঢ় কেল্লার ন্যায়।

[৭ম স্তবক] **শিয়রে কি··দারুণ শোক**—নূরজাহানের সমাধির উপর যে কবিতা উৎকীর্ণ আছে তাহা দেখিয়া কবি সেই বেদনাপূর্ণ কবিতাটিকে নূরজাহানের ললাটে লিখিত বিধিলিপি বলিয়া মনে করিতেছেন এবং ইহা তাঁহার হৃদয়ে গভীর কারুণ্য-উদ্রিক্ত করিল। **আফসোসে**—মনস্তাপে। **"গরীব গোরে বুলবুলে"**—নূরজাহান তাঁহার সমাধিতে উৎকীর্ণ করিবার জন্য এই শ্লোকটি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন—"এই অকিঞ্চন দীনের সমাধির উপর কেহ যেন প্রদীপ না জ্বালায়, কেহ যেন অজ্ঞাতেও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন না করে, সেই দীপের আলোয় যেন এই সমাধিকুঞ্জের শ্যামা-পোকার পাখা না পোড়ে, সেই মনুষ্যপ্রদত্ত ফুলের দ্বারা এখানকার বুলবুলগুলি যেন বেদনা না পায়।" **সত্যি তোমার··লুপ্ত প্রাণ**—প্রকৃতপক্ষে নূরজাহানের সমাধিতে আজ কেহ প্রদীপ জ্বালায় না, অযত্নবর্ধিত কণ্টকবনে সেখানে ফুলের লতাও যেন প্রাণ হারাইয়াছে। এই কাঁটাবনে যেন

নূরজাহানরূপ পুষ্পলতাও অবরুদ্ধপ্রাণ। **নিঃস্ব তুমি ··সজ্জতে**—ভারত-সম্রাজ্ঞী রূপশ্রেষ্ঠা নূরজাহান আজ রিক্ত ও সর্বস্বান্ত, আজ তাঁহার কোনো অলংকার নাই—ধূসর ধূলির ক্রোড়ে মৃত্যুর হিমস্পর্শে চিরশায়িতা। জীবিতকালে স্বর্ণসিংহাসনে উপবিষ্টা শত দাসদাসীর পরিচর্যাবেষ্টিতা সম্রাজ্ঞী আজ অনাদর-অবহেলার অন্ধকার গহ্বরে ধীরে ধীরে অপসৃত হইয়া যাইতেছেন, ইহাই মহাকালের নিষ্ঠুর ইঙ্গিত। **ডুবছে ডুব্‌বে না**—কিন্তু পর মুহূর্তেই কবির মনে হইল, দেহ অবলুপ্ত হয়, মানুষ বাঁচিয়া থাকে না, তাহার অস্থি মৃত্তিকায় রূপান্তরিত হয়—কিন্তু তাহার কীর্তি ও স্মৃতি বাঁচিয়া থাকে। **রূপের স্বর্গে যায় চেনা**—দেহের অবসান হইলেও রূপের স্বর্গলোকে চিরনূতন হইয়া নূরজাহান বিরাজ করিতেছেন। **সেথায় তোমার বিরাম নাই**—রূপের যে অক্ষয় স্বর্গে নূরজাহান বিরাজ করিতেছেন, সেখানে তাঁহার নামকে ঘিরিয়াই সৌন্দর্যের ফুল ফুটিয়া উঠে। সেখানে নূরজাহানের প্রতি আমাদের প্রাণের অনুরাগ প্রদীপ হইয়া অনির্বাণ জ্বলিতেছে। **চেরাগ**—প্রদীপ। **চিত্ত লোকে ··যুগ ভরি**—ইতিহাসের ছাত্রের হৃদয়ে, নূরজাহানের অনুরাগীর চিত্তলোকে নূরজাহানের রূপের প্রতি আরতি চিরকাল অব্যাহত থাকিবে। **মোগল-যুগের তিলোত্তমা**—পৌরাণিক যুগে ব্রহ্মা বিশ্বের সারভূত সৌন্দর্য তিল তিল সংগ্রহ করিয়া তিলোত্তমা নামে সুন্দরী রমণীকে নির্মাণ করিয়াছিলেন, অপরূপ সুন্দরী নূরজাহান যেন সেই তিলোত্তমা যিনি মোগল-যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

•

ব্যাখ্যা

রূপের গোলাপ ঠোঁট হানে গো ;—

আলোচ্য চরণযুগল সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবর-ই-নূরজাহান কবিতার অন্তর্গত। এখানে কবি ভারত-সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের সমাধিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার অনুপম সৌন্দর্যের কথা চিন্তা করিতেছেন। অনিন্দনীয় দেহসুষমার অধিকারিণী নূরজাহান নিতান্ত সাধারণ অবস্থা হইতে জাহাঙ্গীরের রূপতৃষ্ণাতুর দৃষ্টিতে পড়িয়া ভারতেশ্বরী হইয়াছিলেন। এই ভাগ্যপরিবর্তনের মূলে ছিল তাঁহার পরমাশ্চর্য সৌন্দর্য। এ সৌন্দর্য মানবীয় দেহে সর্বদা সুলভ নয়, নিত্যই সংসারে এহেন বিস্ময়কর তনুরুচি আবির্ভূত হয় না। এইজন্যই রূপলুব্ধ মানব

স্বর্গীয় সৌন্দর্যের দিকে মুগ্ধের ন্যায় ধাবমান হয়। দৃষ্টান্ত দিয়া কবি বলিতেছেন, পুষ্প-সম্রাজ্ঞী গোলাপ অসংখ্য সাধারণ ফুলের মত নিত্যই ফুটিয়া উঠে না—একটি রমণীয় গোলাপের জন্ম একটি স্মরণীয় ঘটনা। পুষ্পরূপমুগ্ধ বুলবুল পক্ষীও সম্ভবত গোলাপের এই দুর্লভ জন্মের বিষয়ে অবগত। তাই একটি গোলাপের জন্ম হইলেই তাহারা তাহার রূপ হরণ করিবার জন্য ফুলটিকে ঘিরিয়া কলরব করে। এমন কি সকলেই সেই একটিমাত্র ফুলের প্রতি ঠোঁট ঠুকরাইতে থাকে। এখানে নূরজাহানকে দুর্লভ জাত রূপের গোলাপ বলা হইয়াছে এবং বুলবুলের ফুলের প্রতি ঠোঁট হানা পুরুষের রূপতৃষ্ণার প্রতি অস্ফুট ইঙ্গিত।

তুচ্ছ রূপার সে পোদ্দারে।

সত্যেন্দ্রনাথের কবর-ই-নূরজাহান কবিতা হইতে উদ্ধৃত বক্ষ্যমাণ অংশে অনবদ্য রূপসুষমার অধিকারিণী নূরজাহানের জন্য জাহাঙ্গীরের উন্মত্ত কার্যকলাপকে সমর্থনই করা হইয়াছে। সৌন্দর্য দুর্লভ বস্তু এবং তাহার আবির্ভাব একটি স্মরণীয় ঘটনা। এই সৌন্দর্য নূরজাহানের জীবনে বিধাতার আশীর্বাদে বর্ষিত হইয়াছিল এবং তাঁহার দৃষ্টিবিভ্রমকারী সেই সৌন্দর্যের নেশায় ভারত-সম্রাট জাহাঙ্গীর মত্ত হইয়া নূরজাহানের স্বামী শের আফঘানকে কূট-কৌশলে নিহত করান ও নূরজাহানকে হস্তগত করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। ইহা বিস্ময়কর নয় যে, অসাধারণ রূপসী নারীর জন্য পুরুষ বহুবার অন্যায় দুষ্কর্মে পা বাড়াইয়া থাকে—বরং তাহাই স্বাভাবিক। সামান্য অর্থের জন্য, রৌপ্য-মুদ্রার জন্য মানুষ প্রত্যহ অসংখ্য পাপকর্মে লিপ্ত হয়। আর যথার্থ রূপ তো তদপেক্ষা মূল্যবান। সুতরাং তাহার জন্য অন্যায় করা স্বাভাবিক। খনিজ স্বর্ণ পণ্যদ্রব্য—তাহা ক্রয়-বিক্রয়ের সামগ্রী, যে-কোনো ব্যবসায়-স্থানে প্রত্যহই পাওয়া যায়। কিন্তু যে রূপ দেহসৌন্দর্যে বিকশিত হইয়া উঠে, তাহা এই ধাতব সোনা অপেক্ষা শতগুণে মূল্যবান। তাহা পণ্যদ্রব্য নয়, তাহা ব্যবসায়ীর নিকট মুদ্রার বিনিময়েও পাওয়া যায় না বলিয়া সেই জগৎদুর্লভ রূপের প্রতিই মানুষের মোহ। নূরজাহানের রূপ ছিল সেই আকস্মিকতার কিরণে দীপ্ত—তাহা পণ্যদ্রব্য বা খনিজ স্বর্ণ নয়। সুতরাং তাহার জন্য রূপদুর্বল মানুষের হানাহানি নিতান্তই স্বাভাবিক, ইহাই কবির বক্তব্য।

মরুভূমির মেহেরবাণী ....চির-দিন-নিশা !

সত্যেন্দ্রনাথের কবর-ই-নূরজাহান হইতে সংকলিত আলোচ্য ছত্রে কবি নূরজাহানের জন্ম-পরিবেশ তাঁহার উত্তর-জীবনে কিরূপ দুশ্ছেদ্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

নূরজাহানের পূর্ব নাম ছিল মেহেরউন্নিসা। সমকালীন ঐতিহাসিক তথ্যে জানা যায় যে, আকবরের রাজত্বকালে তাঁহার পিতা মির্জা ঘিয়াস বেগ পারস্য হইতে স্ত্রী ও সন্তানদের সহিত ভারতবর্ষে আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে কান্দাহারের মরুভূমিতে মেহেরউন্নিসার জন্ম হয়। সাংসারিক দারিদ্র্য ও অন্নসংস্থানের অভাববশত পিতামাতা প্রথমে নবজাত শিশুকে পরিত্যাগ করিয়াই চলিয়া আসিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, পরে সম্ভবত স্নেহবশত তাঁহারা সেই নিষ্ঠুরতা হইতে নিবৃত্ত হইয়া মেহেরউন্নিসাকে লইয়া ভারতে আসেন। এই ঘটনা স্মরণ করিয়া কবি মেহেরউন্নিসাকে মরুভূমির আশীবাদ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। অসহায় শিশুর নিষ্পাপ সুন্দর কোমল দেহের প্রতি দৃষ্টি দিয়া পিতামাতা তাঁহাদের দুঃখদারিদ্র্য ভুলিয়াই মেহেরকে বক্ষে তুলিয়া লইয়াছিলেন—সেই শিশুকন্যা আশীবাদ ব্যতীত আর কী। পরবর্তীকালে এই মেহেরউন্নিসার ভাগ্যে বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। সাধারণ জায়গীরদারের স্ত্রী মেহেরউন্নিসা কেবল তাহার রূপসৌন্দর্যের জন্য ভারতসম্রাটের দৃষ্টিতে পড়িয়া তাঁহার বেগম হইয়াছিলেন এবং আপন ভাগ্যক্রমে স্বয়ং ভারতসাম্রাজ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। ইহা অদৃষ্টের যোগাযোগ ব্যতীত আর কিছুই নয়। রুক্ষ রৌদ্রতপ্ত মরুভূমির বুকে যাঁহার জন্ম, পরবর্তীকালে পুরুষের রূপতৃষ্ণা তাঁহাকে ঘিরিয়াই জ্বলিয়া উঠিয়াছে। নূরজাহানের অসীম অনিন্দ্য রূপ এবং জাহাঙ্গীরের প্রবল রূপতৃষ্ণা ইহাই নূরজাহানের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিয়াছে, সামান্য মেহেরউন্নিসা হইয়াছে জগতের আলো। এই রূপের জ্যোতি দিয়া নূরজাহান কেবল জাহাঙ্গীরকেই বশ করেন নাই, স্বয়ং সম্রাটের কর্ম পরিচালনা করিয়া সেনাধ্যক্ষ মন্ত্রীবর্গ সকলকেই বশ করিয়াছিলেন। মরুভূমির বালুকা চিরতপ্ত—এই তপ্ত বালুকার দহন নূরজাহানের জীবনের সহিত ছিল অচ্ছেদ্য। তাই সকলেই এই দহন অনুভব করিয়াছে। এই অনির্বাণ রূপতৃষ্ণার প্রখর দাহে জাহাঙ্গীর শেষ দিন পর্যন্ত দীপ্ত হইয়াছেন।

অন্যায়ের সে বৈরী····· মোহের কি বন্যায়।

সত্যেন্দ্রনাথের কবর-ই-নূরজাহান কবিতা হইতে উৎকলিত আলোচ্য পংক্তিগুলিতে নূরজাহানের জন্য রূপমুগ্ধ ভারতসম্রাট জাহাঙ্গীরের অধর্ম-চারিতার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ইতিহাসের তথ্যে জানা যায়, জাহাঙ্গীর ছিলেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ বিচারক। সম্রাট হইবার দিন হইতে তিনি প্রজাদের সুবিচারের জন্য কতকগুলি বিধি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রে বহু বিপরীত স্বভাবের সমাবেশ হইলেও মোটামুটি তিনি অন্যায় অধর্মের শত্রু ছিলেন, শাসনের ব্যাপারে সুবিচার, ন্যায়পরায়ণতার আদর্শ, সত্যনিষ্ঠা রক্ষা করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য—এই ব্যাপারে ইতিহাসের সমর্থন মেলে। কিন্তু নূরজাহানের অসামান্য রূপলাবণ্য এই সুবিচারক জাহাঙ্গীরকে উন্মত্ত করিয়াছিল। সকল ধর্মনিষ্ঠা ন্যায়শীলতা বিসর্জন দিয়া যৌবনে-দেখা অপূর্ব রূপসী মেহেরউন্নিসাকে তিনি সম্রাট হইবার পর করায়ত্ত করিবার জন্য শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বস্তুত রূপের প্রতি অন্ধ আসক্তি মানুষের জীবনে কী ঘোরতর সর্বনাশ সাধন করে—অন্যায়ের চিরশত্রু সুবিচারক সম্রাটও সামান্য রূপবতী রমণীর জন্য সত্য ধর্ম ন্যায় বিসর্জন দিয়া রূপমোহের বন্যায় আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ডুবাইয়া দিতে পারেন—জাহাঙ্গীরের জীবনই তাহার প্রমাণ।

[এই ছত্রগুলির বক্তব্যের সহিত পূর্ববর্তী চরণের বক্তব্যের মিল নাই। ইতিপূর্বে কবি রূপমোহের উন্মত্ততাকে সমর্থনই করিয়াছেন—'রূপের তরে হানাহানি তার চেয়ে কি বদ্‌রীতি?' এখানে অন্যায়ের বৈরী জাহাঙ্গীর হঠাৎ ধর্ম-ন্যায় ভুলিয়া রূপের মোহের বন্যায় ডুবে ভেসে তলিয়ে গেল'—ইহা তাঁহার চরিত্রের প্রতি একপ্রকার নিন্দাসূচক মন্তব্য।]

গরীব বাপের······আজ রাখছে না।

বক্ষ্যমাণ পংক্তিগুলি ছন্দোরাজ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবর-ই-নূরজাহান কবিতা হইতে উদ্ধৃত। লাহোরের শহরতলীর কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গলে রূপবতী নূরজাহানের অযত্নে পতিত সমাধিদর্শনে কবি জাগতিক রূপের পরিণাম চিন্তা করিয়া এই মন্তব্য করিয়াছেন। নূরজাহান একদা দরিদ্র অর্থাভাবক্লিষ্ট পিতা-মাতার নিঃস্ব বাসগৃহে মরুভূমির রিক্ত আশ্রয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যৌবনে রূপের গৌরবে তাঁহার ভাগ্য পরিবর্তন হইয়াছিল, সামান্য অবস্থা

হইতে তিনি ভারতেশ্বরী হইয়াছিলেন, কিন্তু মৃত্যুর পর তিনি পূর্বের অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। দরিদ্র পিতার দরিদ্র কন্যা রত্নসিংহাসন ও স্বর্ণপালঙ্ক ছাড়িয়া মৃত্তিকার শয্যায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় চিরশায়িতা। আজ তাঁহার শোভা নাই, সম্পদ নাই, দাসদাসী অনুচর সাম্রাজ্যশক্তি কিছুই নাই। প্রাসাদপতি বাদশাহের যিনি প্রিয়তমা সঙ্গিনী ছিলেন, তাঁহাকে সেই প্রাসাদপতি সম্রাট আর আহ্বান করেন না। তিনিও আজ মৃত্যুর মহানিদ্রায় সুপ্ত—নূরজাহান তাঁহার পার্শ্বে নাই, ইহাও তাঁহার অবিদিত।

বিস্মরণী লতার ··· বিশ্বনারীর শ্রী-দুর্গ।

কবর-ই-নূরজাহান কবিতা হইতে উদ্ধৃত আলোচ্য পংক্তিচতুষ্টয়ে কবি সত্যেন্দ্রনাথ নূরজাহানের জীর্ণ সমাধিদর্শনে জাগতিক রূপসম্পদের পরিণতি চিন্তা করিয়া এই মন্তব্য করিয়াছেন। অনিন্দ্য রূপবতী নূরজাহান সম্রাট জাহাঙ্গীরকে বশীভূত করিয়া ভারতবর্ষ স্বয়ং শাসন করিয়াছিলেন। আজ তিনি মৃত্যুর তুষারস্পর্শে সমাধিশায়িতা। আজ তাঁহার সমাধির উপর যে সকল আরণ্যক তরুলতা জন্মিয়াছে, তাহারা যেন পার্থিব সব কীর্তি, জীবনের সব গৌরবকে বিস্মৃতির গর্তে ঢাকিয়া দিয়া নূরজাহানকে সুপ্তির বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। তথাপি নূরজাহান এক স্মরণীয় গৌরবদীপ্ত জীবন যাপন করিয়াছিলেন বলিয়া সেই সুন্দরীর কবরের মৃত্তিকা আজ সাধারণ মৃত্তিকা মাত্র নয়। সেই রূপসুন্দরীর দেহ মাটিতে পরিণত হইলেও এই মাটি বৈষ্ণবদের তিলক কাটিবার গৈরিক মৃত্তিকার মতই পবিত্র। নূরজাহান তাঁহার স্বামী জাহাঙ্গীরের প্রেম ও ভালবাসা উজাড় করিয়া লইয়াছিলেন। সেই আদর্শ প্রেমিকার সমাধিস্থিত দেহের মৃত্তিকাকে কবি তাঁহার স্বামী-প্রেমের শুভ মঙ্গল-চিহ্ন সিন্দূর বলিয়াছেন। তাঁহার সমাধি আজ যতই সৌন্দর্যহীন ও ভগ্নদশায় উপনীত হোক না কেন, পৃথিবীর যাবতীয় নারীর কাছে তাহা সৌন্দর্যের দৃঢ় দুর্গের ন্যায়: অর্থাৎ এই দুর্গে রূপের মৃত্যু ঘটে না, সৌন্দর্য এখানে সকল কালের আক্রমণেও সুরক্ষিত থাকে, এই বিশ্বাসই সে নারীসমাজের কাছে, রূপসুন্দরীদের কাছে প্রচার করিতেছে।

গরীব-গোরে দীপ······লুপ্ত প্রাণ—[রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]।

নিঃস্ব তুমি······যায় চেনা—[রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]।

সেথায় তোমার······চিরযুগের সুন্দরী—[রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]।

প্রশ্ন ১। কবর-ই-নূরজাহান কবিতায় নূরজাহানের সমাধিদর্শনে সত্যেন্দ্রনাথের মনে যে সকল অনুচিন্তা জাগিয়াছে তাহার পরিচয় দাও।

সুদূর বাঙলা দেশ হইতে কবি সত্যেন্দ্রনাথ নূরজাহানের সমাধিভবন দেখিতে লাহোরে আসিয়াছেন। লাহোরের শহরতলীর এক প্রান্তে ভারত-সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের বিরলসৌষ্ঠব সমাধিটি অযত্নবর্ধিত জঙ্গল ও জঞ্জালে আবৃত দেখিয়া কবির বিস্ময় জাগিয়াছে। মোগল যুগের স্থাপত্যশিল্প, সমাধি-অলংকরণের ব্যয়বহুল সৌধনির্মাণের রীতি এখানে অনুসৃত হয় নাই। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয়, যে নূরজাহান আপনার অনিন্দ্যসুন্দর রূপযৌবনের দ্বারা ভারতসম্রাটকে জয় করিয়াছিলেন, জাহাঙ্গীর রূপের মোহে যাঁহাকে নূরজাহান বা জগতের আলো এই নাম দিয়াছিলেন—তাহার সমাধি আজ প্রদীপের আলোক বা অনুরাগীর সামান্য পুষ্পার্ঘ্য হইতেও বঞ্চিত। সন্ধ্যার অন্ধকারে কেবল একগুচ্ছ জোনাকির ম্লান দীপ্তিই সেই কবরের শোভা। জাগতিক রূপের পরিণাম চিন্তা করিয়া কবির স্মৃতিপটে ভাসিয়া উঠিল নূরজাহানের জীবনের রোমাঞ্চকর নাটকীয় ঘটনাবলী, সমকালীন ইতিহাসের বিস্মৃতপ্রায় তথ্যগুলি। কবি কল্পনানেত্রে ইরান দেশের শকুন্তলাকে কবরের অবগুণ্ঠন খসাইয়া বারেক দেখিয়া লইতে চাহিলেন।

অসামান্য সৌন্দর্যের অধিকারিণী ছিলেন নূরজাহান—বাস্তব সংসারে এই রূপ সহসা দেখা যায় না। এই স্বর্গীয় রূপের মোহে সংসারে দেখা দেয় মুগ্ধ মানুষের তৃষ্ণাজনিত পারস্পরিক সংঘাত, তিলোত্তমার জন্য সুন্দ-উপসুন্দের দ্বন্দ্বের মত। ইরান পরিত্যাগকারী পারসিক ঘিয়াস বেগের কন্যা মেহের-উন্নিসার জন্ম হয় অবহেলা-অনাদরে, ভারত আগমনের পথে কান্দাহারের বালুতপ্ত মরুভূমিতে। নিতান্ত স্নেহবশতই অভাবগ্রস্ত পিতামাতা সেদিনের অবাঞ্ছিত এই কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে পারেন নাই। যুবরাজ সেলিমের চোখে পড়িয়াছিল একবার মেহেরউন্নিসার রূপ, বাদশাহ হইবার পরও মেহেরকে তিনি ভুলিতে পারেন নাই। মেহেরউন্নিসা তখন শের আফঘানের পত্নীরূপে বর্ধমানে প্রায় নির্বাসিতা। জাহাঙ্গীরের শঠ কৌশলে উদারহৃদয় বীর শের-আফঘান নিহত হইলে মেহেরউন্নিসা দিল্লীর অন্দরমহলে প্রেরিতা হইলেন। দুর্মূল্য মণিমুক্তায় মেহেরউন্নিসাকে বরণ করিলেন জাহাঙ্গীর, মেহেরউন্নিসা হইলেন নূরজাহান। অচিরেই ক্ষমতালিপ্সা উচ্চাকাঙ্ক্ষা

ও বুদ্ধিবলে নূরজাহান জাহাঙ্গীরকে বশীভূত করিয়া সাম্রাজ্যের সর্বময়ী কর্ত্রী হইয়া বসিলেন—স্বয়ং শাসনকার্যে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন পর্দানশীন অন্দরমহল হইতে বাহিরে আসিয়া। নূরজাহানের পিতা হইলেন মন্ত্রী, কবিভ্রাতা আসফ খান সেনানায়ক পদে বৃত হইলেন। নূরজাহান কেবল বিচক্ষণতার সহিত শাসন পরিচালনাই করিলেন না, তাঁহার পারদর্শিতায় দেশে শিল্পসমৃদ্ধি আসিল, শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল, মোগল-শাসন দৃঢ়মূল ও বহুবিস্তৃত হইয়াছিল। সম্রাজ্ঞী নূরজাহান স্বয়ং কয়েকটি শিল্পের ব্যবহার উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে গোলাপ ফুলের আতর নির্মাণ স্মরণীয়।

কিন্তু আজ কালের করাল কবলে নূরজাহানের রূপযৌবন অপহৃত হইয়াছে। তাঁহার সাম্রাজ্যসম্পদ বিলাসবৈভব রত্নসিংহাসন স্বর্ণপালঙ্ক বিলীন হইয়াছে। জগতের সর্বরিক্ত নিঃস্ব নিরাভরণ নূরজাহান মৃত্তিকার কোলে চিরশায়িতা। প্রস্তরের কঠিন সমাধির মধ্যে সুপ্তিমগ্না নূরজাহান, সমাধির উপর অযত্নবর্ধিত বিস্মরণী লতা তাঁহার সব কীর্তিকে ঢাকিয়া দিয়াছে। কিন্তু সত্যই কি সব অবলুপ্ত? এই শ্রীহীন সমাধি আজ বিশ্বনারীর রূপের দৃঢ়মূল দুর্গে পরিণত, কবরের মৃত্তিকা আজ বৈষ্ণবের তিলক-মাটির মতই পবিত্র। জাহাঙ্গীরের প্রেমে মহীয়সী নারীর দেহের মৃৎ-পরিণাম আজ পাতিব্রত্যের মঙ্গলসিন্দূর।

সমাধির উপর উৎকীর্ণ নূরজাহানের স্বরচিত শ্লোক পড়িয়া কবির বেদনার অবধি নাই। জীবিতকালে যিনি ভারতব্যাপী সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী ছিলেন, তিনি আপনার দীনতার ঘোষণা করিয়া লিখিয়া গেছেন: কেহ যেন এই সমাধির উপর প্রদীপ না জ্বালে, ফুল না দেয়। যেন এখানকার শ্যামা পোকা বুল-বুলিদের শান্তিকে কেহ বিচলিত না করে। জীবিতাবস্থায় রচিত এই শোকগভ শ্লোক কি নূরজাহানের জীবনে দৈববাণীর মত সত্য হইয়াছিল! এই জীর্ণ অনাদৃত জঙ্গলাস্তীর্ণ সমাধির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, পুরাতন ইতিহাসের বিস্মৃতপ্রায় ঘটনাবলী স্মরণ করিয়া কবির মনে হইয়াছে—দেহ বিলীন হয়, অস্থি মৃত্তিকা হয়, কিন্তু যথার্থ রূপ বাঁচিয়া থাকে। রূপের স্বর্গে চিরকাল অমলিন, চিরযুগের সুন্দরীশ্রেষ্ঠা, মোগলযুগের তিলোত্তমার পূজা রূপতৃষ্ণ মানুষের চিত্তমন্দিরে চিরকাল অব্যাহত থাকিবে, ইহাই নূরজাহানের সমাধিদর্শনে কবির অনির্বাণ বিশ্বাস। এই বিশ্বাস লইয়াই তিনি কবর-ই-নূরজাহান দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড : কুমুদরঞ্জন মল্লিক

ভূমিকা

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক হইতেই বাঙলা দেশের গ্রামগুলি অবহেলা-অনাদরে মৃতকল্প হইতে থাকে। দারিদ্র্যে অন্নুৎপাদনে রোগে গ্রামের অর্থনীতি ভাঙিয়া পড়ে এবং দলে দলে গ্রামের মানুষ নগরের দিকে চলিয়া আসিতে থাকে। গ্রাম্য অর্থনীতির এই বিপর্যয়ে দেশের সামগ্রিক অবস্থায় সংকট উপস্থিত হয় এবং শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ গ্রামে প্রত্যাবর্তনের আন্দোলন সুরু করেন। এই গ্রাম-পরিত্যাগের অকাল সংকটের দিন হইতে কুমুদরঞ্জন একটি মুগ্ধ হৃদয় ও একটি উষ্ণ আসক্তি লইয়া তাঁহার চিরকালের বাস্তুভিটা ও জন্মজন্মান্তরের গ্রামজীবনকে সবল মুষ্ঠিতে আকর্ষণ করিয়া, ক্ষীণ অস্পষ্ট কণ্ঠে গ্রামে প্রত্যাবর্তন করিবার কাব্য-আবেদন প্রচার করিয়া আসিতেছেন। অর্থনীতি রাজনীতির সূক্ষ্ম তথ্য কিংবা দেশগঠনের বৃহত্তর পরিকল্পনা নয়, নিতান্ত প্রাণের গভীর আকর্ষণ হইতে উত্থিত যে মৃত্যুঞ্জয় প্রেম তাহাকে এই মৃত্তিকার প্রতি চিরঘনিষ্ঠ করিয়া রাখিয়াছে সেই প্রেমই কুমুদরঞ্জনের কবিধর্মের বীজমন্ত্র। বাঙলার প্রতি, বাঙালীর প্রতি এই অবোধপূর্ব অনাস্বাদিত চিরঅনর্পিত ভালবাসা প্রকাশের এমন কাব্যসাধনা কুমুদরঞ্জনের পূর্বে আর দেখা যায় নাই, পরেও যাইবে কিনা সন্দেহ।

গ্রামবাঙলার সংকট

পল্লী প্রত্যাবর্তনের কাব্য-আবেদন

পল্লীপ্রীত কুমুদরঞ্জন

সত্যেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রমোহন, করুণানিধান, কালিদাস রায়ের মত কুমুদরঞ্জনও রবিরশ্মে লালিত কবি। পরন্তু প্রাচীন বাঙলার কাব্যসাধনার ঐতিহ্যটি তাঁহার মধ্যে সযত্নে প্রবাহিত হইয়াছে। পল্লী-জীবনের প্রীতি ও মাধুর্য একদিকে যেমন তাঁহার কাব্যের বাদীসুর, তেমনি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস পুরাণ শাস্ত্র ও সংস্কৃতির প্রতি প্রণত শ্রদ্ধাও তাঁহার কবিতার সংবাদী সুর। কবি হিসাবে তাঁহার বিষয়-চারিতা সীমাবদ্ধ নয়, যে-কোন বিষয়ই কুমুদরঞ্জনের কবিতারচনার প্রেরণা হইতে পারে। মুখ্যত দৃশ্যগ্রাহ্য প্রকৃতি-নিসর্গ, জ্ঞানগম্য ইতিহাস-ভূগোল, বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীত ও অনুভবগম্য

কবিবৈশিষ্ট্য

বিবিধ বিষয়চারিতা

স্মৃতি তাঁহার কল্পনাকে সর্বাধিক অধিকার করিয়াছে। তাঁহার কাব্যে যেমন কোনো গভীর জীবনদর্শন নাই, অতীন্দ্রিয় অনুভূতির অসামান্য উপলব্ধি নাই, সুমহান জীবনপ্রত্যয়ের তীব্রতম বেদনা নাই, তেমনি ধর্মবিষয়ে কোনো সংকীর্ণতা নাই, প্রাদেশিকতা নাই, জটিলতা বা কৃত্রিমতা নাই। খানিকটা বাউলের মত বৈরাগ্য, গৃহীর মত আসক্তি, বৈষ্ণবের মত বিনয়, শাক্তের মত মাতৃব্যাকুলতা, শিশুর মত মুগ্ধতা, প্রৌঢ়ের মত ধ্যানস্থ দৃষ্টি এবং কবির মত রসতন্ময়তা—এইসব মিলিয়াই কুমুদরঞ্জন। নাগরিকতা তাঁহাকে ঈষন্মাত্র বিচলিত করে নাই, বিশ্বসাহিত্য তাঁহাকে মানবাত্মার অন্তস্থল পর্যন্ত দেখিয়া লইবার জন্য বিপুলভাবে আকর্ষণ করে নাই, ভাষা ও ছন্দের কারুকার্য তাঁহার লেখনীকে বিব্রত করে নাই। স্বাদেশিকতা তাঁহার নামাবলী কিন্তু বিশ শতকের মধ্যভাগে অহিংস আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদ বা উত্তেজক দেশভক্তিবাদের দ্বারা তিনি তাঁহার স্বাজাত্য-বোধকে দীক্ষিত করেন নাই। তাহা বহিরান্দোলনের স্পর্শ হইতে বিমুক্ত একটি জন্মলব্ধ শান্ত অনুভব।

দেশপ্রেমের স্বরূপ

যাহা কিছু দীন ও বিরলসৌষ্ঠব, অপাংক্তেয় ও সাধারণতম, বিনীত ও তুচ্ছ, সে মানুষই হোক বা সামান্য পদার্থই হোক, তাহার প্রতি কবি একপ্রকার আত্মীয়তা অনুভব করিয়াছেন। অসুস্থ জীবনাচার ও বিজাতীয় চিন্তার তরঙ্গপ্রবাহ হইতে আপনাকে নিঃসম্পর্কিত রাখিয়া এইরূপ সুস্থ পরিতৃপ্ত পল্লী মুগ্ধ জীবনপ্রেমের মৃদু সাধনা বাঙলা সাহিত্যে যে এখনও বর্তমান ও সম্ভব, ইহাই কুমুদরঞ্জন মল্লিকের কাব্যগৌরব।

তুচ্ছের প্রতি দরদ

কাব্যগ্রন্থ

১৯০৬ হইতে আজ পর্যন্ত তিনি কাব্যরচনায় নিমগ্ন। তাঁহার গ্রন্থগুলির নাম শতদল, বনতুলসী, উজানি, একতারা, বীথি, বীণা, বনমল্লিকা, নূপুর, রজনী-গন্ধা, অজয়, তূণীর, চূণকালি, স্বর্ণসন্ধ্যা।

ভাবার্থ

কলিকাতা হইতে পেশোয়ার পর্যন্ত সুবিস্তৃত সড়ক গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড কত নদনদী নগরীকে সংযুক্ত করিয়াছে, কত দেশের মানুষ, আহার-আহার্য, আচার-ব্যবহার ও সংস্কৃতিকে এই পথ একসূত্রে মিলাইয়া দিয়াছে ভাবিয়া কবি বিস্মিত। এই পথ ধরিয়া বহু

বস্তু-বিশ্লেষণ

দূরদূরান্তে যাইবার গিরিপথে ধাবিত হইবার জন্য, কোনো দেশের আঙুর পেস্তা কিসমিস খাইবার জন্য আজ কবির মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড সাধারণ একটি পথ হইলেও নানা দেশের মধ্য দিয়া বাহিত হইবার জন্য যেন তাহার একটি বিশ্বজনীন ধর্ম গড়িয়া উঠিযাছে, যেখানে পথে পথে কোথাও মন্দির কোথাও মসজিদ কোথাও প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মের গির্জা নির্মিত। কোথাও কালো জলে শ্বেতপদ্মের মত সমাধির উপরিস্থিত গম্বুজ স্বর্গমর্ত্যকে যেন এক করিয়া দিয়াছে। এই বিশাল পথ পানিপথের প্রান্ত দিয়া দিল্লীর মত কত নগরীর উত্থান-পতনের ইতিহাস বক্ষে ধারণ করিয়া চলিযাছে। ইহার কোথাও বাদ্যযন্ত্রের গান, কোথাও নিষুপ্ত জঙ্গলে ঝিল্লির ঝংকার, কোথাও মিনার, কোথাও ছিন্নবীণার বেদনা ; কোথাও ব্যাঘ্রের বাসা, কোথাও গোয়ালাদের গ্রাম। এই পথ দিয়া কামান অশ্ব হস্তী লইয়া কত সেনাবাহিনী উদ্দামবেগে কত গ্রাম শ্মশান করিযা ধাবিত হইয়াছে। এই পথ দিয়া কত তীর্থযাত্রী অভিযাত্রীর দল আজও চলিতেছে। কোথাও কামারশালায় কাজ হইতেছে, কোথাও নদীর ধারে উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে। সম্রাট শেরশাহ্ নির্মিত এই পথ সরলরেখায় সোজা কাশ্মীর পর্যন্ত প্রসারিত, ভারতের দুই প্রান্ত সংযুক্তকারী এই পথ গঙ্গার সহিত তুলনীয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সংস্কৃতিকে যেন একটি পথ একাকার করিয়া দিয়াছে। আম-আখরোট, আলুবোখারা-চালতা, ফুটি-সর্দায়, পুনকো-পালং-পলতা, বাঙালী-তুর্কী, দুর্গামন্দির ও দুর্গ, জদা ও সাঁচিপান, সুর্মা ও আলতা, শাল-মসলিন, হুঁকা-ফরশী, মিহিদানা-বেদানা, বর্শা-বঁড়শী, হিঙ-কলাই, ভুট্টা-বাদাম-বাসমতী নানা জাতির নানা খাদ্য-ব্যবহার্য-দ্রব্য এই একটি পথের ধর্মে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে। কোথাও কোনো দুঃখ নাই, সব একটি গতিপ্রবাহে ধাবমান : কোথাও ময়ূর কোথাও টিয়া কোথাও টাকসোনা পাখি দেখা যায়, আবার কোথাও ধূরসক্ষেত্রে হরিণের আকুল দৃষ্টি চোখে পড়ে। সমগ্র ভারতের বৈচিত্র্য এই একটি পথে দ্রষ্টব্য হইলেও বাঙালীর কবি সন্তান শেষ পর্যন্ত বাঙলা দেশের জন্যই ব্যাকুল হইতেছেন।

আলোচনা

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ভারতবর্ষের একটি ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত প্রাচীন

জনপথ। শেরশাহের দ্বারা ইহার প্রথম নির্মাণকার্য হয় এবং পরবর্তী সম্রাটদের রাজত্বকালে এই পথ ভারত শাসনের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করিয়াছিল। বস্তুত রাজনৈতিক গুরুত্বে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যোগসূত্র রচনায়, যাতায়াতের সুবিধায়, সংবাদ পরিবহনে এই পথটি উত্তর ভারতের একটি স্মরণীয় সম্পদ। বিচিত্র জাতি ও [illegible] আচার-আচরণ, ভাষা, ধর্ম, আহার্য, ঋতুর সংমিশ্রণে এই ভারতবর্ষে বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি ঐক্য দেখা যায়, ভারত-ইতিহাসের আলোচনায় ইহা বারবার কথিত হইয়াছে। বিবিধের মধ্যে মিলনসূত্র, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, প্রভৃতি শব্দগুলির গভীর তাৎপর্য ভারত-ইতিহাসের যে রহস্যময় স্তরেই নিহিত থাকুক না, ভারতবর্ষের একটি বিপুলদীর্ঘ জনপথের দিকে তাকাইয়াই কবি যেন তাহার তাৎপর্য উপলব্ধি করিয়াছেন। বস্তুত পথ অপেক্ষা মিলনসেতু সমাজে আর কী হইতে পারে? পথের আকর্ষণে নানা দেশের পথিক ধাবিত হয় দূর দূরান্তে, নানা ভাষা নানা বেশ নানা পরিধান এক যাত্রার আকর্ষণে বিভেদ ভুলিয়া এই পথেই একত্র হয়। এই পথের ধারে ধারে সমাজের সুখদুঃখের ধারা, প্রতিদিনের উৎসব-আনন্দ, লোকালয়, জনপদ গড়িয়া উঠিয়াছে। এই পথ বাহিয়া চলিলে দেখা যায় নানা দেশের ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্য, ভাষা-সংস্কৃতির মৌলিকতা। মোটের উপর, কবির পথিক মন এই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া সমগ্র ভারত পর্যটন করিয়াছে। যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে তাহা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, বিবিধের মধ্যে রসবন্ধন। তাই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড কেবল বিশেষ পথমাত্র নয়, ইহা ভারতবর্ষের জীবনযাত্রারই একটি দীর্ঘ বিসর্পিত ধারা—এইরূপ বিশ্বাস কবিতাটি পাঠ করিলে আমাদের মনে সঞ্চারিত হয়, এইখানেই কবিতাটি গুরুত্বলাভ করিয়াছে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ পথের ইতিহাস

ভারত-ইতিহাসের প্রতীক

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য

পথিক কবির কল্পনা-পর্যটন

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড কুমুদরঞ্জনের দীর্ঘ কবিতা, আলোচ্য পাঠে কয়েকটি স্তবক বর্জিত হইয়াছে (দ্বিতীয় হইতে ষষ্ঠ স্তবক এখানে বর্জিত, মূল কবিতার প্রথম স্তবকের পর সপ্তম স্তবকটি এখানে দ্বিতীয় স্তবক)। ইহাতে কবিতাটি খানিকটা পুনরুক্তি হইতে মুক্ত হইয়া আরও স্বচ্ছন্দগতি ও সুখপাঠ্য হইয়াছে।

কুমুদরঞ্জনের কবিপ্রকৃতি গ্রামকেন্দ্রিক, পল্লীমমতাতুর, নিসর্গপ্রিয় এবং অতীতস্মৃতিমুখী, কিন্তু গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে এই কবিস্বভাবের পরিচয় নাই। কবিতা হিসাবেও ইহা উচ্চাঙ্গের নয়। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডকে বৈচিত্র্যপ্রধান নানা-জাতি-সংস্কৃতি-আচার-আচার্য-অধ্যুষিত ভারতবর্ষের ঐক্যের প্রতীকরূপে দেখা গভীর কল্পনাশক্তির পরিচয় বহন করে না। ইহাকে বলা যায় খেয়ালী লঘু কল্পনা, যাহা উদ্ভট আপাতবিসদৃশ বস্তুর মধ্যে একজাতীয় সাদৃশ্যসূত্র আবিষ্কার করে। এই ধরনের কবিতা রচনায় কুমুদরঞ্জন মুখ্যত সত্যেন্দ্রনাথেরই ভাবশিষ্য। নানা জাতি ও সংস্কৃতির আচার-আচরণ বর্ণনায় তদ্ভব ও বিদেশি শব্দব্যবহারে, ছয় মাত্রার ধ্বনিপ্রধান ছন্দে, চিত্রধর্মিতায় গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড কুমুদরঞ্জনের উপর সত্যেন্দ্রনাথের বাণীবিগ্রহের প্রভাবেরও পরিচায়ক। কুমুদরঞ্জনের প্রথম জীবনের কবিতায় ভারতীয় ইতিহাস, বৃহত্তর জাতীয় চেতনা, ভারতবর্ষের অতীত মহিমার বিবৃতির প্রতি একপ্রকার মনোযোগ দেখা যায়। কিন্তু এই ধরনের কবিতায় কবি শেষ পর্যন্ত স্বচ্ছন্দচারণা করিতে পারেন না। বাঙলার পল্লীজীবনের রূপসৌন্দর্য বর্ণনাতেই তিনি সর্বাধিক স্ফূর্তি অনুভব করেন। আলোচ্য কবিতার শেষ চরণটি এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, 'বাঙালীর ছেলে বাঙলার লাগি তবু আঁখিমন ঝুরছে'। ইহাই কুমুদরঞ্জনের স্বভাব।

উচ্চাঙ্গের কবিতা নয়

লঘু কল্পনার দৃষ্টি

সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব

রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ

(প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবক) **চলিয়াছ তুমি···মেশবার**—ভারতের সর্বদীর্ঘ জনপদ গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড কলিকাতার পশ্চিম প্রান্ত তথা হাওড়া হইতে সুরু করিয়া পেশোয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ার জন্য ইহা ভারতবর্ষের যাবতীয় সড়কের রাজা। বিভিন্ন দেশের উপর দিয়া যাইবার জন্য অসংখ্য নদ-নদী জনপদের সহিত এই পথ যেন ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করিবার সুযোগ পাইয়াছে, ইহাই কবির বক্তব্য। **আঙুর পেস্তা···কিশমিশ**—আঙুর পেস্তা কিসমিস ইত্যাদি ফল শুষ্ক মরু অঞ্চলের খাদ্য। এই পথ ধরিয়া ভারতের সেই পশ্চিম প্রান্তে গিয়া কবি উক্ত ফলসকল আস্বাদন করিবেন ইহাই তাঁহার আন্তরিক বাসনা। **ডাকে খাইবার···কেশভার**—ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের খাইবার

নামক গিরিপথ যাইবার টানা সড়ক এই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড—এই পথে দাঁড়াইয়া কবি সেই দূর গিরিপথের আহ্বান শুনিতে পাইতেছেন, কত সুদূর পাহাড়-পর্বত মরুভূমি অজ্ঞাত দেশ কবির কাছে ডাকিনীর মত আলুলায়িত কেশে মাথা বিস্তার করিয়া কবিকে সেই অজানা রহস্যপুরীতে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। **ধর্ম তোমার বিশ্বজনীন**—গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের নিজস্ব কোনো ধর্ম নাই, নানা মানুষের ধর্মের সম্মিলনে যেন একটি সর্বজনীন উদার ধর্মৈক্য গড়িয়া উঠিয়াছে। **পথে পথে প্রতিদ্বন্দ্বীর**—ভারতবর্ষের প্রধান দুই ধর্ম হিন্দুধর্ম ও মুসলমান ধর্ম, ইহার সহিত খ্রীস্টধর্মের যোগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে শত শত মন্দির মসজিদ ও গির্জা গড়িয়া উঠিয়াছে। নানা সময়ে এই সকল ধর্ম পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছে, আত্মপ্রচার করিয়াছে। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়া পথ চলিলে এই পথের পার্শ্বে কখনও হিন্দুধর্মের উপাসনাস্থল মন্দির, কখনও মুসলিম-ধর্ম-প্রধান নগরের অসংখ্য মসজিদ, কখনও প্রতিযোগী খ্রীস্টধর্মের গির্জা চোখে পড়ে। **সমাধির সন্ধির**—আর চোখে পড়ে বহু বিচিত্র বর্ণের প্রস্তর দ্বারা নির্মিত সমাধিসৌধ, যাহার ঊর্ধ্বভাগ মুসলিম স্থাপত্যের নিদর্শনস্বরূপ গোলাকৃতি গম্বুজের ন্যায়। মনে হয় যেন কৃষ্ণবর্ণের দীঘির জলে শ্বেত-পদ্ম ভাসিতেছে। তাহাদের কারুকার্যখচিত শোভা দেখিয়া মনে হয় যেন তাহারাই কৌশলে স্বর্গমর্ত এক করিয়া দিতেছে।

(তৃতীয়-চতুর্থ স্তবক) **প থ দেখাইয়া··· কত দিল্লি**—গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের পথেই পড়ে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পানিপথের প্রান্তর, যেখানে একাধিকবার ভারতবর্ষের ইতিহাসের ভাগ্যপরিবর্তন ঘটিয়াছে। ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লির উত্থান-পতনের ইতিহাস এই পানিপথের সঙ্গে জড়িত ছিল বলিয়া প্রকারান্তরে তাহা এই রাজসড়কের সহিতও জড়িত, ইহাই কবির ইঙ্গিত। (পানিপথ—কবর-ই-নূরজাহান কবিতার রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য)। **কোথাও তোমার ডাকিছে ঝিল্লি**—এই বৃহৎ বিসর্পিত পথের নানাস্থানে প্রকৃতি ও মানুষের বিচিত্র লীলা: কোথাও হয়ত কোনো সংগীতের আসর বসিয়াছে, সারেঙ্গি বাজিতেছে, আবার কোথাও মনুষ্যবসতি নাই, কেবল অন্ধকারপ্রায় বনে ঝিল্লির ডাক শোনা যায়। অর্থাৎ একস্থানে জনবহুল আনন্দ, আর একস্থানে নির্জন নৈঃশব্দ্য। **কোথাও মিনার···টুটছে**—এই পথ দিয়া যাইতে যাইতে কবি দেখিতেছেন একস্থানে সৃষ্টির পর, অন্যত্র ধ্বংসের লীলা:

কোথাও প্রাসাদের শীর্ষচূড়া নির্মিত হইতেছে, কোথাও বা কাহারও বীণার তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে, অর্থাৎ কেহ বা আশাভঙ্গ হইয়া নৈরাশ্যের বেদনা বক্ষে ধারণ করিয়া বসিয়া আছে। **কোথাও আভীর-পল্লী**—এই পথের একস্থানে গভীর অরণ্য—সেখানে হিংস্র ব্যাঘ্রের বাস, আবার আর একস্থানে চোখে পড়ে গোয়ালাদের গ্রাম। **তুমি নিয়ে…মৃতের অস্থি**—ইতিহাসের দিকে তাকাইলে মনে পড়ে, এই পথ দিয়া কতকালে কত সৈন্যবাহিনী রাজ্যজয়ের জন্য উদ্দামগতিতে ধ্বংসাত্মক অভিযানে যাত্রা করিয়াছে। সেই সকল পদাতিক অশ্বারোহী গজারোহী বাহিনী কামান বন্দুক লইয়া যাইবার সময় কত দেশের শস্যসম্পদ লুটপাট করিয়াছে, ধ্বংস করিয়াছে, কত মানুষকে হত্যা করিয়া তাহাদের কঙ্কাল ছড়াইয়া ফেলিয়াছে। **লয়ে যাও যাত্রী**—আজও এই পথ দিয়া অসংখ্য মানুষ যাত্রা করিতেছে। তাহাদের কেহ তীর্থযাত্রী, কেহ বা অভিযাত্রী, কাহারও হাতে ভিক্ষার ঝুলি। **ঝাণ্ডা**—কোন দল সম্প্রদায়,বা সঙ্ঘের পতাকা। **সোহাগে বসতি**—পথের কোথাও কামার তাহার কামারশালায় লৌহ গলাইতেছে। কোথাও নদীর ধার দিয়া পথ গিয়াছে, সেখানে নূতন উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে। সবই যেন পথের স্নেহে ঘনাইয়া আসিয়াছে।

(পঞ্চম-ষষ্ঠ স্তবক) **স্বর্গ না · শেরশা**—সম্রাট শের শাহ্ নির্মিত ভারতের সর্বদীর্ঘ এই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ভারতের অন্যতম বিস্ময়—ইহা স্বর্গে উপনীত না করিলেও অন্তত ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর পর্যন্ত আমাদের লইয়া যাইতে পারে, রসিকতা করিয়া কবি ইহা বলিয়াছেন। **শের শাহ্**—হুমায়ুনের প্রতিদ্বন্দ্বী আফঘান বীর, অল্প সময়ের জন্য উত্তর ভারতের অধিকর্তা হইয়া ভারতশাসন ব্যবস্থায় বহু বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন। তাঁহার শাসন-ব্যবস্থার উপরই পরবর্তী মোগল-শাসন ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। **সিধা আগাগোড়া…তেরচা**—শের শাহ-নির্মিত এই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড প্রশস্ত সরল, ইহার কোথাও কোনো বক্রতা নাই, ইহাই কবির অভিমত। **তেরচা**—তির্যক। **ভারতের·· প্রান্ত**--পূর্ব ভারতের পশ্চিম বাঙলা হইতে পশ্চিম ভারতের আর এক প্রত্যন্ত পেশোয়ার, এই দুই প্রান্তকে সংযুক্ত করাই যেন এই পথের দায়িত্ব ছিল, তাহা সে পালন করিয়াছে। **গঙ্গার···হয় ঈর্ষা**—দৈর্ঘ্যে ভারতের বহু জনপদ-স্পর্শী দীর্ঘ গঙ্গার ধারাপথের উপযুক্ত

সঙ্গী এই পথ। বস্তুত পথের এই অবিশ্রান্ত দৈর্ঘ্য ঈর্ষা করিবার মত। **তুমিই মিশালে··চালতায়**—আম, আখরোট, আলুবোখরা, চালতা ভিন্ন দেশের ফল ও ফসল। সেই সকল দেশের উপর দিয়া গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড চলিয়া গিয়াছে বলিয়া এই পথ সেই সব বিভিন্ন ফসলকে একটি ঐক্যসূত্রে বাঁধিয়া দিয়াছে। **এক পর্দায়**—অর্থাৎ এক স্তরে, এক শ্রেণীতে। **সর্দায়**—ফুটি ও তরমুজ জাতীয় এক প্রকার ফল (সবদা হিন্দী)। **পুনকো**—নটে শাকের মত একজাতীয় শাকবিশেষ। **বাঙালী · আলতায়**—গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড কত দেশের বিচিত্র জাতি ও সংস্কৃতির মানুষকে, তাহাদের আচার-আচরণ ব্যবহার্য দ্রব্য-খাদ্যবস্তুকে এক সূত্রে গাঁথিয়াছে' বাঙালী এবং তুর্কী এই পথের বাঁধনে বাঁধা পড়িয়াছে, কোথাও দুর্গামন্দির কোথাও প্রাচীন কেল্লা, এই পথের ধারেই অবস্থিত। কোনো দেশের জদা ব্যবহারের পদ্ধতি, কোথাও সাঁচিপানের ব্যবহার, কোথাও সুর্মা চোখে দেওয়ার রীতি, কোথাও চরণ আলতায় রাঙাইবার ব্যবস্থা—সবই যেন এই এক পথের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া আছে।

(সপ্তম-অষ্টম স্তবক) **তুমিই মিশালে বঁড়্শী**—শাল ও মসলিন, হুঁকা ও ফরশী, মিহিদানা ও বেদানা, বর্শা ও বঁড়শী—এইগুলি ভিন্ন ভিন্ন দেশের বস্ত্র, খাদ্য ও ব্যবহার্য দ্রব্যাদি—পথের সূত্রে সবই সম্মিলিত, অর্থাৎ এই সকল জিনিসপত্রের মধ্য দিয়া নানান দেশ ও জাতিই যেন পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হইয়াছে আর এই মিলন ঘটিয়াছে এই পথের বন্ধনে। **ফরশী**—লম্বা নল লাগানো হুঁকা বা গুড়গুড়ি (আরবী শব্দ)। **বালাম**—প্রকৃতপক্ষে ভারবাহী বড় নৌকার নাম বালাম, এই নৌকায় বাখরগঞ্জে উৎপন্ন একপ্রকার সরু চাল চালান যাইত বলিয়া উক্ত চালের নাম বালাম। **বাসমতী**—সুবাসযুক্ত একপ্রকার ধান্য ও সেই ধানের চাল বিশেষ। **বিলকুল ছুটছে**—কোথাও কোনো যন্ত্রণা নাই ক্লেশ নাই, জীবনযাত্রা প্রতি মুহূর্তে মসৃণগতিতে ধাবমান। **বিলকুল**—সমুদয়, সমস্ত। **তক্‌লিফ**—ক্লেশ, কষ্ট, পীড়া। **হরঘড়ি**—প্রতি মুহূর্তে, সবদা। **উষর**—অনুবর, রুক্ষ। **বাঙালার···ঝুরছে**—এই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড পাড়ি দিয়া কবি ভৌগোলিক দিক হইতেই ভারতদর্শন করিলেন না, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক দিক হইতেও ভারতের বিচিত্র জনজীবন, আচার-ব্যবহার, বেশভূষা, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদির এক বিপুল বিচিত্র সমন্বয় দেখিতে

পাইলেন, যাহা পথের টানে মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই দীর্ঘ পথের পথিক হইলেও কবি একান্তভাবে বাঙলা দেশের সন্তান, বাঙালী এই পরিচয়েই তাঁহার গর্ব ও শান্তি। তাই সারা ভারতের সব জাতি সব সম্প্রদায়-সমন্বয়ের বদলে বাঙলা দেশের আকাশ-বাতাস ভূ-প্রকৃতির জন্যই তাঁহার সমগ্র সত্তা ব্যাকুল।

ব্যাখ্যা

চলিয়াছ তুমি এলায়ে কেশ-ভার।

রবীন্দ্রযুগের বয়োজ্যেষ্ঠ কবি পল্লীপ্রেমিক কুমুদরঞ্জন মল্লিকের গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড কবিতা হইতে সংকলিত এই প্রথম স্তবকটিতে কবি ভারতের ঐতিহাসিক জাতীয় জনপথ গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের দীর্ঘতার প্রশস্তি এবং কবিচিত্তের উপর তাহার আহ্বানের কথা নিবেদন করিয়াছেন। মধ্যযুগে সম্রাট শের শাহ্ নির্মিত এই পথ পশ্চিম বাঙলার একটি শহর হইতে সুদূর পশ্চিম ভারতের পেশোয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অতুলনীয় দৈর্ঘ্যে ইহা ভারতের যাবতীয় রাজপথ-জনপথের সম্রাটতুল্য। এই দূরবিসর্পিত পথটি কত নদ-নদী কত দেশের নগর জনপদের সহিত পরিচিত হইবার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করিয়াছে। ইহার বিভিন্ন স্তরে কত মানুষের শোভাযাত্রা, কত দেশের আচার-ব্যবহার ও খাদ্যদ্রব্য অপেক্ষা করিতেছে। এই পথ বাহিয়া সুদূর পশ্চিম ভারতের আঙুর পেস্তা কিসমিস প্রভৃতি ফল আস্বাদন করিবার জন্য কবির রসনা লোভাতুর হইয়া উঠিতেছে। কেবল রসনাকেই এই পথ আকৃষ্ট করে না, ইহার আহ্বান চিত্তের দূরাভিযান-পিপাসার নিকটও। কোনো গিরিকন্দরের সংকীর্ণ খাত খাইবার—কবি শুনিয়াছেন এই পথেই সেখানে যাওয়া যায়। হিমালয়ের সেই সংকীর্ণ গিরিপথের আহ্বান তাঁহার নিকট মেলিয়া ধরে এই পথ। সুদূর অজ্ঞাত অঞ্চল যেন ডাকিনীর মত, তাহার রহস্যময় কেশগুচ্ছ অরণ্যে প্রান্তরে পর্বতে ছড়াইয়া সে হাতছানি দিতেছে অজানিত রহস্য ও মায়ার আকর্ষণে কৌতূহলী চিত্তের নিকট। দূরের সেই রহস্যমেদুর হাতছানি এই পথ বাহিয়া গৃহচারী কবির নিকট সমাগত হইয়াছে।

ধর্ম তোমার⋯⋯করিছে সন্ধির।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড কবিতা হইতে উদ্ধৃত এই চরণগুচ্ছে রবীন্দ্রানুরক্ত কবি কুমুদরঞ্জন বহুদেশস্পর্শী উক্ত পথের বিচিত্র সমন্বয়ধর্মিতার প্রশস্তি করিয়াছেন।

নানা ধর্মাবলম্বী মানুষের বাস এই পথের এক একস্থানে, তাহাদের ধর্মাচরণের বৈশিষ্ট্যগুলিও এই পথের ধারেই শোভমান। হিন্দুর মন্দির, মুসলমানগণের মসজিদ, প্রতিদ্বন্দ্বী খ্রীস্টানদের বহু গির্জা এই বিপুল বিস্তৃত পথের ধারে অবস্থিত কত নগরে লোকালয়ে অবস্থান করিতেছে। ইতিহাসে প্রতিটি ধর্ম কতবার আত্মগর্বে অপরকে আঘাত করিয়াছে, পরস্পরের প্রতিযোগিতা করিয়াছে, কিন্তু পথের সহিত কাহারও বিবাদ নাই। পথ সকলকেই ধারণ করিয়াছে। মন্দির, মসজিদ, গির্জা সব ধর্মের স্পর্শে এই পথ একটি উদার বিশ্বজনীন নিজস্ব ধর্ম লাভ করিয়াছে—তাহা পথ চলার ধর্ম, সহিষ্ণুতার ধর্ম। পথের ধারে দাঁড়াইয়া আছে কত স্মৃতিসৌধ কত সমাধিমন্দির—তাহাদের চূড়ার গম্বুজগুলি স্থাপত্যের দর্শনীয় নিদর্শন সেগুলি কোথাও দুর্মূল্য মণিমাণিক্য পাথরে খচিত। এই সকল বর্তুলাকৃত গম্বুজ দেখিয়া কবির মনে হইতেছে যেন কৃষ্ণবর্ণের জলে শুভ্রকান্তি শ্বেতপদ্ম ভাসিতেছে। সৌন্দর্যে-শোভায় সেই স্থানগুলি অপূর্ব সুষমা ধারণ করিয়াছে। কবির মনে হইতেছে যেন স্বর্গমর্ত কৌশল করিয়া একস্থানে মিলিত হইবার জন্য এই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের পাশেই নামিয়া আসিয়াছে। এমনই এ রাস্তার বিচিত্র পরিবেশ।

পথ দেখাইয়া · ·কোথাও আভীর-পল্লী

ভারতবিখ্যাত ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড কত অতীত ইতিহাসের নীরব সাক্ষী, কত বিচিত্র জীবনছন্দের দর্শক, ইহাই কুমুদরঞ্জন মল্লিকের গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড কবিতা হইতে উৎকলিত বক্ষ্যমাণ স্তবকের বক্তব্য। এই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপরই ভারত-ইতিহাসের বহু যুদ্ধায়োজনের স্মৃতিক্ষেত্র পানিপথের অবস্থান। এই পানিপথের যুদ্ধে একাধিকবার ভারতবর্ষের ভাগ্য নির্ধারিত হইয়াছে, ভারতসাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লির উত্থান-পতন এই ভাগ্য নির্ধারণের সঙ্গে ছিল ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সুতরাং সেই সকল পতন-অভ্যুত্থানের সহিত জড়িত এই নীরব পথ। ইহার অপরিমেয় দৈর্ঘ্যহেতু এক এক অঞ্চলে এক একপ্রকার জীবনযাত্রা। কোথাও হয়ত একদল মানুষ সারেঙ্গি বাজাইয়া আনন্দে কোলাহল করিতেছে, কোথাও কাহারও আশার বীণার তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে, তাহার জীবন হইতে সংগীত-কোলাহল অন্তর্হিত হইয়াছে। কোথাও প্রাসাদোপম গৃহের শীর্ষদেশ সুনির্মিত হইতেছে, আবার কোথাও

হয়ত ঘন অরণ্যে ঝিল্লি ডাকিতেছে। কোনো আরণ্যক অঞ্চল হিংস্র ব্যাঘ্র অধ্যুষিত কোথাও বা গোপশ্রেণীর গ্রাম শোভা পাইতেছে।

সারঙ—একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র (সারেঙ্গি) অথবা রাগবিশেষ। পরবর্তী চরণে 'কোথা বীণাতার টুটছে'-এর সঙ্গে সংগতি রক্ষা করিয়া বাদ্যযন্ত্ররূপে গ্রহণ করাই সুবিবেচনা।

তুমি নিয়ে যাও ·· ·স্থাপো বসতি।

আলোচ্য পংক্তিগুলি কুমুদরঞ্জনের গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড কবিতা হইতে উদ্ধৃত। এখানে কবি ইতিহাসের অতীত স্মৃতির দ্বার উন্মোচন করিয়া দেখিতেছেন, এই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর দিয়া কত দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী প্রাণঘাতী সমরাভিযান করিয়াছে। কত পদাতিক অশ্বারোহী গজারোহী সৈন্যবাহিনী দুর্মদ যুদ্ধনেশায় কামান প্রভৃতি মারণাস্ত্র লইয়া এই পথ বাহিয়া ছুটিয়া গেছে শত্রুপুরীর উপর। পথে কত নিরীহ গ্রাম তাহারা ধ্বংস করিয়া গেছে। দেশের ফসল তাহারা লুঠ করিয়াছে, অসংখ্য মানুষ হত্যা করিয়াছে, আর সেই মৃতদেহের হাড় চতুর্দিকে নিষ্ঠুরের মত ছড়াইয়া গিয়াছে। আজ আর এই পথ দিয়া সেনা-বাহিনী হত্যাভিযানে যায় না, কিন্তু এখনো এই পথের উপর দিয়া অসংখ্য মানুষ দিনরাত্রি অন্য কোনো অভিযানে চলিয়াছে। কেহ যাইতেছে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া, কেহ সম্প্রদায়ের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলিয়া, কেহ বা চলিতেছে তীর্থাভিমুখে। পথ আজ সকলকে এক করিয়া দিয়াছে। এই পথের ধারে কোথাও কামারের কর্মশালা, যেখানে পথের স্নেহে কঠিন লৌহপিণ্ড গলিয়া যাইতেছে। কোথাও নদীর ধার দিয়া পথ চলিয়াছে, যেখানে মানুষের উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে। [পথ কিরূপে দরিয়ায় বসতি স্থাপন করিবে, তাহার অর্থ স্পষ্ট নয়]।

তুমিই মিশালে শালে····· ·পাড়া-পড়শী।

স্নিগ্ধরসের কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড কবিতা হইতে সংকলিত আলোচনীয় স্তবকে কবি ভারতের দীর্ঘতম জাতীয় সড়কের দ্বারা কিভাবে বিচিত্র সংস্কৃতির দেশ ভারতবর্ষের এক মহান সাংস্কৃতিক ঐক্যবন্ধন ঘটিয়াছে তাহারই ইঙ্গিত দিয়াছেন। বহু বিচিত্র ভাষা নরগোষ্ঠী আচার-ব্যবহার আহার্য-বস্ত্র ধর্মের দেশ ভারতবর্ষের বুকের উপর দিয়া প্রসারিত এই

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নানা ধর্মমত দ্রব্য আচার-ব্যবহারকে একই সরলরেখায় ঐক্যে বিধৃত করিয়াছে। কোথাও শালের ব্যবহার, কোথাও মসলিনের ঐশ্বর্য, কোনো দেশে হুঁকা, কোথাও আলবোলার ঐতিহ্য, কোথাও মিহিদানার খ্যাতি, কোথাও বেদানার জন্ম—এক কথায় নানা বিচিত্র জাতি ও দেশগত বৈশিষ্ট্য এই ভারতবর্ষে বর্তমান। বর্শা ও বড়শী, হিঙ্ ও কলাই, ভুট্টা, বালাম, বাসমতি—সবই এক একটি পথের টানে মিশিয়া গিয়াছে। পথের যোগে কেহই আর দূরদূরান্তে বাস করে না, সব দেশ সব জাতি এই পথের ধারে প্রতিবেশীর মত।

প্রশ্ন ১। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড কবিতার মধ্য দিয়া কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সাধনার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহার আলোচনা কর।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নামক যে সুদীর্ঘ পথটি বহুযুগ ধরিয়া কলিকাতা হইতে পেশোয়ার পর্যন্ত প্রসারিত, যাহা ভারতের দুই প্রান্তকে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার প্রতি চাহিয়া কবির বিস্ময়ের অবধি নাই। ইহা ভারতবর্ষের সমন্বয়ব্রতী জীবনাদর্শের প্রতীক। বিচিত্রের মধ্যে, বিরোধের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করিয়া এই ভারতবর্ষ বহুযুগ ধরিয়া যে সমন্বয় রচনা করিয়া চলিয়াছে, এই দীর্ঘায়ত জনপদটি যেন তাহারই একটি আদর্শ প্রতিনিধি। ভারতের নানা স্থানে নানা-ভাষা, নানা-মত, আচার-ব্যবহার-সংস্কার, রীতি-নীতি ও আহার-বিহার প্রচলিত। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ইহার বিভিন্নতা—একটির সঙ্গে আর একটির কোনো মিল নাই। অনেক সময় এক-একটি ধর্ম আর একটি ধর্মকে আক্রমণ করিয়াছে, পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘৃণা ঈর্ষার সৃষ্টি করিয়াছে, আপন ধর্মের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার জন্য বৃহৎ চূড়াযুক্ত বিশাল উপাসনালয় নির্মাণ করিয়াছে। কিন্তু পথ কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করে নাই, সকলকেই সাগ্রহে বরণ করিয়াছে। তাহার ধর্ম পথিকধর্ম, তাহা বিশ্বজনীন প্রেম ও সৌভ্রাত্রের, তাহা সমন্বয় ও সহিষ্ণুতার, তাহা ঐক্যের ও মিলনের ধর্ম।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক প্রকৃতির বিভিন্নতা হেতু এক এক দেশে এক এক প্রকার শস্য ফসল জলবায়ু সংস্কৃতি ও আচার-ব্যবহার গড়িয়া উঠে। কিন্তু এই সকল পরস্পর-বিরুদ্ধ দেশগুলির উপর দিয়া যদি কেহ একটি

মৈত্রীর বন্ধন রচনা করিতে পারে তাহা এই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। বহু বিরোধ-বৈচিত্র্যের মধ্যে যোগস্থাপন করাই যেন তাহার নীরব সাধনা। এই পথের কোনো স্থানে ইতিহাসের ভাগ্যপরিবর্তনের পদচিহ্ন অঙ্কিত, কোথাও বিজয়-সেনানীর ধ্বংসাত্মক অভিযানের স্মৃতি নিহিত, আবার তাহারই আর এক ধারে নূতন কালের সৃষ্টি গড়িয়া উঠিতেছে। এই পথের কোথাও সমবেত কোলাহলে সংগীতের আনন্দধ্বনি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, কোথাও কাহারও আশাভঙ্গের নীরব বেদনা দেখা যায়। কোথাও নির্জন শ্বাপদসংকুল অরণ্যে ঝিল্লির রব, কোথাও ক্ষুদ্র গ্রাম্য পল্লী। নানা দেশের ফলমূল-বস্ত্র-ধর্ম-শস্য-উদ্ভিদ যতই পৃথক্ হোক এই পথের পার্শ্বে সবই যেন এক বৃহত্তর ঐক্যের অন্তর্ভুক্ত। আমের সহিত আখরোট, হুঁকার সহিত ফরশী, ফুটির সহিত সরদা, পুনকো শাকের সহিত পালং-পলতা, বাঙালীর সহিত তুর্কী, দুর্গামন্দিরের সহিত দুর্গ, ভুট্টার সহিত চাল, জর্দার সহিত সাঁচিপান, সুর্মার সহিত আলতা, মিহিদানার সহিত বেদানা—কী বিচিত্র সব বস্তুই যে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া মিলিতে মিলিতে চলিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ভারতের দুই সুদূর-প্রান্ত-স্পর্শী এই পথটি একমাত্র গঙ্গার সঙ্গী হইবার উপযুক্ত। এই পথ আজ কবিকে দূরদুর্গম অজানা অঞ্চলের রহস্যময় হাতছানি দিয়া ডাকে। কত বিচিত্র খাদ্যদ্রব্যের দিকে রসনাকে লালায়িত করে। এই বিচিত্র আচার ও সংস্কার, জাতিবৈশিষ্ট্য ও আহার্যকে সমসূত্রের বন্ধনে বাঁধিয়া দিয়াছে যে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, কবি সেই ভারত-রাজপথের উপর দিয়া তাঁহার মানস-পর্যটন সমাপ্ত করিয়াছেন। ইহা একপ্রকার ভারত-দর্শনেরই নামান্তর।

প্রশ্ন ২। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড কবিতায় কুমুদরঞ্জনের কবিপ্রকৃতির যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহার আলোচনা কর। প্রসঙ্গত 'বাঙালীর ছেলে বাঙলার লাগি তবু আঁখি মন ঝুরেছে' এই পঙ্‌ক্তির দ্বারা কবি কী বলিতে চাহিয়াছেন বুঝাইয়া দাও।

রবীন্দ্রযুগের কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক একদিকে যেমন পল্লীজীবনের স্নিগ্ধ মাধুর্যকে তাঁহার কাব্যে বিধৃত করিয়াছেন, অসীম মমতায় মাখাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন, অন্যদিকে ভারতবর্ষের শাস্ত্র-পুরাণ-ইতিহাস, অতীত গৌরব ও মানব-মহিমা ইহার প্রতিও তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। যে ভারতবর্ষ পুরাবৃত্ত ও ভৌগোলিক রূপবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া সনাতন মনুষ্যত্ব ও সর্বজনীন মিলনের

একটি পুণ্যক্ষেত্র রচনা করিয়াছে তাহার প্রতি কবির প্রণতি অসংখ্য কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে। ইতিহাস-শাস্ত্র-পুরাণের সহিত কবির আন্তরিক যোগ ছিল। একদিকে ভারতচেতনার স্বভাবটি রবীন্দ্রনাথের ভারত-তীর্থ কবিতার উত্তরাধিকার, অন্যদিকে ইতিহাস-পুরাণের তথ্যকে কেন্দ্র করিয়া কবিকল্পনার প্রসার—ইহা সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাবসঞ্জাত। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড কবিতায় দুই প্রভাবই সমীকৃত হইয়াছে। পথের প্রতীকে বিচিত্রের মিলনবন্ধ আবিষ্কারের দৃষ্টি ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনাকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

কুমুদরঞ্জন স্বচ্ছন্দ সাবলীল চিন্তার কবি। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃশ্য কবির নিকট কোন বস্তুময় তথ্যবর্ণনার আবেদন জানায় না। বস্তু ও তথ্যের মধ্য দিয়া কুমুদরঞ্জন তথ্যের অতিরিক্ত একটি সত্য আবিষ্কারেরও চেষ্টা করেন। কিন্তু সেই সত্য হয়ত গভীর অন্তর্ভেদী কল্পনার দ্বারা উদ্ভাসিত নয়, হয়ত উদ্ভট খেয়ালি কল্পনার দ্বারাই তাহার আখ্যানপত্র রচিত, তথাপি নিছক বর্ণনারস অপেক্ষা ইহা উচ্চাঙ্গের। কুমুদরঞ্জন গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডকে ভারতবর্ষের নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধানের মধ্যে সংযোগ-রক্ষাকারী বিচিত্রের সেতুবন্ধ-স্বরূপ দেখিয়াছেন। এই দেখার মধ্যে হয়ত গভীর জীবনদর্শন নাই, কিন্তু কষ্ট-কল্পনাও নাই। নিতান্ত স্বাভাবিক সহজ চিন্তায় এই সত্য উদ্ভাসিত হইয়াছে : একটি দীর্ঘ বিসর্পিত পথ কেমন করিয়া বিসদৃশ বস্তুকে এক করিয়া দেয় তাহার সামান্য চিন্তা মাত্র কবি কবিতাটি লিখিয়া ফেলিয়াছেন। চিন্তার এই স্বাভাবিকত্ব ও দ্রুততাই তাঁহার কবিবৈশিষ্ট্য। আম-আখরোট-আলু-বোখারা, পুনকো-পালঙ্-পলতা, ফুটি-সরদা, ভুট্টা-বাদাম-বাসমতি, হিঙ-কলাই, জর্দা-সাঁচিপান, শাল-মসলিন—ইত্যাদি বহু আপাত বিসদৃশ বস্তুর নাম-সংগ্রহে তাঁহার সত্যেন্দ্রসুলভ কৌতূহল যেখানে তীব্র হইয়া উঠিয়াছে সেখানে কবিতাটি ঈষৎ বস্তু-ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যেখানে তিনি সাঙ্কেতিকতার সৃষ্টি করিয়াছেন, সেখানে গভীরতার স্পর্শ আছে, যথা—

কোথাও তোমার বাজিছে সারঙ কোথাও ডাকিছে ঝিল্লি।

কবিতার সমাপ্তিচরণে কুমুদরঞ্জনের পল্লীপ্রীত বঙ্গীয় মনটি অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। কুমুদরঞ্জন নানা বিষয়ে কবিতা রচনা করিয়াছেন ঠিকই, কিন্তু যেখানে তিনি পল্লীনিষ্ঠ, প্রকৃতিঘনিষ্ঠ, বঙ্গসৌন্দর্যব্যাকুল, গ্রামকেন্দ্রিক, সেইখানেই তাঁহার কবিধর্ম স্বতঃস্ফূর্ত এবং

রসঘনতম। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড অপেক্ষা অজয়ের চর, তাঁহার বহুজন্মের ভিটা, গৃহসন্নিধ অশথতরুটি, তাঁহার গ্রামের রেলোয়ে স্টেশনটি—এইগুলিই তাঁহার প্রিয়, তাঁহার কল্পনার নিত্যসঙ্গী। সুতরাং গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের মধ্য দিয়া ভারত-পরিক্রমায় তাঁহার কবি-কল্পনা যথেষ্ট তৃপ্তিলাভ করে নাই। খেয়ালি কল্পনার দ্বারা এই পথের মধ্য দিয়া তিনি ভারতবর্ষের বহু বিসদৃশ বস্তুর মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পাইয়াছেন—কিন্তু শেষ মুহূর্তে ভারত-দর্শন সমাপ্ত করিয়া কবি তাঁহার স্বভূমি, স্বগ্রাম, স্বভ্রমণক্ষেত্রে রুদ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মুক্তি, তাঁহার আনন্দ, তাঁহার লীলাবিহারের স্বাধীন ক্ষেত্র এই বাঙলা দেশই। এখানকার ভৌগোলিক প্রকৃতিই তাঁহার চিরবাঞ্ছিত, ইহাই তাঁহার ঐক্যসূত্র, এই কথা উল্লেখ করিয়া তাই কবি তাঁহার কবিতা সমাপ্ত করিয়াছেন। ইহাতে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড কবিতার ভাবসংলগ্নতা শেষ চরণে হঠাৎ যেন ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে কবির স্বকণ্ঠসংগীত শুনিয়া হঠাৎ বস্তু-সমাবিষ্ট তথ্যপ্রধান কবিতায় আমরা একটি মৃন্ময় গীতিরস লাভ করিলাম, ইহাও কম্ কথা নয়।

লোহার ব্যথা : যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

ভূমিকা

মধ্যাহ্নে ধূমকেতুর ন্যায় রবীন্দ্রযুগে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের আবির্ভাব আধুনিক বাঙলা কাব্যে একটি বিস্ময়। রবীন্দ্রযুগের ভাবপ্রবণতা সৌন্দর্যমুগ্ধতা প্রেমাকুলতা প্রকৃতিব্যাকুলতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত এমন একজন কবি যিনি জীবনের তিক্ততার মধ্যে অপটু-সন্তরণে অহরহ ক্লান্তবাহু, সৌন্দর্যের মিথ্যা স্তাবকতায় বিরক্ত, মানুষের নির্বিচার দুঃখে হতোদ্যম, সংসারের শতচ্ছিদ্র বসন ঢাকিতে ঢাকিতে লজ্জিত, এহেন কবির নামই যতীন্দ্রনাথ। ধাতুপ্রকৃতি ও মেজাজে যতীন্দ্রনাথের কাব্যে একটি অসহিষ্ণু বিদ্রোহ দেখা যায় এবং তাহা সর্বাংশে পরিচালিত হইয়াছে রাবীন্দ্রিকতার বিরুদ্ধেই। মরীচিকা, মরুশিখা, মরুমায়া, প্রভৃতি কাব্যনাম হইতেই বোঝা যায়, এই পর্জন্যমেদুর শ্যামলকোমল বাঙলা দেশের ভাবার্দ্র আবহাওয়া তাঁহার রৌদ্রতীক্ষ্ণ কবি-

কবিবৈশিষ্ট্য

মরুভূমির প্রতীক

স্বভাবের পক্ষে অনুকূল ছিল না। জীবন ও সংসারের মন্থনজাত অমৃত তাঁহার অদৃষ্টে জোটে নাই, বিষের ভাগই জুটিয়াছিল। সেই বিষ পান করিয়া কবি নির্জীব দুঃখে নিত্যবিষণ্ণ—আর এই কারণেই কবির কাব্যে কল্পদেবতাও শ্মশানবাসী, ভস্মাচ্ছাদিত নীলকণ্ঠ শিব (মাধুকরী সংকলনের অন্তর্গত ভিখারী দেব কবিতাটি দ্রষ্টব্য)। যাহা কিছু তথাকথিত সুন্দর ও মধুর, প্রেমময় ও ললিত, তাহা ভাবালু দৃষ্টির আত্ম-বঞ্চনা মাত্র, এইজন্য সন্দিগ্ধ কবি কখনই সেই তথাকথিতের প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করেন নাই। অন্ধ সংস্কার ও প্রচলিত বিশ্বাস, সত্যশিবের অভ্রান্ত বিজ্ঞাপন, রূপরসগন্ধের স্বাভাবিক আয়োজন—এ সবই যতীন্দ্রনাথের তির্যক অনুকম্পা ও অসন্তুষ্ট প্রতিবাদ লাভ করিয়াছে। ঈশ্বরের অবিচারপরায়ণতা ও মানুষের প্রতি তাঁহার মঙ্গলবিধানের অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের ক্রমাগত স্খলনহেতু বিশ্ববিধাতাও যতীন্দ্রনাথের ক্লিষ্ট কটাক্ষ হইতে অব্যাহতি পান নাই। যতীন্দ্রনাথের অভিমান সবাপেক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে প্রকৃতি বর্ণনায়। তাঁহার চোখে বাঙলা দেশের প্রকৃতি ব্যাধিক্লিষ্ট ক্ষুধাতুর দুঃখজর্জর ও ক্ষতদগ্ধ মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনেরই মত। 'হে মাতঃ বঙ্গ শ্যামল অঙ্গ ভরে গেছে খানা ডোবাতে'—রবীন্দ্রনাথের শরৎ কবিতার এই খ্যাতনামা প্যারডি যতীন্দ্রনাথেরই রচনা। কিন্তু নিছক প্রতিবাদ, অসহিষ্ণু অভিমান বা গৃহীত সিদ্ধান্তের নির্বিচার প্রত্যাখ্যান কোনো মৌলিক কবিপ্রতিভার স্থায়ী গৌরব হইতে পারে না। যতীন্দ্রনাথের একটি জীবনাদর্শ ছিল, নিজস্ব একটি বিশ্বাস ছিল—শেষ জীবনে তাঁহার কবিতায় অসন্তোষ ঈষৎ স্তিমিত হইলেও এই জীবনদর্শন পরিবর্তিত হয় নাই। এই জীবনাদর্শকে এক কথায় দুঃখবাদ বলা যায়। ইহা ঠিক নৈরাশ্যবাদ নয়, জগৎ ও জীবনের দৃশ্যমান বস্তু ও পদার্থকে দুঃখের ব্যাখ্যায় সম্পূর্ণ করিয়া দেখাই ইহার লক্ষণ। মোটের উপর কবি মানবতাবাদী, নিপীড়িত মানবাত্মা তাঁহার সহানুভূতি ও বেদনাবোধ হইতে কখনই বঞ্চিত হয় নাই। এই দিক দিয়া তিনি আধুনিক বুদ্ধিজীবী কবিতায় একটি নূতন সুর প্রবর্তন করিয়াছেন। যতীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থগুলি যথাক্রমে মরীচিকা, মরুশিখা, মরুমায়া, সায়ম্, ত্রিযামা, নিশান্তিকা ও অনুপূর্বা।

শিবের উপাসক

বিদ্রোহ প্রতিবাদ ও অসন্তোষের কাব্যকার

প্রকৃতি সম্পর্কে নূতন দৃষ্টি

যতীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শন

মানবতাবাদী কবি

উৎস

লোহার ব্যথা কবিতাটি যতীন্দ্রনাথের মরুশিখা কাব্য হইতে গৃহীত। আলোচ্য কবিতায় দুঃখবাদী কবি কর্মকারের কামার-শালায় হাতুড়ির আঘাতে পিষ্ট লৌহপিণ্ডের মধ্যে এক আঘাতজনিত বেদনা অনুভব করিয়াছেন। আপাতদৃষ্টিতে বুদ্ধিমান মানুষের নিকট লোহার ব্যথা বলিয়া কিছু নাই, কিন্তু যতীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম কবিহৃদয়ের নিকট কঠিন ধাতব পিণ্ডের ব্যথাও অনুভূত হয়। বিশেষ করিয়া অবিরাম উত্তপ্ত অগ্নিতে গলিতপ্রায় যে লৌহ কঠিন নির্মম হাতুড়ির নিরন্তর আঘাতে মানুষের ব্যবহার্য সুবিধাজনক পদার্থে পরিণত হইতেছে, তাহা তো একহিসাবে এই সংসারের নিপীড়িত কর্মজীবী মানুষেরই প্রতিনিধি। এই সূক্ষ্ম রূপকারোপের ফলেই কবিতাটি আমাদের অভিভূত করে। লোহার ব্যথা এই অসংগতিপূর্ণ নামকরণের মধ্যে গভীর ব্যঞ্জনা নিহিত বলিয়া এই নামকরণ সার্থক হইয়াছে।

দুঃখবাদী কবির দৃষ্টিভঙ্গি

লোহার ব্যথা নামকরণ

ভাবার্থ

লোহা গলাইয়া পিটানোই যাহার একমাত্র কর্ম, সেই কামারের কর্মশালায় প্রভাত হইতে রাত্রি পর্যন্ত জ্বলন্ত অগ্নিতে গলিত হইয়া হাতুড়ির কঠিন আঘাতে পীড়িত লৌহপিণ্ড গভীর রাত্রে যেন ক্লান্তিবোধ করিয়া প্রভু কর্মকারের নিকট বিশ্রাম প্রার্থনা করিতেছে। এখন পল্লী নিস্তব্ধ ঝিল্লিমুখর, এখন অস্তত যন্ত্র তুলিবার সময় হইয়াছে। নেহাইয়ের উপর হাতুড়ির ঘা এখন নেহাইয়ের করুণ আর্তনাদের ন্যায় শুনাইতেছে, অগ্নি যেন নিদ্রাঘোরে ক্লান্ত, সাঁড়াশি শ্রান্ত হইয়া শিথিলভাবে ছেনিটি চুম্বন করিতেছে, হাপর রুদ্ধশ্বাস, হাতুড়ি বিরামপ্রত্যাশী। সমগ্র বিশ্ব যখন অবসন্ন তখন কর্মকার তাহার বজ্রমুষ্টি শিথিল করুক। কর্মকারের হয়ত মনে নাই, কিন্তু ভোর হইতে কতভাবে সে হাতুড়ির ঘায়ে রূপান্তরিত হইল, কর্মকার কতভাবে তাহাকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া জলে ডুবাইয়া তাহার দুঃসহ দাহ শীতল করিল, পীড়িত লৌহ তাহা ভুলে নাই। দুইজন অপরিচিত শ্রমিকের কঠিন পেষণে, কখনও অকারণে দ্বিখণ্ডিত হইয়া লৌহ তাহাদের পীড়ন সহ্য করিল। এখন বহু রূপান্তরে কঠিন পিণ্ড তাহার পূর্বরূপ

বস্তুবিশ্লেষণ

যেন চিনিতেই পারে না, চিন্তা করিতে গেলে পুরস্কার-স্বরূপ পুনবার হাতুড়ির আঘাত জোটে। তথাপি শাঁড়াসির পেষণে হাতুড়ির আঘাতে নিরুপায় লৌহপিণ্ড চূর্ণ হইয়া যায় নাই, সে তাহার সমতুল কাঠিন্যে এই আঘাত ফিরাইয়া দিয়াছে, ইহাই তাহার গর্ব। লৌহের বক্ষেও যে বিশুদ্ধ কোমলতা আছে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করাই যেন তাহার ধর্ম, আঘাত জ্বালা সহ্য করিয়াই সে ইস্পাতে পরিণত হয়। কর্মকার-নির্মিত লৌহাস্ত্রে কেহ কাহাকেও হত্যা করে, ইহাতে লৌহের কোনো আত্মপ্রসাদ নাই। কর্মকাররূপ মনুষ্যের অপূর্ব চাতুর্যে একটি লৌহযন্ত্র তাহার ভ্রাতৃতুল্য অপর লৌহকে পিটাইয়া মারিতেছে। এখন রাত্রি সাক্ষী রাখিয়া ক্লান্ত লৌহ কর্মকারের শুভবুদ্ধির নিকট বিরতি প্রার্থনা করিতেছে। কর্মকার ভাল করিয়াই জানে, যে লৌহ তাহার উপার্জনের হেতু। এই হাতুড়ির আঘাত কি তাহার কৃতজ্ঞতার প্রতিদান? অথচ আঘাতক্লিষ্ট পদার্থ কোনোদিন আঘাতকারীর আসন দখল করিতে পারে না।

আলোচনা

লোহার ব্যথা যতীন্দ্রনাথের প্রতিনিধিমূলক কবিতা। জীবন সম্পর্কে কবির তির্যক্ শ্লেষপূর্ণ দৃষ্টি এবং বস্তুদর্শনের মৌলিকতা আলোচ্য কবিতায় প্রতিফলিত হইয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যতীন্দ্রনাথ আপনাকে দুঃখবাদী কবিরূপে ঘোষণা করিয়াছেন—ছবি ও ছন্দে তিনি প্রকৃতির মিথ্যা অবাস্তব রূপের বর্ণনা করেন নাই। তিনি জানেন,

> মিথ্যা প্রকৃতি, মিছে আনন্দ, মিথ্যা রঙিন সুখ;
> সত্য সত্য সহস্রগুণ সত্য জীবের দুখ। [দুঃখবাদী-মরুশিখা]

দুঃখবাদী কবি জীবনে দুঃখের অভিজ্ঞতায় পুড়িয়া জাগতিক সকল বস্তুর অন্তরালে একটি নিত্যবহমান দুঃখের অস্তিত্ব অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার বিষাদখিন্ন হৃদয়ে জগতে কোথাও আনন্দরেখা আছে বলিয়া বোধ হয় না। আপাতদৃষ্টিতে যাহা দুঃখসুখের সহিত নিঃসম্পর্কিত, যাহা জড় নির্জীব, তাহাকেও কবি এক অপরিবর্তনীয় অনিবার্য নিত্যদুঃখের প্রতীকরূপে দেখেন। বস্তুদর্শনের এই তির্যক্ দৃষ্টিই যতীন্দ্রনাথের কবিতাকে একটি অসাধারণত্ব দান করিয়াছে। রাজপথের শান-বাঁধানো কাঠিন্যের ধারে রোপিত বকুলতরুর

আকস্মিক পুষ্পবিকাশের ভিতর তাই তিনি রূপোপজীবিনী নারীর বিষণ্ণ পণ্যপীড়া অনুভব করেন; গৃহশয্যাপার্শ্বস্থিত সযত্ন-ঝুলন্ত কেয়াফুল দেখিয়া তাঁহার মনে হয়—

ঝুলিছে সর্বনাশী
নিজ অঙ্গের নীলাম্বরীতে কণ্ঠে লাগায়ে ফাঁসি!
কসিয়া কোমর বাঁধা,
অলকগুচ্ছে আধঢাকা মুখ অস্বাভাবিক সাদা।

পণ্যদ্রব্যের বাজারে আসিয়া ফলমূল শাকসবজী দেখিয়া স্তম্ভিত কবির চোখে পড়ে—

ফলে ফুলে পাতে শীতের প্রভাতে মাঠের শিশির কাঁদে।

লোহার ব্যথা কবিতাটিও এই পর্যায়ভুক্ত। এখানে লৌহের স্বকণ্ঠ-ভাষণে কবি কর্মকারের কিণাঙ্ক-কঠিন হাতুড়িবদ্ধ হাতের আঘাতে লৌহপিণ্ডের দ্রবীভূত দুঃখ-প্রকাশের যে সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা এক হিসাবে সংসারের নিপীড়িত আঘাতক্লিষ্ট অথচ পিণ্ডবৎ কঠিন শ্রমেরই রূপ মাত্র। লৌহের ধাতব রূপান্তরে, তাহার অবস্থা-পরিবর্তনের অন্তরালে যে গভীর দুঃখের বিলাপ আলোচ্য কবিতায় ধ্বনিত হইয়াছে, তাহা এই বাস্তব জীবনের নির্যাতিত মানুষেরই মর্মন্তুদ ইতিহাস। প্রত্যূষ হইতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত অহর্নিশি আঘাতে আঘাতে মৃতকল্প যাহাদের জীবন মৌন ক্লেশে, অগ্নিতাপে, নির্বাপিত স্ফুলিঙ্গে ক্রমাগত অপরের সুবিধার অস্ত্র হইয়া উঠিতেছে, তাহাদের অন্তরের চারিত্রিক বিশুদ্ধির কথা কবি উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহারা এই কবিতায় আঘাতকারীর বিরুদ্ধে কোনো সম্ভাব্য বিদ্রোহের ইঙ্গিত দেয় নাই—কারণ কবি জানেন 'পিটনের গুণে লোহা কবে হায় পায় কামারের গদি।' লৌহ ও কর্মকারের এই অপরিবর্তনীয় আঘাত-আঘাতক সম্পর্কের নৈরাশ্যই কবির দুঃখবাদ হইয়া দেখা দিয়াছে।

রূপতত্ত্ব বিশ্লেষণ

ও ভাই…কর্ম আর—কামারশালায় অগ্নিদগ্ধ লৌহকে হাতুড়ির দ্বারা পিটাইয়া মনোমত লৌহদ্রব্য নির্মাণ করাই কর্মকারের জীবিকাকর্ম। তাহার কর্মশালার এই নিত্যপিষ্ট আঘাতজর্জর লৌহপিণ্ডের যদি ভাষা থাকিত তবে

হয়ত সে আর্তকণ্ঠে এই কথাই বলিত, তাহাকে পুড়াইয়া পিটানো ব্যতীত কি কর্মকারের অন্য কোনো কর্ম নাই ? বস্তুত ইহা ব্যতীত কর্মকারের অন্য কর্ম থাকিতেই পারে না। কিন্তু কবির সূক্ষ্ম ইঙ্গিত—জীবিকাই কি সব ? নিত্য আঘাতক্লিষ্ট মানুষ ইহা বোঝে না। সে যেন এই যন্ত্রণা, এই অগ্নিতাপ ও নিরন্তর ভাগ্যের মুদ্গরের আঘাত হইতে সামান্য মুক্তি চায়। **কোন্ ভোরে··· গভীর হলো**—অতি প্রত্যুষে কামার তাহার নিত্য কর্ম সুরু করিয়াছে, গভীর রাত্রি পর্যন্ত ইহার আর বিরাম নাই—ইহাই পিষ্ট লৌহের বিস্ময়। প্রকারান্তরে বুঝা যাইতেছে, বিরামহীন দিবারাত্রি অমানুষিক পরিশ্রম করাই কর্মকারের ভাগ্য। **ঝিল্লিমুখর···তোলো**—পল্লীর যে অঞ্চলে কামারশালা অবস্থিত সেখানে আর কেহই এখন জাগ্রত নাই, চতুর্দিক নিদ্রা-নীরব, কেবল সুষুপ্ত পল্লীতে ঝিল্লির ডাক শোনা যাইতেছে। **নেহাই**—যাহার উপর লোহা পেটানো হয় সেই মজবুত লৌহখণ্ড। **ঠকাঠাঁই ছেনি চুমে**—কয়েকটি নিপুণ শব্দে কবি জড় পদার্থের চিত্তেও একটি আঘাতের অনুভবজনিত বেদনা সৃষ্টি করিয়াছেন। গভীর রাত্রি পর্যন্ত কর্মকারের হাতুড়ির আঘাত পড়িতেছে নেহাইয়ের উপর, কর্মকারের বিরামহীন শ্রমের ক্লান্তিবশত সেই শব্দগুলি পূর্বের তুলনায় যেন তত তীব্র নয়। ইন্ধনের অভাব-হেতু অগ্নিও প্রায় নিষ্প্রভ; শাঁড়াসি দিয়া ছেনি ধরা হইতেছে, তাহাতেও যেন জোর নাই—কারণ শ্রমিকটি স্বয়ং শ্রান্তি অনুভব করিতেছে—ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু কবির দৃষ্টিতে উল্লিখিত দ্রব্যগুলি নির্জীব ধাতব দ্রব্যমাত্র নয়, তাহারা কেবল মানুষের হাতে অসহায় উৎপাদনের যন্ত্র। কিন্তু তাহাদেরও অনুভবশক্তি আছে। তাই মানুষ এখনও ক্লান্তিবোধ না করিলেও নেহাই ক্লান্ত—তাহার ঠকাঠাঁই ঠাঁই শব্দগুলিতে তাহার শ্রান্তির বেদনা কবি স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছেন। রক্তাক্ত অগ্নির নিষ্প্রভতা আর কিছুই নয়, তাহার চোখে অবসন্ন নিদ্রাঘোর নামিতেছে। যে শাঁড়াসি দৃঢ় ওষ্ঠে ছেনিকে আঁকড়াইয়া ধরিত, তাহার সেই আকর্ষণের তীব্রতাও শিথিল বলিয়া সে যেন নিতান্ত বিবশ ওষ্ঠে দিয়া ছেনিটিকে চুম্বন করিতেছে। লৌহ এবং অগ্নিও অবসাদ অনুভব করে, কিন্তু মানুষ করে না—ইহা কী নিষ্ঠুরতা—এই কথাই লৌহের বক্তব্য। কিন্তু গভীরতর ইঙ্গিতে বুঝা যাইতেছে—জড়পদার্থ পর্যন্ত শ্রান্ত হয় নিদারুণ শ্রমের আঘাতে, কিন্তু অসহায় শ্রমিকের শ্রান্ত হইবারও

উপায় নাই। **দেখ গো…বজ্র-মুঠি**—অগ্নিতে বায়ু সঞ্চালন করিবার যন্ত্রবিশেষ অর্থাৎ হাপর ক্লান্তিবশত যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে, হাতুড়ি বিরাম প্রার্থনা করিতেছে। সমগ্র পৃথিবী দিবসের শ্রমে যখন ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত তখন কর্মকার তাহার কঠিন বজ্রের ন্যায় দৃঢ় মুষ্টি যেন শিথিল করে, ইহাই লোহার অনুনয়। **রাত্রি দুপুরে…চৌকা করে**—অতি প্রত্যূষে লৌহপিণ্ড লইয়া কর্মকার যখন কর্ম সুরু করিয়াছিল, তখন সেই লৌহ ছিল আকরিক, তাহাকে গলাইয়া পিটাইয়া কর্মকার ইচ্ছামত লৌহদ্রব্য নির্মাণ করিয়াছে। আপনার এই দেহগত বিকারের কথা স্মরণ করিয়া লৌহ যেন বলিতে চায়, এই গভীর রাত্রে সে তাহার প্রাত:কালের পূর্বরূপটিকে স্মরণ করিতে পারিতেছে না, কেবল এইটুকু তাহার মনে আছে তাহার দেহটিকে কর্মকার কতভাবে ভাঙিয়াছে, পুনর্নির্মিত করিয়াছে, সিধা বাঁকা গোল লম্বা চৌকা নানাভাবে তাহাকে রূপান্তরিত করিয়াছে। অর্থাৎ লৌহের নিজস্ব কোনো রূপ আর নাই, সে কর্মকারের ইচ্ছায় নানাভাবে বিকৃত হইতেছে। **কভু আতপ্ত… দাহ মম**—অগ্নিতে দ্রবীভূত করিয়া লোহার দ্বারা দ্রব্য নির্মিত হয়—ইহা স্মরণ করিয়া লৌহ বলিতেছে, নিষ্ঠুর কর্মকার তাহার দেহের উপর কী নিদারুণ অত্যাচার করিয়াছে। তাহাকে নানাভাবে আগুনে পোড়ানো হইয়াছে। কখনো উত্তপ্ত অগ্নিতে, কখনো মৃদু তাপে, কখনও রৌদ্রের মত গনগনে আঁচে লৌহ গলাইবার পর পুনর্বার তাহাকে ঠাণ্ডা জলে ফেলিয়া তাহার অসহ্য দাহনযন্ত্রণাকে শীতল করা হইয়াছে। লৌহের বিলাপের মধ্য দিয়া এইগুলি সবই কর্মকারের কর্মপ্রণালীর পরিচিত চিত্রমাত্র। **অজানা-দুজনে… সাধ**— যে দুইজন কামার লৌহদ্রব্য নির্মাণ করে, তাহারা লৌহের নিকট অজ্ঞাত-পরিচয়, কিন্তু তাহাদের বাসনা-পরিতৃপ্তির জন্য লৌহকে গলানো ও জোড়া দেওয়া হইয়াছে। **খণ্ড হতে ·দিলে বাদ**—দ্রব্য নির্মাণের প্রয়োজনে কর্মকার লৌহের কোনো অনাবশ্যক অংশ বর্জন করিতে পারে। কিন্তু তাহাদের অপ্রয়োজনের সামগ্রী লৌহের নিকট হয়ত অতীব প্রয়োজনীয়। হয়ত এইরূপ অনাবশ্যক বোধে তাহারা লৌহের সমগ্র দেহ হইতে মুণ্ডটিকেই বাদ দিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। **ঘন ঘন…হাতুড়ির বাড়ি**—লৌহপিণ্ডের এইরূপ ক্রমাগত রূপান্তর কর্মকারের হস্তে এত দ্রুত সংঘটিত হয় যে তাহা ধীরভাবে চিন্তা করিবারও সময় মেলে না, তাহার পূর্বেই লৌহের উপর কামারের হাতুড়ি

প্রবলবেগে আসিয়া পড়ে। ভাবার্থে বলা হইল যে, কর্মকারের হাতুড়ি কেবল লৌহের দেহগত রূপান্তরও ঘটাইতেছে না, তাহার চিন্তাশক্তিকে পর্যন্ত প্রতি মুহূর্তে প্রতিহত করিতেছে। ইহা কিসের রূপক আশা করি বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। **আগুনের তাপে ··নিরুপায়**—জলন্ত অগ্নিতাপ এবং কঠিন শাঁড়াশির লৌহবন্ধন—এই দুই অবস্থার নিকট চিরকালের মত বন্দী অসহায় লৌহের নিরুপায়তার আর্তনাদ এখানে নিত্যকালের দুর্ভাগ্যকবলিত মূক মানবাত্মার সহিত সর্বজনীনতা লাভ করিয়াছে। **তবু সগর্বে ··ঘায়**—লৌহের উপর আঘাত করিলেই তাহা' চূর্ণ হইয়া যায় না—তাহার ধাতব কাঠিন্যের উপর প্রতিটি আঘাতই প্রতিহত হয়, ইহাই লৌহের আত্মশক্তির ক্ষীণতম গর্ব। **যাহা অন্যায়···তারে খাদ**—লৌহের মধ্যেও খাদ থাকে; কিন্তু লৌহ যে তাহার উপর নিক্ষিপ্ত কঠিন হাতুড়ির আঘাতকে প্রতিহত করিতে পারে তাহা তাহার আত্মশক্তির জোর। ইহা যেন প্রবলতর অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের যথাসাধ্য প্রয়াস—এই কোমলতাকেই সকলে খাদ বলিয়া থাকে। **তোমার হস্তে···পোড়**—গলিত লৌহ হাতুড়ির ঘায়ে ধারালো হইয়া, আগুনে পুড়িয়া, অন্য ধাতু মিশ্রিত হইয়া ইস্পাতে পরিণত হয়। **পান**—পাইন, ঝাল; যে মিশ্রধাতুর দ্বারা লোহা জোড়া হয়। এই মিশ্রধাতুর সাহায্যে ইস্পাত ইত্যাদিকে প্রয়োজনমত কঠিন করা হয়। **রামের সুখ মোর**—লৌহকে ইস্পাতে পরিণত করিয়া যে অস্ত্র নির্মিত হয় তাহার দ্বারা কেহ তাহার শত্রুকে হত্যা করে। একজনের প্রাণঘাতী অস্ত্র হইয়া লৌহের কোনো চরিতার্থতা নাই, ইহাই তাহার বক্তব্য। **তোমার হাতের···ভায়ে পেটে**—কর্মকারের যাবতীয় যন্ত্রাদিই লৌহনির্মিত। সকলেই কর্মকারের হাতে দিবারাত্র খাটিয়া মরিতেছে। কর্মকারের কৌশলে প্রতিটি যন্ত্র লৌহনির্মিত হওয়া সত্ত্বেও একে অপরকে আঘাত করিতেছে—লোহার হাতুড়ি ও নেহাই তাহাদের ভ্রাতাকে দিনরাত পিটাইতেছে। **ও ভাই···ধর্মতারে**—এই নিস্তব্ধ গভীর রাত্রিকে প্রত্যক্ষদর্শনের সমর্থকরূপে রাখিয়া কামারশালার লৌহ কামারকে ধর্মবোধে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। **কহ গো···দিনের রুজি**—লৌহ কামারকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে যে, যাহাকে সে দিনরাত্রি আহত করিতেছে, সেই লৌহই তাহার জীবিকার একমাত্র হেতু। **তুমি না···তাহে ক্ষতি**—লৌহ ব্যতীত কর্মকারের জীবিকা অচল, কিন্তু কর্মকার না থাকিলেও লৌহের

কোনো ক্ষতিই হইত না। **কৃতজ্ঞতা…মারক্ষতি**—যে লৌহ কর্মকারের অন্নসংস্থানের হেতু তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া তাহাকে হাতুড়ির ঘায়ে আঘাত করায় লৌহ বিস্ময় প্রকাশ করিতেছে। **কি কহিছ… কামারের গদি**—কামারের বিরুদ্ধে লৌহের অভিযোগের প্রত্যুত্তরে কামার একমাত্র লৌহের সহিত তাহার কর্ম বিনিময়ের প্রস্তাব করিতে পারে। কিন্তু তাহার দ্বারা লৌহের, তথা চির-নির্যাতিত আঘাতজর্জরিত মানুষের দুঃখ দূরীভূত হইবে না, এই কথাই কবি একটি তীক্ষ্ণ সংশয়ের নিপুণ বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন। সংসারে সর্বদাই দুইটি শ্রেণী, একজন আঘাতকারী, অন্যজন আঘাতপ্রাপ্ত। আঘাতকারীর আঘাতের ফলে নির্যাতিত ব্যক্তি কখনও স্বয়ং আঘাতকারীতে পরিণত হইতে পারে না।

ব্যাখ্যা

ঠকা ঠাঁই ঠাঁই…তোমার বজ্র মুঠি।

আলোচ্য পংক্তিগুলি দুঃখবাদী কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের লোহার ব্যথা কবিতা হইতে উদ্ধৃত। এখানে কবি কামারশালায় আঘাতপিষ্ট লোহার মুখ দিয়া দিবারাত্রি বিরামহীনভাবে আঘাতপ্রাপ্ত কর্মক্লান্ত মানুষের অবসাদের ইঙ্গিত দিয়াছেন। জীবিকার জন্য কর্মকার প্রভাত হইতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত ক্রমাগত খাটিতেছে—উত্তপ্ত অগ্নিতে লোহা গলাইয়া তাহাকে হাতুড়ির ঘায়ে নূতন দ্রব্যে পরিণত করিতেছে। কিন্তু তাহার ক্লান্তি না থাকিলেও যে দ্রব্যগুলির দ্বারা সে কর্ম নির্বাহ করে তাহাদের ক্লান্তি আছে, অবসাদ আছে। অবিশ্রাম আঘাতে আঘাতে তাহাদের করুণ অবস্থাই লোহার মুখ দিয়া কবি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত প্রকাশ করিয়াছেন। গভীর রাত্রে নেহাইয়ের উপর যে হাতুড়ির ঘা পড়িতেছে সেগুলি যেন তাহাদের আর্তনাদ। অগ্নির সে তাপ নাই, যেন ঘুমে তাহার চোখ শিথিল হইয়া আসিয়াছে। যে সাঁড়াশি কঠিন বন্ধনে ছেনি ধরিত, এখন সে শিথিলভাবে ছেনি স্পর্শ করিতেছে, অর্থাৎ ছেনির প্রতি তাহার পূর্ববৎ প্রেমচুম্বন এখন কত প্রাণহীন। হাপর আর আগুনে বায়ু সঞ্চালন করিতে পারিতেছে না, সে এখন অপরিমিত শ্রমে বিপন্ন হইয়া শ্বাসকষ্ট বোধ করিতেছে। শ্রান্ত হাতুড়িও যেন বিশ্রাম প্রার্থনা করিতেছে। যখন চতুর্দিক নিস্তব্ধ নিথর, বিশ্ব যখন সারা দিবসের কর্মে ক্লান্ত

নিদ্রাভিভূত, তখন কর্মকার যেন তাহার বজ্রের মত কঠিন মুষ্টি শিথিল করে, ইহাই তাহার কর্মশালায় পীড়িত লৌহপিণ্ডের সকাতর অনুনয়।

সারা দিবস প্রচণ্ড পরিশ্রমে কর্মকার স্বয়ংক্লান্ত, তাই তাহার শারীরিক অবসাদবশতই নেহাইয়ের উপর আঘাতে জোর নাই, ইন্ধনের অভাবে অগ্নি নিষ্প্রভপ্রায়, হাপরে বাতাস দিবার জন্য হাতের জোর নাই, শাঁড়াসি তাই ছেনি দৃঢ়ভাবে ধরিতে পারিতেছে না, হাতুড়ির আঘাতেও শৈথিল্য দেখা গিয়াছে। কিন্তু ইহাকে গোপন করিয়া কবি জড় পদার্থেরও অনুভব শক্তি আছে, অবসাদ আছে, ক্লান্তি আছে এইরূপ বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য নেহাই অগ্নি হাপর শাঁড়াসি ও হাতুড়ির শ্রমক্লান্ত নির্জীবতার বিবরণ দিয়াছেন। [রূপতত্ত্ব বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]

রাত্রি দুপরে…হাতুড়ির বাড়ি।

প্রচলিত রোমান্টিক কবিধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী অসহিষ্ণু কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের লোহার ব্যথা কবিতায় নির্জীব নিষ্প্রাণ জড় পদার্থের উপর মনুষ্য-প্রদত্ত কঠিন আঘাতের ফলে যে গভীর দুঃখ ও বেদনা নিহিত তাহারই সহৃদয় সন্ধান করা হইয়াছে। কর্মকারের লৌহশালায় অগ্নিদগ্ধ নিষ্পেষিত লৌহ-পিণ্ডের আঘাতজনিত এই আর্তনাদ অপরূপ দরদভরা ভাষা পাইয়াছে উক্ত কবিতা হইতে উদ্ধৃত আলোচ্য ছত্রগুলিতে। অতি প্রত্যুষ হইতে কর্মকারের কাজ চলিতেছে গভীর রাত্রি পর্যন্ত—লোহা পিটাইয়া আগুনে পুড়াইয়া তাহাকে মনোমত লৌহপদার্থে পরিণত করা হইতেছে। কখনো আগুনে গলাইয়া, ভাঙিয়া, জোড়া দিয়া, লম্বা বাঁকা গোল চতুষ্কোণ নানাবিধ রূপান্তরের মধ্য দিয়া ধাতবপিণ্ড একটি প্রত্যাশিত দ্রব্যে পরিণত হইতেছে। ইহার জন্য কখনও তপ্ত অগ্নিদাহ কখনও গনগনে আঁচ প্রয়োজন হইতেছে, কখনও তপ্ত লৌহকে জলে শীতল করা হইতেছে। দুইজন শ্রমিক দুইদিক হইতে লোহা চাপিয়া তাহাতে হাতুড়ির ঘা লাগাইতেছে। প্রয়োজনমত কোনো অপ্রয়োজনীয় লৌহাংশ বর্জন করিতেছে। কিন্তু সেই কঠিন লোহার বক্ষেও পিষ্ট হইবার বেদনা আছে—যে আঘাত পায় তাহারই বেদনা বক্ষে বহন করিয়া রাখিয়াছে এই নির্বাক মৌন লৌহখণ্ড। দিবারাত্রি আঘাতে রূপাবয়ব-পরিবর্তনে তাহার স্মরণে নাই প্রথমে সে কিরূপ আকৃতির ছিল—কেবল

অপরের প্রয়োজনে তাহার নানা আকৃতি বদলের কথাই মনে থাকে। এই ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়া তাহার দেহের উপর চলে অমানুষিক্ টানাপোড়েন, কখনও সে লম্বা হয় কখনও চৌকা। কখনো দারুণ দুঃসহ অগ্নিতে দগ্ধ হয়, কখনও প্রখর তেজে জলিয়া মরে। কখনও তাহার এই অগ্নিতাপজনিত জ্বালা ঠাণ্ডা জলে ডুবাইয়া শীতল করা হয়। যাহারা তাহার দেহকে এইরূপ আঘাত-পেষণে পরিবর্তিত করে সেই সব ভাগ্যবিধাতৃগণ তাহার অপরিচিত অথচ তাহাদেরই প্রয়োজনে অনাবশ্যক বলিয়া তাহার দেহ হইতে হয়ত একান্ত অপরিহার্য মুণ্ডটি বাদ দেওয়া হইয়া থাকে। কারণ কর্মকর্তার প্রয়োজনের মানদণ্ডেই কর্মীর শরীরের অংশবিশেষের মূল্য, তাহার শরীরের প্রয়োজনে নয়। একটি নির্বাক অসহায় ধাতুমাংসের পিণ্ডের উপর যে অমানুষিক নির্যাতন চলে তাহার স্বরূপ ধীরভাবে চিন্তা করিবার অবকাশ পর্যন্ত তাহার জোটে না —পরমুহূর্তেই হাতুড়ির আর এক আঘাত আসিয়া পড়ে। অসহায় ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তির বিচারশক্তিও লোপ পায় তাহার উপর প্রদত্ত আঘাতের নিরবচ্ছিন্নতাহেতু, ইহাই কবির বক্তব্য।

আগুনের তাপে তারে খাদ?

বক্ষ্যমাণ পংক্তিগুলি মূক হৃদয়ের কারাকার যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের লোহার ব্যথা কবিতা হইতে উদ্ধৃত। এখানে কবি লৌহপিণ্ডের ন্যায় আঘাতসহিষ্ণু কঠিন পদার্থেরও যে অন্যায়ের বিরুদ্ধতা করার মানসিক বল আছে তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন সেই লৌহেরই স্বকণ্ঠ-সংলাপে। কর্মকারের কর্মশালায় লৌহপিণ্ড অগ্নিদগ্ধ হইয়া সাঁড়াসির কঠিন নিষ্পেষণে শক্তিহীন ও উপায়হীন হইয়া হাতুড়ির ক্রমাগত আঘাত সহ্য করিয়াছে ইহা সত্য। কিন্তু শত পেষণেও তাহার আত্মশক্তির একটি মৌনী মহিমা আছে। সে কঠিন ধাতব-পিণ্ড বলিয়াই চূর্ণ হইয়া যাইতেছে না। হাতুড়ির প্রত্যাভিঘাত সে প্রতিবারই ফিরাইয়া দিতেছে। ইহা যেন প্রবলতর অন্যায়ের প্রতিবাদ করিবারই সগর্ব দুঃসাহস। আকরিক লৌহের মধ্যে কিছু অবান্তর খাদ বা ভেজাল থাকে। কিন্তু পেষণক্লিষ্ট লৌহ জানে তাহা খাদ নয়, তাহা অন্যায়ের প্রতিবাদ করিবার সাহস, তাহা তাহার কাঠিন্যের অন্তরালশায়ী কোমলতা, তাহা ধাতবপিণ্ডের হৃৎপিণ্ডের বেদনা। ইহাকে লোকে খাদ বলিয়া থাকে। বস্তুত তাহা খাদ নয়, নিখাদ চারিত্র্যমাহাত্ম্য।

তোমার হস্তে···তায়ে পেটে।

আলোচ্য পংক্তিদ্বয় নির্বাক্ নিষ্পেষিত জীবনের ব্যথার কাব্যকার যতীন্দ্রনাথের লোহার ব্যথা হইতে উদ্ধৃত—কর্মকারের কামারশালায় যন্ত্রণাক্লিষ্ট লৌহপিণ্ডের উক্তি। কর্মকার লৌহাস্ত্র নির্মাণের জন্য লৌহপিণ্ডকে অগ্নিতে দ্রবীভূত করে, তাহাতে অন্যান্য খাদজাতীয় ধাতু মেশায়, তাহাকে ধারালো করিয়া তোলে। এইভাবেই আকরিক লৌহ ধীরে ধীরে ইস্পাতে পরিণত হয়। কিন্তু ইস্পাতে পরিণত হইলেও লৌহের নিরতিশয় দুর্ভাগ্য, সে ইস্পাতের অনমনীয় দৃঢ়তা রক্ষা করিতে পারে না। কারণ এই ইস্পাতের দ্বারা নির্মিত অস্ত্রেই একে অপরকে আঘাত করে, শত্রুতাবশত পরস্পরকে হত্যা করে। অস্ত্রের দ্বারা রাম যদি তাহার শত্রু শ্যামকে দ্বিখণ্ডিত করে, তাহা রামের পক্ষে আনন্দদায়ক হইলেও অস্ত্রের তথা লৌহের পক্ষে নয়। এক্ষেত্রে লৌহ নিরুপায় নিমিত্ত মাত্র, ইহাই লৌহের আক্ষেপ। কর্মকারের অপর্ব ষড়যন্ত্রে ও চাতুর্যে লৌহজাতীয় পদার্থগুলি তাহার কর্মশালায় পরস্পর ভ্রাতৃঘাতকতায় নিযুক্ত। যে নেহাইয়ের উপর লৌহকে পিটানো হইতেছে তাহাও লৌহের, যে হাতুড়ির দ্বারা সে আঘাত করিতেছে তাহাও লৌহযন্ত্র। প্রতিটি যন্ত্রই দিবারাত্র তাহাদের প্রভুর হাতে খাটিয়া মরিতেছে এবং একে অপরকে আঘাত করিতেছে। এইভাবেই লৌহ-পদার্থগুলি আত্ম-স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা হারাইয়া আঘাতকারীর হস্তের নিমিত্ত হইয়া আছে।

কহ গো বন্ধু··· হাতুড়ির মারফতি।

বক্ষ্যমাণ চরণগুলি দুঃখবাদী কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের লোহার ব্যথা কবিতা হইতে উদ্ধৃত। কর্মকারের কামারশালায় অগ্নিদগ্ধ লৌহপিণ্ড দিবারাত্র স্বাধীনতাহীন হইয়া হাতুড়িপিষ্ট হইতেছে, অপরের জিঘাংসার নিমিত্তাস্ত্র হইতেছে। কর্মকারের কৌশলে একটি লৌহকে পিষ্ট ও আহত করিতেছে। কিন্তু ইহা বাস্তব সত্য যে, লৌহ না থাকিলে কর্মকারের জীবিকার্জন বন্ধ হইয়া যাইত। সেই কথাই লৌহ কর্মকারকে তাহার নিজস্ব মৌন ভাষায় স্মরণ করাইয়া বলিতে চাহিতেছে যে, যে লৌহের দ্বারা তাহার প্রভু অন্নসংস্থান করে, তাহার প্রতি কর্মকারের চরম কৃতজ্ঞতা বুঝি এমন করিয়া হাতুড়ির আঘাতে প্রকাশ করিতে হয়! লৌহ না থাকিলে কর্মকারের জীবিকা অচল,

কিন্তু কর্মকার না থাকিলে লৌহের কোনোই ক্ষতি হইত না। সুতরাং মানবিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে জীবিকা সংগ্রহের হেতুস্বরূপ লৌহের প্রতি কর্মকারের যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত ছিল, তাহা না করিয়া পরন্তু সে তাহাকে হাতুড়ির দ্বারা পিটাইতেছে—ইহাই বুঝি মনুষ্যত্ব। প্রকৃতপক্ষে লৌহকে না পিটাইলে কর্মকারের জীবিকার কোনোই অর্থ নাই। সুতরাং লৌহের এই অভিযোগ বা বিস্ময় যুক্তিহীন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আলোচ্য ছত্রগুলির মধ্য দিয়া কবি সমাজের একটি বাস্তব সত্যেরই ইঙ্গিত দিয়াছেন। প্রভুস্থানীয় ব্যক্তিরা—যাহারা কলকারখানা মিল ফ্যাক্টরির মালিক, তাহারা উৎপাদনের জন্য সর্বাধিক নির্ভর করে শ্রমিকদের শ্রমশক্তির উপর। অথচ ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় শ্রমিকরাই সর্বাধিক নির্যাতিত ও নিপীড়িত হইয়া থাকে। এই সূক্ষ্ম অর্থের দিকে দৃষ্টি দিলে ছত্রগুলির তাৎপর্য বুঝা যাইবে।

কি কহিছ ভাই···কামারের গদি।

[রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]

প্রশ্ন ১। লোহার ব্যথা কবিতাটির নামকরণ-তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া কবিতাটির ভাবার্থ সংক্ষেপে আলোচনা কর।—[আলোচনার শেষাংশ ও ভাবার্থ দ্রষ্টব্য]।

প্রশ্ন ২। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে দুঃখবাদী কবি বলা হয় কেন? লোহার ব্যথা কবিতায় এই দুঃখবাদের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় কি?

বাঙলা কাব্যের শ্যামল কোমল তৃণক্ষেত্রে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত একটি ধূসর রৌদ্রদগ্ধ পিপাসার্ত মরুভূমির ছবি দেখিতে পাইয়াছিলেন। যেখানে জল নাই ছায়া নাই। সেই আতঙ্ক পাণ্ডুর জনশূন্য বালুকাতীক্ষ্ণ ভূমিতে মরীচিকার প্রেতাত্মা আর তৃষ্ণাতুর পথিকের মরণ-সংকেত। সেখানে লেলিহান বহ্নির অতৃপ্ত যজ্ঞকুণ্ড জ্বালাইয়া উৎসব করিতেছেন ভস্মভূষণ রুদ্র। এই কবিদৃষ্টির জন্যই তাঁহার কাব্যের নাম মরীচিকা, মরুশিখা, মরুমায়া প্রভৃতি।

এই অভিনবত্বেই যতীন্দ্রনাথের কবিতা বিশেষভাবে চিহ্নিত। রবীন্দ্রযুগে আবির্ভূত হইয়াও যতীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রকাব্যের রোমান্টিকতাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। বাঙলা দেশের তৎকালীন স্বাধীনতা-আন্দোলনের উপর ব্রিটিশ রাজশক্তির নির্মম অত্যাচার, দেশের দারিদ্র্য, নিপীড়িত মানুষের

কঠিন জীবন-সংগ্রাম, বাঙলার একদা-শস্য শ্যামল গ্রামগুলির শ্মশানদশা, নাগরিক জীবনের-সহস্রবিধ রোগশোক-অপমানের দুর্বিষহ জ্বালা, মধ্যবিত্তের মরণপণ বাঁচার তাগিদ—এসব কবিচিত্তকে পীড়িত করিয়াছিল। জীবনের কোথাও তিনি শ্যামলতা কোমলতা আনন্দ সরস সজীবত্ব দেখিতে পান নাই বলিয়া কাব্যে তাই আত্মবঞ্চনা করেন নাই। জগতের চতুর্দিকেই যখন অন্তহীন দুঃখ, নিখিল জীব যখন দুঃখের দুর্বহ বোঝা আর বহিতে পারিতেছে না, যখন জীবের দুঃখের বিষে শিব পর্যন্ত ভস্মাচ্ছাদিত বৈরাগ্যে ছিন্ন কন্থা পরিয়া নীলকণ্ঠ হইয়া আছেন, তখন কবিই বা কেন আনন্দবাদের মিথ্যাচার করিবেন ? এইজন্য যতীন্দ্রনাথের কাব্যদৃষ্টি একান্তই দুঃখবাদী হইয়া উঠিয়াছে। দুঃখের কঠিন অভিজ্ঞতায় পুড়িয়া কবি জাগতিক সকল বস্তুব—তাহা সজীব কিংবা নির্জীব যাহাই হোক, অন্তরালে একটি নিত্যবহমান দুঃখের অস্তিত্ব অনুভব করিয়াছেন। লোহার ব্যথা কবিতাটিতেও এই দুঃখবাদের পরিচয় আছে।

লোহা প্রাণহীন ধাতু, সুতরাং তাহার ব্যথা বলিয়া কোনো অনুভবশক্তি অবিশ্বাস্য। কিন্তু যে খনিজ পদার্থ নিরন্তর কর্মকারের কর্মশালায় অগ্নিদগ্ধ হইয়া শাঁড়াসির চাপে হাতুড়ির কঠিন আঘাতে পিষ্ট হইতেছে, তাহার ঐ দহন ও আঘাতের রূপটিকে কবি নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের রূপক হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। আঘাত যদি হৃদয়হীন হয়, তবে লোহার কঠিন বক্ষেও ব্যথার সৃষ্টি করে, ইহাই কবিতাটির সূক্ষ্ম ইঙ্গিত। অতি প্রত্যূষের নিঃশব্দ মুহূর্ত হইতে নিস্তব্ধ গভীর মধ্যরাত্রি পর্যন্ত কামারশালায় লৌহপিণ্ডের উপর হাতুড়ির ঘা পড়িতেছে, আর মৌনী লৌহ সেই বিরতিহীন ক্রমান্বয় আঘাতে আর্তনাদ করিয়া উঠিতেছে, দুঃখবাদী কবি তাহা কান পাতিয়া শুনিয়াছেন। সমগ্র জগৎ যখন নিদ্রাচ্ছন্ন, যখন লোহা ঠুকিবার নেহাই, হাতুড়ি, হাপর, শাঁড়াসি, অগ্নি ইহাদের অচেতন সত্তায়ও ক্লান্ত ঘুমের স্পর্শ লাগিয়াছে, তখন কেবল কর্মকারই বিশ্রামহীন ভাবে লোহা পিটাইয়া তাহাকে দুমড়াইয়া মুড়িয়া ভাঙিয়া, দেহ হইতে মুণ্ড বাদ দিয়া, ইচ্ছামত অস্ত্র নির্মাণ করিতেছে। আর সেই অস্ত্র দিয়া মানুষ তাহার শত্রুর উপর জিঘাংসা মিটাইতেছে। এখন তাই রাত্রি সাক্ষী রাখিয়া নিষ্পেষিত লৌহখণ্ড তাহার প্রভুর নিকট সামান্য বিরাম প্রার্থনা করিতেছে। যে লৌহ কর্মকারের জীবিকার একমাত্র

হেতু, সেই লৌহের উপর হাতুড়ির আঘাত একটি নিদারুণ অকৃতজ্ঞতারই প্রতীক হইয়া যেন দেখা দিয়াছে। কিন্তু আঘাতের গুণে লৌহ কখনও কর্মকারের আসন লাভ করে না। আঘাতপ্রাপ্ত ও আঘাতকারী, এই দুই শ্রেণীর অস্তিত্ব চিরকালই সংসারে থাকে। এই নিরাশ উপলব্ধিতেই দুঃখবাদী কবির জীবন-অভিজ্ঞতা সমাপ্ত হইয়াছে।

রেবা : করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকা

রবীন্দ্রযুগের রবীন্দ্রভক্ত কবিগোষ্ঠীর মধ্যেই করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থান, সত্যেন্দ্রনাথ যতীন্দ্রমোহন কুমুদরঞ্জন কালিদাস রায়ের পার্শ্বে তাঁহার স্বচিহ্নিত আসন। তিনি কোনো অভিনবত্বের ইঙ্গিত দেন নাই, কোনো বিস্ময়কর আধুনিকতায় উৎকেন্দ্রিক জীবনের বন্দনা করেন নাই, স্পর্ধিত বিদ্রোহে যুগ-পরিবেশকে স্বাধীনভাবে বিচার করিতে বসেন নাই। সমকালীন জীবনের কোনো অস্থির ঝঞ্ঝা-বায়ু তাঁহাকে বিচলিত করে নাই, দেশকালের ঘূর্ণায়মান রথচক্রের পথ হইতে তিনি সতর্কভাবে মুক্ত থাকিয়া নিত্যকালের পল্লী বাঙলা ও শাস্ত্র-ধর্ম-ভক্তি-অধ্যুষিত পুণ্যতীর্থ ভারতবর্ষকেই কাব্য-লক্ষ্মীর উপাসনার মন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মুগ্ধ প্রকৃতি-প্রেমকেই তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছিলেন। কুমুদরঞ্জনের পল্লীপ্রেম ছিল গ্রামের পরিচিত মমতা-চিহ্নিত পরিবেশের মধ্যেই আতুর-দুর্বলতায় অবরুদ্ধ। আর করুণানিধানের প্রকৃতিপ্রেম সৌন্দর্যের সুদূরাভিসারে বাউলের মতো অজ্ঞাতপ্রান্ত পথেপ্রান্তরে ভ্রাম্যমাণ। বাঙলা দেশের নারীজীবন এক স্নিগ্ধ সৌন্দর্য লইয়া তাঁহার কবিতায় উদ্ভাসিত। আবার একদিকে প্রাচীন ভারতের যে সকল তীর্থ ও তীর্থকল্প নদী-জনপদগুলি অপরূপ সৌন্দর্যের স্মৃতি বহন করিয়া চলিয়াছে তাহাদের প্রতিও স্বপ্নবিভ্রান্ত রূপকাতর কবির আগ্রহের অন্ত নাই। এইজন্য

রবীন্দ্রযুগের কবি

কবিপ্রকৃতি

প্রকৃতিপ্রেমের স্বরূপ

কবিশেখর কালিদাস রায় করুণানিধানের কবিতার সংকলন 'শতনরী'তে কবির কাব্যের নিম্নরূপ শ্রেণীভাগ করিয়াছিলেন—স্বপ্নলোক, রূপতীর্থে, প্রেমালোক, কল্পকথা, মর্মপথে, মুক্তিপথে, ছায়াপথে, ইত্যাদি। রেবা কবিতাটিকে তিনি রূপতীর্থে পর্যায়ভুক্ত করিয়াছিলেন। প্রাচীন পৌরাণিক-ঐতিহাসিক যুগ হইতে আজ পর্যন্ত বিস্তৃত রূপবান ভারতের যে তীর্থসৌন্দর্য কবির চোখে পড়িয়াছে, এই পর্যায়ের কবিতাবলীতে তাহারই মানস-স্মৃতিচারণা ঘটিয়াছে। ইহাদের মধ্যে রেবা একটি বিশিষ্ট কবিতা। করুণানিধানের মৌলিক কাব্যগ্রন্থগুলির নাম বঙ্গমঙ্গল, ঝরাফুল, শান্তিজল, ধানদূর্বা, গীতায়ন, গীতারঞ্জন।

রূপতীর্থের পর্যটক

নামকরণ

ভাবার্থ

কেশপাশের মত জলপ্রবাহ বিন্যস্ত করিয়া উন্মাদতরঙ্গে সুন্দরী রেবা উপলখণ্ডের উপর দিয়া দুর্নিবার বেগে অরণ্যতল হইতে আবর্তিত হইতেছে। তাহার ধূসর কুজ্ঝটিতুল্য জলকণার দ্বারা সে যেন আপনহারা হইয়া অবগুণ্ঠন ঢাকিয়া রাখিয়াছে। কে জানে কবে নর্মদা মর্মরের অবরোধ বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইল? ফাল্গুনের সন্ধ্যায় তাহার বক্ষে দেবকন্যাদের মঞ্জীর-ধ্বনি শোনা যায়, তখন যেন নিসর্গ-লক্ষ্মীর মুখে স্মিতহাস্য ছড়াইয়া পড়ে। যেখানে আকাশ-পথে মরকততুল্য রথের শীর্ষে জ্যোৎস্নার পতাকা উড়িতেছে, সেই স্বপ্নের দেশ ত্যাগ করিয়া দুর্বার বেগে পুলকে-প্রেমে বিন্ধ্য-পর্বতের দুহিতা সুভাষিণী সুরূপসী রেবা সমুদ্রের সহিত স্বয়ংবরা হইবার জন্য, কাহার আলিঙ্গনের প্রত্যাশায় কেন অবতীর্ণা হইল, কবি তাহা ভাবিয়াই পান না (প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবক)।

বস্তু-বিশ্লেষণ

রেবার স্মৃতিবিলসিত কোথায় আজ সেই মাহিষ্মতী পুরী? এই নদী-তীরবর্তী মর্মর-সোপানে উপবিষ্ট রাজললনাদের মৃগমদ-সুরভিত কমলতুল্য চরণ-ঘিরিয়া নদীর সেই কলস্বর আজ শুনা যায় না। ইহার প্রান্তে পৌর-অলিন্দে পূর্ণিমানিশীথে অর্ধ-রজনীতে দ্রাক্ষাসবে পূর্ণ স্বর্ণপাত্র ওষ্ঠে রাখিয়া তাহারা কত লীলালয় যাপন করিয়াছে। জলের স্রোত যাহার নাভির

ন্যায়, হংস-শ্রেণী যাহার মেখলাবাস, সেই তরুণী রেবা তাহার যৌবন-চাঞ্চল্যে কবি কালিদাসকে পর্যন্ত বিভ্রান্ত করিয়াছে। রেবা বস্তুত পুরাণ-প্রসিদ্ধা নদী। কত মধুপ-গুঞ্জরিত মাধবী-মঞ্জরিত দিবসে, বীণাবাদিনী বাগ্দেবীর সান্ধ্য আরতির আলোকে যখন হিমালয় হইতে সমুদ্র পর্যন্ত বিপুল দেশ অপূর্ব শোভা ধারণ করিত, পৃথিবী যখন সুশাসিতা ছিল, সেই দিনগুলিতে রেবার সৌন্দর্য-ঐশ্বর্যের তুলনা ছিল না (তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবক)।

আজ সেই নবরত্ন-সুশোভিত প্রাচ্যের গৌরব অবন্তিকা-পুরী আর নাই—জ্ঞানসূর্য অস্তমিত হওয়ায় ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র সমাধির মত নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। অন্যদিকে পৃথিবীর চলার পথে নিত্যই আগমন-নির্গমন ঘটিতেছে। কোথাও কোনো ক্ষতির জন্য অনুতাপ নাই। ফুলে-ফলে সে সর্বদাই চিরযৌবন-সম্পন্ন। মৃত্যু যে আনন্দের জন্যই, মঙ্গলের জন্যই, ইহা অবোধ মন বুঝিতে চায় না, অপসৃত সৌন্দর্যের জন্য সে সর্বস্বান্ত শ্মশানে শোক করিতে চায়। তাই অতীতের পানে মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টি মেলিয়া কবির মনে পড়িতেছে, এই নদীর পার্বত্যতট কত তাপস সন্ন্যাসীদের নিত্য বিহারস্থল ছিল, এখানে হরিতকীর বনে যজ্ঞে-আহুত ঘৃতের ইন্ধন-গন্ধ উঠিত। ভগবান-বক্ষে পদচিহ্ন আঁকিয়াছেন যে বিদ্রোহী ত্রিকালজ্ঞ ভৃগুমুনি, তাঁহার সাধনাক্ষেত্র এই রেবা-তীর ভারতের সনাতন তীর্থ হইয়া আছে। যোগপরায়ণ ও বাক্‌সিদ্ধ মহাযোগীগণ মঠ-মন্দিরে লোকান্তর-গমনের পর এই নদীতীরবর্তী শ্মশানের চিতায় মহাকাশে বিলীন হইয়াছেন (পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্তবক)।

কত কালের কত জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন কবি যেন মূর্তিধারণ করিয়া কবির সম্মুখে আজ আরাধ্যা রেবার প্রতি তাহাদের বাঁশরীতে মধুর বন্দনা গান উপহার দিতেছেন। সেই চির-অমর কবিবৃন্দ আজ প্রাতঃস্মরণীয়, সর্বলোকে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে (সপ্তম স্তবক)।

এই জীবনে আর কখনও রেবার অনুপমভঙ্গি কবি ভুলিবেন না—তাঁহার অন্তরের গভীরে রেবার সম্মোহনধ্বনি বাজিবে। দুই হাতে কবি আজ রেবার বুক হইতে স্ফটিকের মত ভাসিয়া-আসা উপলমণি সঞ্চয় করিলেন, যাহা তাঁহার বক্ষে সূর্যকান্তমণির দীপ্তির মত চিরউজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিবে (অষ্টম স্তবক)।

আলোচনা

রেবা ঠিক নিসর্গ-কবিতা নয়, কিছুটা পৌরাণিক স্মৃতিদীপ্ত, কিছুটা প্রকৃতিশোভার মনোজ্ঞ বর্ণনা। পুরাণে-ইতিহাসে রেবা নদীর বিচিত্র কাহিনী উল্লিখিত আছে, কবি সেইগুলির সাহায্যে রেবার একটি মনোরম রেখাচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের মত তাহা তথ্যসর্বস্ব উপাখ্যানবহুল প্রসঙ্গ-নির্ভর কবিতা হইয়া উঠে নাই। বরং কোথাও সুস্পষ্ট তথ্যের উল্লেখ না থাকায় সাধারণ-ভাবে অতীত-সৌন্দর্য-ব্যাকুল একটি রোমান্টিক স্বপ্ন-সন্ধানী কবির তন্দ্রালু দৃষ্টিরই পরিচয় পাওয়া যায়। যাহা দূর-অতীতের, তাহার জন্য ব্যাকুলতাই রোমান্টিকতার অন্যতম স্বভাব। ইহা পরিচিতকে মুহূর্তে অপরিচিত করিয়া তোলে, কাছের বস্তুকে দূরে স্থাপিত করে, নিত্যদৃষ্টের উপর একটি অপরিচয়ের রহস্যগুণ্ঠন পরাইয়া দেয়।' তাই বর্তমানের নদীকূলে বসিয়া কবি যে নদীকে দেখিয়াছেন তাহার বর্ণনা তাঁহার কবিতায় স্থান পায় নাই।

নিসর্গ কবিতা কিনা

সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা।

কবিতাটিতে রোমান্টিকতার লক্ষণ

সেই চেনা-নদীর সহিত একটি কাল-দূরত্বের বিচ্ছিন্নতা স্থাপিত হইয়াছে, একটি অজ্ঞাতপরিচয় অতীতের রহস্যময় সৌন্দর্য-যবনিকা আসিয়া তাহাকে পৃথক করিয়া দিয়াছে। যে রেবা আলোচ্য কবিতার আলেখ্য তাহা তাই অর্ধেক নদী, অর্ধেক মনোনদী—কবির আপন মনের মাধুরীর দ্বারা তাহার বরকান্তি রচিত হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্যময় নগর-জনপদ 'নদী-বনভূমি পর্বত-প্রান্তরগুলি রবীন্দ্রনাথের কবিচেতনাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল। অসংখ্য প্রবন্ধে কবিতায় গানে তাহার উল্লেখ আছে। প্রাচীন সাহিত্যে কাব্যে-নাটকে রামায়ণ-মহাভারত কাব্যে পুরাণে-উপপুরাণে এই সকল স্থান-নামের সহিত কত ইতিহাস কত কিংবদন্তী বিজড়িত। এই সকল কাহিনী অবলম্বন করিয়া এযুগের কবি বহু কাহিনী রচনা করিয়াছেন। প্রাচীন যুগের কোনো সূক্ষ্ম ইঙ্গিত পল্লবিত করিয়া এ-কালে তাহাকে সৃষ্টিশীল সাহিত্যে পরিণত করা হইয়াছে।

সাহিত্যে প্রাচীন-ভারতের সৌন্দর্যচিত্র

মোটের উপর এ-যুগের বুদ্ধিজীবী কবিমন প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্যভূমি পর্যটন করিয়া যাহা কিছু স্বর্ণময় স্মৃতি, যাহা কিছু রত্নখচিত মুহূর্ত সব পরমাগ্রহে সঞ্চয় করিয়া আনে। রেবা কবিতার শেষ দুই চরণে এ-কালের রোমাণ্টিক কবিদৃষ্টির সেই প্রাচীন সৌন্দর্যসন্ধিৎসার পরিচয় আছে—

করপুট ভরি আজি স্ফটিকবর্তুল রাজি করিনু সঞ্চয়,
সূর্যকান্তমণিসম রাজিবে যা বক্ষে মম উজ্জ্বল অক্ষয়।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের রেবা কবিতাটি পড়িলে রবীন্দ্রনাথের মেঘদূত প্রবন্ধের কথা (প্রাচীন সাহিত্য) অনিবার্যভাবে মনে পড়ে। প্রাচীন ভারতের সেই সৌন্দর্যখচিত জীবন হইতে আমরা চিরকালের মত নির্বাসিত হইযাছি বলিয়া সেই মন্দাক্রান্তা-ছন্দে প্রবাহিত জীবনের জন্য আমাদের দীর্ঘশ্বাস পড়ে। সেখানকার পুরসুন্দরীদের কনক-কিঙ্কিণীর মৃদু রব, তাহাদের লীলাকমলের মৃদু সৌরভ ভাসিয়া আসে স্বপ্ন প্রদোষের ম্লান অন্ধকারে, এ-কালের জ্যোৎস্না-বিভাসিত নদীজলে সেকালের দেবকন্যাদের চকিত চরণের আভাস মেলে। মেঘদূত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,

রেবা কবিতায় রবীন্দ্রনাথের মেঘদূত-প্রবন্ধের প্রভাব

"আবার সেই প্রাচীন ভারতখণ্ডটুকুর নদী-গিরি-নগরীর নামগুলিই বা কী সুন্দর। অবন্তী বিদিশা উজ্জয়িনী, বিন্ধ্য কৈলাস দেবগিরি, রেবা শিপ্রা বেত্রবতী। নামগুলির মধ্যে একটি শোভা সম্ভ্রম শুচিতা আছে। মনে হয়, ঐ রেবা-শিপ্রা-নির্বিন্ধ্যা নদীর তীরে অবন্তী-বিদিশার মধ্যে প্রবেশ করিবার কোনো পথ যদি থাকিত তবে এখনকার চারিদিকের ইতর কলকাকলি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইত"।

প্রাচীন নদী-পর্বত জনপদের নামগুলি কী সুন্দর

কবির বর্ষার গানেও এই রেবার জন্য এ-যুগের কবির রোমাণ্টিক ব্যাকুলতার পরিচয় আছে,

সেদিন এমনি মেঘের ঘটা রেবা নদীর তীরে
এমনি বারি ঝরেছিল শ্যামল শৈলশিরে।

করুণানিধানের রেবা কবিতা এই কবিদৃষ্টিরই সম্প্রসারিত রূপ মাত্র।

রেবা প্রাচীন ভারতের একটি সুবিখ্যাত নদী, ইহার নামান্তর নর্মদা, অর্থাৎ নর্মদায়িনী, বিলাস-সহচরী—বায়ুপুরাণে উল্লিখিত ঋক্ষ বা বিন্ধ্যপর্বত হইতে নির্গতা। বিশ্বকোষে এবং অন্যান্য পুরাণে এই নদীর সহিত সংশ্লিষ্ট বহু কাহিনীর উল্লেখ আছে। প্রাচীন যুগে এই নদীই ছিল আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের সীমা-নির্দেশিকা, তলেমির ভূগোলে ইহার নাম নমদস্। ভৌগোলিক পরিচয়ে বলা হইয়াছে, অমরকণ্টক পর্বতে ইহার জন্ম, উৎপত্তিস্থান হইতে আটশত মাইল প্রবাহিত হইয়া ইহা সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। পর্বতশিখরের একটি জলাশয় হইতে উৎসারণের পর কিছুদূর পর্যন্ত তৃণপূর্ণ প্রান্তরের উপর দিয়া বঙ্কিমগতিতে প্রবাহিত হইয়া ইহা অমরকণ্টক মালভূমির প্রান্তদেশে আসিয়াছে। পথে বহু প্রস্রবণ ইহার সহিত মিশিয়াছে। মালভূমির প্রান্তদেশ হইতে ইহা দুইটি জলপ্রপাত সৃষ্টি করিয়াছে, একটির নাম কপিলধারা আর একটি দুগ্ধধারা। মধ্যপ্রদেশে প্রবেশের পর ইহা বেগবতী ও ঘননীলকান্তি ধারণ করিয়াছে। পথে পথে ইহার বহু জলপ্রপাত ও উপনদী দেখা যায়। একটি প্রাচীন বিশ্বাস এই যে, নর্মদা নদীর উপর সেতুবন্ধন অসম্ভব। অবশ্য এই বিশ্বাস ভিত্তিহীন।

রেবানদীর ভৌগোলিক বৃত্তান্ত

রেবার যাত্রাপথ

জলপ্রপাত

স্কন্দপুরাণ বিষ্ণুপুরাণ বায়ুপুরাণ দেবীপুরাণ মৎস্যপুরাণ বরাহপুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে রেবার উৎপত্তি ও ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট বহু উপাখ্যানের উল্লেখ পাওয়া যায়। বরাহ-পুরাণ মতে, রেবা নদীতে শিবলিঙ্গের উৎপত্তি হইয়া থাকে। দেবীপুরাণে আছে,

পুরাণ-পৃষ্ঠায় রেবা-কাহিনী

রেবা তু নর্মদা দেবী নদী বা রেবতীমতা
অতিখণ্ডনবন্ধা বা লোকে দেবী প্রকীর্তিতা।

দেবী নর্মদা

স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত রেবাখণ্ডে রেবা বা নর্মদা সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, দেবী নর্মদা তিনবার পৃথিবীতে অবতীর্ণা হন। প্রথমবার রাজা পুরূরবা, দ্বিতীয়বার সোমবংশীয় হিরণ্য-তেজা নামক রাজা এবং তৃতীয়বার ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা পুরুকুৎস—এই তিনজনেই তপস্যায় মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া নর্মদাকে স্বর্গ

তিনবার মর্ত্তবাহিনী নর্মদা

হইতে মর্তবাহিনী করিয়াছিলেন। দেবী নর্মদা মহাদেবের অনুরোধেই মৃৎপথযাত্রিনী হইয়াছিলেন। বিন্ধ্যগিরি তাহার অসহ্য বেগ ধারণ করিয়াছিলেন। রেবাখণ্ডে নর্মদাকে শিবসীমন্তিনী বলা হইয়াছে। তাহার রূপ,

শ্যামবর্ণা মহাদেবী সর্বাভরণভূষিতা
মকরাসনমারূঢা শিবস্যাগ্রে ব্যবস্থিতা।

মৎস্যপুরাণ মতে,

নর্মদা সরিতাং শ্রেষ্ঠা সর্বপাপপ্রণাশিনী।
তারয়েৎ সর্বভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ॥

পুণ্যতোয়া নর্মদা

এই নদী সকল নদীর মধ্যে উত্তমা, সর্বপাপঘ্না। গঙ্গা ও কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী পুণ্যা, কিন্তু গ্রাম বা অরণ্য সকল স্থানেই নর্মদা অতিশয় পুণ্যপ্রদা। সরস্বতীর জল তিনদিন, যমুনার জল সাতদিন, গঙ্গার জল স্পর্শমাত্র ও নর্মদার জল দর্শনমাত্রই পবিত্র হওয়া যায়। এই ধরণের বহু পুণ্যপ্রদ তথ্য নর্মদা সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে। সৌভাগ্যবশত করুণানিধান এই সকল তথ্য চয়ন করেন নাই, কিংবা পুণ্যতীর্থময়ী নর্মদার তথা রেবার গুণকীর্তন করেন নাই। তিনি কবিদৃষ্টিতেই রেবাকে দেখিয়াছেন।

শব্দভূষিতা কবিতা

করুণানিধানের রেবা কবিতাটি চিত্রময়ী বর্ণনায় সুভাষিত, যদিও বহুস্থলে কবি রমণীয় শব্দঝংকারের মোহে অর্থের বা বাক্যের প্রাঞ্জলতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। শব্দই এই কবিতার সম্পদ। তৎসম শব্দের ধ্বনি-সম্পদে প্রতিটি বাক্যই বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্যকে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথের পদ্মা কবিতাটিও এই প্রসঙ্গে মনে পড়িবে। কিন্তু পদ্মা যেখানে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় ধ্বংসবাহিনী নদী, সেখানে রেবা কবির চোখে স্মৃতিভারাক্রান্ত সৌন্দর্য-স্রোতা নদী মাত্র।

রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ

জল-বেণী-রম্যা—বেণী অর্থ প্রবাহ, সুতরাং রমণীয় জলপ্রবাহ-যুক্ত নদী। বেণী শব্দের আর একটি অর্থ কেশপাশ। এই অর্থ ধরিলে জল-বেণী-রম্যা শব্দের দ্বারা বুঝায়, রমণীয় কেশপাশ আলুলায়িত করিয়া আছে যে নদী। **বরকান্তি**—সুন্দর কান্তিযুক্ত। **উন্মাদিনী প্রায়**—উন্মাদের মত। জলপ্রবাহের

কেশপাশ এলাইয়া যে নদী ছুটিয়া চলিয়াছে তাহাকে দেখিয়া কবি এক পাগলিনী নারীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। **অরণ্য-নেপথ্য-পথে**—অরণ্যের এক অদৃশ্য অংশ হইতে, অথবা অরণ্যের অদৃশ্য অন্ধকারে। **শিলাজলে**—পার্বত্য প্রদেশে। **তুরন্ত ধারায়**—দ্রুত গতিতে। **কুন্দবর্ণ··· আত্মহারা**—উপল-ব্যথিত রেবার বুক হইতে শীকর-কণা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহাতে মনে হইতেছে যেন শুভ্রবর্ণের ধূম্রজালে রেবা তাহার অবগুণ্ঠন ঢাকিয়া আপনহারা হইয়া ছুটিতেছে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, উৎস হইতে যাত্রাপথে রেবার অনেকগুলি জলপ্রপাত আছে। সীমন্ত অর্থ সিঁথি, সীমন্ত-বাস অর্থে অবগুণ্ঠন। কিন্তু অবগুণ্ঠন আবরিত করার অর্থ এখানে স্পষ্ট নয়। **কবে তুমি · মর্মরের কারা**—নদীর জন্ম হয় নির্ঝরিণী হইতে, নির্ঝরিণীর আবির্ভাব ঘটে পাষাণ-প্রাচীর বিদীর্ণ করিয়া। রেবা তথা নর্মদা নদীকে সম্বোধন করিয়া কবি তাই প্রশ্ন করিতেছেন, কোন্ মন্ত্র শক্তির দ্বারা পাষাণ-কারাগার ভাঙিয়া কবে নর্মদা বাহিরে আসিয়াছে? তুলনীয়, রবীন্দ্রনাথের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ।

ফাল্গুন-রজনী-মুখে—ফাল্গুন মাসের রজনী-সূচনায়, অর্থাৎ রাত্রির প্রথম প্রহরে। **গুঞ্জরে মঞ্জীর**—ফাল্গুন রাত্রির সূচনায় রেবার বুকে এক স্বর্গীয় কলতানের সৃষ্টি হয়, তখন কবির মনে হয় যেন রেবার বায়ুস্পৃষ্ট তরঙ্গ-হিল্লোলের উপর স্বর্গ হইতে দেবকন্যারা নামিয়া আসেন, তাহাদের চারুচরণের মঞ্জীরধ্বনি এই নদীর অস্ফুট কলশব্দে মিশিয়া যায়। **অমরী**—সুর-সুন্দরী, দেবকন্যা। **মঞ্জীর**—নূপুর। **মানস-রঞ্জন···নিসর্গ-লক্ষ্মীর**—তখন বিশ্ব-প্রকৃতি এক অপূর্ব শোভা ধারণ করে; মনে হয়, নিসর্গ-লক্ষ্মীর প্রসন্ন পদ্মনিভ আননে একটি মধুর মনোহর হাস্য ছড়াইয়া পড়িতেছে। **মানস-রঞ্জন হাস্য**—মনোমুগ্ধকর স্মিত হাসি। **কমল-আস্যে**—কমলতুল্য রমণীয় মুখে। **নিসর্গ-লক্ষ্মীর**—নিসর্গ তথা প্রকৃতি-সুন্দরীর, প্রকৃতির সৌন্দর্যময়তার অন্তরালে একটি চৈতন্যের অস্তিত্ব অনুভব করা রোমান্টিক কবিদের লক্ষণ। এই চৈতন্যময়ী সৌন্দর্যরূপিণীর জন্যই প্রকৃতি মনোহর ও বিচিত্র হয়। ইহাকেই কবি নিসর্গ-লক্ষ্মী বলিয়াছেন। **ইন্দ্রনীল-রথ-চূড়ে**—নীলকান্ত মণির রথের মাথায়, এখানে ইন্দ্রনীল শব্দের স্পষ্ট কোনো অর্থ নাই, সুনীল-আকাশ অর্থে গ্রহণ করা যাইতে পারে। **চন্দ্রিকা-কেতন**—জ্যোৎস্নার পতাকা। **অন্তরীক্ষ-**

পথে—আকাশপথে। **ইন্দ্রনীল-রথ··· অন্তরীক্ষ পথে**—ঊর্ধ্বে সুনীল আকাশ যেন মরকত বা নীলকান্তমণির দ্বারা নির্মিত এক রথ, তাহার শীর্ষে ধবল-জ্যোৎস্নার পতাকা উড়িতেছে। **হেন স্বপ্ন-লীলা ··দুর্নিবার স্রোতে**—পুরাণে কথিত হইয়াছে, রেবা নদী তিনবার স্বর্গত্যাগ করিয়া মর্ত্যবাহিনী হইয়াছিল, এই কথা স্মরণ করিয়াই কবি বলিতেছেন, সেই সুদূর ঊর্ধ্বাকাশে স্বর্গের নীলিমলোকে রেবার বাস ছিল। সেখানে নীলবর্ণের মরকতমণির ন্যায় আকাশ-রথের চূড়ায় চন্দ্রকিরণের কেতন উড়িত; সেই স্বপ্নের বিহারভূমি ত্যাগ করিয়া কী অনিবার্য-প্রবাহে রেবা মর্ত্যের মাটিতে নামিয়া আসিল? **দুর্নিবার স্রোত**—প্রচণ্ড অপ্রতিরোধনীয় বেগে, কথিত আছে, মর্তমুখী রেবার অসহ্য স্রোত বিন্ধ্যপর্বত ধারণ করিয়াছিল। **অনুরাগ-রসোল্লাসে**—প্রেমের প্রবল আনন্দে। **কার আলিঙ্গন·· বিন্ধ্যের নন্দিনী**—বিন্ধ্য-কন্যা, (কারণ বিন্ধ্যপর্বত হইতে পড়িতেছে) সমুদ্রের স্বয়ংবরা, গৌরাঙ্গী সুন্দরী রেবা কাহার আলিঙ্গনের আশায়, কাহার প্রেমে উন্মত্ত হইয়া কলশব্দে আনন্দে ছুটিয়া চলিতেছে? পারাবার-স্বয়ংবরা শব্দের দ্বারা কবি বলিতেছেন, রেবা সমুদ্রকে স্বেচ্ছায় বরণ করিবার জন্যই ছুটিয়া চলিতেছে। **বরবর্ণিনী**—গৌরবর্ণা, সুরূপসী। **পারাবার-স্বয়ংবরা**—সকল নদীই সমুদ্রবাহিনী বলিয়া সমুদ্র ও নদীর সহিত প্রেম ও পরিণয়ের সম্পর্কের রূপক বা কবিপ্রসিদ্ধি গড়িয়া উঠিয়াছে। নদী চলিয়াছে সমুদ্রের সহিত অভিসারে, সমুদ্রের সহিত মিলিত হইবার জন্য, এইরূপ প্রয়োগ বহু দেখা যায়। নদী যেহেতু তাহার স্বাধীন ইচ্ছায় সমুদ্রের সহিত মিলন-প্রত্যাশিনী, তাই কবি তাহাকে পারাবার-স্বয়ংবরা বলিয়াছেন।

কোথা মাহিষ্মতী পুরী—পুরাণ বর্ণিত মাহিষ্মতী বা মহিষ্মতী পুরীর সহিত রেবার সম্পর্ক আছে। কৃতবীর্যের পুত্র সহস্রবাহু কার্তবীর্যার্জুন ছিলেন হৈহয়-রাজ্যের রাজা, নর্মদা-তীরে মাহিষ্মতী পুরী ছিল তাহার রাজধানী। নর্মদার জলে রূপসী পত্নীদের সহিত জলক্রীড়া রাজার অন্যতম বিলাস ছিল। একদা দিগ্বিজয়কালে রাবণ হৈহয় রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া রেবাতীরে শিবপূজায় রত হইলেন। অদূরে সস্ত্রীক নর্মক্রীড়ারত কার্তবীর্য সহস্রবাহুর দ্বারা রেবার জলপ্রবাহ রুদ্ধ করায় রাবণের পূজার ব্যাঘাত ঘটিল। ক্রুদ্ধ রাবণ কার্তবীর্যকে আক্রমণ করিলেন কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হন। পরবর্তী চরণগুলিতে

কার্তবীর্যার্জুনের সস্ত্রীক জললীলার সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আছে। **মর্মর-সোপানোপরি· ·ঝঙ্কার**—রেবার জলে যখন কার্তবীর্য পত্নীদের সহিত লীলাময় হইতেন, তখন অনুমান করা যায়, রেবার তীরেই ছিল তাঁহার মর্মর-প্রাসাদ—সেই প্রাসাদের যে অবতরণিকাগুলি নদীর জলে নামিয়া গিয়াছে, তাহার ঘাটে বসিয়া থাকিত পুরসুন্দরীগণ। রাজ-রূপসীগণ যখন মৃগনাভি-সুবাসিত হইয়া বিলাসে উল্লাসে পদ্মরাগ চরণগুলি নদীর জলে ডুবাইয়া দিত, তখন সেই চরণ ঘিরিয়া জলে উঠিত ঝঙ্কার, ইহা যেন কবি কল্পনায় অনুমান করিতেছেন। **পৌর্ণমাসী···অধরে**—যেদিন আকাশে পূর্ণচন্দ্রের কিরণ ছড়াইয়া পড়িত সেই দিন নদীর বুকে জ্যোৎস্নার লাবণ্য-সুধা উপভোগ করিবার জন্য রাজপুরীতে চলিত বিলাসোৎসব, চন্দ্রালোকিত অলিন্দে মদমত্ত আনন্দের লহরী উঠিত। রূপসীদের হাতে হাতে ঘুরিতেছে সোনার পাত্রে দ্রাক্ষারসের পানীয়, তাহাতে চাঁদের আলো পড়িতেছে, কেহ তাহা ওষ্ঠে ঠেকাইতেছে, কেহ বা আবেশে-নেশায় ঢুলিয়া পড়িতেছে। জ্যোৎস্নাবিবশ নিশীথে মদিরামুগ্ধ পৌরাঙ্গনাদের লীলা বিলাসের যে চিত্রটি সংহত বাক্যে মাত্র দুইটি চরণের মধ্যে কবি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পরিণত শব্দ-দক্ষতার পরিচায়ক। **আবর্ত-শোভন···মেখলায়**—এখানে রেবানদী কবির দৃষ্টিতে একটি উপনীত-যৌবনা নারী—যেরূপ নারীর বর্ণনা প্রাচীন কাব্যে পাওয়া যায়। নদীর জলস্রোত তথা আবর্ত বা ঘূর্ণি যেন নদীর নাভিদেশ, আর নদীর উপরিভাগে যে হংসশ্রেণী বিচরণ করিতেছে, তাহা যেন সেই রমণীর মেখলা বা কোমরের বহির্বসন। **কোথায় রূপসী···যৌবন-বিভায়**—এই যৌবন-লাবণ্যেই রূপসী রেবা যেন কবি কালিদাসকে মুগ্ধ করিয়াছে। মেঘদূত কাব্যে একাধিক স্থানে রেবার উল্লেখ আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—

> তস্মিন্ স্থিত্বা বনচরবধূভুক্তকুঞ্জে মুহূর্তং
> তোয়োৎসর্গদ্রুততরগতিস্তৎপরং বর্ত্মতীর্ণঃ।
> রেবাং দ্রক্ষ্যস্যুপল বিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাং।
> ভক্তিচ্ছেদৈরিব বিরচিতাং ভূতিমঙ্গে গজস্য॥
> তস্যাস্তিক্তৈর্বনগজমদৈর্বাসিতং বান্তবৃষ্টি-
> র্জম্বুকুঞ্জপ্রতিহতরয়ং তোয়মাদায় গচ্ছেঃ।

অন্তঃসারং ঘন তুলয়িতুং নানিলঃ শক্ষ্যতি ত্বাং
রিক্তঃ সর্বো ভবতি হি লঘুঃ পূর্ণতা গৌরবায় ॥

অর্থাৎ, কুঞ্জে ভ্রমে যার বন্য বধূগণ, ক্ষণেক থেকো সেই শৈলে।
মোচন করে বারি ত্বরান্বিত গতি, নতুন পথে উত্তীর্ণ।
দেখবে নদী এক বিন্ধ্য শৈলের উপলবন্ধুর চরণে—
হাতির গায়ে আঁকা চিত্রলেখা যেন শীর্ণ রেবা সেই বিসর্পিতা।
যখন বর্ষণ ফুরোবে পান ক'রো তীব্র-সৌরভ রেবার জল,
জামের বনে যার আঘাত লাগে, আর বন্য গজমদগন্ধে ভরা।
বিফল হবে বায়ু তোমার পরাভবে, হে মেঘ, যদি হও সারবান,
কেবল পূর্ণতা দেয় যে গৌরব, লঘুতা রিক্তেরই লক্ষণ।

(বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ)

পুষ্পিতা⋯ফাল্গুনের দিনে—ফাল্গুন মাসে যখন চারিদিকে মাধবী লতায় ফুল ফুটিতে থাকে আর তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমর আসিয়া জোটে। **শ্বেতভুজা⋯উনমদ বীণে**—শ্বেতপদ্মাসীনা শুভ্রবাহু দেবী সরস্বতীর আরতির প্রদীপালোকে বীণাঝঙ্কার উদ্দাম হইয়া উঠে। **আসমুদ্র⋯রম্যপট**—অর্থাৎ সমগ্র ভারতবর্ষ তখন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অনুপম হইয়া উঠে। **রাজন্বতী মহী**—পৃথিবী তখন সর্বত্র শৃঙ্খলাবদ্ধ, কোথাও কোনো অরাজকতা নাই, অশান্তি নাই, বস্তুত পৃথিবী তখন সুশাসিত। **রাজন্বতী**—রাজন্বান (=রাজন্বৎ) শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ, অর্থ রাজশাসিত, রাজবান। **কি সৌন্দর্যে⋯মহৈশ্বর্যময়ী**—যখন মাধবীপুষ্পিত ভ্রমরগুঞ্জিত ফাল্গুনে, শুক্লবসনা বীণাপাণির বীণা-ঝঙ্কারে ও আরতির আভায় সমস্ত ভারত শোভাময়ী হইয়া উঠে, যখন পৃথিবী সুরাজক হয়, তখন রেবা নদীও অবর্ণনীয় সৌন্দর্যে পূর্ণ হইয়া যায়, তাহার সেই সময়কার অসামান্য ঐশ্বর্যময় ইতিহাসের তুলনা হয় না। আর্যসভ্যতা ছিল নদীতীরকেন্দ্রিক, প্রাচীনকালে নদীতীরেই তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা সমাজ-সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই সভ্যতার প্রতীকরূপে নদীগুলি দেবতার স্তরে উন্নীত হয়। এইভাবে নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতীর সহিত গঙ্গা গোদাবরী শতদ্রু বিপাশা নর্মদা কাবেরী প্রভৃতি নদীগুলি পূজিত হইয়াছে। যথা—

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্মদে সিন্ধুকাবেরী জলেঽস্মিন্ সন্নিধং কুরু।

দ্র০ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—সরস্বতী, পৃ ৪১।

কোথায় সে···প্রাচ্যের গৌরব—রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্ন বিরাজ করিতেন, সেই বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী বা অবন্তিকা নগরীতে, জ্ঞানে বিদ্যাচর্চায় শিল্পকলায় সেই দেশ ছিল সমগ্র প্রাচ্যদেশের গৌরবস্থল; সে দেশ আজ কোথায় হারাইয়া গেছে, ইহাই কবির বিস্ময়! তুলনীয়, "আর সেই যে অবন্তীতে গ্রামবৃদ্ধেরা উদয়ন এবং বাসবদত্তার গল্প বলিত তাহারাই বা কোথায়"—(মেঘদূত, রবীন্দ্রনাথ)। **অবন্তী**—উজ্জয়িনীর চারিটি নাম—উজ্জয়িনী, বিশালা, অবন্তী ও পুষ্পকরণ্ডিনী। মেঘদূতের পূর্বমেঘের ৩১ শ্লোকে আছে রাজ্যের নাম অবন্তী, রাজধানী বিশালা বা উজ্জয়িনী। এই দেশ নর্মদা বা রেবার উত্তরে শিপ্রাতীরবর্তী। মহাভারতের সময় ইহা দক্ষিণে নর্মদার উপকূল পর্যন্ত এবং পশ্চিমে মাহী নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বিক্রমাদিত্যের সভায় যে **নবরত্ন** ছিলেন তাঁহাদের নাম—ধন্বন্তরী, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির ও বররুচি। এই নবরত্নের আলোকে অবন্তীরাজ্য আলোকিত হইত বলিয়া অবন্তী বা অবন্তিকাকে কবি **নবরত্নপ্রভা** বলিয়াছেন। **অস্ত জ্ঞান···সমাধি-নীরব**—সেদিনের সেই জ্ঞান-কেন্দ্র অবন্তী আজ ইতিহাসের বিষয় বলিয়া ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র যেন সমাধির মত নিস্তব্ধ হইয়া গেছে, সে-কালের জ্ঞানসূর্য অস্তমিত হইয়াছে। **উদয়-বিলয়···ক্ষোভ-কণা**—পৃথিবীতে কোথাও ধ্বংস কোথাও সৃষ্টির লীলা, এই অভ্যুদয়-অবসানের নৃত্যচ্ছন্দেই পৃথিবী আবর্তিত হইতেছে, ইহার জন্য জগতের কোথাও বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নাই। **কোরকে প্রসূনে·· অনন্ত-যৌবনা**—একদিকে ধ্বংস-মৃত্যু অবসান-বিলয়, অন্যদিকে সৃষ্টি-উদ্দাম বিকাশ-সূচনা, এই পর্যায়ক্রমে পৃথিবীর গতি বলিয়া পৃথিবীতে কোথাও ক্ষয়-ক্ষতি নাই। নিত্যই ফুল ফুটিতেছে, কুঁড়ি মুকুলিত হইতেছে, ফল ধরিতেছে। তাই পৃথিবী এক হিসাবে অনন্ত-যৌবন-সম্পন্ন। **মঞ্জু কিশলয়**—মনোরম কচি পাতা। **প্রণষ্ট···শ্মশানে**—পৃথিবী ধ্বংস-মৃত্যুসত্ত্বেও অনন্তযৌবনা একথা চিন্তা করিয়া কেহ ক্ষতির জন্য বিলাপ করে না। কিন্তু কবি অতীতের সৌন্দর্য-নগরী, তাহার জ্ঞানচর্চা,

কলাবিদ্যা, নিসর্গ-শোভা ইত্যাদির অবলুপ্তির জন্ম বেদনার্ত হইতেছেন। যে শ্মশানে প্রিয়স্মৃতির চিতাভস্ম গঙ্গাজলে ধৌত হইয়া গেল তাহাকে সান্ত্বনা দিবার দর্শন শোকার্তের প্রায়ই থাকে না, সে অনুতপ্ত অশ্রুপাত করে। মৃত্যুর দ্বারা ঈশ্বর হয়ত আমাদের আনন্দ-বিধানেরই ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, জীবনের শুভ-সম্পাদনই হয়ত মৃত্যুর রূপ ধরিয়া, মঙ্গলের আরতির মত নামিয়া আসে, কিন্তু শোকব্যথিত অজ্ঞান ব্যক্তি তাহা বুঝিতে চায় না। **বধির-মতি**—মতিচ্ছন্ন হইয়াছে যে, যে বুদ্ধিগ্রাহ্য-কথা কানে তোলে না।

পাষাণ-পুলিনে·· সঘৃত ইন্ধন—কবি কল্পনা করিতেছেন, এই রেবার পাষাণ-নির্মিত নদীতটে একদা কত সন্ন্যাসী তপস্বী ভিক্ষুগণ জীবন যাপন করিয়াছেন, তপঃ হোম করিয়াছেন। এইজন্য এই নদীতট পবিত্র হইয়া আছে। তাঁহাদের আশ্রম স্থাপিত ছিল এই নদীর তীরবর্তী হরীতকী-বৃক্ষে আচ্ছন্ন অরণ্যে। সেখানে অবিরত হোম যজ্ঞ হইত, তাহাতে ঘৃতাহুতি দেওয়া হইত বলিয়া সেই বনভূমি সর্বদা সুরভিত থাকিত। **ত্রিকালজ্ঞ ভুবন-পাবন**—এই রেবতীরেই ছিল ত্রিকালদর্শী মহাসাধক ভৃগুর সাধনার ক্ষেত্র, তাই এই অঞ্চল ভারতবর্ষের চিরকালের তীর্থে পরিণত হইয়াছে। এই ঋষিশ্রেষ্ঠ ভৃগুর পদচিহ্ন ত্রিভুবনের উদ্ধারকর্তা ভগবান বিষ্ণুর বক্ষে অঙ্কিত আছে। **ত্রিকালজ্ঞ**—ভূত-ভবিষ্যৎ ও বর্তমান যাঁহার অবগত আছে। **পদরজঃ**—পদধূলি। **ভৃগু**—ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণের জন্ম ভৃগুর উপর ঋষিরা দায়িত্ব দিলে ভৃগু প্রথমে ব্রহ্মলোকে গিয়া ব্রহ্মাকে যথোচিত সম্মান দেখান নাই। ফলে ব্রহ্মা কুপিত হইলে ভৃগু তাঁহাকে স্তবে সন্তুষ্ট করিয়া শিবলোকে যান। এখানেও শিবের প্রতি অসম্মানে শিব ভৃগুকে হত্যা করিতে উদ্যত হওয়ায় ভৃগু তাঁহাকে স্তবে তুষ্ট করিয়া গোলোকে বিষ্ণুর নিকট গেলেন। এখানে বিষ্ণুকে নিদ্রিত দেখিয়া ভৃগু বিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাত করেন। কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে কুপিত না হইয়া, আঘাতে ব্যথিত হইয়াছে মনে করিয়া ভগবান বিষ্ণু ভৃগুর চরণসেবা করিতে লাগিলেন। তখন ভৃগু দেবতাত্রয়ীর মধ্যে বিষ্ণুকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন। সেই হইতে বিষ্ণুবক্ষে ভৃগুর পদচিহ্ন অঙ্কিত। **প্রাণায়াম-পরায়ণ**—প্রাণায়াম ইত্যাদিতে যাঁহারা পারদর্শী। **প্রাণায়াম**—দেহমধ্যে প্রাণবায়ুর সংযম অভ্যাসকে যোগশাস্ত্রে ও তন্ত্রে প্রাণায়াম বলে। বায়ু-গ্রহণকে বলে পূরক, বায়ু-নিরোধকে

কুম্ভক ও নিঃসরণকে বলা হয় রেচক। এই তিন মিলিয়া প্রাণায়াম। **সিদ্ধবাক্**—বাক্‌সিদ্ধ, অর্থাৎ যাঁহাদের উচ্চারিত বাক্যই সত্য হয়। **প্রাণায়াম···তোমার সকাশ**—যে সকল মুনিঋষিরা ছিলেন যোগী, প্রাণায়াম ইত্যাদিতে সিদ্ধ। যাঁহারা অব্যর্থবাক্ সত্যদ্রষ্টা, তাঁহারা মৃত্যুর পর এই নদীতীরেই নিঃশব্দ চরণে বিলীন হইয়াছেন। তাঁহাদের অমর আত্মা তাঁহাদের জীবৎকালের মঠ আশ্রম বা আখড়া হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মহাকাশে অর্থাৎ অসীম অনন্তে মিলিয়া গিয়াছে। সেই আত্মা এক অনির্বচনীয় জ্যোতির্ময় চিন্ময় পরমাত্মার সহিত এক হইয়া গিয়াছে। সুতরাং মহাযোগীগণের জীবদেহ ও ব্রহ্মলোকের মধ্যে যোগ-সংঘটনের নিভৃত স্থান এই নদীর তীরই, ইহাই কবির বক্তব্য।

আজি যেন ·আমার—আজ বহুযুগের বহু জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন কবিবৃন্দ যেন বর্তমানের কবির ধ্যানদৃষ্টির সম্মুখে মূর্তিধারণ করিয়া আবির্ভূত হইতেছেন। তুলনীয়,

শতেক যুগের কবিদল মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্ত মদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা। (বর্ষামঙ্গল—রবীন্দ্রনাথ)

মুরলীর· ·স্তোত্র-উপহার—কবি কেবল তাঁহার সম্মুখে বহুযুগের জ্ঞানদৃষ্টি কবিদেরই দেখিতে পাইলেন না, তাঁহাদের কবিকণ্ঠও শুনিতে পাইলেন, যেন তাঁহারা সমস্বরে বাঁশীর সুরে তাঁহাদের সমবেতভাবে উপাসিত এই রেবার প্রতি স্তোকার্ঘ্য নিবেদন করিতেছেন।

যুগান্তের···প্রতিষ্ঠার গান—সেই সকল বহুযুগের কবিদের সম্পর্কে বর্তমান কবির প্রশস্তি রচিত হইয়াছে আলোচ্য দুই চরণে। প্রাচীন কালের সেই সকল জ্ঞানচক্ষু কবিরা সকলেই প্রথিতযশা, চিরঅমর ও অমৃতোপম। তাঁহারা অন্তযুগের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিলেও তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা-সংগীত এক লোক হইতে অন্য লোকে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

এ জীবনে···তোমার—রেবা-নদীর মনোরম সৌন্দর্যভূমি দর্শন করিয়া এবং তাহার পুরাণে-উৎকীর্ণ বহুবিধ কাহিনী স্মরণ করিয়া কবি মুগ্ধচিত্তে জানাইতেছেন যে, এই জীবনে তিনি রেবার বিচিত্র মধুর ভঙ্গি কখনই বিস্মৃত হইবেন না। **সম্মোহন···অন্তরে আমার**—রেবার তরঙ্গস্রোতে কলধ্বনিতে

মিশ্রিত আছে তাহার অতীত পুরাতন লীলাচ্ছন্দ, সেই ধ্বনি কবির অন্তরকে প্রতি মুহূর্তেই মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া তুলিবে। **করপুট ভরি…উজ্জ্বল অক্ষয়**—আলোকোজ্জ্বল ও স্মৃতিদীপ্ত রেবার বুক হইতে কবি যেন স্ফটিকের মত স্বচ্ছ মাণিক্য সংগ্রহ করিয়া লইলেন, যাহার সূর্যরশ্মির মত প্রোজ্জ্বল মণিখণ্ডের শিখা নিত্যকাল তাঁহার অন্তরে বিকিরণ করিবে। **স্ফটিকবর্তুল**—একপ্রকার মার্বল পাথর, যাহা রেবা নদীর জলে পাওয়া যায়, এইগুলি অনেকেই বালুতীর হইতে কুড়াইয়া আনে। তবে বিশেষ অর্থে এখানে রেবার স্মৃতিমাধুরীকেই স্ফটিকের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। **সূর্যকান্তমণি**—একপ্রকার রত্ন; স্ফটিককেই সূর্যকান্তমণি বলা হয়।

ব্যাখ্যা

জল-বেণী রম্যা… …মর্মরের কারা?

আলোচ্য স্তবকটি রবীন্দ্রযুগের সৌন্দর্যপ্রসন্ন কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের রেবা কবিতা হইতে উদ্ধৃত। বক্ষ্যমাণ অংশে কবি পুরাণকীর্তিত বেগতোয়া রেবার অভিরাম গতিচ্ছন্দের কাব্যপ্রশস্তি করিয়াছেন।

পর্বতকন্দর হইতে উদ্দাম গতিতে নির্বারিত রেবার জলপ্রবাহ অতি সুদর্শন। রেবাকে একটি বিন্যস্ত-বেণী নারীর সহিত কবি উপমিত করিয়াছেন। অরণ্যের অদৃশ্য গোপন কেন্দ্র হইতে সহসা লোকালয়ে বাহির হইয়াছে রেবা—পথে পথে পর্বত-খণ্ডে-খণ্ডে তাহার দুরন্ত জলস্রোত আছড়াইয়া পড়িতেছে, মনে হইতেছে যেন আকুল বেণী বিতত করিয়া হিল্লোলে কল্লোলে উন্মাদিনীর মত একটি সুন্দরী নারী ছুটিয়া চলিয়াছে। পর্বতের উপর উচ্চস্থান হইতে গড়াইয়া পড়ার জন্য জলকণা ছিটাইয়া একপ্রকার শুভ্র ধূম্রজাল বা কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি হইয়াছে—তাই তাহার পতনের উর্ধ্বস্থানটি দেখা যাইতেছে না। কিন্তু মনে হইতেছে যেন সেই রমণী কোন স্বচ্ছ শুভ্র বারিধূমের বসন দিয়া তাহার মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। অর্থাৎ বারিপুঞ্জের কুয়াশাই হইয়াছে তাহার নূতন এক অবগুণ্ঠন। রেবার নামান্তর নর্মদা—এই নদী বিন্ধ্য বা অমরকণ্টক পর্বত হইতে নির্গত। কবি বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছেন, কবে, কোন্ দিবসে কী মন্ত্রশক্তির দ্বারা এই নর্মদা পর্বতের প্রস্তর প্রাচীর ভেদ করিয়া বাহিরে আসিল?

টীকা—জল-বেণী-রম্যা—বেণী শব্দের অর্থ জলপ্রবাহ এবং কেশপাশ। উভয় অর্থই এখানে গ্রহনীয়। রামায়ণে নদীর বিশেষণে 'বেণীকৃতজলা' শব্দটি আছে। করুণানিধান তাহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া থাকিবেন।

ফাল্গুন-রজনীমুখে ·······বিন্ধ্যের নন্দিনী?

আলোচ্য স্তবকটি প্রকৃতি-সৌন্দর্যমুগ্ধ কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের রেবা-প্রশস্তিমূলক রেবা কবিতা হইতে উদ্ধৃত। স্বর্গ হইতে মর্তে আগতা রেবার বিচিত্রসুন্দর গতিভঙ্গি দর্শন করিয়া কবি সেই চিরন্তনীর প্রতি তাঁহার মুগ্ধ-হৃদয়ের হর্ষ-বিস্ময় নিবেদন করিয়াছেন।

রেবার কলস্রোতের উপর ফাল্গুনের জ্যোৎস্নারাত্রির প্রথম প্রহরের আলোক পড়ে। তখন সেই কলধ্বনিতে কান পাতিয়া কবি শুনিতে পান যেন স্বর্গচ্যুতা এই রেবার আকর্ষণে এখনও স্বর্গ হইতে দেবকন্যাগণ ইহার উপর নামিয়া আসেন। তাঁহাদের চপল চরণে বাজে নূপুরের নিক্কণ। সেই মঞ্জীরধ্বনিই রেবার তরঙ্গগীতির সহিত মিশিয়া যায়। তখন সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি এক মনোহর শোভা ধারণ করে। এই বিশ্বব্যাপ্ত প্রকৃতি তখন এক দেবী-মূর্তিতে রূপান্তরিত হন, এবং সৌন্দর্য-স্বরূপিণী প্রকৃতি-বেশিনী সেই লক্ষ্মীর স্মিত মুখে একটি হাস্যকিরণ বিকিরিত হয়—যে হাস্য কবির হৃদয় বিমুগ্ধ করে। পুরাণে আছে রেবা স্বর্গবাহিনী, তিনবার তিনি মর্তে অবতরণ করিয়াছিলেন। একবার রাজা পুরূরবা, দ্বিতীয়বার হিরণ্যতেজা এবং তৃতীয়বার পুরুকুৎস রাজা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া রেবাকে স্বর্গচ্যুত ও মর্তাভিমুখী করিতে পারিয়াছিলেন। স্বর্গের অমর সৌন্দর্যভূমি পরিত্যাগ করিয়া এই মর্তে নামিয়া আসা রেবার পক্ষে বিস্ময়। যেখানে নীলকান্তমণির মত শ্যামল আকাশের আলোকরথের শীর্ষে নিত্য চন্দ্রকিরণের ধবল পতাকা উড্ডীন, স্বর্গপথভ্রষ্ট হইয়া সেই স্বপ্নের ন্যায় লীলাক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া অতি অনায়াসে রেবা মৃৎপৃথিবীতে কী অনিবার্য বেগে নামিয়া আসিল কবি তাহা ভাবিয়াই পান না। কোন্ অদৃশ্য গতির আবেগে সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা রেবা আপনহারা হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, কবি তাহাও ভাবিয়া পান না। সে যেন কোনো অজ্ঞাতপরিচয় কাহারও প্রেমে মত্ত হইয়া তাহার সহিত আলিঙ্গিত হইবার জন্য ধাবমানা। তাই বিন্ধ্যপর্বত-নির্গতা বিন্ধ্যকন্যা শুভ্রবর্ণা রেবার কণ্ঠে প্রেমের মধুর আনন্দের

কলগীত উত্থিত। শেষ পর্যন্ত সমুদ্রের সহিতই রেবা মিলিত হইবে বলিয়া সমুদ্রের কণ্ঠে মালা পরাইবার জন্যই হয়ত তাহার এই স্বয়ংবর-যাত্রার উন্মাদনা বলিয়া কবির মনে হইতেছে।

টীকা—বিন্ধ্যের নন্দিনী—ভৌগোলিক মতে অমরকণ্টক পর্বত হইতে নির্গত হইলেও পুরাণমতে স্বর্গচ্যুতা এই রেবার অসহ্য বেগ বিন্ধ্যপর্বতই ধারণ করিয়াছিল বলিয়া রেবাকে বিন্ধ্যের নন্দিনী বলা হইয়াছে। পুরাণে রেবার নামান্তর সোমসুতা (সোম=পর্বত)।

কোথা মাহিষ্মতী………যৌবন-বিতার ?

বক্ষ্যমাণ পংক্তিনিচয় রেবা-সৌন্দর্যস্নাত প্রকৃতিপ্রিয় কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের রেবা কবিতা হইতে চয়িত। পুরাণ-মহাকাব্যে প্রকীর্তিত রেবার মনোহর গতিভঙ্গিমার স্মৃতি স্মরণ করিয়া সেই অতীত সৌন্দর্যব্যাকুল কবির দীর্ঘশ্বাস পড়িয়াছে।

পুরাণে আছে,- হৈহয়রাজ্যের রাজধানী মাহিষ্মতী পুরী ছিল রেবা নদীর উপকূলে, এই রাজ্যের অমিতবিক্রম রাজা কার্তবীর্যার্জুন এই নদীর জলে সুন্দরী পত্নীদের সহিত জলক্রীড়া করিতেন। স্বচ্ছতোয়া রেবার জলে সেই রূপসীদের জলকেলির স্মৃতি কবিকে বিমনা করিয়া তুলিয়াছে। মাহিষ্মতী পুরী আজ নাই, কিন্তু সেই রেবা আজও তটবিপ্লাবিনী গতিতে বহিয়া চলিয়াছে। এই নদীর তীরে অবস্থিত প্রাসাদের মর্মর সোপানে বসিয়া নদীর জলে চরণ নিমজ্জিত করিয়া থাকিত সেই পুর-সুন্দরীগণ—বিলাসের প্রসাধনে তাহাদের অঙ্গ আচ্ছন্ন থাকিত। তাহাদের শরীর-বাসিত মৃগমদগন্ধ বাতাসে ভাসিয়া যাইত, তাহাদের কমলমনোহর চরণ ঘিরিয়া জলের কলতান উঠিত। যেদিন আকাশে পূর্ণচন্দ্র উঠিত, পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাজোয়ারে পৃথিবী প্লাবিত হইত, সেদিন মধ্য নিশীথে রাজপ্রাসাদে বহিত লীলাবিলাসের হিল্লোল—প্রাসাদের [illegible] জ্যোৎস্নার আলোকে আঙুর-নির্মিত মদিরার স্বর্ণপাত্র মুখে লইয়া রাজললনাগণ আবেশে তন্দ্রার ঘোরে ঢলিয়া পড়িত, আর সেই [illegible] পানপাত্রে রাত্রির চন্দ্রের ছায়া পড়িত। এই সেই রেবা—সুন্দরী রমণীর সহিতই ইহার উপমা দেওয়া যায়। রমণীর যৌবনমত্ত অঙ্গদেহের [illegible], তেমনি রেবার জলের ঘূর্ণিস্রোত রমণীদেহের [illegible]

যেমন মেখলা, নদীর উপর তেমনি হংসশ্রেণী শোভা পাইতেছে। এই যৌবন-সৌন্দর্যেই রূপবতী রেবা মেঘদূতের কবি কালিদাসকে মুগ্ধ করিয়াছে। কালিদাস পূর্বমেঘে তাই আষাঢ়ের মেঘকে তাহার যাত্রাপথে 'হস্তিগাত্রে অঙ্কিত শৃঙ্গার-লেখার ন্যায় বিশীর্ণা রেবার বুকে জল-বর্ষণের জন্য এবং হস্তিমদবাসিত সেই জল পানের জন্য' অনুরোধ জানাইয়াছেন।

টীকা—মাহিষ্মতী পুরী—রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য। পৌর্ণমাসী—রূপতত্ত্ব বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য। আবর্ত-শোভন-নাভি—রামায়ণে রামচন্দ্র যে নদীসকল দেখিয়াছিলেন, তাহাদের কোনোটি ফেননির্মলহাসিনী, কোনোটি বেণীকৃতজলা, কোনোটি আবর্তশোভিতা। শব্দটি তথা হইতে আহৃত বলিয়া মনে হয়। প্রসঙ্গত রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ হইতে কালিদাস-সম্পর্কিত টীকা সংযোজিতব্য।

উদয়-বিলয়-ভরা······আনন্দ-বিধানে। .

আলোচ্য পংক্তিগুলি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের রেবা কবিতা হইতে উদ্ধৃত। রেবা নদীর সহিত অতীত ভারতের বহু সৌন্দর্যস্মৃতি জড়িত। নবনীল অন্তরীক্ষ হইতে মর্মরবিদারী রেবার মর্তলোকে অবতরণের কাহিনী, রেবা-পুলিনে মাহিষ্মতী পুরীর রাজললনাদের বিলাসললিত লীলা-বিহার, মেঘদূতের যুগে যৌবন-শোভাময়ী রেবা, ফাল্গুনদিবসে রেবাতীরে শ্বেতভুজা সারদার বীণা-ঝঙ্কার—এসব দৃশ্যকল্পনা কবিকে সেই প্রাচীন পথচিহ্নহীন সৌন্দর্যের জগতে আকর্ষণ করে। কিন্তু রেবা-তীরবর্তী সেই বিলাসপুরী মাহিষ্মতীও নাই, সেই নবরত্ন-সভা-শোভিত অবন্তীও নাই, মহাকালের রথচক্রতলে সবই পিষ্ট হইয়া গিয়াছে। ধ্বংস ও সৃষ্টির মধ্য দিয়াই পৃথিবীর বিবর্তন চলিয়াছে, ইহাই সত্য। আজ যাহা অস্তিত্ব কাল তাহা ক্ষয়, আজ যাহা বর্তমান আগামীকাল তাহা ধূলিতলে বিলীন হইবে। এইভাবে জন্ম জরা ও মৃত্যুর মধ্য দিয়া বিশ্বের গতি চলিয়াছে বলিয়াই কোনো মৃত্যু, কোনো বিলয়, কোথাও কোনো ক্ষোভের বিন্দুমাত্র চিহ্ন রাখে না। পৃথিবীতে তবু কুঁড়ি অঙ্কুরিত হয়, ফুল ফোটে, ফল ধরে, গাছে নবপল্লব-সমারোহ ঘটে। এইভাবেই পৃথিবীকে অনন্ত-যৌবন-সম্পন্না মনে হয়, যেন তাহার কোনো জরা নাই, বার্ধক্য নাই, ধ্বংস

নাই। সব ক্ষতি-ধ্বংস-বিলয়কে সে নতুন সৃষ্টিতে ঢাকিয়া দিতেছে। তত্ত্বের দিক দিয়া ইহা সত্য হইলেও সৌন্দর্যবিমুগ্ধ মন তাহা মানিতে চায় না। সে যাহা কিছু একদা-সুন্দর, প্রিয়দর্শী, মনোজ্ঞ, হৃদয়হরণী—তাহাকেই শাশ্বত করিয়া পাইতে চায়, চিরকাল আঁকড়াইয়া রাখিতে চায়। তাই যে সৌন্দর্য যে ঐশ্বর্য ধ্বংসস্তূপে পরিণত, তাহার জন্য বর্তমানের রূপদিদৃক্ষু কবির বিলাপের অন্ত নাই। কালের যে মহাশ্মশানে সৌন্দর্যচিহ্নগুলি নিঃশেষে ধুইয়া গেছে, তাহার প্রান্তে বসিয়া সে কেবলই বিগতের জন্য অবুঝ শোচনা করে। জীবন ও মৃত্যু লইয়াই জগৎ—যাহা যায় তাঁহা আবার রূপান্তরের মধ্যেই ফিরিয়া আসে। তাত্ত্বিক বলেন, মৃত্যু তো চৌর্য নয়, তাহা জীবের মঙ্গল-বিধানের জন্য ঈশ্বরেরই অভিপ্রায়, তাহা আবর্তির ন্যায় মহাকালেরই উপাসনা। কিন্তু বাস্তব সৌন্দর্যমুগ্ধ চিত্ত ইহা শুনিতে চায় না, সে অতীতের মোহে বধির হইয়া থাকে। অতীতবাহিনী রেবার প্রনষ্ট সৌন্দর্যের লীলারঙ্গকথা স্মরণ করিয়া কবিও সেই বেদনার দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছেন।

প্রাণায়াম-পরায়ণ ···চিন্ময় সকাশ।

[রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]।

করপুট ভরি আজি······উজ্জ্বল অক্ষয়।

বক্ষ্যমাণ পংক্তিদ্বয় রেবা-সৌন্দর্যমুগ্ধ করুণানিধানের রেবা কবিতার সমাপ্তি-অংশ। অতীতের সৌন্দর্যলোক হইতে প্রবাহিত রেবাতীরে বসিয়া কবি প্রাচীন যুগের বহু স্মৃতিপুঞ্জে আপনাকে নিমজ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন। সেই পুরাভারতের বিলাসবৈভবপূর্ণ জীবনযাত্রা, হোমধূমস্তম্ভিত তপোবনাদর্শ, জ্যোৎস্নামদির অর্ধরাত্রে নদীতটে পুরসুন্দরীদের মদির লাস্যবেশ—এই রেবা নদীর সূত্রে সবই কবির কল্পনানেত্রে বিভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু নিষ্ঠুরকালের রথচক্রে সে-সব সৌন্দর্যখচিত চিত্রগুলি চূর্ণ হইয়া গেছে। তথাপি সেই রেবা আছে, সেই অবিরাম গতিভঙ্গিমা লইয়া কলহাস্যে পর্বতবিদারিণী নদী অরণ্য-নেপথ্য হইতে সমুদ্রাভিসারে ছুটিয়া চলিয়াছে। বাহিরে যাহা হারাইয়া গিয়াছে, সেই সৌন্দর্যের কণিকাগুলি অন্তরে এখনও অম্লান হইয়া বিরাজ করিতেছে। আজ রৌদ্রালোকিত নদীতটে বসিয়া সেই মাণিক্যদীপ্ত স্মৃতিখণ্ডগুলি কবি যত্নসহকারে সঞ্চয় করিলেন, যেমন করিয়া বালক বালুকাতট হইতে স্বচ্ছ স্ফটিকখণ্ড দুই হাতের অঞ্জলি ভরিয়া সঞ্চয় করে।

সব স্মৃতি লুপ্ত হইবে, সব অস্তিত্ব ধূসর হইবে, সব বস্তু জীর্ণ হইবে—কিন্তু যাহা যথার্থ সৌন্দর্যের দৃষ্টান্ত, যাহা বিশুদ্ধ সুন্দর তাহা কবির বক্ষের মঞ্জুষায় সূর্য-কান্তমণির মত অমলিন হইয়া বিরাজ করিবে।

প্রশ্ন ১। করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের রেবা কবিতাটি রোমান্টিক কবিতার একটি সার্থক উদাহরণ। আলোচনা কর।

রোমান্টিক বলিতে কবিপ্রকৃতির এমন এক বৈশিষ্ট্যকে বুঝায় যাহা কোনো দেশকালের সীমাবদ্ধ গণ্ডীতে নির্দিষ্ট নয়, যাহা একটি সর্বকালীন দৃষ্টিভঙ্গি। যে দৃষ্টিভঙ্গি এই জগৎকে বস্তুস্বরূপে না দেখিয়া তাহাকে আপন মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ভালোলাগা-মন্দলাগার দ্বারা রূপান্তরিত করিয়া দেখে তাহাই রোমান্টিক। রোমান্টিক কবি বর্তমানের বস্তুজটিল জীবনযাত্রা হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া কখনও অতীতের সৌন্দর্যের রূপমাধুরী সম্ভোগ করেন। যাহা কিছু পুরাতন, ধূসর, বিগত, তাহারই প্রতি রোমান্টিক কবির স্বপ্নমদির আকর্ষণ। কাছের জিনিসকে দূরে স্থাপন করিয়া, পরিচিতকে অপরিচিত করিয়া, সেই দূরত্বের অস্পষ্টতায় তাহাকে নিরীক্ষণ করিলে সেই বস্তুটি যে অভিনব হইয়া দেখা দেয়, ইহাতেই রোমান্টিক কবির আকুলতা। তাই যে প্রেম অতীতের, যে নিসর্গ সুদূরের, যে সংগীত শ্রুতির অগম্য, যে দেশ আমাদের জ্ঞানের অগোচর, তাহারই জন্য রোমান্টিক কবি দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে থাকেন। তাঁহার মানস-কল্পনার সহিত বাস্তবের কিছুই মেলেনা বলিয়া রোমান্টিকতায় জগৎ একপ্রকার বিষণ্ণতারই জগৎ। এখানে যে সৌন্দর্যের ধ্যান, তাহা কল্পনা-রচিত বলিয়া সেই সৌন্দর্য বিশুদ্ধ বস্তু-স্পর্শবিহীন মালিন্যবিরহিত সৌন্দর্য; সে সৌন্দর্যের ক্ষয় নাই, বিনাশ নাই।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় রোমান্টিকতায় রবীন্দ্রনাথেরই দ্বারা দীক্ষিত। রেবা কবিতায় নিসর্গ-সৌন্দর্য-সম্ভোগে তাঁহার যে মনোভাবের পরিচয় মুদ্রিত হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে রোমান্টিকতার লক্ষণ। প্রাচীন ভারতের নগর-জনপদ নদনদী পর্বত-প্রান্তরের যে চিত্রাবলী প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য-নাটকে অঙ্কিত হইয়াছে, সেইগুলি বস্তুত এক অপূর্ব সৌন্দর্যময় জগতের অংশ বলিয়া মনে হয়। সেখানকার জনপদ-জীবনের মন্দাক্রান্তা ছন্দ, সেখানকার নদনদী পর্বতের সুশ্রাব্য নামগুলি একালের বস্তুবিভ্রান্ত কর্মব্যস্ত হৃদয়ে যেন একটি মায়ামোহের সৃষ্টি করে। রেবা বা নর্মদা এইরূপ একটি নদী যাহার

কথা সংস্কৃত পুরাণে অসংখ্য কাহিনীতে রূপায়িত হইয়াছে। এই সকল কাহিনীর ভিতর দিয়া নর্মদায়িনী নদীর একটি মনোরম গতিভঙ্গিমা সৌন্দর্য-ব্যাকুল কবিচিত্তকে মুগ্ধ করিয়াছে। কিছুটা কাব্যে-পুরাণে উল্লিখিত কাহিনীর সাহায্যে, কিছুটা প্রত্যক্ষদৃষ্ট রেবানদীর সৌন্দর্য অবলম্বন করিয়া (অবশ্য এ ধরনের কবিতায় প্রত্যক্ষ-দর্শনের প্রয়োজন প্রায়ই থাকে না) এবং কিছু পরিমাণে সৌন্দর্যের মানস-কল্পনার সাহায্যে করুণানিধান তাঁহার রেবা কবিতাটি রচনা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে কবির রোমান্টিক দৃষ্টিরই প্রাধান্য ঘটিয়াছে।

রেবা প্রথমেই কবির নিকট একটি বিতত-বেণী সুন্দরী উন্মাদিনী নারী বলিয়া মনে হইয়াছে, যে পর্বতের কারাগার ভেদ করিয়া অরণ্যের অন্ধকার হইতে পর্বতগাত্রে গড়াইয়া বাহিরে আসিতেছে। তাহার শীকর-কণার কুয়াশা যেন তাহার সীমন্তের অবগুণ্ঠন। এই দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপচিত্রণের পরই রোমান্টিক কবির কল্পনায় রেবার অতীত-সৌন্দর্যের আলেখ্য ভাসিয়া উঠিয়াছে। ফাল্গুনী-রাত্রির প্রথম প্রহরে রেবার কলতানে কান পাতিলে কবি শুনিতে পান স্বর্গের দেবকন্যাদের চরণের মঞ্জীর-ঝঙ্কার। পুরাণে উল্লিখিত আছে স্বর্গের দেবী নর্মদাকে তিনজন রাজা তিনবার মর্ত্যে আনয়ন করিয়াছিলেন। ইহা স্মরণ করিয়া কবি বলিতেছেন, নীলকান্তমণির ন্যায় সুনীল জ্যোৎস্নাবিধৌত আকাশমার্গ পরিত্যাগ করিয়া রেবা কেন মাটির পৃথিবীতে অবতরণ করিল। সে যেন কোনো প্রেমোন্মাদিনী নারী—লাস্যে-অনুরাগে আনন্দে-হিল্লোলে এই বিন্ধ্যকন্যা সমুদ্রের সহিত স্বয়ংবরা হইবার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছে। পুরাণে আরও উল্লিখিত আছে যে, প্রাচীন হৈহয়রাজ্যের রাজধানী মাহিষ্মতী নগরীর রাজা সহস্রবাহু কার্তবীর্য এই রেবার জলে তাঁহার সুন্দরী পত্নীদের সহিত জলক্রীড়া করিতেন। রেবার জলে কবি আজও সেই স্মৃতির আভাস খুঁজিয়া পাইলেন। কবি কল্পনানেত্রে দেখিলেন, এই রেবাতীরবর্তী প্রাসাদের মর্মর-সোপানে বসিয়া মৃগমদ-সুরভিত বিলাসিনী পৌরাঙ্গনাগণ তাহাদের কমলচরণ নদীতরঙ্গে নিমজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। পূর্ণ জ্যোৎস্নারাত্রির মধ্যযামে এই নদীতীরবর্তী প্রাসাদের অলিন্দে চলিত মদিরেক্ষণা রমণীদের লীলাবিলাস—হস্তে দ্রাক্ষারসের স্বর্ণপাত্র—সেই স্বর্ণপাত্র অধরে রাখিয়া তাহারা যখন তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িত তখন

পান-পাত্রের আসবে আকাশের পূর্ণচন্দ্র প্রতিবিম্বিত হইত। এই সকল চিত্র অতীতের অন্ধঅন্ধকার ভেদ করিয়া কবিকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। কখনও মেঘদূতে রেবার বর্ণনা পাঠ করিয়া কবির মনে হয়, রেবা যেন এক যৌবন-পুষ্টতনু নারী, স্রোতের আবর্ত তাহার নাভিদেশ রচনা করিয়াছে, হংসপংক্তি তাহার কটিদেশের অলংকৃত মেখলা। এই নদীর বুকেই কবি শুনিতে পান কাজনে শ্বেতভুজা সারদার উন্মাদ বীণা-ঝঙ্কার। ইহারই উপকূলে ছিল বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন-সভা। কবি আরও কল্পনা করিলেন, এই রেবানদীর প্রস্তর-তটে কত ঋষি সন্ন্যাসীদের সাধনক্ষেত্র ছিল, এই নদীর তীরবর্তী হরীতকী বন তাঁহাদের হোমধূমে সুবাসিত হইয়া উঠিত। হয়ত রেবাতীরেই ছিল ত্রিকালদর্শী ভৃগুমুনির তীর্থক্ষেত্র। এই নদীর তীরেই যোগীশ্রেষ্ঠ অব্যর্থবাক্ ঋষিতাপসগণ লোকান্তরিত হইয়া চিতাভস্মে বিলীন হইয়াছেন; তাঁহাদের আত্মা পরমাত্মায় বিলীন হইয়া গিয়াছে।

এই নদীর কলশব্দগীতের সহিত মিশিয়া আছে বহু যুগের বহু প্রাজ্ঞদৃষ্টি কবির বাঁশরী-ধ্বনিসংবলিত নৈবেদ্য-সংগীত---সেই সংগীত কবি কান পাতিয়া শুনিলেন। পুরাণ-কীর্তিত, অতীত মহিমায় গরীয়সী রেবার সৌন্দর্য-স্মৃতির কণিকাগুলি কবি একে একে সঞ্চয় করিয়া আপন বক্ষের মণিকোঠায় সাজাইয়া রাখিয়াছেন। সেই মাণিক্যের দীপ্তিতেই রোমান্টিক স্মৃতিরসাত্মক রেবা কবিতাটি হৃদ্য ও মনোরম হইয়া উঠিয়াছে।

কালাপাহাড় : মোহিতলাল মজুমদার

ভূমিকা

বিংশ শতকের বাংলা কাব্যে একদিকে রবীন্দ্রানুগামিতার ধারা, অন্যদিকে রবীন্দ্রবিরোধিতার প্রবাহ; এই দুই প্রবাহে মোহিতলাল আপনাকে বাহিত করিয়া না দিয়া একটি স্বতন্ত্র জীবনাদর্শ ও মৌলিকতায় বাণীর উপাসনা করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যরচনার প্রয়াস ভারতী পত্রিকায় ১৯১৫ হইতেই, কিন্তু মোহিতলালের জনপ্রিয়তা সুরু হয় ১৯২২ হইতে। ১৯২৩ সালে

কল্লোল পত্রিকায় তাঁহার দেহবাদ ও ভোগসম্বল জীবনাচারের বলিষ্ঠতা ও গম্ভীর কণ্ঠ তরুণ দলের মন এক মুহূর্তে জয় করিয়া লইয়াছিল। মোহিতলাল যুগপৎ কবি ও সমালোচক ছিলেন এবং সমালোচক হিসাবে তাঁহার রবীন্দ্রবিরোধিতা কোনো কোনো সময় তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিলেও মোটামুটি কবি হিসাবে তিনি তাঁহার জীবনবেদটিকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

আধুনিকতার দীক্ষাগুরু

কবিদর্শন

মোহিতলাল ছিলেন বৈরাগ্যবিমুখ সৌন্দর্যসম্ভোগতৃষ্ণ মানবতাবাদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-প্রিয় কবি। প্রেমকে তিনি তাহার বিষামৃত লইয়া গ্রহণ করিয়াছেন, জীবন তাঁহার নিকট পানপাত্রের সফেন উপচীয়মান মদিরা হইয়া দেখা দিয়াছিল। জীবন অস্বীকার করিয়া তিনি কোনো অরূপ অতীন্দ্রিয়তার মোহে আত্মহারা হন নাই, পরিদৃশ্যমান জগতের সহস্র রূপসুধা দেহের লক্ষ অধরেই তিনি পান করিতে চাহিয়াছেন। নারী তাঁহার নিকট রূপসৌন্দর্য-তৃষ্ণার নির্ঝরিণী হইয়া দেখা দিয়াছে। স্বপ্নসুন্দরী জীবন-শিয়রে বসিয়া যতই দোলা দিয়াছে ততই তিনি বিস্বাদ জীবনের বিষপাত্র ওষ্ঠে তুলিয়া ধরিয়াছেন। তন্ত্রাভিলাষী ভোগবাদের সহিত সাংখ্যদর্শনের পুরুষপ্রকৃতি তত্ত্ব, বৈষ্ণব রসতত্ত্ব, বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ, বায়রনের ইহলোক-সর্বস্ব জীবনতৃষ্ণা, নজরুলের উচ্চকণ্ঠ জীবনবন্দনা, সত্যেন্দ্রনাথের মানবতাবাদ, দেবেন্দ্রনাথের রূপতৃষ্ণা—এই সব মিলিয়াই মোহিতলাল তাঁহার কাব্যের জগৎ নির্মাণ করিয়াছেন। তিনি 'জীবনের মূলে দেখিয়াছিলেন কাম ও প্রেমকে এবং ইহাদের প্ররোচনাকে স্বীকার করিয়া দেহকে আশ্রয় করিয়াই যে জীবনের পূর্ণতর বিকাশ সম্ভব—এমন একটি গভীর অনুভূতিই তাঁহার কবিদৃষ্টিতে পূর্ণ শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল।' মোহিতলালের কাব্যধর্ম সম্পর্কে ডক্টর সুকুমার সেন লিখিয়াছেন,

ইন্দ্রিয়গম্য জীবনের সম্ভোগতৃষ্ণা

"দেহের বাহিরে দেবতার মন্দির নাই, কামনাই নিত্য ও সত্য, এবং বাসনার হুতাশনে আত্মসমর্পণই পরমদেবতা মদনের আরাধনা—এই ভাবটি মোহিতলালের বিশিষ্ট ও গম্ভীর কবিতাগুলির মধ্যে ওতপ্রোত।" (বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস)

দেহবাদ

বাঙলা কবিতায় উজ্জ্বল মননধর্মী বুদ্ধিবাদ প্রবর্তন মোহিতলালেরই কৃতিত্ব। তাঁহার ভোগবাদ নিছক দেহসর্বস্ব কামচারিতা নয়, ইহা একপ্রকার

বুদ্ধিপ্রধান ভাবালুতাবর্জিত ইন্দ্রিয়াশ্রিত দৃষ্টিভঙ্গি। যথার্থ রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিতা যাঁহাদের হাতে সাফল্যলাভ করিয়াছে, সেই সকল অনুজ পরবর্তীদের স্বীকৃতি অনুসারে মোহিতলালই ছিলেন তাঁহাদের যথার্থ গুরু। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একই পথে অবিরুতভাবে নেতৃত্ব করিয়া তিনি উত্তরকালীনকে পরিচালিত করিতে পারেন নাই। ইহার অন্যতম কারণ হয়ত রবীন্দ্রবিদ্বেষ কিংবা রূঢ়ভাষায় অপরের সমালোচনা। দ্বিতীয় কারণ, এই জীবনমুখী ভোগৈকসুখকামনার সহিত তাঁহার কবিচিত্তে আর একটি প্রবণতা ছিল, তাহা সনাতন সত্যশিবসুন্দরের প্রতি। এই উনিশ শতকীয় সত্যনিষ্ঠা তাঁহাকে মাঝে মাঝে অহেতুক নীতিবাগীশ করিয়াছে। যে কবি তাঁহার বলিষ্ঠ পুরুষকার ও শাক্ত বীরাচারে তরুণদের উত্তেজিত করিয়াছিলেন তিনিই আবার তাঁহাদের ভ্রষ্টকণ্ঠের স্খলিত গীতি শুনিয়া খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এইজন্যই শেষ পর্যন্ত নজরুলের সহিতও তাঁহার সৌহার্দ্য স্থায়ী হয় নাই, তরুণদের সহিতও তাঁহার কাব্যবন্ধন দৃঢ় হয় নাই। যিনি পাপের জয়গান করিয়া অপরকে মোহমুক্ত করিয়াছেন তিনি অপরের কবিতায় দুর্নীতি-শ্লীলতার প্রশ্ন তুলিয়াই বিপদ বাধাইয়াছেন। কাব্যে অঘোরপন্থী অথচ জীবনে ঘোর রক্ষণশীল—সম্ভবত ইহাই মোহিত-লালের বৈপরীত্য। এক সুমহৎ জীবনবাদ ও আদর্শের দ্বারা দুইদিককে মিলাইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার কাব্যে ও জীবনে এই বিভেদ বস্তুত অস্বীকার করিবার বিষয় ছিল না।

বুদ্ধিবাদের প্রবক্তা

পরবর্তী পথভ্রষ্টতার কারণ

বৈপরীত্য

ভাষা ছন্দ বাণীভঙ্গিমা ও কাব্যদেহগঠনে একদিকে মধুসূদন দত্তের ঋজু কাঠিন্য এবং দার্ঢ্য, দেবেন্দ্রনাথের ঘনবদ্ধ বাক্‌সংহতি তিনি লাভ করিয়াছিলেন, অন্যদিকে সত্যেন্দ্রনাথের শব্দপটুতা, দেশি শব্দব্যবহারের প্রবণতা, নজরুলের আরবি-ফারসি শব্দের প্রাচুর্য—ইহাও তিনি আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। তাহার সহিত ছন্দের নিপুণ কলাকৃতি ও সৌন্দর্যখচিত প্রসাধনগুণ যুক্ত হইয়া মোহিতলালের কবিতাকে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে।

কাব্যদেহের গঠন

মোহিতলালের কাব্যগ্রন্থগুলির নাম স্বপন-পসারী, বিস্মরণী, স্মর-গরল ও হেমন্ত-গোধূলি। বিস্মরণী হইতে কালাপাহাড় কবিতাটি উদ্ধৃত।

কাব্যগ্রন্থ ও উৎস

ভাবার্থ

শবভুক রক্তপিশাচ প্রেতের বীভৎস কোলাহলে, শ্মশানের ভয়াবহ পরিবেশে সহসা দূর দিগন্তে মশালের আলোকশিখা দেখিয়া আকাশ-পৃথিবী তাণ্ডবলীলার আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল। মানুষের পুঞ্জীভূত পাপমোচন করিয়া দেবতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য ইহা সুরাসুরবিজয়ী যুগাবতাররূপ কালাপাহাড়ের আবির্ভাব বলিয়া কবির মনে হইতেছে। এতকাল ধরিয়া যে বেদী রক্তিম হইয়াছিল আজ তাহার শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে, আর্ত মানবদেহের রক্তে অগ্নির গান ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। আদিকাল হইতে সঞ্চিত মানুষের বঞ্চনার দীর্ঘশ্বাস আজ ঘনায়মান প্রলয়-ঝঞ্ঝা হইয়া উঠিল। এখন কালাপাহাড়ের আগমন-দুন্দুভি ও কাড়ানাকড়ার আওয়াজে ভগবান পলাতক, প্রেতপুরী নিঃশেষপ্রায়, ভয় পর্যন্ত ভীত হইয়া উঠিল (প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবক)।

বস্তুবিশ্লেষণ

দেবতার অনুগ্রহ-প্রার্থনায় কতকাল কত অগণ্য মানুষের অশ্রুজল পাষাণের চরণে নিষ্ফল ঝরিয়াছে। এইভাবে মাথা কুটিয়া কত জীব রক্তলোলুপ দেবতার তৃষ্ণা মিটাইতে মৃত্যুবরণ করিয়াছে। কেবল পাষাণই তাহাতে ক্ষয় হইয়াছে, দেবতার করুণা মেলে নাই, তথাপি মোহাচ্ছন্ন মানুষের চৈতন্যোদ্রেক হয় নাই। এখন সেই অন্ধ সংস্কারের অবসান ঘটাইয়া দেবলোলুপতা দমনের জন্য প্রচণ্ড জয়নিনাদে যুগাবতার কালাপাহাড়ের আবির্ভাব সূচিত হইল। ঈশাণ-কোণে তাহার অপ্রত্যাশিত ভয়ংকর আগমনের সংকেতসূচক উল্কাখচিত অগ্নি-পতাকা উড়িতেছে, তাহার মুক্ত কৃপাণের বজ্রচমকে মন্দিরের ত্রিশূল বিগলিত হইল, তাহার রুদ্রগর্জনে বিশ্ব মূর্ছিত হইল, আকাশ বিদীর্ণ হইল। পুরোহিত যতই ব্যাকুল হোন, দেবতা যে অন্ধ—কোনো উপচারেই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ ঘটিবে না। শিহরণ-সঞ্চারী সেই পরাক্রান্তের প্রতাপে আরতি বন্দনা আজ অর্থহীন হইয়া গেছে (তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবক)।

আপনাকে বিশ্বাসে শৃঙ্খলিত করিয়া মানুষ যে দেবতার চরণে প্রণাম জানায়, করজোড়ে প্রার্থনা করে, সেই দেবতার দুর্গতির আজ ইয়ত্তা নাই। দেবদ্রোহী কালাপাহাড়ের আক্রমণে আজ মন্দিরনিবাসী অমরবৃন্দ মানুষের

কাছেই আশ্রয়প্রার্থী—তাঁহাদের অমিত পরাক্রমের প্রতীক সেই পিনাক ডমরু সুদর্শনচক্র আজ ধূলাবলুণ্ঠিত। লোকালয় ত্যাগ করিয়া আজ তিনি পৃথিবীর কোন্ সুদূর প্রান্তে পলাইয়া যাইতেছেন। সর্বশক্তিমান ভীতিপ্রদ দৈবশক্তি সম্পর্কে মানুষের ভ্রান্তি আজ কালাপাহাড়ই নিরসন করিয়া দিল। মানুষের মনে স্তূপীকৃত বহুকালের দেবকল্পনা, শিশুকাল হইতে বর্ধমান নরকভীতি, পাপচেতনা—এইগুলি চূর্ণ করিয়া দৈত্যদানব সকলের শত্রু কালাপাহাড় জাগ্রত হইল। বাহিরে রচিত বিগ্রহ পূজা করিয়া মানুষ এতকাল দেহাভ্যন্তরস্থ দেবতারই অপমান করিয়াছে। তাহার অসাড় চিত্তের উপর অচলায়তন নির্মাণ করিয়াছে। এই দুর্বিষহ মিথ্যাচার সহ্য করিবে না বলিয়াই মানবসিংহ যুগাবতার কালাপাহাড়ের আবির্ভাব (পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্তবক)।

আজ যেখানে যত দেবনিকেতন দেববিগ্রহ স্তূপমূর্তি আছে তাহা চূর্ণ হইয়া যাক, দেবতার নামে বলিদান, ধূপদীপের উপচার ধূলিসাৎ হোক। এখন ব্রাহ্মণ-ম্লেচ্ছ-যবন প্রভৃতি কোনো শ্রেণীভেদ নাই। ভগবান ও ভক্ত বলিয়া কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নাই। পৃথিবীতে সর্বকালে একমাত্র মানুষই একমাত্র শ্রেণী, মানুষের বক্ষ-রক্তই আজ একমাত্র প্রার্থনীয়। ···অগ্নির সহিত বায়ুর ন্যায় আজ ব্রাহ্মণের সহিত যবন মিলিত হইল। মনে হয় নতুন সৃষ্টি আসন্ন—তাহারই প্রলয় রাত্রিতে বুঝি বিধাতা বজ্র ধারণ করিয়াছেন। মরুর শুষ্ক বক্ষ হইতে আজ তৃষ্ণাহরা সুধা উৎসারিত হইতেছে, সে সুধা বন্যার কল্লোলে পৃথিবীকে যেন প্লাবিত করিতেছে। এ মহোৎসব ভীতির নয়, কারণ আগন্তুকের মুকুটে নববৌদ্রাভাস, কণ্ঠে জ্যোতির মালিকা। সে কাল-নিশীথেরই নিকট ভীতিপ্রদ, তাই তাহার নাম কালাপাহাড়। তাহার অতর্কিত আবির্ভাবে তাই দিকে দিকে রক্তপ্রেতের কান্না উঠিয়াছে, মশালের আলোকে আকাশ ঘর্মাক্ত হইল। তাহার আগমন-পথে পর্বত আনত হইয়া তাহাকে সম্বর্ধনা জানাইতেছে, তাহার রক্তচোখের চাহনিতে সূর্য অস্তমিত হইল। স্থির-বিদ্যুতে নির্মিত তাহার কৃপাণ, তাহার আগমন-পথের ধূলি মেঘের ন্যায় ঊর্ধ্বে উঠিয়া তাহার পতাকা রচনা করিয়াছে। যাহা ভীতিপ্রদ ছিল আজ তাহারই ত্রাস-সঞ্চার, এতকালের ঈশ্বর তাই পলাতক, প্রেতপুরী নিঃশেষপ্রায়। কারণ দুন্দুভি-দামামা কাড়ানাকাড়া বাজাইয়া কালাপাহাড় আসিতেছে (সপ্তম—নবম স্তবক)।

আলোচনা

কালাপাহাড মোহিতলালের কবিধর্মের ইঙ্গিতবাহী একটি স্মরণীয় কবিতা। বিশ শতকের আধুনিক কবিতায় যে বিদ্রোহ, আত্মপ্রত্যয়, বলিষ্ঠতা, মানবতা-বাদ, বাস্তবতা, রোমান্টিক ভাবালুতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা দিয়াছিল, এই কবিতা সেই আন্দোলনের অন্যতম নেতা। যে নূতন দুবার প্রাণশক্তির ফলে নজরুল বাজাইয়াছিলেন অগ্নিবীণা কিংবা বিষের বাঁশি, যে প্রচণ্ড দাবদাহে ধরণীকে শুষ্ক ও মরুভূমিসদৃশ দেখিয়াছিলেন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, সেই শক্তি ও উত্তাপে মোহিতলাল ধ্বংস ও মৃত্যুর মধ্যে দেখিয়াছেন নবজীবনের ইঙ্গিত—কালাপাহাড হইয়াছে তাহার প্রতীক। এই সম্পর্কে ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখিয়াছেন,

আধুনিকতার সুস্পষ্ট লক্ষণে চিহ্নিত কবিতা

"কালাপাহাড দেবতা-বিজয়ী বীর্যবান্ মনুষ্যত্বের জীবন্ত বিগ্রহ। মানুষের কায়ার পিছনে চিরদিন ধরিয়া দেবতার ছায়া শৃঙ্খলের মতন তাহার দৃপ্তগতি রুদ্ধ করিয়াছে, সেই ছায়া-শৃঙ্খল ঘুচাইয়া দিবার যুগ আসিয়াছে। লক্ষ লক্ষ বৎসর কোটি কোটি মানব পাষাণ দেবতার পদমূলে মাথা লুটাইয়াছে—তাহার ফল হইয়াছে কতটুকু? ফল হইয়াছে শুধু আত্ম-প্রবঞ্চনা; সেই যুগান্তের মোহ ভাঙিবার দুন্দুভিই বাজিয়াছে কালাপাহাডের বিজয়োল্লাসে।··· মানুষের কাছে দেবতার এই পরাজয়ের মধ্যে আত্মমহিমায় প্রতিষ্ঠিত বীর্যবান মানুষের যে তপ্ত আত্ম-প্রসাদ আছে কালাপাহাডের বিজয়োল্লাস তাহারই প্রতীক। মানুষের লাঞ্ছনাকে অবলম্বন করিয়া দেবতা অনেক দিন অট্টহাসি হাসিয়াছে—আজ তাহারই প্রতিশোধের দিন সমাগত, দেবতার লাঞ্ছনা আজ তাই সমস্তভাবে মানুষকে অধীর আনন্দে আত্মহারা করিয়াছে"।

সমালোচকের মন্তব্যে কবিতাটির ভাষ্য

[কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা]

মোহিতলালের জনৈক কাব্যগবেষক এই কবিতাটি সম্পর্কে লিখিয়াছেন,

"কালাপাহাড নামক কবিতাটি মোহিতলালের মানবতন্ত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গির এক উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। ইহার প্রতিটি চরণ আধুনিক মানবতাবাদের ঝঙ্কারে স্পন্দিত। যুগযুগান্ত ধরিয়া ধর্মের নামে, সমাজ ও রাষ্ট্রের নামে অথবা পারমার্থিক কল্যাণ-সাধনের নামে মানুষের আত্মপ্রসাদের পথে যে প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করা হইয়াছে,

মানবতন্ত্রীয় দৃষ্টির দৃষ্টান্ত

এই কবিতা তাহারই বিরুদ্ধে মানবাত্মার দুর্জয় পৌরুষের উদাত্ত বিদ্রোহ-সংগীত"।

[কবি মোহিতলাল—হরনাথ পাল]

কালাপাহাড় ঐতিহাসিক পুরুষ, যদিও আলোচ্য কবিতা সেই ইতিহাস-পুরুষের জীবৎকাহিনী নয়। ইতিহাস-কথিত কালাপাহাড়ের নাম গ্রহণ করিয়া কবি এক নূতন অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের নূতন ব্যঞ্জনা আপন কবি-স্বভাবে আরোপ করিয়াছেন। কালাপাহাড় শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কৃষ্ণবর্ণ পাহাড় অথবা বধির পর্বত, এখানে বধির অর্থে ধর্ম-কথা বিবেকবাণী যাহার কর্ণে প্রবেশ করে না। আকৃতি-প্রকৃতির ভীষণতার ইঙ্গিতও শব্দটির মধ্যে আছে।

ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্ক

কালাপাহাড় প্রকৃতপক্ষে জনৈক হিন্দুদেবদ্বেষী মুসলমান—"১৫৬৫ হইতে ১৫৮০ খ্রীঃ পর্যন্ত পূর্বে আসাম, পশ্চিমে কাশী ও দক্ষিণে উড়িষ্যার মধ্যে যাবতীয় বিখ্যাত দেবমূর্তি ও মন্দির কালাপাহাড় কর্তৃক বিনষ্ট হয়। নিষ্ঠুরতা ও ভীষণ অত্যাচারহেতু ইনি কালাপাহাড় নামে প্রসিদ্ধ হন।" কালাপাহাড় বাঙলার নবাব স্থলেমান কররানি ও পরে তাঁহার পুত্র দাউদের সেনাপতি ছিলেন। ইতিহাসকারগণ তাঁহার সম্পর্কে আরও কয়েকটি জনশ্রুতি খুঁজিয়া পাইয়াছেন। প্রথমত, কালাপাহাড় নাকি ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে কোনো মুসলমান শাসকের কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়ত, তিনি রণদুন্দুভি কাড়ানাকাড়া বাজাইয়া মন্দির চূর্ণ করিতে আসিতেন—তাঁহার আগমন-ডঙ্কা শুনিয়া মন্দিরের দেবতা নাকি প্রকাশ্যে কাঁপিয়া উঠিতেন। মোহিতলাল এই জনশ্রুতিমাত্র সম্বল করিয়া তাঁহার কালাপাহাড় কবিতাটি রচনা করিয়াছেন। পূর্বোক্ত সমালোচকের মন্তব্য,

কালাপাহাড়ের মূল প্রাপ্ত ইতিহাসের তথ্য

"ঐ দুইটি জনশ্রুতির ভিত্তিতে মোহিতলালের কল্পনেত্রে অন্ধ আচার ও নিষ্ঠুর সংস্কারের অচলায়তন ভেদকারী প্রেমমন্ত্রে দীক্ষিত মানবাত্মার যে অতিশয় রুদ্রভীষণ রূপটি একটি বলিষ্ঠ আবেগের মুখে জাগিয়া উঠিয়াছিল, শিল্পরীতির সমস্ত পারিপাট্য বজায় রাখিয়া, উহাকেই তিনি এই কবিতার আধারে অতিশয় সার্থকভাবে বাণীবদ্ধ করিয়াছেন। যুগযুগান্তর-পুষ্ট মিথ্যা সংস্কারের জড়ত্ব-

কবিতার রূপান্তরিত ইতিহাসের সত্য

শাপবিমোচনকারী গভীর জ্ঞানদৃষ্টি ও বলিষ্ঠ পৌরুষের উন্মেষ সংগীত এবং আত্মপ্রত্যয়প্রবুদ্ধ নভোস্পর্শী মানব-মহিমার গৌরব-গীতি এই কবিতাটিতে দৃঢ়তার সঙ্গে ধ্বনিত হইয়াছে" (কবি মোহিতলাল)।

কবিতাটির রূপকল্পের পশ্চাতের প্রেরণা

অবশ্য কালাপাহাড়কে এইরূপ যুগোচিত ধর্মদ্রোহিতা ও আচারবিরোধী বিপ্লবের প্রতীকরূপে দেখার প্রেরণা তিনি পূর্ববর্তী কোনো কবির নিকট পাইয়াছিলেন। ভারতী পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট কবি হেমেন্দ্রকুমার রায়ের কাপালিকের উদ্বোধন কবিতায় আছে,

কালাপাহাড়···ঘুমিয়ে নাকি ?··পাশ ফেরো ভাই, চোখ খোলো।
স্যাঁৎ-চাপা ঐ আঙ্‌রাটাতে জ্বালিয়ে আগুন ফের তোলো।
পথ বিপথে তাল বেতালে ঝড় ঝাপটে শাঁখ বাজাও।
লক্ষ যুগের অন্ধকারে রক্তশিখার দীপ সাজাও !

নজরুল ইসলামের একটি কবিতায় ইহারই পুনরাবৃত্তি শোনা যায়,

কোথা চেঙ্গিস গজনী মামুদ কোথায় কালাপাহাড় ?
ভেঙে ফেল ঐ ভজনালয়ের যত তালা-দেওয়া দ্বার।
খোদার ঘরে কে কপাট লাগায়, কে দেয় সেখানে তালা,
সব দ্বার এর খোলা রবে, চালা হাতুড়ি শাবল চালা।
হায়রে ভজনালয়,
তোমার মিনারে চড়িয়া ভণ্ড গাহে স্বার্থের জয়। (সর্বহারা)

হেমেন্দ্রকুমার প্রত্যক্ষত মোহিতলালের প্রেরণা সন্দেহ নাই, আর নজরুল ও মোহিতলালের মধ্যে কে অগ্রবর্তী তাহার মীমাংসা করা সুকঠিন। হয়ত উভয়েই কালাপাহাড় শব্দটি হেমেন্দ্রকুমারের কবিতা হইতেই পাইয়াছেন। তবে ইতিহাসের তথ্য বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করিয়া মোহিতলালই কালাপাহাড়ের ধর্মদ্বেষী মন্দিরবিনাশী ঐতিহাসিক চরিত্রটিকে যুগোচিত

জনশ্রুতির সঙ্গে যুগোচিত মনোভাবের সামঞ্জস্য বিধান

মনুষ্যত্ব-জাগরণের সহিত নিপুণভাবে প্রতীকিত করিয়াছেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ঐতিহাসিক কালাপাহাড়ের জীবৎকাহিনী সম্পর্কে একাধিক জনশ্রুতি আছে। ইহার মধ্যে অন্যতম জনশ্রুতি কালাপাহাড় ব্রাহ্মণপুত্র ছিলেন এবং বরাবক শাহের কন্যা দুলারী বিবি তাঁহার রূপগুণের

প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে কালাপাহাড়কে বলপূর্বক মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করা হয় ও বিবাহ সংঘটন করা হয়। দীনেশচন্দ্র সেন লিখিতেছেন, "তিনি বহু অনুনয় বিনয় এবং অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াও সামাজিক অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইলেন না। জগন্নাথে যাইয়া এ অবস্থায় কি কর্তব্য, প্রত্যাদেশের জন্য সাতদিন অনাহারে ধন্না দিয়া রহিলেন, কিন্তু কোন আদেশ পাইলেন না। পরন্তু পাণ্ডারা অত্যন্ত অপমান করিয়া তাঁহাকে শ্রীমন্দির হইতে তাড়াইয়া দিল। ইহার পরে প্রতিশোধের পালা। সে প্রতিশোধ যে কী ভয়ানক তাহা সমস্ত পূর্বভারত হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছে" (বৃহৎ বঙ্গ)। এই কাহিনী সত্য হোক না হোক, কালাপাহাড়ের ধর্মদ্বেষিতা ও হিন্দুমন্দির-ধ্বংসের পশ্চাতে ধর্মের দৈবাদেশ-দানের ও সত্য-নির্ধারণের ছলনায় যে তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে, কালাপাহাড় যেন তাহারই বিরুদ্ধে তাঁহার সমস্ত ক্রোধ ও প্রতিহিংসাকে প্রয়োগ করিয়াছিলেন—ইহাই মোহিতলালের গৃহীত কাব্যসত্য। এই দিক দিয়া কবিতাটির মর্মবোধ সার্থক হইয়া উঠে।

ঐতিহাসিক তথ্যের পুনরুল্লেখ

রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ

(১ম স্তবক) **শুনিছ না···প্রেতের দল**—প্রেত এখানে ব্যঙ্গার্থে দেবতাকেই লক্ষ্য করিয়া ব্যবহৃত, যাহারা মানুষের ভক্তি-রূপ রক্ত শুষিয়া পান করে তাহাদেরই রক্তপিশাচ প্রেত বলা হইয়াছে। দেবদ্রোহী কালাপাহাড়ের আবির্ভাবে তাহাদের কান্না শুনা যাইতেছে। **শবভুক্· কী কোলাহল**—রাত্রির অন্ধকারে যে সকল প্রেতাত্মা মানুষের মৃতদেহ ভক্ষণ করে তাহারা অশুভ ধ্বনিতে কলরব করিতেছে, কারণ তাহাদের অন্তিম মুহূর্ত সমাগত। **দূর · মশালের···গগন-শিলা**—দূরে কালাপাহাড়ের মশালের অগ্নিশিখা দেখিয়া পর্বতের ন্যায় নিকষকালো রাত্রির আকাশ যেন ভয়ে ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিতেছে। মনে হইতেছে যেন মশালের অগ্নিতপ্ত নিশ্বাস গগনের গায়ে স্বেদ সঞ্চার করিতেছে। **সুরাসুরজয়ী যুগাবতার**—ঐতিহাসিক কালাপাহাড় ছিল হিন্দুদেবদ্বেষী নিষ্ঠুর অত্যাচারী : কিন্তু বিংশ শতাব্দীর যে যুগে মোহিতলাল এই কবিতা লিখিতেছেন, সে যুগ মানুষের বুদ্ধিবাদের ও যুক্তিবাদের আসরণের যুগ : এই যুগ মনুষ্যত্বের প্রকৃত মূল্য আবিষ্কার করিয়াছে।

আধিভৌতিক জীবনকেই সে পূর্ণ মূল্য দেয়, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিককে নয়। এই মনুষ্যত্বের উদ্বোধনকেই কালাপাহাড়রূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে। এই কারণেই কালাপাহাড় যুগাবতার এবং সে দেবদৈত্য-বিজয়ী মানুষ। **মানুষের পাপ ··ভীম প্রহার**—কালাপাহাড়ের এই যৌথ কর্তব্য—একদিকে সে মনুষ্যজীবনকে পরনির্ভরতা, দৈবানুগ্রহ ও আত্ম-অপমানের পাপপুঞ্জ হইতে উদ্ধার করিবে, অন্যদিকে সে অশুভ ভীতিপ্রদ ভক্তিলোলুপ দেবশক্তিকে ভয়ংকর আঘাত হানিবে। **কালাপাহাড়**—নামটি ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত, ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙলার মুসলমান নবাব সুলেমান করবানি ও তাহার পুত্র দাউদ খানের নৃশংস এক সেনাপতি যিনি হিন্দুধর্মবিদ্বেষে মন্দির-বিনাশে সমকালীন জীবনে মহাত্রাসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আসাম হইতে বাঙলা বিহার উড়িষ্যা বারাণসীর অধিকাংশ দেববিগ্রহ তাঁহার সৈন্য ও অশ্বারোহীর পদাঘাতে চূর্ণ হইয়াছিল। তদবধি কালাপাহাড় শব্দটি ধর্মদ্বেষিতা ভয়ংকরত্ব প্রভৃতি অর্থে প্রযুক্ত হয়। কালাপাহাড়ের রোষ ও আক্রমণ ছিল হিন্দুবিগ্রহের উপর। মোহিতলালের যুগোপেত বিদ্রোহ মানুষের ধর্মান্ধতা ও জীর্ণ আচারসর্বস্ব মনুষ্যত্বহীন সংস্কারের বিরুদ্ধে। এই আচারপরায়ণ দৈবকৃপালাভের মারণস্থানই মন্দির—তাই তাঁহার মনুষ্যত্বধর্ম কালাপাহাড় এই সার্থক নাম গ্রহণ করিয়াছে।

(২য় স্তবক) **এতদিন শুধু ··ধূমায়মান**—মানুষের আত্মবলিদানের রক্তে যে দেবস্থান বা বেদী এতকাল লাল হইয়া উঠিয়াছিল, সেই রক্তিমাভার মধ্য দিয়া বিদ্রোহের অগ্নিশিখা ঘনাইয়া উঠিতেছে। **আদি হতে··· মহোচ্ছ্বাস**—মানুষের বেদনা ও বঞ্চনার সূত্রপাত মনুষ্য-সভ্যতার সূচনা হইতেই ; সেই প্রাচীন কাল হইতেই মানুষ এক অলৌকিক শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া সেই অদৃশ্য অনির্বচনীয় দেবতার অনুগ্রহ কামনা করিয়াছে কিন্তু ইহার বিনিময়ে তাহার অদৃষ্টে জুটিয়াছে কেবল বঞ্চনা ও ব্যর্থতা। এই বঞ্চনা ও দীর্ঘশ্বাস জমিয়া জমিয়া কালের দিগন্তে এক ভয়ংকর মেঘ ঘনাইয়া তুলিয়াছে ; কবি কল্পনা করিতেছেন, মানুষের দীর্ঘশ্বাস ও প্রবঞ্চনার বেদনাই গর্জন করিয়া মহাপ্রলয়ের সৃষ্টি করিবে। তুলনীয়,

> এ আমার এ তোমার পাপ।
> বিধাতার বক্ষে এই তাপ

বহুযুগ হতে জমি বায়ুকোণে আজিকে ঘনায়—
ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ,
জাতি-অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান
বিধাতার বক্ষ আজি বিদীরিয়া
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।

(বলাকা—রবীন্দ্রনাথ)

ভয় পায়…কাড়ানাকাড়—দেবতা মানুষের নিকট ভীতির প্রতীক, আজ সেই ভীতিপ্রদ দেবতাই মনুষ্যত্বের বীর্যবান বিগ্রহের আবির্ভাবে আশঙ্কাতুর ; আজ সর্বশক্তিমান বলিয়া কল্পিত অন্তঃসারশূন্য ঈশ্বরের পলায়নের লগ্ন আসিয়াছে, যাহারা বিষনিঃশ্বাসে মনুষ্যজীবন মৃতকল্প করিয়া তুলিয়াছিল তাহাদের কবি প্রেত বলিয়াছেন। এখন সেই প্রেতলোক শূন্য হইয়া যাইতেছে। কারণ রণদামামা জয়বাদ্য কাড়ানাকাড়া দুন্দুভি ইত্যাদি বাজাইয়া কালাপাহাড় আসিতেছে।

(৩য় স্তবক) **কোটি-আঁখি…মূলে**—দেবতার জন্য মানুষ মন্দির ভজনালয় নির্মাণ করিয়াছে। সেই মন্দিরে অগণ্য মানুষ দেবতার করুণা ভিক্ষা করে, সেই মন্দিরের কঠিন পাষাণে মাথা কুটিয়া কাতর ক্রন্দনে মানুষ তাহার ইহজীবনের শোকতাপের অবসান প্রার্থনা করে। **ক্ষয় হল…শিলা-চত্বর**—দেবতার চরণে অনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়া মানুষ কী পাইয়াছে? কেবল মন্দিরের পাষাণবেদী মানুষের চোখের জলে দ্রবীভূত হইয়া ক্ষয় হইয়া গেছে। **অন্ধের…খুলে**—কিন্তু দেবতার নির্বিকার উদাসীন্য যে দেবতার অক্ষমতারই নামান্তর, মানুষের ইহজীবনের সমৃদ্ধিবিধানে যে কোনো অলৌকিক শক্তির করণীয় কিছুই নাই, ইহা মানুষ বোঝে না। তাহার অন্ধবিশ্বাস তবু দূরীভূত হয় নাই। **জীবের চেতনা…শুষ্ক শিলা**—কতকাল কত মানুষ দেবতার করুণা ভিক্ষা করিতে করিতে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছে, তথাপি দেবতা সদয় প্রসন্ন হইয়া কোনো অপার্থিব শক্তিতে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তিত করিয়া দেন নাই ; তথাপি মানুষ বিশ্বাসমুক্ত হয় নাই, তাহার জীবন মৃত্যুতে বিলীন

করিয়াছে। এই মৃত্যু যেন জীবের চেতনা হরণ করিয়া শুক্লরাত্রির অন্ধকারে পরিবর্তন মাত্র। **রক্তলোলুপ ··অমৃত-তৃষা**—মানুষকে প্রার্থী করিয়া শেষ পর্যন্ত তাহাকে হত্যা করাই যেন দেবতার উল্লাস। যাহারা নিজেদের অমৃত অমর বলিয়া প্রচার করিয়াছে, মানুষের প্রাণসংহার ও রক্তলোলুপতাই যেন তাহাদের চির তৃষ্ণা। **আজ তার···আসে ওই**—নবযুগে মানুষের চৈতন্য আবির্ভূত হইয়াছে কালাপাহাডের বেশে, তাই পূর্বতন যুগের যত মনুষ্যত্বলোভী দেবতার শোষণ সব কিছুর আজই অবসান ঘটিবে। দেবতাকে দমন করিবার জন্য যুগপ্রতিনিধি কালাপাহাড ঐ আবির্ভূত হইলেন বলিয়া।

(৪র্থ স্তবক) **অগ্নি-পতাকা···উল্কা-হার**—ভয়ংকর কালাপাহাডের আবির্ভাব ঘটে ঈশান-কোণে। এই ঈশান-কোণে তাহার প্রচণ্ড অগ্নি-পতাকা উডিতেছে, তাহাতে শোভা পাইতেছে উল্কার হার। **অগ্নি-পতাকা** তাহার শক্তিমত্তার প্রতীক, **উল্কা** তাহার অপ্রত্যাশিত অথচ অপ্রতিরোধ্য আবির্ভাবের প্রতীক। **ঈশান**—পূর্ব ও উত্তরদিকের মধ্যবর্তী কোণ, স্বয়ং রুদ্র এই কোণের প্রতীক। তাই যাহা কিছু ভয়ংকর তাহার আবির্ভাব ঘটে ঈশান-কোণে, এইরূপ প্রয়োগ কবিতায় দেখা যায়। **অসির ঝলকে··· ত্রিশূল-চূড়া**—রণদুর্মদ কালাপাহাডের এক ভয়ংকর শক্তিমূর্তি অঙ্কন করিয়াছেন কবি এই ছত্রগুলিতে। তাহার হস্তে শত্রুঘাতী কৃপাণ, তাহাতে বজ্রের দীপ্তি। তাহার আক্রমণের লক্ষ্য দৈববল—তথা মন্দির বিগ্রহস্থান। এইজন্য সেই হস্তধৃত বজ্রাগ্নিতুল্য অসির ঝলকে মন্দিরের উর্ধ্বভাগস্থ ত্রিশূল বিগলিত হইয়া যাইতেছে। **ত্রিশূল**—সংহারক শিবাস্ত্র তথা দেবশক্তির প্রতীক। কিন্তু মনুষ্যশক্তির তেজে দৈবশক্তির অস্ত্র দ্রবীভূত হয় ইহাই কবির ইঙ্গিত। **ভৈরব রবে···হয় ·বা গুঁড়া**—কালাপাহাডের মত্ত গর্জন রুদ্রের প্রলয়ধ্বনির ন্যায়, সেই প্রচণ্ড রবে মৃৎপৃথিবী যেন সংজ্ঞাহীন হয়, আকাশ বিদীর্ণ হয়। **পূজারী···বধির**—কালাপাহাডের বিরুদ্ধে দৈবশক্তিকে জাগ্রত করিবার জন্য পুরোহিত মন্দিরে বৃথাই চেষ্টা করিতেছে, দেবতা শ্রবণহীন—তাহার জাগিবার কোনো ক্ষমতাই নাই, ইহা বিদ্রূপচ্ছলে কবি বলিতেছেন। **ঘণ্টার···আর**—কোনো পূজার্ঘ্য কাংস্যঘণ্টানিনাদ উপচার-আয়োজনেই দেবতার সজীব হইবার ক্ষমতা নাই। অথচ এই সকলের দ্বারাই এতকাল মানুষ দেবতাকে জাগাইবার বিশদ প্রয়াস করিয়া আসিয়াছে। **অরাতির···**

ফুরায়—দেবশক্তির শত্রুর প্রবল পরাক্রমে আজ মিথ্যা পূজার আয়োজন সমাপ্ত হইল।

(৫ম স্তবক) **নিজ পায়ে…কি দুর্গতি**—দৈবশক্তির উপর বিশ্বাস রাখিয়া মানুষ এতকাল আপনার আত্মশক্তিকে নির্জিত করিয়া রাখিয়াছিল—ইহা যেন মানুষের আপন চরণে স্বেচ্ছাগৃহীত বন্ধন-শৃঙ্খল। এইভাবে ক্রীতদাস হইয়া আত্মবিশ্বাসহীন দুর্বল মানুষ দেবতাকে ক্ষীণ করজোড়ে প্রণতি জানাইয়াছে। আজ সেই প্রণামপিপাসু সর্বশক্তিমান দেবতার চূর্ণ মর্যাদা ও ছিন্নভিন্ন প্রতিষ্ঠাহীনতার দুর্দশা দেখিয়া কবি অট্টহাস্য করিতেছেন। **কোথায় …অমরগণ**—পিনাক ডম্বরু সুদর্শন চক্র এইগুলি অরিদমনকারী দৈত্যনিসূদন দেবতার বাদ্য ও অস্ত্র, এইগুলি ভীতি ও শক্তির প্রতীক। কিন্তু কালা-পাহাড়ের মনুষ্যত্ব কোনো দৈবশক্তিকেই পরোয়া করে না বলিয়া আজ বহুকাল-গৃহীত দেবশক্তির প্রতীকগুলি মিথ্যা প্রমাণিত হইয়া গেল। যে দেবতাবৃন্দ অমর বলিয়া এতকাল মানুষ জানিত, যাঁহারা মানুষকেই ত্রাণ করিতে পারিতেন, আজ তাঁহাদের নিরাপত্তা বিপন্ন হইয়াছে; এখন দেবস্থান ত্যাগ করিয়া নশ্বর মানুষের গৃহেই আত্মগোপন করিয়া তাঁহারা আপনাদের কোনোমতে রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল। অর্থাৎ মনুষ্যত্ব আজ যখন জাগিয়াছে তখন দেবতার বাঁচিবার কোনোই উপায় নাই, যদি দুর্বল মানুষ এখনও তাঁহাদের বিশ্বাসের গোপন হৃদয়ে তাঁহাদের লালন করেন সে ভিন্ন কথা। **ছাড়ি লোকালয়…সীমানা-পার**—লোকালয়েই ছিল দেবতাদের আধিপত্যস্থান, মানুষের ভয়ত্রস্ত জীবনই ছিল তাঁহাদের অধিকারের উপকরণ, কিন্তু এখন এই লোকজীবন ও মানববিশ্বাস হইতে তাঁহাদের ছিন্নমূল হইতে হইল! যেখানে মনুষ্য নাই সেখানে দেবতার প্রতাপের বিজ্ঞাপন দিবারও প্রয়োজন নাই। সুতরাং এখন লোকালয় হইতে উদ্বাস্তু দেবতাবৃন্দ মনুষ্য-অধ্যুষিত নয় এমন দূররাজ্যে প্রস্থান করিতেছে, এই বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া কবি বিদ্রূপ করিতেছেন। **ভয়ংকরের ভুল ভেঙে যায়**—দেবতাদের ভীতিপ্রদ রূপ সম্পর্কে মানুষের যুগলালিত অন্ধ বিশ্বাস আজ চূর্ণ হইয়া গেল।

(৬ষ্ঠ স্তবক) **কল্প-কালের…দানব-পুরঞ্জয়**—ঈশ্বর সম্পর্কে মানুষের নানা ধারণা ও কল্পনা কোন আদিম অতীত হইতে সঞ্চিত হইয়াছে, শিশু-বয়স হইতে পাপ-অন্যায় নরকভীতি ইত্যাদি ধারণা মানুষের মনে জমা হইতে

থাকে—স্বর্গ ও মর্ত্য ব্যতীত একটি স্থান আছে যেখানে অপরাধী মানুষের পারত্রিক শাস্তিবিধান হইয়া থাকে। এই নরকের চেহারা বীভৎস। কবি বলিতেছেন পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে এই সকল ধারণা দূর করিবার জন্যই দৈত্য-দানব-বিজয়ী কালাপাহাড়ের আবির্ভাব। **দেহের দেউলে… প্রপিতামহ**—দেবতার নিবাস মানবদেহের মধ্যেই, দেহের প্রবৃত্তিসমূহের তৃপ্তিবিধানেই জীবনের পরম পরিপূর্ণতা, পৃথিবীর অনেক ধর্মেই দেহের ভাণ্ডে দেবসেবা করিবার নির্দেশ আছে। কিন্তু আমরা দেহস্থিত দেবতাকে অস্বীকার করিয়া, দেহকে ক্লিষ্ট করিয়া, বৈরাগ্যে কৃচ্ছ্রসাধনে কাটাইয়াছি এবং বাহিরের কোনো স্থূল পদার্থ—প্রস্তর দারু কিংবা মৃন্ময় পদার্থকে দেবতা বলিয়া স্তব করিতেছি। বাহিরের মন্দিরে দেবতা নাই, দেবতার মন্দির এই মানবদেহ। সুতরাং দেহকে অবহেলা করিয়া রচিত-কৃত্রিম অপদেবতাকে আরাধনা করিলে মানবদেবতার অপমান হয় এবং সেই অপমান একদিন আপনার প্রতিকার সাধনের চেষ্টা করিবেই। এইভাবে কত যুগ ধরিয়া কত বংশানুক্রমে মানুষ অন্তরে অন্তরে বহিঃশক্তির—কল্পিত অপদেবতার বশীভূত হইয়া উঠিয়াছে। তুলনীয়,

মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে,
তারে হাস্য হেনে যাব, বলে যাব, এ প্রহসনের
মধ্যঅঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের।

[সেঁজুতি—রবীন্দ্রনাথ]

এবং
এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো
মন্দির কাবা নাই।—নজরুল

স্তম্ভিত…যুগাবতার—মানুষের হৃদয়ের দেবতাকে অস্বীকার করিয়া অর্থাৎ দেহের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকে শুষ্ক করিয়া, মধুর মানব জীবনের সুধাপান না করিয়া মানুষ পারলৌকিক মুক্তি কামনায় শরীর ক্লিষ্ট করিয়া থাকে, কৃচ্ছ্রসাধন করে, বৈরাগ্যে জীবন সর্বস্বান্ত করিতে চায়। এইভাবে তাহার হৃদয় হয় বন্ধুর, তাহা ব্যথায় উপেক্ষায় অসাড় স্তম্ভিত হইয়া যায়। আর সেই অসাড় হৃৎপিণ্ডের উপর মানুষ চাপাইয়া দেয় মিথ্যা বিশ্বাস, অন্ধ সংস্কার, কৃত্রিম আচারপরায়ণতার অচলায়তন। এইভাবে মানবতার যে

অপমান, মনুষ্যত্বের যে নির্যাতন ঘটিতেছে, যুগের প্রতিনিধি—যুগযন্ত্রণা উদ্ধার করিবার জন্য আবির্ভূত, মানবশ্রেষ্ঠ কালাপাহাড় কি তাহা সহ্য করিবে ?

(৭ম স্তবক) **ভেঙে ফেল··· দাও বিসর্জন**—আজ মনুষ্যত্বের উদ্বোধনে অপদেবতার চিহ্নগুলি নিঃশেষে অবলুপ্ত হইয়া যাক। যাহা কিছু কৃত্রিম আচার অন্ধ সংস্কার ও মিথ্যা বিশ্বাসের স্থূল প্রতীক—সেই মঠ মন্দির বিগ্রহ আজ চূর্ণ করিয়া ফেলিতে হইবে। কারণ ইহারাই মিথ্যা দেবতার জয়-প্রতীক হইয়া আমাদের ভক্তিভীতির ষোড়শোপচার আদায় করিতেছে। এই অপদেবতাকে তুষ্ট করিবার জন্য জীবমেধ করা হয়, ধূপ-দীপের উপচার সাজাইয়া ধরা হয়। এইসব স্থূল আচার-বিচারকে আজ নির্মমভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। তুলনীয়,

তুমি শালগ্রাম শিলা,
শোওয়া-বসা যার সকলি সমান, তারে লয়ে রাসলীলা।—যতীন্দ্রনাথ

I have no chain, no church, no philosophy—ওয়াল্ট হুইটম্যান।

নাই ব্রাহ্মণ···আছে রে—যথার্থ মনুষ্যত্ব শ্রেণীভেদ-বিরহিত, কৃত্রিম পার্থক্য-সূচক সাম্প্রদায়িকতাবর্জিত। এতকাল শাস্ত্রের নামে দেবতার বিধান বলিয়া সমাজে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের জাতি-বিচার করা হইয়াছে, অস্পৃশ্য যবন বলিয়া মনুষ্য-সম্প্রদায়ের বৃহৎ অংশকে দূরে সরাইয়া রাখা হইয়াছে ; সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এক-দিকে অন্যদিকে ঈশ্বর-বিশ্বাসী ভক্ত, এইভাবে মানুষকে চিহ্নিত করা হইয়াছে। এসকলই স্থূল ভেদ, মিথ্যা পৃথকীকরণ—পৃথিবীতে একমাত্র সত্য মানুষ, ইহাই কবির অভিনব অভিজ্ঞতা। [বিংশ শতকের বুদ্ধিজীবী মানুষের কাছে মনুষ্যত্বের এই উপলব্ধি অসংখ্য কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে। 'জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে সে জাতির নাম মানুষ জাতি'—সত্যেন্দ্রনাথের কণ্ঠে আমরা শুনিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,

হে চিরকালের মানুষ, হে সকল মানুষের মানুষ,
পরিত্রাণ করো
ভেদচিহ্নের তিলক-পরা
সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে। (পত্রপুট ১৫নং)

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত লিখিয়াছেন—

শুনহে মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য, স্রষ্টা আছে বা নাই।

নজরুলের মানবতাবাদ ইহারই সহিত সুর মিলাইয়া গাহিয়াছে,

মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।]

মানুষের বুকে রক্ত চাই—মানুষের কৃত্রিম ভেদ বর্ণপার্থক্য জাতিবৈষম্য এইগুলি মিথ্যা, সত্য মানুষের তপ্ত শোণিত, তাহাকে কোনো প্রভেদসূচক বৈষম্য নাই বলিয়া কবি আজ মনুষ্যত্বযজ্ঞে সেই ভেদবিরহিত সত্য মনুষ্যশোণিত কামনা করিতেছেন। রক্ত জীবনের সঞ্জীবতার প্রতীক।

(৮ম স্তবক) **ব্রাহ্মণ যুবা··বহ্নি সাথে**—মহামানবের মিলনযজ্ঞে ব্রাহ্মণ যুবশক্তির সহিত ম্লেচ্ছ অস্পৃশ্য যবন আজ এক হইয়া গিয়াছে কারণ ব্রাহ্মণ-যবন-ভেদ কৃত্রিম ভেদ। বরং এই দুই সম্প্রদায় মিলিত হইয়াই মানবতার বৃহত্তর শক্তি গঠিত হইবে, অগ্নির সহিত বায়ু যুক্ত হইলে অগ্নি যেরূপ লেলিহান শিখায় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। **এ কোন প্রলয়-রাতে**—নূতন চিন্তা, নূতন বিদ্রোহ-বিপ্লবকে ঝড়ের প্রলয়-রাত্রির সহিত তুলনা করা এবং নবযুগের কল্পনাকে আসন্ন প্রভাতের রূপকে চিত্রিত করা কাব্যে প্রায়শ দেখা যায়। সেই সূত্রেই বিধাতার বজ্র প্রভৃতি আনুষঙ্গিকের আগমন। বিধাতা এখানে সেই ভাগ্য-বিধাতা যিনি পৃথিবীর সকল কৃত্রিম ধর্মভেদ মনুষ্যত্ব-হীনতার প্রতিশোধ ঘটাইবেন আঘাতের মধ্য দিয়া। **মরুর মর্ম···ভাসায় ধরা**—মানবতার জন্য সমাজের যে পিপাসা এতকাল অতৃপ্ত অবরুদ্ধ ছিল, আজ মনুষ্যত্বের চেতনায় তা মুক্তির পথে, মনে হইতেছে যেন, মরুভূমির শুষ্ক বক্ষ ভেদ করিয়া সত্যের অমৃত সুধা উৎসারিত হইল, তাহার বিপুল প্রবাহ পৃথিবী ভাসাইয়া লইবে অর্থাৎ আজ এই প্রচণ্ড মনুষ্যত্বের সার্বভৌম জাগরণে বিশ্বের কোথাও কোনো অন্ধ, সংস্কারের মরুত্ব থাকিবে না। তুলনীয়,

পঙ্কিল যত পল্বলে আজ শোনো কল্লোল বন্যাজলে —সত্যেন্দ্রনাথ।

মুকুটে···ময়ূর হার—মানবতার জীবন্ত বীর্যবান প্রতীক কালাপাহাড়, তাহার তেজোদীপ্ত মূর্তি কবির দৃষ্টিতে পূর্ণউদ্ভাসিত। তাহার মস্তকের মুকুটে নব-যুগের প্রভাত-সূর্যের আলোক রশ্মি, তাহার কণ্ঠে জ্যোতির হার। তুলনীয়,

নমি তোমা নরদেব ! কি গর্বে গৌরবে দাঁড়ায়েছ তুমি !
সর্বাঙ্গে প্রভাত-রশ্মি, শিরে চূর্ণ মেঘ, পদে শষ্প-ভূমি।

—অক্ষয়কুমার বড়াল।

কাল-নিশীথিনী লুকায় বসনে—মিথ্যা আচার অন্ধ সংস্কার ভ্রান্ত বিশ্বাস মূঢ় বিচারহীনতাই কাল-নিশীথিনী, রাত্রি তাহার অন্ধতার রূপক। জ্ঞানের বা সত্যের প্রভাত রশ্মির কাছে তাহার স্থান নাই বলিয়া যেন নিশীথিনী বসনে মুখ লুকাইতেছে।

(৯ম স্তবক **কার পথে মেঘ-সমান**।—নরসিংহ যুগাবতার বীর্যবান মনুষ্যত্ব-স্বরূপ কালাপাহাড়ের তেজস্বল রূপটি অপূর্ব ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার আগমন পথে উন্নতগ্রীব পর্বতও তাহার নিকট আভূমি নত হয় অর্থাৎ সেই একমাত্র অভ্রভেদী, আর কেহ নয়। তাহার নয়নের দীপ্তি সূর্যকেও নিষ্প্রভ করে, তাই কটাক্ষে সূর্যও অস্তমিত হয়। আকাশের বিদ্যুৎ চঞ্চল, তাহাকে স্থির করিয়া সে তাহার কৃপাণ নির্মাণ করিয়াছে। তাহার পদভারে যে ধূলি উত্থিত হয় তাহাই মেঘ। তুলনীয়,

শির নেহারি আমার নতশির ঐ শিখর হিমাদ্রির। —নজরুল।

ব্যাখ্যা

শুনিছ না ওই · · ভীম প্রহার, কালাপাহাড়। (প্রথম স্তবক)

আলোচ্য পংক্তিগুলি আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে দেহবাদ ও মানববাদের প্রবর্তক কবি মোহিতলাল মজুমদারের 'কালাপাহাড়' কবিতা হইতে উদ্ধৃত। দেবরাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে মূর্তিমান বিদ্রোহ মনুষ্যত্বের প্রবর্তক কালাপাহাড়ের আবির্ভাব ঘোষণায় এই স্তবকটি সুচিহ্নিত।

কালাপাহাড় ঐতিহাসিক ব্যক্তি, ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে বাঙলার নবাবের এই মুসলমান সেনাপতির অত্যাচারে ও নিষ্ঠুরতায় বাঙলা আসাম বিহার উড়িষ্যার দেবমন্দিরগুলি নির্মমভাবে ধূলিসাৎ হইয়াছিল। আলোচ্য কবিতায় মোহিতলাল কালাপাহাড়কে মানুষের অন্ধ দৈবভক্তি, অলৌকিক শক্তির নিকট কৃপাপ্রার্থনা, আচারপরায়ণ সংস্কারের বিরুদ্ধে মনুষ্যত্বের পর্ধিত প্রতীকরূপে অঙ্কন করিয়াছেন। মনুষ্যত্ব জাগ্রত হইলে মানব-পীড়ন স্তব্ধ হয়, সংস্কারের অচলায়তন ভাঙিয়া পড়ে, ইহাই বর্তমান কবিতাংশের

গূঢ়ার্থ। মানবত্ব-লোপী দৈবশক্তির ভয়াবহ অত্যাচারকে কবি একটি শ্মশান-দৃশ্যের সহিত তুলনা করিয়াছেন, ভক্তিলোলুপ দেবতাবৃন্দ এই শ্মশানে রক্ত-লোভাতুর প্রেতাত্মা ও নিশাচরতুল্য। সহসা মানবতার মূর্তিমান বিগ্রহ কালাপাহাড়ের আগমন-সংবাদে এই শ্মশানে প্রেতাত্মাদের কাতর মরণক্রন্দন উঠিয়াছে। যে সকল দেবতা মানবজীবনকে শবতুল্য ভাবিয়া তাহাদের আহার করিত, সেই সকল নিশাচরদের মধ্যে কলরব উঠিয়াছে। কালা-পাহাড়ের দৃপ্ত আবির্ভাব দূরবর্তী আকাশের অন্ধকারকে মশালের আলোকে রাঙাইয়া দিয়াছে, সেই অগ্নির তপ্ত নিশ্বাসে অন্ধকার আকাশের পাষাণ যেন ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিতেছে। পৃথিবী তাহার পদভারে কম্পিত হইল। তাহার তাণ্ডব নৃত্যের দ্বারা এখনই যেন এক মহাপ্রলয় জাগিবে। কবি উদ্‌গ্রীব হইয়া ভাবিতেছেন, এতকাল পরে মানুষের দৈববিশ্বাসজনিত পুঞ্জীভূত পাপ করিবার জন্য দেব-দৈত্য-বিজয়ী মনুষ্যত্বের অবতার আবির্ভূত হইলেন? এই সেই কালাপাহাড়, দেবতাকে আঘাত করিবার জন্য, অপ্রাকৃত শক্তিকে চূর্ণ করিবার জন্যই তাহার আবির্ভাব ঘটিয়াছে।

টীকা—কালাপাহাড—আলোচনা দ্রষ্টব্য।

কত কাল পরে ···কাড়ানাকাড়! কালাপাহাড়! (দ্বিতীয় স্তবক)

প্রসঙ্গসূত্র পূর্ববৎ

কালাপাহাড় ষোড়শ শতাব্দীর জনৈক হিন্দুবিদ্বেষী বিগ্রহ-ধ্বংসকারী অত্যাচারী মুসলমান হইলেও আলোচ্য কবিতায় কবি আধুনিক মানুষের দৈবানুগ্রহ-প্রার্থনার বিরুদ্ধে, অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মনুষ্যত্বের বলিষ্ঠ প্রতীকরূপে তাহাকে অঙ্কিত করিয়াছেন। আজ তাহার দৃপ্ত আবির্ভাবে দেবসমাজে আর্তনাদ উঠিয়াছে, পুরাতন অচলায়তনের ভিত্তি কম্পিত হইয়াছে, নির্জিত মানবাত্মা আবার আত্মশক্তি ও পুরুষকার লাভ করিতেছে। কালা-পাহাড়ের পদসংকেতে আজ মানুষের শিরায় ধমনীতে এতকাল-সুপ্ত রক্তস্রোত অগ্নিতপ্ত হইয়া উঠিল, দীর্ঘকালের আত্ম-বিক্রীত অধীনতার পর এই স্বাতন্ত্র্য ও আত্মনির্ভরশীলতা শোণিতে সংগীতধ্বনি তুলিল। মানুষের আত্মবলিদানের ফলে দেবতার বেদী এতকাল কেবল লাল হইয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহাতে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ধূম্রপুঞ্জ দেখা যাইতেছে। সেই সুপ্রাচীন কাল হইতে

দেবতাগণ মানুষকে কেবলই প্রবঞ্চিত করিয়া আসিতেছেন। মানুষের সেই বঞ্চনা-ব্যর্থতা-জনিত বেদনা ও দীর্ঘশ্বাস পুঞ্জীভূত হইয়া আজ একটি মহা-প্রলয়ের বিপুল ঝড়ের সৃষ্টি করিয়াছে, দিগন্তের কোলাহল সেই ঝটিকারই মত্ত উল্লাসমাত্র। এই ঝটিকার মধ্য হইতে প্রাদুর্ভূত হইল মানবতার প্রতীক কালাপাহাড। যে দেবতা ছিলেন ভীতির প্রতীক, আজ কালাপাহাড়ের আবির্ভাবে তাঁহাদেরই ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে, ভগবান আজ মনুষ্যত্বের সম্মুখে আপনার প্রতিষ্ঠা-ভঙ্গ করিয়া পলাতক, মানবলোলুপ প্রেতের নিবাস বুঝি নিঃশেষ হইল। চতুর্দিকে আজ মহামানবের আগমন-সংকেত ধ্বনিত হইয়া উঠিল, কালাপাহাড়ের আবির্ভাব-ঘোষক দুন্দুভি, তাম্রনির্মিত দামামা, কাড়া-নাকাড়া প্রভৃতি জয়বাদ্য বাজিয়া উঠিয়াছে। পরাক্রান্ত সেনাপতি যেমন শত্রু আক্রমণ করিবার সময় নানা জাতীয় জয়সূচক রণবাদ্য বাজাইয়া আসে, অপরাহত মনুষ্যত্বের আবির্ভাবও সেইরূপ কবির নিকট বাদ্যভাণ্ড-সমারোহে নিঃসংশয়িতভাবে সূচিত হইয়াছে।

কোটি-আঁখি-ঝরা· ···কাড়ানাকাড়'। কালাপাহাড়'। (তৃতীয় স্তবক)

প্রসঙ্গসূত্র পূর্ববৎ

বহু শত শত বৎসর ধরিয়া মানুষ মিথ্যাই অসহায়ভাবে দৈবনির্ভরশীল—আপনার দুঃখ বিপদে সে কোন্ অদৃশ্য স্বর্গলোকের দিকে উদ্বাহু কৃপা প্রার্থনা করিয়াছে। কিন্তু ইহাতে মানুষের কেবল শক্তিক্ষয়ই হইয়াছে। দেবতা মানুষের আত্মশক্তি হরণ করিয়াছেন, তাহাকে স্বাধীন স্বনির্ভরশীল করিয়া তোলেন নাই। যুগান্তর-বাহিত এই মিথ্যা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কবি কালাপাহাড়কে স্থাপন করিয়াছেন মানুষের আত্মমহিমা ও আত্মপ্রত্যয়ের প্রবুদ্ধ প্রতীকরূপে। কত কোটি মানবনয়ন দেবতার করুণা ভিক্ষা করিয়া নিত্যকাল অশ্রুপাত করিয়াছে, কিন্তু সেই মিথ্যা-বিশ্বাসের পরিণামে আত্মবঞ্চনাই লাভ হইয়াছে। দেবমন্দিরের প্রস্তরকঠিন চত্বর সেই অশ্রুপাতে বরং বিগলিত হইয়াছে, কিন্তু দেবতা গলিয়া যান নাই। তথাপি দৈবশক্তির নিষ্ফলতা সম্পর্কে অচেতন মানুষের চৈতন্য জাগ্রত হয় নাই, ইহাই বিস্ময়ের। অসহায় মানব কত আকুল কাতর প্রার্থনায় আহ্বান করিয়াছে, এইভাবে মাথা কুটিতে কুটিতে কত প্রাণ আত্মদান করিয়াছে। এই আত্মদানের কালিমা যেন

জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে, তথাপি দেবতা জাগ্রৎ হন নাই। ইহা দেবতার নিষ্ঠুরতারই দৃষ্টান্তমাত্র। অমর বলিয়া আখ্যাত দেবতাগণ এইভাবেই তাঁহাদের লোলুপ বাসনার দ্বারা মানুষের রক্ত শোষণ করিয়া দেবতার অমৃত-তৃষ্ণা মিটাইয়াছে। কিন্তু সেই তৃষ্ণার সেই রক্তশোষণের আজই অন্তিম পরিণাম। আজ নির্জিত মনুষ্যত্বকে জাগাইবার জন্য মানব-অবতার যুগ-প্রতিনিধি কালাপাহাড়ের দৃপ্ত আবির্ভাব ঘটিয়াছে, তাহার বিজয় অভিযানের স্মারক-ঘোষণা শুনা যাইতেছে দুন্দুভি কাড়ানাকাড়া দামামা প্রভৃতি রণবাদ্যে। মনুষ্যত্বলোপী দৈবশক্তির সহিত মনুষ্যত্বের সংগ্রামের প্রতীক-রূপেই কালাপাহাড়ের অভিযাত্রা।

বাজে দুন্দুভি বুক ·· ·অসাড়! কালাপাহাড়! (চতুর্থ স্তবক)

প্রসঙ্গসূত্র পূর্ববৎ

পৃথিবীতে সর্বশক্তিমান প্রাণী হইল মানুষ, তাহার গর্বোন্নত শির ঊর্ধ্বে হিমালয়-সমান, তাহার চরণভারে ধরিত্রী কম্পমান। কিন্তু এই মানুষকে ঘিরিয়া ধরিয়াছিল অন্ধ সংস্কার, মিথ্যা দৈব বিশ্বাস, সংস্কারের অচলায়তনে নির্জিত হইয়াছিল মানুষের আত্মপ্রত্যয়। এতকাল মানুষ আত্মমর্যাদা হারাইয়া ধর্মের যূপকাষ্ঠে নিজেকে বলি দিয়াছে। মন্দিরের পাষাণ-দেবতার চরণে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছে। পরম শক্তিমান বলিয়া মিথ্যা দেবতার উপাসনা করিয়াছে, পরিমাণে আত্মবিশ্বাস লুপ্ত করিয়া অপ্রাকৃত মিথ্যার পায়ে মাথা কুটিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। মানুষের সেই সুপ্ত আত্মপ্রত্যয় লুপ্ত বিশ্বাস ও বঞ্চিত মনুষ্যত্ব পুনরুদ্ধার করিবার জন্য কালাপাহাড়রূপী যুগাবতার মানব-সিংহের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। দিকে দিকে তাহার আগমনের বিজয়-সংকেত শুনিতে পাইতেছেন কবি। পরাক্রান্ত সেনানায়ক যেমন করিয়া বিজয় দুন্দুভি নিনাদে, তাম্রনির্মিত দামামা বাজাইয়া, ভয়ংকর কাড়ানাকাড়ার শব্দ করিতে করিতে শত্রুসৈন্যের উপর আক্রমণ করে, তেমনি জয়নাদে বিপুল বাদ্য সমারোহে মনুষ্যত্বের মূর্তিমান প্রতীক কালাপাহাড়ের আগমন ঘোষিত হইতেছে। বিপুল তাহার শক্তি, ভয়ংকর তাহার প্রতাপ। ঈশান-কোণে তাহার জয় সূচক অগ্নিপতাকা উড়িতেছে। তাহাতে তাহার অপ্রত্যাশিত দ্রুত আগমনের চিহ্নস্বরূপ উল্কার মালিকা দুলিতেছে। তাহার মুক্ত কৃপাণে বজ্রের

ঝলক—এই বজ্ররূপ কৃপাণের দ্বারা সে দৈববলের অত্যাচারকে দ্বিখণ্ডিত করিবে। এই বজ্রের দীপ্ত তেজে দেবশক্তির মূর্তিমান প্রতীক মন্দিরের ত্রিশূল-চূড়া বিগলিত হইতে সুরু করিয়াছে। তাহার ভৈরবসদৃশ প্রচণ্ড গর্জনে সমগ্র বিশ্ব যেন চৈতন্য হারাইতেছে, আকাশ যেন শতখান হইয়া চূর্ণ হইয়া যাইবে। অর্থাৎ ঊর্ধ্বলোক ও মৃত্তিকা উভয়ই তাহার আগমনে প্রকম্পিত। যে সকল ধর্মব্যবসায়ী দেবমন্দিরের রক্ষক, যাহারা দেবতার নিকট মনুষ্যত্বের অপমান ঘটাইয়া থাকে সেই সকল ভক্তিধর্মের পুরোহিত-সম্প্রদায় এখন অস্থির হইয়া উঠিল। এই মানব-দেবতার বিরুদ্ধে উপাচার-পূজায় ঘণ্টা বাজাইয়া তাহারা দেবতাকে জাগাইতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু মনুষ্যত্বের জাগরণে দেবতা বধির হইয়া পড়েন, তাঁহার নিদ্রা আর ভাঙে না। দেবঘ্ন পরাক্রমের যখন জাগরণ ঘটে, তখন দেবারতির পালা ফুরায়। কালাপাহাড় ধর্মদ্বেষী, নিষ্ঠুর, দেবশক্তির সে ভয়ংকর শত্রু। তাহার নাম শুনিলেই সুলভ ভক্তিবাদের ত্রাস উপস্থিত হয়, বক্ষ শুষ্ক হইয়া যায়।

নিজ হাতে পরি ·· ··কাড়ানাকাড়! কালাপাহাড়! (পঞ্চম স্তবক)

প্রসঙ্গসূত্র পূর্ববৎ।

দেববিদ্বেষী কালাপাহাড়ের দৃপ্ত আবির্ভাব মনুষ্যত্বের বীর্যবান আত্ম-প্রকাশেরই প্রতীক। কালাপাহাড় এখানে ঐতিহাসিক চরিত্র নয়, যুগ প্রয়োজনে ধর্মের মনুষ্যত্বলোপের বিরুদ্ধে সে মানুষের আত্মপ্রত্যয়-জাগরণেই নামান্তর। দীর্ঘকাল ধরিয়া দেবতা ভয় ও ভক্তির বলশালিতায় মানুষকে অন্ধ বিশ্বাসের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিয়াছেন, তাহাকে পরনির্ভর অসহায় ক্রীতদাসে পরিণত করিয়াছেন। দৈবশক্তির উপর নির্ভর করিয়া মানুষ আপনার ব্যক্তিত্ব হারাইয়াছে। নিজের স্বাধীনতা দেবতার অনুগ্রহের কাছে বিক্রয় করিয়া নিজেকেই চিরবন্দী রাখিয়াছে। আজ তাহারই প্রতিশোধের দিন সমাগত। যুগান্তের মোহভঙ্গের দুন্দুভি বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে আজ দেবতার দুর্গতি সুরু হইল। যে দেবতাকে দুর্বল আত্মবিশ্বাসহীন মানুষ সন্ত্রস্ত হইয়া প্রণামী দিয়াছে, করজোড়ে যাঁহার করুণা প্রার্থনা করিয়াছে, আজ তাঁহার দুর্দশার শেষ নাই। দেবতার অন্তঃসারশূন্যতা আজ ধরা পড়িয়া যাইতেছে। এতকাল মানুষ দেবতার সর্বশক্তিমানতার প্রচার শুনিয়া আসিয়াছিল।

তাঁহার ভয়ংকর পিনাক নিনাদে দৈত্যবিনাশ হয়, তাঁহার ডমরু-ধ্বনিতে ভুবন কাঁপিয়া উঠে, তাঁহার সুদর্শন-চক্র অন্যায়ের প্রতিবিধান করে—এসবই মিথ্যা রঙিন কথার বিম্বমাত্র। মনুষ্যত্ব জাগিলে দেবত্ব ছায়ায় মিলাইয়া যায়। আত্মপ্রত্যয় জাগিলে ত্রাস অপহৃত হয়। তাই কালাপাহাড়ের আবির্ভাবে দেবতার পিনাক ডম্বরু *সুদর্শন*চক্রের মহিমাও বুঝা যাইতেছে। দেবতা এখন সম্মান বাঁচাইবার জন্য মানুষের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছেন। মানুষ যাঁহার নিকট এককণা করুণা ভিক্ষা করিত, যাঁহার ভয়ে এতকাল মানুষ সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিত, সেই মহাশক্তি দেবতার দুর্গতির আজ সীমা নাই। যাঁহারা অমর বলিয়া আত্মপ্রচার করিয়াছেন, সত্যই তাঁহারা অমর হইলে এখন কালাপাহাড়ের হাতে ধ্বংসের ভয়ে মানুষের ভক্তিকুটীরে সামান্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করিতেন না। লোকালয় ছাড়িয়া দেবতা এখন সপ্তসমুদ্র-সীমানা পার হইয়া অদৃশ্য গোপনে পলায়ন করিতেছে। দেবতাগণের অলৌকিক মহিমা ও ভয়ংকর প্রতাপ সম্পর্কে এখন মানুষের ভুল ভাঙিয়া যাইতেছে। সসৈন্য রণবাদ্য-অভিযানে মনুষ্যত্বের জীবন্ত বিগ্রহ কালাপাহাড়ই সেই ভুল ভাঙিয়া দিল।

কল্পকালের কল্পনা যুগাবতার—কালাপাহাড়? (ষষ্ঠ স্তবক)

প্রসঙ্গসূত্র পূর্ববৎ।

দৈবশক্তি মনুষ্যত্বের সর্বনাশ করিয়া থাকে। জগতের অন্তরালে এক পরাশক্তি বাস করেন, সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই জগতের প্রভু, আমাদের জীবন তাঁহার ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হয়—এইরূপ বিশ্বাসবশত মানুষ শিশুকাল হইতেই আত্মপ্রত্যয় ও মনুষ্যত্ব হারাইয়া অন্ধ বিশ্বাস আচারপরায়ণতা মিথ্যা-ভক্তিবাদ ও কুসংস্কারের অধীন হইয়া পড়ে এবং পদে পদে দেবতার অনুগ্রহলাভ করিবার জন্য দেবতার চরণে মাথা কুটিতে থাকে। দেবতাকে তুষ্ট করিবার জন্য সম্পদ সংগ্রহ করিয়া মন্দির-মসজিদ নির্মাণ করে। তাহাকে ষোড়শোপচারে পূজা দেয়। পাছে দেবতা রুষ্ট হইয়া আমাদের সর্বনাশসাধন করেন, এই ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া থাকে। আবহমান কাল হইতে মানুষের মনে দেবতা সম্পর্কে এই সকল কল্পনা প্রশ্রয় পাইয়াছে, অমূলক পাপচেতনা ও নরকের ভয় ঢুকিয়াছে। দেবতার বিরুদ্ধে আচরিত কর্মের অপরাধে দেবতা

মানুষকে পরলোকে নরক নামক বীভৎসস্থানে নানাবিধ যন্ত্রনাদায়ক শাস্তিবিধান করিয়া থাকেন—শিশুকাল হইতেই এইরূপ ভীতি আমাদের মনে প্রবেশ করিয়া থাকে। এইভাবে মানুষ ধীরে ধীরে তাহার মনুষ্যত্ব স্বাধীন সত্তা বলিষ্ঠ পৌরুষ ও দুর্দম আত্মপ্রত্যয় হারাইয়া বসিয়া আছে। কিন্তু অপরাহত মনুষ্যত্বের জীবন্ত বিগ্রহ দেব-দৈত্য-দানবত্রাসী কালাপাহাড় আজ মানুষের সেই চিরাচরিত ভয় ও অন্ধ দৈবানুসরণের বিরুদ্ধে মনুষ্যত্ব জাগাইবার জন্য আবির্ভূত। যথার্থ দেবতা মানুষের আত্মমর্যাদা, মানুষের অন্তরেই তাহার বাস—বাহিরের কোনো শক্তি মানুষের উপর প্রভুত্ব করিতে পারে না। কিন্তু মানুষের আপন অন্তরের শক্তিকে অপমান করিয়া মানুষ মিথ্যা ভয়ে বাহিরের দেবতাকেই বংশানুক্রমে সনাতন কাল ধরিয়া পূজা করিয়া আসিয়াছে, ভক্তিভয়ের অর্ঘ্য দান করিয়া আসিয়াছে। আত্মমর্যাদার অপমানে অন্তরের দেবত্ব এতকাল অপমানিত হইয়াছে, তথাপি মানুষের চৈতন্য হয় নাই। মিথ্যা পূজার ভারে তাহার অসাড় হৃৎপিণ্ডের উপর সে বিশ্বাসের পাষাণস্তূপ বেদী মন্দির প্রভৃতি অচলায়তন নির্মাণ করিয়াছে। কিন্তু হৃদয়ের দেবতা এই অসহ্য অপমান সহ্য করিবেন কেন? সেই অপমানিত মনুষ্যত্বই আজ কালাপাহাড়ের ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করিয়া সমুপস্থিত। মানবের বহুকাল-সঞ্চিত গ্লানি দূর করিবার জন্য যুগপ্রতিনিধি মানবশ্রেষ্ঠ কালাপাহাড়ের বিদ্রোহজনিত আগমন ঘটিয়াছে।

ভেঙে ফেল মঠ ··· কাড়ানাকাড়—কালাপাহাড়? (সপ্তম স্তবক)

প্রসঙ্গসূত্র পূর্ববৎ।

ইতিহাসের কালাপাহাড় ছিলেন হিন্দুধর্মদ্বেষী অত্যাচারী মুসলমান সেনাপতি—আসাম হইতে বারাণসী, উড়িষ্যা, বাঙলা দেশের কোনো বিখ্যাত মন্দিরই তাহার নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলা হইতে রক্ষা পায় নাই। এই ঐতিহাসিক কালাপাহাড়কে কবি মোহিতলাল আধুনিক বুদ্ধিজীবী মানুষের মনুষ্যত্ব চেতনার পুনরুজ্জীবনের প্রতীকরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বছরের মধ্যে মানুষের মনোরাজ্যে বহু বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। তাহার পুরাতন ধর্মবিশ্বাস, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক চেতনা আমূল বিবর্তিত হইয়াছিল। বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতির

ফলে তাহার পূর্বতন সংস্কার ও মূল্যবোধগুলি সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হইয়া গেল, ন্যায় অন্যায়, পাপচেতনা, কল্যাণ-ভক্তিবাদ অলৌকিকতা ইত্যাদির ভিত্তি শিথিল হইয়া গেল। এই সব কিছুর মূলে দেখা দিল এক নূতন মনুষ্যত্বচেতনা। মানুষকে মানুষরূপে দেখিবার দৃষ্টিভঙ্গি, দেহকেই জীবনের সর্বস্ব বলিয়া গ্রহণ করার বলিষ্ঠতা। পুরাতন অন্ধবিশ্বাস ও প্রথানুগত্যকে স্থানান্তরিত করিয়া এই মনুষ্যত্ববোধের প্রতিষ্ঠা খুব মসৃণভাবে হয় নাই। তাহা হইয়াছিল বিদ্রোহের দ্বারা পুরাতন বিশ্বাসকে সবল হঠকারিতায় চূর্ণ করিয়া। এইজন্য কালাপাহাড়ের ঐতিহাসিক রূপকের প্রয়োজন হইয়াছিল।

কালাপাহাড় তাই অতীতের যাবতীয় অন্ধ বিশ্বাস, স্থবির কুসংস্কার, শিথিল ভক্তিবাদ ও স্থূল দৈবনির্ভরশীলতার বিরুদ্ধে মূর্তিমান বিদ্রোহ। কালাপাহাড়ের জাগরণে তাই প্রাচীনকে কবি চূর্ণ করিতে চাহিয়াছেন। যেখানে যত মঠ মন্দির আছে, দেববিগ্রহ আছে, তাহা এই মুহূর্তেই চূর্ণ করা হোক। এই সকল স্থানেই মানুষ আপনাকে জড়পদার্থের কাছে মিথ্যা বিশ্বাসে বিকাইয়া দেয়, সামান্য কাঠ-পাথরের নিকট মানুষ আত্মপ্রত্যয় বিক্রয় করিয়া বসে। বলিদানের দ্বারা জীবহত্যা করিয়া আত্মবিসর্জন দিয়া, ষোড়শ-উপচারে মানুষ এই অন্ধদেবতার উপাসনায় আত্মহারা হয়, ধূপ-দীপের আরতি জ্বালিয়া কী নিদারুণ মিথ্যাকে সে সত্য বলিয়া পূজা করে। এসবই এখন বিসর্জিত হোক, ধূলিসাৎ হোক। যথার্থ মনুষ্যত্বের জাগরণে মানুষে-মানুষে কোনো কৃত্রিম ভেদ থাকিবে না, ব্রাহ্মণ-শূদ্রে পূজনীয়-অস্পৃশ্যে কোনো দেবনির্দেশসৃষ্ট পার্থক্য থাকিবে না। একদিকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, অন্যদিকে নিখিল মানুষ তাঁহার ভক্ত, এই বিভাগও মিথ্যা—কারণ ভগবান বলিয়া কিছু নাই, মানুষই একমাত্র সত্তা, অনন্তকালে নিখিল যুগে একমাত্র পরিচয় মানুষেরই। মানুষের রক্ত-রক্ত আজ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কারণ তাহা তপ্ত জীবনের প্রতীক। দেবতা আজ সর্বশক্তিমান নয়, দেবতা মানুষের লোকালয় ত্যাগ করিয়া বহু দূরে অদৃশ্য কোনো গোপন আত্মরক্ষার স্থানে পলায়ন করিতেছেন। তাঁহার ভয়ংকর প্রতাপ সম্পর্কে মানুষের ভ্রান্তি ও ত্রাস দূর হইয়া গিয়াছে, কারণ দৈবশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের রণদামামা দুন্দুভি কাড়ানাকাড়া বাজাইয়া মনুষ্যত্বের জীবন্ত প্রতীক কালাপাহাড় আজ বীর-বিক্রমে ধাবমান।

ব্রাহ্মণযুবা যবনে····· নাম তাহার কালাপাহাড় ! (অষ্টম স্তবক)

প্রসঙ্গসূত্র পূর্ববৎ।

বহুযুগ-বাহিত মানুষের অন্ধ কুসংস্কার, মিথ্যা আচারপরায়ণতা ও ভ্রান্ত দৈবানুগ্রহ-লাভের নিষ্ফল উদ্যমকে ব্যর্থ করিয়া আত্মপ্রত্যয় ও মনুষ্যত্বে মানুষকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র করিয়া তুলিবার জন্য কালাপাহাড়ের বীর্যবান আত্ম-প্রকাশ ঘটিতেছে। যথার্থ মনুষ্যত্ব কোনো আধ্যাত্মিক বা আধিদৈবিক বিশ্বাসের সহিত আপোষ করে না, তাহার কাছে কোন ধর্মনৈতিক কুসংস্কারের মূল্য নাই, কোনো অপ্রাকৃত শক্তিকে উপাসনা করা সে মনুষ্যত্ব-বিরোধী মনে করে। যে দেবশক্তি এতকাল আপনার প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য আপনার অলৌকিক ক্ষমতার মিথ্যা প্রচারে মানুষের সংস্কারাচ্ছন্ন মনকে বশীকৃত রাখিয়াছিল, কৃত্রিম জাতি ও বর্ণভেদ সৃষ্টি করিয়া সমাজে শ্রেণীঘটিত বৈষম্য রচনা করিয়াছিল, বিচারবুদ্ধিহীন মূঢ় আত্মসমর্পণের উপর আপনার দম্ভ ও শক্তির মারণসিংহাসন রচনা করিয়াছিল, তাহা আজ ধূলিলুণ্ঠিত হইবার লগ্ন আসিয়াছে। আজ মনুষ্যত্বের জাগরণে সমাজের সেই কৃত্রিম ভেদ চূর্ণ হইল, দৈব বিশ্বাস মন হইতে অপসৃত হইল। এখন তাই ব্রাহ্মণ-শূদ্রে কোনো ভেদ থাকিবে না, বর্ণোত্তমের সহিত অস্পৃশ্যের মিলনে আজ যে মানবশক্তি সঞ্চারিত হইবে তাহা বায়ুবেগে বাহিত অগ্নিশিখার মত চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িবে। আজ যেন অচলায়তন ও যুগ-যুগ-সৃষ্ট সংস্কারের প্রাচীর ধ্বংস করিবার জন্য মানুষের ভাগ্যবিধাতা তাঁহার প্রবলহস্তে বিনষ্টির বজ্রধারণ করিয়াছেন—এই ধ্বংসযজ্ঞের প্রলয়রাত্রি অবসান হইলে মনুষ্যত্বের আলোকস্নাত নূতন যুগের প্রভাত উদিত হইবে। আজ তাই অনাস্বাদিতপূর্ব পুলকে কবির হৃদয় আপ্লুত হইতেছে। মনে হইতেছে, দীর্ঘকাল ধরিয়া মানুষের তৃষিত বক্ষে যে জীবনতৃষ্ণা ছিল তাহা মিটাইবার জন্য শুষ্ক মরুভূমির অন্তর হইতে অমৃতকল্প সুধার নির্ঝর উৎসারিত হইয়াছে—এই সুধা যথার্থ জীবনের আনন্দ, জীবনকে জীবন বলিয়া গ্রহণের আনন্দ—কোনো দৈবশক্তির অনুগৃহীত বলিয়া নয়। সেই সুধা বন্যাবেগ-প্রবাহের ন্যায় পৃথিবীকে যেন প্লাবিত করিয়া দিতেছে। কবি আজ কালাপাহাড়ের অভ্যর্থনায় উৎফুল্ল হইয়া নির্জিত সংস্কারহত মানুষকে অভয় দিয়া বলিতেছেন, কালাপাহাড়ই মানুষকে উদ্ধার করিবে ধর্মভীরুতা ও পরনির্ভরশীলতার হাত হইতে—সে যে মানবিকতার জীবন্ত

বিগ্রহ। তাহার মুকুটে নতুন সূর্যের কিরণ, কণ্ঠে জ্যোতির মালিকা। অন্ধকার রাত্রি এই প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের আলোকে ভয় পায়, ভয় পায় ধর্মভীরুতা এই বীর্যবান অবিশ্বাসীকে। তাহাদের ভীরুতাই এই যুগাবতারের নাম দিয়াছে কালাপাহাড—সে পাহাড়ের মত বিশাল দুর্ভেদ্য ও কঠিন, ধর্মবাণী বিবেক কথা শুনিতে চাহে না তাই সে বধির।

শুনিছ না ওই ··· ·কাড়ানাকাড় কালাপাহাড়! (নবম স্তবক)

[রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]

প্রশ্ন ১। কালাপাহাড বলিতে কবি কী বুঝাইয়াছেন? ইহার পশ্চাতে যে ঐতিহাসিক তথ্য আছে কবিতার সহিত তাহার কোনও সম্পর্ক আছে কি? মোহিতলাল মজুমদারের কালাপাহাড কবিতাটির বক্তব্য বিশ্লেষণ করিয়া কবিতাটির নাম-সার্থকতা আলোচনা কর।

বাঙলার ইতিহাসে কালাপাহাড একটি বিস্ময়কর চরিত্র। জাতিতে ইনি ছিলেন মুসলমান। ষোড়শ শতকের সপ্তম হইতে অষ্টম দশকের মধ্যে বাঙলার নবাব সুলেমান কররানি ও তাঁহার পুত্র দাউদের এই মুসলমান সেনাপতি যে-কোনো কারণেই হোক, প্রচণ্ড হিন্দুধর্ম-বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং বাঙলা দেশের ধর্মবিগ্রহ প্রতিমা মঠ-মন্দির চূর্ণ করিবার মারণযজ্ঞে নামিয়া ছিলেন। তাঁহার নিষ্ঠুর অত্যাচারে ও দৌরাত্ম্যে পূর্ব ভারতের আসাম হইতে দক্ষিণে উড়িষ্যা ও পশ্চিমে বারাণসী অঞ্চল পর্যন্ত কোথাও খ্যাতনামা হিন্দু মন্দিরগুলি আর অবশিষ্ট ছিল না। ভয়াবহ নৃশংসতা ও অমানুষিক হত্যা-কাণ্ডের তাণ্ডব শক্তির দ্বারা তিনি সমগ্র দেশে যে ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছিলেন তাহারই জন্ত তিনি সমকালে কালাপাহাড় নামে কুখ্যাত হইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে এইজন্তই কালাপাহাড শব্দের অর্থ দাঁড়াইয়াছিল ধর্মকথা-বিবেকবাণী সম্পর্কে বধির, ভয়াবহ আকৃতি। ইতিহাসের জনশ্রুতি এই যে, কালাপাহাড় যখন সৈন্তসামন্ত লইয়া কাড়ানাকাড়া দুন্দুভি বাজাইয়া মন্দির ধ্বংসযজ্ঞে বাহির হইতেন, তখন ধ্বংসভয়ে দেববিগ্রহ পাষাণপ্রতিমা পর্যন্ত প্রকম্পিত হইত। এই ইতিহাস-পুরুষের অনুরূপ জনশ্রুতিকে ভিত্তি করিয়াই মোহিতলাল তাঁহার কালাপাহাড় কবিতাটি রচনা করিয়াছেন।

ইতিহাসের কালাপাহাড় ছিলেন হিন্দুধর্মদ্বেষী অত্যাচারী বিধর্মী সেনাপতি—হিন্দুমন্দিরের প্রতি তাঁহার অন্ধ ঘৃণা এক প্রকার ধর্মোন্মত্ততারই উদাহরণ বলা চলে। পূর্ব ভারতের এক বিপুল অঞ্চলের যাবতীয় হিন্দুমন্দির ও দেববিগ্রহ চূর্ণ করার প্রচণ্ড নেশা তাঁহাকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু এই ঐতিহাসিক কালাপাহাড়কে কবি আধুনিক বুদ্ধিজীবী মানুষের মনুষ্যত্ব-চেতনার পুনরুজ্জীবনের প্রতীকরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বৎসরের মধ্যে আমাদের মনোরাজ্যে বহু অভাবিত পূর্ব বিপ্লব ঘটিয়া যায়। আমাদের পূর্বতন ধর্মবিশ্বাস, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক চেতনা আমূল পরিবর্তিত হয়। বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির ফলে মানুষের চিন্তারাজ্যে আন্দোলন আসে। ফলে বহু প্রাক্তন সংস্কার ও জীবন সম্পর্কে মূল্যবোধ মিথ্যা হইয়া যাইতে থাকে। সনাতন ন্যায়-অন্যায়-বোধ ও পাপচেতনা, দেহসংস্কার ও ভক্তিবাদের ভিত্তি শ্লথ হইয়া পড়ে এবং মনুষ্যজীবন সম্পর্কে নূতন মূল্যের সূচনা হইতে থাকে। এক নূতন মনুষ্যচেতনা, মানুষকে মানুষরূপে দেখিবার দৃষ্টিভঙ্গি, বাস্তব প্রয়োজনে জীবন সম্ভোগের তৃষ্ণা, মানবিক মূল্যে সবকিছুকে পরীক্ষা করা—ইহাই প্রধান হইয়া উঠে। আধুনিকতার এই সর্বাতিশায়ী লক্ষণ রবীন্দ্রনাথ হইতে সুরু করিয়া সে-পর্বের তরুণতম কবিকণ্ঠেও ধ্বনিত হইয়াছে, মোহিতলাল সেই তরুণ আধুনিকদেরই অন্যতম দিশারী ছিলেন। নানা বিষয়ে পুরাতন অন্ধবিশ্বাস ও প্রথানুগামিতাকে স্থানচ্যুত করিয়া এই মনুষ্যত্ববোধের প্রতিষ্ঠা মসৃণভাবে হয় নাই, অনেক সময় তাহা অতর্কিতে, সবল হঠকারিতায়, বিদ্রোহের আকস্মিকতায় করিতে হইয়াছে। এই বৈপ্লবিক বিশ্বাস পরিবর্তনের প্রতীকরূপে এমন কিছু দরকার এমন কাহাকেও দরকার যাহার গতির মধ্যে সেই দুর্ধর্ষতা আছে, সেই বলিষ্ঠ পৌরুষ ও প্রত্যয়প্রবুদ্ধ অভিযাত্রার বেগ আছে। কালাপাহাড় তাহার সার্থক দৃষ্টান্ত। তদ্ব্যতীত কালাপাহাড়ের সংগ্রাম ছিল স্থূল মন্দিরের বিরুদ্ধে, যেখানে পাষাণদেবতা আমাদের ভক্তিঅর্ঘ্য নীরবে গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন, অথচ বিনিময়ে কিছুই দেন নাই। কবির মনে হইয়াছে, মনুষ্যত্ববিরোধী যে ধারণাগুলি এতকাল আমাদের আচ্ছন্ন করিয়াছিল, সেইগুলিও মূল্যহীন—মিথ্যাই আমরা এতকাল তাহাদের বিশ্বাস করিতেছিলাম। তাহারা আমাদের ভ্রান্তিকালের উপর তাহাদের অচলায়তন গড়িয়া তুলিয়াছিল। সেই ভ্রান্তিবোধ

হইবার জন্যই তাহাদের ভাঙিয়া ফেলিতে আমরা এত দ্রুততা অনুভব করিতেছি। এইজন্যই কালাপাহাড়কে রণবাদ্যে ভৈরবনিনাদে আকাশমৃত্তিকা কম্পিত করিয়া ছুটিয়া আসিতে হইয়াছে।

সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে কবিতাটির অন্তরালে যে ইতিহাসের তথ্য আছে তাহা সার্থক প্রতীক-দ্যোতনা লাভ করিয়াছে বলা যায়। ব্রাহ্মণবংশীয় যুবাপুরুষ কালাচাঁদ রায়কে মুসলমানধর্মে বলপূর্বক দীক্ষিত করিয়া মুসলমান কন্যার সহিত বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল। ইহার বিরুদ্ধে তিনি হিন্দুধর্মের আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন, মন্দিরে ধন্না দিয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম তাঁহাকে ধর্মনিরাপত্তা দান করিতে পারে নাই। ধর্মান্তরিত কালাপাহাড় তাই হিন্দুধর্ম ও মিথ্যা দেবদেউল চূর্ণ করিবার সর্বনাশা প্রতিহিংসা গ্রহণ করিলেন। এই জনশ্রুতির মধ্য দিয়া মোহিতলাল যে সত্য উদ্ধার করিয়াছেন তাহা এই যে, দেবতা মিথ্যাই মানুষকে আশ্বাস দেয়, আমাদের ভক্তিভীতির উপচারে তাহার লোলুপ-রসনাই তৃপ্ত হয়, কিন্তু তাহা মনুষ্যত্বকে জাগাইতে পারে না। তাই দেবতার অন্ধশাসনের বিরুদ্ধেই মনুষ্যত্বের প্রতিশোধের কাল আসিয়াছে। কালাপাহাড় ধর্মের অনাচারের যুগপ্রতিনিধিরূপ প্রতিকার—ইহাই কালাপাহাড় কবিতায় কবির বক্তব্য।

প্রশ্ন ২। আধুনিক বাঙলা কাব্যে কবি মোহিতলাল মজুমদারের মানবমুখী কাব্যাদর্শের স্বরূপ নির্ণয় কর এবং এই কাব্যাদর্শ তাঁহার কালাপাহাড় কবিতায় কী পরিমাণে প্রতিফলিত হইয়াছে বিশ্লেষণ কর।

বাঙলা কাব্যে মোহিতলাল এক গোষ্ঠী-বিচ্যুত বলিষ্ঠ কবিনাম। তাঁহার স্পর্ধিত স্বাতন্ত্র্য ও সপৌরুষ জীবনসম্ভোগতৃষ্ণা বিশ শতকের তৃতীয় দশক হইতে আধুনিক রবীন্দ্র-বিরোধী তরুণ কবিদের মনে অসাধারণ প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যকল্পনা ও অমর্ত্যচেতনার সহিত সম্পর্ক স্থাপন না করিয়া তিনি তাঁহার কাব্যে শক্তিধর্মসম্মত এক বীরাচারী জীবনবেদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবীয় ভাবালুতা, পল্লীপ্রীতি, খণ্ড নিসর্গের মাধুর্যউপভোগ এইগুলিকেও তিনি বিশেষ প্রাধান্য দান করেন নাই। নজরুল ইসলামের বিদ্রোহ এবং যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের দুঃখবাদের সহিত বরং তাঁহার কবিতা আংশিক সগোত্র। কিন্তু পূর্ববর্তীদের

তুলনায় মোহিতলালের কবিতা বুদ্ধিবাদে প্রোজ্জলতর। তত্ত্বাভিলাষী ভোগ-বাদের সহিত বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্ব, বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ, বায়রণের ইহলোক-সর্বস্ব জীবনতৃষ্ণা, নজরুলের উচ্চকণ্ঠ জীবনবন্দনা, সত্যেন্দ্রনাথ যতীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ, দেবেন্দ্রনাথ সেনের রূপতৃষ্ণা—এই সকলের সমবায়ে, তৎসহ পরিচ্ছন্ন বলিষ্ঠ বুদ্ধিবাদ-নিভর পৌরুষের সাহায্যে এবং সবল কবিধর্মের গুণপনায় মোহিতলাল তাঁহার কাব্যের জগৎ নির্মাণ করিয়াছেন। তিনি ছিলেন একান্তভাবেই জীবনরসের রসিক—জীবন-ব্যতিরিক্ত কোনো অলৌকিক অপ্রাকৃত ঐশীলীলার কাছে কখনও আত্মসমর্পণ করেন নাই। এই বস্তুজগতের রূপরসগন্ধকে তিনি ইন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাইয়াই আরতি করিয়াছেন। রূপব্যাকুলতা এবং সম্ভোগ-অভীপ্সা ছিল তাঁহার সারস্বত-সাধনার মর্মমূলে, কাম ও প্রেমকে তিনি ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেন নাই। দেহই তাঁহার কাছে জগতের সকল প্রাপ্তির চরম আনন্দ ছিল। ধর্মাতুরতা, অন্ধ সংস্কার, জড় আচারধর্মিতা, মিথ্যা কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা প্রাণের আকাঙ্ক্ষাকে উপবাসী রাখা তাঁহার নিকট উপহসিত ও ধিক্কৃত হইয়াছে। এইজন্য সমকালীন আধুনিক বিদ্রোহী প্রথাত্যাগী কবিদের নিকট তিনি গুরুস্থানীয় ছিলেন। রবীন্দ্রকাব্যের আবেগপ্রাবল্য, ভাবানুভূতি, অতীন্দ্রিয়তা ও সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতার বিরুদ্ধে এইসব নবযুগের প্রমিথিউসদের চোখে ছিল যুরোপীয় বস্তুবিজ্ঞানের ক্ষুরধার দীপ্তি, জীবনের বাস্তব ক্ষুধাতৃষ্ণা, বুদ্ধিবাদ ও দেহবাদের নূতন চেতনা। ফ্রয়েড-বার্ণাডশ-লরেন্স-হাক্সলের মনন ও চিন্তার ঢেউ ইহাদের তরঙ্গিত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যে দেহচেতনা, কীট্স-শেলীর সৌন্দর্য-পিপাসা ও অতীন্দ্রিয়তার সহিত যুক্ত হইয়া বিমূর্ত জ্যোতির্ময়তায় বিলীন হইয়াছিল, মোহিতলাল তাহাকে স্পর্শগ্রাহ্যতার ভূমিতে নামাইয়া আনেন। বাঙলার বীরাচারী তান্ত্রিক সাধনার আধুনিক রূপ ও স্পন্দন তাঁহার কাব্যে পাওয়া যায়। আবার সেই সঙ্গে সত্যসুন্দরের প্রতি, মনুষ্যত্বের ক্লাসিকাল আদর্শের প্রতি একাগ্র নিষ্ঠাও তাঁহাকে অতি আধুনিকতায় পথভ্রষ্ট করে নাই।

বাঙলা কাব্যে মোহিতলালের এই বিশিষ্ট স্থান ও ভূমিকার স্মৃতি কালা-পাহাড় কবিতাটি পড়িবার সময় বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার। কালাপাহাড় মোহিতলালের জীবনতত্ত্ব ও কবিভাবনার, তাঁহার অভিনব কাব্যচেতনা ও ভোগবাদের আদর্শ প্রতীক। রবীন্দ্র-প্রভাব-আকীর্ণ বাঙলা কাব্যের দিগন্ত-

বিস্তৃত শ্যামলতার মধ্যে ছোট ছোট কয়েকটি ধূসর রৌদ্র-বিবিক্ত পাণ্ডুর ক্ষেত্র চোখে পড়ে—একটি মোহিতলাল, একটি নজরুল ইসলাম, একটি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। তিনজনেই তাঁহাদের কাব্যের অভিনব মৌলিকতার বিশিষ্ট প্রতীক সন্ধান করিয়াছিলেন। মোহিতলাল কালাপাহাড়-নাদির শাহ এই সকল ঐতিহাসিক অত্যাচারীর নামের মধ্য দিয়া গতানুগতিক প্রথাবদ্ধ ভাবশিথিল জীবনের বিরুদ্ধে দেহবাদী ভোগবাদীর আততায়ী আক্রমণ ফুটাইতে চাহিয়াছেন। নজরুল তাঁহার দেশচেতনা, পরাধীনতার বিরুদ্ধে সাম্যবাদীর বিদ্রোহকে অগ্নিবীণা বিষের বাঁশি বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। আর যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ জীবনে দেখিয়াছে কেবল মরুভূমি মরীচিকাকে।

মোটের উপর আধুনিকতার প্রকাশ এক একজনের কাব্যে এক একরূপে প্রকাশিত হইলেও ইহার মূল স্বরূপ একটিই মাত্র, তাহা মানবতাবাদ, মানব জীবনকে অভিনব রসরূপে উপভোগ করা, আস্বাদ করা, দেহসচেতন জীবনের আরতি করা। এই মানবতাবাদের চরম প্রকাশ কালাপাহাড় কবিতাটি। অতীন্দ্রিয় আদর্শ বা অমর্ত্য ভাববিলাস, পারমার্থিক কল্যাণ কিংবা অপ্রাকৃত পুণ্য দিয়া জীবনকে ভোলান যাইবে না, মানবাত্মার দুরন্ত দুর্বিনীত অভিযানে ধর্মের মিথ্যা মঠমন্দির এইবার চূর্ণ হইয়া যাইবে। যাহা কিছু আচারসর্বস্ব, মিথ্যা ভ্রান্তি, জীবনবিমুখ বৈরাগ্য, অকারণ কৃচ্ছ্রসাধন—তাহার পাষাণ-বিগ্রহ ও স্থূল অচলায়তন কাঁপিয়া উঠুক, কারণ ভোগের ও আসক্তির কাড়ানাকাড়া বাজাইয়া দুরন্ত মানব কালাপাহাড় আজ ছুটিয়া আসিতেছে। তাহার আগমনে নির্জীব আকাশ-পৃথিবী প্রকম্পিত হইতেছে, তাহার নির্ভীক পদক্ষেপে মিথ্যার দেবতা শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছে। মানুষের ধর্মপরায়ণতা ও আচারপরায়ণ সংস্কারাচ্ছন্নতাই যুগযুগ সঞ্চিত পাপ—সেই পাপ মোচন করাই কালাপাহাড়ের মহান কর্তব্য। মানুষ আপনাকে ক্ষয় করিয়া দেহ জীর্ণ করিয়া জড়-পাষাণের পূজা করিয়াছে, দানবরূপী দেবতা মানুষের ভক্তির অর্ঘ্য হরণ করিয়া মানুষকে প্রবঞ্চিত করিয়াছে—আজ সেই মোহের অবসান হইবে, কবি এইরূপ আশা করিয়াছেন। শাস্ত্রবিধানে নির্মিত সমাজের কৃত্রিম ভেদরেখা, ব্রাহ্মণ-শূদ্রের সাম্প্রদায়িক প্রভেদ, আত্মশক্তিহীন পরাধীনতার শৃঙ্খল ঘুচিয়া এক মহামানবতার মিলনমৈত্রীতে সমাজ জাগিয়া উঠুক, এই বাণীকেই কবি কালাপাহাড়ের আবির্ভাব-ঘোষণার মধ্য দিয়া অভ্রান্তভাবে সূচিত করিয়াছেন। এই মানবতাবাদী কাব্যাদর্শেই কবিতাটি স্পন্দিত।

খণ্ডকপালী : কালিদাস রায়

ভূমিকা

রবীন্দ্রপ্রভাব সত্ত্বেও কালিদাস রায়ের স্বতন্ত্র কাব্য-প্রেরণা

রবীন্দ্র-বনস্পতির মূল আশ্রয় করিয়া পল্লবিত হইলেও কালিদাস রায় রবি-করোদ্দীপ্ত, সমীরিত ও বৃষ্টি-বিধৌত পারিপার্শ্বিক হইতে আপন কাব্যের প্রেরণা সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের মৃৎগভীরে শিকড় সঞ্চালিত করিয়া তথা হইতেও তিনি প্রাণের রস আহরণ করিয়াছেন। বস্তুত, সাহিত্যের অতীত ও বর্তমান এমন প্রীতিসূত্রে আর কাহারও রচনায় গ্রথিত হয় নাই।

বৈষ্ণব ঐতিহ্য

বৈষ্ণবীয় কবিসংস্কার, বিনীত ভক্তি ও মাধুর্যবৃত্তি তিনি জন্মসূত্রে লাভ করিয়াছিলেন। কর্মসূত্রে সর্বজনীন সারস্বতসত্রে তাঁহার স্বচ্ছন্দ পর্যটন ঘটিয়াছিল, মর্মপ্রেরণায় সংস্কৃত

সংস্কৃত প্রেরণা

রসসাহিত্যে তাঁহার সাবলীল অন্তপ্রবেশ ঘটিয়াছিল। এই সকলের সমবেত প্রেরণা তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত কবিতায় সঞ্চারিত হইয়াছে। মুখ্যত পল্লীজীবনের স্নিগ্ধ বর্ণালেখ্য-রচনায়, বাঙলার মৃত্তিকা-

পল্লীজীবনের প্রতি আকর্ষণ

ঘনিষ্ঠ জীবনের মেদুর গীতি-চারণায় তাঁহার হৃদয়ানুরাগ তীব্রতর হইলেও, কবিতার উপকরণ-নির্বাচনে গত অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল তিনি কোনো সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেন নাই। সমকালীন অন্যান্য কবিরা যে-কালে যুগনন্দ যন্ত্রণার

যুগযন্ত্রণার কবি নন

রক্তাক্ত শতাব্দীর বিষপাত্র পান করিয়াছেন, কবিশেখর তখন অনায়াসে শাশ্বত বাঙলার নিত্যসংস্কৃতিকে, তাহার চিরকালের দিন-যাপনের বৃত্তচ্ছন্দকে, মনে-প্রাণে গ্রহণ করিয়া যুগবাত্যার

চিরকালের বাঙলার কবি

হাত হইতে রক্ষা পাইয়া গিয়াছেন। বিদ্যাদানের শুকবৃত্তি তাঁহার সারস্বত-সাধনাকে নীরস করে নাই, পরন্তু বিচিত্রমুখী জ্ঞানের শীকরস্পৃষ্ট হইয়া তাঁহার কবিতা পাঠক-চিত্তের রৌদ্রতুষার সংঘর্ষে ইন্দ্রধনু বিকিরণ করে। গার্হস্থ্য

গার্হস্থ্য জীবনরস

জীবনের মুগ্ধ বিস্ময়, বৈষ্ণবীয় ভক্তির প্রগাঢ় আত্ম-নিবেদন, ভারত-সংস্কৃতির মানব-মাহাত্ম্য, ক্ষীয় জীবনের

মাধুর্য-কণিকা, দেশ-কাল-ব্যক্তি, প্রকৃতি ও জীবন, ইতিহাস ও ভূগোল নানাভাবে তাঁহার কবিতার স্বচ্ছন্দ উপকরণ রূপে গৃহীত হইয়াছে। তাঁহার সমধর্মী কবিসহচর করুণানিধানের মত তিনি একান্ত রোমান্টিক স্বপ্নবাতুর নন। বাস্তব জীবনের বৃন্তেই কাব্যকুসুম মুকুলিত করার প্রযত্নে তিনি বঙ্গীয় পাঠকের নিকট প্রিয়তর।

করুণানিধান ও কালিদাস

যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চীর দৃষ্টি কেবল পল্লীজীবনে কোমল স্পর্শকাতর অনুভূতির সন্ধানী ছিল। সেই তুলনায় কালিদাস রায় ভূমাক্ষী। কুমুদরঞ্জন মুখ্যত স্বগ্রামের মঙ্গলকাব্যকার—কালিদাস সমগ্র বঙ্গের আধুনিক বৈষ্ণব গীতিকবি।

যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে তুলনা

কুমুদরঞ্জনের তুলনায় তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ভাষা-শিল্পের সুষমাময় বাণী-বিগ্রহ রচনায়, সুঠাম বাক্-প্রতিমা নির্মাণে।

কুমুদরঞ্জন ও কালিদাস

কালিদাস রায় যেমন অক্লান্ত দাক্ষিণ্যে বাঙালীকে অর্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল ধরিয়া কাব্যসুধা পান করাইয়াছেন, তেমনি প্রবন্ধে, সমালোচনায় এবং মননশীল গবেষণায়, ভাষা-বিজ্ঞানের দুরূহ বিবিক্ষায়, রম্য রচনায়, কাব্যসংকলনে সাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছেন।

বিচিত্র সাহিত্য সৃষ্টি

তাঁহার মুখ্য কাব্যগ্রন্থগুলির নাম কুন্দ, কিশলয়, পর্ণপুট, ক্ষুদকুঁড়া, বল্লরী, ঋতুমঙ্গল, লাজাঞ্জলি, রসকদম্ব, চিত্তচিতা, আহরণী, হৈমন্তী, বৈকালী, ব্রজ-বাঁশরী, আহরণ, গাথাঞ্জলি, সন্ধ্যামণি ইত্যাদি।

কালিদাস রায়ের কবিতায় নদীজলের ফেনপুঞ্জের মত প্রাগাধুনিক বাঙলা সাহিত্যের ও সংস্কৃত সাহিত্যের বহু উল্লেখ-কণিকা দৃষ্ট হয়। বস্তুত, এইগুলি কেবল সুঅধীতী কবির সযত্ন-চয়িত অনুসন্ধিৎসা মাত্র নয়। সাহিত্যের মধ্য দিয়া চিরবাহিত বঙ্গসংস্কৃতির উত্তরাধিকার রূপেই তাঁহার কবিতা রচিত হইয়াছে। আলোচ্য 'খণ্ডকপালী' কবিতাটি তাহার নৈপুণ্য-নির্মিত উদাহরণ।

কালিদাস রায়ের কাব্যে প্রাচীন সাহিত্যের প্রসঙ্গোল্লেখ

মনসামঙ্গল কাব্যে বেহুলার অকাল-বৈধব্যের দুর্বিষহ গ্লানির সহিত খণ্ডকপালী শব্দটি অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত। দুর্ভাগিনী মন্দ-অদৃষ্টা নারীর প্রতিশব্দ হিসাবে সাহিত্যে শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইলেও ইহা যেন বেহুলা সম্পর্কেই চরম সত্য। দীর্ঘকালের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর বিখণ্ডিত বঙ্গজননীর

খণ্ডকপালীর নাম-সার্থকতা

দিকে চাহিয়া মনসা-মঙ্গলের কবির মতই কবিশেখরের মনে পড়িয়াছে খণ্ডকপালী শব্দটি: অদৃষ্টের শোচনীয় দুর্দৈবে বাসর রাত্রিতেই যাহার সৌভাগ্যের সিন্দুর মুছিয়া গেল সেই বেহুলার মত দুরদৃষ্টা বঙ্গলক্ষ্মীর ইহা অপেক্ষা উপযুক্ত বিশেষণ আর কী হইতে পারে। এই প্রাক্তন অনুষঙ্গেই কবিতাটি সার্থক হইয়াছে।

ভাবার্থ

স্বাধীনতা-প্রাপ্তির চরম মূল্যস্বরূপ স্বর্ণপ্রসূ বঙ্গভূমি দ্বিখণ্ডীকরণের পর অবশিষ্ট পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকাইয়া কবির বেদনার অবধি নাই। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র-বন্দিত মাতৃভূমিকে এখন কী করিয়া তিনি সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বলিবেন!

বস্তুবিশ্লেষণ

এখন আর তাহার সেই বিবিধ বিহঙ্গ-কূজিত বালুচর, রাজ-হংসতুল্য পালতোলা তরণীতে সুশোভিত ও মরাল-মুখরিত ভরানদী নাই, আর সেই মাঝিদের কণ্ঠে নৌকা-বাওয়ার ছন্দে ভাটিয়ালী গান শোনা যায় না। সেই সুপারি-বেণু-বেতস-কুঞ্জ-পরিবৃত স্বর্ণপ্রসূ অঙ্গন, বায়ু-হিল্লোলিত পাটের ক্ষেত আজ কোথায় হারাইয়া গেল। জননীর শুষ্কবক্ষে পীযূষ-ধারা নাই—দুগ্ধের বদলে আজ বঙ্গসন্তানদের পিঠালি গোলা পান করিতে হইবে, ইহা কী নিদারুণ ক্ষোভের বিষয়। স্নানকালে কটিদেশে নদী-স্রোতের মীন-পংক্তি আর এখানে মেখলা রচনা করিবে না। এই জলহীন পাণ্ডুর ভূমির উপর সূর্য তাহার তৃষ্ণা মিটাইতে পারিবে না। রাত্রি স্নিগ্ধ-কিরণ বিকিরণ করিবে না। গ্রীষ্মের সমীরণে আর সেই মধুর স্পর্শ থাকিবে না, ইহা আশঙ্কা করিয়া কবি গভীর বেদনা অনুভব করিয়াছেন। নীলপদ্মের মাল্যের বদলে আজ জননী রুক্ষদেশের কূলে বৈরাগিণীর মত অঙ্গ অলংকৃত করিয়াছেন পদ্মবীজের মালা ও রুদ্রাক্ষের বাজুবন্ধে। হিমালয়-নিঃসারিত নদীজলের দাক্ষিণ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া তৃষ্ণার্ত দেশ আজ মৃত্তিকাতল হইতে জল সংগ্রহের চেষ্টা করিবে। গভীর রাতে চিরবাঞ্ছিত স্বাধীনতা লাভ করিয়া প্রভাতেই এই দুর্ভাগ্যের কালিমায় ভাসিয়া যাওয়ার জন্যই কবি তাহাকে বেহুলার মত 'খণ্ডকপালী' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন (প্রথম-চতুর্থ স্তবক)।

বিধাতার কী নিষ্ঠুর ভাগ্যলিপি! অতীতের সেই গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস এখন আর বঙ্গদেশের নিজস্ব নয়, বঙ্গ-জননী আর সীতারাম রায়, চাঁদ-প্রতাপের

মাতা বলিয়া আজ গর্ব করিতে পারিবেন না। যে পদ্মার দিগন্ত-বিস্তৃত স্রোতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সৃষ্টির পরিণত শস্যসম্ভার সাজাইয়া সোনার তরী ভাসাইয়াছিলেন, সে পদ্মা এখন বাঙলার অন্তর্ভুক্ত রহিল না—কেবল তাহার কয়েকটি শাখানদী, উপনদী বঙ্গদেশের ভাগ্যে জুটিয়াছে। মেঘরথে চড়িয়া ইন্দ্র অবতীর্ণ হইলে সেই পূর্ববঙ্গের পরিচিত নদী-জনপদগুলির নূতন নামকরণে হয়ত তাহাদের চিনিতেই পারিবেন না, প্রতি মুহূর্তেই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলিবেন।

একদা বঙ্গদেশ যে পূর্ণ স্বাধীনতার তপস্যা করিয়াছে, আজ সেই তপস্যার অধচ্যুত, দ্বিখণ্ডিত, অভিশপ্ত পরিণতি দেখিয়া কবি ব্যথিত হইয়াছেন। যেন মাতার দুই চক্ষুর মধ্যে এখন ময়ূরাক্ষী মাত্র আছে, কপোতাক্ষীকে আমরা হারাইলাম। এই মাতাকে কি অন্নদায়িনী বলিয়া ধন্য হওয়া যায়? জননী যদি দৃষ্টির অর্ধাংশ ত্যাগ করিয়া এক-দর্শিনী মনসার মত হইয়া উঠেন, তবে সৎ সদাগর কেমন করিয়া তাঁহাকে উপাসনা করিবেন কবি ভাবিয়া পাইতেছেন না। কর্ণফুলী নদী আর মাতার কর্ণভূষণ সাজাইবে না, মেঘনা তাঁহার নয়নের কজ্জল রচনা করিবে না। প্রতি বৎসর শারদীয়া অন্নপূর্ণা মারী মড়ক-দারিদ্র্যের প্রতীক ঘোটকে আগমন করিবেন, সম্পন্নলক্ষ্মী হইয়া নৌকায় আগমন করিবেন না। অথচ এই মাতৃভূমির মুক্তিযজ্ঞে যাহারা অকাতরে প্রাণ দিয়াছে, রক্তপাত করিয়াছে, কারাবরণ করিয়াছে, বঙ্গভূমির পূর্বপ্রান্তবাসী সেই বীরপুত্রদের বঞ্চিত করিয়াই আমরা স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছি—সেই প্রবীরকুমারদের করুণ পরিণাম স্মরণ করিয়া কবি আজ অশ্রুকাতর হইয়াছেন।

আলোচনা

'খণ্ডকপালী' কবিতার উপলক্ষ্য সাময়িক ঘটনা অর্থাৎ স্বাধীনতা-লাভের সহিত দেশ-ব্যবচ্ছেদ। কিন্তু নানাকারণে এই মর্মবিদারক ঘটনাটি ভারত-বাসীর জীবনে, মনে, সংস্কৃতি ও ইতিহাসে একটি রক্তাক্ত বেদনার চিরন্তন ক্ষত সৃষ্টি করিয়াছে। একদা সাম্রাজ্য শাসনগত সুবিধার নামে বঙ্গবিচ্ছেদ-চক্রান্তকে কেন্দ্র

কবিতার উপলক্ষ্য সাময়িক ঘটনা

করিয়া বাঙলা দেশে যে প্রমত্ত প্রতিরোধ আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার তুলনায় এই দেশ-বিভাগ আরও নির্মম নিষ্ঠুর সত্য, অথচ এই বিচ্ছেদের অমোঘ দুঃখকে আমরা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। ধর্মোন্মত্ত আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে রাজনীতির কুটিলতম ছলনায় বিশ্বাসযোগ্য করিয়া অচিরপ্রত্যাশী বিদেশী-শাসন-মুক্ত স্বাধীন দেশের সম্ভাবনাকে করতললগ্ন করিয়া, স্বার্থান্বেষী নেতাদের ও বৈদেশিক শাসকদের পৃষ্ঠ-পোষকতায়, ভ্রাতৃরক্তে ভূমি ও ইতিহাস কলঙ্কিত করিয়া সেদিন দেশ-বিচ্ছেদকে নত মস্তকে, লজ্জিত কুণ্ঠায় বরণ করিতে হইয়াছে। ইহার পরিণাম হইয়াছে শোণিতাদ্র্র অশ্রুলবণাক্ত, সে ক্ষত আজও শুখায় নাই—সম্ভবত তাহা চিরকাল একই প্রকার থাকিবে। হৃদয়ের প্রয়োজনে দেহ হইতে মস্তক দ্বিখণ্ডীকরণের মতই উদ্ভট এই রাজনীতিকে দুই বাঙলার সুস্থ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন দেশপ্রেমিক মানুষ কোনো দিনই প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। বাঙলার ফলবান শস্যপরিপূর্ণ পলিমাটি-বিধৌত নদী-মেখলা বৃহৎ ভূখণ্ড হারাইবার ক্ষতি বা অনুতাপ মাত্র নয়, ইহা আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তির, প্রত্যাশা ও পরিণামের এক অবিশ্বাস্য করুণতম বৈপরীত্যের বিমূঢ় বিস্ময়ে আমাদের স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে। বৃহৎ বঙ্গের সঙ্গে প্রাণ-ধারণের লক্ষ ধমনীতে গ্রন্থিবদ্ধ, বহু যুগের জাতিস্মর প্রেমে লালিত, সৌরকর-বর্ষণে পল্লবিত বাঙালী, আপন দীন দুর্ভাগ্যের অব্যর্থ বিধিলিপির এই দানকে এক হাতে গ্রহণ করিয়া আরেক হাতে তাহার বেদনাঙ্কিত ললাটে করাঘাত করিয়াছে। সেই নিত্যকালের বাঙালীর ঐতিহাসিক অদৃষ্ট-বিলাপকেই ভাষা দিয়াছেন বাঙলার আপন কবি কালিদাস রায়। এইজন্যই খণ্ডকপালী কবিতা সাময়িকতার উপলে আঘাত খাইয়া উচ্ছ্বসিত হইলেও ইহার গতি চিরকালের লবণাম্বুরাশির দিকে—'শোকার্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা'—এই কাব্যসূত্রে ইহা সার্থক কবিতা। ভাগ্যের নিষাদ কর্তৃক বঙ্গ-বিহঙ্গের অকাল-মৃত্যুতে রচিত খণ্ডিত বাঙলার ইহা যেন আদি কবিতা।

দেশ-বিচ্ছেদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

আমাদের জীবন-কালের করুণতম অভিজ্ঞতা

স্বাধীনতা-আন্দোলনের অবিশ্বাস্য বিপরীত পরিণতি

সাময়িকতাশ্রয়ী হইয়াও তাই কবিতাটি নিত্য বিলাপের শ্লোক

বঙ্গভূমির এই বীতমহিম বিষণ্ণ দুর্ভাগ্য মনসামঙ্গল কাব্যে বিবাহ-রাত্রির পুষ্পাভরণভূষিত বাসর শয্যায় স্বরূপসী বেহুলার অকাল-বৈধব্যের সহিত পরমাশ্চর্য রসকল্পনায় উপমিত হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক বিষনিঃশ্বাসের হিমস্পর্শে স্বাধীনতার তরুণসুন্দর চন্দনভূষিত অঙ্গ রাত্রির ম্লানান্ধকার উৎসব-লগ্নে বিবর্ণনীল হইয়া গিয়াছে, নবযুগের প্রভাতকিরণ তাহার সকল হৈমদ্যুতি সংবরণ করিয়া এই ধূসর-সিন্দুর অশ্রুকজ্জললিপ্ত শোক-কর্ষিতা রমণীকে তাহার নিঃসঙ্গ নিরুদ্দেশ যাত্রায় শীতল বিদায় সম্ভাষণ নিবেদন করিয়াছে, ইহা কবিকল্পনায় একটি অনুপম সৃষ্টি। যে বিবাহ নবযৌবনাবেশ-মধুরা তরুণীর জীবনে ভবিষ্যতের বর্ণাঢ্য সম্ভাবনার বীজ উপ্ত করিয়াছিল, তাহা এক অপ্রতিরোধনীয় দৈবের নির্দয় আঘাতে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়াছে। এখন গুরুজনদের নীরব ভর্ৎসনার সম্মুখে ভূলুণ্ঠিত লজ্জা ও কুণ্ঠিত অপমানের কালিমা লইয়া হৃত-ভাগিনী তাহার বিগত উৎসবের অরক্ষণীয় সজ্জা বহন করিয়া কোন্ অজ্ঞাত অনন্তে যাত্রা করিতেছে—মাতৃভূমির এই বিস্ময়কর চিত্রকল্প সৃষ্টির জন্য কবিশেখর সমগ্র বাঙলা সাহিত্যের কৃতজ্ঞতার পাত্র।

বেহুলার দুর্ভাগ্যের সহিত সার্থক উপমিত

খণ্ডকপালী শব্দটি বেহুলা সম্পর্কে মনসামঙ্গল কাব্যে বহুবার প্রযুক্ত হইয়াছে। খণ্ডকপালী, খণ্ডকপালিয়া, খণ্ডকপালিনী ইত্যাদি শব্দের দ্বারা মন্দভাগা নারী অর্থ প্রাদেশিক সাহিত্যে সুপরিচিত (দ্রঃ—খণ্ডবাসিয়া খণ্ডকপালিয়া জগদানন্দ গাওয়ে)। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল কাব্য হইতে কয়েকটি উদাহরণ—

খণ্ডকপালী শব্দের ব্যবহার

চাঁদের নৌকাডুবির পর মনসার খেদ :

'তব বুদ্ধি হ্রাস কৈলে সর্বনাশ
আমি হৈলাম খণ্ডকপালী।'

লৌহবাসরে লখীন্দরের সর্পাঘাতে মৃত্যুর পর :

'যত কুলকামিনী বেহুলার কথা শুনি
আপন শ্রবণে দেই হাত।
চিরল চিরল দাঁতি মঙ্গল-বিভার রাতি
সাপেতে খাইল প্রাণনাথ॥

প্রভুশোকে তনু দহে সর্বলোকে তারে কহে
তুমি বড় খণ্ডকপালিনী।
তোরে বিড়ম্বিল ধাতা বিপরীত কত কথা
জলেতে ভাসিয়া যাবে কেনি'॥

অবশ্য কবিতার আদ্যন্ত কালিদাস রায় বেহুলার রূপকটি খণ্ডিত বাঙলার উপর আরোপ করেন নাই। কেবল প্রযুক্ত শব্দের ধ্বনিগত ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করিয়াই বিড়ম্বিত দেশের দুর্ভাগ্যের সাদৃশ্য-ইঙ্গিত রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার কবিতার মধ্য দিয়া হৃত-গৌরব চ্যুত-সৌন্দর্য বঙ্গভূমির চিত্রটি কয়েকটি নিপুণ রেখায় স্মরণীয় হইয়া উঠিয়াছে। নদীমাতৃক বেণু-বেতস-কুঞ্জপরিবৃত পদ্মা-মেঘনা-কর্ণফুলী-কপোতাক্ষী প্রভৃতি নদীর কলতানে মুখরিত একটি চিরকালের বাঙলা দেশের স্নিগ্ধ ছবিটিকে আমাদের সন্তপ্ত চেতনায় মেলিয়া তিনি একটি ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাস ধ্বনিত করিয়াছেন। ভৌগোলিক দিক দিয়া দ্বিখণ্ডিত হইলেও সে বাঙলা আমাদের মানসলোকে অখণ্ড হইয়া থাকিবে, ইতিহাসের দিক দিয়া পুরাঘটিত অতীত হইলেও সে আমাদের মাতৃমমতার ইতিহাসে নিত্যবর্তমান হইয়া বিরাজ করিতেছে, এই আবেদন জাগাইয়া কবিতাটি সমাপ্ত হইয়াছে। মূল কবিতার একাধিক পংক্তি এখানে বর্জিত হইয়াছে।

একটি চিরকালের বাঙলা দেশের চিত্র

রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ

সুজলা সুফলা…না ভূমি—পূর্ব বাঙলার যে অংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত সেই অংশই প্রকৃতপক্ষে উর্বর। সুজলা সুফলা বঙ্গভূমি পূর্ববঙ্গকে বাদ দিয়া বলা অর্থহীন। নদীকলধ্বনিত পলিমাটি-বিধৌত পূর্ববঙ্গের বঙ্গদেশ হইতে বিচ্যুত হওয়ার বেদনায় কবি আর তাঁহার দেশকে সুজলা সুফলা বলিতে পারিতেছেন না। **কবি বঙ্কিম…মাতৃভূমি**—বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে 'বন্দেমাতরম্' সংগীতে বাঙলার যে অনিন্দ্যমূর্তির বরণীয় বর্ণনা আছে কবি তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। বঙ্কিমের চোখে মাতৃভূমির সেই গরীয়সী মহিমার ধ্যান :

বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুর-ভাষিণীম
সুখদাং বরদাং মাতরম্ ইত্যাদি ॥

রুক্ষ উষর···বালুচর—পশ্চিমবঙ্গ পূর্ববঙ্গের তুলনায় নদীবিহীন—ইহার দিগন্তবিস্তৃত শস্যবঞ্চিত রুক্ষ ধূসর প্রান্তর যেন মাতৃভূমির বর্তমান বক্ষের নিষ্প্রাণ শুষ্কতারই প্রতীক। পূর্ব বাঙলার অসংখ্য নদীর তীরবর্তী দিক্‌প্রান্ত-বিস্তীর্ণ বালুচরগুলির উপর ডাহুক-ডাহুকী, বলাকা চখাচখীর মেলা স্মরণ করিয়া কবির দীর্ঘশ্বাস পড়িয়াছে। বস্তুত পাকিস্তানের অন্তর্গত যশোহর-খুলনা-ঢাকা-বরিশাল-ফরিদপুর মৈমনসিংহ-চট্টগ্রাম প্রভৃতি শস্যপ্রসূ জেলাগুলির তুলনায় বর্ধমান-বাঁকুড়া-মেদিনীপুর প্রভৃতি রাঢ়-সন্নিহিত ও বিহার-সমীপবর্তী জেলাগুলি মুখ্যত উৎপাদন-বঞ্চিত ও রুক্ষ। 'কোলভরা যার কনকধান্য বুকভরা যার স্নেহ' সত্যেন্দ্রনাথের এই মাতৃপ্রশস্তি পশ্চিম বাঙলা সম্পর্কে প্রযোজ্য হইতে পারে না। নদীতরঙ্গিত বাঙলার মমতাময়ী মূর্তি রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাঙলা' গানেও পাওয়া যায়—

কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে নদীর কূলে কূলে।

কোথা গেল খরা···ভাটিয়ালী গান—এই ছত্রগুলির ভিতর দিয়া কবি নদী-মেদুর পূর্ব বাঙলার একটি কনকরুচির চিত্র আঁকিয়াছেন। সেখানে অকূলদীঘল নদীর বুকে হংসশুভ্র পাল তুলিয়া ভাসিয়া যাইত শ্রেণীবদ্ধ তরণী, রূপসী বাঙলার চরণপদ্ম বেষ্টন করিয়া কলকণ্ঠে মরাল বাহিনী বিহার করিত, নদী-স্রোতে মাঝি-মাল্লারা বৈঠার তালে তালে ভাটিয়ালী গান ধরিত—এই চিত্রগুলি আমাদের দিনযাপনের অভিজ্ঞতা হইতে অন্তর্হিত হইয়া মানসলোকে স্মৃতিশায়িত হইয়া পড়িতেছে।

কোথা গেল পূগ···অঙ্গন—শস্যোৎপাদনের দিক দিয়া পশ্চিমবঙ্গ পূর্বাঞ্চলের মত স্বর্ণপ্রসূ নয়; এখানে পূর্ববঙ্গের মত অসংখ্য সুপারিকুঞ্জও নাই। সুপারিবন পূর্ববাঙলার অন্যতম শোভা, বাঙলার রূপসন্ধানী কবির দৃষ্টি

স্মরণ করিবার মতই। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের কবিকণ্ঠ:

সকালে কাকের ডাকে আলো আসে, চেয়ে দেখি কালো দাঁড়কাক
সবুজ জঙ্গল ছেয়ে সুপুরির—শ্রীমন্তও দেখেছে এমন:
যখন ময়ূরপঙ্খী ভোরের সিন্দুরমেঘে হয়েছে অবাক,
সুদূর প্রবাস থেকে ফিরে এসে বাঙলার সুপুরির বন
দেখিয়াছে—অকস্মাৎ গাঢ় নীল; করুণ কাকের মত ক্লান্ত ডাক
শুনিয়াছে—সে কত শতাব্দী আগে ডেকেছিল তাহারা যখন।

[জীবনানন্দ দাশ—রূপসী বাঙলা]

কোথা গেল কঙ্ক···বেতসের বন—বাঁশঝাড় বেতস-লতা বিশেষভাবে পূর্ববাঙলারই নিসর্গ বৈশিষ্ট্য—ইহাদের কথা কবির পরিত্যক্ত বঙ্গের সহিত অবিচ্ছিন্ন স্মৃতিতে মনে পড়িতেছে। **কোথা সে··পট্টবসন গায়**—উন্মুক্ত প্রান্তরের প্রেমিক হাওয়ার আনন্দিত উদার হাস্য যে বঙ্গজননীর পট্টবস্ত্র উত্তরীয় উড়াইয়া দিত, সে আজ কোথায়? **পট্টবসন** অর্থে রেশমী বা পাটের কাপড়, এখানে পূর্ব বাঙলার উত্তাল হাওয়ায় আন্দোলিত পাটের খেতকেই মাতৃঅঙ্গের পট্টবসনরূপে কল্পিত করা হইয়াছে। **শুষ্ক সহসা · হায়**—'জাহ্নবী-যমুনা-বিগলিত-করুণা'কে রবীন্দ্রনাথ 'পুণ্য-পীযূষ স্তন্যবাহিনী' বলিয়াছেন। সুতরাং পশ্চিম বাঙলা নদীবঞ্চিত হওয়ার জন্যই বর্তমান জননী যেন শুষ্কবক্ষা পীযূষহীনা, এইরূপ অর্থ করা যায়। অথবা সাধারণভাবে অর্ধাংশ বিচ্ছেদের জন্য মাতার স্নেহফল্গুধারা শুকাইয়া গেল, ইহাও কবির অভিপ্রেত হইতে পারে। **দুধের তৃষ্ণা···খোলে**—মাতার বক্ষসুধার তৃষ্ণা, নদীজলের তৃষ্ণা কিংবা স্নেহক্ষরণের জন্য সন্তানের ব্যাকুলতার পরিনিবৃত্তির কোনো বিকল্প নাই, ইহাই কবির লক্ষ্যার্থ। **শিশুরা···কোলে**—হতাশ আক্ষেপে কবি বলিতেছেন, এই জলহীন পাণ্ডুর মরুক্ষেত্রের শিশুদের এইবার মাতৃস্তন্যনিঃসৃত সুধার বদলে কোনো কৃত্রিম পদার্থের দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ করাইতে হইবে, ইহাই হয়ত নিষ্ঠুর ইতিহাসের বিধান। দুধের বদলে চালগুঁড়া জলে গুলিয়া খাওয়ানোর করুণ ইতিহাস মহাভারতের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ভীষ্মের নিকট দ্রোণাচার্য বলিতেছেন,

"একদা বালক অশ্বত্থামা ধনিপুত্রদের দুধ খেতে দেখে আমার কাছে এসে কাঁদতে লাগল, তাতে আমি দুঃখে দিশাহারা হলাম। বহুস্থানে চেষ্টা করেও

কোথাও ধর্মসংগত উপায়ে পয়স্বিনী গাভী পেলাম না। অশ্বত্থামার সঙ্গী বালকরা তাকে পিটুলি-গোলা খেতে দিল, দুধ খাচ্ছি মনে করে সে আনন্দে নাচতে লাগল। বালকরা আমাকে উপহাস করে বললে, দরিদ্র দ্রোণকে ধিক্, যে ধন উপার্জন করতে পারে না, যার পুত্র পিটুলি গোলা খেয়ে আনন্দে নৃত্য করে" (রাজশেখর বসু—মহাভারত সারানুবাদ)। **সিনানে··· না গাঁথি**—এখানে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে শীর্ণ অগভীর নদীতে সেই মৎস্যের রূপালী সমারোহ নাই, যাহারা স্নান কালে বস্ত্রের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে, যেন রমণীর কটিদেশে মেখলার মত শোভা পায়। অর্থাৎ সে মেখলা যেন মৎস্যপংক্তির দ্বারাই নির্মিত, কেবল তাহাতে যেন ঘুঙুরটুকুই বাঁধা নাই। ইহা বিশেষভাবে মনে করাইয়া দেয় কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের অষ্টম সর্গের একটি পংক্তি। উক্তব-পরিণয় মধুলগ্ন-যাপনকালে সপ্রতিভ প্রগল্‌ভতায় অব্রীড়িতা পার্বতী কখনও কখনও সোনার পদ্ম লইয়া মহাদেবকে তাড়না করেন আর মহাদেব উমার বিনিমীলিত চোখে প্রবল জল ছিটাইয়া দেন। নিরুপায় পার্বতী সেই মুহূর্তেই তরঙ্গিণীতে ঝাঁপাইয়া পড়েন, সঙ্গে সঙ্গে মীনপংক্তি যেন তাহার কটিদেশে মেখলা পরাইয়া দেয়। শ্লোকটি এই—

হেম-তামরস-তাড়িত প্রিয়া তৎকরাম্বু-বিনিমীলিতেক্ষণা।
সা ব্যগাহত তরঙ্গিণীমুমা মীনপঙ্‌ক্তি-পুনরুক্তমেখলা॥

[কুমারসম্ভব—৮/২৬]

দিনের অতিথি···তোমা নিশা—নদীর জলকণা সূর্যরশ্মির তাপে বাষ্প হইয়া নভোচর মেঘে পরিণত হয়, সেই মেঘ শ্যামায়মান আষাঢ়ে প্রমত্ত প্রাবৃটে ধারাবর্ষণ করে। কিন্তু যে দেশে নদী নাই সেদেশের উপর দিয়া সূর্য আকণ্ঠ তৃষ্ণা লইয়া ব্যর্থ অতিথির মত প্রত্যাবর্তন করিবে। রাত্রি তাহার অপরূপ জ্যোৎস্নার স্বর্গীয় মাধুরী দিয়া সে দেশকে সেবা করিবে না অর্থাৎ কবির বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গে জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রির সে শোভা নাই। **শীকরসিক্ত··· সমীরণ**—আতপ্ত গ্রীষ্মে যখন বৃষ্টিকণার গন্ধ লইয়া মন্দপবন প্রবাহিত হইত তখন কবির মনে হইত যেন জননীর বৃষ্টিধৌত আলুলায়িত কেশদাম স্পর্শ করিয়া আসিতেছে সেই বাতাস। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এই মিঠে বাতাস কোথায়? তুলনীয় :

বহিছে প্রথম শিশির সমীর
ক্লান্ত শরীর জুড়ায়ে,
কুটীরে কুটীরে নব নব আশা
নবীন জীবন উড়ায়ে—[রবীন্দ্রনাথ]

কোথা গেল গলে···রুদ্রাক্ষের মালা—পুষ্পসমারোহে পশ্চিমবঙ্গ পূর্ব বঙ্গের তুলনায় অতৃপ্তিজনক, এখানে নদী সরোবরে নীলপদ্ম ভাসে না। তাই কবির আক্ষেপ, মাতা যেন নীলপদ্মের মালিকা ত্যাগ করিয়া পদ্মবীজের মালা ও রুদ্রাক্ষের বাহুবন্ধ পরিয়াছেন। অর্থাৎ সৌন্দর্যময়ী রূপ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনীর মত বৈরাগ্যবেশ ধারণ করিয়াছেন। কাদম্বরী উপাখ্যানে মহাশ্বেতার পদ্মবীজমালা-ধারণ প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়। **হারাইয়া হিম···কুক্ষিতে বসুধার**—পর্বতনিঃসৃত যে নদীগুলি বাঙলার সম্পদ, আজ তাহার বিপুলায়তন অংশগুলি পূর্ববঙ্গেই অবস্থিত। সুতরাং প্রাকৃতিক পর্বতপ্রসাদবঞ্চিত পশ্চিমবঙ্গ জলের অভাবে মৃত্তিকা খনন করিয়া নলকূপ বসাইয়া ভূগর্ভস্থিত জলের সন্ধানে রত। যেন বরুণ বা জলদেবতার ভাণ্ডার আমাদের বঞ্চিত করিয়াছে বলিয়া বসুন্ধরার অন্তঃসলিলা জলের কাঙাল হইয়া মাটি খুঁড়িতেছি। **খণ্ডকপালী··· ভেলা প্রান্তে**—গভীর রাত্রিতে পুষ্পভূষিত বাসরশয্যায় বেহুলা তাহার জীবনের চরম সম্পদ প্রিয়তম স্বামীকে লাভ করিয়াছিল। কিন্তু প্রভাতের পূর্বেই সেই চির-প্রত্যাশিত স্বামী সর্পদষ্ট হইলেন—বেহুলা তাহার প্রাণহীন দেহ লইয়া গাঙুড় নদীর জলে কলার ভেলা ভাসাইল, গুরুজন শাশুড়ী প্রতিবেশীরা এই দুর্ভাগিনী নারীকে খণ্ডকপালী বলিয়া অভিশাপ-ধিক্কার দিল। দুর্ভাগিনী বেহুলার মত বাঙলাও তাহার দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর গভীর রাত্রিতে [অর্থাৎ রাত্রি বারোটা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে, এই ইঙ্গিত] স্বাধীনতা লাভ করিল, কিন্তু দিবসের আলোকে সমগ্র জাতি দেখিয়াছে, এই স্বাধীনতা উৎফুল্ল আত্মার আনন্দ নয়। দেশের একাংশ হারাইয়া এই স্বাধীনতা অকাল-বিধবার মত শোকনদীতে আপনার যাত্রা সুরু করিল। তুলনীয়, কেতকা-দাসের মনসামঙ্গলে লখীন্দরের মৃত্যুর পর সনকার ভর্ৎসনা :

সনকা কাঁদিয়া দেয় বেহুলায় গালি।
সিথার সিঁদুরে তোর না পড়িল কালি॥

পরিধান বস্ত্রে তোর না পড়িল মলি।
পায়ের আলতায় তোর না পড়িল ধূলি॥
খণ্ডকপালিনী বেহুলা চিরল দাঁতি।
বিভা দিনে পতি মৈল না পোহাল রাতি॥

তোমার ভাগ্যে…মাতা—শোকে-দুঃখে, সম্পদে-আনন্দে প্রবর্ধিত দীর্ঘদিনের বাঙলা দেশের এই দ্বিখণ্ডন-দুর্ভাগ্য তাহার ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা অপ্রত্যাশিত ট্রাজেডি—এইরূপ পরিণতি আমাদের অকল্পনীয় ছিল। এখন বাঙলার ইতিহাস ছিন্ন হইল, ভূগোল খণ্ডিত হইল, ঐতিহ্য পৃথগন্ন হইল, শত শতাব্দীর সংস্কৃতির ভদ্রাসন দ্বিভক্ত হইল। বাঙলা দেশ তাহার বারভূঁইঞাদের গৌরবে পুলকিত ছিল, এখন সে গৌরব উভয় দেশের এক ঐতিহ্যভুক্ত থাকিবে না। সেই সীতারাম রায়, চাঁদ রায়, প্রতাপাদিত্যের ইতিকথা লইয়া আমরা গর্বিত হইতে পারিব না, কারণ তাহারা এখনকার হিসাবে পূর্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। **সীতারাম রায়**—বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারাম উপন্যাসের নায়ক, মুর্শিদকুলিখাঁর রাজত্বকালে বাঙলার অন্যতম বীরযোদ্ধা ও সুশাসক ছিলেন (জন্ম ১৬৫৮-৬০ খ্রীঃ)। মগ ও পাঠানদের অত্যাচারে যশোহর, খুলনা ফরিদপুর যখন জনশূন্য ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছিল, তখন সীতারাম আপন বাহু ও বুদ্ধিবলে এবং সুশিক্ষিত সেনাদলের সাহায্যে এলাকায় শান্তি ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। শায়েস্তা খাঁ আরংজেবের নিকট সনদ আনাইয়া তাঁহাকে 'রাজা' উপাধি দিয়াছিলেন। তাঁহার সম্পর্কে প্রবাদ আছে :

ধন্য রাজা সীতারাম বাঙলা বাহাদুর।
যার বলেতে চুরি ডাকাতি হয়ে গেল দূর॥

সীতারাম সম্ভবতঃ বাঙলা দেশে এক স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন এবং পাঠানদের অধিকার হইতে বহু পরগণা দখল করিয়া সুশাসন প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে সমসাময়িক কয়েকজন অত্যুৎকৃষ্ট বীরযোদ্ধা তাঁহার সহায়ক হইয়াছিল। 'সীতারামের রাজ্য পদ্মার উত্তর পার হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গোপসাগরের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল' (যশোহর-খুলনার ইতিহাস)। সীতারাম অসংখ্য দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন ও প্রজাদের রণকুশলী করিয়া তুলিতেছিলেন। ক্রমে তাঁহার দুর্ধর্ষ প্রতাপ মোগলদের সন্দেহের কারণ হওয়ায় মোগলদের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ বাধে ও

কয়েকজন অন্তরঙ্গের বিশ্বাসঘাতকতায় সীতারামের পতন ঘটে। ইতিহাসকার লিখিয়াছেন:

"হিন্দুমুসলমানে এই প্রীতি, জাতিধর্ম-নির্বিশেষে গুণগ্রাহিতা, কায়স্থ হইয়া বৈদ্য পণ্ডিতকে মহোপাধ্যায় উপাধিপ্রদান, মন্দির ও মসজিদ, চতুষ্পাঠী ও মক্তব একত্র প্রতিষ্ঠা, শিল্পের প্রাণপ্রতিষ্ঠা এবং রাজধানীর মহম্মদপুর নামকরণ—এমনভাবে প্রতাপাদিত্যের পরে আর কে করিয়াছেন?" (বৃহৎবঙ্গ)।
চাঁদ (রায়)—ঢাকা-বিক্রমপুর অঞ্চলের বীর সৈনিক চাঁদ রায় বারভূঁইঞার অন্যতম ভূমাধিকারী এবং কেদার রায়ের ভ্রাতা ছিলেন। চাঁদ রায় ও কেদার রায় সমস্ত বিক্রমপুর পরগণা ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি স্থান অধিকার করিয়া পাঠান রাজত্বের শেষভাগে স্বাধীন নৃপতিরূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন" (বৃহৎবঙ্গ)।
প্রতাপ—বাঙলার বিদ্রোহীবীর যশোহরের প্রতাপাদিত্যও মোগল-পাঠান-শাসনমুক্ত এক স্বাধীন বাঙলার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। বাঙলাদেশের অসংখ্য স্থানে দুর্গনির্মাণ, রণপোত নির্মাণ, সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী গঠন সম্পর্কে এখনো অজস্র জনশ্রুতি আছে। তাঁহার দুর্দমনীয় ক্রোধ ও দানশীলতাও কিংবদন্তীর বিষয়। প্রতাপের সময়ে পর্তুগীজ জলদস্যুদের আক্রমণ প্রতিহত হইয়াছিল এবং সর্ববিষয়ে যশোহর তখন বঙ্গদেশে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়াছিল। মানসিংহ প্রতাপের বল খর্ব করিবার জন্য বাঙলায় উপস্থিত হইলে প্রতাপের প্রতি ঈর্ষা-পরায়ণ নৃপতিদের অকুণ্ঠ সহায়তা পাইলেন এবং যুদ্ধে প্রতাপকে পরাস্ত করেন। প্রথমবার সন্ধিস্থাপন করার পর প্রতাপ যখন পুনর্বার বিদ্রোহী হন তখন মানসিংহ প্রতাপকে সম্পূর্ণ পরাজিত করিয়া বন্দী অবস্থায় আগ্রায় প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে বারাণসীতে মতান্তরে পুরীতে তাঁহার মৃত্যু হয়। রবীন্দ্র-নাথের 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসে প্রতাপাদিত্য-কাহিনী আছে। **কবির পদ্মা...অসীমের অভিমুখে**—পূর্ব বাঙলার অন্যতম স্মরণীয় নদী পদ্মার লীলা-মাধুর্যের তরঙ্গাঘাতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের যৌবনের কাব্যসাধনা শতদলে বিকশিত হইয়াছিল। এই পদ্মার কল্লোলিত বক্ষে কত বর্ষণমুখর সকালসন্ধ্যায় জ্যোৎস্নালোকিত নিশীথে ইহার দিগন্তবিস্তৃত বালুচরে কবির যৌবনের কত রহস্যময়ী সিসৃক্ষার জন্ম হইয়াছে। সোনারতরী, চিত্রা, চৈতালির অসংখ্য কবিতা, নৌকাডুবি উপন্যাস, কাহিনী কাব্যনাট্য, চিত্রাঙ্গদা মালিনী প্রভৃতি রচনা, ছিন্নপত্র, প্রবন্ধ, তাঁহার বিস্ময়কর ছোট গল্পগুলি, সবই কল্পনাদিব্যী

পদ্মার শাখিপল্লবের আতিথ্যচ্ছায়ে রচিত। সৃষ্টির উচ্ছ্বসিত আনন্দে তিনি তখন কেবল সাহিত্যের ফসল ফলাইয়াছেন, তুলিয়া দিয়াছেন মহাকালের সোনার তরীতে, তাহারা সৌন্দর্যের কোন নিরুদ্দেশ লোকে ভাসিয়া যাইবে ইহাই ছিল কবির বিস্ময়! 'সোনার তরী' কাব্যের প্রথমকবিতা সোনার তরীতে কবি লিখিয়াছেন,

> যত চাও তত লও তরণী 'পরে
> আর আছে? আর নাই, দিয়েছি ভরে।
> এতকাল নদীকূলে
> যাহা লয়ে ছিনু ভুলে
> সকলি দিলাম তুলে থরে বিথরে।

আর শেষ কবিতা 'নিরুদ্দেশ যাত্রায়' লিখিয়াছেন:

> আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী?
> বলো কোন্ পারে ভিড়িবে তোমার সোনার তরী।

—এই ভাবের ইঙ্গিত খণ্ডকপালীর আলোচ্য ছত্রে প্রাপ্তব্য। **সে পদ্মা... খুঁজি**—রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির সঙ্গে অচ্ছেদ্য প্রেরণাসূত্রে গ্রথিত এই পদ্মা এখন বাঙলাদেশ ও বাঙালীর জীবন হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে। এখন ভাগীরথী, ভৈরব, ইছামতী প্রভৃতি কয়েকটি শাখাপ্রবাহ মাত্র আমাদের বর্তমান। পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলি মুখ্যত ছোটনাগপুর অঞ্চলের পার্বত্যভূমিজাত। **ইন্দ্রের রথ...কি খুঁজি**—আজ স্বয়ং দেবরাজ যদি মেঘের রথ লইয়া তাঁহার প্রতি বর্ষের প্রতিবর্ষণের পরিচিত বঙ্গে উত্তীর্ণ হন, তবে তিনি তাঁহার সেই পরিচিত দেশটিকে খুঁজিয়া পাইবেন না। কারণ এখন দেশ-শাসন ও রাজনীতির প্রয়োজনে নদী ও অঞ্চলের নাম পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে।

পূর্ণ মুক্তি...বড় তাপ—তপস্যা করিলে বাঞ্ছিত-প্রাপ্তি ঘটে, কিন্তু বাঙলা দেশের স্বাধীনতার জন্য যে তপস্যা তাহা প্রাপ্তিতে নয়, তাহা যেন অভিশাপে পরিণত হইয়াছে। আমাদের কামনা ছিল বিদেশী-শাসনমুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতা (সম্পূর্ণ ভারত ছাড় আন্দোলনের দাবী স্মরণীয়) কিন্তু পূর্ণ মুক্তিরূপ চন্দ্রের বদলে আমরা পাইয়াছি অর্ধমুক্তি, অর্ধাংশ-দেশ ত্যাগ করিয়া যে মুক্তি ঘটিল তাহা যেন অপ্রত্যাশিত গলাধাক্কায় মত। কবি শ্লেষ-বেদনায় বলিতেছেন, জ্যোৎস্না স্নিগ্ধ করে, কিন্তু বর্জিত খণ্ডিত দেশের স্বাধীনতারূপ অর্ধচন্দ্রের

আলোক আজ দেহমন দগ্ধ করিতেছে। যে দুঃসহ দুঃখের মূল্যে এই স্বাধীনতা অর্জিত হইয়াছে তাহা স্বাধীনতার আনন্দ অপেক্ষা তপ্ত। **ময়ূরাক্ষীটি···কপোতাক্ষীটি কই**—পশ্চিমবঙ্গের ময়ূরাক্ষী ও পূর্ববঙ্গের কপোতাক্ষী যেন বঙ্গজননীর শ্যামল মুখশ্রীর দুই নয়ন—এখন কপোতাক্ষী পাকিস্তানের অন্তর্গত হইয়াছে, ময়ূরাক্ষীরূপ একটি মাত্র নয়ন পড়িয়া আছে জননীর। **তুমি একাক্ষী···অতঃপর**—দুই চক্ষু-তুল্য নদীর মধ্যে কপোতাক্ষী হারাইয়া কেবল ময়ূরাক্ষী-সম্বলা জননী এখন একচক্ষুবিশিষ্টা হইয়াছেন। কেবল একটি মাত্র চোখ থাকার অর্থ একদেশদর্শিনী হওয়া, কুটিলা হওয়া। প্রসন্নময়ী জননী আজ বুঝি সেই একচক্ষুবিশিষ্টা কুটিলারূপ ধারণ করিবেন—ইহাই কবির আশঙ্কা। মাতা যদি এইরূপ কুটিলা মনসার রূপ ধারণ করেন, তবে চাঁদসদাগরের মত কোনো সৎ বণিক তাঁহাকে কেমন করিয়া পূজা কবিবেন। মনসা দেবী ছিলেন একচক্ষুবিশিষ্টা তাই চন্দ্রধর তাহাকে 'চ্যাংমুড়ি কানী' বলিয়া ডাকিতেন। মনসাকে উপাসনা না করার জন্য চন্দ্রধরের জীবন দেবী দুর্বিষহ করিয়াছিলেন—ইহাও তাহার কুটিলতার দৃষ্টান্ত। কবি বলিতেছেন, বঙ্গজননীর সন্তান কেমন করিয়া বিকৃতাঙ্গ জননীকে মা বলিয়া ডাকিবেন। সূক্ষ্মভাবে আরও একটি অর্থ পাওয়া যাইতেছে। নদীপথ বাণিজ্যের অন্যতম উপায়, সুতরাং দেশ নদী-বঞ্চিত হইলে বাণিজ্যও সঙ্কুচিত হয়। নদী-পথগুলি হারাইয়া বাঙলা দেশের সওদাগরগণ পণ্য আদান-প্রদানের ব্যাপারেও ক্ষতি-গ্রস্ত হইবেন। **কর্ণভূষণ···কাজলভুলী**—বাঙলার নৈসর্গিক সৌন্দর্যগুলিকে অলংকার করিয়া স্বদেশজননীকে রূপান্বিত করা কবিতার একটি প্রিয়প্রসঙ্গ। কবি তাহারই সূত্র ধরিয়া সংক্ষেপে বলিতেছেন, বিচ্ছিন্ন বঙ্গ যেন জননীর মুখশ্রীর অলংকারগুলি বিনষ্ট করিয়াছে। কর্ণফুলী নদী যেন বঙ্গমাতার কানের কুসুম-সদৃশ অলংকার ছিল, মেঘনা যেন মাতার আয়ত চোখের সযত্নরচিত মেঘসদৃশ কজ্জল-রেখা ছিল। কিন্তু উক্ত নদীগুলি অন্যদেশভুক্ত হওয়াতে বাঙলা মাতার সেই কানের ভূষণও নাই, চোখের কাজলও নাই। **বৎসরান্তে...তরী'পরে**—সম্পদহীনা বহু-সৌভাগ্য-বঞ্চিতা বঙ্গমাতার জীবনে অশেষবিধ অশুভ ঘটনা ঘটিবে এই আশঙ্কা করিয়া কবি বলিতেছেন, পূর্বে প্রতিবৎসর শারদ-উৎসব-উপলক্ষে দশপ্রহরণধারিণী দশভুজা সম্পদে সৌভাগ্যে বঙ্গভূমি ভরিয়া দিয়া যাইতেন ; এবার তাঁহার আগমন সূচিত হইবে মড়ক-

মন্বন্তর-দারিদ্র্যে। দেবীর ঘোটকে আগমন দুর্ভাগ্যসূচক, তরীতে আগমন সৌভাগ্যসূচক। সূক্ষ্ম অর্থে ইহাও প্রতীয়মান যে, তরাপালতরী নদী-প্রাধান্যের সূচক, ঘোটকে আগমন পশ্চিমবঙ্গের স্থলপথ-প্রাধান্যেরই সূচক। **মুক্তির লাগি···প্রবীরকুমার**—প্রবীরকুমার নীলধ্বজ ও জনার পুত্র, অর্জুনের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বরোধ করিয়া অর্জুনের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। দেশের জন্য যে সকল বীর প্রাণ দিয়াছেন, কারাবরণ করিয়াছেন, গুলির সম্মুখে বুক পাতিয়া বক্ষোরক্তে মৃত্তিকা সিক্ত করিয়াছেন তাহাদের ত্যাগ, মহত্ত্ব ও বীর্য তাই ক্ষত্রবীর প্রবীরকুমারের সহিতই তুলনীয়। **তাহাদের পরিণাম···অবিরাম**—দেশপ্রেমিক মুক্তি-যোদ্ধাদের যে পরিণামের কথা চিন্তা করিয়া কবি ক্ষুব্ধ ও অশ্রুসজল হইতেছেন, সে পরিণাম আশাভঙ্গের ও ব্যর্থতার। স্বাধীনতা-আন্দোলনে চট্টগ্রাম-ঢাকা-বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চলের অবদান ছিল অবিস্মরণীয়। সুতরাং পূর্ববঙ্গবাসী নির্ভীক যে সকল মুক্তিসেনানী স্বাধীনতা-অর্জনের প্রতিজ্ঞায় সর্ববিধ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, কারাবরণ করিয়াছেন, সেই স্বাধীনতা লাভের পর ভিটেমাটি ছাড়িয়া তাঁহারাই পশ্চিম-বঙ্গে নগ্নপদে, নতমস্তকে চলিয়া আসিয়াছেন। ইহাই প্রবীরকুমারদের করুণ পরিণাম।

ব্যাখ্যা

দুখের তৃষ্ণা মিটিবে······তোমার কোলে ? (দ্বিতীয় স্তবক)
[রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]
সিনানে নামিলে ······দিবে না গাঁথি। (দ্বিতীয় স্তবক)
[রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]
দিনের অতিথি ······নিদাঘের সমীরণ। (তৃতীয় স্তবক)
[রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]
কোথা গেল গলে ······কুক্ষিতে বসুধার ? (চতুর্থ স্তবক)
[রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]
খণ্ডকপালী চিরবাহিতে ··· ···ভেলা প্রান্তে। (চতুর্থ স্তবক)

আলোচ্য পংক্তি দুইটি কবিশেখর কালিদাস রায় বিরচিত খণ্ডকপালী কবিতা হইতে উদ্ধৃত। একদা-সুবর্ণগ্রহ বঙ্গদেশের অর্ধাংশ-পরিত্যাগের

কঠিন-মূল্যে-অর্জিত স্বাধীনতা যে বঙ্গজননীর অদৃষ্টকে দুর্ভাগ্যের দুরপনের কালিমায় মণ্ডিত করিয়াছে ইহাই বক্ষ্যমাণ অংশে কবির উদ্দিষ্ট।

স্বাধীনতা-লাভের সহিত দেশ বিভাগের সর্বনাশ অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত বলিয়া বাঙলা দেশের এই শোচনীয় দুর্ভাগ্য অনিবার্যভাবেই কবিকে মনসা-মঙ্গল কাব্যে বেহুলার দুরদৃষ্টকে মনে করাইয়া দিয়াছে। দুর্ভেদ্য লৌহনির্মিত সুরক্ষিত গৃহে সদ্য-বিবাহিতা লখীন্দর ও বেহুলা বাসররাত্রি যাপন করিতে-ছিলেন। কিন্তু মনসার ষড়যন্ত্রে গভীর নৈশ মুহূর্তে সেই লৌহকক্ষেও কালনাগ প্রবেশ করিয়া ঘুমন্ত লখীন্দরকে দংশন করিল—মুহূর্তে বিষক্রিয়ায় লখীন্দরের তরুণসুন্দর দেহ বিবর্ণ হিমনীল হইল। বিবাহের পুষ্পাভরণ, সুসজ্জিত বাসর-শয্যা, চরণের অলক্তক, নয়নের কজ্জল ও অঙ্গসজ্জা অক্ষুণ্ণ থাকিতে থাকিতেই বেহুলা সহসা নির্মম দৈবের নিদয় বিধানে অকাল-বৈধব্য বরণ করিলেন। গভীর রাত্রির উৎসব-লগ্নে যে প্রিয় স্বামীকে তিনি একান্ত সান্নিধ্যে পাইয়া ছিলেন, সেই চিরপ্রিয়, নারীর চিরআকাঙ্ক্ষিত স্বামী মুহূর্তে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িলেন। পরদিন ম্লান প্রভাতে বাষ্পাকুল চক্ষে, নত মস্তকে অকাল-বৈধব্যের গ্লানি বহন করিয়া বেহুলা মৃত স্বামীর দেহ কলার মান্দাসে তুলিয়া গাঙুড়ের জলে সেই মান্দাস ভাসাইলেন। কারণ সর্পদষ্ট দেহ পোড়াইতে নাই, জলে ভাসাইয়া দিতে হয়। সেই সঙ্গে বেহুলাও জলে ভাসিলেন। বিবাহ রাত্রির শুভনিশীথে মঙ্গল-সিন্দূর মুছিয়া যে নারী বিধবা হয় সে মন্দভাগ্য, হতললাট—তাই শাশুড়ী গুরুজন প্রতিবেশীরা খণ্ডকপালী, দুর্ভাগা বলিয়া বেহুলাকে গাল দিয়াছিল।

বঙ্গজননীও বেহুলার মতই মন্দঅদৃষ্ট দগ্ধ-ললাট অভাগিনী। তাহার দীর্ঘ কালের অভীপ্সিত পরমকাম্য স্বাধীনতা তাহার করতল-লগ্ন হইল একদিন—রাত্রির মধ্যযামে বিদেশী শাসকগণ তাহাদের সমস্ত কর্তৃত্ব আমাদের হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়া গেল। বাসর-রাত্রির উৎসবের মতই আমরা সেদিন উল্লাসে কলরব করিয়াছিলাম। কিন্তু নবযুগের অচির-প্রভাতেই সে স্বাধীনতার বিবর্ণরূপ প্রত্যক্ষ হইল। খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন সোনার দেশ দুর্ভাগ্যের নতশির লজ্জা বহন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—অগণ্য ছিন্নমূল মানুষের হৃতসর্বস্বতার বেদনা, ভ্রাতৃরক্ত ও স্বার্থপরতার গ্লানি তাহাকে সম্বর্ধনা করিতেছে। এই অধরিক্ত বিভক্ত স্বদেশের প্রতি খণ্ডকপালী শব্দটি সুপ্রযুক্তই হইয়াছে। এই

বঙ্গ যেন মৃত স্বাধীনতা লইয়া দুর্ভাগ্যের নদীতে নিঃসঙ্গ খেয়া ভাসাইতেছে। ইহাই কবির ইঙ্গিত।

তোমার ভাগ্যে……পাবে কি খুঁজি? (পঞ্চম স্তবক)

[রূপতত্ত্ব বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]

পূর্ণ মুক্তি-চন্দ্রের তরে……বড় তাপ। (ষষ্ঠ স্তবক)

বক্ষ্যমাণ পংক্তিদ্বয় দেশবিভাগে ব্যথিত কবিশেখর কালিদাস রায়ের খণ্ডকপালী কবিতা হইতে চয়িত। আলোচনীয় কাব্যাংশে কবি বঙ্গদেশের সুদীর্ঘকালের স্বাধীনতা-কামনা ও ফলপ্রাপ্তির করুণ বৈপরীত্যের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। পুরাকালে ঋষি অথবা মানব তপস্যা করিতেন অভীষ্ট পূরণের জন্য। তপস্যার ফলে দেবতা তপস্যাকারীর সিদ্ধিলাভ ঘটাইতেন। কিন্তু দুর্ভাগা বঙ্গদেশ তাহার স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বহু সহস্র প্রাণ বিসর্জন দিয়া যে তপস্যা করিয়াছে, তাহা অভীষ্ট পূরণ করে নাই—তাহা শেষ পর্যন্ত চরম অভিশাপে সমাপ্ত হইয়াছে। কারণ এই স্বাধীনতা-আন্দোলনের পরিণাম হইয়াছে জননীর স্বর্ণপ্রভ শ্যামল অঙ্গের দ্বিখণ্ডীকরণ: বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের দ্বারা পশ্চিম বাঙলা ও পাকিস্তানের জন্ম হইয়াছিল। বৈদেশিক শাসন-অধিকার হইতে যে মুক্তি সে প্রত্যাশা করিয়াছিল, ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে সে মুক্তি সম্পূর্ণ ঘটে নাই, অর্ধমুক্তি মাত্র ঘটিয়াছে। পূর্ণমুক্তির সহিত পূর্ণ চন্দ্রের উপমা দিয়া কবি বলিতেছেন পূর্ণচন্দ্র তো ভাগ্যে মিলে নাই, অর্ধাংশ ত্যাগ করিয়া জুটিয়াছে অর্ধচন্দ্র—যাহার লক্ষ্যার্থ গলাধাক্কা তথা বঞ্চনা ও প্রতারণা। দেশের অবিচ্ছেদ্য মাটি দুখানা করার অর্থ স্বাধীনতা নয়, তাহা এক প্রকার অপমান—ইহা স্বীকার করায় কুণ্ঠা নাই। যে খণ্ডিত স্বাধীনতা বঙ্গের ভাগ্যে জুটিয়াছে তাহা কোটি কোটি মানুষের ছিন্নমূল ও হৃতসর্বস্ব হইবার অপূরণীয় বেদনার মূল্যে, ভ্রাতৃরক্তে ও ঘৃণায়। তাহা যদি অর্ধচন্দ্রও হয়, তবে সেই চন্দ্র জ্যোৎস্নার বদলে দান করিতেছে দাহ।

ময়ূরাক্ষীটি রহিল……মেঘলা কাজলতুলী। (ষষ্ঠ স্তবক)

বর্তমান পংক্তির উৎস কবিশেখর কালিদাস রায় রচিত খণ্ডকপালী কবিতা। বাসররাত্রিতে অকালবৈধব্য-বরণ-করা দুর্ভাগিনী নারীর সহিত দ্বিখণ্ডিতা দেশজননীর তুলনা করিয়া কবি পরিত্যক্ত বিসর্জিত বাঙলার লুপ্ত সৌন্দর্যের জন্য বারবার বেদনার্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছেন। পূর্ব বাঙলায় প্রধান

সম্পদ ছিল নদী—অসংখ্য নদনদীবিধৌত পলিকীর্ণ এই পূর্বাঞ্চলই সমগ্র বাঙলাকে জুগাইয়াছে শস্য সম্পদ, তৃষ্ণার জল, প্রাণের আরাম। কিন্তু দেশ-বিভাগের ফলে বাঙলার নদীসম্পদ এখন পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। অবিভক্ত বঙ্গের নদীগুলি যেন মাতৃভূমির দেহকান্তির শোভাস্বরূপ ছিল: প্রকৃতি ছিল জননীর সুষমা, নদী ছিল তাঁহার অলংকার। কিন্তু এখন সেই নদী-গুলির অভাবে মাতার সেই স্নিগ্ধশ্রী মুখটি যেন বিকারপ্রাপ্ত হইয়াছে। ময়ূরাক্ষী ও কপোতাক্ষী এই দুইটি নদী পশ্চিমবঙ্গে ও পূর্ববঙ্গে জলবিস্তার করিয়া বাহিয়া যাইত—মনে করা যাইতে পারে তাহারা যেন বঙ্গমাতার হিরণরুচির মুখের দুইটি আয়তদীঘল নয়ন ছিল (কপোতাক্ষ, ময়ূরাক্ষ—কপোত ও ময়ূরের মত নয়ন যাহার, স্ত্রীলিঙ্গে কপোতাক্ষী ময়ূরাক্ষী)। কিন্তু এখন একটিমাত্র দৃষ্টি পড়িয়া আছে, আর একটি চোখ তিনি হারাইয়াছেন। এখন পশ্চিমবঙ্গ উৎপাদনের দিক দিয়া প্রায় ব্যর্থ—সুতরাং বর্তমান ভূ-ভাগকে অন্নপ্রসূ বলা যায় না। দেবী অন্নদার মুখশ্রী প্রসন্ন দুই নয়নের স্নিগ্ধহাস্যেই—একচক্ষু দেবীকে কি অন্নদা অন্নপূর্ণা বলা যায়? দেব-সমাজে একচক্ষুবিশিষ্টা ছিলেন মনসা, তাই উদ্ধত বিদ্রোহী চাঁদসদাগর তাঁহাকে চ্যাংমুড়ি কানী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। মনসা কেবল একচক্ষু ছিলেন না, প্রকৃতিতেও তিনি ছিলেন তেমনি কুটিলা ও একদেশদর্শিনী—একচক্ষু হইলে এইসকল স্বভাবই হইয়া থাকে। সৎ বণিক হিসাবে চন্দ্রধরের খ্যাতি ছিল, সমাজে তিনি আদর্শবান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু তথাপি কুটিলা মনসার দেবত্বে তাঁহার শ্রদ্ধা জাগে নাই। মনসাকে তিনি ভক্তিভরে প্রণাম করেন নাই। আজ বঙ্গজননীও যদি একাক্ষী একদর্শিনী হন, তবে তাঁহার কুটিলতার জন্য কেহ তাঁহাব পূজা করিবেন না। আজ এই কুরূপা দৈহিক বিকারলক্ষণা জননীর দিকে চাহিয়াও কবির আশঙ্কা হইতেছে বোধহয় তিনিও সন্তানদের পূজা উজাড় করিয়া আর পাইবেন না। প্রকারান্তরে ইহাই বলা হইল যে, নদীপথই বাণিজ্যের প্রধান অবলম্বন। নৌবাণিজ্যে একদা বাঙলার খ্যাতি ছিল, কিন্তু এখন নদীগুলি আমাদের দেশ হইতে চলিয়া যাওয়ায় আমাদের বাণিজ্যের পক্ষে তাহা গভীর ক্ষতির কারণ হইবে। এই নদীগুলিই বঙ্গমাতার অঙ্গশোভাস্বরূপ ছিল। এখন রুক্ষ-ধূসর প্রান্তরসহ যে পশ্চিম বাঙলা আমাদের স্বদেশ হইয়াছে, তাহার মুখাবয়বে সে নৈসর্গিক শোভা নাই। কর্ণফুলী নদী আর তাঁহার কর্ণের পুষ্পভূষণের

মত শোভা পাইতেছে না। প্রমত্ত মেঘসদৃশ মেঘনা নদী মাতার স্নিগ্ধ চোখের কাজলরেখা ছিল। এখন মাতার চোখের কোলে মেঘনা তাহার ঘনকৃষ্ণ কাজলের তুলী বুলাইয়া দেয় না। এই রিক্ত শ্রীহীন বিকৃত রূপই বর্তমান জননীর বিশেষত্ব—দেশবিচ্ছেদের অপূরণীয় বেদনা স্মরণ করিয়া ইহাই কবির বারবার মনে হইতেছে।

বৎসরান্তে অম্বিকা……তরী পরে। (ষষ্ঠ স্তবক)

[রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]।

মুক্তির লাগি……আজ অবিরাম। (ষষ্ঠ স্তবক)

[রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]।

প্রশ্ন ১। খণ্ডকপালী বলিতে কবি কালিদাস রায় কী বুঝাইয়াছেন? কবিতাটির বক্তব্য পরিস্ফুট করিয়া নামকরণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

[আলোচনা ও ভাবার্থ দ্রষ্টব্য]।

জীবন-বন্দনা : কাজী নজরুল ইসলাম

ভূমিকা

বাঙলা ১৩৩৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কলিকাতায় প্রদত্ত একটি সম্বর্ধনা-সভায় নজরুল তাঁহার কবিপরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,

"বিংশ শতাব্দীর সম্ভাবনার যুগে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এরি অভিযান-সেনাদলের তূর্যবাদক একজন আমি। এই হোক আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়।

নজরুলের আত্মপরিচয়

আমি জানি, এই পথযাত্রার পাকে পাকে, বাঁকে বাঁকে কুটিল-ফণা ভুজঙ্গ, প্রখর-দর্শন শার্দুল পশুরাজের ভ্রূকুটি! এবং তাদের নখরদংশনের ক্ষত আজও আমার অঙ্গে অঙ্গে। তবু ওই আমার পথ, ওই আমার গতি, ওই আমার ধ্রুব।"

ইহাই নজরুল-প্রতিভার মূলসূত্র। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী কবি নজরুলের আত্মপ্রকাশ মুখ্যত সাময়িকতার মুখপাত্র হিসাবেই, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে

সাময়িকতার মধ্য হইতে আবির্ভাব

সেই সাময়িকতাকে তিনি অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন। গভীর মননশীলতা বা বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বলতায় তাঁহার কবিতা চিহ্নিত নয়, কিন্তু হৃদয়াবেগের প্রাবল্যে

এবং অশান্ত জীবনের উন্মাদনায় তাঁহার কবিতা এক মুহূর্তে জনগণমন হরণ করিয়াছিল। নতশির স্তব্ধ জীবনের প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি এবং সমাজবিপ্লবের অগ্নিগর্ভ সম্ভাবনায় তিনি বাঙলা কবিতায় রবীন্দ্রোত্তর যুগে একটি নূতন কাব্য-রাগিণীর প্রচলন করিয়াছিলেন। সৈনিক হইতে দোকানদারি, দারিদ্র্য হইতে বিলাসিতা, কাব্যসাধনা হইতে নজবৃত্তিসেবা, অশেষবিধ বৈপরীত্যে তাঁহার জীবন চিহ্নিত হইয়াছিল। সাংবাদিকতা, রাজদণ্ড, সংগীত-পরিচালনা, রাজনীতি—বিচিত্র কর্মে অভাবিত উত্তেজনায়, বিস্ময়কর পরিবর্তনে তাঁহার জীবন কাটিয়াছিল। অভিজ্ঞতা-সংকীর্ণ বাঙালী জীবনে নজরুল এই জন্যই বিস্ময় হইয়া আছেন। হাবিলদার-কবি, কারাদণ্ডে দণ্ডিত কবি, শ্যামাসংগীতের কবি ইহাদের মধ্যে মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সমকালীন অন্য কোনো কবির সহিত তাঁহার কোনো দিক দিয়াই সাদৃশ্য ছিল না। এমন কি, শেষ পর্যায়ে মস্তিষ্করোগে চিরকালের মত বাকশক্তিরুদ্ধ হইয়াও তিনি তাঁহার উদভ্রান্ত জীবনের পক্ষে একটি বিচিত্র উপসংহার সংযোজন করিয়াছেন। নজরুলের কাব্যগ্রন্থের মধ্যে নানা স্বরের সমাহার ঘটিয়াছে, মুখ্যত তিনটি শ্রেণীতে ইহাদের ভাগ করা যায়। প্রথমত, বিদ্রোহ, সামাজিক বিপ্লব, সাময়িকতা, অসহিষ্ণুতার কবিতা। ইহাদের মধ্য দিয়াই নজরুলের জনপ্রিয়তার প্রতিষ্ঠা, সার্থকতা ও প্রতিভার ভূমিকা স্থাপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনায় বিবিধ মেজাজ ও বিপরীত মনোভাবের প্রতিফলন ঘটিয়াছে। তাঁহার বিদ্রোহী উত্তেজনার অন্তরালশায়ী রোমান্টিক কবিধর্ম, প্রেম ও সৌন্দর্যস্পৃহা, সুস্থ জীবনাচার ও আদর্শবাদ, দেহবাদ, এই জাতীয় রচনার মধ্যে ছড়ানো আছে। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে, তাঁহার নিজস্ব মুসলিম ধর্ম ও সংস্কৃতি-চিন্তামূলক কবিতা। যদিও ধর্ম সম্পর্কে নজরুল কোনোদিনই সাম্প্রদায়িক ছিলেন না, 'হিন্দু না ওরা মুসলিম ঐ জিজ্ঞাসে কোন্ জন' এই বজ্রস্বনিত মানবতা বাদ তাঁহারই কণ্ঠে উচ্চারিত, তথাপি নজরুলই বাঙলা কবিতায় একটি নিজস্ব

রবীন্দ্রযুগে নূতন রাগিণী

বৈপরীত্যমূলক জীবন-পরিচালনা

উদভ্রান্ত জীবনের করুণ শেষ সর্গ

কাব্যশ্রেণী বিভাগ

বিদ্রোহ কবিতা

রোমান্টিক কবিতা

ইসলাম-সংস্কৃতি

মুসলিম সংস্কৃতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আরবী-ফারসী শব্দের অসংখ্য সাবলীল ব্যবহারে, ইসলামি ধর্ম ও সংস্কৃতির কাব্য-রূপায়ণে, হাফেজের জীবনাচরণের অনুবাদে তিনি পরবর্তী বাঙলা কাব্যে একটি ঐতিহ্য রচনা করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার অসংখ্য গ্রন্থ ও রচনাবলীর মধ্যে কাব্যগ্রন্থ হিসাবে স্মরণীয়, অগ্নিবীণা, দোলনচাঁপা, বিষের বাঁশী, ভাঙার গান, প্রলয় শিখা, ছায়ানট, পূবের হাওয়া, সাম্যবাদী, সর্বহারা, ফণিমনসা, সিন্ধু-হিল্লোল, চক্রবাক, সন্ধ্যা, নতুন চাঁদ, মরুভাস্কর ও সঞ্চিতা।

বাংলা কাব্যে নূতন ঐতিহ্য রচনা

কাব্যগ্রন্থ

জীবন-বন্দনা কবিতাটি নজরুলের সন্ধ্যা (প্রথম প্রকাশ ১৩৩৬) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। সংস্কারমুক্ত বল্গাহীন যে জীবন নিত্য মরুবিজয়ে বিশ্বাভিযানে সংগ্রামে বিপ্লবে প্রাণের কেতন ঊর্ধ্ব-আকাশে মেলিয়া আছে, এই কবিতায় সেই জীবনেরই বন্দনা করা হইয়াছে। সুতরাং কেবল শ্রমিক-অভ্যুত্থান বা সর্বহারা জীবনের প্রতি সাম্যবাদী কবির সাম্প্রদায়িকতা বলিয়া যাঁহারা কবিতাটিকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহারা কবিতাটির প্রতি অবিচার করিয়াছেন। এই কবিতার বিষয়বস্তু শ্রমিক বা কৃষিজীবন নয়, সর্বতোভাবে মানব-জীবন, যে জীবন ইতিহাসের বন্ধুর পথ ধরিয়া পতন-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়া যুগ-যুগ-ধাবিত, যাহার রথচক্রে দিনরাত্রি স্পন্দিত হয়, যাহার কর্মচক্রে সভ্যতার পৃষ্ঠাবদল হইতেছে, যাহার বিপুল জয়যাত্রায় বিধাতা নিত্য আশীর্বাদ প্রেরণ করেন। সে জীবন দেশকালের অঙ্গীভূত নয়, তাহা নিত্যকালের নিখিল মানব-জীবন, কর্মে-ধর্মে শ্রমে-শোষণে বুদ্ধিতে-সংস্কারে ঔদ্ধত্যে-প্রেমে মিশাইয়া সে জীবন। এই শাশ্বত মানব-জীবনের এমন শুভ্র অনিন্দিত রূপটিকে এই কবিতার সীমাবদ্ধ পরিসরে কবি ধরিতে পারিয়াছেন বলিয়াই জীবন-বন্দনা কবিতাটি নজরুলের অন্যান্য সাময়িক উত্তেজনা-প্রসূত অসহিষ্ণু কবিতার তুলনায় উৎকৃষ্ট কাব্যমহিমা লাভ করিয়াছে। মানব-জীবনের প্রতি এমন গভীর আত্ম-প্রত্যয়মিশ্রিত শ্রদ্ধাবোধ, মানব-মহিমার এরূপ সার্থক রূপায়ণ, বিশ্বভৌম মানব-জীবনের প্রতি এরূপ মহান্ মৈত্রীবন্ধনের আহ্বান কবিতাটিকে সার্থকনামা করিয়াছে।

উৎস

মানব-জীবনের মহান রূপ

কবিতাটির অপসমালোচনার বিরুদ্ধে

নামকরণের সার্থকতা

ভূমিকা

যাহাদের শ্রম-কঠিন বজ্রমুঠিতে পৃথিবী তাহার শস্যের সম্পদ উজাড় করিয়া দিতেছে, যাহাদের নির্দেশে ফসল উৎপন্ন হয়, যাহাদের শাসন-ত্রাসে আরণ্যক জরামৃত্যুসংকুল ধরিত্রী পুষ্পসম্ভবা হইয়া উঠিতেছে, বনচর ব্যাঘ্র, মরুচর সিংহ, গহ্বরস্থিত নাগিনীর সহিত প্রতিবেশিত্বে যাহারা নির্ভীক বর্বরের মত গৃহবন্ধন করে, কবি সেই তাহাদের জীবন-বন্দনা গান করিতেছেন। সেই দুর্বার গতিবেগসম্পন্ন যাযাবর-শিশুর ন্যায় বিশ্বমাতার সন্তানদের চলার আবেগেই মহাশূন্যে পৃথিবী উল্কার মত ঘূর্ণমান।

বক্তব্যবিবরণ

মানব-জীবন চঞ্চল বলিয়াই কখনও অরণ্যকে আপন ইচ্ছায় বাসযোগ্য করিয়াছে, উপনিবেশকে পুনরায় ধূলিসাৎ করিয়াছে। মর্মের মত্ত-আবেগই তাহাদের হিমালয়-লঙ্ঘনে ধাবিত করে সমুদ্র-শোষণে প্রবৃত্ত করে। নবীন রাজ্যাবিষ্কারের নেশায় মানুষ দুর্গম মেরুর অভিযাত্রী, কখনো শূন্যলোকে ধাবমান। অপ্রতিহত অশান্ত জীবনোল্লাস ও যৌবশক্তি মানুষকে চন্দ্রলোকে গ্রহান্তরে অসীম শূন্যে চালিত করিতেছে। যাহারা মৃত্যুর নিকট জীবনকে অনায়াসে বিক্রয় করিতে পারে, সংগ্রামক্ষেত্রে পণ ধরিয়া প্রাণ বিসর্জন দেয়, যুগে যুগে ইতিহাসে অকারণে বিপ্লব ঘনাইয়া তোলে, সেই বেদে-বেদুইন মানব-জীবনের বন্দনা গান করিতেছেন নশ্বর-জগতের কবি। উপচিত জীবন-সুখের উল্লাসে যাহারা বিষের পাত্র তুলিয়া লইয়াছে, আপন বক্ষে মৃত্যু-আঘাত হানিয়াছে, বর্ষার হিমবাহের মত দুর্বার, সংকীর্ণচেতাদের নিকট বর্বর ও কূপ-মণ্ডুকের নিকট অসংযমী বলিয়া অভিহিত সেই বাধাবন্ধহারা জীবনেরই কাব্য-প্রশস্তি রচনা করিতেছেন কবি।

আলোচনা

অমিত যৌবনের দুর্ধর্ষ আত্মপ্রত্যয় লইয়া বাঙলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। জাতীয় চিন্তায় তখন চারিদিক হইতেই পূর্বতন গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে নবীনদের ধূমায়িত বিক্ষোভ সুরু হইয়াছিল, সভ্যতার প্রাক্তন সংজ্ঞা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইতেছিল, বিশ্বের মনীষীদের জ্ঞানে ও

নজরুলের আবির্ভাবের পূর্বপট

গবেষণায় সমাজের চিরাচরিত মূল্যবোধগুলি বদলাইয়া যাইতেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতেই বাঙলা দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে বহুবিধ ভাঙন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। প্রতিষ্ঠাপন্ন সাহিত্যিক ও নেতাদের বিরুদ্ধে তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে এক জাতীয় অসহিষ্ণুতা ও অসন্তোষের বীজ উপ্ত হইয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি ও সাহিত্যে মানুষের মনোজগতে যেসকল বৈপ্লবিক চিন্তার মুক্তি-বদল হইতেছিল, আমাদের সাহিত্যেও তাহার প্রতিক্রিয়া সুরু হইল। কাব্যের ক্ষেত্রে পুরাতন ছন্দের বিরুদ্ধে, রোমান্টিক ভাবালুতার বিরুদ্ধে, সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় বাস্তবতার দাবীতে, জীবনের সহজ চিত্রণের অঙ্গীকারে ধীরে ধীরে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আসন্ন হইয়া উঠিতেছিল।

যুদ্ধোত্তর ভাঙন

মনোজগতের বিপ্লব লক্ষণ

প্রথা-নিরুদ্ধতা

প্রথম মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনের স্বপ্ন ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। সোভিয়েট দেশে সমাজতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তিত হইবার পর, সমাজের শ্রমজীবী ও কৃষিজীবী জীবন সম্পর্কে বুদ্ধিজীবী মানুষের চিন্তায় প্রচণ্ড পরিবর্তন ঘটে। ইতিমধ্যে ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে নানাপ্রকার অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও রাজনৈতিক সংকট তীব্রতর হইতে থাকে। ভারতবর্ষ প্রমুখ ঔপনিবেশিক শাসনভুক্ত দেশগুলিতে পরাধীনতার বেদনা দুর্বিষহ হইয়া উঠে এবং অনুন্নত দেশের স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার-জ্ঞাপক আন্দোলনের উপর বৈদেশিক শাসকবর্গের অত্যাচারও নির্মমভাবে বৃদ্ধি পায়। জনগণের মৌলিক অধিকার-হরণ, বিনাবিচারে কারাবদ্ধ করা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-হরণ, অন্নবস্ত্র-পানীয়ের শোচনীয় দুরবস্থা, সাম্প্রদায়িক অনৈক্য-বৃদ্ধি ইত্যাদি বহুবিধ ঘটনায় জীবন তখন সঙ্কুচিত বিধ্বস্ত। এমন সময় সাহিত্যে প্রয়োজন হইয়াছিল এক দুরন্ত তেজস্বিতার, অকুতোভয় সত্যভাষণের, দলিত মনুষ্যত্বের পক্ষ হইতে শাণিত উপেক্ষার। মনুষ্যত্বের বীর্যবান বাণী, মৃত্যুঞ্জয় আশার সংগীত চিরকাল রবীন্দ্রনাথই সর্বাগ্রে জাতিকে শুনাইয়াছিলেন। কিন্তু তখন রবীন্দ্রনাথও যেন সমকালীন যুগতৃষ্ণাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারেন নাই। তাই একদল

সমাজতান্ত্রিক চিন্তার প্রসার

ঔপনিবেশিক শাসনভুক্ত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার পর

রবীন্দ্রদ্রোহিতা

আধুনিক তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে, তাঁহার অভ্রান্ত রোমান্টিক স্বভাবের বিরুদ্ধে, জীবন সম্পর্কে তাঁহার অপরিবর্তনীয় প্রসন্ন আত্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রবল অভিমান ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল। যুগজীবনের তীব্র উৎকণ্ঠা কাহারও কণ্ঠে বিপুল বীর্যে উৎসারিত হইল, নীলাভ যন্ত্রণাক্ত শতাব্দীর

যুগমানব কবিবৃন্দ

কম্পন কেহ আপন সাংকেত ছন্দে ধরিবার চেষ্টা করিলেন, বিশ্বব্যাপ্ত মানবতার জয়সংগীতকে কেহ অশ্রান্তভাবে বাজাইয়া তুলিলেন। কাজী নজরুল ইসলাম এই যন্ত্রণার মধ্যে আবির্ভূত হইয়া অগ্নিবীণা বাজাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন—সে দায়িত্ব সর্বাংশে না হইলেও তিনি বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিয়াছিলেন।

নজরুলের কবিতায় একটি আগ্নেয়গিরির লাভা-স্রোত আছে। তাঁহার বাণী ছিল বিপুল, ভাষা ছিল অফুরন্ত, উৎসাহ ছিল অদম্য, সংযম ছিল সেই তুলনায় কম। এই কারণে তাঁহার কবিতা অনেক

নজরুলের কবিমানস

সময় পথভ্রষ্ট হইয়াছে, উত্তেজনায় তুবচঃ হইয়াছে, শেষ পর্যন্ত বলগাহীন রোমান্টিকতায় দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়াছে—তথাপি ইহার প্রাণসঞ্চারী জীবনরস যে আমাদের জড়তাগ্রস্ত জাতীয় জীবনে এক অভিনব উত্তেজনা ও উৎসাহ বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। অপাংক্তেয় সর্বহারা জীবনের প্রতি সীমাহীন দরদ, সমাজ বিপ্লবের

কাব্যলক্ষণ

অগ্নিস্রাবী ভবিষ্যদ্‌ঘোষণা, নারীজীবনের প্রতি অসাধারণ গুরুত্ব-আরোপ, পরাধীনতার প্রতি দুর্বিষহ গ্লানি-প্রকাশ, বিশ্বের নিপীড়িত নির্যাতিত শোষিত সম্প্রদায়ের পুনরভ্যুত্থানের সুস্পষ্ট আহ্বান, সাম্প্রদায়িক ভেদবৈষম্যের প্রতি অকুণ্ঠ ঘৃণানিক্ষেপ, যুবশক্তির প্রতি বলিষ্ঠ চিত্তারতি, বৈদেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে দ্বিধাহীন সংগ্রামের অনমনীয় দৃঢ়তা এবং ব্যক্তি

জাতীয় জীবনে নজরুল কাব্যের প্রভাব

স্বাধীনতার নির্ভীক মন্ত্রোচ্চারণ মেরুদণ্ডহীন জাতির স্বাধিকার-প্রমত্ততা অর্জনের পথে যে অসীম শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল, ইহা বিস্ময়ের বিষয় নয়। জীবন-বন্দনা কবিতায় নজরুলের কবিমানসের সেই অকুণ্ঠ নগ্ন জীবনাদর্শ তাঁহার স্বভাবসংগত বিদ্রোহী-চেতনা এবং তেজোদীপ্ত বাক্‌ভঙ্গি নিহিত আছে।

জীবন-বন্দনা শ্রমজীবী জীবনের বন্দনামাত্র নয়। এই জীবন মানব-জীবন, সে মানব শ্রমজীবী বুদ্ধিজীবী কৃষিজীবী বা যাযাবর যাহাই হোক। কবি এখানে জীবনবাদী বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের আধুনিকতার লক্ষণে চিহ্নিত। মোহিতলালের কালাপাহাড় কবিতায় নবযুগের ধর্মভারহীন সংস্কারমুক্ত আচার-বৈষম্য-বর্জিত সুস্থ মানবাত্মার বন্দনা করা হইয়াছে, নজরুলের জীবন-বন্দনা কবিতায় কর্মমুখর দেশকালপাত্র-পরিচয়বিহীন তরুণ আশাবাদী জীবনের বন্দনা করা হইয়াছে। মোহিতলাল ও নজরুল সমসাময়িক কবি, একে অপরকে হয়ত অনেক ক্ষেত্রেই প্রভাবিত করিয়াছেন। কালাপাহাড় ও জীবন বন্দনা উভয় কবিতাকেই তাই সমকালীন যুগজীবনের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করিয়া বিচার করিতে হইবে। মোহিতলালের বিদ্রোহ রাজনৈতিক নয়, নজরুলের বিদ্রোহ যথার্থই রাজনৈতিক বিদ্রোহ। মোহিতলাল বুদ্ধিবাদের আলোকে জীবনের ধর্মভীরুতাকে বিদ্রূপ করিয়াছেন। নজরুল হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রেরণা ও প্রবণতায় সর্বসংস্কারমুক্ত নবীন প্রাণের প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন। এই কারণে মোহিতলালের কবিতার আবেদন কিছুটা ঐতিহাসিক, নজরুলের কবিতার আবেদন সকল কালের।

জীবনবাদী কবি

মোহিতলাল ও নজরুল

নজরুলের জীবন-বন্দনা কবিতায় রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক চিন্তাধারার প্রতিফলন অস্পষ্ট নয়। ১৩২১ সালে সবুজ পত্র প্রকাশ এবং বলাকা কাব্যের সূচনা হইতেই বাঙলা দেশে যুব আন্দোলনের একটি উপযুক্ত পটভূমিকা প্রস্তুত হইতে থাকে। সবুজপত্রের প্রকাশ নানা কারণে বাঙলার নাগরিক ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। দেশের সমাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যুবশক্তির প্রাধান্য-দানের দাবী ইহার পূর্বে জাতির শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদের কণ্ঠে এমন করিয়া ধ্বনিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের 'ওরে নবীন ওরে আমার কাঁচা', প্রমথ চৌধুরীর উজ্জ্বল শাণিত যুক্তিবাদ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'যৌবনে দাও রাজটীকা' কবিতা এবং আরও অসংখ্য কবি সাহিত্যিকের কণ্ঠে যুবসমাজের প্রতি উজ্জীবন বাণী বাঙলা দেশকে মাতাইয়া দিয়াছিল। সবুজপত্রের পৃষ্ঠাতেই বিখ্যাত বিবেচনা ও অবিবেচনা প্রবন্ধে কবি লিখিয়াছিলেন,

রবীন্দ্রনাথের প্রভাব

সমকালীন যুব আন্দোলন

এই যুগের কয়েকটি রচনা

"প্রাণ দুঃসাহসিক—বিপদের ঠোকর খাইলেও সে আপনার জয়যাত্রার পথ হইতে সম্পূর্ণ নিরস্ত হইতে চায় না।...এই মরুভূমি সনাতন নহে, ইহার বহুপূর্বে এখানে প্রাণের নবলীলা চলিত—সেই লীলার কত দর্শন বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্য রাজ্য সাম্রাজ্য কত ধর্ম ও সমাজ-বিপ্লব তরঙ্গিত হইয়াছে। ইজিপ্টের প্রকাণ্ড কবরগুলার যে সমস্ত মমি মৃত্যুকে অমর করিয়া দাঁত মেলিয়া জীবনকে ব্যঙ্গ করিতেছে, তাহাদিগকেই কি বলিবে সনাতন! তাহাদের সিন্দুকের গায়ে যত প্রাচীন তারিখের চিহ্নই খোদা থাক্ না কেন, সেই ইজিপ্টের নীলনদীর পলিপড়া মাঠে আজ যে 'ফেলাহীন' চাষা চাষ করিতেছে, তাহারই প্রাণ যথার্থ সনাতন। মৃত্যু যে প্রাণের ছোট ভাই—আগে প্রাণ পরে তাহার মৃত্যু। যাহা কিছু চলিতেছে তাহারই সঙ্গে জগতের চিরন্তন চলার যোগ আছে—যাহা থামিয়া বসিয়াছে তাহার সঙ্গে সনাতন প্রাণের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। পৃথিবীর বড় বড় সভ্যতাই দুঃসাহসের সৃষ্টি। শক্তির দুঃসাহস, বুদ্ধির দুঃসাহস, আকাঙ্ক্ষার দুঃসাহস। শক্তি কোথাও বাধা মানিতে চায় নাই বলিয়াই মানুষ সমুদ্র পর্বত লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া গিয়াছে। বুদ্ধি আপাতপ্রতীয়মানকে ছাড়াইয়া অন্ধ সংস্কারের মোহজালকে ছিন্নভিন্ন করিয়া মহৎ হইতে মহীয়ানে অণু হইতে অণীয়ানে, দূর হইতে দূরান্তরে, নিকট হইতে নিকটতমে সগৌরবে বিহার করিতেছে। ব্যাধি দৈন্য অভাব অবজ্ঞা কিছুকেই মানুষের আকাঙ্ক্ষা অপ্রতিহার্য মনে করিয়া হাল ছাড়িয়া বসিয়া নাই, কেবলই পরীক্ষার পর পরীক্ষা করিয়া চলিতেছে।...

এই দুঃসাহসের মধ্যে একটা প্রবল অবিবেচনা আছে। আজ যাহারা আকাশযানে উড়িতে উড়িতে আকাশ হইতে পড়িয়া চুরমার হইয়া মরিতেছে, তাহাদের মধ্যে সেই দুরন্ত অবিবেচনা কাজ করিতেছে। সেই দুর্ধর্ষ অবিবেচনার উত্তেজনাতেই আজও মানুষ তুষারদৈত্যের পাহারা এড়াইয়া কখনো উত্তরমেরু কখনো দক্ষিণমেরুতে কেবলমাত্র দিগ্বিজয় করিবার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছে। এমনি করিয়া যাহারা নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়া তাহারাই লক্ষ্মীকে দুর্গম অন্তঃপুর হইতে হরণ করিয়া আনিয়াছে।...ইহারা দুঃখ পায়, দুঃখ দেয়, মানুষকে অস্থির করিয়া তোলে এবং মরিবার বেলায় ইহারাই মরে। কিন্তু বাঁচিবার পথ ইহারাই বাহির করিয়া দেয়।...তারুণ্যের জয় হউক। তাহার পায়ের তলায় জঞ্জল মরিয়া থাক, জঞ্জাল সরিয়া থাক, কাঁটা দলিয়া

থাক, পথ খোলসা হোক, তাহার অবিবেচনার উদ্ধত বেগে অসাধ্য সাধন হইতে থাক"।

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হইল, কিন্তু স্পষ্টতই ইহারই সুরে নজরুলের জীবন-বন্দনা কবিতাটি বাঁধা। ইহার সহিত রবীন্দ্রনাথের বলাকার প্রথম কবিতা 'ওরে নবীন ওরে আমার কাঁচা' মিলাইয়া পড়িলেই দেখা যাইবে, জীবন-বন্দনা রবীন্দ্রনাথই শুরু করিয়াছিলেন, নজরুল তাহাকে আপন ভাষায় ও ছন্দে রূপান্তরিত করিয়াছেন মাত্র। রবীন্দ্রনাথের রচনায় মহাকবির স্বভাবসুলভ একটি দর্শন আছে, একটি গভীরতত্ত্ব আছে ; নজরুল তাঁহার ব্যক্তিচিত্তের স্বাভাবিক অনুভবকেই কাব্যায়িত করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু বক্তব্য উভয়ই সমান এবং সে বক্তব্য সাধারণভাবে জীবনের তারুণ্যের বন্দনা। এই প্রমত্ত জীবনের বন্দনা নজরুলের কাব্যের বৃহত্তর অংশ জুড়িয়া আছে। প্রসঙ্গত 'দেখব এবার জগৎটাকে' কবিতাটি দ্রষ্টব্য।

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল

রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ

ধরণীর···ফরমান—অর্থাৎ পৃথিবীর মৃত্তিকায় যাহাদের নির্দেশে শস্য জন্মায়। **শ্রম-কিণাঙ্ক···ফুলে ফলে**—তাহারাই বিশ্বের সম্রাট, মৃৎপৃথিবী সভয়ে আপনার শস্য ফল ফুলের উপচার লইয়া তাহাদের শ্রম-সহিষ্ণু বজ্রকঠিন মূর্তির উপর অর্ঘ্য নিবেদন করে। **শ্রম-কিণাঙ্ক-কঠিন**—মেহনতের ঘর্ষণ-জনিত চিহ্নে যে বাহু সুদৃঢ়। **নজরানা**—রাজদর্শনের উপঢৌকন। **বন্য-শ্বাপদ···মনোহরা**—কোথাও ভয়াবহ বন্য হিংস্র প্রাণীতে পরিপূর্ণ অরণ্য, কোথাও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়শীল ভূমি, কোথাও ভয়ংকর মৃত্যুর শঙ্কায় চিহ্নিত এই পৃথিবী। কিন্তু শ্রমজীবী সৃজনব্রতী মানুষ সেই দুরন্ত প্রকৃতিকে পরাস্ত করিয়া তাহা মনুষ্যবাসের উপযোগী করিতেছে, রুক্ষভূমিকে পুষ্পসম্ভব করিতেছে। ইহা যেন দুর্বিনীত প্রজাকে বশীভূত করার মতই। **যারা বর্বর···বন্দী ভয়ে**—অর্থাৎ যে সকল হিংস্র পশুপ্রাণী একেবারেই পোষ মানে না, তাহাদের সহিত বসবাস করিতে যাহাদের বিন্দুমাত্র আশঙ্কা নাই। **এল দুর্জয়···বীত**—পৃথিবীর ভাগ্য পরিবর্তনের রূপকার মানব জীবনকে প্রশংসা করিতে গিয়া কবি বলিতেছেন, তাহাদের গতিবেগ বন্ধহীন দুর্দম্য : তাহারা কোনো বাঁধনে বাঁধা পড়ে নাই, কোনো ভয়ে ত্রস্ত হয় নাই : তাহারা

বিশ্বের চলমান জীবন-প্রবাহ, তাহারা যাযাবর মানব-সন্তান। বিশ্বের নিপীড়িতদের নিকট করুণার বাণী আনিয়াছিলেন যেমন মেরীমাতার পুত্র যীশুখ্রীস্ট, তেমনি তাহারাও বিশ্বমায়ের সন্তান, তাহারাও মানুষের কাছে মৈত্রীর প্রেমের সখ্যের সৌহার্দ্যের নূতন বাণী প্রচার করিতে আসিয়াছে। **যাহাদের চলা…অমিত বেগে**—পৃথিবী সৌরমণ্ডলে আপন কক্ষে আবর্তিত হইতেছে; কিন্তু কবির বিশ্বাস অপরিমিত যৌবনশক্তির অস্তিত্বেই সমগ্র বিশ্ব দ্রুত ধাবমান। অর্থাৎ পৃথিবীতে এই অস্থির জীবন-প্রবাহ না থাকিলে পৃথিবীর আবর্তনই স্তব্ধ হইয়া যাইত

খেয়াল-খুশিতে…চঞ্চল-মতি—ইতিহাসে একপ ঘটনার পুনঃপুন উল্লেখ আছে যে, বহু আরণ্যক অঞ্চল সু-বাসযোগ্য জনপদে পরিণত হইয়াছে। আবার কত কারণে বহু সুদৃশ্য নগরী ধ্বংস করা হইয়াছে, সেখানে ধীরে ধীরে অরণ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। কবি বলিতেছেন, ইহা সেই চিরঅস্থির দুরন্ত চঞ্চল মানবজীবনের খেয়াল মাত্র—সিসৃক্ষা ও জিঘাংসার লীলায়িত ছন্দে তাহাদের জীবন গ্রথিত। **নবীন-আবেগে…সিন্ধু-নীর**—এক আকুল অশান্ত জীবনাবেগ মানুষকে ক্রমাগত উদ্বুদ্ধ করিতেছে বলিয়াই সেই অনবরুদ্ধ প্রাণস্পন্দনে তাহারা দুরারোহ পর্বত শিখর জয় করিতে প্রণোদিত হইয়াছে, অকূল মহাসাগর শোষণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। অর্থাৎ মানুষের প্রাণাবেগ-স্ফুরিত গর্বোন্নত মস্তকের নিকট পর্বতশৃঙ্গের দুর্গমতা কিংবা অতলান্ত সমুদ্রের দুরবগাহত্ব সঙ্কুচিত হইয়াছে—ইহাই মানবসভ্যতার সারকথা। **নবীন-জগৎ… ঊর্ধ্বপানে**—ইতিহাসের কোন ধূসর প্রত্যুষ হইতে দেশ-দেশান্তরের মানুষের আকাঙ্ক্ষা অজানা রাজ্য আবিষ্কার করা—জ্ঞানের অগোচর, ধ্যানের অগম্য যে ভূমি, সেখানে আপনার বিজয়-পদচিহ্ন মুদ্রিত করা। এই উদ্দেশ্যে মানুষ দিগন্তক্রমী মেরুপ্রদেশে যাত্রা করিয়াছে। আকাশযান আবিষ্কার করিয়া মানুষ মহাশূন্যে পাড়ি দিয়াছে। বৈজ্ঞানিক শূন্যলোকের দুর্নিরীক্ষ্য গ্রহতারকার সন্ধান পাইয়াছে। সব মিলিয়া কেবল মানুষের জ্ঞানসাম্রাজ্যের সীমা বাড়িয়াই চলিয়াছে। **তবুও থামে না…অসীমাকাশে**—দুর্নিবার্য জ্ঞানতৃষ্ণায়, অপরিতৃপ্ত জীবনের আনন্দে ও অপরিমেয় যৌবনাবেগে মানুষ কেবল আকাশযান আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহার জিগীষা পৃথিবী ছাড়াইয়া অন্য লোকে গ্রহান্তরে ধাবিত হইয়াছে। এই শতকের

প্রথম হইতেই চন্দ্রলোক শুক্রগ্রহ মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের কৌতূহল আশাতীত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, যাহার পরিণতি এই দশকে মর্তপৃথিবীর অধিবাসী কর্তৃক মহাশূন্য-বিজয়—মনুষ্যরচিত মহাকাশ যানের মাধ্যাকর্ষণশূন্য মহাকাশে যাত্রা, গ্রহে গ্রহান্তরে বিজয়-অভিযান। কবি নজরুল এই পরবর্তী শূন্য-পুরাণের পরিচয় পান নাই, কিন্তু প্রতিভার পূর্বসংস্কারে তিনি মহাকাশ-বিজয়ের পূর্বাভাস দিয়াছেন। দ্রষ্টব্য, নজরুলের—

বল বীর—
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি
চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা ছাড়ি
ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া
খোদার আসন আরশ ছেদিয়া
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ববিধাত্রীর। (অগ্নিবীণা)

যারা জীবনের··· রেখে হারে—জীবন যাহাদের নিকট পণ্য মাত্র, মৃত্যু ক্রেতা—অর্থাৎ মৃত্যুর নিকট যাহারা কেবল জয়ের উল্লাসে অথবা যৌবনাবেগের মূল্যে প্রাণ বিকাইয়া দিতে প্রস্তুত, সংসারের শতবিধ প্রচণ্ড সংগ্রামের মধ্যে তাহারা নিছক উত্তেজনার বশবর্তী হইয়া ওক করিয়া প্রাণের উপর বাজি রাখে এবং অনায়াসে আত্মদান করে। অর্থাৎ পণ হারিয়া মৃত্যু বরণ করার মধ্যে গ্লানি তো নাই-ই, পরন্তু তাহাতেই যেন উল্লাস। **আমি নর কবি**—কবি আপনার ক্ষমতা ও প্রতিভার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন। আপনাকে যুগন্ধর মহাকবি বলিয়া পরিচয় দিবার কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁহার নাই : তিনি নশ্বর কবি। **গাহি সেই···গান**—মানব-জীবন অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের মত বিনাশহীন, তাহার অবিরাম চলার জন্য সমগ্র মানব সমাজকেই কবি যাযাবর, বেদে বেদুইন সম্প্রদায় বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। **বেদে-বেদুইন**—দুই ভিন্ন সম্প্রদায় হইলেও জীবন যাত্রার বন্ধনহীন সংস্কার-মুক্ত উদ্দামতার জন্য, আসক্তিহীন প্রমুক্ত জীবনাচারের জন্য মানুষের নিরুদ্দেশ দূরাভিযান ও সমতুল সংস্কারহীনতার স্বভাবের সহিত বেদে অথবা বেদুইন শব্দটি প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। তুলনীয়, মানসী কাব্যে রবীন্দ্রনাথের,

ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন
চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন।

ছুটেছে ঘোড়া উড়েছে বালি
জীবন-স্রোত আকাশে ঢালি
হৃদয়তলে বহ্নি জ্বালি চলেছি নিশিদিন। (দুরন্ত আশা)

যুগে যুগে···অভিযান—পৃথিবীতে নানাকালে নানা দেশে কত গণ-অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে, কত বিপ্লব বিদ্রোহ বিক্ষোভ সংঘটিত হইয়াছে। ইহাদের প্রতিটি উত্তেজনার অন্তরালেই কোনো না কোনো কারণ ছিল, কিন্তু বৃহত্তর মানব-ইতিহাসের সহিত যুক্ত করিয়া দেখিলে মনে হয় যেন কোনো দুর্জ্ঞেয় প্রমত্ততায় মানুষ অকারণে দেশে-দেশে কালে-কালে বিপ্লব বাধাইতেছে, অভ্যুত্থানের সৃষ্টি করিতেছে। **জীবনের···হানিল • বুকে**—জীবন কেবল দেহের সচলতা মাত্র নয়, জীবন একটি দুরন্ত অফুরন্ত শক্তিসঞ্চার যাহা আয়ুষ্কালকে অতিক্রম করিয়া যায়, যাহা দেহকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে, যাহা সমাজকে মাতাইয়া দেয়। সেই উপচীয়মান জীবনের বিভ্রান্ত নেশায় মানুষ সুখোন্মত্ত হইয়া স্বেচ্ছায় বিষপাত্র তুলিয়া ধরে আপনার ওষ্ঠে, মৃত্যু সম্পর্কে বেদনাবোধ-রহিত হইয়া আপন বক্ষকে অনায়াসে শেলবিদ্ধ করে। তাহাদের কথাই কবির উদ্দিষ্ট। তুলনীয়,

অন্ধকারে সূর্যালোকে সন্তরিয়া মৃত্যু স্রোতে
নৃত্যময় চিত্ত হতে মত্ত হাসি টুটে।
বিশ্ব-মাঝে মহান যাহা সঙ্গী পরাণের—
ঝঞ্ঝা-মাঝে ধায় সে প্রাণ সিন্ধু মাঝে লুটে। (মানসী)

আষাঢ়ের···মানিল না—অপ্রতিহত যৌবশক্তির রাজটীকায় ভূষিত জীবন নববর্ষাগমে পর্বত-উৎসারিত জলপ্রবাহের মত বাধাবন্ধহারা দুর্বার। **বর্বর···ক্ষুদ্রমনা**—সংসারে যাহারা গৃহবলিভুক্ নিরুদ্বিগ্ন সংকীর্ণচিত্ত, তাহাদের নিকট কবির বরণীয় এই অভিযাত্রী জীবন বর্বর অসভ্য ইত্যাদি বিশেষণে আপ্যায়িত হয়। **কূপমণ্ডুক···যারে**—বৃহত্তর জীবন যাহাদের কৌতূহলের সামগ্রী নয়, মহাবিশ্ব যাহাদের অজ্ঞাত, যাহারা অন্নজীবী স্তন্যপায়ী গার্হস্থ্য প্রাণী, তাহাদের কবি কূপমণ্ডুক বলিয়াছেন। এই সকল কূপমণ্ডুকের কাছে উদ্ধত যৌবন স্বভাবতই অসংযমী। এই ক্ষুদ্রমনা ও কূপমণ্ডুকের প্রতি বিদ্রূপ রবীন্দ্রনাথের দুরন্ত আশা কবিতাতে দ্রষ্টব্য,

ভদ্র মোরা শান্ত বড় পোষ-মানা এ প্রাণ
বোতাম-আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান।
দেখা হলেই মিষ্ট অতি মুখের ভাব শিষ্ট অতি
অলস দেহ ক্লান্ত গতি গৃহের প্রতি টান—
তৈলঢালা স্নিগ্ধ তনু নিদ্রারসে ভরা,
মাথায় ছোটো বহরে বড বাঙালী সন্তান। (মানসী)

ব্যাখ্যা

গাহি তাহাদের··· কুসুমিত মনোহরা।

আলোচনীয় পংক্তিগুচ্ছ চির-তারুণ্যব্রতী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবন-বন্দনা কবিতা হইতে উদ্ধৃত। যে কর্মজীবী মানুষের অনলস-উদ্যমে পৃথিবী নিত্যই ফলবতী ও শস্যসম্ভবা হইয়া উঠিতেছে, বর্তমান স্তবকাংশে কবি তাহাদের মহান্ জীবনের প্রতি অভিনন্দন সংগীত রচনা করিয়াছেন। পৃথিবীতে এতকাল দুইটি শ্রেণী ছিল—রাজা ও প্রজা। কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য-দৃষ্টিতে কবি বুঝিতে পারিয়াছেন পৃথিবীর যথার্থ শাসক শ্রমজীবী কর্মজীবী মানুষই। এই বৃহৎ মৃৎ-পৃথিবী যেন তাহার আজ্ঞাবহ প্রজা। পৃথিবী যে দিনে-রাত্রিতে তাহার ফসল উৎপন্ন করিতেছে, মানুষের আহার্য যোগাইতেছে, ইহা যেন সেই মানব-শাসকের কঠিন রাজাজ্ঞায়। তাহাদের মর্ত্যশাসনের বাহু ক্ষমাহীন নির্মম। কঠিন শ্রমের আঘাতে সেই বাহুতে সহিষ্ণুতার দাগ পড়িয়াছে। এই বাহু-প্রদত্ত শাসনের ভয়ে পৃথিবী সর্বদাই সন্ত্রস্ত ভীত হইয়া থাকে বলিয়াই সে তাহার ফলফুল শস্য-সম্পদ তুলিয়া দিতেছে এই প্রভু-মানবের বজ্রকঠিন মুষ্টিপূর্ণ করিয়া। ইহা যেন সম্রাটের প্রতি প্রজা-পৃথিবীর সম্ভ্রমা বনত উপচার। শ্রমতান্ত্রিক মানবের কঠোর শাসনের আর এক পরিচয় পাওয়া যায়, যখন দেখা যায়, তাহাদের নির্দেশে-অনুজ্ঞায়-শাসনে বন্যজন্তু সমাকীর্ণ অরণ্য কিংবা মনুষ্যবাসের অযোগ্য ভয়ংকর প্রকৃতি আপন রূপ পরিবর্তিত করিয়া মানুষের সুদৃশ্য উপনিবেশে পরিণত হইতেছে। হিংস্র পশুদের বিনাশ করিয়া মানুষ অরণ্যকে মনোমুগ্ধকর নগরী করিয়া তুলিয়াছে। জরাগ্রস্ত কর্কশ ভূমি চাষ করিয়া তাহাকে ফসলপূর্ণ করিতেছে : যে প্রকৃতি দুর্গম

দুর্বিনীত ও ভয়ংকর ছিল, তাহাও ক্রমে মনুষ্য অধ্যুষিত হইতেছে। মানব যদি সম্রাট না হয়, তবে কেমন করিয়া এই পরিবর্তন ঘটে? এই বিশ্বের প্রভু মানুষ—পৃথিবীর সকল প্রকার প্রতিকূলতাকেই সে প্রশমিত করিতে পারে ইহাই কবির বক্তব্য। তাই সেই বিশ্বকর্মা মানুষকেই কবি বন্দনা করিতেছেন, সে মানুষ শ্রমজীবী কৃষিজীবী কর্মজীবী, যাহারা উৎপাদনের হেতু, পৃথিবী-পৃষ্ঠের পরিবর্তনের কারুকৃৎ।

যারা বর্বর হেথা·· ···শূন্যে অমিত বেগে।

পরাধীন ভারতের দেশ-বিদ্রোহী কবি নজরুলের জীবন-বন্দনা কবিতা হইতে চয়িত আলোচ্য চরণগুলে মর্ত্যপৃথিবীর অভিযাত্রী, যৌবনাবেগ-স্পন্দিত চিরকালের মনুষ্য-জীবন কবির অনিন্দ্য প্রশস্তিতে ভূষিত হইয়াছে। কর্মব্রতী মানুষই বিশ্বের উপরকার পৃথিবী-পৃষ্ঠের ভাগ্যবিধাতা: তাহাদের বাহুনির্দেশেই ভূমি শস্যের উপচার পাঠাইয়া দিয়া থাকে, অরণ্য পুষ্পিত উপনিবেশ হয়। অমিত প্রাণশক্তি যে মানুষের জীবনে নিহিত, তাহারা বর্বরের মত হিংস্র প্রাণীর সহিত ঘর বাঁধিতে ভয় পায় না। এইভাবে পৃথিবীর ইতিহাসে দেখি শত শত মানুষ দুষ্প্রবেশ্য অরণ্যে, দুর্গম মরুভূমিতে, ভয়ংকর বন্য প্রাণীদের ভয়ে ভীত না হইয়া আপনার বাসের সীমানা নিত্য প্রবর্ধিত করিয়াছে। বনের ব্যাঘ্র, মরুভূমির সিংহ কিংবা গোপন গর্তের সর্প, এই তিন প্রাণী মানুষের নিকট সর্বাপেক্ষা ভীতিপ্রদ। কিন্তু মানুষ ইহাদের ভয়ে পলাইয়া আসে নাই, ইহাদেরও সে বশীভূত করিয়াছে, দমিত শাসিত বিতাড়িত করিয়াছে। এই মানব-জীবন বাঁধভাঙা বন্যার মত প্রাণশক্তিতে পূর্ণ, তাহারা কোথাও থামে না, কোথাও বাধা পায় না, কোনো সংস্কার তাহাদের কখনো সঙ্কুচিত করে নাই বলিয়া তাহাদের যাযাবর-সন্তান বলা যাইতে পারে। খ্রীস্টধর্মের প্রবর্তক যীশু খ্রীস্ট যেরূপ মেরীমাতার গর্ভে আবির্ভূত হইয়া পৃথিবীতে অহিংসা ও প্রেমের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, এই বিশ্বকর্মা মানুষও সেইরূপ ধরণীমাতার সন্তান—তাহাদেরও প্রচার্য প্রেম ও মৈত্রী: অখিল মানুষদের মধ্যে সৌভ্রাত্রবন্ধন স্থাপন করা। তাহারা চিরচঞ্চল। তাহাদের এই চাঞ্চল্য ও গতিবেগ লইয়াই পৃথিবী সূর্যমণ্ডলীতে উল্কার মত দ্রুতবেগে আবর্তিত হইতেছে। অর্থাৎ

তাহারা না থাকিলে পৃথিবীর নিজস্ব কক্ষাবর্তনও যেন স্তব্ধ হইয়া যাইত, ইহাই কবির বক্তব্য।

খেয়াল-খুশিতে ·····স্বর্গে অসীমাকাশে।

[রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]

যারা জীবনের·· ···বর্শা হানিল বুকে।

বক্ষ্যমাণ পংক্তিনিচয় 'বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবন-বন্দনা কবিতা হইতে সংকলিত। এখানে কবি চিরকালের অভিযাত্রী মানব-জীবনের অপ্রতিহত জয়যাত্রার বন্দনা-গান গাহিতেছেন। দুর্দম যৌবনের অমিত পরাক্রমে উদ্বুদ্ধ, ভাঙাগড়ার খেলায় লীলায়িত, বিশ্বজয়ের দুরন্ত দুঃসাহসে উন্নতশির যে মানব-জীবন মৃত্যুকে আপনার চরণের বশীভূত ভৃত্য করিতে মুহূর্তমাত্র ইতস্তত করে না, তাহারাই আজ কবির প্রশস্তি হরণ করিয়াছে। প্রাণধারণ তাহাদের নিকট দুর্লভ নয়—জীবন তাহাদের নিকট পণ্য মাত্র। মৃত্যু যখনই তাহাদের নিকট এই জীবন-ক্রয়ের আহ্বান জানায়, তখনই তাহারা অবলীলায় মৃত্যুর নিকট জীবন বিক্রয় করিয়া দিতে জানে। কেবল চিত্তের বলিষ্ঠ আনন্দই এই ত্যাগের মূল্যস্বরূপ তাহারা গ্রহণ করে। সংসারের বহুপ্রকার ভয়াবহ যুদ্ধক্ষেত্রে তাহারা জীবন পণ রাখে, আর স্বচ্ছন্দে পণ হারিবার জন্যই যেন তাহারা আত্মদান করে। তাহারা ধর্মহীন সংস্কারহীন আসক্তিহীন বন্ধনহীন মানুষ। মানব সংসারে এমন বহু, একদল সম্প্রদায় আছে যাহারা সংস্কারমুক্ত যাযাবর, দেশ-দেশান্তরে অস্থায়ী বাসা বাঁধিয়া অকারণে ঘুরিয়া বেড়ায়। মরুপ্রদেশের বেদুঈন-সম্প্রদায়ও এইরূপ বন্ধনহীন আচার-বহির্ভূত উদ্দাম জীবন যাপন করে। কবির বন্দিত এই যৌবশক্তিসম্পন্ন মানব-জাতিও বেদে-বেদুঈনদের মত। তাহারাই অকারণে যুগে যুগে দেশে দেশে গণ-অভ্যুত্থান জাগাইয়া তোলে, প্রচলিত শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তাহারা কী এক উপচয়িত জীবনের আকুল আনন্দে আত্মহারা হইয়া বিনা প্রয়োজনে বিষের পাত্র আপন ওষ্ঠে তুলিয়া ধরে, অকারণ পুলকে মৃত্যুবরণ করে, আপনার কঠিন বক্ষে কঠিনতর শেলাঘাত অক্লেশে গ্রহণ করে। সেই অশান্ত প্রমত্ত মানব-জীবনের প্রতি এই নশ্বর-জগতের সামান্য কবিকণ্ঠ অভিনন্দনে অধীর হইয়াছে।

আষাঢ়ের গিরি-নিঃস্রাব……বন্দনা করি তারে।

[রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]

প্রশ্ন ১। জীবন-বন্দনা কবিতায় কবি কাজী নজরুল ইসলাম যে জীবনের বন্দনা করিয়াছেন, তাহার পরিচয় দিয়া কবিতাটির বক্তব্য-বস্তু আলোচনা কর।

যুগে যুগে যৌবশক্তিই স্থবির রক্ষণশীল চিন্তাধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া নূতন প্রাণের জয় সূচনা করে। অচল অভ্যস্ত জীবনের বিরুদ্ধে তাহারা অমিত প্রাণের অক্ষয় উৎসাহে সংগ্রাম ঘোষণা করে, তাঁহাদের শ্রমে, তাহাদের অবিবেচক তারুণ্যের দুরন্ত প্রবাহে, তাহাদের দুর্ধর্ষ চিত্তের নিঃশঙ্ক অভিযানে পৃথিবীর কল্যাণের রাজপথ দূর দিগন্তে বিস্তৃত হয়। প্রকৃতি তাহার দুঃসহ দুরধিগম্যতা তাহাদের দৃপ্ত পদতলে সঙ্কুচিত করে। হিমগিরি তাহাদের সঙ্কল্পের চরণে আপন দুর্গমতাকে আনত করিয়া দেয়। বিদ্রোহী যৌবনের রাজটীকা মৃত্যুর দক্ষিণ হস্তকে পরাভূত করে। সেই অপরাহত যৌবনের, সেই প্রগল্‌ভ জীবনের কাব্যবন্দনা রচনা করিয়াছেন রবীন্দ্রোত্তর যুগের বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁহার জীবন-বন্দনা কবিতায়।

যাহাদের কর্মে ও ঘর্মে, পরিশ্রমে ও সংগ্রামে পৃথিবীর বুকে ফসল উৎপন্ন হইতেছে, যাহাদের কঠিন-নির্মম মুষ্টিতে ধরিত্রী ফলফুল ভরিয়া দিতেছে, এতকাল তাহাদেরই জীবন ছিল অপাংক্তেয়, তাহারা ছিল সকল দৃষ্টির নেপথ্যে। অথচ তাহারাই জীবনের সবকালের অগ্রযোদ্ধা—তাহাদের দর্পিত শাসনে আরণ্যক জীবন মনুষ্যবাসের উপযোগী হইয়াছে। তাহারা নির্ভীক্ বলিষ্ঠ—বন্য পশুপ্রাণীর সহিত বসবাস করা তাহাদের অনায়াস-সাধ্য। তাহাদেরই গতির আবেগে পৃথিবী নবসৃষ্টির পথে ঘূর্ণ্যমান বলিয়া, তাহাদেরই নিত্য চলমানতার সংগীতে বিশ্ব মুখর বলিয়া কবি তাহাদেরই জীবন-বন্দনার দায়িত্ব লইয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে যৌবশক্তিই বিশ্বের কারিগর; তাহাদেরই মেহনতে কত দুর্গম অরণ্য সুদৃশ্য জনপদে পরিণত হইয়াছে। তাহারা নিত্য-চঞ্চল অস্থির প্রমত্ত বলিয়া তাহারা সৃষ্টি করে, তাহারাই ধ্বংসেরও দূত। অনিরুদ্ধ প্রাণের দুরন্ত উৎসাহে তাহারাই দুরারোহ পর্বতচূড়া জয় করিতে যায়, তাহারা দুরবগাহ

সমুদ্র নিঃশেষে পান করিতে চায়, দুস্তর মরু জয় করিয়া নূতন ভূখণ্ড আবিষ্কার করিতে যায়। তাহাদের অফুরন্ত যৌবনবেগ মৃত্তিকায় বন্ধন অতিক্রম করিয়া গ্রহে গ্রহান্তরে ধাবিত করাইতেছে, অসীম আকাশে নির্ভয়ে ভ্রাম্যমান করিতে প্রণোদিত করিতেছে। মৃত্যুর মুখে পদাঘাত করিয়া তাহারা জীবন-পসারী। সেই মৃত্যুঞ্জয় যাযাবরদের জীবন-বন্দনা গাহিতেছেন নর-জগতের কবি। তাহারাই ইতিহাসে যুগে যুগে বিপ্লব সংঘটিত করে। জীবনের উগ্র অতৃপ্ত ক্ষুধায় তাহারা অকারণে প্রাণ বিসর্জন দিতে জানে, আঘাত বুক পাতিয়া গ্রহণ করে। বর্ষার কূলপ্লাবী জলধারার মত যাহারা দুর্বার, সুখস্পৃহ নিরুদ্বিগ্নের চোখে যাহারা বর্বর, আদিম কূপমণ্ডূকের নিকট যাহারা উদ্ধত অসংযমী—আলোচ্য কবিতায় কবি তাহাদের নামে জয়-সংগীত নিবেদিত করিয়াছেন।

প্রশ্ন ২। কাজী নজরুল ইসলামকে বিদ্রোহী কবি বলা হয় কেন? তাঁহার কবিধর্মের যে বৈশিষ্ট্য জীবন-বন্দনা কবিতায় পাওয়া যায় তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া কবিতাটির নামকরণের তাৎপর্য বিচার কর।

[ভূমিকা ও আলোচনা দ্রষ্টব্য]

সাধারণ প্রশ্নমালা ও উত্তর

তুলনামূলক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ১। প্রেমের তুলনা ও ভাবোল্লাস কবিতাদ্বয় অবলম্বনে বৈষ্ণবীয় প্রেমের কবি হিসাবে দ্বিজ চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কবি-ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা কর।

উত্তর। [বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিধর্মের তুলনামূলক আলোচনার জন্য মাধুকরী-মঞ্জুষার ৭০—৮২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ইহার সহিত নিম্নলিখিত অংশ যোগ করিতে হইবে]

প্রেমের তুলনা ও ভাবোল্লাস পদ দুইটি বৈষ্ণব পদসাহিত্যের দুই শ্রেষ্ঠ কবির রচনা। প্রেমের তুলনা কবিতাটি অনুরাগ পর্যায়ের, বৈষ্ণব কাব্যে ইহার নাম প্রেমবৈচিত্ত্য আর বিদ্যাপতির পদটি ভাবসম্মিলন পর্যায়ের। প্রাক্‌চৈতন্য যুগের কবি হিসাবে চণ্ডীদাস অথবা বিদ্যাপতি উভয়ের কেহই পরবর্তী পদাবলীর এই রসপর্যায়সূত্র জানিতেন না, তথাপি প্রতিভার পূর্ব-সংস্কারে তাঁহারা এই দুই পর্যায়ের স্বরূপটি স্পষ্টভাবে নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন। চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতি উভয়েরই পদের বিষয় প্রেম এবং এই প্রেম রাধাকৃষ্ণ প্রেম। 'মানুষ এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে'—মানুষ এমন প্রেমের কথা কোথাও শুনে নাই, এইরূপ মন্তব্যের দ্বারা সর্বমানব সংসারে এই প্রেমের অতুলনীয়ত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন দ্বিজ চণ্ডীদাস। অথচ স্বভাবগুণে ইহা অলৌকিক হইয়া উঠে নাই, নিতান্ত মনুষ্যসুলভ বৈশিষ্ট্যেই চিহ্নিত। রাধা এবং কৃষ্ণের পারস্পরিক আকর্ষণ জগতের প্রতিটি প্রেমিক সম্পর্কের তুলনায় আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছে—ইহাদের অবিচ্ছিন্নতার সহিত কবি প্রাকৃত জগতের কোনো উদাহরণ খুঁজিয়া না পাইয়া হতবাক্ হইয়াছেন। চণ্ডীদাসের এই পদটি তাই একই সঙ্গে মানবিক প্রেম ও ঐশ্বরিক প্রেমের সংজ্ঞা হইয়া উঠিয়াছে। যে প্রেম ক্ষণবিচ্ছেদ-কাতর, যে প্রেম পরস্পরের তিলার্ধ অদর্শন সহ্য করিতে পারে না, যে প্রেম গভীর উষ্ণ হৃদয়-সান্নিধ্যের মধ্যেও বিচ্ছেদ অনুভব করে, সেই প্রেম নরজন্মের পক্ষে আদর্শ-স্বরূপ, ইহাও

যেমন সত্য—তেমনি এই অভাবনীয় অনুরাগের পাত্রপাত্রী যে পরম প্রেমময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহারই নিত্যপ্রিয়া প্রেমিকা-শিরোমণি শ্রীরাধা, ইহাও কবিতাটির মধ্য দিয়া নিঃসংশয় ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে।

পক্ষান্তরে বিদ্যাপতির পদটি অপেক্ষাকৃত মানবিক ভাবাবেগের পরিচায়ক। দীর্ঘকালের অদর্শনের পর প্রেমিক ও প্রেমিকার সাক্ষাৎকারের মধ্যে যে নিবিড় বেদনামিশ্রিত আনন্দপুলক সঞ্চারিত হয়, তাহার এমন বাস্তব অভিজ্ঞতা-লব্ধ অনুভূতি-প্রকাশ পদাবলী সাহিত্যে দুর্লভ। বিরহের অগ্নিতাপে প্রেম যেন আরও কনককান্তি লাভ করিয়াছে, আরও হেমোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এখানেও নায়ক-নায়িকা রাধাকৃষ্ণ, কিন্তু তাহাদের নিত্য-অবিভাজ্যতা বিনাসত্তে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সাধারণ মানব-মানবীর মতই দুঃখের পরীক্ষায় তাহা ক্রমশ আপনার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে। এখন 'চিরদিন মাধব মন্দির মোর' এই আনন্দবাচক প্রতিজ্ঞার সার্থকতা সদ্য-অতিক্রান্ত দীর্ঘ বিচ্ছেদের মূল্যেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। মোটের উপর, চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতি উভয়ের পদেই প্রেমকে মানব-জীবনের সহিত নিঃসম্পর্কিত কোনো অপ্রাকৃত অভিজ্ঞতারূপে দেখা হয় নাই। লোকায়ত জীবনের অনুরাগকেই তাঁহারা ঊর্ধ্বায়িত করিয়া বৈষ্ণবীয় বিশ্বাসে পরিণত করিয়াছেন।

প্রশ্ন ২। বৈষ্ণব গীতিকবিতার বিষয়বস্তু এক হইলেও প্রেমের প্রকাশভঙ্গি ও কাব্যরীতির দিক দিয়া কবিদের মধ্যে প্রচুর স্বাতন্ত্র্য আছে। পঠিত বৈষ্ণব গীতি-কবিতাগুলি অবলম্বনে ইহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

উত্তর। বৈষ্ণব গীতিকবিতার বিষয়বস্তু প্রেম, এবং এই প্রেমের আধার শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা। বৈষ্ণব গীতিকবিগণ মধুর উজ্জ্বল শৃঙ্গাররসকেই শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন, ঈশ্বরকে মধুরভাবে ভজনা করাই তাঁহাদের সাধনা। এই প্রেম-বিষয়ক কবিতার পর্যায়ে পড়ে দ্বিজ চণ্ডীদাসের প্রেমের তুলনা, বিদ্যাপতির ভাবোল্লাস, জ্ঞানদাসের অভাগিনীর আক্ষেপ এবং রায়শেখরের বর্ষাবিরহ। এই চারটি কবিতার মধ্যে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস চৈতন্যপূর্ব যুগের এবং জ্ঞানদাস ও রায়শেখর অর্বাক্-চৈতন্যযুগের। অর্থাৎ প্রথমোক্ত কবিদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যক্ষভাবে বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের সহিত যুক্ত ছিল না, আর জ্ঞানদাস রায়-

শেখর উত্তরকালের কবি বলিয়া তাঁহাদের কবিতার বিষয়বস্তু সম্পূর্ণভাবে রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব অর্থাৎ বৈষ্ণব দার্শনিক তত্ত্ব। তৎসত্ত্বেও তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য নিম্নলিখিত তথ্য হইতে বুঝা যাইবে।

বিদ্যাপতি মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, তাঁহার কবিতায় ভাব ভাষা ও ছন্দের এমন একটি গাঢ়বদ্ধতা আছে যাহা অন্য কোনো কবির মধ্যে পাওয়া যাইবে না। দীর্ঘ বিরহের পর প্রেমিকের আগমন বিচ্ছেদকাতর রমণীর চিত্তে যে প্রচণ্ড মিলনোল্লাস সৃষ্টি করিয়াছে, তিনি হৃদয়ের নিপুণ ভাষায় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং এই কবিতায় প্রেমের আনন্দকেই কবি ভাষা দিয়াছেন। সাধারণত বলা হইয়া থাকে, বিদ্যাপতি সুখের কথায় বড়, তিনি মিলনের উল্লাসের সংগীতকার, অন্তত ভাবোল্লাস পদটি তাহারই প্রমাণ।

দ্বিজ চণ্ডীদাস প্রাক্‌চৈতন্যযুগের কবি হইলে প্রেম সম্পর্কে তাঁহার একটি নির্দিষ্ট দার্শনিক বিশ্বাস ছিল। যথার্থ প্রেম পৃথিবীর কোনো প্রাকৃত প্রেম-সম্পর্কের সহিতই তুলনীয় নয়। সকল প্রেম-সম্পর্কের মধ্যেই কোনো ত্রুটি আছে, একপক্ষের কোনো অনিবার্য স্খলনহেতু সেই সকল প্রেম নিত্য-প্রেমের উজ্জ্বলতম উদাহরণ হইয়া উঠে না। একমাত্র রাধাকৃষ্ণ প্রেমই ইহাদের ব্যতিক্রম, রাধাকৃষ্ণ প্রেম জগতে শাশ্বত অবিচ্ছিন্নতার এক আশ্চর্য দৃষ্টান্ত বলিয়া কবির বিশ্বাস। রাধাকৃষ্ণ প্রেমের এই নিত্যসম্পর্ক-নিরূপণের সহিত পরবর্তী বৈষ্ণব দার্শনিকের ধর্মবিষয়ক তত্ত্বের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। বিদ্যাপতির তুলনায় চণ্ডীদাসের পদটি ভাষার দিক দিয়া গাঢ়বদ্ধ নয়। ইহার প্রাকৃত সাধারণত্ব, অলংকার-প্রয়োগের গতানুগতিকতা সত্ত্বেও কবিতাটি যে উৎকৃষ্ট হইয়াছে তাহা কবির প্রেম-সম্পর্কে এক দৃঢ় ও নিবিড় বিশ্বাসের জন্যই। 'দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া' এই অসাধারণ পংক্তিটির অন্তর্ভুক্তি পদটিকে নিত্যস্মরণীয় করিয়া তুলিয়াছে।

চৈতন্যোত্তর যুগের কবি জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য বলিয়া তাঁহার রচনায় এমন একটি আন্তরিক হৃদয়াবেগ আছে, তত্ত্বসম্পর্কে এমন একটি নিরাসক্তি আছে, যাহা তাঁহার কবিতাকে গভীর মর্মগ্রাহী করিয়া তোলে। জ্ঞানদাসের পদে একটি সরল প্রেমমুগ্ধ রমণীর নিত্য অন্তর্জ্বালা, অনুরাগের সহিত অবিনাভাবে যুক্ত প্রচণ্ড আক্ষেপ অনুতাপ ও বিষণ্ণতা আছে।

চণ্ডীদাসের প্রেমিকা যেমন নিত্য মিলনের অনুভূতির মধ্যেও বিচ্ছেদের আশঙ্কা অনুভব করিয়া কম্পিত-দেহ হইয়াছেন, তেমনি জ্ঞানদাসের রাধাও প্রেমের সহিত প্রাপ্ত অসহ্য তৃষ্ণা ও দাহ লইয়া আত্মহারা হইয়াছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে প্রেম নায়িকার প্রতিটি প্রত্যাশার সহিতই আশাভঙ্গের ব্যর্থতা ও দুঃসহ বৈপরীত্য সৃষ্টি করে, সে প্রেম যে অনন্যসাধারণ প্রেম, তাহার অধিকারী যে সাধারণ মানবমানবী হইতে পারে না, ইহাও জ্ঞানদাসের অভাগিনীর আক্ষেপ কবিতায় গোপন থাকে না। এইজন্যই জ্ঞানদাসের পদে চৈতন্যোত্তর যুগের তত্ত্ববাদপ্রবণতার সন্ধান পাওয়া যায়। প্রচলিত অলংকার শাস্ত্রের দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রেমের সর্বাতিশায়ী মহত্ত্ব-প্রতিষ্ঠার অনায়াস ভঙ্গিটি জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের নিকট হইতে লাভ করিয়াছেন।

রায়শেখরের পদটি ঐতিহাসিক দিক হইতে সন্দিগ্ধ হইলেও চৈতন্যোত্তর যুগের রায়শেখর নামক কবি-রচিত বলিয়াই ইহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। বিদ্যাপতি পদের বিষয়বস্তু প্রেমের আনন্দ, বিরহোত্তর মিলনোল্লাস। চণ্ডীদাসের পদের বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের অনন্যতা কিন্তু ইহাও মিলন-পর্যায়ের। জ্ঞানদাসের পদের বিষয়বস্তু কৃষ্ণপ্রেমের অসাধারণত্বে রাধিকার অসহনীয় অবস্থার বর্ণনা। ইহাও মিলনের পদই, কারণ মিলনের অসহ্য আনন্দ হইতেই এই আক্ষেপ ও অতৃপ্তির সৃষ্টি হয়। রায়শেখরের পদের বিষয়বস্তুও বিরহ। প্রকৃতির পটে মানবজীবনের এইরূপ বেদনার্ত চিত্র বৈষ্ণব পদাবলীতে বিরল। এখানেও রাধাকৃষ্ণ যেন তত্ত্বের প্রতীক নন। সাধারণ মানব-মানবীরূপেই তাঁহাদের মূল্য। নিবিড় বর্ষণমুখর রাত্রিতে হৃদয়ের অন্তরঙ্গ ব্যক্তি যদি দূরপ্রবাসে বাস করেন, তবে গৃহচারিণী প্রেমিকার মনে প্রকৃতির ধ্বনি ও প্রাণীর সহিত মিলিয়া যে অসহায় দুঃখের বিলাপ সৃষ্টি হয় কবি তাহাই বাণীবদ্ধ করিয়াছেন। এই দিক দিয়া আলোচ্য কবিতাটি সর্বাধিক আধুনিক রোমান্টিক কবিতার লক্ষণাক্রান্ত।

কাব্যরীতির দিক দিয়া বিদ্যাপতির পদে পরিচ্ছন্ন শিল্পগুণ আছে, কিন্তু চণ্ডীদাসের পদে তাহা নাই। পদটি মিলনোল্লসিত রাধার উক্তি। বহুদিনের বিরহের পর নায়িকার সকল মর্মযাতনার অবসান ঘটাইয়া নায়কের আগমনে নায়িকার আনন্দ উদ্বেল হইয়াছে, অথচ সেই সহর্ষ-আনন্দের প্রকাশভঙ্গী কূলপ্লাবী হইয়া উঠে নাই। মাত্র সংক্ষিপ্ত দুইটি চরণে তাঁহার বিরহের

যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা অনুরূপ কোনো সম্ভাব্য অদর্শনের পুনরুক্তি না ঘটার ব্যাপারে নিশ্চিত বিশ্বাস ও প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছে –

আঁচল ভরিয়া যদি মহানিধি পাও।
তবু হাম দূরদেশে পিয়া না পাঠাও॥

চণ্ডীদাসের পদটি পয়ার ছন্দে রচিত, ব্যতিরেক অলংকারের সাহায্যে তিনি তাঁহার কাব্যবস্তু নির্মাণ করিয়াছেন। নৈসর্গিক প্রেমের কতকগুলি প্রথাগত দৃষ্টান্ত বা কবিপ্রসিদ্ধির সহিত তুলনাসূত্রে তিনি রাধাকৃষ্ণ প্রেমের অতুলনীয়ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইঁহার ভাষার মধ্যে একটি সরলতা আছে, কিন্তু তাহা যুক্তিমূলক বলিয়া অনায়াসে পাঠকের প্রতীতি উৎপাদন করে। এই যুক্তি বা উদাহরণের ভঙ্গিটি জ্ঞানদাসের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। তিনিও কতকগুলি দৃষ্টান্ত সন্নিবেশ করিয়া রাধার প্রেমের অন্তর্বেদনা ও যন্ত্রণাক্ত অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করিয়াছেন। রায়শেখর ভাষা ও ছন্দের দিক দিয়া বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য, তাঁহার পদটি ব্রজবুলিতে রচিত। কোনো অলংকার ব্যবহার না কেবল কতগুলি বর্ষা-বর্ণনার বাস্তব তথ্যের মধ্য দিয়া একটি গভীর বেদনা ঝঙ্কৃত করা উচ্চাঙ্গের কবিত্ব-শক্তির পরিচায়ক।

[ইহার সহিত বিস্তারিত আলোচনার জন্য সংশ্লিষ্ট কবিতাগুলির ভূমিকা ও আলোচনা অবশ্যই পঠনীয়।]

প্রশ্ন ৩। বাসুদেব ঘোষের শচী-মার বিলাপ পদের পরোক্ষ বিষয়বস্তু গৌরাঙ্গদেব, আর গোবিন্দদাসের কবিতার বিষয়ও শ্রীগৌরাঙ্গ। কিন্তু দুইটি কবিতা ভিন্ন প্রকৃতির। এই দুই কবিতার তুলনামূলক আলোচনা কর।

উত্তর। বৈষ্ণব পদাবলীর ঐতিহ্য প্রাচীন হইলেও পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ও বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের পর বৈষ্ণব পদাবলীর জনপ্রিয়তা অসাধারণ বৃদ্ধি পায়। শ্রীচৈতন্যদেবের অলৌকিক ভাববিদ্ধ পবিত্র জীবন তাঁহার সহচর শিষ্য ভক্ত ও পার্ষদদের অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, আপন জীবনের পরম রমণীয় মাধুরীকণা বর্ষণ করিয়া তিনি তাঁহার চতুর্দিকের মানুষকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। সেই অনুপ্রেরণা, সেই বিস্ময় আপনার মধ্যে সীমাবদ্ধ

থাকে নাই। গৌরাঙ্গদেবের জীবনের ঘটনাবলী এমন আশ্চর্যজনক, এমনই করুণার উৎস ছিল যে, পাষাণ হৃদয় পর্যন্ত দ্রবীভূত হইয়া গিয়াছিল। সেই বিগলিত বিস্ময়কে তাঁহারা ভাষায় ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহাদের জীবৎকালের স্মরণীয় অভিজ্ঞতাকে তাঁহারা নিত্যকালের কণ্ঠে প্রচারিত করিবার মহৎ দায়িত্ব লইলেন। এইভাবেই বৈষ্ণব কবিতায় একটি নূতন বিষয়বস্তুর আবির্ভাব ঘটিল, তাহা গৌরাঙ্গপ্রসঙ্গ।

এই গৌরাঙ্গপ্রসঙ্গ হইল প্রধানতঃ দুই প্রকার—সমগ্র জীবনাশ্রিত দীর্ঘ আখ্যান অথবা খণ্ড স্মৃতিমূলক গীতিকবিতা। কোনো কোনো ভক্ত লিখিলেন চৈতন্যদেবের জন্মমৃত্যুর বিবরণ সংবলিত জীবনলীলাকাহিনী, অথবা তাঁহার সুদীর্ঘ ভ্রমণ ও ধর্মপ্রচারের, পর্যটন ও ভক্তিবিহ্বলতার ইতিবৃত্ত। আবার কেহ লিখিলেন, কেমন ভাবে তিনি বিভোর হইয়া রাধার মত অচৈতন্য হইতেন, কেমন করিয়া কেবল কৃষ্ণনাম শুনিয়া তিনি পাপীর চরণ জড়াইয়া ধরিতেন, এই সকল ছোটখাট ঘটনা বা ভাবের চিত্র। ক্রমশ চৈতন্যদেবের জীবন-বিষয়ক খণ্ডখণ্ড কবিতাগুলি দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত দেখা গেল। কতকগুলি কবিতা তাঁহার জীবন-সংক্রান্ত ঐতিহাসিক তথ্যাশ্রয়ী কিন্তু আকার-আয়তনে ক্ষুদ্র খণ্ড কবিতা বা গীতিকবিতা ধর্মী। এইগুলি যেন চৈতন্যজীবনীরই খণ্ড খণ্ড সংস্করণ। ইহাদের মধ্যে চৈতন্যদেবের জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রত্যক্ষদর্শীর বহু মূল্যবান ঐতিহাসিক সত্যমূলক অভিজ্ঞতা ছড়ানো আছে। অনেকক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতাই ইহাদের কাব্যরস, নতুবা কবিত্বশক্তির দিক দিয়া ইহাদের সবগুলি উচ্চাঙ্গের নয়। কিন্তু যে কবিতাগুলি চৈতন্যদেবের ভাবজীবনের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত সেইগুলি ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভরশীল নয়, প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা অবলম্বন করিয়া ভক্ত কবিদের কল্পনার সৃষ্টি। ভক্তের বিশ্বাসে চৈতন্যদেব ছিলেন রাধাবতার, তাঁহার সকল ভাগবৎ উৎকণ্ঠা, বিলাপ-ব্যাকুলতা, মূর্চ্ছা-উদ্বেগ ভক্তের দৃষ্টিতে ছিল পদাবলীর রাধার সহিত অভিন্ন। এইজন্য তাঁহারা রাধার প্রেমের সূক্ষ্ম পর্যায় ও বিষয়ভেদ অনুসরণ করিয়া গৌরাঙ্গদেবের দিব্য জীবনের পরিকল্পনা করিয়াছেন। এই জাতীয় পদকেই গৌরাঙ্গচন্দ্রিকা বলা হয়। গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পঠিত কবিতাবলীর মধ্যে বাসুদেব ঘোষের শচী-মার বিলাপ পদটি প্রথম জাতীয় অর্থাৎ চৈতন্যদেবের জীবনের কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা

অবলম্বনে রচিত প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। দ্বিতীয় পদটি চৈতন্যদেবের ভাব-জীবনের স্মৃতি অবলম্বনে রচিত গৌরচন্দ্রিকা।

[বাকি আলোচনা অর্থাৎ পদদ্বয়ের বিশ্লেষণ উক্ত কবিতা দুইটির ভূমিকা ও আলোচনা হইতে লিখিতে হইবে।]

প্রশ্ন ৪। মঙ্গলকাব্যের কবিরূপে খুল্লনার বারমাসী কবিতার কবি দ্বিজ মাধবাচার্যের সহিত দেবসভায় বেহুলা কবিতার কবি কেতকাদাসের তুলনা কর।

উত্তর। [দুইটি কবিতার ভূমিকা অংশ অবলম্বনে প্রশ্নের প্রারম্ভিক উত্তর লিখিতে হইবে এবং তাহার পর নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটিকে সম্প্রসারিত করিতে হইবে]।

'খুল্লনার বারমাসী' চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবি দ্বিজ মাধবাচার্যের রচনা—চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ধনপতি শ্রীমন্ত উপাখ্যানের অন্তর্গত। দেবসভায় বেহুলা কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বিরচিত মনসামঙ্গল কাব্যের অঙ্গীভূত। দ্বিজ মাধব ষোড়শ শতাব্দীর কবি এবং কেতকাদাস সপ্তদশ শতাব্দীর কবি, সুতরাং অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগের কবি হিসাবে কেতকাদাসের রচনায় কিছু পরিমাণে পরিচ্ছন্নতর শিল্পরুচি কলাসংযম ও ভাষাঘটিত পারিপাট্য আছে। উভয় কবির উদ্ধৃত কাব্যাংশ নায়িকামূলক: দ্বিজ মাধব ধনপতি-কাহিনীর নায়িকা খুল্লনার মুখে তাঁহার স্বামীহীন জীবনের লাঞ্ছিত কয়েকটি দিনের ক্রন্দন-কাতর অভিজ্ঞতা ফুটাইয়াছেন। কেতকাদাস তাঁহার লখীন্দর বেহুলা-উপাখ্যানের কাব্যনায়িকা বেহুলার স্বর্গসভায় নৃত্যগীতের বর্ণনা দিয়াছেন। মঙ্গলকাব্যের নায়িকাদের পাতিব্রত্য সাধ্বীত্ব ও সহিষ্ণুতার বিস্তারিত বিবরণ দান করিতে কবিরা কখনও কৃপণতা করেন নাই। বস্তুত মঙ্গলকাব্য নায়িকাপ্রধান কাব্য, সতীত্ব ও স্বামীনিষ্ঠার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ নায়িকাদের আদর্শ মহিমা অশিক্ষিত নিরক্ষর সমাজে প্রচার করাই মঙ্গল-কাব্যের কবিদের মুখ্য সামাজিক দায়িত্ব ছিল বলিয়া মনে হয়। এই দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁহারা তাঁহাদের নায়িকাকে দিয়া বহু অসম্ভব সংঘটিত করিয়াছেন, রোমাঞ্চকর ব্যাপারে লিপ্ত করাইয়াছেন, কঠিনতম পরীক্ষায় অবতীর্ণ করাইয়াছেন, ভাগ্যের দুঃসহ দুঃখে ভাসাইয়া আবার তাঁহাদের ফিরাইয়া আনিয়াছেন। তবে এই ব্যাপারে, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের নায়িকার তুলনায় মনসামঙ্গল কাব্যের বেহুলার পরীক্ষাই

হইয়াছে কঠিনতম। মৃত স্বামী সঙ্গে লইয়া, দেবসভায় বিচারকমণ্ডলী দেবতাদের নিকট নৃত্যগীতের পরীক্ষা দিয়া, মনসার বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করিয়া বেহুলা যে চমৎকারিত্ব ও বিস্ময়সৃষ্টি করিয়াছে তাহা ঠিক মধ্যযুগীয় বঙ্গনারীর পক্ষে বিশ্বাসযোগ্য নয়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের নায়িকাগণ দারিদ্র্য ও সাংসারিক অনটন এবং বড়জোর সপত্নীর বিদ্বেষ সহ্য করিয়াই তাঁহাদের সহিষ্ণুতার পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণা হইয়াছেন। এই দিক দিয়া খুল্লনার বারমাসী অংশের খুল্লনা দ্বিজ মাধবের বর্ণনার মধ্য দিয়া যতখানি বাস্তব নারী, দেবসভায় বেহুলা অংশে কেতকাদাসের বেহুলা ততখানি বাস্তব নারী নয়। ইহা কেতকাদাসের ত্রুটি নয়, কাহিনীরই গঠনপ্রণালী এজন্য দায়ী। তৎসত্ত্বেও দ্বিজ মাধবের বর্ণনায় একটি গার্হস্থ্য চিত্র প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাহেতু এই চিত্র বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু কেতকাদাস যে স্বর্গসভার বিবরণ দিয়াছেন সে বিষয়ে তাঁহার কোনো অভিজ্ঞতা নাই বলিয়া চিত্রটি তথ্যচয়নে বিশ্বাস্য ও জীবন্ত হইয়া উঠে নাই।

প্রশ্ন ৫। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ উভয়েই অষ্টাদশ শতকের কবি—উভয় কবির রচনাতেই যুগসন্ধির চিহ্ন সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের হরিহোড়ের বৃত্তান্ত এবং রামপ্রসাদের প্রসাদী সংগীতগুলিতে এই যুগসন্ধির পরিচয় পাওয়া যায় কি? আলোচনা কর।

উত্তর। অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্য ইতিহাসে যুগসন্ধির সাহিত্য বলিয়া পরিচিত। এই যুগে পূর্বযুগের সাহিত্য-ধারাগুলি গতানুগতিক ও নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল এবং সমাজের আসন্ন রাজনৈতিক পরিবর্তনের আভাস সাহিত্যে ধীরে ধীরে প্রতিফলিত হইতেছিল। ষোড়শ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙলা দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন মোটামুটি মুসলমান শাসনে সুরক্ষিত ছিল, মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় নাই, হিন্দুমুসলমান সংস্কৃতি ঐক্যবদ্ধ ছিল। মানুষের ধর্মবিশ্বাস ও শিল্পচর্চা, সাহিত্য ও কলা-সাধনা তাই সংহত ছিল বলা যায়। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে সামাজিক জীবনের নিরাপত্তা যেমন বিঘ্নিত হইল, ধর্মবিষয়েও তেমনি শিথিলতা দেখা দিল। বিশ্বাসের বদলে সংশয়, অলৌকিকতার স্থানে বাস্তবতা, পারত্রিকতার বদলে ঐহিকতা,

অন্ধ সংস্কারের স্থানে বিদ্রূপাত্মক মনোভাব এই পর্বে কবিদের মধ্যে ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়াছে। মঙ্গলকাব্যের কবিরা কাব্যরচনার প্রথানুসরণ করিয়া মঙ্গলকাব্য লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই প্রাচীন বিশ্বাস অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। দেবতার প্রত্যাদেশ-দানের উপর তাঁহাদের আস্থা পূর্বের তুলনায় অনেক স্তিমিত হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের কাব্যে এই যুগলক্ষণের সর্বাধিক পরিচয় পাওয়া যায়।

অন্যদিকে এই যুগে গোষ্ঠীশাসন শিথিল হইয়া মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের জন্ম হইয়াছে। দেশের সর্বত্র অরাজকতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, মারী-মন্বন্তরে গ্রামগুলি শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, কেন্দ্রীয় শাসনের অব্যবস্থার সুযোগে স্থানীয় ভূস্বামী শাসকদের পীড়ন বৃদ্ধি পাইয়াছে, মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা বিপন্ন হইয়াছে। ধনীর সম্পত্তি ও বিত্তবানদের বিত্তরক্ষার ব্যাপারে দুর্ভাবনা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অসহায় রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অবস্থায় মানুষ এক নূতন ধর্মপ্রেরণা অনুভব করিয়াছে। পূর্বযুগের বৈষ্ণবধর্ম তাহার আলুলিত মাধুর্যবাদ, অতিরিক্ত বিনয়পরায়ণতা, বিগলিত প্রেমভক্তি লইয়া মানুষের বর্তমান সামাজিক প্রয়োজন মিটাইতে পারিল না। তাই একালের মানুষ নূতন করিয়া শক্তি সাধনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিল। মাধুর্যের বদলে ঐশ্বর্য ও শক্তির দেবতার আরাধনা করিতে শিখিল। দেবতার কাছে কেবল প্রেম নয়, বরাভয় ও বিপন্মুক্তির সাহস প্রার্থনা করিল। রামপ্রসাদের সংগীতের মধ্য দিয়াই এই নূতন ধর্মচেতনার সুস্পষ্ট আভাস লক্ষ্য করা যায়। পূর্বযুগের মঙ্গলকাব্যের দেবীরা নিজেদের মাহাত্ম্য-প্রচারের উৎকট স্বার্থে মানুষকে দুর্ভাগ্যের ক্রীড়নক করিয়া তুলিয়াছিলেন। দাম্ভিক আত্মবিশ্বাসে তাঁহারা অন্য ধর্মমত বা দেবতার উপাসনা সহ্য করিতে পারেন নাই। কিন্তু যে দেবতা সমগ্র বিশ্বের ত্রাতা ও বিধাতা, তাঁহার ঈর্ষাদ্বেষ, প্রতিহিংসাপরায়ণতা ও স্বার্থবুদ্ধি মানুষকে সন্দিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। তাই এই যুগের ভক্তের দৃষ্টিতে দেবতা হইয়াছেন সমগ্র বিশ্বের জননী, সৃষ্টির আদিকারণ, পরম মঙ্গলময়ী, সন্তানের প্রতি করুণারূপিণী। রামপ্রসাদের সংগীতে ভক্তিবাদের এই নূতন চেতনা প্রতিফলিত হইয়াছে। এইজন্য তিনিও যুগসন্ধির গীতকার।

[ইহার সহিত হরিহোড়ের বৃত্তান্ত এবং প্রসাদী সংগীতগুলির আলোচনা-অংশ সংক্ষেপে যোগ করিতে হইবে।]

অন্যান্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ৬। 'দ্বিজ চণ্ডীদাসের প্রেমের তুলনা কবিতাটি বৈষ্ণব পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইলেও কবিতাটির রোমাণ্টিক স্বভাব চণ্ডীদাসকে আধুনিক কবির লক্ষণে চিহ্নিত করিয়াছে'। এইরূপ মন্তব্য যুক্তিযুক্ত কিনা বিচার কর।

[প্রেমের তুলনা কবিতার আলোচনা দ্রষ্টব্য]।

প্রশ্ন ৭। ভাবসম্মিলন ও ভাবোল্লাস শব্দ দুইটির কোনো পৃথক অর্থ আছে কি? বিদ্যাপতির ভাবোল্লাস পদটিতে বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব অপেক্ষা মানবিক মিলনের আনন্দই সমধিক অভিব্যক্ত হইয়াছে, এই মন্তব্যের যুক্তিযুক্ততা বিচার কর।

উত্তর। [ভাবোল্লাস পদের ভূমিকাংশে ভাবোল্লাস-শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভাবোল্লাস ও ভাবসম্মিলনের তুলনামূলক আলোচনা করা হইয়াছে। ইহার সহিত আলোচনার শেষাংশ যোগ কর।]

প্রশ্ন ৮। আপেক্ষানুরাগ কাহাকে বলে? জ্ঞানদাসের অভাগিনীর আক্ষেপ কবিতাটিকে আক্ষেপানুরাগের অন্তর্ভুক্ত পদ বলিবার কারণ কী ব্যাখ্যা কর।

উত্তর। [অভাগিনী আক্ষেপ কবিতার ভূমিকা দ্রষ্টব্য।]

প্রশ্ন ৯। জ্ঞানদাসের অভাগিনীর আক্ষেপ জ্ঞানদাসের নয়, বৈষ্ণব কাব্য, এমন কি সর্বকালের একটি শ্রেষ্ঠ বাঙলা কবিতা—ইহা কতদুর গ্রহণীয় বিচার কর।

উত্তর। [অভাগিনীর আক্ষেপ কবিতার আলোচনা দ্রষ্টব্য।]

প্রশ্ন ১০। চণ্ডীদাসের প্রেমের তুলনা এবং জ্ঞানদাসের অভাগিনীর আক্ষেপ কবিতাদ্বয় অবলম্বনে কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপ নির্ণয় কর।

উত্তর। [চণ্ডীদাসের কবিতায় বৈষ্ণব প্রেমের স্বরূপ সম্পর্কে ৮৬ পৃষ্ঠার ব্যাখ্যাভুক্ত আলোচনা এবং জ্ঞানদাসের কবিতায় প্রেমের স্বরূপ সম্পর্কে ১২০ পৃষ্ঠার আলোচনা দ্রষ্টব্য।]

প্রশ্ন ১১। 'ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগসন্ধির আকাশে লগ্নবদলের নক্ষত্র'—মন্তব্যটি অবলম্বন করিয়া হরিহোড়ের বৃত্তান্ত কবিতায় এই যুগসন্ধির মনোভাব কী পরিমাণ প্রতিফলিত হইয়াছে আলোচনা কর।

উত্তর। [আলোচ্য কবিতার ভূমিকা ও আলোচনা দ্রষ্টব্য।]

আধুনিক যুগ

প্রশ্ন ১২। বাঙলা কাব্যে কবি মধুসূদন বিদ্রোহের প্রতীক। এই বিদ্রোহ কেবল কবিতার বিষয়বস্তুতে নয়, ভাষা ও ছন্দেও প্রতিফলিত হইয়াছিল। মিত্রাক্ষর নামক সনেটে কবিতার রীতির ক্ষেত্রে এই বিদ্রোহ তিনি ঘোষণা করিয়াছেন। আলোচনা কর।

উত্তর। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা কাব্যধারায় মধুসূদন দত্ত ভগীরথের দুশ্চর তপস্যায় স্বর্গীয় সুরধুনীর বেগবতী প্রবাহকে মর্ত্যমুখে পরিচালিত করিয়া, পুরাতন যুগের ভাবধারাকে প্লাবিত করিয়া এক নূতন যুগের প্রতিষ্ঠা সম্ভব করিয়াছিলেন। ইংরাজি শিক্ষা ও ইউরোপীয় চিন্তা তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তিকে মার্জিত করিয়াছিল। নবীন কালের যুক্তিবাদের আলোকচ্ছটা তাঁহাকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল বলিয়া তিনি তাহারই অভিজ্ঞতায় আমাদের অভ্যস্ত জীবনাচার ও প্রথাগত সাহিত্যে বিদ্রোহ উপস্থিত করিলেন। রামায়ণের বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া তিনি মেঘনাদবধ কাব্য লিখিলেন। কিন্তু তাহার পৌরাণিক ভূমিকা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়া আধুনিক কালের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ইহার পাত্রপাত্রীর বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করিলেন। বীরাঙ্গনা কাব্যে তিনি পুরাণ-প্রসিদ্ধ নায়িকাদের মুখে নবযুগের স্বাধীন আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আত্মমর্যাদার বাণী দান করিলেন। ব্রজাঙ্গনা কাব্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেম-প্রকাশের বৈষ্ণবীয় ঐতিহ্য গ্রহণ করিয়াও নূতন কালের স্বাধীনচিত্ত নায়িকার নির্ভীক প্রেম-নিবেদনের ভঙ্গি আরোপ করিলেন। চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে জীবনের অসংখ্য বাস্তব বিষয় অবলম্বন করিয়া তিনি কবিমনের ব্যক্তিগত সুখদুঃখ অনায়াসে সঞ্চারিত করিয়া দিলেন। কেবল বিষয়বস্তুতে নয়, ভাষা ছন্দ শব্দচয়ন এবং কাব্যের প্রকাশভঙ্গিতেও তিনি একটি স্পর্ধিত স্বাধীনতা ও

বলিষ্ঠ আধুনিকতা প্রকাশ করিলেন। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে দেবাসুরের সংগ্রামকে ভিত্তি করিয়া একটি নূতন ধরনের আখ্যায়িকা কাব্যের জন্ম হইল। মেঘনাদবধ কাব্যে রামায়ণের একটি ঘটনা অবলম্বন করিয়া তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যিক মহাকাব্যের মত অভিনব আঙ্গিক সৃষ্টি করিলেন। বীরাঙ্গনা কাব্য ইতালীয় পত্রকাব্যের প্রযুক্তির দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের মানবৃদ্ধি করিল. ব্রজাঙ্গনা কাব্য ধর্মসংস্কারমুক্ত রোমান্টিক গীতিকবিতার আবির্ভাব ঘোষণা করিল। চতুর্দশপদী কবিতাবলী ফরাসী এবং ইতালীয় সনেটের রীতি বাঙলা কাব্যে প্রতিষ্ঠিত করিল।

ছন্দের দিক হইতে তাঁহার বিদ্রোহ চরম আধুনিকতার প্রবর্তন করিয়াছে। চোদ্দ অক্ষরের স্বয়ংসম্পূর্ণ বাক্যে পয়ার রচনার যে রীতি আট-নয় শত বৎসরের বাঙলা কাব্যে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, তিনি তাহাকে করজোড়ে বিদায় দিয়া, সম্প্রসারিত বাক্যে, ভাবানুযায়ী দীর্ঘস্বস্থচক এবং অর্থানুযায়ী যতিস্থাপনপূর্বক, মিলহীন অথচ চতুর্দশ-অক্ষরের মূল অনুশাসন-ভুক্ত রাখিয়া এক আশ্চর্য সম্ভাবনাময় নূতন ছন্দের বিস্ময়কর সাফল্য ঘটাইলেন। এই ছন্দের নাম দেওয়া হইয়াছে অমিত্রাক্ষর ছন্দ। এই ছন্দ পয়ারের নিদ্রাবেশোদ্রেককারী সুরের বদলে মনোভাব প্রকাশের স্বাভাবিক বলিষ্ঠ রীতি অবলম্বন করিয়া কবিতাকে সর্বপ্রকার আধুনিক মনোভঙ্গি অকুণ্ঠভাবে অভিব্যক্ত করিতে সাহায্য করিয়াছে। ব্রজাঙ্গনা কাব্যে ত্রিপদীর পুরাতন রীতিকে সংস্কৃত করিয়া এবং আরও নূতন পর্ব-স্তবক উদ্ভাবন করিয়া তিনি গীতিকবিতার সংগীত-সুষমায় যুগান্তর আনিয়াছেন। শব্দের ক্ষেত্রে তৎসম শব্দের সার্থক ব্যবহার, বিশেষণ-প্রয়োগের মৌলিকতা, নামধাতুর সৃষ্টি ও প্রয়োগের দ্বারা ক্রিয়াপদের ব্যাপ্তি ঘটানো, তদ্ভব ও দেশি শব্দের মিশ্রণ, প্রতিশব্দ-ব্যবহারের কুশলতা—এইগুলিও কবিতার সম্ভাবনাকে অপরিসীম বাড়াইয়া দিয়াছে।

মিত্রাক্ষর কবিতার বিষয়বস্তু মধুসূদনের কবিবিদ্রোহের এই পটভূমিকায় স্থাপন করিয়া দেখিতে হইবে। মিত্রাক্ষর হইল কবিতার চরণান্ত মিল বা অন্ত্যানুপ্রাস। প্রাচীন কবিতার অন্যতম লক্ষণ উহার একঘেয়েমি—যতি-স্থাপনে, পরিমিত বাক্যে, শব্দের মৌলিকত্বার অভাবে, মিল-বিন্যাসে সর্বত্রই একটি ক্লান্ত পুনরুক্তি ছিল। মধুসূদন ইহার বিরুদ্ধে তিনটি বিদ্রোহ সংঘটিত

করাইলেন। প্রথমত, বাক্যকে একটি চরণেই অনিবার্যভাবে সমাপ্ত না করিয়া মনোভাব-অনুযায়ী তাহাকে একাধিক চরণে সম্প্রসারিত করিয়া দিলেন। দ্বিতীয়ত, আট ও ছয়মাত্রার পর যতি-স্থাপন-রীতি রক্ষা করিয়াও অর্থ-অনুযায়ী যে-কোনও অক্ষরের পর আর একপ্রকার অর্থযতিকে অপরিহার্য করিয়া তুলিলেন। তৃতীয়ত, প্রতি চরণের শেষে মিল বা ধ্বনিসাম্য রচনার দ্বারা যে কৃত্রিম শ্রুতিমাধুর্য সৃষ্টি হইত, তাহা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিলেন। চরণের শেষে মিল ব্যবহার করা একপ্রকার পরাধীন মনোভাবেরই সূচক। কেবল মিলের জন্যই মিল-ব্যবহার করায় বাক্যকে ভাবানুযায়ী স্বাধীন না করিয়া মিলানুযায়ী পরিবর্তিত করিতে হয়—সুতরাং 'মিল বা মিত্রাক্ষররূপ পরাধীনতার এই শেষ চিহ্নটিকে খণ্ডন করিবার বিদ্রোহী ঘোষণাই বর্তমান মিত্রাক্ষর কবিতার বিষয়বস্তু। চরণশেষের অন্ত্যপ্রাস কবির কাছে যেন নারীর শ্রীচরণে পরাধীনতা ও কুসংস্কারের প্রতীক নিষ্ঠুর লৌহশৃঙ্খল—'মিত্রাক্ষররূপ বেড়ি'। কবিতার কোমল চরণে এই মিত্রাক্ষররূপ বেড়ি পরানো কবিতাকে ভাবের দিক হইতে সঙ্কুচিত করা মাত্র। কারণ কবিতার উদ্দেশ্য মুক্তি, বন্ধন তাহাকে সুশ্রী করে না। কমলকে কি রঙ দিয়া রাঙাইতে হয়? জাহ্নবীর জলকে কি মন্ত্রে পবিত্র করিতে হয়? প্রকৃত কবিতা আপন ভাবধনে সমৃদ্ধ—এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই কবি কবিতার চরণ হইতে মিত্রাক্ষর-ভঙ্গের দাবী উত্থাপন করিয়াছেন। কবিতার রীতির ক্ষেত্রে ইহাই মধুসূদনের বিদ্রোহের পরিচায়ক। অবশ্য সনেটের নিয়মানুসারে মিত্রাক্ষর নামক কবিতাটিতে কিন্তু মিল আছে।

প্রশ্ন ১৩। 'শোকের ভিতর দিয়া ভাববিভোর চিত্তে কেমন করিয়া বাণীমূর্তি সরস্বতীর দিব্য-উদ্ভাসন ঘটে, ইহাই বিহারীলাল চক্রবর্তীর আদি-কবি কবিতার বিষয়বস্তু'। মন্তব্যটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর। [আদি-কবি কবিতার আলোচনা এবং শেষ ব্যাখ্যাটি দ্রষ্টব্য]।

প্রশ্ন ১৪। আত্মবিলাপ জাতীয় কবিতার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ-পূর্বক হেমচন্দ্রের জীবন-মরীচিকা কবিতাটিকে আত্মবিলাপ কবিতার উদাহরণরূপে গ্রহণ করা যায় কিনা আলোচনা কর।

। [জীবন-মরীচিকা কবিতার ভূমিকা ৩১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

প্রশ্ন ১৫। মধুসূদনের বহু পরিচিত আত্মবিলাপ ('আশার ছলনে ভুলি কী ফল লভিনু হায়') কবিতার সহিত হেমচন্দ্রের জীবন-মরীচিকা কবিতার তুলনামূলক আলোচনা কর।

উত্তর। [হেমচন্দ্রের জীবন-মরীচিকা কবিতার শেষাংশ ও আলোচনায় এই তুলনামূলক বিচার করা হইয়াছে।]

প্রশ্ন ১৬। 'রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিবাবসানে কবিতাটি অনুবাদ কবিতা হইলেও ইহা একটি মৌলিক কবিতার মর্যাদা লাভ করিয়াছে।' কী-গুণে ইহা মৌলিক কবিতার মর্যাদা লাভ করিয়াছে বিশদ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর। [দিবাবসানে কবিতার ভূমিকা ও আলোচনার প্রথমাংশ দেখ]।

প্রশ্ন ১৭। নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণার্জুন কবিতায় অর্জুন ও কৃষ্ণের সংলাপের উপলক্ষটি ব্যাখ্যা কর। এই কথোপকথনের ভিতর দিয়া অর্জুন ও কৃষ্ণের জীবনের যে মহান কর্তব্য-পালনের আভাস পাওয়া যাইতেছে, এ বিষয়ে তোমার ধারণাটি পরিস্ফুট কর।

উত্তর। [আলোচ্য কবিতার ভূমিকার শেষ অনুচ্ছেদ (পৃ. ৩৪২) এবং আলোচনার প্রথমাংশ দ্রষ্টব্য। ব্যাখ্যার পর যে প্রথম প্রশ্নের উত্তর আছে তাহাও এই প্রসঙ্গে পঠনীয়]।

প্রশ্ন ১৮। দেবেন্দ্রনাথ সেন রূপদ্রষ্টা কবি, আপনাকে তিনি রূপের পূজারী বলিয়াছেন। তাঁহার রূপদৃষ্টির এই বৈশিষ্ট্য বৈশাখ কবিতায় পাওয়া যায় কি ?

উত্তর। [ভাবার্থ ও আলোচনা অবলম্বনে প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে]।

প্রশ্ন ১৯। অক্ষয়কুমার বড়ালের জিজ্ঞাসা কবিতাটি কবির শোককাব্য এষা হইতে উদ্ধৃত। ব্যক্তিগত শোককে কবি কিরূপে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসায় পরিণত করিয়াছেন, কবিতার বিষয়বস্তু অবলম্বনে তাহা বুঝাইয়া দাও।

উত্তর। [প্রথমে আলোচনা পরে ভাবার্থ উদ্ধৃত করিলেই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাইবে।]

প্রশ্ন ২০। 'চলে যা রে সুখের রাজ্য, দুখের রাজ্য নেমে আয়' —দ্বিজেন্দ্রলালের হাসি ও অশ্রু কবিতায় এই 'দুখের রাজ্য' বলিতে কবি যে অশ্রুলোক রচনা করিয়াছেন, কবির বর্ণনা অনুযায়ী তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

প্রশ্ন ২১। হাসি ও অশ্রু কবিতায় হাস্যরসিক দ্বিজেন্দ্রলাল অশ্রুকে হাসির বিরুদ্ধে স্থাপন করিয়াছেন কেন, বুঝাইয়া দাও।

প্রশ্ন ২২। 'দ্বিজেন্দ্রলাল হাসি ও অশ্রু কবিতায় কেবল অশ্রুর প্রতি আকর্ষণমাত্র দেখান নাই, ইহার ভিতর দিয়া মনুষ্যত্বের একটি মহান্ আদর্শের পরিচয় দিয়াছেন। এইখানেই কবিতাটির সার্থকতা'। মন্তব্যটি বিচার কর।

উত্তর। [তিনটি প্রশ্নের উত্তরসংকেতই আলোচ্য কবিতার প্রাসঙ্গিক আলোচনায় পাওয়া যাইবে। উক্ত কবিতার সহিত যে প্রশ্নোত্তর আছে তাহাও এই সূত্রে পঠিতব্য।]

প্রশ্ন ২৩। যথার্থ নিসর্গ-কবিতা কাহাকে বলে? করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের রেবা কবিতাটির মধ্যে নিসর্গ-কবিতার লক্ষণ কী পরিমাণে আছে, আলোচনা কর।

উত্তর। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগতের মধ্যে প্রকৃতি বা নিসর্গের স্থান মানব-জীবনের পরই। চিরকাল মানুষ প্রকৃতির লতাপাতা পুষ্পপল্লব নদী-আকাশ-বাতাস-অরণ্য-প্রান্তরের মধ্যে এক অসীম সৌন্দর্য আবিষ্কার করিয়াছে। মানব-জীবনের প্রতিবেশীরূপে নিসর্গ মানুষকে চিরকাল সঙ্গদান করিয়া তাহাকে লালন করিয়াছে, শৈশব হইতে যৌবনে পরিণত করিয়া তুলিয়াছে। আতিথ্যে স্নেহে সখ্যে মানব-সংসারের কর্মপাশবদ্ধ জীবন সে মধুর করিয়া তুলিতেছে। এইজন্য সাহিত্যে নিসর্গের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা সর্বদেশে সর্বকালেই দেখা যায়। প্রকৃতির দৃশ্যরূপের শোভাময়ী বর্ণনা, প্রকৃতির অভ্যন্তরে একটি চৈতন্যময়ীর অস্তিত্ব অনুভব, মানব-জীবনের সহচর হিসাবে প্রকৃতিকে সম্বোধন করা—সাহিত্যে কাব্যে-নাটকে পরিচিত রীতি। সুতরাং যে কবিতায় প্রকৃতির চিত্রময়ী বর্ণনা থাকে, প্রকৃতির উপর চেতনা আরোপ করিয়া কবি প্রকৃতির সহিত মানব-সম্বন্ধ স্থাপন করেন, তাহাকেই নিসর্গ-কবিতা বলা যায়।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের রেবা কবিতাটি একটি মিশ্র নিসর্গ কবিতা। রেবা-নদীর দৃষ্টিগ্রাহ্য সৌন্দর্যই আলোচ্য কবিতায় কবির প্রেরণা হইলেও শেষ পর্যন্ত রেবা তাঁহার দৃষ্টিলোক হইতে অপসারিত হইয়া মনোলোকে স্থানান্তরিত হইয়াছে। আলোচ্য কবিতায় স্পষ্টত দুইটি নদীর বর্ণনা আছে—একটি ইন্দ্রিয়গম্য নদী, আর একটি স্মৃতিনদী—পুরাণে ইতিহাসে যাহার মনোরম বিবরণ পাওয়া যায়। বাস্তব নদীকে দেখিয়াই কবি প্রথমে তাহার সৌন্দর্যে বিহ্বল ও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছেন। কিন্তু একই সঙ্গে এই নদীর অতীত স্মৃতিগুলি তাঁহার মানস-পটে ভাসিয়া উঠিয়াছে। এই পুরা-সৌন্দর্য-ব্যাকুল স্বপ্নসন্ধানী দৃষ্টির জন্য রেবা কবিতাটি নিসর্গ-কবিতা হইতে মুহূর্তে রোমান্টিক স্মৃতিমূলক কবিতায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু যথার্থ রোমান্টিক কবিতা অতীতের স্বপ্নকণিকার দিকেই ধাবমান, বর্তমান তাহার নিকট ক্লান্ত সৌন্দর্যহীন। এই দিক দিয়া করুণানিধানের রেবা কবিতাটি শেষ পর্যন্ত খাটি রোমান্টিক কবিতাও হইয়া উঠে নাই। এই কারণেই ইহাকে মিশ্র নিসর্গ-কবিতা বলা যায়।

রেবা কবিতার প্রথম দুইটি স্তবকে পর্বতপ্রবাহিনী রেবার নয়নবিমোহন রূপটি কয়েকটি বর্ণাঢ্য রেখাসম্পাতে অঙ্কিত হইয়াছে। রেবা যেন একটি উন্মাদিনী নারী—অপরূপ তাহার অঙ্গকান্তি, বিন্যস্ত কেশবীথি দুলাইয়া ফেন-হিল্লোলে কলকল্লোলে ছুটিয়া চলিয়াছে। একটিমাত্র সংক্ষিপ্ত চরণে একটি পার্বত্য জলপ্রবাহের এরূপ রমণীয় বর্ণনা নিসর্গ-শোভাচিত্রকর করুণানিধানের কৃতিত্বেরই পরিচায়ক। পরবর্তী চরণগুলিতে রূপবতী রেবার আলেখ্যটি বর্ণনার স্বাভাবিকতায় যেন এক মুহূর্তে পাঠকদের দৃষ্টিগ্রাহ্য হইয়া উঠে। পর্বত সানুদেশে নিশ্ছিদ্র অরণ্য—সেই অরণ্যের গভীর অন্ধকার হইতে কলশব্দে পাথরে পাথরে ঝাঁপাইয়া দুরন্ত ধারায় রেবা নীল আকাশের নীচে আসিয়া পড়িতেছে। পথে একাধিক জলপ্রপাত থাকায় পর্বত-আহত নদীর জলকণাগুলি সূর্যালোকে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ধূম্রবর্ণের একটি কুয়াশা সৃষ্টি করিতেছে। মনে হইতেছে যেন সে কোনো রহস্যময়ী রমণী—এই কুন্দবর্ণ বারিধূমের দ্বারা তাহার ঘোমটা ঢাকিয়া রাখিয়াছে। তাহার এই প্রমত্ত কলনাদ, উদ্দাম গতিভঙ্গি দেখিয়া মনে হয় সে কোনো আশ্চর্য মন্ত্রবলে পর্বতের কারাপ্রাচীর বিদীর্ণ করিয়া বাহিরে আসিল। কবি দেখিয়াছেন, ফাল্গুন মাসের বাসন্তী সন্ধ্যায় যখন প্রকৃতির সর্বত্র একটি অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের সমারোহ ঘটে, তখন যেন রেবা অপরূপ হইয়া উঠে। কান পাতিলে শোনা যায়, কোন স্বর্গলোকের দেবকন্যাদের চারুচরণের নূপুর-নিক্বণ ও মঞ্জীরধ্বনি বাজিতেছে এই নদীর

তরঙ্গ-উত্তরোল ছন্দে। সমগ্র প্রকৃতিসুন্দরী তখন স্মিতহাস্যে শোভাভিরাম-রূপ ধারণ করেন। এই যে প্রকৃতিকে নিসর্গলক্ষ্মীরূপে বর্ণনা করা, তাঁহার কমলমুখের স্মিতহাস্যে চতুর্দিক আচ্ছন্ন করিয়া দেখা, ইহা নিসর্গ-কবিতারই স্বভাব। কবি যখন রেবাকে সমুদ্রের সহিত মিলনের জন্য স্বয়ংবরা কন্যারূপে দেখিয়াছেন, তখনও রেবা নিসর্গের কবিতা। কিন্তু পরবর্তী স্তবকে রেবার ভৌগোলিক রূপ তিরোহিত হইয়া পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক রূপই কবির মানসনেত্রে ভাসমান হইয়াছে। রেবাকে কবি দেখিয়াছেন অতীত ভারতের কাল্পনিক সৌন্দর্যপটে। সেখানেও নিসর্গচিত্ররূপেই রেবার বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু এই নিসর্গ মানসলোকের। কবিতার শেষ চরণে আবার কবিদৃষ্টি বাস্তবে স্থানান্তরিত হইয়াছে। সূর্যালোকিত রেবার উজ্জ্বল উপকূল হইতে কবি গোলাকৃতি মার্বল পাথরের টুকরা কুড়াইয়াছেন দুই হাতের মুঠি পূর্ণ করিয়া, রেবার বক্ষ হইতে সংগৃহীত স্মৃতিরূপে তাহাদের তিনি রক্ষা করিবেন এই প্রতিজ্ঞায়। মোটের উপর, স্বপ্নে ও সৌন্দর্যে, কল্পনায় ও বাস্তবে, দৃষ্টিলোকে ও মনোলোকে মিশ্রিত হইয়া রেবা করুণানিধানের একটি সার্থক কবিতা।

প্রশ্ন ২৪। 'রোমাণ্টিক স্বপ্নসন্ধানীর দৃষ্টিতে করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় রেবা কবিতাটি লিখিয়াছেন। স্বপ্নে সৌন্দর্যে বাস্তবে ও কল্পনায় ইহা অপরূপ'—আলোচনা কর।

উত্তর। [রেবা কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে রোমাণ্টিক কবিতার স্বভাব বৈশিষ্ট্য বিবৃত হইয়াছে। ইহার সহিত ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।]

প্রশ্ন ২৫। করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের রেবা, যতীন্দ্রমোহন বাগচীর মাধবিকা এবং কুমুদরঞ্জন মল্লিকের গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড কবিতাত্রয়ী অবলম্বনে এই তিনজন কবির কাব্য বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

উত্তর। [তিনজন কবির প্রাসঙ্গিক ভূমিকা অবলম্বনে আলোচনা কর।]

প্রশ্ন ২৬। রবীন্দ্রোত্তর যুগের কাব্যলক্ষণ সংক্ষেপে নির্দেশ-পূর্বক এই যুগের কবিগোষ্ঠীর মধ্যে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার এবং নজরুল ইসলামের পঠিত কবিতাবলী লইয়া তুলনামূলক কাব্যবিচার কর।

উত্তর। [প্রাসঙ্গিক ভূমিকা ও আলোচনা দ্রষ্টব্য।]